বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া : বিশ শতকের ষাটের দশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি
ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জানুয়ারি ২০২০

আহম্মেদ শরীফ
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বাংলাদেশ

বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া : বিশ শতকের ষাটের দশক

আহম্মেদ শরীফ
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি
ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জানুয়ারি ২০২০

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আহম্মেদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে আমার তত্ত্বাবধানে 'বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া : বিশ শতকের ষাটের দশক' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। আমার বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমি পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদানের সুপারিশ করছি।

ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে দাখিলকৃত 'বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া : বিশ শতকের ষাটের দশক' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপন করি নি।

আহম্মেদ শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদন

পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য 'বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া : বিশ শতকের ষাটের দশক' শিরোনামে গবেষণার রূপরেখা জমা দেওয়ার পর ইতিহাস বিভাগ অধ্যাপক মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুনকে তত্ত্বাবধায়ক করে অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করে। সৌভাগ্যের বিষয় আমার তত্ত্বাবধায়ক ষাটের দশকের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে বেড়ে ওঠেছেন। তাই তিনি প্রতিটি বিষয়ের তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমাকে গঠনমূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক বর্তমান গবেষণায় আমাকে সাহস ও পরামর্শ দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণার সার্বিক বিষয়ে শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে একান্তভাবে সহায়তা করেছেন। গবেষণার প্রয়োজনে আমার জন্য উন্মুক্ত করেছেন তাঁর জ্ঞানের দ্বার ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। তিনি নিজের লেখা বই, সংগৃহীত গ্রন্থাবলি, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, ম্যাগাজিন, জার্নাল ও প্রবন্ধ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমার জমা দেওয়া অধ্যায়গুলো তিনি যত্ন সহকারে পড়েছেন এবং আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর সদয় সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় আমার অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষণার শুরু থেকে অভিসন্দর্ভ জমাদানের পূর্ব পর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য সহযোগিতা আমি পেয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ ও গবেষণার খোঁজখবর নিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আমার কর্মস্থল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ সার্বক্ষণিকভাবে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া অধ্যাপক ড. আবু মো. ইকবাল রুমি শাহ্, সহযোগী অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান শাহীন ও সালা উদ্দিনসহ অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ গবেষণাকর্মটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদাই উৎসাহিত করেছেন। আমার গবেষণাকর্মে সাহিত্য বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন–নিপা জাহান। তাঁদের সকলের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাকর্মটি যাদের সহযোগিতা না থাকলে কঠিন হতো তাদের মধ্যে রয়েছেন–লেখক ও গবেষক মামুন সিদ্দিকী ও তপন পালিত। এছাড়া ড. মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান, ড. চৌধুরী শহীদ কাদের, মিঠুন সাহা ও শান্তা পত্রনবীশসহ অনেকে মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

অশেষ ধন্যবাদ জানাই বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা রাজিব কুমার সাহাকে। যিনি যত্নসহকারে অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে বানান সংশোধন করতে আমাকে সহায়তা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরও সহযোগিতা পেয়েছি পাবনা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হাবিবুল্লাহ্‌র। যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রকিব সিদ্দিকী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিবুল হাসানসহ অনেকে।

পিএইচ.ডি ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ জমাদানের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বিশেষ করে মো. মাসুদূর রহমান, মো. ফয়সাল আখতার, চন্দন কুমার বিশ্বাস, শৈশব দে ও রতন কুমার দেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণার প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভস, প্রেস ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও হেরিটেজ আর্কাইভস। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই তাদের নিবিড় সহযোগিতার জন্য।

আমার বন্ধুরা সবসময় গবেষণার অগ্রগতির খোঁজখবর নিয়ে উৎসাহিত করেছেন আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। গবেষণাকালে অনেকে আমাকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আমার সেই সব শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমি অত্যন্ত ঋণী।

আমার গবেষণাকর্মে সবসময় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন ও মামারা। আমি আমার পরিবারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আহম্মেদ শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

বাংলাভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতির ইতিহাস শুরু। কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে বাঙালি নিজেদের এক মনে করে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে দেশ গঠনের একটা প্রয়াস প্রাচীনকাল থেকে করে আসছিল। বাঙালি যে বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে এক হওয়ার চেষ্টা করেছে তা সবসময় একই রকম ছিল না, তবে বৈশিষ্ট্যসমূহের মৌলিক দর্শন ছিল একটি, তাহলো ভাষা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য। বাঙালির এই বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনার মাধ্যমে বাঙালিত্বকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কীভাবে ষাটের দশকে বাঙালিত্ব স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় পূর্ববঙ্গকে সুনির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে এবং তা কেন পশ্চিম বাংলা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র তা স্পষ্টকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙালিত্বের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি লাভ কীভাবে হলো এবং তার সঙ্গে পূর্ববঙ্গ কীভাবে সম্পৃক্ত ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

নব্যসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভাষা আন্দোলনের পর দুইবার সামরিক শাসন এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শাসকশ্রেণি শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগের পাশাপাশি পূর্ব বাংলার ভাষা, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করারও সমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করে। শাসকগোষ্ঠী এ উদ্দেশ্যে বাঙালিত্বের সবথেকে বড়ো উপাদান বাংলাভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু বাঙালি ৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আত্মদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা রূপে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে বাধা দেয়। শুধু তাই নয় ষাটের দশকে শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে তা সবই ব্যর্থ করে দেয়। শাসকগোষ্ঠী আরবি ও রোমান হরফে বাংলা লেখা, বাংলা বর্ণমালা-সংস্কারে উদ্যোগ, বাংলা ভাষায় অনাবশ্যকভাবে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাঙালি সংস্কৃতির বিভাজন, বাংলা নববর্ষ-উদ্‌যাপন, ঋতু-উৎসব-পালন কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রচর্চার বিরোধিতা ও বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার বন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যত বেশি সরকারি বাধা এসেছে, বাঙালিরা ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত আত্মপরিচয় সম্পর্কে ক্রমে সচেতন হয়েছে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ততোই ঘটেছে। বাংলাভাষা ও জাতীয়তাবাদের গলা টিপে ধরার সব রকমের অপচেষ্টাকে বানচাল করে দেয় বাংলার জনতা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মীদের নির্যাতন, কারাগারে প্রেরণ, নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে চক্রান্তের মাধ্যমে বাতিল করা, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতিদানে বিলম্ব, শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালিকে পশ্চাৎপদ রাখার ষড়যন্ত্র, বাঙালি পুঁজির বিকাশে বাধাদান প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সচেতন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে পাকিস্তানি প্রশাসনের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা তীব্র রূপ ধারণ করে। মননচর্চায় বাঙালি পাঞ্জাবি বা বেলুচদের থেকে পিছিয়ে নেই। তাহলে কেন প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর থেকে বাঙালি পিছিয়ে থাকবে? অন্য জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা নিপীড়ন হবে? এই কথা শিক্ষিত বাঙালিরা বুঝতে পারলো যে তারা পশ্চিম পাকিস্তানি জাতিগোষ্ঠীর অধীনস্ত হয়ে গেছে। শিক্ষিত সচেতন বাঙালিরা সিদ্ধান্তে পৌঁছায় এই রাষ্ট্র তাদের নয়। যদি তাদের রাষ্ট্র হতো তাহলে শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালিকে অধস্তন করে রাখার চেষ্টা করতো না। ফলে বাঙালি শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে থাকে। কিন্তু তা সরল রৈখিক ছিল না। শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য অনবরত চেষ্টা করতে থাকে। বাঙালির ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিপক্ষে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মের ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, ধর্মকে অবলম্বন করে তারা জাতিগত নিপীড়ন করেছে।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে বাঙালির সকল ধরনের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেয়। বাঙালিরা পাকিস্তানিদের সামরিক শাসন মেনে না নিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য আন্দোলন করতে থাকে। এ সময় ছাত্র সংগঠনের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। ছাত্রদের মাধ্যমে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আন্দোলন। ১৯৬২ সাল থেকে পাকিস্তানের সামরিক শাসন গণপ্রতিরোধের মুখে পড়ে। তারপর ধাপে ধাপে বিকশিত হয়–ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সর্বোপরি বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠী কারফিউ, সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা সহ বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষণার পর বাঙালির মধ্যে যে স্বাধীনতার তৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছিল তা এইসব বাধাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। বাঙালি স্লোগান তোলে 'কারফিউ ভাঙব, রাস্তায় নামব।' ষাটের দশকের বাঙালিত্বে যে স্ফুরণ তা ধারণ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণরা। বাঙালিত্বের বিকাশ, রাষ্ট্র সাধনা ও তরুণদের মনে চাওয়ার বিষয়গুলোকে ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নেতাগণ কাজে লাগিয়েছিলেন বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু। তেমনি তরুণরাও আবার বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চাপেও রেখেছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। ষাটের দশকের আন্দোলন-সংগ্রামে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় সবাই সরাসরি জড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৮-৬৯-এর গণ-আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে ছাত্রদের আন্দোলনই প্রাধান্য পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশে দেশে বঞ্চিত মানুষের পক্ষে প্রগতিশীল শক্তি বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও মুক্তিসংগ্রাম থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে। এসময় কঙ্গোর প্রতিষ্ঠাতা প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বে

Dhaka University Institutional Repository

প্রচণ্ড ঘৃণা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ ঘটনা বাংলাদেশেও নতুন প্রজন্মকে স্পর্শ করেছিল তার প্রমাণ ঐ সময় *দৈনিক সংবাদের* উপসম্পাদকীয় পাতায় আসাদ চৌধুরীর কবিতা 'ইতিহাসের আরেক নায়ক' ছাপা হয়েছিল। শুধু পত্রিকার খবরেই সীমাবদ্ধ থাকে নি তা বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি ভিয়েতনামে মার্কিন ধ্বংসযজ্ঞ বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রের প্রথম পাতার খবর হয়ে ওঠে। ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল বাংলাদেশেও। এ সময় পৃথিবীব্যাপী একটা উদারনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। এই পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন জাতিগুলো নিজেদেরকে স্বাধীনতার দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর করে। এই জাতিসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা বাঙালিরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

পূর্ববাংলার জনগণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তায় যে পরিবর্তন হয়েছে তার প্রতিফলন ঘটেছে তৎকালীন কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটোগল্প ও প্রবন্ধসহ সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলনের পর প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও সংগ্রামকে অবলম্বন করে শাসকগোষ্ঠীর কাছে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এক বিশেষ শ্রেণির সাহিত্য রচিত হয়। এই ধারার বিকাশে আরও বৈচিত্র্য ও গভীরতা এসেছে শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে রচিত কবিতাসমূহের মাধ্যমে। এ কবিতাগুলোয় মুখ্য হয়েছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবাদী বক্তব্য; বাংলাভাষা সংস্কারের মুখে রচিত হয়েছে আবেগোদ্বেল কবিতা, পূর্ববাংলার জনজীবনের দুর্দশাকে কবিগণ কবিতায় এনেছেন বেদনা ও দরদের সঙ্গে, কেউ কেউ লোকায়ত ঐতিহ্যকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে উপজীব্য করেছেন বাংলার প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি ও আবিষ্কারের আশায়। সমাজে পরিবর্তন নিয়ে আসার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও গণজাগরণমূলক সাহিত্য রচিত হয়েছে এ সময়। লেখকগণ এ ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন অন্যায়-অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে। কবি-সাহিত্যিকদের লেখনি বাঙালি তরুণদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে, ছাত্ররা দেশবাসীকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করতে চেষ্টা করেছে। এদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পাকিস্তানের জন্মসূত্রের ফাঁক ও ফাঁকি।

উনসত্তরের অভ্যুত্থানের পর সত্তর সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বাঙালি কবি-সাহিত্যিকগণ এ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তাদের কাছে মনে হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা এখন অর্থহীন ও অপমানজনক। তাই পাকিস্তানি শোষকদের কবি সিকান্দার আবু জাফর বাংলা ছাড়ার আদেশ দিয়েছেন 'বাংলা ছাড়ো' কবিতায় :

> কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে/কেউটে সাপের ঝাঁপি!/আমার হাতেই নিলাম আমার/নির্ভরতার চাবি; তুমি আমার আকাশ থেকে/সরাও তোমার ছায়া,/তুমি বাংলা ছাড়ো।

পরবর্তী সময়ে কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো আর কবির কথা হয়ে থাকেনি, বাংলার জনগণের কথা কবির কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে। শ্লোকগুলো কবির কলম থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে বাঙালি নিজের করে নিয়েছিল। বলা যায় 'বাংলা ছাড়ো' কবিতাটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কাব্য-ভিত্তি রচনা করেছিল।

আবার উল্টো দিকে রাজনীতিও শিল্প-সাহিত্যের শাখাগুলোকে প্রভাবিত করেছিল। ৭ই মার্চের ভাষণ সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। কবিগণ ৭ই মার্চ নিয়ে কবিতা লিখেন। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে যে ভাষণ দেন তাঁর মুখ থেকে বাণী আকারে বের হওয়ার সাথে তা জনগণের হয়ে যায়। কবি জসীম উদ্‌দীন ১৬ মার্চ রেডিওতে নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি করেন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর লেখা তাঁর কবিতা।

> মুজিবুর রহমান/ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।/বঙ্গদেশের এ-প্রান্তে হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে,/জ্বালায় জ্বলিয়ে মহাকালানল ঝঞ্ঝ-অশনি বেয়ে/ .../জীবন দানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনানী পাছে,/তোমার হুকুম তামিলে লাগি সাথে তব চলিয়াছে।/রাজ ভয় আর কারাশৃঙ্খল হেলায় করেছে জয়/ফাঁসির মঞ্চে মহত্ত্ব তব কখনো হয়নি ক্ষয়।/বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ,/প্রতি বাঙালীর হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার তক্ত-তাজ।/তোমার একটি আঙুল হেলনে অচল সে সরকার/অফিসে অফিসে তালা লেগেছে গেছে-স্তব্ধ হুকুমদার।

এইভাবে পুরো ষাটের দশকে কখনও সাহিত্য রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে, আবার কখনও রাজনীতি হয়ে ওঠেছে সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। কখনওবা সমান্তরালভাবেই চলে রাজনীতি ও সাহিত্য। তাই দেখা যায় ১৯৬২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশকে স্বাধীন করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রি জহওরলাল নেহেরুর সাথে যোগাযোগ করছেন, ঠিক একই সময় কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখছেন 'স্বাধীনতা' কবিতাটি। একই সময়ে সমান্তরালভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাহিত্যিকগণ স্বাধীনতার কথা বলছেন বা ভাবছেন। এর অর্থ হলো সমাজ সার্বিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হওয়া শুরু করেছিল। তাই রাজনীতিক, শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের ভাবনা এক বিন্দুতে উপনীত হয়েছিল। এভাবে সাহিত্য ষাটের দশকের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এবং জনগণকে জাগরিত করে।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পকলার মাধ্যম–চিত্রকলা; স্থাপত্য, দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্য; চলচ্চিত্র; মঞ্চনাটক; গণসংগীত; নৃত্যকলা; যাত্রা; বেতার ও কবিতা-আবৃত্তি প্রভৃতি সৃজনশীল সাংস্কৃতিক উপাদান মানুষকে দ্রুত নাড়া দেয় এবং একটি আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। শিল্পীগণ তাদের সৃষ্টিকর্মে সমকালীন সামাজিক বৈষম্য, ধনবৈষম্য এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে তার প্রতি আঘাত করেন। এক্ষেত্রে শিল্পীগণ ব্যবহার করেন জাতির নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু শিল্পকলা নয়, এক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে বাঙালির মানসগঠনে। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরের সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রই প্রস্তুত করেনি, কখনও কখনও রাজনৈতিক সংগ্রামের বিকল্প হিসেবেও কাজ করেছে। বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিল্পসংস্কৃতিতে সামন্তবাদী ও ধর্মীয় জীবনভাবনা ও মূল্যবোধের প্রাধান্য ছিল। বাঙালিরা নিজেদের শিল্প ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তার মাধ্যমে আত্মসঞ্জীবনের চেষ্টা করে। এজন্যে অনেকগুলো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন পঞ্চাশের দশকে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলে। একালপর্বে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সাহিত্যসভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, গণমুখী ও দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা, নাটক, নৃত্যকলা, চলচ্চিত্র পরিবেশনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপট সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইসব সাংস্কৃতিক কার্যক্রম রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য মানসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয়। একাজে কেন্দ্রের ভূমিকাকে পরিপুষ্ট, প্রবল ও প্রভাবিত করে প্রান্তের সাহিত্য; সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও সংগঠনসমূহ। এইসব সম্মেলন ও সংগঠনসমূহ সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তোলে। যা অন্তিমে বাঙালিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে প্রেরণা জোগায়। এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন, প্রান্ত ও কেন্দ্র যেমন একে অপরকে প্রভাবিত করে, তেমনি রাজনীতিকেও সমানভাবে প্রভাবিত করে। এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনগুলো বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণের সাংস্কৃতিক ভিত ভূমি।

দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংবাদ ও সাময়িকপত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসন, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬ দফা এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে সংবাদপত্র ছিল পূর্ব বাংলার জনসাধারণের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ষাটের দশকে শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র সাধারণ মানুষকে জাগানোর চেষ্টা করেছে। তাই, পাকিস্তানি শাসকদের নির্যাতনের শিকার হন–*দৈনিক ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। বহুবার তিনি কারা রুদ্ধ হন। কিন্তু কোনো নির্যাতনই তাঁকে ও তাঁর দৈনিক পত্রিকা *ইত্তেফাক*কে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬২ সালে জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেখানে বলা হয়েছিল, 'মানিক মিয়া ঢাকায় থেকে নিয়মিত স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও দাবি নিয়ে ইত্তেফাকে লিখে জনগণকে প্রস্তুত করবে'। শেখ মুজিবুর রহমান *ইত্তেফাক*কে ঘিরে যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা সফল হওয়ায় মূলত পত্রিকাটি সরকারের তোপের মুখে পড়ে। তারপরেও সংবাদপত্র বাংলার মানুষকে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। ১৯৬৪ সালের ১৭ জানুয়ারি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে *ইত্তেফাক*, *আজাদ* ও *সংবাদে*র প্রথম পৃষ্ঠায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়ে দাঁড়াও' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। শুধু সংবাদপত্রকর্মীরা সংবাদ প্রচার করে ক্ষান্ত হননি তারা আইয়ুববিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে সভাপতি করে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন। শাসকশ্রেণির দমনপীড়নের মুখে যেসব পত্রিকা জনগণের কথা লিখেছে তাদের ওপর নেমে এসেছে নিষেধাজ্ঞার খড়্গ। ৭ জুনের হরতাল সম্পর্কে খবর প্রকাশের কারণে ১৭ জুন (১৯৬৬) *দৈনিক ইত্তেফাক*কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পূর্ববাংলার বেশিরভাগ সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। এসব আন্দোলন-সংগ্রাম, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও পূর্বপাকিস্তানের প্রতি হওয়া অন্যায় তুলে এনে সংবাদপত্র কীভাবে জনগণকে সচেতন করে তোলে এবং শাসকগোষ্ঠীর ভিত দুর্বল করে দেয় তা পরিস্ফুটিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন পত্রিকা, সাহিত্য ও লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সম্পাদকীয়, দর্শন, বৈশিষ্ট্য, লেখার বিষয় ইত্যাদি আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কীভাবে তা বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করেছিল।

শোষণ, বঞ্চনা শুধু পাকিস্তান আমলে নয়, প্রাচীন আমল থেকেই প্রতিনিয়ত এই ভূখণ্ডে হয়ে এসেছে। সেজন্য প্রতিরোধও হয়েছে কিন্তু দেশ স্বাধীন হয় নি। ষাটের দশকে ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে আসা অভিঘাতগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির আলাদা এই বোধটা তৈরি হয়। বাঙালি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তারা একই ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও জাতিগতভাবে ভিন্ন। তারা বাঙালি। বাঙালির মধ্যে নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক যে বোধ তৈরি হয় তা বাঙালিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যায়। ষাটের দশকের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে পূর্ব বঙ্গবাসী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ থেকে মুক্তির পক্ষে রায় দিয়েছে। বাঙালি জাতিসত্তার এই চেতনাকে উজ্জীবিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কাজী নজরুল ইসলাম 'বাঙালির বাঙলা' প্রবন্ধে বলেছিলেন, "বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে–'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে।" কবি কাজী নজরুলের সেই ঐক্যের আশা পূর্ণ হলো ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্য দিয়ে। এই রকম ঐক্যবদ্ধ বাঙালি কখনো হয়নি। বাঙালি দীর্ঘ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে সেই জায়গায় উপনীত হয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি নজরুলের সেই 'অসাধ্য সাধন' করে লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। বাংলাকে নিজের করে পায়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা : ১-৯
প্রথম অধ্যায় : বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া ১০-৬৬
দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট ৬৭-১৪৯
(আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক)
তৃতীয় অধ্যায় : মননচর্চা ও মানসজগৎ ১৫০-২৬০
চতুর্থ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নির্মাণে শিল্পকলার ভূমিকা ২৬১-৩৩৬
পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা.................................. ৩৩৭-৪৩০
ষষ্ঠ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে পত্র-পত্রিকার অবদান ৪৩১-৫০২
গবেষণার ফলাফল ও উপসংহার : ৫০৩-৫১২
পরিশিষ্ট : ৫১৩-৫৪৮
গ্রন্থপঞ্জি : ৫৪৯-৫৬২

ভূমিকা

বাংলা ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতির ইতিহাস শুরু। কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে বাঙালি নিজেদের এক মনে করে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে দেশ গঠনের একটা প্রয়াস প্রাচীনকাল থেকে করে আসছিল। বাঙালি জাতির মধ্যে যে জাতীয়তাবাদের চেতনা পরিস্ফুটিত হয়েছে তাকেই আমরা বাঙালিত্ব বলে অবহিত করছি। উল্লেখ্য বাঙালি যে বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে এক হওয়ার চেষ্টা করেছে তা সবসময় একই রকম ছিল না, তবে বৈশিষ্ট্যসমূহের মৌলিক দর্শন ছিল একটি, তাহলো ভাষা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য। বাঙালির এই বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনার মাধ্যমে বাঙালিত্বকে বোঝার চেষ্টা করা হবে এবং কীভাবে ষাটের দশকে বাঙালিত্ব স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলো তা তুলে ধারা হয়েছে।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ষাটের দশকে পদার্পণের পূর্বে বাংলার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে বলেছেন,

> ...রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, চট্টগ্রামে-কুমিল্লাতে-ঢাকায়-টাঙ্গাইলে সন্তোষ কাগমারীতে সংস্কৃতিক সম্মেলন, এবং ওদিকটায় আরো ‘৫৪-তে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। নানান সব মেশামেশিতে আমাদের নিকট-অতীতের মানসভূমি। অতঃপর এখন আমরা ষাটের দশকে পা রাখছি।[১]

অর্থাৎ ষাটের দশকে বাঙালিত্বের যে চূড়ান্তরূপ আমরা দেখতে পায় তার পটভূমি মূলত পঞ্চাশের দশকে নিহিত রয়েছে। বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া নিয়ে এককভাবে কোনো গবেষণা হয় নি। তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এ বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা ও গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রণীত গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ও দৃষ্টিতে লেখা কয়েকটি গ্রন্থের পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৯০

বাংলাদেশে রাজনীতির ইতিহাস সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রণীত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়ের *বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৯০*। এ গ্রন্থে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের সিভিল সমাজ কীভাবে বহুমুখী সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যে উঠে এসেছে ঐ সময়কার রাজনৈতিক ইতিহাস। গ্রন্থটিতে তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রতিটি ঘটনার সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিহাসের কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণায় অনেক ক্ষেত্রে আঘাত করেছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কীভাবে ইতিহাস রচনা করতে হয় তা এই গ্রন্থ থেকে পরিষ্কার হওয়া যাবে। এই গ্রন্থে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যা ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। গ্রন্থটিতে ষাটের দশকের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে গুরুত্বে দিয়ে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।[২] গ্রন্থটিতে সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বর্তমান গবেষণায় তা পরিপূর্ণভাবে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা

সাঈদ-উর-রহমান রচিত *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* গ্রন্থটি ১৯৪৭-৭১ সময় পর্বের ওপর। তিনি গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে ৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও সংগঠনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একইসঙ্গে এই সময়ের কবিতা কীভাবে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে স্পর্শ করে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু লেখক বাংলা সাহিত্যের মানুষ হওয়ায় গ্রন্থটিতে সাহিত্যের রূপ-রস, শৈলী, গঠনকৌশল ও কাঠামোর আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস গবেষণার এখানে লেখকের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল না।[৩]

পূর্ব বাঙলার চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া

বাংলায় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের চিন্তাচর্চা সম্পর্কে এখন পর্যন্ত মোরশেদ শফিউল হাসান প্রণীত *পূর্ব বাঙলার চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া* গ্রন্থটি অন্যতম। গ্রন্থটিতে তিনি চিন্তাচর্চার একটি সাধারণ ধারার উল্লেখ করে তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নেন। এ গবেষণাকর্মে তিনি প্রবন্ধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্যে তিনি দশজন[৪] প্রবন্ধকারকে বেছে নিয়েছেন। গ্রন্থটিতে প্রত্যেকজন প্রবন্ধকারের জীবনপঞ্জি, রচনা পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ তিনি ব্যক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এইসব প্রবন্ধকারদের প্রবন্ধ কীভাবে জাতীয় বিষয়াবলিকে প্রভাবিত করে কিংবা জাতীয় ঘটনাবলির সাথে ধারাবাহিকভাবে তাদের প্রবন্ধের বিষয়গুলোকে তিনি তুলে ধরেন নি তা এখানে দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, একটি জাতির চিন্তাচর্চা ও মননচর্চা বিধৃত থাকে প্রধানত তাঁর সাহিত্যে। তিনি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকে তাঁর গবেষণায় আনেন নি। তাই তাঁর গ্রন্থটি বাঙালির চিন্তাচর্চার পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশ করে নি।[৫]

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন গ্রন্থটি রহমান হাবিব রচিত। তিনি এ গ্রন্থে দশজন[৬] প্রাবন্ধিকের লেখা পর্যালোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে ১৯০০-১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের চিন্তাচর্চার বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রাবন্ধিকগণের প্রবন্ধ ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের রচিত প্রবন্ধগুলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রবন্ধ সীমিত পরিসরে আনা হয়েছে। যতটুকু আনা হয়েছে তা কীভাবে বাঙালির মানসগঠন করছে তা লেখক গ্রন্থটিতে তুলে ধরেন নি।[৭]

পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গ্রন্থটির রচয়িতা রেজোয়ান সিদ্দিকী। সংস্কৃতি বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে তিনি আলোচনার শুরু করেন। গ্রন্থটি তিনি পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিস্তারিত আলোচনা করেন। লেখক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চালিকাশক্তি হিসেবে সংগঠন ও সম্মেলনকে চিহ্নিত করে তা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। লেখক ঢাকাকেন্দ্রিক কিছু সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু কীভাবে তা তৎকালীন কেন্দ্রিকপ্রবাহকে স্পর্শ করে তা স্পষ্টভাবে দেখাতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রিকপ্রবাহে প্রান্তিকের যে ভূমিকা ছিল তাও তিনি দেখান নি। ফলে সার্বিকভাবে তৎকালীন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চিত্র তাঁর গ্রন্থটিতে ফুটে ওঠে নি।[৮]

বাঙলা, বাঙালী ও বাংলাদেশ

আহমদ শরীফ রচিত *বাঙলা, বাঙালী ও বাংলাদেশ* গ্রন্থটি অনেকগুলো প্রবন্ধের সংকলন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পৃথক পৃথক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই গ্রন্থটিতে বাঙালি জাতির ব্যুৎপত্তিগত দিকগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে রচিত না হওয়ায় বাঙালিত্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রন্থটিতে আসে নি।[৯]

ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন

ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন গ্রন্থটির রচয়িতা রোজিনা কাদের। গ্রন্থটিতে ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা বোঝার জন্য দুই পর্বে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার সাংস্কৃতিক সম্মেলনগুলো, ১৯৫৭ সালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গবেষণায় লেখক এই কেন্দ্রিকগুলোকে উপেক্ষা করেন। তাছাড়া লেখক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপাদান হিসেবে শুধুমাত্র

গণসংগীত ও নাটক এ দুটি বিষয়কে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল ধারার বিপরীতে গড়ে ওঠা প্রতিক্রিয়াশীল বা পাকিস্তানবাদী ধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পৃথকভাবে চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করেন নি।[১০]

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা

বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী রচিত *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা* গ্রন্থটিতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি পটভূমি হিসেবে বিভাগ-পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উৎসমূল খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে এবং যুগমানস বোঝার জন্য রাজনৈতিক কেন্দ্রিকপ্রবাহের বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া লেখক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপাদানগুলোকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল ধারার বিপরীতে গড়ে ওঠা প্রতিক্রিয়াশীল বা পাকিস্তানবাদী ধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পৃথকভাবে চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি কেন্দ্রে বাইরে প্রান্তিক অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রের ওপর প্রান্তিককের কর্মকাণ্ডের প্রভাব বা তার গুরুত্ব তুলে ধরতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।[১১]

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ মুনতাসীর মামুনের পিএইচডি অভিসন্দর্ভে গ্রন্থরূপ। এই গ্রন্থে প্রথমে পূর্ববঙ্গ চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি পূর্ববঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্পষ্ট করার মাধ্যমে একাজটি সম্পূর্ণ করেছেন। কিন্তু পূর্বে ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য তুলনা করে পার্থক্যগুলো তিনি দেখান নি। এরপর তিনি পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলনগুলোকে তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে আলোচনা করে এবং আন্দোলনগুলোর প্রতিক্রিয়া বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া তিনি 'জনমত : সাংবাদপত্র ও সভাসমিতির বিকাশ' নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর ওপর অনেক অজানা, অনালোচিত ও উপেক্ষিত তথ্যের প্রয়োগ করেছেন। পূর্ববঙ্গের ঐ সময়কার ইতিহাস এই গ্রন্থ জানা যায়। অর্থাৎ একথা বলা যেতে পারে ১৮৫৭-১৯০৫ পর্যন্ত পূর্ববাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এটি আকার গ্রন্থ।[১২]

বাংলাদেশ : বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা

বাংলাদেশ : বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা গ্রন্থটির রচিতা মুনতাসীর মামুন। তিনি গ্রন্থটিতে বাঙালি মানস বা বাঙালিত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে তার আলোকে বাঙালির রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রগঠনের পরও যেসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন আসে বিশেষ করে আধুনিকতার বিপরীত মৌলবাদ নিয়ে। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাঙালির মানস, রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা বিষয়ে বিদ্যমান যেসব ধারণা আছে তা পুর্নমূল্যায়ন করে ব্যাখ্যা করছেন।[১৩]

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও সুকুমার বিশ্বাসের *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা ১৯৪৭-১৯৭১*, রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, সাইম রানার *বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, সৈয়দা খালেদা জাহান *রচিত বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ চেতনা*–এইসব গ্রন্থ কিছুটা ইতিহাসভিত্তিক হলেও মূলত সাহিত্যধর্মী। তাই এইসব গ্রন্থে যে অসম্পূর্ণতা তা ইতিহাসের আলোকে বর্তমান গবেষণায় দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাঙালিত্ব ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া এই বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট গবেষণা হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়ে আরও বিশদ গবেষণার সুযোগ বিদ্যমান আছে। তাই আমি এই অভিসন্দর্ভ রচনায় উৎসাহিত হয়েছি। এক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ শতকের ষাটের দশক বেছে নিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি আলোচনা করতে গেলে আমরা শুধু রাজনৈতিক পটভূমিই আলোচনা করি। অন্যান্য যে বিষয়গুলো রাজনৈতিক

কেন্দ্রিকপ্রবাহকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এমন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়েই এই গবেষণার কাজ এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, মননচর্চা ও মানসজগৎ, শিল্পকলা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কীভাবে বাঙালিত্বের চর্চা হয় এবং তা কীভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। অর্থাৎ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কীভাবে মননচর্চা হয় যা মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কীভাবে স্বাধীনতার জন্য সমাজকে প্রস্তুত করে। বিভিন্ন আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদানকে দৃষ্টিগোচর করা।

বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এবং এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়ে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে রাজনীতিবিদদের সমান্তরালে মননচর্চা ও মানসগঠনে কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ভূমিকা এবং তাদের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ প্রক্রিয়ার সাথে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সর্ম্পর্কে অভিসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তির সংগ্রামের এই লড়াইয়ে সমাজের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে–রাজনীতিবিদ, কবি-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্র-শ্রমিক ও জনতা কী ভূমিকা পালন করেছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান অভিসর্ন্দভে। কীভাবে তারা সামাজিক, সাংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজকে মুক্তির পথে ধাবমান হতে সাহায্য করেছিলেন তা দেখানো হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি

সাধারণ অর্থে গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের প্রণালিবদ্ধ অনুসন্ধান। গবেষণা পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো গবেষণার বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা। সুতরাং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গবেষণা করতে হলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আচরণ, ঘটনাবলি বা সমস্যা সম্পর্কে প্রণালিবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করতে হয়। অতএব, সমাজ-গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা আমরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আচার-আচরণ উপলব্ধি করার প্রয়াস চালিয়ে যাই। সামাজিক সমস্যাবলি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য কিছু কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ গবেষণায় আমি কোনো ধরাবাঁধা পদ্ধতি অনুসরণ করি নি। এ গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি ও কার্যধারা অবলম্বন করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের শিরোনাম পর্যালোচনা করলে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়–এক, বাঙালিত্বের বিকাশ; দুই, রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিকশিত বাঙালিত্বের ওপর ভিত্তি করে কীভাবে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং তিন, বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়াটি ১৯৬০ দশকে কীভাবে একটা পরিণতির দিকে ধাবমান হয়। এতগুলো বিষয়কে কোনো একক পদ্ধতিতে গবেষণা করা সহজ নয়। তাই একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে। প্রথমত, বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য, উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো বর্ণনামূলক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্ণনামূলক গবেষণার লক্ষ্য হলো বিষয়বস্তুতে সঠিক ও নির্ভুলভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা। এই পদ্ধতিতে পূর্বজ্ঞাত কোনো বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলা হয়। এই গবেষণার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। অর্থাৎ কীভাবে বাঙালিত্বের বিকাশ হয় এবং তা রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় কীভাবে ভূমিকা পালন করছে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক এবং দ্বৈতয়িক উভয় ধরনের উৎসের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে।

ব্যবহৃত উৎসসমূহ

এই গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক এবং দ্বৈতয়িক উভয় ধরনের উৎসের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তৎকালীন দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সাময়িকী, লিটল ম্যাগাজিন, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রচারপত্র, স্মরণিকা, পোস্টার ও ফেস্টুনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎস। ষাটের দশকের আন্দোলনে যারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন সেইসব সংগঠকের সাক্ষাৎকার যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। বিশিষ্ট সংগঠকদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এবং আন্দোলনের উপকরণ যা দলিল-দস্তাবেজ, সরকারের প্রণীত আইন ও নীতিসমূহ, সাহিত্য (গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও উপন্যাস), স্মৃতিকথা, সংগীত, নাটক ও চলচ্চিত্র ইত্যাদির মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ষাটের দশকের মননচর্চায় মানসজগৎ পরিবর্তনের বিষয়ে কেন্দ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদাহরণ উপস্থাপনের জন্য সাংস্কৃতিক সংগঠকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গ্রন্থ, সমালোচনা গ্রন্থ, বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও জার্নাল ইত্যাদি।

বর্তমান গবেষণায় ষাটের দশকের উপর্যুক্ত উৎসসমূহ থেকে তথ্য নিয়ে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের সময়ব্যাপ্তি

এই গবেষণার সময় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে–বিশ শতকের ষাটের দশককে। বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া কীভাবে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে পরিণতি লাভ করলো এবং কীভাবে এই দশক ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা পালন করে তা ফুটে উঠেছে এই গবেষণায়।

অধ্যায় বিভাজন

গবেষণা কর্মটি ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট ৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

ভূমিকা

এই অধ্যায়ে পুস্তক পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণায় ব্যবহৃত উৎসসমূহ, গবেষণার উদ্দেশ্য, অধ্যায় বিভাজন, অভিসন্দর্ভের সময়ব্যাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া

এই অধ্যায়ে বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের যেসব তত্ত্ব রয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে। পূর্ববঙ্গকে সুনির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে এবং তা কেন পশ্চিম বাংলা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র তা স্পষ্টকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।[১৪] বাঙালিত্বের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি লাভ কীভাবে হলো এবং তার সঙ্গে পূর্ববঙ্গ কীভাবে সম্পৃক্ত ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। এইসব আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা দেখানোর প্রয়োজনে ঠিক কখন থেকে এই অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস শুরু হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে কখন থেকে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে শুরু হয়েছে তাও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

এই অধ্যায়ের সময় হলো ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত। ৬০-এর দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যখন উপনিবেশ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তি পাচ্ছিল। তখনও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা বাঙালিরা শোষিত হয়ে আসছিল। ভাষা আন্দোলনের পর

দুইবার সামরিক শাসন এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারেনি। ফলে বাঙালি শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে থাকে। আন্দোলন-সংগ্রামের ফল হলো সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ উক্ত সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অনবরত চেষ্টা চালায়। অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যই ছিল ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। ফলে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও বাঙালির পারস্পরিক চাওয়ার বৈপরিত্যের ফলে একটা দ্বান্দ্বিকভাব পুরো আমলেই ছিল। ৬০-এর দশকে তা আরও চূড়ান্তরূপ লাভ করে। অর্থাৎ এ ভূ-খণ্ডের মানুষের মধ্যে বাঙালিত্ব বোধ একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। এ সময়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বাঙালির প্রতিরোধ এবং বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় ইত্যাদি বিষয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : মননচর্চা ও মানসজগৎ

পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার জনমানসে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার যে পরিবর্তন হয়েছে তার প্রতিফলন ঘটেছে তৎকালীন কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটোগল্প ও প্রবন্ধসহ সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে। আবার এসব সাহিত্য প্রভাব বিস্তার করেছে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তায়। ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদমূলক সাহিত্য এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। দেশবিভাগের পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যেসব সাহিত্যিক পাকিস্তান ও ধর্মকে অবলম্বন করে লিখেছেন এবং পরবর্তীকালে তারাই আবার পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতি হতাশা ব্যক্ত করেছেন। এই রূপান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের পর বাঙালিত্বের বিকাশ ও জাগরণ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে পরিস্ফুটিত হতে থাকে। এদেশের প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও আন্দোলন অবলম্বন করে শাসকগোষ্ঠীর কাছে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এ বিশেষ শ্রেণির সাহিত্য রচিত হয়েছে। এরপর থেকে বাঙালিত্বের যে প্রভাব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিদ্যমান ছিল তা ধীরে ধীরে দৃশ্যমান ও স্পষ্ট হতে থাকে। অপরদিকে বাঙালিত্বের এই ধারাকে অবদমন করার জন্য আবার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লেখকগণ পাকিস্তানকেন্দ্রিক ও ধর্মকে কেন্দ্র করে রচনা করতে থাকে। যদিও ধর্ম ও পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বণ করে ৪৭ পূর্ব থেকেই নাটক, উপন্যাস, কবিতা, ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ রচনার প্রাধান্য ছিল। ফলে দ্বান্দ্বিকরূপ আরও স্পষ্ট হয় এবং শেষ অবধি বাঙালিত্বের প্রভাব বেশি প্রসারিত হয় তা বাঙালিকে নতুন দেশ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতীয়বাদের মধ্যে দ্বান্দ্বিকরূপ গড়ে উঠে তা কীভাবে ষাটের দশকের সাহিত্য ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং তা কীভাবে জনগণকে জাগরিত করে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নির্মাণে শিল্পকলার ভূমিকা

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপকরণ হিসেবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সৃজনশীল ও নান্দনিক সাংস্কৃতিক চর্চা হয়ে ওঠে প্রধান। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে ক্ষেত্রবিশেষে এসব সৃজনশীল সাংস্কৃতিক চর্চা মানুষকে দ্রুত নাড়া দেয় একটি আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাতে অনড় থাকতে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে শিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শিল্পীগণ তাদের সৃষ্টিকর্মে সমকালীন সামাজিক বৈষম্য, ধনবৈষম্য এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে তার প্রতি আঘাত করেন। শিল্পীগণ নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমাজ কীভাবে তৈরি হয়েছে স্বাধীন হওয়ার জন্য সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে এ অংশে। এই অংশে শিল্পকলার যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো–চিত্রকলা; স্থাপত্য, দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্য; বাংলা চলচ্চিত্র; মঞ্চনাটক; গণসংগীত; নৃত্যকলা; যাত্রা; বেতার ও কবিতা-আবৃত্তি প্রভৃতি। বাঙালির মানসগঠনে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ বিষয়গুলোর মাধ্যমে বাঙালির জীবনের না পাওয়া বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাথে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিল্পকলাতে সামন্তবাদী ও ধর্মীয় জীবনভাবনা এবং মূল্যবোধের প্রাধান্য ছিল। বাঙালিরা নিজেদের সংস্কৃতির ও শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তার মাধ্যমে আত্মসঞ্জীবনীর চেষ্টা করে। একদিকে সামন্তবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থ ও দর্শন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা অন্যদিকে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে এই চাপিয়ে দেওয়া দর্শনের বিপরীতে নিজেদের অবস্থান জানান দেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব একসময় বাঙালিদের স্বাধীন দেশ গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই লড়াইয়ে শিল্পীগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল ধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে প্রস্ফুটিত করে। তাদের উজ্জ্বল কর্মতৎপরতাতেই বাংলাদেশকেন্দ্রিক মানসগঠন সহজতর হয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন উন্নততর হয়। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছর সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রই প্রস্তুত করেনি, কখনও কখনও রাজনৈতিক সংগ্রামের বিকল্প হিসেবেও কাজ করেছে। পূর্ব বাংলার মানুষের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সফল বিজয় অর্জন পর্যন্ত সর্বত্র সাংস্কৃতিক সংগ্রামের উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল।

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা

বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাংস্কৃতিক ধারা তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। পূর্বপাকিস্তানে সংঘটিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তত্ত্বসমূহ পর্যালোচনা করে সাংস্কৃতিক ধারার অগ্রগমন দেখানো হয়েছে। এই অগ্রগমনে পক্ষ-বিপক্ষ সৃষ্টি হয়। একটি প্রগতিশীল ও বাঙালিত্বের পক্ষের শক্তি এবং অন্যটি রক্ষণশীল ও শাসকগোষ্ঠীর সমর্থক। ১৯৬০-৭১ সাল পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ স্পষ্টকরণের জন্য পটভূমি হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে ১৯৪৭ সাল থেকে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের (১৯৪৭-৭১) কালপর্বে গড়ে ওঠা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো তাদের রাজনৈতিক দর্শনকে সামনে রেখে সর্বত্র নানাভাবে তৎপর ছিল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম কীভাবে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবৃদ্ধি করে তা এই অধ্যায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাহিত্যসভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, গণমুখী ও দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা, নাটক, নৃত্যকলা, চলচ্চিত্র পরিবেশনা ইত্যাদি ছিল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যম বা প্রধান বিষয়বস্তু। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের দর্শন এবং তাদের নানা মাত্রার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, গতি-প্রকৃতি ও ফলাফল ইত্যাদি গবেষণার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। রাজনৈতিক সংগ্রামের সাফল্য ত্বরান্বিত করার জন্য সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রয়োজন সব থেকে বেশি। সাংস্কৃতিক সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য মানসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয়। সাংস্কৃতিক দলের উদ্ভব, বিকাশ ও কর্মকাণ্ড, গণসংগীতের উদ্ভব; দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে বাঙালির জীবনের অপ্রাপ্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন উপাদান ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে যে সাংগঠনিক বিকাশ হয় তা কীভাবে আমাদের মুক্তির আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত, বাঙালিত্ব বিকাশ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কীভাবে হয় তা তুলে ধরা এই অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব এবং তা কীভাবে বাঙালিত্বের বিকাশ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি তৈরিতে ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে পত্র-পত্রিকার অবদান

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংবাদপত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে পত্র-পত্রিকার অবদানকে আমরা দুইটি পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো–এক. সংবাদপত্র, দুই. সাহিত্য পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন।

জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি পূর্ববাংলার বেশিরভাগ সংবাদপত্র একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। ফলে সরকারের পক্ষে থেকে পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রসমূহের ওপর বিভিন্ন সময়ে নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রসমূহ কীরকম সংগ্রাম করতে হয়েছে, সে বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলায় উদ্ভূত রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অন্যান্য গণআন্দোলনে দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা কালানুক্রমিকভাবে দেখানো হয়েছে। এসব আন্দোলন-সংগ্রাম, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও পূর্বপাকিস্তানের প্রতি হওয়া অন্যায় তুলে এনে সংবাদপত্র কীভাবে জনগণকে সচেতন করে তোলে এবং শাসকগোষ্ঠীর ভিত দুর্বল করে দেয় তা পরিস্ফুটিত করা হয়েছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলো নিয়ে এ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো ছিল দ্বিধাবিভক্ত। ফলে পত্রিকায় প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ঘটনার পক্ষ-বিপক্ষ দাঁড়িয়ে যায়। ফলে ৬০-এর দশকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোকে পর্যালোচনা করলে আমরা তাতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন পাব। তৎকালীন পত্রিকা, সাহিত্য ও লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সম্পাদকীয়, দর্শন, বৈশিষ্ট্য, লেখার বিষয় ইত্যাদি আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কীভাবে তা বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করেছিল।

এইসব ঘটনা ও কার্যক্রমে সরকারসমর্থিত দৈনিক পত্রিকা ও সাহিত্যপত্রগুলো কীরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মোটকথায় পূর্বপাকিস্তানের মানুষের/বাঙালির মানসগঠন, জনমত সংগঠন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি সৃষ্টিতে দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকপত্র ও লিটল ম্যাগাজিনগুলোর ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার ও গবেষণার ফলাফল

শোষণ, বঞ্চনা শুধু পাকিস্তান আমলে নয়, প্রাচীন আমল থেকেই প্রতিনিয়ত এই ভূ-খণ্ডে হয়ে এসেছে। সেজন্য প্রতিরোধও হয়েছে কিন্তু দেশ স্বাধীন হয় নি। ষাটের দশকে কী জন্য আমরা ভিন্ন পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। জাতি কীভাবে প্রস্তুত হয়েছিল যার ফলে সব প্রতিবন্ধকতা দূরে ঠেলে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ কীভাবে স্বাধীনতার দিকে দেশ অগ্রসর হচ্ছে তা মূলত বর্তমান অভিসন্দর্ভে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকাভাষ্য

[১] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নিবেদন ইতি উত্তরখণ্ড*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯৯

[২] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫

[৩] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১

[৪] মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৯৮১-১৯৫৩), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ (১৮৯৮-১৯৭৪), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) ও সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০২-১৯৮১)।*

*মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলার চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৯-৪০০

[৫] *প্রাগুক্ত*

[৬] আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), বদরুদ্দীন উমর (জ. ১৯১৩), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (জ. ১৯৩৪), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জ. ১৯৩৬), আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), আবুল কাসেম ফজলুল হক (জ. ১৯৪৪)।*

*রহমান হাবিব, *বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৩-২০২

[৭] *প্রাগুক্ত*

[৮] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬

[৯] আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*, মহাকাশ, ঢাকা, ২০১৩

[১০] রোজিনা কাদের, *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৪
[১১] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩
[১২] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪
[১৩] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ : বাঙালি মানস রাষ্ট্র ও আধুনিকতা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭
[১৪] পূর্ববঙ্গ সুনির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে তেমন কোনো গবেষণা হয় নি। একমাত্র মুনতাসীর মামুন তাঁর *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। বর্তমান গবেষণায় পূর্ববঙ্গ সুনির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থটির সহযোগিতা সবথেকে বেশি নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-৫৯

প্রথম অধ্যায়

বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া

বিশ শতকের ষাটের দশক বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের সোনালি দশক। একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম দ্বারা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অধিকার বা স্বাধীনতাকে বোঝায়।[১] পঞ্চাশের দশকে এ ভূ-খণ্ডে সংঘটিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের একটা চূড়ান্ত পরিণতি এই সময় লক্ষ করা যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা পর্ব থেকেই ভাষা বিতর্কের উদ্ভব হয়। ভাষাবঞ্চনা ও সাংস্কৃতিক শোষণকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোহ কাটতে শুরু করেছিল। ভাষা বিতর্ক বাঙালিকে সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে সহযোগিতা করে পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে তাদের কাঙ্ক্ষিত চাওয়া-পাওয়া অর্জন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভাষা বিতর্কের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়। আন্দোলন-সংগ্রামের এই ধারার ভিতর দিয়ে বাঙালির মধ্যে গড়ে ওঠে একটি সাধারণ সত্তা বা একাত্মবোধ–জাতি সচেতনতা ও জাতিরাষ্ট্র গঠন যার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক রূপ বা প্রকাশ। আর একটি জনগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তি অর্জনে জাতিরাষ্ট্র গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[২] বাঙালি সেই জাতিরাষ্ট্র গঠনের দিকে এ সময় থেকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে থাকে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের দর্শন ছিল বাঙালিদের শোষণ এবং তাদেরকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করা। অপরদিকে বাঙালিদের উদ্দেশ্যে ছিল স্বাধীনদেশে উন্নত গণতান্ত্রিক পরিবেশে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। পরস্পরবিরোধী এই উদ্দেশ্য একটা দ্বন্দ্বের সূচনা করে। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সূচনা হলো একটি নতুন বোধের আর তা হলো 'বাঙালি জাতিসত্তা'। এটাকে আমরা জাতীয়তাবাদ বলতে পারি। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাঙালির জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> জাতীয়তাবাদ আসলে একটা অনুভূতি। তাতে দেশপ্রেম থাকে, কিন্তু দেশপ্রেম থেকে আবার স্বতন্ত্রও বটে, ব্যাপকও; কেননা প্রথমত দেশপ্রেমের তুলনায় জাতীয়তাবাদ অনেক বেশী রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত একটি জাতি কেবল একটি দেশে নয়, বিভিন্ন দেশে বসবাস করতে পারে, করেও। বাঙালীরা আজ যেমন করছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ ভিন্ন অর্থে দেশের কথা ভাবেও, না- ভেবে পারে না। সেই দেশ অনেকটা কল্পনার, তাতে স্মৃতি থাকে অতীতের, স্বপ্ন থাকে ভবিষ্যতের, স্বপ্ন ও স্মৃতি মিশে একাকার হয়ে যায়। এই স্বপ্নটা খুবই জরুরী, কেননা সমষ্টিগত স্বপ্ন ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতে পারে না। এমনকি টিকে থাকাও কঠিন।[৩]

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যে স্বপ্নের কথা বলছে তা ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমানে ৬ দফা উপস্থাপনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। জাতীয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রবলভাবে শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে বলেন, '...আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটা নিজস্ব জায়গা।'[৪] পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে একটি আদর্শগত লড়াই শুরু হয় তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জাতীয়তাবাদ। এই লড়াই অন্তিমে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের মধ্যে দিয়ে পরিণতি লাভ করে। বাঙালিত্বের বিকাশ ষাটের দশকে পরিণত রূপ লাভ করে যা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে সাফল্য লাভ করে। বাঙালির মুক্তি অর্জনের পথ প্রস্তুত ও প্রশস্ত করতে সাহায্য করে। বাঙালিরা সর্বস্তরে নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া প্রতিবন্ধকতা দূর করে বাঙালিরা এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে সমাজের প্রতিটা অংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রস্তুত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট।

তত্ত্ব পর্যালোচনা

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ছিল সামন্ত-আদর্শপুষ্ট পুঁজিপতি শ্রেণি ও আমলানিয়ন্ত্রিত। তাদের একদশকের শাসনকার্যের ফলে জনগণের মধ্যে এই সামন্ত-মূল্যবোধ ও ধর্মাদর্শপুষ্ট রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা ও অনাগ্রহ জন্মে। এবং এ দশকের আন্দোলন ও সংগ্রামী অভিজ্ঞতার যোগফল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবনে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা বিকাশের লক্ষণসমূহ স্পষ্টতর

হতে থাকে। সামন্ত-মূল্যবোধ ও ধর্মাদর্শপুষ্ট রাজনীতির প্রতি জনমানসের বিতৃষ্ণা ও অনাগ্রহ পাকিস্তানবাদী শাসনযন্ত্রকে করে তোলে ভীত ও সন্ত্রস্ত। মুষ্ঠিমেয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির কবল থেকে প্রকৃত রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রক্ষমতা স্থানান্তরিত হওয়ার আশংকায় নব্য-ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি প্রশাসন ষড়যন্ত্রের পথকেই অনিবার্যভাবে গ্রহণ করে। জাতিক ও আন্তর্জাতিক বিচিত্র ষড়যন্ত্রে মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বশক্তির আদর্শ-পুষ্ট পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্র নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের পতনকে করে তোলে অবশ্যম্ভাবী। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তন পাকিস্তানের নব্য-উপনিবেশবাদী শাসনতন্ত্রের অন্তর্ঘাতক চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ।[৫] যা একইসাথে বাঙালির স্বার্থের পরিপন্থিও। নব্য-উপনিবেশবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত বাঙালিরা প্রতিরোধ ও সংগ্রাম করেছে, নিজেদের সত্তা বিকাশের জন্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য।

বাঙালির এই বাংলাদেশ আন্দোলনের তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করাতে হলে যে বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে তা তুলে ধরা হলো–

পাকিস্তান আমলে বাঙালিত্ব ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বের অনেক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো এবং এর ভিত্তিতেই অভিসন্দর্ভটি প্রণীত হবে–

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন বাঙালিত্বের উপাদানসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'বাঙালিত্বের উপাদানগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় খুব গুরুত্বপূণ তা হলো–ঐতিহ্য, দ্রোহ ও সমন্বয়।'[৬] পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান, নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছে পূর্ববঙ্গবাসীর জীবন, নির্ধারণ করেছে তার চরিত্র। এ অঞ্চলের জীবনচর্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি এক ধরনের ঐক্য সৃষ্টি করেছে এবং একে পৃথক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জলবায়ু ও প্রকৃতি পূর্ববঙ্গবাসীকে কিছুটা আয়েশি করে তুললেও নদী ও সমুদ্র তাকে দিয়েছে আত্মরক্ষার সহজ প্রবণতা ও প্রতিরোধক্ষমতা। মুনতাসীর মামুন *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন* গ্রন্থে রাধাকমল মুখার্জীর অভিমত এ প্রসঙ্গে তুলে ধরেন। রাধাকমল মুখার্জী লিখেছেন,

> বাঙ্গালীর এই রক্ত সংমিশ্রণ তাহার প্রধান গৌরব। ইহা হইতেই আসিয়াছে বাঙ্গালীর কোমলতা ও ঔদার্য। ... তাহা ছাড়া বাঙ্গালার মাটির, বাঙ্গালার জলের, প্রতিবেশের প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ, খুব নিবিড়। ...বাঙ্গালী তাই সর্বক্ষেত্রে ভাবুক, উদার ও সেরা বিদ্রোহী। তাই আর্য সংস্কৃতি ও বেদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্গালাতে প্রথম ও প্রধান আশ্রয় পাইয়াছিল।[৭]

কিন্তু উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গবাসীর মনে দু'টি পরস্পরবিরোধী সত্তার পরিচয় পাই–এক. আয়েশি জীবন এবং দুই. প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ।

মুনতাসীর মামুন পূর্ববঙ্গবাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পর্যালোচনা করতে গিয়ে *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ* গ্রন্থে বলেছেন,

> আবহমানকাল থেকে বিদেশীরা এখানে এসেছে কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসীর জন্যে তা কখনও বড় রকমের সমস্যার সৃষ্টি করেনি। শাসক বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও এক ধরনের সহ-অবস্থান ছিল তাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গবাসীর। যখন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তখন সরাসরি কোন সংঘাত বা সংঘর্ষের পরিবর্তে সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে বা বসতি বদলেছে। ফলে সবকিছুকে এড়িয়ে যাওয়ার ...মানসিকতা তৈরী হয়েছে তার মনে।[৮]

এড়িয়ে চলার যে বৈশিষ্ট্য তা সমন্বয়ের সব থেকে বড়ো দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্রশ্ন উঠে তা'হলে উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে এত কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল কীভাবে? এটা ঠিক পূর্ববঙ্গের কৃষক বিদ্রোহ করেছিল কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব সে সংঘাত এড়িয়ে চলেছে। সে রুখে দাঁড়িয়েছে তখন যখন অত্যাচার একেবারে চরমে উঠেছে বা তার জীবিকার অবলম্বন জমির ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ঐ একটি কারণে বাঙালি রুখে দাঁড়ায়।[৯]

অপরদিকে, এর বিপরীতে পাকিস্তানিবাদের যে উপাদান তা হলো–সামন্তবাদ ও ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি। মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদরা, তাত্ত্বিকরা বাস্তবতাবাদকে স্বাভাবিকতাবাদের সমপর্যায়ী করে তুলেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকগোষ্ঠীর কাছে বাস্তববাদ ছিল স্বাভাবিকতাবাদ : পাকিস্তান এক স্বাভাবিক বাস্তব, আদি অন্তহীন এক বাস্তব। এই বাস্তবের ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িক বিষয়ের নির্বাচন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠী সচেতনভাবে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রচার, ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়নের প্রয়াস শুরু করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে শাসকগোষ্ঠী মুসলিম মতাদর্শের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিল এবং মুসলিম মতাদর্শ ও মুসলিম-সংস্কৃতির

নামে বাঙালিসমাজ গঠনের বাস্তবতায় এবং দেশজ-সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য দমন করতে চেয়েছিল। এই দমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ হয়েছে।[১০] বাঙালিরা মুসলিম দর্শনের বিরুদ্ধে নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ব্যবহার করছে। আবার পাকিস্তানি দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছে এবং আবার প্রয়োজনের মুহূর্তে সমন্বয় করেছে। মুনীর চৌধুরীর *রক্তাক্ত প্রান্তর*-এর সব থেকে বড়ো উদাহরণ। যেখানে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মুনীর চৌধুরীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলো। মারাঠাদের বিরুদ্ধে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়গাথা সাম্প্রদায়িক-চক্র সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করতে চেয়েছিল।[১১] কিন্তু মুনীর চৌধুরী ইতিহাসকে নাটকের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করে ব্যক্তিজীবনের হৃদয়যন্ত্রণা এবং যুদ্ধবিরোধী দৃঢ় প্রত্যয় কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মান্ধতা নয়।[১২] *রক্তাক্ত প্রান্তর*-এ যুদ্ধবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনাই শিল্পরূপ দিয়েছেন। নাটকে শেষ পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনারই প্রাধান্য পেয়েছে। যা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী। এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাঙালি তার স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

রক্ষণশীলতা ও আধুনিকতার টানাপোড়েন

ষাটের দশক ছিল রক্ষণশীলতা ও আধুনিকতার টানাপোড়েনের দশক। এ সময় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় আবরণে বাঙালিকে শোষণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। যেখানে উনিশ শতকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী এস. ওয়াজেদ আলী *আকবরের রাষ্ট্র সাধনা* (১৯৪৩) গ্রন্থে বলেছেন, 'মানুষের দেশ হিসাবে তার জাতিনির্ণয় হবে, ধর্ম হিসেবে নয়। এ আদর্শও আকবর চিরকালের তরে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন।'[১৩] সেই ধর্মের ভিত্তিতেই ভারত পাকিস্তান নামক দুটি দেশের উদ্ভব হয় বিশ্ব মানচিত্রে। এস. ওয়াজেদ আলী এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> শাস্ত্র এবং সংস্কারের শৃঙ্খলমুক্ত উন্নত, সার্বজনীন রাষ্ট্রের আদর্শ তিনিই (আকবর) প্রথম ভারতবর্ষকে দিয়ে গিয়েছেন।... রাষ্ট্রে লৌকিক ধর্মের স্থান কোথায় সে সমস্যার সমাধানও আকবর চিরকালের তরে করে গিয়েছেন। ভবিষ্যতে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য, কখনও ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।[১৪]

সুতরাং ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বাঙালিকেও সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বাঙালিরা প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার চর্চার মাধ্যমে ধর্মীয় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য আন্দোলন, সংগ্রাম করেছে। এই আন্দোলনের ফলে বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশ লাভ করে এবং বাঙালিকে একটি স্বতন্ত্র দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

সাম্প্রদায়িকতা বনাম অসাম্প্রদায়িকতা

পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক আচরণে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি বাঙালি আস্থা কমে যায়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু যেহেতু এই প্রস্তাবটি আসে একজন হিন্দু সদস্যের কাছ থেকে তাই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। তাঁরা উক্ত প্রস্তাবকে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা বিনষ্ট করার প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন।[১৫] সরকারের এই নীতির ফলে সরকারি কর্মচারীরা অতি উৎসাহ দেখাবার জন্য হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণ সমাজকর্মী ফণি মজুমদার ও চন্দ্র ঘোষকে গ্রেফতার।[১৬] অতি উৎসাহী কর্মচারীরা সরকারকে খবর দেয় হিন্দুরা আইন মানছে না। হিন্দুস্থানের পাতাকা তুলেছে। চন্দ্র ঘোষ এদের নেতা। শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয় কর্মচারী কর্তৃক তাঁকে গ্রেফতারের কারণ ব্যাখ্যা করেন এভাবে, 'দেখ আমি কিভাবে রাষ্ট্রদোহী কাজ দমন করলাম। পাকিস্তানকে রক্ষা করলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি।'[১৭] চন্দ্র ঘোষ জেলে মুমূর্ষু অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তাঁর মনে অবস্থা ব্যক্ত করেন এভাবে,

> ভাই, এরা আমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে বদনাম দিল; শুধু এই আমার দুঃখ মরার সময়! কোনোদিন হিন্দু মুসলমানকে দুই চোখে দেখি নাই। সকলকে আমায় ক্ষমা করে দিতে বোলো। আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইল, মানুষকে মানুষ

হিসাবে দেখ। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য ভগবানও করেন নাই। আমার তো কেউ নাই, আপন ভেবে তোমাকেই শেষ দেখা দেখে নিলাম। ভাগবান তোমার মঙ্গল করুক।[১৮]

পাকিস্তান শাসনামলে বাঙালিদের প্রতি একই রকম আচরণ প্রদর্শন করেছে। যার ফলে বাঙালিকে চিন্তা করতে হয়েছে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে। বাংলার ইতিহাস বলে যখনই শাসকশ্রেণি সাম্প্রদায়িক আচরণ করেছে তখন বাংলার জনগণ তা প্রতিরোধ করেছে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরচারী মনোভাব

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকার স্বৈরাচারী মনোভাব দেখাতে থাকে। চালাতে থাকে রাজনৈতিক নিপীড়ন। মুসলিম লীগ সরকারের এই নির্যাতনে হাত থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। ১৯৪৮ সালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকায় সভা করতে আসে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কায়েম থাকে। প্রথম সভার জায়গা ঠিক হয় টাঙ্গাইল। কিন্তু সরকারের বাধার জন্য তিনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করেই ফিরে যান। সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বিদায় দিতে গেলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'তোমার উপরও অত্যাচার আসছে। এরা পাগল হয়ে গেছে। শাসন যদি এইভাবে চলে বলা যায় না, কি হবে!'[১৯]

মুসলিম লীগ নেতারা একটা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছিল যাতে কেউ সরকারের সমালোচনা করতে না পারে। সরকারি প্রশ্রয়ে থাকা গুণ্ডার দল বিভিন্ন শোভাযাত্রা আক্রমণ ও মারপিট করতো।[২০] শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দেখি উল্টা হয়েছে। এর একটা পরিবর্তন করা দরকার। জনগণ আমাদের জানত এবং আমাদের কাছেই প্রশ্ন করতো। স্বাধীন হয়েছে দেশ, তবু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে না কেন?'[২১] তিনি আরও বলেন, 'যে আদর্শ ও পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছি, সে আদর্শ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালাব।'[২২]

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 'কোন বিরুদ্ধ দল পাকিস্তানে না থাকায় সরকার গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে একনায়কত্বের দিকে চলছিল। প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান সর্বময় ক্ষমতার মালিক হলেন। তিনি কোনো সমালোচনাই সহ্য করতে পারছিলেন না।'[২৩] যদিও তিনি গণতন্ত্রের কথা মুখে বলতেন, কাজ তার উল্টা করছিলেন।[২৪] কোনো বিরুদ্ধ দল সৃষ্টি হোক তা তিনি চাইতেন না। তাঁর সরকারের নীতির কোনো সমালোচনা কেউ করে তাও তিনি পছন্দ করতেন না। লিয়াকত আলী খান মুসলীগ লীগের সভায় ঘোষণা করেন, 'যো আওয়ামী লীগ করেগা, উসকো শের হাম কুচাল দেগা।'[২৫] শেখ মুজিবুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, '...মুসলিম লীগের নামে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে কিছুটা; কিন্তু বেশিদিন ধোঁকা দেওয়া চলবে না। মুসলিম লীগের নামের যে মোহ এখনও আছে, জনগণকে বোঝাতে পারলে এবং শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে মুসলিম লীগ সরকার অত্যাচার করতে সাহস পাবে না।'[২৬] তিনি মনে করতেন, 'শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।'[২৭]

লিয়াকত আলী খান বাঙালি ও পাঞ্জাবি সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করতে চাইতো। কারণ তিনি ছিলেন রিফিউজি। তাঁকে নির্ভর করতে হয় আমলাতন্ত্রের ওপর, যারা সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানের।[২৮] ফলে শুরুতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক উত্তর ভারত থেকে আগত মোহাজের ও পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের উর্দু-ভাষী রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে চলে যায়। পূর্ববঙ্গের শাসক দলকে নিয়ন্ত্রণ করেছে পাঞ্জাবি শাসকচক্র। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার হলেই তারা খুশি থেকেছেন এবং পরিণামে বাঙালিদের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

শুধু দমনপীড়ন নয়, একইসাথে মুসলিম লীগের নেতারা পরাজয়ের ভয়ে ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বার বার পিছিয়েছেন। ১৯৪৯ সালে এই প্রদেশের উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের পর প্রদেশের অন্যান্য উপ-নির্বাচনও স্থগিত রাখা হয়। এমনকি এই প্রদেশের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্তও স্থগিত রাখা হয়।[২৯] একটা সময় দেখা গেল প্রাদেশিক

ব্যবস্থা পরিষদে চৌত্রিশটি আসন শূন্য পড়ে আছে। শেষ পর্যন্ত ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে।[৩০] ৫৪-এর নির্বাচনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়ে বাঙালিরা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তাদের ভোট দেয়।

মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং বাঙালির প্রতিরোধ

শেখ মুজিবুর রহমান *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে বলেন, 'পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল।'[৩১] মুসলিম লীগে নেতৃত্ব নিয়ে এ ষড়যন্ত্র। 'বিশেষ করে সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে দিল্লিতে এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়। কারণ, বাংলাদেশ ভাগ হলেও যতটুকু আমরা পাই, তাতেই সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মিলিতভাবে লোকসংখ্যার চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বেশি। সোহ্‌রাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও কর্মক্ষমতা অনেককেই বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ, ভবিষ্যতে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবেন এবং বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও থাকবে না। জিন্নাহ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ভালোবাসতেন।'[৩২] দিল্লি থেকে হুকুম আসল আবার নেতা নির্বাচন হবে। সোহ্‌রাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের লোক হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে আবার তাঁকে নির্বাচন করতে হবে বলা হলো।[৩৩] এ সবকিছু হয় সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্থানে নাজিমুদ্দীনকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য এবং তা তারা করতে সক্ষম হয়। এটিই শেষ নয় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানে এই ধারা অব্যাহত ছিল।

১৯৪৭-১৯৫৮ এই সময়ে পাকিস্তানের আটজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একমাত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছাড়া সবাই ছিলেন অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি। চারজন রাষ্ট্রপ্রধানের সকলেই ছিলেন অবাঙালি ও উর্দু-ভাষী।[৩৪] জাতীয় পরিষদের পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সাধারণ নির্বাচন ১৯৫০-১৯৫১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হলেও পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচন ১৯৫৪ সালের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নি।[৩৫] ১৯৫৪ সালে, নির্বাচনের যুক্তফ্রন্ট 'একুশ দফা'র বিপুল জয়লাভ করলে এই প্রদেশে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসে। কিন্তু মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে থাকে। মাত্র চার বছরে সাতটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করা হয়।[৩৬]

৮ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। তিন সপ্তাহ পর মীর্জা স্থলে জেনারেল আইয়ুব খান হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।[৩৭] এরপর পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের আগ পর্যন্ত আর কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। কিংবা ক্ষমতায় যেতে দেওয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সেই বিখ্যাত উক্তি পরিধান যোগ্য, '...আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'[৩৮] বাঙালি যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মতামত দিয়েছে। উদাহরণ ১৯৫৪ ও ১৯৭০-এর নির্বাচন।

গণবিদ্রোহের কারণ

একটি সমাজে প্রতিরোধ বা বিদ্রোহের সূচনা হতে পারে দু'ধরনের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে–প্রথমত, বাইরের কোনো শোষণকারী শক্তির নীতি ও কর্মকাণ্ডের ফলে সেই সমাজের মৌল সংস্কৃতির উপাদানসমূহের[৩৯] ওপর অভিঘাত এলে প্রচণ্ড রকমের সমষ্টিগত প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদান[৪০] সমূহের ক্ষেত্রে এমনি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে যে প্রতিরোধ জন্ম নেবে তা হয়তো তুলনামূলকভাবে খুব ব্যাপক হবে না, বা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে গোটা জনগোষ্ঠীকে সমানভাবে আলোড়িত করে একটি মৌল পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে না।[৪১]

মৌল সংস্কৃতির উপাদান এবং প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদান উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ সৃষ্টিতে একটি অভিন্ন উপাদানে সক্রিয়; এবং তা হলো আপেক্ষিক বঞ্চনা।[৪২]

অভিঘাত (Intrusion)>> মৌল সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ (Cultural Core (CC))>> আপেক্ষিক বঞ্চনা (Relative Deprivation (RD))>> সমষ্টিগত প্রতিরোধের প্রচণ্ডতম সম্ভাবনা (High Intensity of Collective violence)।

অভিঘাত (Intrusion)>> প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ (Cultural Peripherals (CP))>> আপেক্ষিক বঞ্চনা (Relative Deprivation (RD))>> সমষ্টিগত প্রতিরোধের অপেক্ষাকৃত কম সম্ভাবনা (Low Intensity of Collective violence)।

ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বা শোষণমূলক প্রক্রিয়ায় পরাধীন ও শোষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে বঞ্চনার চেতনা গড়ে ওঠে। আপেক্ষিক বঞ্চনার জন্ম হয় যখন গণমানসে সাংস্কৃতিক উপাদানভিত্তিক ন্যায়সংগত অধিকার ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও বিরাজমান পরিস্থিতির (যা বাইরের শক্তির সৃষ্টি) পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অধিকারের মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে বা যদি তা ক্রমেই বেড়ে চলে।[৪৩]

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই মডেলটির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে হলে '৭১-এর পূর্বে রাজনৈতিক পটভূমির ওপর আলোকপাত করতে হবে। ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যেসব স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু এই প্রস্তাবটিকে পরবর্তীকালে বিকৃত করে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সৃষ্টি হলো পাকিস্তান নামে এক অদ্ভুত রাষ্ট্রের। ধর্মের আড়ালে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে উপনিবেশবাদ শুরু হতে সময় লাগেনি প্রথমেই আঘাত এসেছিল ভাষা-সংস্কৃতির ওপর। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন '৪৭-উত্তর প্রথম প্রতিরোধ। বায়ান্নে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় একটি মোড় পরিবর্তনের সময়। দ্বিতীয় প্রতিরোধ '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন। শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি এসব ক্ষেত্রে বঞ্চনার ফল হিসেবে জন্ম হয় '৬৬-র ছয়দফা আন্দোলন। এরপর ছয় দফা ও এগারো দফা-র মিলিত ধারা গড়ে ওঠে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। '৭০-এর নির্বাচন-পরবর্তী বঞ্চনার মধ্য দিয়ে এলো '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিসংক্রান্ত দুটো বক্তব্য এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমত, '৭১-পূর্ব যে প্রতিরোধ তা প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহে অভিঘাত থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। আর সে কারণেই সে প্রতিরোধগুলোতে প্রচণ্ডতা ছিল না। সেগুলো ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরেই পূর্ববাংলার জনগণের স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন। কিন্তু '৭১-এর পাকিস্তানি সামরিকচক্রের গণহত্যা ছিল মৌল সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহে অভিঘাত। এ ধারাকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পূর্ববাংলার বাঙালির অস্তিত্বকে মুছে ফেলার নীল নকশা নিয়েই পাকিস্তানি সামরিকচক্র সেদিন গণহত্যা ও অন্যান্য নির্যাতন শুরু করেছিল। আর এ জন্যই প্রচণ্ড ও ব্যাপক প্রতিরোধ, যার নাম '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।[৪৪]

বাঙালিত্বের বিকাশ

ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বাঙালিত্ব পরিণতি লাভ করে যা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ। বাঙালিত্বের বিকাশ পূর্ব থেকেই ছিল। ঐ বিকাশে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নির্যাতন ভূমিকা পালন করে। তা স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রাখে। তবে পাকিস্তানিদের শোষণ বাঙালিত্বের বিকাশের একমাত্র কারণ নয়। পাকিস্তানি শাসনের শুরু থেকেই বাঙালিরা শোষিত হয়। তখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নি। কারণ বাঙালিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ তখনও হয়নি। যে সময় বাঙালিত্বের বিকাশ একটি পূর্ণরূপ পায়, তখনই শোষণ-বঞ্চনার বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। যেমনটি ১৯০৫ সালে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ পরিপূর্ণ হওয়ায় তারা সেই সময় শক্ত অবস্থান নিতে পেরেছিল, যেটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ছিল না বা পারে নি। ষাটের দশকে বাঙালি আত্মনিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সেই সময় বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ হয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করে। ফলে, তারা নিজেরা দেশ পরিচালনার বা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জন করে বলেই রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যায়।

বাঙালির দর্শনচর্চা ও সমাজ প্রস্তুতকরণ

বাঙালির দর্শনচর্চার মূলভিত্তি হলো–মানবমুক্তি। এটা শুধু বাঙালিরই নয় ভারতবর্ষের দর্শনেরও মূলভিত্তি। উপনিষদে মানবমহিমারই স্তুতিকীর্তন করা হয়েছে। বেদপন্থি ভারতীয় অধিকাংশ দার্শনিক মানবমুক্তির উপায় অনুসন্ধানকেই দর্শনচর্চার ভিত্তিরূপে দেখেছেন। অনুরূপভাবে অবৈদিক জৈন ও বৌদ্ধদর্শনেও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। চার্বাক (লোকায়ত) দর্শনে মানবমুক্তি তথা মোক্ষকে স্বীকার না করলেও মানুষের ঐহিক (ইহলৌকিক) কল্যাণবোধের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে প্রকারান্তরে মানবমহিমারই জয়কীর্তন করা হয়েছে। প্রতীচ্য দর্শনেও বিষয়টি ব্যাপক গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। গ্রিক দর্শনের প্রথম পর্ব বিশ্বতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে সম্পৃক্ত থাকলেও সোফিস্ট দার্শনিকদের যুগ থেকে সেখানেও আনুষ্ঠানিকভাবে মানবচর্চা শুরু হয়। খ্রিষ্টীয় যাজকদের অনুশাসনের মুখে মধ্যযুগে এ চর্চার গতি আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছিল, তবে আধুনিক ও সমকালীন প্রতীচ্যে তা আবার দার্শনিকদের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর এ সকল উন্নত দার্শনিকধারার মতো বাঙালির দর্শনচিন্তায়ও মানুষকে নিয়ে মানুষের ভাবনা, মানুষের স্বরূপ অন্বেষা একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়েছে।[৪৫] যখন বাংলার কোনো শাসক বা শাসকগোষ্ঠী মানবতাবাদের বিপক্ষে গেছে তখনই বাঙালি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। মানবতা বিজয় অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বাঙালি লড়াই করেছে।

বাঙালির দর্শনচিন্তার ইতিহাস বিভিন্ন যুগে ঠিক এক ও অভিন্নভাবে প্রবাহিত না হলেও মানবভাবনার বিষয়টি কিন্তু বাঙালির প্রাচীনকাল থেকে সমকাল পর্যন্ত সব যুগেই প্রাধান্য পেয়েছে। কাব্য, কবিতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্পকলাসহ মননসাধনার সর্বত্রই বাঙালি চিন্তাবিদরা মানবমহিমার স্তুতিকীর্তন ও মানবমুক্তির উপায় অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা থেকে কখনো বিরত থাকেন নি।[৪৬]

বাঙালি দার্শনিক মহাস্থবির শীলভদ্র (৫২৯-৬৫৪) বৌদ্ধশাস্ত্রের একজন শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক ছিলেন। তিনি নালন্দা মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৪৭] শীলভদ্রের মাধ্যমে বাঙালি মনীষা বিকশিত হয়েছে তর্কশাস্ত্রে এবং দার্শনিক ভাবনায়।[৪৮] শীলভদ্র রাজ পরিবারের সন্তান হয়েও ভিক্ষু হিসেবে দেশ-বিদেশ ঘুরে জ্ঞান অন্বেষণ করেন। তিনি অর্থকে কাজে লাগান বৌদ্ধবিহার নির্মাণে যাতে সেখানে ব্যাপক জ্ঞানচর্চা হতে পারে। সৃষ্টি হতে পারে জ্ঞানদীপ্ত আলোকিত মানুষ।[৪৯] শীলভদ্রের দর্শন ছিল এই আলোকিত মানুষগণই মানব মুক্তিতে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

প্রাচীন যুগে বিশ্ব-নন্দিত দার্শনিক অতীশ দীপঙ্কর যুক্তিবাদী দর্শনচর্চার জন্য ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর চিন্তাধারায়ও মানবমহিমার স্তুতিকীর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যযুগের বাঙালি মানসে মানবপ্রেমের এ চর্চা আরও বিকশিত হয়। কবি চণ্ডিদাস ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চণ্ডিদাসের মানবদর্শন বাঙালিকে প্রেম ও ঐক্যে আবদ্ধ হওয়ার যে দীক্ষা দিয়েছিল, বাঙালির কাব্য-সাহিত্য ও দর্শনচিন্তায় তার অবদান আজো অম্লান। মানুষকে বড়ো করে, মহৎ করে মানবমহিমা প্রচার করাই ছিল তাঁর কাব্য-সাধনার মূল লক্ষ্য। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।'[৫০]

শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদী প্রেমদর্শনে মানবতত্ত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও বিকশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বাঙালিকে প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করালেন, 'জীবে ব্রহ্ম, নরে নারায়ণ'। জীবসেবার আদর্শের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য প্রেম ও ঐক্যের বাণীতে সেদিনের মৃতকল্প বাঙালি মন ও মননে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন। অতঃপর বাঙালির দর্শনচিন্তার মানবমহিমার এই ধারণাটি আরও পরিপূর্ণ, আরও ব্যাপক ও আন্তরিকভাবে বিকশিত হতে দেখা যায় উনিশ শতকের প্রারম্ভে–বাঙালির নবজাগরণের মধ্য দিয়ে।[৫১]

নিজেদের ঐতিহ্য ও জীবনধারাকে উন্নত করার স্বার্থে প্রতীচ্য সংস্কৃতি থেকে উপাদান আহরণ করা প্রয়োজন বটে, কিন্তু তা করতে গিয়ে নিজের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা সুবিবেচনার পরিচায়ক হতে পারে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে নিজের সংস্কৃতি ও ভাষাকে অবহেলা করে প্রতীচ্য-সংস্কৃতির ভাষা ও জীবনবোধে মাত্রাতিরিক্তভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু পরিণত জীবনে এই প্রতীচ্য-প্রীতি যে কত বেদনাদায়ক হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যায় তাঁর রচিত 'বঙ্গভাষা' কবিতাটিতে–

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন!
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ[৫২]

বাঙালির দর্শনচর্চার রয়েছে এক দীর্ঘ ঐতিহ্য। তারা জীবন-জগৎ নিয়ে ভেবেছে, ইহকাল-পরকালের রহস্যজাল উন্মোচন করে সত্য আবিষ্কার করতে চেয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাঙালির কাব্যচর্চা ও সাহিত্য-সাধনার পাশাপাশি অনুশীলন করেছে মননচর্চার।[৫৩] বাঙালির মনন সাধনার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি ঐহিক (ইহলৌকিক) জীবন প্রণালির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। বাঙালি মাত্রই যেন ঐহিক জীবন-সন্ধানী। বাঙালি পরদেশি ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও কোনো কিছুকেই সে অবিকৃত রাখে নি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলামকে সে তার নিজ রুচি ও পছন্দানুযায়ী রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে। বাঙালির মনন-সাধনার এ এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এভাবে অন্যান্য পরধর্ম ও পরসংস্কৃতি বাঙালি মানসে নবরূপ গ্রহণ করে।

শুধু তাই নয়, আইনশাস্ত্র এবং অর্থনীতি সম্বন্ধেও বাঙালি স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছে। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভট্ট নারায়ণের বংশধর জীমূতবাহন বাঙালি হিন্দুর দায়াধিকার নির্ণয় করে যে দায়ভাগ প্রথা প্রচলন করেন, তাতে বাংলার হিন্দু সমাজের অর্থ ব্যবহার সম্বন্ধে এমন এক স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে বাঙালির সনাতন স্বাধীনতা প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৪]

বাঙালির মননসাধনায় অন্য যে জিনিসটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে, তা হলো জীবন উপভোগের সাধনা।[৫৫]

বাঙালি অতীতের কখনো রাজ্যগৌরব, শাসনদণ্ড, ধনগর্ব, ক্ষমতার দাপট কিংবা বাহুবলের প্রতাপ কামনা বা অর্জনের উৎসাহবোধ করে নি। সে নিজের মতো করে নিজেকে জেনেই তৃপ্ত থেকেছে, আত্মসমাহিত জীবনে সে আনন্দিত ও পরিতুষ্ট রয়েছে।[৫৬]

কর্মবাদী, ইহলোকমুখী ও ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার পরিচয় বাঙালির ঐতিহ্যের অংশ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের, বিশেষত উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে অধ্যাত্মবাদী ও ধর্মানুগত মতের পাশাপাশি চলতে থাকে এক বস্তুবাদী, সংশয়বাদী ও নিরীশ্বরবাদী ধারা।[৫৭]

বাঙালি মনীষী ও দাশর্নিকদের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক–

রেনেসাঁ বা নবজাগরণ যুগের প্রথম বাঙালি মনীষী রাজা রামমোহন রায়। তিনি সকল ধর্মের সারাৎসার নিয়ে তাঁর জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন ধর্মের ভিত্তি রচিত যুক্তিবুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণের ওপর। এর লক্ষ্য পরলোককে পরমসুখের জীবন নয়, ইহলোকে ব্যাপক মানব কল্যাণ। ধর্মকে আচারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে বাঙালি তথা বিশ্বমানবতার যথার্থ কল্যাণের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল রামমোহনের জীবনসাধনা, এটাই ছিল তাঁর জীবনদর্শন।[৫৮]

আমিনুল ইসলাম রাজা রামমোহন রায়ের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

> রামমোহন কোনো মোক্ষশাস্ত্র (মানবমুক্তি) রচনা করেননি, ধর্ম যাজকের ভূমিকা পালন করাও তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তাঁর ধ্যান-ধারণার মূল লক্ষ্যই ছিল ধর্মকে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আচারের বন্ধন থেকে মুক্ত করা, এবং তাতে করে পরিণামে মানবমুক্তির পথ সুগম করা ধর্মের মধ্যে যে মানবিক বোধের সঙ্কেত, তাকেই তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন যুক্তি দিয়ে, মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য।[৫৯]

উনিশ শতকে পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্ম আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের শুরু ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা' থেকে সূত্রপাত হয়।[৬০] বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রধান যা ঐতিহ্যগত হিন্দু ধর্মের মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্ট ধর্মের নীতিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল। রেঁনেসার সময়,

প্রটেস্টান্ট আন্দোলন ইউরোপের জন্যে যা করেছিল, বাংলায় ব্রাহ্ম আন্দোলন করেছিল অনেকটা তাই। বাংলার সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির একটি বিশেষ অংশে ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছিল, সৃষ্টি করেছিল কিছু নতুন মূল্যবোধের, সচলতা এনেছিল অনড় সমাজে বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্ক আলোড়ন তুলে।[৬১] এই ব্রাহ্মসমাজের মানবমুখীন কার্যক্রমের প্রভাবে সমাজে আসে পরিবর্তন। কিন্তু এরপূর্বেই বাঙালিসমাজকে প্রস্তুত করেছিল সুফিসাধকগণ। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের পর ইরান-ইরাক-তুরস্ক ও আফগানিস্তান থেকে অনেক সুফি দরবেশ, পির-আউলিয়া ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলায় আসেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–শাহ জালাল (রঃ), শাহ সুলতান (রঃ), শাহ মুখদম (রঃ), শাহ আলী (রঃ), খানজাহান আলী (রঃ) ইত্যাদি।[৬২] সুফিদের আদর্শ চরিত্র, অসাধারণ নৈতিক বল এবং দুঃস্থ মানুষের জন্য তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সেবা বাংলার মানুষকে মুগ্ধ করে।[৬৩] এইসব সুফিসাধক বাংলার নিজস্ব আচার-আচরণ, রীতি-নীতি এবং প্রথা স্বীকার করেই ধর্ম প্রচার করেন। সুফিদের মধ্যে এদেশি চিন্তার প্রবেশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে এনামুল হক বলেন,

> [বাংলা] দেশে সূফীমত প্রচার ও বহু বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যোগসাধনা ও সহজিয়া প্রভৃতি পন্থ বঙ্গের সূফী মতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সূফীমতের সাথে এ দেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতির সম্মিলিত হইতে থাকে।[৬৪]

তাই অনেক রীতি-নীতি বাঙালি মুসলমান, হিন্দু ও অন্যরা পালন করেন নিজেদের মতো করে। যেমন : বিভিন্ন পালা-পার্বণ ও নবান্নের উৎসব পালন। বিয়েতে নিজ নিজ ধর্মের নিয়ম অনুসারে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালনের আগে ও পরে বাঙালি রীতির নানা প্রথা বা আচার মানা ইত্যাদি।[৬৫] বাঙালির যে সমন্বয়ের ঐতিহ্য তা সুফিবাদের দ্বারা আরও সমৃদ্ধ হয়। বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন এবং ইসলাম ধর্ম আদি এবং অকৃত্রিম রূপে এ অঞ্চলে পৌঁছায়নি। এসব বহিরাগত ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচারের সমন্বয় ঘটেছে। মধ্যযুগে সুফিবাদের মতো ভক্তিবাদী দর্শনের উদ্ভব এবং বৈষ্ণব, সহজিয়া, বাউল, কর্তাভজা ও সখিভাবকের মতো ধর্মীয় সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করার পর সত্যপীর/সত্যনারায়ণ এবং দক্ষিণ রায়/বড় খান গাজী মতো লৌকিক দেবতার দেখা মেলে। এবং সাহিত্যেও একটা অসাম্প্রদায়িক এবং সমন্বয়বাদী ধারার সৃষ্টি হয়।[৬৬] এ প্রসঙ্গে হারুন-অর-রশিদ বক্তব্য প্রাসঙ্গিক, তিনি বলেন,

> বাঙালির মানস গঠনে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব পূর্বাপর লক্ষ্য করা গেলেও, এ সময়ে সুফী-সাধকদের উদার ইসলামী দর্শন বা সুফীবাদ এবং শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩০), কবীর, নানক প্রমুখের বৈষ্ণববাদ, ভক্তিবাদ মিলে বাঙালির জীবনে জন্ম নেয় একটি সহনশীল সংশ্লেষণাত্মক সংস্কৃতি (Syncretistic Culture) পরবর্তীতে অসাম্প্রদায়িকতা যার উত্তরাধিকার।[৬৭]

এই সাহিত্য ছিল বাঙালিত্বের ধারণাপুষ্ট। বাংলায় সুফিবাদের প্রভাব ছিল বহুমুখী। সুফিরা সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ঐতিহ্য ও মননে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী আবুল হাশিম বলেন, 'যথার্থ দর্শন কেবল তত্ত্বচিন্তা নয়, বরং জীবনেরই ভাষ্য ও সমীক্ষা। জীবনের সঙ্গে যে দর্শনের যোগ নেই, তার কোনো মূল্যও নেই।'[৬৮] দর্শনকে উন্নত জীবনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার এই আহ্বান কমবেশী সব বাঙালি মনীষীদের কণ্ঠে শোনা যায়।[৬৯]

অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব তাঁর রচনায় ও জীবনসাধনায় মানবতাবাদী জীবন-দর্শনের প্রচার ও জয়গান করেছেন। তিনি এ দর্শনের নাম দিয়েছেন 'সমন্বয়ী ভাববাদ'। যার সন্ধান তিনি পেয়েছেন, 'মধ্যপথ' অবলম্বনে-সেই মধ্যপথে যা অবস্থিত ধর্ম ও দর্শনের দেওয়া সর্বজনীন ও সার্বভৌম দৃষ্টি মানুষের মধ্যে জাগাবে প্রেম আর সেই প্রেমের সঙ্গে বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত অফুরন্ত শক্তির সংযোগে মানুষের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় হবে, নিখিল বিশ্বের মানুষ এক কল্যাণমুখী বিশ্বসমাজ গড়ে তুলবে, এই ছিল মনীষী দেবের আশা ও বিশ্বাস।[৭০]

আমিনুল ইসলাম অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব-এর দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> তাঁর (অধ্যাপক দেব) দর্শনের মূল উপজীব্য ছিল মানুষ, মানবিক বোধ ও মানবতাবাদের বিকাশ-এটা তাঁর কেবল একক মুখের বুলিই ছিল না। একে তিনি বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন তাঁর কর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে, তাঁর অর্থসম্পদ ও জীবন দিয়ে।[৭১]

সাইদুর রহমান দর্শনের জীবনমুখী ও মানবতাবাদী বাণীকে মুক্তবুদ্ধির আলোকে দেখার নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ-প্রচারের এবং ব্যাপক মানবকল্যাণে প্রয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত উচ্চারণ ও আচরণে এ সত্যই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, 'দর্শন শুধু থিওরী নয়, উন্নত জীবনের দাবী এবং সেই জীবনকে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা।'[৭২] পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের যেকোনো সার্থক দর্শনের ন্যায় বাঙালরি দর্শনও মূলত জীবনদর্শন, উন্নত মানবজীবন প্রণয়ন ও যাপনের উপায়ানুসন্ধান।[৭৩]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী দর্শন বাঙালি মানসকে সমৃদ্ধ করলেও সামাজিক ভাবাদর্শকে তা তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। মানবতাবাদ এদেশে বাঙালির নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতির আদলে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে।[৭৪]

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি বিজাতি ও বিদেশি শাসন কর্তৃক শাসিত হলেও নিজস্ব মননসাধনার ব্যাপারে সে সবসময়ই ছিল স্বতন্ত্র। জীবন ও জগৎ, সমাজ ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনচর্চা বিষয়ে বাঙালি বাইরের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হলেও বাইরের কাছে নিজেকে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিকিয়ে দেয় নি। বাইরের ভালো কিছু গ্রহণ করে তার সঙ্গে নিজের চিন্তা-চেতনার সম্মিলন ঘটিয়ে সে উন্নততর কিছু রচনা করতে চয়েছে। বলা বাহুল্য, বাঙালির চিন্তা ও চেতনা এবং ধর্ম ও মননসাধনায় মানুষ সবসময়ই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। অর্থাৎ মানুষকে যন্ত্ররূপে না দেখে মানুষরূপে দেখা বাঙালির মননসাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আর বাঙালির এ বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক–সব যুগেই অব্যাহত রয়েছে।[৭৫] বাঙালির দর্শনচর্চায় মানবতত্ত্বের দিকটি সার্থক জীবনদর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, বাঙালির দর্শনচিন্তায় সবসময়ই এ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগরণের পর বাঙালির দর্শনচিন্তায় মানব ভাবনা আরও বেশি গুরুত্ব পায়।[৭৬]

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজিকর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকেই এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর এদেশিয় তত্ত্বের সঙ্গে মুসলিম চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটে।[৭৭] মুসলিম শাসকরা বাঙালি না হলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান ছিলেন। তাঁরা একথা বিলক্ষণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এদেশকে শাসন করতে হয়ে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এ দেশের মাটি ও মানুষকে উপলব্ধি করা, এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা। আর এদেশের মানুষকে বুঝতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তাদের ভাষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা। তাই সম্পূর্ণ বিদেশি-বিভাষী-পরসংস্কৃতির মানুষ হয়েও তারা প্রথমেই বাংলা ভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তেরো শতকের শেষের দিকে সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ শাহ্র সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাভাষায় এদেশে প্রথম মহাভারতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মূলত তিনিই বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার বাতায়ন সৃষ্টি করেন। এবং তা অব্যাহত থাকে হোসেন শাহ-র শাসনামল পর্যন্ত। এভাবেই মুসলিম শাসকরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে বাঙালির ভাবসম্পদকে সমৃদ্ধ করেন।[৭৮]

হোসেন শাহীর সময় বাঙালির প্রতিভার বহুমুখী প্রসার ঘটেছিল। তার সময় শ্রী চৈতন্যের (১৪৭৮-১৫৩৩) বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার হয়েছিল। তিনি প্রচার করেন প্রেম-দর্শন, গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মুক্তি দিলেন মানবিক গুণের দীনতা থেকে।[৭৯] তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তুলে দিলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, যবন সব মিলে একাকার হয়ে গেল। হোসেন শাহ মুসলমান হয়েও সে ধর্মের উৎসাহদাতা ছিলেন। এই আমলে বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছিল। সুলতানি আমলে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিপ্রদাস পিপিল্লাই, বিজয়গুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী ও শ্রীধর নামক হিন্দু কবিরা *মহাভারত* অনুবাদ করেন।[৮০] মমতাজুর রহমান তরফদারের ভাষায়, 'বাংলা ভাষার উন্নতি ও বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ওপর স্থানীয় সংস্কৃতির বিজয়ের প্রতীক।'[৮১]

চৈতন্য পরবর্তীকালে প্রেমধর্ম বা প্রেমাত্মক দর্শনকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্বসাহিত্য রচিত হয় তা বাঙালির চিন্তা-ভাবনা তথা সমগ্র উপমহাদেশিয় জীবনে বয়ে আনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ তত্ত্ব ও দর্শনের মূলকথা : জাতি নয়, শ্রেণি নয়, কুল নয়, ভক্তি ও প্রেমই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রেমই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।[৮২]

বাংলার ইতিহাসে পাঠান ও মুঘল শাসনের তুলনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

> পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দ্দশা ঘটে নাই। ...পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্ত অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।... এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।
>
> ... মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলে সাম্রাজ্যে যুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেইদিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালার রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল।... বাঙ্গালার হিন্দুর অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে?[৮৩]

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাঙালি জাতি ইংরেজ শাসনের সংস্পর্শে আসে। এর ফলে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটে।[৮৪] তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটি নতুন মোড় নেয়। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশিয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা দেখা দেয়। এর ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটে।[৮৫] দেশিয় তরুণদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নগরবাসী বাঙালি শিক্ষার্থীর যোগ সাধিত হয়।[৮৬] ফলে পাশ্চত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বাঙালির চিন্তা জগতে বিরাট পরিবর্তন আসে যা নবজাগরণ নামে পরিচিত। নবজাগরণ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সেকালের ধ্যান-ধারণা পরিহার করে নতুন করে ভাববার, কল্পনা করার স্বাজাত্য বোধ্যে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জোগায়।[৮৭]

বাঙালির দর্শন চিন্তা সমন্বয় ধর্ম এবং এই সমন্বয়ের প্রয়োজনেই অনেকটা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বাঙালির জন্য তৃতীয় একটি লোকদর্শনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়েছে। তাতে হিন্দু এবং মুসলিম বাঙালির তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব আছে। বাস্তব অবস্থা, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার প্রেরণায় এ মিলন-মিশ্রণের কাজটি হয়েছে। এই তৃতীয় একটি ক্ষেত্র অনুসন্ধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে বৈপরীত্য ও বিদ্বেষ থেকে অতিক্রমণ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই মুক্তির লক্ষ্যই হচ্ছে মানবতাবাদের উত্তরণ।[৮৮]

অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই বাঙালির সংস্কৃতি–বাংলা নববর্ষ-উদ্‌যাপন, ঋতু উৎসব পালন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছে, রোমান হরফে বাংলা লেখার কিংবা বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে আমাদের যত দূরে সরাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বাঙালি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই প্রচেষ্টা মানেননি বরং প্রতিরোধ করেছে।

বাঙালির দর্শন হলো ইহলৌকিক কল্যাণ। আর এই কল্যাণের জন্য বাঙালি সমন্বয়বাদী দর্শনকে গ্রহণ করেছে। তারা ধর্মকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছে কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে নয়। যখন ধর্ম এবং বাঙালিত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তখন বাঙালি বাঙালিত্বের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে। উদাহরণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পরলোক এবং ধর্মকে ব্যবহার করেছে রাজনীতিতে। তখন বাঙালি পাকিস্তানি নীতির বিরোধিতা করে তার বিরুদ্ধে নিজেদের ইতিহাস-ঐহিত্যকে ব্যবহার করেছে। বাঙালির ঐতিহ্য হলো মানবিকতা। অর্থাৎ বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে বিদেশি-বিজাতি-বিভাষীর শাস্ত্র, সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনচর্যা গ্রহণ করেই।[৮৯]

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব তৎকালীন বাংলা প্রদেশের জনগণের প্রকৃত মানসগঠন, ভূগোল পরিচিত ও পরিবেশ, ভূমি ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক, ভাষা-সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাসের মূলধারা ও ঐতিহ্য লালিত আচার-আচরণ, জনসৌধের ঐতিহ্যমণ্ডিত সমন্বয়ধর্মী দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতিতে উপেক্ষা করে। তারা বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ধারণে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাথে 'ধর্মীয় বাহ্যিক আচার-আচরণে'র ভিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়ে জনসাধারণের 'সরল ধর্মানুভূতি'কে বিপথে চালনা করে সাফল্য লাভ করেছিল। এ প্রয়াস ছিল মূলত রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিনির্ভর। এই ধর্মভিত্তিক তথা সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির ধারা ও সাতচল্লিশোত্তর পূর্ববাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) তার প্রয়োগ প্রচেষ্টা এবং

সেই প্রচেষ্টার বিরোধিতায় বাঙালির জাতীয় স্বার্থ চেতনার উন্মেষে যে জাতীয় ঐতিহ্যানুরাগ ক্রিয়াশীল ছিল, তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ১৯৪৮-'৭১ সময়কালের মধ্যে বিকশিত ও বিজয়ী এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্যনির্ভর উপকরণসমূহের যেমন–আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা, সহজ জীবন-সহজ ভাব-সরল ধর্মানুভূতি, বিদ্রোহী-সংগ্রামী-বিপ্লবী চেতনা, সাম্যের ভাবনায় শোষণমুক্ত সমাজ আকাঙ্ক্ষা, ভেদাভেদ জ্ঞানাতিরিক্ত মানুষের মানব-মহিমা তথা মানবতাবাদ ইত্যাদির উপলব্ধি, মূল্যায়ন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতিসত্তা নির্মাণের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য থেকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উত্থিত হয়েছিল।[৯০]

এ ভূখণ্ডে মানুষ মুসলিম দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। যেখানে সংকীর্ণতা নেই। সমন্বয়ের ধারা বিদ্যমান। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ইসলামের দোহাই দিয়ে সবকিছু করছিলেন কিন্তু ইসলামের দর্শন থেকে দূরে গিয়ে পরমতকে শ্রদ্ধা না করে হিন্দুত্বে জুজু দেখিয়ে বার বার বাঙালির ওপর সবকিছু চাপিয়ে দিচ্ছিল। ফলে বাঙালি এই অভিঘাতের প্রতি উত্তর দেয়। প্রতিরোধ করে তোলে।

সমাজকে প্রস্তুত করতে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো বাঙালি দর্শন। এছাড়াও যে বিষয়গুলো সমাজকে প্রস্তুত করতে ভূমিকা পালন করেছে, সেগুলো হলো–সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিকতাবাদসহ আরও বেশ কিছু উপাদান। ঐ সময়ের পৃথিবী স্নায়ুযুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হলেও একইসাথে মানবতাবাদের/সমাজতন্ত্রের জয়গান ছিল। এগুলোর দ্বারা বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণ প্রভাবিত হয়েছিল। ফলে সমাজের পক্ষে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সমাজের এইসব বিষয় মূলধারার রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। ফলে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব হয়।

ভিন্ন মত বা আদর্শ নির্বাচন বা অবলম্বনের কোনো স্থান না থাকা

পাকিস্তান আমলের সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশেই ছিল নানা মানস প্রতিবন্ধে আচ্ছন্ন। দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠাদানের লক্ষ্যে পাকিস্তানবাদী ইতিহাসকাররা সমস্ত কিছুই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন।[৯১] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, কিংবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির সাথে একটি দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ ও বৈপরীত্য তীব্রতা এবং প্রখরতা লাভ করেছিল, পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতাদর্শ বনাম পূর্ব বাংলার সমাজ, পূর্ব বাংলার সমাজের সাংস্কৃতিক মতাদর্শকে কেন্দ্র করে। যেক্ষেত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতাদর্শ স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল, সেক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সমাজ এবং সমাজ গঠনের সাংস্কৃতিক মতাদর্শ তখনও ঘনীভূত এবং সচেতনায়নের মাত্রা অর্জন করেনি।[৯২] তৎকালীন পাকিস্তানে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাইরে অভিজ্ঞতার, চেতনার অন্য কোনো নির্বাচন (Choice) নেই কিংবা নির্বাচন সম্ভব নয়, আদর্শ লক্ষ্য হচ্ছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রিকটি সংরক্ষণ করা।[৯৩] অর্থাৎ পাকিস্তান যে দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পয়েছে তা হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব।[৯৪] এর বিপরীত কোনো আদর্শের স্থান পাকিস্তানে ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দূর করা সম্ভম নয় সমন্বয় ধর্মগত ও ইতিহাসগতভাবে অসম্ভব।[৯৫]

মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদ এবং তাত্ত্বিকরা বাস্তবতাবাদকে স্বাভাবিকতাবাদের এক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বাঙালিরা শুধু বাস্তববাদকে স্বাভাবিকতাবাদ থেকে আলাদা করেন নি, স্বাভাবিকতাবাদ বিরোধী নির্বাচনের বোধও তাদের মধ্যে এসেছিল।[৯৬] নির্বাচন (Choice) বোধ নিয়ে আসতে সক্ষম হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমান-এর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে বলেছেন, হবীবুল্লাহ বাহার ও মুজিবুর রহমান খাঁর *পাকিস্তান* গ্রন্থ দুটি তার মুখস্থের মতো ছিল।[৯৭] যে বই দুটিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সাহিত্যিক ভিত্তি দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই গ্রন্থ দুটি অধ্যয়নের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের যে স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ অনুসন্ধান করেও সফল হন।

সশস্ত্র বিদ্রোহ/ বিপ্লব এবং বাঙালি মধ্যে যে দর্শনগুলো বিদ্যমান ছিল সেগুলো কীভাবে ৬০-এর দশকের দর্শনকে প্রভাবিত করে। প্রতিটা ক্ষেত্রে, বাংলায় যে দুটি দর্শন (বাঙালি ও পাকিস্তানি) দেখা যায় তার মধ্যে দ্বন্দ্ব কীভাবে ৬০-এর দশকের

দার্শনিক ভিত্তি দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও দার্শনিক তত্ত্ব অস্বীকার করতে পেরেছিলেন বলেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভবপর হয়েছিল।[৯৮]

বাঙালিত্ব ও পূর্ববঙ্গ

জাতীয়তাবাদকে একটি আধুনিক ধারণা বলে মনে করা হলেও প্রাচীন যুগেও বিশেষত গ্রিক রাষ্ট্র চিন্তায় জাতীয়তাবাদের স্থান ছিল। গ্রিকরা নিজেদেরকে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ থেকে স্বতন্ত্র মনে করতো। মধ্যযুগে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপনের চিন্তার প্রভাবে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা প্রায় লোপ পায়। ষোড়শ শতক থেকে জাতীয়তাবাদী চিন্তা পুনরায় মানুষকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ জোরালোভাবে আবির্ভূত হয়। 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'-র বাণী সংবলিত ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বের নানা দেশের মানুষ দেশাত্মবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। এ দেশাত্মবোধের চেতনা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে এটি হয়েছে আরও বেগবান। ঐক্যবদ্ধ ইতালি ও জার্মানির পশ্চাতে ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী প্রেরণা। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নানা প্রান্তে শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম যা মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফল। অর্জিত হয় বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা।[৯৯] ঠিক একই রকম, একটি স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্র এবং একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বস্বীকৃতি পাবার বহু পূর্ব থেকেই এই অঞ্চলের মানুষের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা স্ফুরণ ও শক্তি সঞ্চয়ের কাজ শুরু হয়। অর্থাৎ যখন বাংলাদেশ বলে কোনো রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি, তখনও বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই অঞ্চলের মানুষের মনে ক্রিয়াশীল ছিল। বস্তুতপক্ষে সেই চেতনাই বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তোলে।[১০০]

এখন জাতীয়বাদ কী সে সম্পর্কে সাধারণ ও সরল ধারণা নেওয়া যাক–কোনো জাতি যখন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিজেদের এক মনে করে এবং তার ভিত্তিতে একটা স্বাধীন দেশ গঠনের প্রয়াস করে তখন তাকে জাতীয়তাবাদ বলে। ঠিক একই রকম, কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে বাঙালি নিজেদের এক মনে করে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে দেশ গঠনের একটা প্রয়াস প্রাচীনকাল থেকে করে আসছিল। বাঙালি জাতির মধ্যে যে জাতীয়তাবাদের চেতনা পরিস্ফুটিত হয়েছে তাকেই আমরা বাঙালিত্ব বলে অবহিত করছি। উল্লেখ্য বাঙালি যে বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে এক হওয়ার চেষ্টা করেছে তা সবসময় এক রকম ছিল না, তবে বৈশিষ্ট্যসমূহের মৌলিক দর্শন ছিল একটি, তাহলো ভাষা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য। বাঙালির এই বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনার মাধ্যমে বাঙালিত্বকে বোঝার চেষ্টা করা হবে এবং কীভাবে বাঙালিত্ব স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলো তা তুলে ধরা হয়েছে।

একটা বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের যারা বংশানুক্রমে অধিবাসী এবং বাংলা যাদের বংশানুক্রমে মাতৃভাষা তাদেরই বাঙালি বলা হয়।[১০১] এ কথার সমর্থনে *বঙ্গভূমিকা* গ্রন্থের সূচনায় সুকুমার সেন যে কথা সিদ্ধান্তের মতো করে বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'ভাষা নিয়ে জাতি, জাতি নিয়ে দেশ। বাংলা ভাষার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতির ইতিহাস শুরু।'[১০২] তিনি জানিয়েছেন, "কোন জাতি অধ্যুষিত দেশ ('বিষয়') সেকালে সেই জাতিনামে পরিচিত হ'ত।" এই সূত্রে সেকালের অনেক দেশনাম একাল পর্যন্ত চলে এসেছে। পূর্বভারতের জাতিদেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে উল্লিখিত দেখা যায় 'বঙ্গ'।' পরে এ-প্রসঙ্গে সুকুমার সেন আরও একটু যোগ করে বলেছেন,

> ... আমাদের পুরোনো দেশনামগুলি জাতিনাম থেকে এসেছিল। সেখানে বলা হয়নি যে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ উল্লিখিত একটি ছাড়া সব জাতিদেশনামগুলি অনেককাল আগেই লুপ্ত হয়েছে। লুপ্ত হয়নি শুধু 'বঙ্গ' নামটি। সে নাম এখনও রয়েছে। যখন সমগ্র ভারতবর্ষের এমনকি আর্যাবর্তেরও নামকরণ হয়নি তখনও 'বঙ্গ' এই জাতিনামটি চলিত ছিল।[১০৩]

চর্যাপদে 'বঙ্গ'-সঙ্গে 'আল' ও 'আলী' প্রত্যয় যোগে বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দ চালু হয় দেশ ও জাতি অর্থে।[১০৪] অস্ট্রিক, আলপাইন, পামিরীয়, দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সমবায়ে আধুনিক বাঙালি জাতির উদ্ভব।[১০৫] বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং ইংরেজের সঙ্গে তাদের তুলনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,

> ইংরেজ এক জাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে আমরা চারিপ্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ

জাতিবাঙ্গালী মুসলমান। চারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙ্গালীসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি অমিশ্রিত আর্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।[১০৬]

বাঙালিরা যাঁরা সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন তাঁরা সেই *চর্যাপদ* শুরু করেন। বাঙালিত্বের উদ্ভব হয়েছে বাংলা ভাষার সূত্রে।[১০৭] রবীন্দ্রনাথও জোর দিয়েছিলেন ভাষার ওপরে। বাঙালি সত্তার পরম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর, তার বিরুদ্ধে ছয়বছরের আন্দোলনে। ১৯০৭ সালের একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

একবার ভাবিয়া দেখুন, বাঙালিকে আমরা যে বাঙালি বলিয়া অনুভব করিতেছি, তাহার মানচিত্রে কোনো কৃত্রিম রেখার জন্য নহে। বাঙালির ঐক্যের মূলসূত্রটি কী? আমরা এক ভাষায় কথা কই।[১০৮]

১৯২৯ সালে অন্য একটি অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

...বাঙালি বাংলা দেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়; বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি। ...

যেখানে বাংলার শুধু ভৌগোলিক অধিকার সেখানে সে মানচিত্রের সীমা পরিধিকে ছাড়াতে পারে না। সেখানে তার দেশ বিধাতার সৃষ্ট দেশ; সম্পূর্ণ তার স্বদেশ নয়। কিন্তু, ভাষা-বসুন্ধরাকে আশ্রয় করে যে মানসদেশে তার চিত্ত বিরাজ করে সেই দেশ তার ভূসীমানার দ্বারা বাধগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্বজাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালি সেই দেশটিকে নদীপ্রান্তর পর্বত অতিক্রম করে সুদূরপ্রসারিতরূপে দেখতে পাচ্ছে, তাই বাংলার সীমার মধ্যে থেকে বাংলার সীমার বাহির পর্যন্ত তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হচ্ছে।[১০৯]

বাঙালিত্বের বিকাশও বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে হয়। সৈয়দ শামসুল হক বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলেন, 'বাংলা ... শুধু মানুষের ব্যবহার যোগ্য বিশেষ একটি বর্ণমালা নয়, বা একটি ভাষার নাম নয়, কিংবা শুধু অক্ষরের সমষ্টি নয়; বাংলা একটি সংস্কৃতির নাম।'[১১০] বাঙালিত্ব হলো সেই সংস্কৃতির পূর্ণরূপ।

পূর্ববঙ্গ চিহ্নিতকরণ

ভারতীয় উপমহাদেশের, তারপর বাংলার অংশ হয়েও কীভাবে এই অঞ্চল একটি এককে পরিণত হলো। এককে পরিণত হওয়ার পেছনে কাজ করেছিল প্রবল আঞ্চলিকতাবোধ বা এই আঞ্চলিকতাবোধ ও এককে পরিণত হওয়ার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত ভারত ও অভিন্ন বাংলাকে বিভিন্ন সময় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং তারই একটি অংশ ক্রমে নির্দিষ্ট এককে পরিণত হয়।[১১১]

এ প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুন *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ* গ্রন্থে বলেন,

পূর্ববঙ্গবাসীর মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল ...। কিন্তু এর কারণ, এখানকার কৃষিভিত্তিক সমাজ যেখানে উৎপাদক পদ্ধতি প্রায় নিশ্চল। এই নিশ্চলতার দরুণ সমাজ বিন্যাসে বহু স্তর সমান্তরালভাবে থেকে গেছে। এছাড়া কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থান এবং প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা আবার সৃষ্টি করেছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সাংস্কৃতিক অসাম্যের। আর 'নিশ্চল উৎপাদন পদ্ধতি তাকে আরো করে তুলেছে জোরদার, সৃষ্টি করেছে গতিহীনতা ও পুনরাবৃত্তি।' আবার 'সমাজ কাঠামোর অসম ঐক্য সংস্কৃতি প্রসারণের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে, সে জন্যে আঞ্চলিকতা বাংলার গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে থেকে গেছে'।[১১২]

প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, 'ভূমি নির্ভর কৃষি জীবনের কারণে কৌম ও আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল।'[১১৩] এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন আরও কিছু বিষয় যোগ করে বলেছেন,

আঞ্চলিক চেতনার মধ্যে ভূমি নির্ভরতার এই অনুপ্রবেশ ক্রিয়াশীল দেখতে পাই বিকাশমান মধ্য বা বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে। ঐ সময় একই সঙ্গে সর্বভারতীয়, আঞ্চলিক (বাংলা) ও উপ-আঞ্চলিক (পূর্ববঙ্গ)—এই চেতনাত্রয় কাজ করেছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্যে সর্বভারতীয় পরিসরে সুবিধা ছিল বেশি। সেজন্যে সে চেয়েছিল সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার আঞ্চলিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল সে, যেমন, বঙ্গভঙ্গের সময়। কলকাতার বিরুদ্ধে আবার পূর্ববঙ্গের কাঠামোগত দুর্বল মধ্যশ্রেণীর উপ-আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। ঐ মধ্যশ্রেণীর মতে, তাদের অঞ্চলের

> উৎপাদিত কাঁচামাল চলে যাচ্ছিল কলকাতায়, কিন্তু পাচ্ছিল না ন্যায্যমূল্য। পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অবহেলিত।...এই চেতনা সহায়তা করেছিল আবার ভূমিনির্ভর জীবন, শিল্পের অভাব। এই উপ-আঞ্চলিক চেতনা পূর্ববঙ্গবাসীর মন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি কখনও। সে চেতনা আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে (১৯৭১) সহায়তা করেছিল।[১১৪]

তিনি আরও বলেন,

> ঔপনিবেশিক আমলে, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল এবং এর দু'টি ধারা ছিল বহমান–একটি সর্বভারতীয়, অপর আঞ্চলিক। প্রথমটির ভিত্তি ছিল–সর্বভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। দ্বিতীয়টির ভিত্তি ছিল স্ব স্ব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং নিজ অঞ্চলের লোক সমষ্টির ঐ অঞ্চলের বাজার ও সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ। জাতীয় চেতনার মধ্যে আঞ্চলিক চেতনার এই অবস্থানের ভিত্তিতে আবার অনুপ্রবেশ করেছে প্রাচীন বাংলার অতীত এবং ঐতিহ্য।[১১৫]

সর্বভারতীয় চেতনার মধ্যে থেকে উদ্ভব আঞ্চলিক (বাংলা) চেতনার এবং তা আরও পরে উপ-আঞ্চলিক (পূর্ববঙ্গ) চেতনায় পরিণত হয়েছিল। এই উপ-আঞ্চলিক চেতনা পূর্ববঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বৃহত্তর বাংলা থেকে পৃথক রূপ দেয়।

বাঙালিত্ব ধারণাটা মূলত মধ্যবিত্তের। একসময় বাঙালিত্বের ধারণাটি এসেছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্তের সচেতনতা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ঐ যুগের অনেকেই খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন–বাঙালির নিজস্ব কিছু সামাজিক সত্তা আছে।[১১৬] বাঙালিত্বের ধারণা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের মনে দু'রকম। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির ঝোঁকটা হলো–ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের যে-যোগ, হিন্দুত্বের সঙ্গে যে-যোগ, উপনিষদ-পুরাণের সঙ্গে যে-যোগ, তাকেই প্রাধান্য দেওয়া। শিবনারায়ণ রায় বলেন,

> উনিশ শতকে ন্যাশন্যালিজ্‌মের প্রভাবে একদিকে যেমন শিক্ষিত বাঙালি তাঁদের গোষ্ঠীসত্তাগত বাঙালিত্ব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের আন্তরিক প্রযত্নে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের লক্ষণীয় বলাধান ঘটল, অন্যদিকে আবার বৃহত্তর জাতিসত্তার অন্বেষণে তাঁদের মন ভারতীয়ত্ব আবিষ্কারেরও উন্মুখ হল।[১১৭]

রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেরই ঝোঁক প্রাক্-মুসলিম ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপরে–বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদিকেই তাঁরা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মুখ্য উপাদান বলে ধরে নিয়েছিলেন। অপরপক্ষে প্রায় সাত-আটশো বছর ধরে এই উপমহাদেশে সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, সংগীত, পোশাক-আশাক, রন্ধন বিদ্যা, শাসনব্যবস্থা, উদ্যান চর্চায় মুসলমান শাসক সমাজ যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রচনা করেছিলেন তাকে তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য হিসেবে ভাবতে শেখেন নি।[১১৮]

বাংলার ক্ষেত্রে ভারতী ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালির বিশিষ্ট ঐতিহ্যকে মেলাবার চেষ্টা করা যায় না। কারণ দুই অঞ্চলের ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। এ প্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায় বলেন,

> বাঙালির ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, তার লোকজীবনের বিচিত্র বহুবর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই তথাকথিত ভারতীয় আর্য ঐতিহ্যের সম্পর্ক কতটুকু? হিন্দু বাংলার যে দেবীপূজাকে নিয়ে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ তার সঙ্গে পুরুষপ্রধান ব্রাহ্মণ্যসমাজসংস্কৃতি কী সূত্রে মিলবে? বাংলার ভূ-প্রকৃতিকে বন্দনা করে রবীন্দ্রনাথ যে সব স্বদেশী গান বেঁধেছেন তারা কতটুকু সাড়া তুলতে পারে রাজস্থানে বা তামিলনাড়ুতে? শিক্ষিত হিন্দু বাঙালির স্বাদেশিকতার মূল উৎস বাংলাদেশ; ভারতীয় ন্যাশন্যালিজ্‌মের উল্লেখ বারে-বারে করলেও মনের গভীরে আজও তা খুব একটা সাড়া তোলে না। দেশ স্বাধীন হবার পর হিন্দীর আগ্রাসী বিস্তার পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির স্বজাতিপ্রেমের দুর্বলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ব্রাত্য রূপটিকে স্পষ্টতর করে তুলেছে।[১১৯]

যুক্ত বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ছিল মুসলমান; কিন্তু দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গসংস্কৃতির ওপর প্রাধান্য ছিল বাঙালি উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু। বাঙালি মুসলমানের ধর্ম সমাজ-পরিবার সংগঠন, আচার-বিচার, মৌখিক ভাষা এবং লিখিত সাহিত্য সম্পর্কে এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিন্দু প্রবক্তাদের না ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞান, না কোনো যথার্থ আগ্রহ। নজরুলের বিদ্রোহী রচনাবলি সাময়িকভাবে হিন্দু-মুসলিম ব্যবধানকে অতিক্রম করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হিন্দু

চেতনায় তার কোনো স্থায়ী প্রভাব পড়েনি। ফলে, বাঙালি হিন্দুর স্বাদেশিকতায় সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী মিশ্রণ ঘটে। বিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া আর অস্পষ্ট থাকে নি। এ কারণে দেশবিভাগের সময়ে বঙ্গবিভাগ প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে।[১২০]

আর পূর্ববঙ্গের বাঙালি–তাদের পক্ষে স্বভাবতই মধ্যযুগের সঙ্গে যোগ বেশি অর্থপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মধ্যযুগকে প্রায় উড়িয়েই দিয়েছে; এখানকার সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশে ইসলামের অবদানকে তারা বিশেষ মূল্য দেন না। সেইদিক থেকে, বাঙালিত্বের ধারণাটা দুই বাংলায় এক রকমের নয়।[১২১] শিবনারায়ণ রায় বলেন,

> যে পর্বে বাঙালি নামে জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে সেটির সূচনা এবং প্রাথমিক বিকাশ যে আসলে মুসলমান আমলেই ঘটে, বাঙালি হিন্দু ঐতিহাসিক এবং অন্য আলোচকদের মধ্যে অধিকাংশই এ সত্য স্বীকারে অনাগ্রহী এবং এই সত্যের সুদূরব্যাপী অর্থবিচারে অনিচ্ছুক। বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঐক্য এবং স্বতন্ত্রের মুখ্য অবলম্বন বাংলা ভাষা এবং বাংলা অক্ষরমালা এবং দুটিরই উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে মুসলমান রাজত্বকালে।[১২২]

পশ্চিম বাংলায় একটা মান ভাষা তৈরি হয়েছে, সাহিত্যেও তারা আধিপত্য বিস্তার করেছে। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে এগুলোর কিছুই তখনও হয় নি। এই পূর্ববঙ্গে অধিবাসীদেরকে তাই তারা বাঙাল বলছে। 'বাঙাল' তথা সংস্কৃতিহীন লোকবসতি অঞ্চল।[১২৩] অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিরা পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীদের অবজ্ঞা করে বাঙাল বলছে। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের সবসময় অবজ্ঞাসূচক সম্বন্ধ করা হতো। তারা এটাকেই নিজেদের গর্বের বিষয়ে পরিণত করে। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের গায়ের রং নিয়ে গর্ব করছেন। বাঙালিরা নিজেদের নিয়ে এই ধরনের গর্ব প্রাচীনকাল থেকেই করে এবং সেটা তাদের ঐতিহ্যের অংশে পরিণত হয়। বাঙালত্বের এই বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে–ইসলাম ধর্ম। ছয়শো বছর ধরে মুসলিম শাসনের অধীন থেকে পূর্ববঙ্গ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সেখানে হিন্দু-মুসলমান দুটোরই ব্যাপার আছে–এক সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল, তার বিপরীতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। বাঙালত্বের মূল বিষয় সেকুলারিজম কিন্তু বার বার তা এই দুই ধর্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তাই পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে বাঙালির থেকে তাই বাঙালত্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই বাঙালত্ব ৭১-এ পরিণত হচ্ছে।

আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু পূর্ববঙ্গ। শাশ্বত বাংলাকে ও তার ঐতিহ্যকে বাদ না দিয়ে, সেটাকে পটভূমি হিসেবে ধরে পূর্ববঙ্গের আত্মপরিচয় গঠন করা হলো আমাদের লক্ষ্য। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গকে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য থেকে একেবারে আলাদা না করে, সব বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়েই আলোচনা করা হবে। পূর্ববঙ্গের বৈশিষ্টগুলোকে আমরা বাঙালত্ব হিসেবে চিহ্নিত করবো। তাহলে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার যে বৈশিষ্ট্য স্পষ্টকরণ সম্ভব হবে।

ভাষা ও জাতি হিসেবে একটি ভৌগোলিক এককের মধ্যে একাত্মতা গড়ে উঠলেও অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক এবং লোকজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। এ অঞ্চলের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে খাল-নদী-হাওর এবং দারিদ্র্য। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেছেন,

> পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর মানসিকতা তৈরী হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রকৃতির প্রভাবের ফলে। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নদী, নৌকা, সবুজ গাছ-গাছালি, আর দিগন্ত-বিস্তৃত সমভূমি। এই নিসর্গ বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ... প্রভাবিত করেছে বাঙালি মন ও জীবনকে...।[১২৪]

তিনি আরও বলেছেন,

> ভাষা এবং জাতি হিসেবে বাঙালির 'একত্বতা' গড়ে উঠলেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা দুটি অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। প্রকৃতিগত দিক থেকেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক অঞ্চল। এছাড়া সংস্কৃতিগতভাবেও যে প্রাচীনকালে দুটি অঞ্চলের খুব মিল ছিল এমন কথা বলা যায় না। যেমন রাঢ় (বা পশ্চিমবঙ্গ)-এর ওপর প্রভাব পড়েছিল বেশি উত্তর ভারতীয় 'কালচারাল ইডিওমস'-এর যার উদাহরণ ঐ অঞ্চলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।[১২৫]

একসময় উত্তর ভারতের সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলেও কিছুটা ছিল। কিন্তু একসময় পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের আগমন এবং তারপর তাদের সংগঠিত ধর্মজীবন ও কৃষি বাণিজ্যের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরাঞ্চলে। এক কথায়, মুসলমানদের আগমন, মসজিদ নির্মাণ ও তাকে ঘিরে পতিত জমি উদ্ধার ও সংগঠন, বিশেষ করে সুফীদের প্রভাব অনেক বেশি ছিল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। এভাবে, উত্তরাঞ্চল রাঢ়ের সংলগ্ন ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে তা পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেও কাছে মলীন হয়ে গিয়েছিল।[১২৬]

পূর্ববঙ্গের যে আঞ্চলিক এবং লোকজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা উৎপাদন ব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, ধর্ম এবং প্রকৃতি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই বিষয়গুলো আলোচনা করে আমরা পূর্ববঙ্গকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।

ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রকৃতিগত পার্থক্য

বাংলা নদীবহুল দেশ। নদীর বৈশিষ্ট্য হলো–বহমান ও গতিশীল। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ পাহাড় দ্বারা প্রভাবিত। পাহাড়ের বৈশিষ্ট্য হলো–স্থির, মৌন ও ধ্যানী। সুতরাং পাহাড়ের সাথে নদীর পার্থক্য আছে। একইসাথে দুই বঙ্গের মধ্যে তাই পার্থক্য প্রকৃতির মতোই স্পষ্ট।

প্রকৃতিগত ছাড়াও অন্যান্য দিক থেকেও পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পার্থক্য ও ভিন্নতা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অনেক নদী থাকলেও সেই তুলনায় পূর্ববঙ্গে অনেক বেশি নদী আছে। ফলে পূর্ববঙ্গকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ।[১২৭] পশ্চিম বাংলায় অনেক নদী আছে তার মধ্যে প্রধান গঙ্গানদী। গঙ্গার দক্ষিণ-পূর্ব ধারা পদ্মা নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর প্রবাহ পবিত্রতার প্রতীক। যখনই তা পূর্ব বঙ্গে প্রবেশ করলো তা নাম নিল পদ্মা নামে। তা আর পবিত্র রইল না। মনসা যার অন্য নাম পদ্মা। মনসা হলো শিবের কন্যা। কালিদহে পদ্মপত্রের ওপর তাঁর জন্ম। সেই জন্য মনসার অন্য নাম পদ্মাবতী। যার জন্ম অবৈধ ছিল। ফলে তার নামের মতো পদ্মা নদীও অপবিত্র হলো। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা সবসময় পূর্ববঙ্গকে অবজ্ঞা করতো এটি তার প্রমাণ। অর্থাৎ বাঙালদের সংস্কৃতিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা অবজ্ঞা করে, তেমন প্রকৃতিগত দিকগুলোতেও পূর্ববঙ্গকে সবসময় অবজ্ঞাসূচক সম্বন্ধ করা হতো। এটা তার অন্যতম প্রমাণ। প্রতিটা ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলাকে এ রকম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো। স্বভাবতই দুই অঞ্চলের মধ্যে একটি পার্থক্য গড়ে ওঠে।

নদী পূর্ব বাংলার যোগাযোগের সব থেকে বড়ো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নৌকায় মাঝিরা গাইত সারিগান, ভাটিয়ালি ইত্যাদি গান। এটাই পরিণত হয় পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গে। যা পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক করেছে।[১২৮] এই গান শুধু নদী অঞ্চলেই হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের গান দেখা যায় না।[১২৯]

শুধু তাই নয়, পূর্ববঙ্গের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে নদী। এ প্রসঙ্গে রেলেসের (১৭৮১) উক্তি স্মতর্ব্য–'বাংলা নদনদী কমপক্ষে তিরিশ হাজার মাঝির অন্ন যোগাচ্ছিল।'[১৩০] প্রবাদ আছে, 'মাছে ভাতে বাঙালি'। কারণ, পূর্ববঙ্গের জলবায়ু ধান উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক তাই ভাতই বাঙালির প্রধান খাদ্য। ভেতো বাঙালি কথাটার উদ্ভব বোধ হয় সেখান থেকেই।[১৩১] ভাতের পর মাছেই তার প্রধান খাদ্য। এর অন্যতম একটি কারণ, নদীনালা, খালবিলে মাছের সহজলভ্যতা। নদীর জল-নিঃসারক, জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক, মৎস্যের আধার।

নদীর অন্যতম প্রধান কাজ ভূমি নির্মাণ করা। বহতা নদীর পলি সম্পূর্ণ করে ভূমির পরিবর্তন। নদীর প্রবাহ বদল করে সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতো। নদীর প্রবাহ বা খাত পরিবর্তন জনজীবনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। পুরোনো বন্দর, শহর আর গ্রাম হয়েছে প্রাণহীন, এসেছে ধ্বংস আর পরিবর্তন। নদী মরে যাওয়ার সাথে সাথে সেই অঞ্চলে মানুষও কমতে থাকে। তারা জীবিকার সন্ধানে নতুন জায়গায় বসতি গড়ে। শুধু তাই নয়, মৃত নদীগুলো ছিল আবার ম্যালেরিয়ার জন্মস্থল। ফলে ম্যালেরিয়াও ঐ অঞ্চলে জনসংখ্যা হ্রাসে সহায়তা করেছিল। প্রতিবছর কোনো না কোনো অংশে বন্যার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্যা হয়ে ওঠে সম্পদহানি ও প্রাণনাশের কারণ।[১৩২] কামরুদ্দীন আহমদ-এর মন্তব্যে পূর্ব বাংলার চিত্র পরিপূর্ণ ফুটে উঠেছে,

> বাংলা বানের দেশ, ধানের দেশ, গানের দেশ। বানে মাটিতে বেশি পলি পড়ে-তাই ধান-পাট জন্মায় বেশি। আর সে ধান ঘরে উঠলে অন্তরে সুর বেজে ওঠে। নদীমাতৃক বাংলায় উত্তাল নদী পাড়ি দেবার জন্য এবং বিপদকে ভুলে থাকার জন মাঝি গান গায়।[১৩৩]

অপরদিকে, পশ্চিম বাংলার উত্তরে হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত দার্জিলিং-এর শৈলশৃঙ্গ ও পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্বতের শাখা হিসেবে সাঁওতাল পরগনার পর্বতমালা বাংলাকে বেষ্টন করে রেখেছে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার শুশনিয়া, মশক ও বিহারীনাথ এবং পুরুলিয়া জেলায় অযোধ্যা ও বাগমুণ্ডি পাহাড়।[১৩৪] পূর্ববঙ্গেও অনেক পাহাড় আছে–সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে। এ অঞ্চলে পাহাড়ের অধিবাসীরা সমতলের অধিবাসীদের মতোই জীবনযাপন করে।[১৩৫] পাহাড় যাপিত জীবনে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে পাহাড়ের প্রভাব অনেক বেশি। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গ হিমালয় প্রভাবিত ভূখণ্ড যার প্রবণতা নগরমুখিতা এবং উন্নয়নের দিকে। অর্থাৎ রেনেসাঁসের দিকে। ঐ রেনেসাঁসকে বাঙালির রেনেসাঁস না বলে পশ্চিমবঙ্গের রেনেসাঁস বলাই ভালো। ব্রিটিশ আমলে পশ্চিমবঙ্গ তাদের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে পরিণত হয়। অপরদিকে পূর্ববঙ্গ কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রূপান্তর হয় প্রান্তে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধানটির এই দুই অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করলো। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যায়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের কালচার এক হয় না। পূর্বে ভৌগোলিকভাবে পার্থক্যই বেশি দৃশ্যমান হলেও পরে তা সাংস্কৃতিকভাবেও পরিলক্ষিত হয়।

দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য আরও স্পষ্টভাবে *বাংলার কাব্য* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন হুমায়ুন কবির। তিনি *বাংলার কাব্য* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, 'পশ্চিম-বাঙলার প্রকৃতি ... বাঙালীর কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস। অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।'[১৩৬]

অপরদিকে পূর্ব বাংলা নিসর্গের ভাঙাগড়ার খেলা ও মানুষের নিত্যকার জীবনসংগ্রামের ফলে। তাই তিনি বলেন, 'লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানে স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি। প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?'[১৩৭]

সুতরাং ভৌগোলিক ও প্রকৃতিগত পার্থক্য দুই বাংলার মধ্যে স্পষ্ট। এই পার্থক্যের ভিত্তিতেই আমরা পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করবো।

শাসনব্যবস্থা

শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে কোনো সময় (শশাঙ্কের সময় ব্যতীত) পূর্ববঙ্গ ছিল না। কেন্দ্র শাসন করেছে বিদেশিরা। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সম্রাট গোপালের অধিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পাল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। পশ্চিম বাংলা ও বিহার ভূ-খণ্ড ছিল পাল সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র। সেন রাজাদের আমলে (১১৫৯-১২০৬) নবদ্বীপ[১৩৮] ছিল রাজধানী। নবদ্বীপ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববঙ্গ পরিণত হয়েছিল কলকাতা তথা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কাঁচামালের আড়ত বা পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে।[১৩৯]

সুতরাং বেশিরভাগ সময় কেন্দ্র শাসন থেকে দূরে থাকায় পূর্ববঙ্গের প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা আবার সৃষ্টি করেছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সাংস্কৃতিক অসাম্যের। আবার 'সমাজ কাঠামোর অসম ঐক্য সংস্কৃতি প্রসারণের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে, সে জন্যে আঞ্চলিকতা বাংলার গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে থেকে গেছে'।[১৪০] ফলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা পার্থক্য গড়ে ওঠে।

উৎপাদন ব্যবস্থা

যুক্ত বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ছিল একটা ভারসাম্য। পূর্ব বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান। সেজন্য পূর্ব বাংলা ছিল খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের আড়ত। আর পশ্চিম বাংলা ছিল শিল্পপ্রধান অংশ। পশ্চিম বাংলাকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জন্য

পূর্ব বাংলার ওপর নির্ভর করতে হতো। দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর, এই আর্থিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ে।[১৪১] নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছিলেন, 'উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে ও বাঙালির বাস্তব সভ্যতার রূপ গ্রামীণ।' এ সময় পূর্ববঙ্গে ছিল জলাজঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ করার সময়। শহর যেগুলো ছিল সেগুলো ছিল সমৃদ্ধিশালী গ্রামেরই বিস্তৃতি। গ্রামের সঙ্গে 'শহরবাসীর' সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ, দৃঢ়।[১৪২] প্রাচীনকাল থেকে বৃহৎ বাংলার উৎপাদন ব্যবস্থা মোটামুটি একই হলেও পরবর্তী সময়ে তাতে রূপান্তর ঘটে। বিশেষ করে ইংরেজ আমলে যখন কলকাতা শাসকদের কেন্দ্র হলো এবং সেখানে গড়ে উঠলো শিল্পকারখানা। প্রত্যক্ষভাবে গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় নি।[১৪৩]

তখন থেকে পূর্ববঙ্গকে ব্যবহার করা হয় কাঁচামাল সরবরাহের উৎস হিসেবে। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে কৃষিভিত্তিক সমাজই রয়ে গেল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কৃষির পাশাপাশি শিল্পে সমৃদ্ধি অর্জন করে। ফলে দুই বাংলার উৎপাদন ব্যবস্থায় দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে। কৃষি ও শিল্পনির্ভর অঞ্চলের যাপিত জীবনে সংস্কার ও সংস্কৃতি এক হয় না। ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিকভাবে একটি সীমারেখা পরিলক্ষিত হয়।

ভাষা

ভাষা এবং জাতি হিসেবে বাঙালির 'একত্বতা' গড়ে উঠলেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা দুই অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। বাংলার বৌদ্ধবিপ্লব যে শুধু ধর্মবিপ্লব ছিল না, আর্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল, এবং তার ফলে তা শুধু সমাজ ও রাজনীতিকেই স্পর্শ করেনি, ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের পরাজয় ঘটিয়ে দেশজ ভাষার জাগরণ ঘটিয়েছিল। দেশজ ভাষায়ও যে কাব্যসৃষ্টি হতে পারে, এই বিস্ময়কর আবিষ্কার বৌদ্ধ দোঁহার শুষ্ক নীতিভাষণকে কাব্যের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্য যদি হয় অভিজাতের সাহিত্য, তাহলে এসব দোঁহার কারবার 'ধনিক বণিক শ্রমণ ভিক্ষু এমনকি সাধারণ মানুষকে নিয়েও'।[১৪৪]

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর শহরের নানাস্থানে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। ফলে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয়। এই সমাজের ছেলেরা নানারকম পেশা গ্রহণ করে। কেউ হন ডাক্তার, কেউ আইনবিদ, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বিজ্ঞানী ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ পত্তন করলো এক নতুন সাহিত্যের। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন–বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও আরও অনেকে। তাঁদের লেখা ভাষাই কলকাতার ভাষা তথা বাংলার মানরূপে গৃহীত হয়।[১৪৫]

প্রাচীনকাল থেকেই অভিজাত এবং শাসকরা এ অঞ্চলে নিজেদের ভাষা চালু করেছিলেন। এভাবে সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে শাসক শ্রেণির ভাষা আলাদা হয়ে গিয়েছিল যেমন : সংস্কৃতি, ফারসি, ইংরেজি এবং উর্দু। সাধারণ মানুষ, শাসক শ্রেণির ভাষার বিপরীতে, নিজেদের ভাষার মাধ্যমে সমাজের ঐক্য তৈরি করেছেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়েছেন, অর্থনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছেন এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে মতাদর্শ সৃষ্টি করেছেন। এসব বিভিন্ন উপাদান আবার শক্তি জুগিয়েছে এই অঞ্চলের রাজনৈতিতে, সে জন্যে ভাষা রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মতাদর্শ তৈরির পটভূমি হিসেবে।[১৪৬]

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃত রীতির পর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সাধুভাষা। আবার এরই পাশে বর্তমানে গড়ে উঠেছে একটি ভাষা যা কলকাতার 'শিষ্ট জনের মৌখিক ভাষা'।[১৪৭] এর বিপরীতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষার একক যা পূর্ববঙ্গের সকল সম্প্রদায়ের জীবনচর্যায় সক্রিয় ছিল।

অঞ্চলভেদে বাংলায় মৌখিক ভাষার নানারূপ আছে। এবং এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উপভাষা। উপভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট থাকে আঞ্চলিক জীবনধারা। তবে ভাষার ক্ষেত্রে পরিশীলনের জন্য নষ্ট হয় আঞ্চলিকতা। ভাষা গড়ে ওঠে একটি কৃত্রিম একক হিসেবে যেখানে ক্রমাগত তৈরি হতে থাকে শাসকশ্রেণির আধিপত্যবাদ। উপভাষায় ঐ আধিপত্যবাদের প্রভাব সামান্য এবং তাই এ ক্ষেত্রে টিকে থাকে আঞ্চলিকতা। পূর্ববঙ্গের উপভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।[১৪৮]

ঐ একই কারণে পূর্ববঙ্গের লোক কলকাতার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও উপভাষা ঐ এককের সদস্য জীবনযাপন করেন ঘরের মধ্যে যা পূর্ববঙ্গবাসীয়দের মধ্যে, যদিও বাইরের পোশাকি জীবনে তিনি ব্যবহার করেন পরিশীলিত ভাষা।

এ প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গে যারা সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁদের দু'একজনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে উদাহরণ হিসেবে। পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষার আদলে তৈরি হয়েছিল বটতলার পুথি সাহিত্য যা এখানে গণমানসে আদৃত।

উনিশ শতকেও দেখি পূর্ববঙ্গের যেসব সাহিত্যিক সাহিত্যচর্চা করেছেন, তাঁরা পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করেছিলেন মৌখিক ভাষার একক। গোবিন্দ দাস যখন কোনো কিছুর প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলেন বা সরাসরি পাঠকদের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন তখন আবার ব্যবহার করেছেন তাদের মুখের ভাষা। যেমন–

> ওই ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
> তোমার আমার চিতায় দিবে মঠ্?
> আজ যে আমি উপোষ করি, না খেয়ে শুকায়ে মরি...[১৪৯]

১৯৪৭-এর পর ভাষা পূর্ববঙ্গে শুধু সাংস্কৃতিক একক হিসেবেই থাকে না, কাজ করেছিল রাজনৈতিক একক হিসেবে। বাঙালিদের ভাষাগত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও আকার ও আচারে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের হিন্দুস্তানি প্রভাব রয়েগেছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষার ওপর সর্বাধিক। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি ভাষার প্রভাব মুখ্য এবং বাংলা ভাষার প্রভাব গৌণ।

পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে, যখন থেকে পূর্ববাংলা ঐতিহাসিক পর্যায়ে রাজনৈতিক একটি একক হিসেবে উৎপত্তি লাভ করেছে তখন থেকেই ভাষার মধ্যে দিয়ে, ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয়েছে সংস্কৃতিতে, সমাজের মতাদর্শে।[১৫০] পূর্ববাংলার বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম, জনগোষ্ঠীর মৌখিক ব্যবহার, জীবনধারণ, মতাদর্শ, প্রবাদ, ছড়ায় এই নির্দিষ্টতা সোচ্চার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই নির্দিষ্টতার অন্যতম উপাদান ভাষার রাজনৈতিক একক হিসেবে ব্যবহার।[১৫১] অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে তা সাংস্কৃতিক একক হিসেবে রয়ে যায়।

পোশাক

বাঙালিদের পোশাক সাধারণ। উনিশ শতকের প্রায় শেষার্ধে পর্যন্ত সবাই ধুতি বা কাছা দিয়েই কাপড় পরতেন। মেয়েরা একপেঁচে শাড়ি। ফরাজিরাই প্রথম পূর্ববাংলায় সাদা লুঙ্গি বা তহবন্দের প্রচলন করেছিলেন। রঙিন লুঙ্গির আমদানি হয়েছিল বার্মা থেকে। প্রথমদিকে মুসলমানরাই লুঙ্গি পরা শুরু করেছিলেন। কিন্তু অন্তিমে তা হিন্দু-মুসলিমের, এক-কথায় পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের সর্বজনীন পোশাকে পরিণত হয়।[১৫২]

শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা এনে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার দিকে যখন অগ্রসর হচ্ছেন, তখন কিন্তু তিনি বাঙালি বলতে পূর্ববঙ্গে অধিবাসীদের বুঝাচ্ছেন। এদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রভৃতি নিয়েই নতুন চিন্তা ও চেতনায় তিনি অগ্রসর হতে চাচ্ছেন।

৫০-এর দশকে বাঙালত্বের একটি স্ফুরন দেখা যায়–সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকলা ও ভাষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেটাই ৬০-এর দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক চিন্তাধারা রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে যে ভাবে একদিকে প্রভাবিত করছে বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যকে। বুদ্ধিবৃত্তিক যে চিন্তাধারা সেগুলো আবার একইসঙ্গে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়াকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা আবার আলাদা রাষ্ট্রের কথা বলছে, যে রাষ্ট্র বাঙালিদের রাষ্ট্র কিন্তু সে বাঙালি ঐ বাঙালি নয়। আমরা বলতে পারি, বাঙালদের রাষ্ট্র। যে তফাত আমরা দেখি ইংল্যান্ডে ইংলিশদের মধ্যে–স্কটিশ, আইরিশ ও ইংলিশ উপাদান আছে। মুনতাসীর মামুন বলেছেন,

> ভাষা কাজ করে দু'ভাবে–সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক একক হিসেবে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা একটিই–বাংলা ভাষা। এই ভাষা সাংস্কৃতিক একক হিসেবে কাজ করেছে উভয় বঙ্গেই, কিন্তু রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করেছে পূর্ববঙ্গেই। ...পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে, যখন থেকে পূর্ববাংলা ঐতিহাসিক পর্যায়ে রাজনৈতিক একটি একক হিসেবে উদ্ভব লাভ করেছে তখন

থেকেই ভাষার মধ্যে দিয়ে, ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার নির্দিষ্ট প্রকাশ হয়েছে সংস্কৃতিতে, সমাজে, মতাদর্শে, প্রবাদে, ছড়ায় এই নির্দিষ্টতা সোচ্চার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই নির্দিষ্টতার অন্যতম উপাদান ভাষার রাজনৈতিক একক হিসেবে ব্যবহার।[১৫৩]

১৯৪৭-এর পর থেকে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার বাঙালির পরিচয় নিয়ে একটি বির্তকের শুরু হয়। যদি পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রকৃতিগত পার্থক্য, শাসন, উৎপাদন, ভাষা, সংস্কৃতি ও পোশাকে সূক্ষ্ণ পার্থক্য সবসময়ই ছিল। কিন্তু একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ঐ বিতর্কের সম্পূর্ণ সমাপ্তি হয়। যদিও পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ আবার এ বির্তকের সূচনা করেন। এর মধ্যে অন্যতম শ্রী সন্তোস কুমার ঘোষ[১৫৪] বলেন,

> এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশের লোকেরা নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু তারাইতো কেবল বাঙালী নয়। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাও বাঙালী। তারা পূর্ববঙ্গের লোকদেরই কেবল বাঙালী পরিচয়ের একচ্ছত্র অধিকার ছেড়ে দিতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশের লোকদের উচিৎ একটা স্বতন্ত্র পরিচয় খুঁজে নেওয়া।[১৫৫]

এ প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুনের মত প্রণিধানযোগ্য, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্র হবে ঢাকা, কলকাতা নয়। কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন'।[১৫৬] অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন একটি ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যে রাজনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন তা একটি স্বাধীন দেশে হিসেবে বাংলাদেশেই দেওয়া সম্ভব।

১৫ খণ্ডে প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্রের* সূচনায় লেখা হয়েছিল :

> আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিল পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নেই যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত।[১৫৭]

বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনে সপ্তম শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন *চর্যাপদ* থেকে আলোচনার অবতারণা করলেও উপর্যুক্ত বিষয়টিকে মূল বিবেচনায় রেখে অগ্রসর হয়েছি।

নীহাররঞ্জন রায় অবিভক্ত বাংলার সীমারেখা নির্দেশ করেছেন এভাবে,

> উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয়কৃত নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রক্ষ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বহে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল সাওতাঁল পরগণা ছোটনাগপুর-মালভূমি-ধলভূত-কেওঞ্ঝর-ময়ূরভাঞ্জুর শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমা বিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্র-রাঢ়-সূক্ষ্ম, তাম্রলিপ্ত-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রক্ষ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরো অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত বাঙলার গ্রাম, নগর, পান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য–এটাই বাঙালি ভৌগোলিক ভাগ্য।[১৫৮]

যে ছোটো ছোটো জনপদের কথা বলা হলো, তাদের সমন্বয়েই বৃহত্তর বঙ্গের ভাবমূর্তি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। এ সকল জনপদের অধিবাসীদের পারস্পরিক সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বাঙালি জাতির সৃষ্টি হয়।[১৫৯] সৈয়দ আকরম হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> প্রাগৈতিহাসিক কালের বহুপ্রাচীন কোমবিভক্ত জন ও জনপথ স্বজাতি ও বিজাতির দ্বন্দ্ব-মিলনে, সংঘর্ষে সমন্বয়ে ইতিহাসের স্রোতে রূপান্তরিত হয়ে গড়ে উঠেছে বাঙলাদেশ আর বাঙালী।[১৬০]

বর্তমান বাংলাদেশের যে ভূ-খণ্ড তাই বিবেচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর (আদি-অস্ট্রেলীয়, মঙ্গোলীয়) 'পাঁচ মিশালি জাত' বাঙালি। প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতের যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এদের বসবাস, আজকের বাংলাদেশ তার একটি অংশ মাত্র। নানা কৌম সমাজ বা স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত ছিল সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও এর মানুষ। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সেখানে কালক্রমে বঙ্গ থেকে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা বা বাংলা, সুবে বাংলা, নিজামত, বেঙ্গল, পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান, পরিশেষে, স্বাধীন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অভ্যুদয়।[১৬১]

পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড় ও বঙ্গ ইত্যাদি এইসব প্রতিবেশী জনপদের অধিবাসীরা স্বাভাবিক বিরোধ-সংঘাত ও মিলন-বিরোধের মাধ্যমে পরস্পরের কাছাকাছি আসেন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় প্রক্রিয়ার দ্বারা বাঙালি বলে একটি বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন শশাঙ্ক এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ, মুর্শিদাবাদ থেকে আরম্ভ করে একেবারে উৎকল পর্যন্ত সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে। ক্রমশ রাঢ়ের মতো প্রাচীন জনপদও গৌড় নামের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। পাল (৭৫০-১১৬২) ও সেন (১০৯৫-১২৬০) রাজাদের আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হওয়া। অবশ্য তখনও বঙ্গ জনপদটি স্বতন্ত্র নাম ও সত্তা নিয়ে বিরাজিত। তারপর ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী আক্রমণ এবং পাঠান আমলে প্রথম 'সুবা বঙ্গাল' নামে বৃহত্তর বঙ্গের ভাবমূর্তির প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক স্বীকৃতি লাভ।[১৬২]

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, সুরমা-ধলেশ্বরী-কর্ণফুলী, আরও অসংখ্য নদ-নদীবাহিত, পলিগঠিত এই বঙ্গীয় অববাহিকা। শুরু থেকে এই ব-দ্বীপ ভূমিতে বিবর্তমান মানবগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যসূচক অভিধার নাম বাঙালি। আর তার বসতভূমির নাম বাংলা নামের দেশ। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম-জাতিরাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ হলো তার চূড়ান্তরূপ। জন্মমুহূর্ত থেকে দেশটির সাংবিধানিক নাম দেওয়া হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। এ কারণে এই রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কাছে 'নদী বা বদ্বীপ বা পলির মতো অনিবার্য ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের মতোই 'বং, বাংলা বা বাঙালী' শীর্ষক শব্দত্রয়ীও তার সত্তার পরিচয় নির্ণয় করে। হাজার বছরের বিবর্তনের ধারায় বাঙালি এই অভিধা স্বতঃপ্রাকৃতিকভাবেই অর্জন করেছে। এই অভিধা যেমন তার আপন অর্জন, তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক বিবর্তনের পথও প্রায় স্বতঃসিদ্ধজাত। তাই এই জাতিরাষ্ট্র ও তার নাগরিকের সার্বিক বিজয় মানে বাংলা ও বাঙালির বিজয়। ইতিহাসপূর্ব কাল থেকে এই সত্যটি স্বতঃপ্রাণোদিতভাবে অনুধাবন করেছেন বাংলার লোককবি, লোকদার্শনিক ও ভাবুক সম্প্রদায়। তার প্রকাশ দেখা যায় ইতিহাসস্বীকৃত যুগে বাঙালি কবির মৌখিক ও লিখিত অভিব্যক্তিতে। বাংলা ভাষার প্রথম লিখিত দলিল 'চর্যাপদে'র কবি ভুসুকুর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো 'বাঙালী' অভিধাটি। তিনি ৪৯নং চর্যায় বলেন, 'আজি ভুসুকু বঙালী ভইলি'।[১৬৩] শুধু তাই নয়, চর্যাপদের অনেক কবি বাঙালি ছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'চৌরাশী সিদ্ধা বা চুরাশি জন সহজিয়া বৌদ্ধাচার্যের মধ্যে মীননাথ, কাহ্নপা, লুইপা, বিরুপা, ধামপা প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী'।[১৬৪]

মধ্যযুগের কবি শ্রীধর দাসের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, তার মাতৃভাষার নাম বাংলা। যদিও তার সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। কেননা সমাজ তখন তাঁকে অন্য ভাষায় সাহিত্যচর্চার অধিকার দেয়নি। অথচ তিনিও তাঁর মাতৃভাষা বাংলাকে গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র মনে করেছেন। শ্রীধরের *সদুক্তিকর্ণামৃ*-তে এঁর দুটি সংস্কৃত শ্লোক সংকলিত হয়। তার একটিতে বাংলা ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন, 'গঙ্গা ও বঙ্গাল-বাণী, (দুটিই) প্রগাঢ় রসময়, গভীর, সুন্দর গতিভঙ্গময় এবং কবিদের উপজীব্য। (দুটিতেই) অবগাহন করলে পুণ্য হয়।'[১৬৫] পাশাপাশি স্মরণযোগ্য মধ্যযুগের মুসলমান কবি আবদুল হাকিমের কণ্ঠে উচ্চারিত মাতৃভাষার সপক্ষে তীব্র শ্লেষাত্মক উক্তি,

> যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
> সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।[১৬৬]

এই বিপ্লবাত্মক উক্তি বাংলার মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের চরম কথা। জাতির মর্মলোক থেকে এই কথা বেরিয়ে এসেছে। কবি কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এরূপ উক্তি করেন নি। কবি সমাজের বিবেক-সেই বিবেকের প্রতিধ্বনি আছে এই উক্তিতে। মাতৃভাষা-প্রীতির মধ্যেই বাংলার মুসলমানের জাতিসত্তার মর্মস্পন্দনটি নিহিত রয়েছে। ভাষানুরাগ থেকে দেশানুরাগ, দেশানুরাগ থেকে জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবোধ থেকে স্বাধীনতাপ্রীতি–এই ধারাতেই বাংলার মানুষ অগ্রসর হয়ে এসেছে।[১৬৭] উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে মাতৃভাষা প্রীতি এবং যারা মাতৃভাষা অবজ্ঞা করে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ, প্রতিবাদ।[১৬৮] তার পর থেকে বাংলা ও বাঙালিত্বে এই ধারণা, প্রেরণা, শক্তিমত্তা ও বহুমাত্রিকতা বাঙালি কবির চিত্তে কত বিচিত্র পথে সংজ্ঞায়িত হয়েছে, তার হিসাব নেই। চর্যা-কবি, মঙ্গল-কবি, পুথি-কবি, বৈষ্ণব-কবি বা বাউল-

কবির পরম্পরা পেরিয়ে পাশ্চাত্য মনন-দর্শনে সমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক বাঙালি কবিরা অভ্রান্তভাবে বাংলা নামক দেশ ও বাংলা নামক ভাষার জয়গান করেছেন।

শুধু কবি সাহিত্যিক নয় শাসকরাও বাঙালি হিসেবে গর্ব করে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নিজেকে 'বাঙালির সুলতান' (Sultan of the Bengalis) বা 'শাহে-বাঙালিয়ান' বলে ঘোষণা করেন।[১৬৯] স্বাধীন সুলতানি আমলের দুইশ বছরে দেশটির নাম 'বাঙ্গালা' ও ভারতের থেকে পৃথক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং হিন্দু-মুসলমান বাঙালির সমন্বিত জাতিসত্তা গঠনের সূচনা হয়।[১৭০]

এই সময় মঙ্গলকাব্য এবং ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-পুরাণের বাংলায় অনুবাদ, চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণবসাহিত্য ও গণজাগরণের সংগীতের ধারা এবং বিপুলসংখ্যক মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের বিশাল অবদানে শুধু বাঙালিত্বই পরিপুষ্টতা লাভ করে নি, সমন্বিত বাঙালি জাতিসত্তারও একধরনের শক্তিশালী মৌলিক ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল। এই সময়কে বাঙালির জাতিসত্তার উদ্ভব ও বিকাশের প্রাথমিক যুগ বলেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[১৭১] তবে ষোড়শ শতকে দেশজ বাঙালি অভিজাত মুসলমান সমাজের ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। তারা মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকেই দৈনন্দিন কাজকর্মের ভাষা বলে পরিচয় দিতে থাকেন। কবি সৈয়দ সুলতান যখন বাংলায় *শব-ই-মেরাজ* শীর্ষক কবিতা রচনা করেন, আশরাফ সম্প্রদায়ের লোকেরা সে-জন্য তাঁকে 'মুনাফেক' হিসেবে ঘোষণা করেন।[১৭২] সৈয়দ সুলতানকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবেলা করতে হয়। 'নবীবংশ' অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> কর্মদোষে বঙ্গে বাঙালি উৎপন
> না বুঝে বাঙালি সবে আরবি বচন ॥...
> মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি।
> কিতাবের কথা দিলু হিন্দুয়ানী করি॥[১৭৩]

বাঙালি হওয়ার জন্য কবির বেদনা আছে, আবার বাঙালির জন্য তাঁর কর্তব্যবুদ্ধিরও অভাব নেই। গোঁড়া আলেমশ্রেণির আরোপিত 'মুনাফিক' অপবাদ নিয়েও তিনি আরবি-ফারসির অনুবাদ করতে পশ্চাৎপদ হননি। সমাজের স্বার্থের কথা ভেবেই তিনি এরূপ কাজে প্রয়াসী হন।[১৭৪] বাঙালি কবি নিজের মাতৃভাষায় ইসলামি বিষয়ে কবিতা লেখাকে নিজের অধিকার বলে মনে করে লেখেন :

> যারে যেই ভাষে প্রভু করিলেন সৃজন
> সেই ভাষ হয় তার অমূল্য রতন।[১৭৫]

সৈয়দ সুলতানের সামনে যে মুসলিম সমাজ তার একটিই পরিচয়–বাঙালি; বাংলা ভাষা দিয়েই সে-সমাজের চাহিদা পূরণ করতে হবে।[১৭৬] যেখানে মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবি বাংলা ভাষাকে নিজের ভাষা জ্ঞান করে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করলেন, কাহিনির পাত্রপাত্রী হিন্দু কিংবা মুসলমান তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না, নিঃসংকোচে লোকাচারকে তাদের রচনায় স্থান দিলেন, সেখানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কতিপয় শিক্ষিত বিত্তশালী অভিজাত বংশীয় বাঙালি মুসলমান তাদের মাতৃভাষা নিয়ে অহেতুক বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জন্ম দিলেন। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কী? সে কোনো ভাষাকে আঁকড়ে ধরবে? তা কি বাংলা না আরবি, না ফারসি, না উর্দু? ইসলামি সংস্কৃতির একটা অস্পষ্ট কৃত্রিম আদর্শের ছবি এঁকে তারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতার নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। মিলন ও সমন্বয়ের স্থানে দানা বাঁধতে শুরু করলো বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা।[১৭৭] এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে লিখছেন, 'বাঙালী এবং মুসলমানদের মধ্যে ফুটবল খেলা হচ্ছে।'[১৭৮] অর্থাৎ মুসলমানরা বাঙালি নয়। এরপর ঐ প্রশ্ন আরও জোরদার হয়ে উঠলো আমরা কি বাঙালি, নাকি বাঙালি মুসলমান এবং যদি বাঙালি মুসলমানই আমাদের যথার্থ পরিচয় হয় তাহলে আমরা কি আগে বাঙালি ও পরে মুসলমান, নাকি আগে মুসলমান পরে বাঙালি।[১৭৯] এ রকম কৃত্রিম বিতর্কের অবতারণা করে, অযৌক্তিক অগ্রাধিকারের প্রশ্ন তুলে প্রতিক্রিয়াশীল ও অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ বাঙালি সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন স্রোতোধারাকে কলুষিত করে তুললো। এ যাবৎ নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও যার একটা অখণ্ড রূপ ছিল তা খণ্ডিত

হলো। অনিবার্যভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশেও বাধা পড়লো। অবশ্য বাংলার গ্রামজীবনের গভীরে, যা যাবতীয় বিচ্ছিন্নতামুখী নাগরিক তৎপরতা উপেক্ষা করে, এক ধরনের ঐক্যস্রোত তখনো প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। সমন্বিত বাঙালি সংস্কৃতির সেই রূপ ঘুরেফিরে আমরা প্রত্যক্ষ করি লালনসহ বহু বাউল সাধক ও লোককবিদের রচনায়। তাছাড়া নাগরিক সমাজের নেতৃত্ব স্থানীয়রা অনেকেই এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর অজস্র কবিতা ও গানে বিভেদ সৃষ্টিকারী আচারসর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ ধর্মের প্রসঙ্গ তীব্র ব্যঙ্গ ও আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। তার জায়গায় হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পুরাণ, ইতিকথা, ধর্ম ও ইতিহাস থেকে আহরিত অনবদ্য উপমা রূপক প্রতীক চিত্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশিত হলো সুস্থ সমন্বিত বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জ্বল এক ছবি।[১৮০]

শুধু যে হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ এই বিভেদ করেছিল তা নয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতাকেন্দ্রিক অনেক শিক্ষিত মুসলমান নিজেদেরকে 'বাঙালি' হিসেবে পরিচয় দিতে অপ্রস্তুত হতেন। ব্যতিক্রমধর্মী একজন শিক্ষিত মুসলিম মৌলভী ইয়াকুবুদ্দীন আহমদ ১৮৯৬ সালে দুঃখের সাথে লিখেছেন,

> কলকাতায় হিন্দুদেরকে বাঙালী হিসেবে ডাকে মুসলমানেরা যারা হয়ত মারাঠা পরিখার বাহিরে কোন দিন যায়নি, ব্যাপারটা যেন এমন এসব মুসলমান আরবের মহানবীর ধর্ম বিশ্বাস মেনে নেয়ার কারণে অ-বাঙালী হবার অধিকার পেয়েছে।[১৮১]

চিন্তাশীল বাঙালি মুসলমান গদ্যলেখকদের মধ্যে প্রথম দিকে কেউ কেউ যে প্রকৃতপক্ষেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী খাঁটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর প্রমাণ ১৯০০ সালে পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দিন আহমদ মাশহাদী তাঁর 'বিবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন,

> জাতি, জাতীয় ভাব, জাতীয় স্বার্থ প্রভৃতির স্মরণে-মননে ভারতবর্ষ বলিয়া একটা বিষয় স্থূলরূপে প্রতিভাত হইলেও আমরা বাঙ্গলাদেশের কথা বিশদভাবে বুঝি। বাঙ্গালি বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়ে সন্তুষ্ট হই। সহস্র বৎসর যে দেশে বাস করিয়া আসিতেছি, যাহার শীত-গ্রীষ্ম, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, প্রাচুর্য-দুর্ভিক্ষ, সুখ-সম্পদ, হর্ষ-বিষাদ সমভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছি, সে আমার স্বদেশ নহে, তাহার বাহিরে আবার আমার এক নিজের দেশ আছে, এ-কথা কখনো কেহ মনে করিতে পারে না। এইজন্য আমি মোসলমান হইলেও বাঙ্গলাদেশ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালি জাতি সম্বন্ধে কোনো কথা উপস্থিত হইলে তাহাতে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার সম্পূর্ণ ষোল আনা অধিকার আছে।[১৮২]

ভাষাতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তি। উনিশ শতাব্দীর যে রেনেসাঁসের কথা আমরা জানি তা ঠিক রেনেসাঁস ছিল না, কিন্তু তখন সৃষ্টিশীলতার একটি জোয়ার এসেছিল। সেই জোয়ারের মূল অবলম্বন ছিল বাংলা ভাষা। সময়টা ছিল পরাধীনতার, কবে ইংরেজ রাজত্বের শেষ হবে কেউ বলতে পারে নি, কিন্তু অধীনতার ভিতরেও বাংলা ভাষার যে চর্চা হয়েছিল সেটি ছিল স্বাধীনতার জন্য সাধনা। অনেকে তখন পুরোদস্তুর ইংরেজ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই যাওয়াটা জয়ের চিহ্ন নয়, পরাজয়ের গ্লানি। জয় ছিল বাংলা ভাষার চর্চায়, ইংরেজিকে বাদ দিয়ে নয়, তাকে ব্যবহার করে। ভিক্ষুকের মতো নয়, প্রভুর মতো। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র–এঁরা কেউ ইংরেজি কম জানতেন না, ইংরেজিতে এঁরা লিখেছেনও, পরে রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পুরস্কার পেলেন সেও তো তাঁর নিজের করা বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদের জন্যই, কিন্তু এঁরা যদি ইংরেজি ভাষাতেই শুধু লিখতেন তাহলে তেমন হতেন না যেমনটি তাঁরা হয়েছেন। বাংলার পথে এসেছেন তাঁরা কারণ জানতেন সেইখানেই আছে মুক্তি, যেমন তাঁদের সৃষ্টিশীলতার তেমনি তাঁদের দেশবাসীর। মাইকেল মিথ্যে নন, কিন্তু মাইকেলের চেয়ে অনেক বড়ো হচ্ছেন মধুসূদন।[১৮৩]

মাইকেলের মাতৃভাষা বন্দনা বাঙালির বোধ ও বিবর্তনের ইতিহাসে একটি নির্ণায়ক কেন্দ্রিক। এই হলো ইতিহাসের সেই কাব্যসম্মত রায়, যা অদ্যাবধি বাঙালি কবি, সারস্বত সমাজ ও বাংলার সর্বশ্রেণির লোক-মানুষকে সর্বাংশে মাতৃভাষী তথা বাংলাভাষী করে রেখেছে। তা না হলে বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি ও বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্নতর মানসিকতার দাসত্ব বাঙালিকে স্ব-সত্তা থেকে বিযুক্ত করে ঔপনিবেশিতার স্বর্ণশিকলে চিরপরাধীন করে রাখতো। সা'দত আলী আখন্দ 'বাঙালী' শিরোনামে প্রবন্ধে বলেন,

বাংলাদেশে যুগ যুগান্তর বাস করেও মুসলিম সমাজের লোকেরা 'বাঙালী' হয়ে যান নি। এখানো বাঙালী বলে ভাবলে তাঁরা অপমান বোধ করেন। তাই বাঙালী বললে ওঁদের ছাড়া বাংলাদেশে আর সকল লোককে বোঝায়, অথচ বাংলাদেশে জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী লোকই মুসলিম।[১৮৪]

একই কথার প্রতিধ্বনি পাই ১৯০৯ সালে হামেদ আলী উত্তর বঙ্গের *মুসলমান সাহিত্য* পত্রিকায় 'বাসনা' শিরোনামের প্রবন্ধে। তিনি বলেন,

আমাদের পূর্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসী হউন, আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙালী, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। যাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল দেশ হইতে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারও এক্ষণে আরব, পারসী অথবা আফগান জাতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারেন না। যে দেশে আমরা সাত শত বৎসর কাল বাস করিতেছি, সে দেশকে যদি আমরা এখনও স্বদেশ জ্ঞান না করি,–তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য এবং পরিতাপের বিষয় আর কি আছে। মাতৃগর্ভে হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম যে ভাষা আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে ভাষা আমরা আজীবন ব্যবহার করি, যে ভাষা আমরা সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ প্রকাশ করি, যে ভাষায় হাটে বাজারে, ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং বৈষয়িক কার্যে কথোপকথন করি,–যে ভাষায় নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখি,–সেই ভাষা বাংলা। সুতরাং বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা,...

...আমাদের অনেকের মোহ ছুটে নাই। তাঁহারা বাংলার বাঁশবন ও আম্রকাননের মধ্যস্থিত পর্ণকুটিরে নিদ্রা যাইয়া এখনও বোগ্‌দাদ, বোখারা, কাবুল, কান্দারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহে বিভোর! দুর্বল ব্যক্তিরা যেমন অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করে, অধঃপতিত জাতিও তেমনি অস্বাভাবিক খেয়াল আঁটিয়া থাকে।[১৮৫]

বাঙালি পণ্ডিতগণ তাদের লেখার মাধ্যমে জাতিকে সচেতন করেছে। একইসাথে তারা ভর্ৎসনা করে জাতিকে জাগাতে চেষ্টা করেছে। আসলে বাঙালি কবির কাছে বাঙালি ও বাংলা জয়গান মানে তার শনাক্তরত স্ব-সত্তার স্বাধীনতার গান। এই পথেই বাঙালি এগিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার গন্তব্যে। বঙ্গভঙ্গের আশংকায় ব্যথিত কবিচিত্ত তাই বাউল বাঙালির সুর ও কথায় বিশ শতকের শুরুতেই জয়গান করলেন অখণ্ড বাংলার রূপৈশ্বর্যের : 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। এরপর ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, মত-পথ নির্বিশেষে বাঙালির জাতীয় উচ্চারণ হলো স্বাধীনতা। যার সর্বজনীন স্বীকৃতি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে বলেন,

তোমরা কেবল ছাত্র নও, তোমরা বাঙালী। তোমরা বাঙালী মুসলমান। বাংলার আবহাওয়ায়, বাংলার মাটিতে বাংলার শস্যে, বাংলায় ফলে তোমাদের দেহ গঠিত পুষ্ট, বর্দ্ধিত। খুব সম্ভবতঃ এই বাংলার ক্রোড়ে তোমাদের শরীর চিরনিদ্রায় শায়িত হইবে।[১৮৬]

উনিশ শতকের বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ে সারা দেশ জেগে উঠেছিল। কবিয়াল রমেশ শীল সক্রিয় অংশ নেন সেই আন্দোলনে। তাঁর রচিত একটি গান হলো–

... জেগে উঠ বাঙালী ভাই কেন অচেতন,
দুরন্ত শ্বেতাঙ্গের হাত হতে বাঁচাতে জীবন... ॥[১৮৭]

তিনি বাঙালিকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছে নিজের মাতৃভূমিকে শেতাঙ্গদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। বাঙালির বোধ-বিবর্তনের পথে বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে বিজয়সূচক ধ্বনি : 'জয় বাংলা'। এটি উচ্চারিত হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে, বিদ্রোহী কবি 'পূর্ণ-অভিনন্দন' কবিতায়। কবিতাটি ১৯২৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ভাঙার গান' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এটি গ্রন্থের চতুর্থ কবিতা। শ্রাবণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (১৯২৪ সালের আগস্ট) প্রকাশিত হওয়ার মাস তিনেকের মধ্যে অর্থাৎ ১১ নভেম্বর তারিখে বইটি ব্রিটিশ সরকারকর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তারপর থেকে এই বইয়ের ওপর এই নিষেধাজ্ঞাটি আর প্রত্যাহার করা হয়নি। মাদারীপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস-এর কারামুক্তি উপলক্ষ্যে

নজরুল এই কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটিতে বাংলা ইতিহাস, পুরাণ, কিংবদন্তির পাশাপশি বাঙালির ভবিষ্যৎ মুক্তিযুদ্ধ ও অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের বার্তা আভাসিত হয়ে আছে। এই কবিতার ৫১ ও ৫২ পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ :

জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দেবে হুকুম
শত্রু-খড়্‌গছিন্ন-মুন্ড-দানিবে ও-পায়ে প্রণাম-চুম।

তারপরেই এক অবিসংবাদিত নেতার প্রতি কবির স্বাগতিক উচ্চারণ :

স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর![১৮৮]

জননীর আদেশ পেলেই মুক্ত সেননি হুকুম দেবেন যুদ্ধের এবং সেই ঘোষিত মুক্তিযুদ্ধের শত্রুর ছিন্ন মস্তক লুটাবে জননীর পায়ের তলায়। এ কবিতা লেখার ৪৭ বছর পর বাঙালির মুক্তিকান্ডারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'জননীর আদেশ পেয়ে' অর্থাৎ 'নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে' ঘোষণা করছেন বাংলা পূর্ণাঙ্গ 'স্বাধীনতা' আর হুকুম দিচ্ছেন সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'স্বাধীনতা', 'হুকুম', ও 'জয় বাংলা'।[১৮৯] নজরুলের 'জয় বাংলা'–কাব্যে 'পূর্ণ-অভিনন্দন' কবিতার ২৭ ও ২৮নং পঙ্‌ক্তিতে 'জয় বাঙলা' ধ্বনি বাংলা ভাষায় প্রথম উচ্চারিত :

জয় বাঙলা-র পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন

'জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি' বলার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের পর ভবিষ্যৎ নেতা-সেনানিদের প্রতিও সম্প্রসারিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেই ঐতিহ্যিক ধারারই শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত নেতা-সেনানি; আর তাঁর কণ্ঠেই পুনরুচ্চারিত সেই বিজয়-ধ্বনি : 'জয় বাংলা'।[১৯০]

কাজী নজরুলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে–'বাঙালির বাঙলা'য় একই আবহে বার বার প্রযুক্ত হয়েছে। ১৯৪২ সালে রচিত 'বাঙালির বাঙলা' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন, 'বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও:

এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালীর-আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।
বাঙলা বাঙালীর হোক! বাঙলার জয় হোক!
বাঙালীর জয় হোক।[১৯১]

কাজেই 'জয় বাংলা' শীর্ষক বাঙালির চিরকালীন জয়ধ্বনির উৎস নজরুলের চিরদ্রোহী কবিচিত্তে। ১৯৪০-এর দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাবে বাঙালি জাতিসত্তা পূর্ব বাংলায় বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়েছিল। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে তার পুনর্জাগরণ ঘটে।[১৯২]

নজরুলের 'বিদ্রোহী আত্মা ও স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার' সুস্পষ্ট শনাক্তকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সচেতনভাবেই নজরুলের কাছ থেকে এই অস্ত্র গ্রহণ করে সকল কালের সকল বাঙালির জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করেছেন। নজরুল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধু নজরুল সম্পর্কে বলেছেন, 'নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালীর স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার রূপকার। ...পরাধীন জাতির তিমিরঘন অন্ধকারে বিশ্ববিধাতা নজরুলকে এক স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়ে পাঠিয়েছিলেন এই ধরার ধুলায়।'

কাজী নজরুল ও বঙ্গবন্ধু উভয়ই উক্তি ও উপলব্ধিতে অভিন্ন। একজন বিদ্রোহের উচ্চারক ও পরিকল্পক, অন্যজন তার ধারক ও বাস্তবায়ক।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পূর্ববাংলা সফরে এসে ভাষার প্রশ্নে স্বৈরাচারী মনোভাব দেখান। ২১ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু–অন্য কোনো ভাষা নয়। জিন্নাহর এই ঘোষণায় সভার কোনো-কোনো অংশ থেকে মৃদু 'নো, নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উক্ত সভার তিনদিন পর (২৪ মার্চ, ১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেন। জিন্নাহর এ উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ 'না না' ধ্বনি উচ্চারণ করে।[১৯৩] মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকে পূর্ববাংলার ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। অর্থাৎ সূচনালগ্ন থেকেই সেখানে বাঙালিরা ভাষা, হরফ ও সংস্কৃতি নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এর কারণ বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হয়ে যে, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে মুসলমান পরিচয় ও বাঙালি পরিচয় বঙ্গদেশে হাত ধরাধরি করে চলেছে। তথাকথিত আশরাফেরা যখন তাঁদের শিকড় খুঁজেছেন আরবে, পারস্যে, তুরস্কে, মধ্য এশিয়ায় কিংবা, অন্তত, উত্তর ভারতে, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানেরা গ্রামবাংলাকেই নিজের পূর্বপুরুষের বাসভূমি বলে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে। পূর্বপক্ষ যদি নিজেদের সাংস্কৃতিক উৎস ও প্রকাশভঙ্গির জন্যে আরবি, ফারসি ও উর্দুর শরণাপন্ন হয়ে থাকে, উত্তরপক্ষ কিন্তু তখন বাংলা ভাষাকেই নিজেদের মাতৃভাষা বলে সগৌরবে ঘোষণা করে, উর্দুর চেয়ে বাংলা ভাষার প্রতি তাদের পক্ষপাত বারেবারেই প্রকাশ করে। এ-কথাও বলা হয়েছে যে, বাংলা কেবল তাদের মাতৃভাষা নয়, হিন্দু-মুসলামান নির্বিশেষে সকল বাঙালির জাতীয় ভাষা।[১৯৪] কিন্তু জিন্নাহর পূর্ববাংলা সফর ভাষা-আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন : ঢাকায় (১৯৪৮) বাঙালিত্বকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে কেন্দ্র একটা চূড়ান্ত দ্বান্দ্বিক রূপ দেখা দেয়। বাঙালিত্বের একটা স্পষ্টরূপ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯; মূল সভাপতি) তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে। তিনি বলেন :

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী, এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।[১৯৫]

তিনি এই সম্মেলনে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যে পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করেন তা পূর্ব বাংলার জনমানসে এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।[১৯৬] ১ জানুয়ারি ১৯৪৯ তারিখের *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করে বলা হয়,

> ...বিভক্ত ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পাকিস্তানি পরিবেশে এই শ্রেণির কথা শুনতে হইবে, এ কথা ভাবা একটু কঠিন ছিল বৈ কি। তা ছাড়া কোনো হিন্দু লেখক নয়, একেবারে স্বয়ং ডক্টর শহীদুল্লাহ্ 'মা প্রকৃতির' এমন স্তব গাহিবেন, এ-কথাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল![১৯৭]

উপর্যুক্ত সম্পাদকীয়তে আরও মন্তব্য করা হয়, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষণে ইসলামি ভাবধারা সম্পর্কে বলার কোনো প্রয়োজনবোধ করেন নি।[১৯৮] বস্তুত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পূর্ব বাংলায় যে বাঙালিত্বের উৎকর্ষতা প্রত্যাশা করেন তা নবীন রাষ্ট্রে পাকিস্তানবাদীরা সুনজরে দেখেননি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সেই ঐতিহাসিক উচ্চারণকে সমালোচনা করে তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র সাপ্তাহিক *সৈনিক* পত্রিকা ১৯৪৯ সালের ৯ জানুয়ারি লেখা হয়েছিল, 'পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরও মুসলমানের চেয়ে আমাদের বাঙালী পরিচয়টাই খাঁটি সত্য এর চেয়ে অভিনব কথা আর কি হতে পারে?'[১৯৯] সাপ্তাহিক *সৈনিক* পত্রিকার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে কোনো আদর্শ নির্বাচনের করার ক্ষেত্রে যে প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা তার সত্যতা মিলে।

যেখানে মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদরা বাস্তবতাবাদকে স্বাভাবিকতাবাদের এক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছে এটা হলো বাস্তবতাবাদ এবং এটাকে স্বাভাবিক হিসেবে শাসকগোষ্ঠী চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু স্বাভাবিকতাবাদ-বিরোধী নির্বাচনের বোধও তাদের মধ্যে এসেছিল।[২০০] তার প্রমাণ ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র বক্তব্য।
সাহিত্য সম্মেলনে দ্বিতীয়দিন অধ্যাপক আবুল কাসেমের প্রস্তাবনায় ব্যবস্থাপকসভায় বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ভাষা করার যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।
১৯৪৮ সালের পর আবার ১৯৫০ সেপ্টেম্বরে ভাষার প্রশ্নে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানিক মূলনীতি কমিটি ২৮ সেপ্টেম্বরে একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করে।[২০১] উক্ত রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব হয়। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদে ঢাকায় একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটি ৪ ও ৫ নভেম্বর (১৯৫০) ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলন করেন এবং পাকিস্তানের সাংবিধানিক মূলনীতি সম্পর্কে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও বাংলা হবে বলে দাবি করা হয়। সংগ্রাম কমিটি ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবশেষে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে ভাষার প্রশ্নটি আপাতত চাপা পড়ে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় খাজা নাজিমউদ্দীনের এক উক্তিতে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ববাংলা সফর করতে এসে (২৭-১-১৯৫২) এক জনসভায় তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরূপ ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই ঘোষণায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভাষা আন্দোলনকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে '৩১ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।' সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সমর্থন করে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। '২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল ঐ অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ হতে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে। ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য সমস্ত ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সরকারি ঘোষণায় বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় (২০ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত) ভোটাভুটিতে ১১ জন ১৪৪ ধারা না-ভাঙার পক্ষে ও ৪ জন ভাঙার পক্ষে ভোট দেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৪৪ ধারা না-ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নেতা অলি আহাদের আনীত একটি প্রস্তাব গৃহীত ও সংযোজিত হয়। ঐ প্রস্তাবটি ছিল : 'যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পথে নেমে পড়ে, তাহলে উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এই কমিটিও বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে।'
১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ২৪ জমাদিয়ুল আউয়াল ১৩৭১ হিজরি। পূর্ব ঘোষণানুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা জমায়েত হতে থাকে। রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা দুজন দুজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে আসে। বেলা ১১টায় ছাত্রসভা শুরু হয়। সভায় 'সর্বদলীয় কর্মী পরিষদের' সিদ্ধান্তের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করে কর্মপরিষদকে লুপ্ত ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙার পন্থা হিসেবে দশজন দশজন করে ছাত্র রাস্তায় মিছিল বের করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ পূর্বরাত্রে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত দিলেও ছাত্রসভার সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখিয়ে তা মেনে নেয় এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

খণ্ড মিছিলগুলো যখন ১৪৪ ধারা ভাঙতে পথে নামছিল তখন রাস্তায় অপেক্ষমাণ পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু কতজনকে পুলিশ আটক করবে? অবশেষে পুলিশ মিছিলকারীদের উপর গুলি চালায়। শহিদ হন–সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর সহ অনেকে।

২১শে ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে এবং কমপক্ষে ২ জন মৃত্যুবরণ করে। ২১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি চারদিন 'ঢাকা বেতার কেন্দ্রে' পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ফলে কেবল সংবাদ বুলেটিন ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়নি।

আন্দোলনকারীদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার একটি সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন।[২০২]

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, তার পরবর্তী পর্যায়ের স্বৈরাচারবিরোধী বিভিন্ন গণ-আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষের মনে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা দৃঢ় হয়, সংস্কৃতির প্রশ্নে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ উপলব্ধি করে যে, তারা একাধারে বাঙালি ও মুসলমান, এবং এর মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই।[২০৩] বাঙালিরূপে নিজেকে আবিষ্কার করে একটা গৌরবোজ্জ্বল ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকার হিসেবে, যেখানে ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রীয় সীমানা কিংবা ধর্মীয় বৃত্ত মুখ্য নয় এবং নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনাই প্রধান।[২০৪]

বাঙালি পৃথিবীর সর্বত্র বাঙালিত্বের জন্য এবং বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করেছেন। আসামের রাজনীতিতেই ভাসানীর বাংলা ভাষাপ্রীতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। আসামের সংসদে তিনি ভাষাকেন্দ্রিক একটি অনমনীয় দাবি উত্থাপন করেন–'আমি বাংলাতে উত্তর চাই।'[২০৫] তিনি এই দাবি আদায় করতে সক্ষমও হয়েছিলেন। বাঙালিত্বের প্রতি তাঁর যে ঝোঁক এবং আসামের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা বলেই তা সম্ভব হয়েছে। শুধু আসামেই নয় পূর্ব বঙ্গ ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা ব্যবহার করার জন্য তিনি বারংবার দাবি করেছিলেন।[২০৬] ১৯৫৩ সালে সিকান্দার আবু জাফরের লেখা গানে বাংলা ভাষার প্রতি অগাধ প্রীতি এবং ভালোবাসার পরিচয় পাই–

আমাদের বাংলা ভাষা
আমাদের লক্ষ প্রাণের নিত্য দিনের
দুঃখ সুখের কান্না হাসা। (সং, ১৯৪)[২০৭]

মওলানা ভাসানী ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে প্রথম বারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক শান্তিসম্মেলনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন।[২০৮]

৫২-র ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী ২ বৎসর ভাষার প্রশ্নে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষ্যে পূর্ববাংলার জনগণ ভাষা, স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন দাবির প্রশ্নে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামক একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। উক্ত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনি মেনিফেস্টো হিসেবে যে ২১ দফা নির্বাচনি ওয়াদা ঘোষণা করে তার অন্যতম ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অঙ্গীকার, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা, ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের জন্য একটি শহিদ মিনার নির্মাণ ও শহিদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান।[২০৯]

১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের 'একুশ দফার' অন্যতম দফা ছিল, 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।'[২১০] 'একুশ দফার' ষোড়শ দফায় বলা হয়েছিল :

> বর্ধমান হাউসকে....বাঙলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার প্রেক্ষিতে ফ্রন্ট সরকার (পূর্ব বাঙলার) একাডেমী প্রতিষ্ঠার কাজ বাস্তবায়ন করলে বাঙলা ভাষার জয় যাত্রা আর এক ধাপ উত্তরণ ঘটে।[২১১]

ভাষা রাজনৈতিক ও নির্বাচনি ইস্যু হিসেবে নিয়ে আসে যুক্তফ্রন্ট। এবং তাতে সফল হয় কারণ বাঙালি ও বাংলা ভাষা একটি আর একটির সম্পূরক ও পরিপূরক।

১৯৫৪-এর নির্বাচনে পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। ফলে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষার আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং সে অনুসারে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিংয়ে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের আলোকে ৯ মে ১৯৫৪ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু ও বাংলা এবং অন্য আর কোনো ভাষা যা কোনো প্রাদেশিক পরিষদে সুপারিশ করা হবে। পার্লামেন্টের সদস্যগণ ইংরেজি ছাড়া উর্দু ও বাংলাতে বক্তব্য রাখতে পারবেন।[২১২] ১৯৫৫ সালে ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলা ভাষার পক্ষ শেখ মুজিবুর রহমান স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> অন্য কোনো ভাষা জানি কি না-জানি তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমরা এখানে বাংলাতেই কথা বলতে চাই। .... যদি আমাদের অনুমতি না-দেওয়া হয় তবে আমরা হাউজ পরিত্যাগ করব। বাংলাকে অবশ্যই হাউজে গ্রহণ করে নিতে হবে–এটাই আমাদের স্ট্যান্ড।[২১৩]

গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এইভাবে বাংলাভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে।[২১৪]

১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি আইয়ুব খানকে ভাষার প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করে কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু আইয়ুব খান তাতে কর্ণপাত করেন নি। বরং ১৯৬২ সালে ঘোষিত তার সংবিধানে তিনি বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বহাল রাখেন (আর্টিকেল-২১৫)।

বাঙালি তার সংস্কৃতিকে নিয়ে যে গর্ব করে তার সবথেকে বড়ো প্রমাণ কাগমারী সম্মেলনে বাংলার কুটির শিল্পের এক মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া সম্মেলনে চিরন্তন বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লাঠিখেলা, তলোয়ার ও রাম দা খেলা প্রদর্শন করা হয়।[২১৫] যার মাধ্যমে বাঙালি নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে বাঙালির যে আত্মপরিচয়ের সংকট ছিল তা কেটে যাওয়ায়।

উনিশ শতকের শেষের দশকে এবং বিশ শতকের শুরুতে বাঙালির আত্মপরিচয়ের যে সংকট ছিল ১৯৪৮ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন-এ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দেন। বাঙালির নিজের পরিচয় নিয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তা তাত্ত্বিকভাবে কেটে যাওয়া শুরু করে। যার চূড়ান্তরূপ আমরা দেখতে পাই ১৯৬০-এর দশকে। এই সময় বাঙালি স্লোগান তোলে–

> তুমি কে আমি কে
> বাঙালী বাঙালী।[২১৬]

বাঙালি নিজেকে বাঙালি বলে স্লোগান দিচ্ছেন। নিজের মধ্যে আর কোনো সংকট, দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা হীনম্মন্যতা নেই তার মধ্যে। উচ্চ স্বরে বলছে তারা বাঙালি।

তাইতো, ২০ মার্চ ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পল্টন ময়দানে ৬-দফার প্রচারণার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উক্ত সভায় শেখ মুজিবের স্লোগান ছিল–'জাগো জাগো বাঙালি জাগো'।[২১৭] তিনি জাতিকে জাগোনোর কথা বলেছেন।

১৯৬৯ সালে কবি সিকান্দার আবু জাফর 'ইতিহাসচারিণী বাঙলা' কবিতায় বাংলাকে জননী বলেছেন এবং তার রূপের বর্ণনা করেন–

> ঝঞ্ঝার সঙ্গীতে ছন্দিতা বাঙলা
> বন্যার তাণ্ডবে বন্দিত বাঙলা
> ষড়ঋতু-সজ্জায় নন্দিতা বাঙলা
> জয় জয় জননী বাঙলা ॥[২১৮]

১৯৬৯-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে মানুষের বুকে শোভা পেয়েছিল নতুন অভিজ্ঞান-বড়ো করে একটি বাংলা বর্ণ লিখে তার উপরে-নিচে লেখা হয়েছিল,

> একটি বাংলা অক্ষর
> একটি বাঙালির জীবন।[২১৯]

যখনই বাঙালিত্বের ওপর আঘাত এসেছে বাঙালিরা তা প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রতিহত করেছে। পূর্ব বাংলার বাঙালির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তা বিকাশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেই ১৯৬৯/৭০এ সিরাজুল ইসলাম রচিত, *পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি* শীর্ষক পাঠ্যবইয়ে বাঙালি জাতিসত্তাবিরোধী তথ্য অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়।[২২০] [পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি বই বাতিলের দাবিতে স্কুলছাত্ররা ৫ আগস্ট, ১৯৭০ সালে জমায়েত। 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' বই বাতিল ও শিক্ষা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ৬ আগস্ট ১৯৭০ সালে শহিদ মিনারে ছাত্র জমায়েত হয়। দীর্ঘ দিন ধরে ছাত্রসমাজ একটি সর্বজনীন সুলভ, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে সংগ্রাম করছে। কিন্তু সরকার নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রদের ওপর 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' বইটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বইয়ে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।[২২১]

তারপর এলো ১৯৭১। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে ধ্বনি উঠল:

> বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
> বাংলাদেশ স্বাধীন করো।[২২২]

আনিসুজ্জামান এ সম্পর্কে বলেন, 'অচিরেই সেই সময় এসে গেল, যখন তারা (বাঙালি) প্রমাণ করলো যে, এ কেবল ফাঁপা স্লোগানই ছিল না।'[২২৩]

আনিসুজ্জামান বাঙালির পরিচয় সম্পর্কে বলেন,

> আমাদের এই বাঙালি পরিচয় ও এই বাঙালি সত্তা ইতিহাসের একটা ধারার মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে। বাঙালির ইতিহাস সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। সে-ইতিহাসের ধারাবাহিক যে উত্তরাধিকার, তা আমরা নিজের বলে দাবি করি। সে-ইতিহাসে অনেক ভাঙাগড়া আছে, অনেক ধারার মিলন আছে। সে-ইতিহাসের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব পেয়েছি বাঙালি-পরিচয়ে যিনি বিশেষভাবে ভূষিত করেছেন নিজেকে। যেমন, পনেরো শতকে বাংলার দরবেশদের অগ্রগণ্য শেখ নূর কুতুব আলম- যেখান থেকেই তিনি এসে থাকুন না কেন-পরিচিত হয়েছিলেন শেষ নূর বাঙালি হিসেবে। যেমন, আঠারো শতকের সংগীতজ্ঞ লালা বাঙালি-সম্রাট মুহম্মদ শাহের দরবারে যিনি সাদরে বৃত হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ বেরিলভির খলিফা উনিশ শতকের নোয়াখালীর সন্তান পরিচিত ছিলেন মওলানা ইনামউদ্দীন বাঙালি বলে। বাঙালির ইতিহাস একটা বিশেষ রূপ নিয়ে আমাদের এই ভূখণ্ডে–১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে। ইতিহাসের সে-বিশেষ রূপই ধরা পড়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে। এই নতুন জাতিসত্তার সূচনা ১৯৫২-তে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভাষাপ্রীতি, আত্মত্যাগ, জাতিগত ঐক্যবোধের মধ্য দিয়ে। ১৯৫২-তে যার সূচনা, ১৯৭১-এ তার প্রতিষ্ঠা। আমাদের নতুন রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে আছে আমাদের জাতিগত পরিচয়।[২২৪]

বাংলা ভাষা বাংলাদেশের জন্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[২২৫] শুধু তাই নয়, বাঙালিত্বের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাংলা ভাষা। পাকিস্তানি শাসকদের আঘাতে আঘাতে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত আত্মপরিচয় সম্পর্কে বাঙালিরা ক্রমে সচেতন হয়েছে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ততোই আমাদের মধ্যে ঘটেছে। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে শুধু এ ভাবধারা পুষ্ট হয়নি। বাংলা নববর্ষ-উদ্‌যাপন, ঋতু উৎসব পালন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যত বেশি সরকারি বাধা এসেছে, রোমান হরফে বাংলা লেখার কিংবা বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে আমাদের যত দূরে সরাবার চেষ্টা হয়েছে, ততই আমরা নিজেদের বাঙালিত্বকে সজোরে আঁকড়ে ধরেছি।[২২৬] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের বক্তব্য এ প্রণিধানযোগ্য–

> ইতিহাসের নানান যোগ-বিয়োগশেষে বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ আজ বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর বর্তেছে। মুক্তি-আন্দোলনের সময় 'জাগো জাগো বাঙ্গালি জাগো' বলে যে স্লোগান দেওয়া হয় তা বাঙালির ইতিহাসে পূর্বে কোনোদিন

ধ্বনিত হয়নি। বাংলাদেশের এই চেতনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র, ১৯৪৬-৪৭-এর মৃত বৎস অখণ্ড সার্বভৌম বঙ্গের চেতনা হতেও স্বতন্ত্র। এর জন্মের সূত্রপাত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে অবশ্য পুরোনো দিনের নানা রেশ ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে।[২২৭]

এভাবে হাজার বছরের বাংলা ইতিহাসে ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয় যা মূলত বাঙালিত্ব। এই বাঙালিত্বের ফলে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করতে সক্ষম হয়েছে।

বাঙালির জন্যে ভাষা ও ভূমি দুইই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি বছর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আদিতে বাঙালির ঐক্যের প্রকাশ শিখরে পৌঁছেছিল। আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কলকাতা, কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বঙ্গদেশে, বিশেষ করে, পূর্ববঙ্গে তার গতি ও গভীরতা ছিল অনেক বেশি।[২২৮]

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান একরকম ছিল না। শাসক পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এ ভূ-খণ্ডের সীমানাও। কিন্তু ঠিক কখন এই অঞ্চলে স্বাধীনতার চিন্তা বা ভিন্ন দেশ গঠনের চিন্তা এলো এবং কীভাবে বাস্তবায়িত হলো তাই মূলত রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া। বাঙালিদের নিয়ে রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে যারা চিন্তা করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হবে–ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল, আবুল হাশিম, শরৎ বসু ইত্যাদি। তাদের চিন্তা পরবর্তীকালে কীভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে বাস্তবায়িত হলো তা আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো কীভাবে বর্তমান যে স্বাধীন বাংলাদেশ তা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলো এবং এক্ষেত্রে বিশশতকের ৬০-এর দশকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

রাষ্ট্রগঠনের চিন্তা তার উদ্ভব

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে প্রজা পার্টির নির্বাচনি ম্যানিফেস্টোতে বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন।[২২৯] বাঙালি মনীষীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আদর্শ কী হবে তা ভেবেছে ২০ শতকে এবং ১৯৭১ সালে তার বাস্তবায়ন হয়।

আবদুল রসুল

ব্যারিস্টার আবদুল রসুল বিশশতকের প্রথম দিকে বলেছেন–'আমরা বাঙালি'। বাঙালিত্বের জন্যে আমাদের হীনম্মন্যতার কারণ নেই। কারণ বাঙালির ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে ও বাঙালি সংস্কৃতি আছে। আবদুল রসুলের পিতা কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে ঘাটু নাচ ও গান প্রচল করেছিলেন। আবদুল রসুল শিশুকাল থেকেই এসব সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যেই বেড়ে ওঠেছেন। তাই তিনি জোর দিয়ে বলতে পেরেছেন–বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতির শক্তির দ্বারা বলিয়ান হয়ে তিনি বলতে পেরেছেন আমরা বাঙালি।[২৩০] সেই বাঙালি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপনিবেশসমূহে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠলে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান প্রায় অবধারিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির বিখ্যাত ফেব্রুয়ারি-ঘোষণার (১৯৪৭) পর এটি একরকম নিশ্চিত হয়ে যায়।[২৩১] ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি ৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সমাপ্তির ঘোষণা দেন। যদি এই সময়ের মধ্যে বৃহৎ দুটো দলের সমঝোতা না হয় তা হলে ব্রিটিশ সরকার প্রদেশ অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। কারণ ভারতবর্ষে তখন যে ১১টি প্রদেশ ছিল প্রতিটি প্রদেশই স্বাধীন দেশে পরিণত হবে।[২৩২] এ ঘোষণায় ভারতবিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একধরনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর (হিন্দু

মহাসভা) বাংলা ও পাঞ্জাবকেও বিভক্ত করার একটা আন্দোলন করে।[২৩৩] হিন্দু মহাসভা যখন বাংলা ভাগের সুপারিশ করে এমনি এক রাজনৈতিক পটভূমিতে সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। বাংলাবিভক্তির দাবির পশ্চাতে সক্রিয় হিন্দুমন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি, এ-দাবির অযৌক্তিকতা, বাংলাবিভক্তির পরিণতি, বাংলার ঐক্যবদ্ধ থাকার অপরিহার্যতা, স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং এ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে সোহ্‌রাওয়ার্দী এক দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের বাংলাবিভক্তির দাবিকে 'অদূরদর্শী এবং 'পরাজিতের মানসিকতা' বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন যে, ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলার হিন্দুরা তাদের সংখ্যা, সম্পদ, শিক্ষা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির তুলনায় বঙ্গীয় মন্ত্রিসভায় আসন লাভ করতে না পারায় তা থেকে সৃষ্ট হতাশাই উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী। বাংলার হিন্দুদের ঐ অবস্থার মূল কারণ হিসেবে প্রধানত সর্বভারতভিত্তিক হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের কথা তিনি উল্লেখ করেন, যেখানে সবধরনের সমস্যা সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হয়ে থাকে। 'প্রত্যেকটি প্রদেশ নিজ ব্যাপারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলে পুরোপরি ভিন্ন এক অবস্থার উদ্ভব হয়'–এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন, 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রে আমরা সবাই একসঙ্গে বসে এমন একটি সরকার-ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে সক্ষম হব, যা সকলের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে।' ১৯৪৬ সালের আগাস্ট মাসে 'ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গা'র অব্যবহিত পরে পূর্ববাংলার নোয়াখালী জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যাতে হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্তরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 'নোয়াখালী দাঙ্গা'কে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রে হিন্দুদের সম্ভাব্য অবস্থার একটি নজির হিসেবে কোনো-কোনো মহল তুলে ধরার চেষ্টা করলে সোহ্‌রাওয়ার্দী তা খণ্ডন করে হিন্দু-সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেন যে, নোয়াখালী ছাড়া বাংলায় আরও বহু জেলা রয়েছে, সেখানে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায় বহুকাল ধরে শান্তি ও পারস্পরিক সৌহার্দের সঙ্গে বসবাস করে আসছে। 'বাংলাবিভক্তি হিন্দুদের জন্য আত্মহত্যার শামিল হবে'–এ অভিমত ব্যক্ত করে তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, 'অর্থনৈতিক ঐক্য, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং একটি কার্যকর শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যকতা' বিবেচনায় বাংলা সর্বদাই অবিভাজ্য। তিনি বাঙালি-অবাঙালি প্রশ্ন তুলে কীভাবে একশ্রেণির অবাঙালি কর্তৃক বাংলা শোষিত হচ্ছে সে-কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলাকে সমৃদ্ধশালী হতে হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে...বাংলাকে অবশ্যই তার ধন-সম্পদ এবং নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হতে হবে।'[২৩৪] ১৯৪৭, ২৭ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন–বাংলা অখণ্ড থাকলে শক্তিশালী হবে। অর্থনৈতিকভাবে ভালো থাকবে। এর সাথে পুনিয়া ও আসাম নিয়ে গ্রেটার বেঙ্গল হবে।[২৩৫] বাংলা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হলে এর ভবিষ্যৎ কেমন হবে তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন :

> এটা বস্তুত একটি মহান দেশে পরিণত হবে, ভারত উপমহাদেশে যা হবে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এখানে জনগণ উন্নত জীবনধারণের সুবিধা নিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করে কালক্রমে এ-দেশ বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রের মর্যদা অর্জন করতে সমর্থ হবে।[২৩৬]

সোহ্‌রাওয়ার্দী এই মর্মে আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হলে একসময়ে বাংলার সঙ্গে তৎসংলগ্ন ও বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মানভূম, সিংভূম ও পূর্ণিয়া জেলা এবং আসাম প্রদেশের সুরমা এলাকার সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান হলে আসামের বাকি অংশ বাংলার সঙ্গে একীভূত হয়ে একক রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে আসবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এটাই ছিল সোহ্‌রাওয়ার্দীর 'বৃহত্তর বাংলা' রাষ্ট্রের ধারণা।[২৩৭]

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের প্রাক্কালে যুক্তবাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বাংলাকে অখণ্ডিত রাখা এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[২৩৮] বাংলার ভবিষ্যৎ প্রশ্নে আলোচনার জন্য তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনায় মি. জিন্নাহ কী অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা আজও অজ্ঞাত।[২৩৯] তবে ঐ আলোচনার পরপর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলন করেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ।[২৪০] তিনি

আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিক সম্মেলনে, 'স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড বাংলা' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।[২৪১] এই উদ্যোগের স্বপক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাসে বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাব নামে খ্যাত। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন।[২৪২] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় নেতা কিরণশংকর রায় এ প্রক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[২৪৩] পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি 'সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, বাংলায় এক নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে যার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান। মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের শতকরা পঞ্চাশভাগ মুসলমান ও পঞ্চাশভাগ অমুসলমান থাকবেন। এরপর প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে পরিষদ নির্বাচিত হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম থাকবে, না পাকিস্তানে যোগদান করবে, কী ভারতে করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে উক্ত পরিষদ। তাৎক্ষণিকভাবে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ যুক্ত বাংলার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২৪৪] প্রাদেশিক মুসলিম লীগের উদ্যোগের প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রধান সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলের কিরণশঙ্কর রায় এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎচন্দ্র বসু আশানুরূপ সাড়া দেন।[২৪৫]

গান্ধীর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোনো আশ্বাস না পেয়ে শরৎচন্দ্র বসু ১৯৪৭ সালের ১২ মে একটি 'ছয় দফা নীতিমালা'[২৪৬] ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ খ্রি. ২০ মে কলকাতায় কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর বাসগৃহে অখণ্ড বাংলার পক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[২৪৭] বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন মুসলিম লীগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, মোহাম্মাদ আলী, এ. এম মালিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অপরদিকে হিন্দু নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় ও সত্যরঞ্জন বখশী।[২৪৮] সভায় স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে উল্লেখ করা হলো–

> এক. বাংলা হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে তা সে নিজেই ঠিক করবে।
>
> দুই. হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসনসংখ্যা বণ্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন সভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।
>
> তিন. স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হবে। পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। উক্ত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া বাকি সদস্যপদ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে।
>
> চার. সামরিক ও পুলিশ বাহিনীসহ সকল চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকবে। এসব চাকরিতে শুধু বাঙালিদের নিয়োগ দেয়া হবে।
>
> পাঁচ. সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ থাকবে। এর মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।[২৪৯]

আনিসুজ্জামান সোহ্‌রাওয়ার্দী-শরৎ বসুর প্রস্তাব সম্পর্কে এ ভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন,

> সোহ্‌রাওয়ার্দী-শরৎ বসুর অখণ্ড ও সার্বভৌম বঙ্গগঠনের দাবিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয়তার মেল বন্ধনের প্রয়াস দেখা যায়। যে সোহ্‌রাওয়ার্দী শুদ্ধ বাংলা বলতে পারতেন না, তিনিও তখন বাঙালি সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁদের পরিকল্পিত রাষ্ট্রকে অভিহিত করেছিলেন একভাষাভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র (monolinguistic unified state) হিসেবে।[২৫০]

কংগ্রেস হাই-কমান্ড বাংলার বিভক্তির প্রশ্নে অটল ছিল এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক তা চাননি। বেঙ্গল কংগ্রেসের একটি অংশ অখণ্ড বাংলার পক্ষে। তবে একথা সত্য যে, বাংলাবিভক্তির উদ্যোগ সর্বপ্রথম কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকেই আসে।[২৫১] ১৯৪৭ সালে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের যে একটা অংশ বাংলা ভাগের পক্ষে অংশ নেয় তারা ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য আন্দোলন করে।[২৫২]

জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের যে অখণ্ড বাংলার পক্ষে মত ছিল তা শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন,

> ... শহীদ সাহেব দিল্লিতে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা একটা ফর্মুলা ঠিক করেন। বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এক ফর্মুলা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। যতদূর আমার মনে আছে, তাতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। জনসাধারণের ভোটে একটা গণপরিষদ হবে। সেই গণপরিষদ ঠিক করবে বাংলাদেশ হিন্দুস্থান না পাকিস্তানে যোগদান করবে, নাকি স্বাধীন থাকবে।[২৫৩]

জিন্নাহ এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুকূল মনোভাব সত্ত্বেও সময়ের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্বিগ্ন ছিলেন। বাংলার স্বাধীন মর্যাদা সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না এবং এঁদের মধ্যে সমর্থক ও বিরোধী উভয়ই ছিল।[২৫৪]

অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলার গভর্নর, সর্বভারতীয় পর্যায়ে গভর্নর জেনারেল এবং লন্ডনস্থ ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন ছিল না। বাংলার গভর্নর স্যার এফ. বারোজ তাঁর মুখ্যমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীর অখণ্ড স্বাধীন বাংলা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাঁর মতে,

> বাংলাকে বিভক্ত না-করে স্বাধীনতা প্রদানই হচ্ছে বাংলার অত্যন্ত জটিল সমস্যাবলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সমাধানের উপায়। এসব সমস্যার অন্যতম হচ্ছে বাংলার উভয় অংশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, যার ওপর কলকাতা মহানগরীর ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল। বাংলাকে বিভক্ত করা হলে খাদ্যঘাটতিপূর্ণ এবং বৃহৎ শিল্প-কারখানাহীন পূর্ববাংলার পক্ষে বিভাগের পর টিকে থাকা সম্ভব নয়' এবং যেহেতু উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে কলকাতা মহানগরীর ওপর, তাই কলকাতাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত সংঘর্ষ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[২৫৫]

স্যার বারোজ স্বাধীন বাংলার পক্ষে ছিল। কখনও কখনও তিনি নিজে বাংলার স্বাধীনতার জন্য ড্রাফট করতেন। তিনি সরকারকে বার বার চিঠি দিয়ে অবহিত করেন বাংলা স্বাধীনতার খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে।[২৫৬]

ভাইসরয় লর্ড মান্টন ব্যাটন এ-ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন।[২৫৭] ব্রিটিশ সরকারের অভিমত যত কম দেশ সৃষ্টি করা যায় তার পক্ষে ছিল।[২৫৮] মাউন্টব্যাটেনের অভিমত এই যে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যদি ভারতকে বিভক্ত করতে হয়, তাহলে একই যুক্তি বাংলা ও পাঞ্জাবসহ অন্য প্রদেশসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তিনি আরও মনে করেন, বাংলাকে যদি স্বাধীনতা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তা হবে ভারতকে 'খণ্ডবিখণ্ডকরণে' সাহায্য করার শামিল এবং কংগ্রেসের মৌলিক নীতি-আদর্শের বিরুদ্ধে যাওয়া।[২৫৯] এমন অবস্থায়, কংগ্রেস পাকিস্তানকে মেনে নিতে সম্মত হওয়ার মাধ্যমে তার অখণ্ড ভারত আদর্শ থেকে সরে এসে যে-ত্যাগ স্বীকার করলো এর মূল্য থাকলো কোথায়! এছাড়া, মাউন্টব্যাটেনের ধারণা ছিল, জিন্নাহ বাংলার স্বাধীনতার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। বারোজের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে মাউন্টব্যাটেন বাংলাকে অবিভক্ত রেখে স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত হন। অন্যদিকে, ভারত সচিব লিস্টওয়েলও (Listowel) বাংলাকে অবিভক্ত অবস্থায় স্বাধীনতালাভের সুযোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর যুক্তি হলো–(ক) আসামের সিলেট অঞ্চলসহ বা এটা বাদ দিয়ে হলেও বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের জন্য যথেষ্ট বৃহৎ (খ) অবিভক্ত বা বিভক্ত যাই থাকুক না কেন, রাজনৈতিকভাবে (পশ্চিম) পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও কার্যত বাংলার অবস্থা হবে একটি পৃথক রাষ্ট্রের মতো এবং (গ) বাংলা বিভক্ত হলে বিশেষ করে পূর্ববাংলায় সৃষ্টি হবে বিরূপ অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া। সুতরাং এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত 'অফিসিয়াল' নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ডমিনিয়ন মর্যাদায় অবিভক্ত বাংলাকে স্বাধীনতা প্রদানে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সম্মত থাকা; তবে শর্ত হচ্ছে, অবশ্যই এ-ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হাই-কমান্ডের অনুমোদন থাকতে হবে।[২৬০] তবে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি ঐক্যবদ্ধ হতো তবে ব্রিটিশ সরকারের আপত্তি ছিল না। যেহেতু এক হতে পারে নি তাই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বেঙ্গল বিভক্ত হয়।

সংগ্রাম কমিটির জাতীয় মহাসম্মেলনে পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একক উদ্যোগের বিরুদ্ধে বাঙালি উঠতি পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহল প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে যে প্রতিবাদ তা মধ্যবিত্ত সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশ না হওয়ায় সফল হয়নি। কিন্তু নব্য-উপনিবেশবাদী পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার সূত্রপাত হয় তখন থেকেই। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম কমিটির জাতীয় মহাসম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি প্রথম সুস্পষ্ট রূপ পেলো।[২৬১] এ মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে সমাজতন্ত্র রাখার কথা প্রথম সুস্পষ্টভাবে বলা হয়।[২৬২]

দেবেন সিকদারের পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব

১৯৫৪ সালের ৫ জুলাই পাকিস্তান সরকার ধ্বংসাত্মক কর্ম-তৎপরতা চালানোর অভিযোগে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে। কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষিত করার পর তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায় এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে থেকে কাজ করতে থাকে। ১৯৫৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত গোপন-বৈঠকে পার্টিকে পূর্ববঙ্গ ভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। এই বৈঠকে কোনো কোনো নেতা পূর্ব-পাকিস্তানকে পৃথক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার কথা প্রস্তাব করেন। ফলে ইতিহাসে এই কংগ্রেসে কমিউনিস্টদের দ্বারাই প্রথম পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে। যদিও তা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ভোটাভুটিতে বাতিল হয়ে যায়।[২৬৩] কমিউনিস্ট নেতা দেবেন সিকদার ১৯৫৬ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি আলোচনা কমিউনিস্ট পার্টিতে তুলেছিলেন। দেশের রাজনীতিতে তাঁর প্রস্তাব কর্মীদের মধ্যে আলোড়ন তোলে।[২৬৪] দেবেন সিকদার বরাবরই বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার বিষয়টি পার্টিতে তুলেছেন এবং কর্মীমহলে প্রচার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শোষক শ্রেণির সাথে বাংলার মানুষের যে দ্বন্দ্ব তা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অবসান কখনোই হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি বলতেন, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনেও এ সংকটও দ্বন্দ্ব যাবে না।[২৬৫] দেবেন সিকদার এ সম্পর্কে জানিয়েছেন,

> ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটির যে সম্মেলন কলকাতায় আয়োজন করা হয়েছিল তাতে কমরেড কুমার মৈত্র পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা সম্মেলনে ৩২ থেকে ৩৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। তখন পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছিল বলে সংসদে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি। এই সংসদ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপক মোজফ্‌ফর আহমদ এবং শহীদুল্লা কায়সার। সম্মেলনে কুমার মৈত্র প্রস্তাবিত স্বাধীনতার দাবী শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি।[২৬৬]

আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসন দাবি

পাকিস্তানের ভৌগোলিক বাস্তবতার জন্য পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল অপরিহার্য। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন খসড়া ম্যানিফেস্টোতে পাকিস্তানের জন্য 'দুটি আঞ্চলিক ইউনিট' গঠন করে এর প্রতিটির জন্য 'আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার' প্রদানের দাবি করা হয়।[২৬৭] ১৯৫০ সালে 'পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সমাজ ও আওয়ামী লীগ সদস্য'রা সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য 'গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন' ডেকেছিলেন। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা থাকায় লিয়াকত আলীর প্রধান টার্গেট হয়েছিল আওয়ামী লীগ।[২৬৮] ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণে বলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা এক রকম নহে, সুতরাং দুই অংশের প্রোগ্রামও ভিন্ন হইবে।' পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন'-এর দাবি জানিয়ে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে অন্যথায় 'মূল লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত স্টেটস আমরা পুনর্বিবেচনাও করিতে বাধ্য হইব।' ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটে

পরিণত করতে দাবি জানায়। ১৯৫৭ সালে দলের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে 'জনগণের প্রাণের দাবি' উল্লেখ করে বলেন, 'এ দাবি আমাদের আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়।' ঐতিহাসিক ৬ দফার মধ্যেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়। এভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সবসময় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়। বস্তুত আওয়ামী লীগের 'পূর্ণ আঞ্চালিক স্বায়ত্তশাসন' দাবির মর্মমূলে ছিল লাহোর প্রস্তাবের 'Independent States' বা স্বাধীন রাষ্ট্রধারণা। পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃবৃন্দ লাহোর প্রস্তাবকে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' অর্থে ব্যাখ্যা করে।[২৬৯]

সমাজতন্ত্র

১৯৫৭ সালের ৬-১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ প্রশ্নে দলের ডানপন্থি নেতা-কর্মীরা সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষাবলম্বন করেন এবং বামপন্থি অংশ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে স্বাধীন এবং জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। ফলে আওয়ামী লীগ আদর্শিক কারণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের বামপন্থি অংশের উদ্যোগে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ২৪-২৫ জুলাই গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়। ন্যাপের মূল লক্ষ্যও আদর্শ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা।[২৭০] ন্যাপ প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে। রাশিয়ার সাথে তাদের যে সম্পর্ক তা এই দাবি উত্থাপনে ভূমিকা পালন করে। এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকার জন্য তাদের অবদান রয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বাঙালিত্বের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা চেতনা জাগ্রত করে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে। চেগুয়েভারাসহ আন্তর্জাতিক বিপ্লবী নেতাগণ বাঙালির আন্দোলনে ওপর প্রভাব ফেলেছিল।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (এনএপি)

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কাগমারীতে সংস্কৃতি সম্মেলনে অবিলম্বে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে বলেন, তা না হলে ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানকে 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলার প্রবণতা অনুভব করতে পারে। মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। 'আচ্ছালামু আলায়কুম'-এর মাধ্যমে মওলানা ভাসানী সরাসরি স্বাধীনতার আহ্বান জানাননি, তবে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন। এটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে আরও একটি অবশ্যম্ভাবী দিকনির্দেশনা।[২৭১] তৎকালীন রাজনৈতিক মহলে ও পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ও সংসদ সদস্য মওলানা আতাহার আলী এক বিবৃতিতে বলেন,

> জনাব ভাসানী পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিদ্বেষ ও তিক্ততার প্রচারণা চালাইয়া ও পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান এছালমী জমহুরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, লেনিন গেট, গান্ধী গেট, সুভাষ গেট প্রভৃতি নামে তোরণ নির্মাণ করিয়া পাকিস্তানকে কি ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে চান তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন।[২৭২]

বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন,

> পাকিস্তান এছলামী জমহুরিয়াকে 'আচ্ছালামু আলাইকুম' না বলিয়া প্রয়োজন হইলে জনাব ভাসানী সাহেবকে 'আচ্ছালামু আলায়কুম' জানাইবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইতেছি।[২৭৩]

দৈনিক আজাদ এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে :

> পাকিস্তান সম্পর্কে কোন পাকিস্তানীর মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হইতে পারে ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল? ...পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহের উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৭৪]

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কাগমারীতে বহুল আলোচিত এই আফ্রো-এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মওলানা ভাসানী। সম্মেলন উপলক্ষ্যে টাঙ্গাইল থেকে কাগমারী পর্যন্ত জিন্নাহ, গান্ধী, তিতুমীর, শেক্সপীয়র, লেনিন প্রমুখের নামে তোরণ নির্মাণ করা হয়। পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে এই সম্মেলনের চেতনা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।[২৭৫]

মহিউদ্দিন আহমদ

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদ। অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, আসহাবউদ্দিন আহমদ এবং শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ জানিয়েছেন, 'প্রস্তাবটি তিনিই তুলেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও শেখ মুজিব তা সমর্থন করেছিলেন'।[২৭৬] খোন্দকার মোশতাক আহমদ এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাবক এবং সমর্থকদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'আপনারা একেবার স্বাধীন হতে চান?'[২৭৭] পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান বিতর্কে অংশ না নিয়ে এ সময় তার দপ্তরে 'বিশ্রাম' নিচ্ছিলেন। ৬ এপ্রিল তিনি এক বিবৃতি দিয়ে জানতে চান, 'পূর্ব বাংলার নেতারা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝাতে চান।'[২৭৮] ১৯৫৭ সালেরই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে এসব বিষয় উত্থাপন করেছিলেন। তিনি ছাত্রদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন,

> পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে প্রাদেশিকতার মনোভাব উস্কে দিয়ে কিছু ব্যক্তি নায়ক হতে চাচ্ছেন এবং এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের সঙ্গে একত্রে থাকতে চায় না।[২৭৯]

বেঙ্গল লিবারেশন এসোসিয়েশন

১৯৬০-৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে ১৩ সদস্যের 'বেঙ্গল লিবারেশন এসোসিয়েশন' নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংগঠন মূলত ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হলেও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তৎকালীন বাম ছাত্রনেতা কাজী জাফর আহমদ বলেন, '১৯৬২ সালের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার বিষয়ে আলাপ হয়েছিল আওয়ামী লীগের সাথে। তৎকালীন সামরিক কর্মকর্তা ও পরে রাজনৈতিক নেতা ক্যাপ্টেন আবদুল হালিমের সাথে এই ব্যাপারে আলাপ হয়েছিল।'[২৮০] ক্যাপ্টেন হালিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে U.O.T.C ক্যাডেটদের দায়িত্ব পালন করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মাজেদ খানের মধ্যস্থতায় তাঁরই বাসায় এই গোপন বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এই আলোচনায় যোগদান করেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন হালিম বলেন,

> তোমাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা হয়, তাহলে আমরা বাঙালী অফিসারেরা রাইফেল তোমাদের পক্ষ হয়ে ওদের দিকে ঘুরিয়ে দেবো। কিন্তু তোমরা কি সেজন্যে মানসিকভাবে ও সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত আছো?[২৮১]

জাকারিয়া চৌধুরী বলেন, '৬০ দশকে বামপন্থীরা বিলাতে স্বাধীনতার কাজ শুরু করেন। বৈষম্যের চিত্র দিয়ে তারা একটি বই বের করেন।' আজিজুল হক ভুঁইয়া বলেন, "বামপন্থীরা বিলাতে 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট' নামে একটি সংগঠন করেছিল। পাকিস্তানের বাম নেতা তারেক আলী এর সমর্থক ছিলেন।"[২৮২]

বেঙ্গল লিবারেশান আর্মি

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্যভাবে ছিল শোষিত ও বঞ্চিত। এই প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীর কতিপয় বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈন্য গোপনে গঠন করে বিপ্লবী সংস্থা

'বেঙ্গল লিবারেশান আর্মি'।[২৮৩] বিভিন্ন সময়ে লে. মতিউর রহমান ও সার্জেন্ট আবদুল জলিলের বাসায় বৈঠক করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত হয়।[২৮৪] এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সেনানিবাসসমূহে একযোগে বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করা। এ লক্ষ্যে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে গোপনে সদস্য সংগ্রহ ও কর্মপ্রক্রিয়া চলতে থাকে। এর সঙ্গে কিছু বেসামরিক উর্ধ্বতন সরকারি বাঙালি কর্মকর্তাও সম্পৃক্ত হন। এয়ারফোর্সের কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম ও সার্জেন্ট জলিল, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ, সার্জেন্ট জহুরুল হক, সামছুল হক, নৌবাহিনীর লে. মতিউর রহমান ও কমান্ডার আবদুর রউফ, করাচিতে টেক্সটাইল কোম্পানির ম্যানেজার মাহবুব উদ্দীন ও লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম।[২৮৫] নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন বিপ্লবী সংস্থার প্রধান ব্যক্তি। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৪ সালের ২৫-২৯ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান করাচি সফরকালে পাকিস্তান নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক আহূত একটি সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম সভায় উপস্থিত শেখ মুজিব ও অন্যদের জানান যে, 'নৌবাহিনীতে কর্মরত বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে একটি জঙ্গি বাহিনী সংগঠিত করেছে। সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি অফিসার ও জোয়ানদেরও দলভুক্ত করতে হবে।' ১৯৬৫ সালের ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পুনরায় করাচি সফর করে। এই সময়ে একদিন কমান্ডার মোয়াজ্জেমের বাসায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'একমাত্র একটি উপায়েই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে তা হলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া।' তিনি জঙ্গি সংগঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। শেখ মুজিব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করে বিপ্লবী গ্রুপগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধি করতে কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে নির্দেশ দেন।[২৮৬]

শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবি ও কমিউনিস্ট পার্টির অভিমত

১৯৬১ সালের শেষার্ধ থেকে বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয়। সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এ ব্যাপারে দুই দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে মণি সিংহ ও খোকা রায় এসব গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।[২৮৭] আন্দোলনের প্রশ্নে কয়েক দফা কার্যক্রমের একটি খসড়া তাঁরা অনুমোদন করেন। ঠিক হয় যে, আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র জারি হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের দিয়ে প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত হবে এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থিরা সম্মিলিতভাবে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেবে। আন্দোলনের কর্মসূচির[২৮৮] মধ্যে অন্যতম ছিল পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন।[২৮৯] বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব কর্মসূচিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বৈঠকে বলেন,

> ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগামে ঐ দাবী রাখতে হবে।[২৯০]

কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন :

> এই দাবীর মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি নিহিত রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে 'পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা আমরা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না'। কিন্তু 'বর্তমানে যেভাবে... 'স্বাধীন পূর্ব বাংলার' দাবী উঠিতেছে তাহা রাজনৈতিক দিক হইতে যুক্তিসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য নয়। তাহা ছাড়া, বর্তমানে এইরূপ দাবী উত্থাপন করা আমরা অপরিপক্ক এবং অসময়োচিত মনে করি।...
>
> বাঙালি ধনিক ও বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী উগ্র স্বদেশীপনা এবং একমাত্র নিজেদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের দিক হইতে এই দাবিটি তুলিতেছেন। তাহারা ইহা অর্জনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তথা সমগ্র পাকিস্তানের জনতার প্রধান শত্রু ও

শোষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতার আশা রাখেন...পূর্ববাংলার জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের গঠনতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের প্রধান শক্তি হইবে এখানকার শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষেরা।...

এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী এখন একটি হঠকারী দাবী।...তাই বর্তমানে আমরা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশানের দাবী উত্থাপন করিব।...

...কিন্তু যাহারা স্বাধীন পূর্ববাংলা দাবী উত্থাপন করিবেন আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিব। আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যে, এই দাবীর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রহিয়াছে, যদিও বর্তমান অবস্থায় এই দাবী হঠকারী আমরা এই কথা তাহাদেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বর্তমানে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন যে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ ইহা বুঝাইতে এখন তাহাদিগকে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবী উত্থাপন হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিব।[২৯১]

মাত্র দেড় মাস পরে এই পার্টির ভিন্ন আরেকটি গোপন দলিলে এই প্রসঙ্গে আরও অভিমত প্রকাশ করা হয় যে :

এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা যত বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন যত জোরদার হইবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও তত দুর্বল হইয়া পড়িবে।

এই অবস্থায়, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মত দুইটি পৃথক অঞ্চল নিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ভবিষ্যতে পাকিস্তান রাষ্ট্র একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িতে পারে।[২৯২]

কমিউনিস্ট পার্টির এসব গোপন দলিল অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৫৯ সাল থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন পূর্ববঙ্গের চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবেই এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ ছাত্র-যুবক সমাজের মনে জেগে উঠেছিল।

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (চতুর্থ সম্মেলনে) ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত যে রাজনৈতিক রিপোর্ট উত্থাপিত হয় তাতেও এই স্বাধীনতা সম্পর্কে কর্মমহলে চিন্তাভাবনার পর্যালোচনা করা হয়। এ সম্পর্কে প্রবীণ দুই কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ ও অমল সেন দু'টি ভিন্ন সাক্ষাৎকার দেন। মণি সিংহ বলেন,

স্বাধীনতা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির এই সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হলো, এমনিতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। তার উপর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কমিউনিস্টদের উপরই ছিল খড়্গহস্ত। এ আমলে সবচেয়ে নির্যাতিত ছিল কমিউনিস্টরা। কিছু হলেই কমিউনিস্টদের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হতো। ফলে কমিউনিস্টরা এসব ব্যাপারে একটু সতর্ক ছিল।[২৯৩]

অমল সেন বলেন,

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ভাবিনি, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টি এতো দ্রুত আগাবে। তবে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, বিশ্বাসও ছিল। আসলে জনগণের মাঝে, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে, বিচ্ছিন্নভাবে এসব চিন্তা ছিল। তবে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরে খুব দ্রুতই জনগণ এটা গ্রহণ করে নেয়। এতো দ্রুত যে, সব কিছু ভাল করে বোঝার আগেই কেন্দ্রিকটা শুরু হয়ে যায়; এমনকি প্রস্তুতি ছাড়াই যুদ্ধ শুরু হয়।[২৯৪]

কিন্তু আওয়ামী লীগ-কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে, কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দলিলের মূল্যায়নের আলোকে শেখ মুজিবের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। অবশেষে শেখ মুজিব বিষয়টির 'অসময়োচিততা ও অপরিপক্কতার' যুক্তি মেনে নেন। এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন ছাড়াও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শ শেখ মুজিব গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[২৯৫]

বঙ্গবাহিনী

১৯৬২ সালেই ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার কিছু তরুণের সমন্বয়ে 'বঙ্গবাহিনী' নামে একটি পাঠচক্র গঠিত হয়। স্বাধীনতার সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য ক্যাডার সৃষ্টিই ছিল এর লক্ষ্য। বঙ্গবাহিনীর মূল সংগঠক ছিলেন–হারুন-উর-রশিদ এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন শেখ আলী আক্কাস, সৈয়দ কুতুবুর রহমান প্রমুখ। বঙ্গবাহিনীর সদস্যদের গড় বয়স ছিল ১৫ থেকে ১৬ বছর। মূলত স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরই এই পাঠচক্রে রিক্রুট করা হতো। ১৯৬২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবাহিনীর পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে ফুলের মালা দেওয়া হয়। মালাটির মাঝে লেখা ছিল 'ববা'। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গবাহিনীর নাম সংক্ষেপে 'ববা' লেখা হয়।[২৯৬]

অপূর্ব সংসদ

১৯৬২ সালে গোপনে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢাকার কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গঠিত হয় 'অপূর্ব সংসদ'। এটি ছিল 'অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার' এর 'সাংস্কৃতিক ছদ্মনাম'। সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা কেন্দ্রীয় বা প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন–আবদুল আজিজ বাগমার। সংগঠনের ঘোষণাপত্র, প্রচারপুস্তিকা ইত্যাদিতে কেবল 'অপু' কথাটি লেখা থাকত। সংগঠনের মনোগ্রামটি এঁকেছিলেন শিল্পী প্রাণেশ কুমার মণ্ডল। তাতে অন্যান্য প্রতীকের সঙ্গে ঠিক মাঝখানে পূর্ব বাংলার একটা মানচিত্র ছিল। বি এম আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন সংগঠনের কর্মবাহিনী ব্রিগেড নামে পরিচিত হতো। সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলীতে ছিলেন–সুফিয়া কামাল, ড. আহমদ শরীফ, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল হাই ও শওকত ওসমান। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে–ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ সরাসরি যুক্ত না থেকেও সংগঠনটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদের মতো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও সংগঠনটির অস্তিত্ব ও এর তৎপরতা সম্পর্কে জানতেন।

১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫ পাল পর্যন্ত তিন বছরে অপূর্ব সংসদ মোট তিনটি ইশতেহার প্রকাশ করে। ইশতেহারগুলো হলো–১. 'বাঙালি কি চায়? জবাব ছিল : স্বাধীনতা' (প্রকাশ : ২১ ডিসেম্বর ১৯৬৩), ২. 'শকুন শৃগালের আবার বাঙলা আক্রমণ'। এতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর হামলার প্রতিবাদে বাঙালিকে জেগে ওঠা ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়। (প্রকাশ : ১ জানুয়ারি ১৯৬৪), ৩. 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালী'। কী কী ঐতিহাসিক সামাজিক সাংস্কৃতিক আর্থিক কারণে বাঙালি স্বাধীনতা চায় তার বিবরণ।[২৯৭] (প্রকাশ : ১ অক্টোবর ১৯৬৫)। অপূর্ব সংসদের কর্মীদের অধিকাংশই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রলীগের বিভিন্ন সভা সম্মেলনকে অপূর্ব সংসদের কর্মীরা তাঁদের বক্তব্য প্রচারের ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করতেন। অপূর্ব সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ভবিষ্যতের জাতীয় সংগীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলা।[২৯৮]

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর মধ্যে স্পষ্ট ধারণা জন্মে বাঙালিদের ক্ষেত্রে পাকিস্তান একটি ঔপনিবেশিক ধাচের রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের মধ্যে যতদিন তারা আবদ্ধ থাকবে, ততদিনে তাদের মুক্তির লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। এ রাষ্ট্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে বাঙালিদের মুক্ত হওয়া আর 'নিজেরাই হবে নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা' এ লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকেন। ৬০-এর দশকের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠেন।[২৯৯] মুনতাসীর মামুন বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান সম্পর্কে *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন* গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করে বলেন,

> ১৯৪৮ সাল থেকেই বঙ্গবন্ধুর মনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট ধারণা ছিল। ক্রমে তা পরিণতি পায় ছয় দফা এবং আরো পরে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। এতো গেলো বাহ্যিক দিক। কিন্তু, স্বাধীনতা আনার জন্য আরো অনেক উপাচারের দরকার ছিল। এর একটি ছিল ভারতে সঙ্গে যোগাযোগ। অন্তরালের এই ঘটনাগুলি ... যা সাহস যুগিয়েছে বঙ্গবন্ধুকে শুধু স্বাধীনতা ঘোষণায় নয়, বাঙালিদের পাকিস্তান মানস পরিবর্তনে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ নিয়ে তিনি এগুতে থাকেন যে লক্ষ আর কোনো রাজনীতিবিদের ছিল না।[৩০০]

বাংলাদেশের একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি বাঙালির মুক্তির জন্য একইসঙ্গে গণতান্ত্রিক ও সশস্ত্র পন্থার কথা চিন্তা করেছিলেন। পাকিস্তানের কাঠামোয় বাস করে গণতান্ত্রিক পন্থায় সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। কিন্তু একইসঙ্গে এই বিশ্বাসও করতেন, পাকিস্তানিদের মতো বর্বররা কখনও গণতান্ত্রিক পন্থায় সমঝোতায় আসবে না। অন্তিমে সশস্ত্র পন্থাই হবে উত্তম।[৩০১] এ জন্যে তিনি ১৯৬২ সালেই প্রবাসী সরকার গঠন করতে চেয়েছিল।[৩০২] ভারতীয় শশাঙ্ক এস ব্যানার্জি *ইন্ডিয়া, মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ লিবারেশন অ্যাণ্ড পাকিস্তান* বইয়ে লেখেন, '১৯৬২ সালেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন।'[৩০৩] এ তথ্য মমিনুল হক খোকা *অস্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল : বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আমি* বইয়ে আগে দিয়েছেন কিন্তু স্পষ্ট বা

বিশদভাবে লেখেননি। ১৯৬২ সালের ২৪ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান, মানিক মিয়া ও শশাঙ্ক এস ব্যানার্জির *ইত্তেফাক* অফিসে একটা মিটিং হয়। শেখ মুজিবুর রহমান মিটিং শেষে শশাঙ্ক ব্যানার্জির মাধ্যমে সরাসরি চিঠি লিখেছিলেন জওহরলাল নেহরুকে। এই চিঠির খসড়া তৈরিতে মানিক মিয়া সাহায্য করেছেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল–

> পূর্ব পাকিস্তানকে পাঞ্জাবি মুসলমানদের চরম শোষণ ও রাওয়ালপিন্ডির সামরিক স্বৈরাচারী শাসন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং বাঙালীদের জন্য গঠন করতে হবে একটি স্বাধীন আবাসভূমি। এজন্য শেখ মুজিব চলে যাবেন লন্ডন এবং সেখানে ঘাঁটি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। এজন্য তিনি একটি রোডম্যাপও তৈরি করেছিলেন। রোড ম্যাপটি ছিল–
>
> ১. মুজিব চলে যাবেন লন্ডন
>
> ২. মানিক মিয়া থাকবেন ঢাকায়। তিনি নিয়মিত স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও দাবি নিয়ে *দৈনিক ইত্তেফাকে* লিখবেন।
>
> ৩. মুজিব লন্ডন থেকে ১৯৬৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অথবা ১ মার্চের ভেতর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে লন্ডনে প্রবাসী সরকার গঠন করবেন।
>
> ৪. পণ্ডিত নেহরু এই সংগ্রামে নৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, কৌশলগত ও পার্থিব সাহায্য প্রদান করবেন।[৩০৪]

শেখ মুজিবুর রহমান নেহরুকে দেওয়া চিঠির শেষে এই সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তিনি চাইলে শেখ মুজিব দিল্লী গিয়ে আনন্দের সঙ্গে বিষয়টি খোলাসা করবেন।[৩০৫] ঢাকায় নিযুক্ত ডেপুটি হাইকমিশনার সূর্য কুমার চৌধুরী, ঢাকায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার স্থানীয় প্রধান কর্নেল এস সি ঘোষ এবং শশাঙ্ক এস ব্যানার্জি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর তা দিল্লীতে প্রেরণ করে। উত্তর দিতে দেরি হওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান ত্রিপুরার শচীন্দ্র লাল সিংহের মাধ্যমে আবার যোগাযোগ করেন।[৩০৬] জওহরলাল নেহরু শেখ মুজিবের প্রস্তাবে শুধু রাজিই হননি, অদূর ভবিষ্যতে কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। ব্যানার্জি এটিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক বলে উল্লেখ করেছেন। ভারত পরামর্শ দিয়েছিল শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার পথযাত্রায় তাড়াহুড়ো না করতে। কেননা তাতে পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে। লন্ডন যাত্রায় কোনো লাভ হবে না। অপারেশনাল বেজে নেতৃত্ব না থাকলে তা কার্যকর হবে না। মুজিবকে সবসময় দৃঢ়ভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এই বলে যে, তিনি যখন গণতন্ত্রের কথা বলছেন তখন সেই গণতন্ত্র চেতনা তৃণমূলে বিকশিত করতে হবে। স্বাধীনতার পথ কণ্টকাকীর্ণ। এই পথ অতিক্রম করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এবং এই পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমেই তাঁর নেতৃত্ব পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছিল, যখন তাঁর বক্তৃতা শুনতে লাখ লোকের আগমন হবে তখনই বিশ্ব স্বীকার করে নেবে তিনি গণমানুষের নেতা।[৩০৭] ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা আরেকটি বিষয়ে কথা ভাবছিলেন, তা হলো অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।[৩০৮] এ সম্পর্কে মুনতাসীর মামুন বলেন,

> মুজিব এরপরই ৬ দফা প্রণয়ন করে প্রচারে বের হয়ে বাঙালিদের হৃদয় হরণ করেছিলেন। আর তাঁর বক্তৃতা? যে শোনেনি তাকে তা বোঝানো যাবে না। ৭ মার্চের বক্তৃতার কথা ধরুন। সারা বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছিল তিনিই বাঙালির নেতা। ১৯৭০ সালের মধ্যে তিনি আওয়ামী লীগকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছিলেন। মার্চ, ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং ৭ মার্চের বক্তৃতায় বলেছিলেন, অন্তিম যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে।[৩০৯]

নিউক্লিয়াস গঠন

১৯৬২ সালের পর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তরুণদের নিয়ে গোপন নিউক্লিয়াস গঠন হয়। আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ প্রমুখ ছিলেন এর সদস্য।[৩১০] ১৯৬২ সাল থেকেই পূর্ববাংলা স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। কাজী আরেফ বলেন, 'এই লক্ষ্যে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন।' সংগঠনের তিন সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস গঠিত হয় যাতে আরেফ ছাড়াও ছিলেন আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান। আরেফ তারপর ছাত্রলীগের কেন্দ্রে একটি 'ছায়া নিউক্লিয়াস' গঠন করেন। পরে প্রত্যেক জেলায় এর শাখা গঠিত হয়। সবকিছুরই উদ্দেশ্য ছিল, জাতীয়তাবাদী চেতনার উজ্জীবন।[৩১১] গ্রুপটির অস্তিত্ব বা তৎপরতা সম্পর্কে সংগঠনের ও বাইরের অন্যদের অন্ধকারে থাকার

একটি কারণ হলো তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হতো কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে। গোষ্ঠীভুক্তির ব্যাপারে আবদুর রাজ্জাক জানান এই দলের সদস্য হওয়ার জন্য 'রক্তশপথ' (অর্থাৎ আঙুল কেটে রক্ত ছুয়ে শপথ) নেওয়ার নিয়ম ছিল। শেখ মুজিবের 'অনুমতিক্রমে'ই সেলের এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়।[৩১২] আরেফ লিখেছেন, ১৯৬৫ সালে আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে এই নিউক্লিয়াসের সঙ্গে শেখ মুজিবের যোগাযোগ হয়।[৩১৩] সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে নিউক্লিয়াস স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেয় ও দলের সাথে নিজেদের আত্মস্থ করে। এরা বরাবরই ছিল দলের ভিতর একটি সুস্পষ্ট, সচেতন ও স্বাধীন 'নিউক্লিয়াস'। আওয়ামী লীগ ছিল জাতীয়তাবাদী দল আর শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই এরা আওয়ামী লীগে যোগ দেয়।[৩১৪] স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছাত্র ও শ্রমিকদের সংগঠিত করার পাশাপাশি তাঁরা ৬-দফার পক্ষেও প্রচার চালান বলে আবদুর রাজ্জাক তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফাকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাঁকো হিসেবে অবহিত করেন।[৩১৫] এছাড়াও '৬৬ সাল থেকে আরও একটি ফোরাম কার্যকরী ছিল। তার সদস্য ছিলেন কামরুদ্দিন আহমেদ, ব্যারিস্টার আহাদ ও আবদুর রাজ্জাক। এই ফোরাম স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের জন্য বুকলেট, লিফলেট ও লিটারেচার লেখা ও ছাপানো এবং আর্থিক সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করতো।[৩১৬] ১৯৬৯ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু গ্রুপের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। তারা গ্রুপের ২০০ সংসদীয় আসনে সফলভাবে কমিটি গঠনের কথা জানান।[৩১৭] ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সময় ছাত্রলীগ কতগুলো স্লোগানকে সামনে নিয়ে আসে–'তোমার-আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', পিন্ডি না ঢাকা ঢাকা ঢাকা', 'জাগো-জাগো বাঙালি জাগো', 'তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি' প্রভৃতি। এই স্লোগানগুলো উদ্ভাবন, প্রচলন ও জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে 'নিউক্লিয়াস' বা ছাত্রলীগের স্বাধীনতা গ্রুপের মুখ্য বা একটি বড়ো ভূমিকা ছিল।[৩১৮]

সমাজতন্ত্রের প্রতি এই গ্রুপটির অঙ্গীকারের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের ২১ আগস্ট ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্বপন চৌধুরী কর্তৃক 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্য দিয়ে। স্বপন চৌধুরী ছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে 'স্বাধীনতা গ্রুপে'র মুখপত্র। রাতে প্রস্তাবটি নিয়ে তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে তিনি তাঁর প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি দাবি করেন। ৬২ সদস্যের কমিটির মধ্যে সেদিনের সভায় মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীসহ মাত্র ১৩ জন ছিলেন প্রস্তাবটির বিপক্ষে। এ অবস্থায় সভাপতি সভা মুলতুবি করে সবাইকে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলার জন্য ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন।[৩১৯] কিন্তু সেখানে গিয়েও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাব

১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তনের বিরোধিতা করে পাকিস্তানের গণপরিষদে বক্তৃতা করেন। তিনি স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> স্যার আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকবেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য।[৩২০]

মওলানা ভাসানী ১৯৫৬ সাল থেকেই নানা সুযোগে পূর্ববাংলার পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলে আসছিলেন। সমাজের বৃহৎ অংশে অবশ্য তা ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করতে পারেন নি। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হলে এ-অঞ্চলের তরুণদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। সে-সময় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে 'ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট' সহ একাধিক সংগঠনের ন্যূনাধিক ৩৩টি পোস্টার পড়েছিল পূর্ববাংলার স্বাধীনতার দাবি করে। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে 'জাতীয় স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার একটি অস্পষ্ট ও কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা... সঞ্জীবনী শক্তির কাজ করছিল। ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় থেকে বুদ্ধিজীবী ছাত্র ও তরুণ রাজনৈতিক কর্মীরা এ-সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। সে-বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কামালুদ্দিন আহমদ 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম'[৩২১] নামক পুস্তকে

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববাংলা কায়েম করার আহ্বান জানান। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় ছাত্রদের মিছিলের একটি স্লোগান ছিল 'সব কথার শেষ কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা'। জাতীয় মুজাহিদ সংঘ ১৯৬৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সভাসমিতি অনুষ্ঠান ও পুস্তিকা-প্রচারপত্র প্রকাশের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন 'স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী সাম্যবাদী' পূর্বপাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত সংগঠন করতে থাকে। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আতাউর রহমান খান নতুন দল গঠনের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তী ৫ই ডিসেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলা' নামকরণের দাবি জানান। তাঁর দাবি বিভিন্ন স্তরের জনগণ সমর্থন করে।[৩২২] ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রশক্তি ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (মুজাহিদী গ্রুপ) তাদের নাম বদলে রাখে যথাক্রমে পূর্ববাংলা ছাত্রশক্তি ও বাংলা ছাত্রলীগ।[৩২৩] ১৮ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের নাম 'বাংলাদেশ' করার দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মিছিল স্লোগান দেওয়া হয়–

তোমার দেশ আমার দেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।[৩২৪]

বাংলা ছাত্রলীগ কর্তৃক ১৯৬৯ সালের একুশে ডিসেম্বর বাংলা দাবির প্রতীক হিসেবে 'আবহমান বাংলা' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন হয়।[৩২৫] ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে সাবেক প্রদেশগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে, তখন অনেকেই বলেছিলেন যে, আমাদের প্রদেশের পূর্ব বাংলা নাম ফিরিয়ে আনতে হবে। কেউ কেউ বললেন, পশ্চিম পাঞ্জাবকে পাঞ্জাব বলা হবে, তা হলে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলা বলা হোক। ১৯৭০-এর জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমরা দাবি করছি, এ প্রদেশের নাম হবে বাংলাদেশ।'[৩২৬] ছাত্রশক্তি ১৯৭০ সালের ৭ জানুয়ারি 'মৃত্যুহীন বাঙ্গালী জাতিকে তার গৌরবোজ্জ্বল বাংলা' নামে পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 'বাংলা' দিবস পালন করে এবং পরদিন 'জাগ্রত বাংলা' নামক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। পরবর্তী সময়ে ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মেমন গ্রুপ) সভাপতি মাহবুব উল্লাহ পল্টন ময়দানের জনসমাবেশে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে পূর্ববাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের ১১ দফা কর্মসূচি উপস্থাপিত করেন। এর জন্য তিনি পরে সামরিক আদালতে দণ্ডিত হন।

ছাত্রদের সাথে আসেন রাজনীতিবিদেরা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন চাকরি থেকে অবসর নেন ১৮ মার্চ, ১৯৭০ সালে এবং এর পর থেকে 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি' স্থাপন করে কাজ শুরু করেন।[৩২৭] কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়ার তিনি বিরোধিতা করেন। ১৯৭০ সালের ২ অক্টোবর মওলানা ভাসানী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যে-গণজমায়েতের আয়োজন করেছিলেন সেখানে, 'কমুনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি'র পক্ষ থেকে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা' কায়েমের আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এবং কিছুদিনের মধ্যে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা'র বিস্তৃত রূপরেখাও পেশ করা হয়। ঐ-সময় সারাদেশে প্রবল নির্বাচনি প্রচার চলছিল কিন্তু ১২ নভেম্বরের মহাপ্লাবনের বর্ণনাতীত ধ্বংস এবং দুর্গতদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অপরিসীম ঔদাসীন্য দেখে মওলানা ভাসানী নির্বাচনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসমাবেশে 'পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও পাকিস্তানের সংহতি 'বোগাস' বলে ধ্বনি তোলেন। আরও কয়টি দল নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ত্রাণকার্যের জন্য পূর্ববাংলায় বিদেশি সৈন্যের অব্যাহত আগমনের প্রতিবাদে ৪ ডিসেম্বর ঢাকায় জনসভার আয়োজন করে। সেখানে ন্যাপের পক্ষ থেকে মওলানা ভাসানী, জাতীয় লীগের পক্ষ থেকে আতাউর রহমান খান ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের পক্ষ থেকে পীর মোহসেনউদ্দীন বক্তৃতা দেন। সভায় লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী 'সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের পক্ষে বক্তৃতা করা ও প্রস্তাব নেওয়া হয়। কদিন পরে মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার পক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।[৩২৮] এ সময় ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মারাত্মক পরিণামের খবর দিয়ে সংবাদপত্রে ব্যানার হেডিং লেখা হয়েছিল : 'কাঁদো বাঙালি, কাঁদো'।[৩২৯] ১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারি তাঁর সন্তোষের বাসভবনে আহূত বিভিন্ন

রাজনৈতিক দলের জাতীয় সম্মেলনে আতাউর রহমান খান, পীর মোহসেনউদ্দীন ও লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন অংশগ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত লক্ষ্যে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য মর্যাদা দেওয়া; সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণমুক্ত কৃষকরাজ কায়েম করা; সকল প্রকার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় সামাজিকীকরণ ও দেশে প্রস্তুত সকল পণ্যের বিকল্প বর্জন।[৩৩০]

এভাবে স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের পক্ষে ক্রমশ জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। ১৯৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান 'স্বাধীন ও সার্বভৌম' বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পয়লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অংশ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার দাবি উঠতে শুরু হয় এবং পরদিন, দোসরা মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। সভায় পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে 'বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত' স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। সেদিনই 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঘোষণায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের তিনটি লক্ষ্য নির্দেশিত হয়–

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা;
২. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েমের ব্যবস্থা;
৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কায়েম করা।[৩৩১]

ইশতেহারে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের 'সর্বাধিনায়ক' বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া গ্রামে-গ্রামে, মহল্লায়-মহল্লায় মুক্তিবাহিনী গঠন করা এবং পাকিস্তানি সৈন্যকে বিদেশি হানাদার হিসেবে গণ্য করে তাদের খতম করার আহ্বান জানানো হয়। ৩রা মার্চ থেকে আওয়ামী লীগের নির্দেশে সারা প্রদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসমাবেশে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন এবং এ-সংগ্রামকে 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তির' সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। তখন থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-শ্রমিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সরকারি চাকুরে, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক-ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রাখতে শুরু করে। ২৩ মার্চ-পাকিস্তান দিবসে-পূর্ববাংলার সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর বাসভবনে তোলেন। পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যের আক্রমণ শুরু হলে বাঙালিদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়।[৩৩২]

বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ছিল তিনটি ধারায়–প্রথমত : সমাজতান্ত্রিক ধারা, দ্বিতীয়ত : উদার মানবতাবাদী ধারা ও তৃতীয়ত : স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা।

প্রথম ধারা হলো সমাজতান্ত্রিক ধারা। এ ধারার প্রস্তাবগুলো ছিল মূলত কাগজে-কলমে। জনগণের কোনো সম্পর্ক এর সাথে ছিল না। ফলে তা জনগণের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি।

দ্বিতীয় ধারা হলো উদার মানবতাবাদী ধারা। এ ধারার নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণের মুক্তির জন্য এ ধারার কর্মীরা অগ্রসর হয়।

তৃতীয় ধারা হলো স্বাতন্ত্র্যবাদী। এরা চায় নি দেশ স্বাধীন হোক। তারা সামন্ত ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে নিজেদের শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল। এই ধারার মধ্যে ছিল–জামাত, মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সমার্থক।

পাকিস্তান সরকার ও পূর্ববঙ্গের জনগণের মধ্যে ভাষা, হরফ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রকাশভঙ্গি নিয়ে বিরোধ লেগেই থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে ঢাকায় একটি সাংস্কৃতিক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ গঠিত হয়। ততদিনে শেখ মুজিবুর রহমান 'ছয় দফা' কর্মসূচি উপস্থাপন করেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার হয়ে উঠেছে সময়ের দাবি।[৩৩৩] প্রাচীনকাল থেকে

বাংলাকে বিভিন্ন সময় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং তারই একটি অংশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তা পরিণত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে।[৩৩৪] আত্মনিয়ন্ত্রণের যে চেষ্টা তা বাস্তবায়িত হয় এবং বাঙালির আত্মপরিচয়ের যে সংকট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা দূরীভূত হয়। এখানে ভাষা ও অঞ্চলের অভূতপূর্ব মিলন ঘটল।[৩৩৫]

উপসংহার : বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিস্ফুটিত অবস্থায় ছিল না, ছিল বিকাশমান। এই বিকাশের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নতুন কিছু দিক তার মধ্যে রয়েছে–কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী। সমাজে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে এবং তার দ্বারা সমাজ প্রভাবিত হচ্ছে। জাতীয়তাবাদের বিকাশের এই পর্যায়ে সমাজের সর্বস্তরের ভূমিকা বাড়তে থাকে। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র ও কাল মূলত বিশশতকের ৬০-এর দশক। ৬০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যায়। ষাটের দশকের রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো হলো ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-এর ছয়দফা, ৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও সত্তরের নির্বাচন। উপর্যুক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোকে কীভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও সংবাদপত্র প্রভাবিত করেছে তা মূলত তুলে ধরা হয়েছে।

৬০-এর দশকে বুদ্ধিবৃত্তিক একটা পরিবর্তন হয়। এ সময় পুরো পৃথিবীতেই একটা পরির্বতন হচ্ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি হলো উদার নৈতিকতা ও মানবতাবাদী দর্শন। এ সময় উদারনীতি বা লিবারালিজম এর সূচনা হচ্ছে দেশে দেশে। একইসাথে তা আমাদের দেশে দেখা যায়। ৬০-এর দশকে বাম রাজনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। ছাত্ররা বাম রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের দাবি দাওয়াগুলো তুলে ধরছেন। কিন্তু অন্যদিকে আওয়ামী লীগ অনুসরণ করেছে মধ্যপন্থা। এ সময়ে বাম ছাত্র রাজনীতি ও মধ্যপন্থার রাজনীতি সবকিছু একটি জায়গায় এসে উপনীত হয় তা হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বামপন্থি ও মধ্যপন্থিরা মিলে যা করছে তা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করে তুলছে এবং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মোটকথা পাকিস্তানিবাদ ও বাঙালিত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঙালিত্বের জয় হয়। বাঙালিত্বের মূল অনুষঙ্গগুলো হলো–বাঙালি ঐতিহ্য, দ্রোহের প্রবণতা ও সমন্বয়বাদ। মূলত কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পূর্ববাংলার জনগণের ঐক্য ও চেতনাকে বাঙালিত্ব বিকাশে সহয়তা দান করে। এগুলো হচ্ছে–বাংলা ভাষা, একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতিসত্তা। এগুলো বাঙালিত্বের শক্তিশালী স্তম্ভ। ৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আত্মদান শুধু একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে উর্দুকে চাপিয়ে দিতেই বাধা দেয় নি, আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অনাবশ্যকভাবে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি, এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাঙালি সংস্কৃতির বিভাজন প্রভৃতি সরকারি উদ্যোগকেও সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করেছিল। পাকিস্তানি শাসকদের আঘাতে আঘাতে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত আত্মপরিচয় সম্পর্কে বাঙালি ক্রমে সচেতন হয়েছে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ততই ঘটেছে। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েই শুধু এ-ভাবধারা পুষ্ট হয় নি। বাংলা নববর্ষ-উদ্‌যাপন, ঋতু-উৎসব-পালন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যত বেশি সরকারি বাধা এসেছে, রোমান হরফে বাংলা লেখার কিংবা বাংলা বর্ণমালা-সংস্কারে উদ্যোগ নিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে আমাদের যত দূরে সরাবার চেষ্টা হয়েছে, ততই আমরা নিজেদের বাঙালিত্বকে সজোরে আঁকড়ে ধরেছি।[৩৩৬] মোটকথায় এ সবের মিথষ্ক্রিয়া বাঙালিত্ব এবং এগুলোর সংমিশ্রণে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন, যার ফল বাঙালির রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া। বাঙালিত্বের এই চেতনার সঙ্গে জড়িত ছিল–অসাম্প্রদায়িকতা।[৩৩৭] অন্যদিকে পাকিস্তানিবাদের মূল অনুষঙ্গ ছিল হলো–ধর্মের ব্যবহার। ধর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইতো। এজন্য বাঙালি যেন জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নিজেদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যেত। তারা সবথেকে বড়ো প্রমাণ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর রামমোহন রায় লাইব্রেরিতে আগুন দেওয়া।[৩৩৮] এই দুটোর দ্বন্দ্বে বাঙালিত্বের জয় হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলো বাঙালিত্বের চূড়ান্ত সফলতার প্রমাণ। বাঙালি বুদ্ধিজীবী এস. ওয়াজেদ আলী বলেন,

বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, দেশ কিম্বা জাতি যখন কাম্যতর, উচ্চতর কোন জীবনের জন্য সত্যই প্রস্তুত হয়, তখন কোন ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষ, ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট কোন এক মহামানব (man of destiny) জাতির সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে আবিভূত হন এবং এসবকে ব্যক্ত এবং রূপায়িত ক'রে তোলেন।[৩৩৯]

তিনি আরও বলেন, 'এ আমি অন্তরচক্ষে যেন দেখতে পাচ্ছি; আর লক্ষ্য করছি সেই অনাগত কালোপযোগী যুগমানবের আবির্ভাব।'[৩৪০] বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সেই কাম্য ব্যক্তি হলেন–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার হাত ধরে হাজার বছরে ইতিহাসে বাঙালি দেশের জন্য অর্জন করেছিল। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে অন্তিমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকাভাষ্য

---

[১] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫

[২] *প্রাগুক্ত*

[৩] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১১, পৃ. অবতরণিকা

[৪] *প্রাগুক্ত*

[৫] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯৭

[৬] মুনতাসীর মামুন *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ* গ্রন্থ আলোচনা বাঙালির চরিত্রের এ তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন।*

*মুনতাসীর মামুন (বক্তৃতা), '১৮৮তম মাঘোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ* গ্রন্থ আলোচনা-২০১৮', বাংলাদেশ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা, ২০ জানুয়ারি ২০১৮

[৭] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২২

[৮] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫৭-৫৮

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[১০] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, জার্নিম্যান বুক্‌স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৬৭

[১১] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৪

[১২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

[১৩] এস ওয়াজেদ আলী, *আকবরের রাষ্ট্র সাধনা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, নবযুগ সংস্করণ ২০১৮, পৃ. ১০৪

[১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

[১৫] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১০৬

[১৬] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৮৭-১৮৮

[১৭] 'চন্দ্র ঘোষকে নিরাপত্তা আইনি বন্দি করা হয়। তিনি কোনোদিন রাজনীতি করেন নাই। তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমায় অনেক স্কুল করেছেন। কাশিয়ানী থানার রামদিয়া গ্রামে একটা ডিগ্রি কলেজ করেছেন। অনেক খাল কেটেছেন, রাস্তা করেছেন।'*

*শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮-১০৯

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৬

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

[২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সংকট পথ প্রশস্ত করেছিল দু'টি রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টিতে, যে দু'টি সংগঠন অচিরেই পূর্ববঙ্গের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। এ দু'টি দল হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ–যা গঠিত হয় ১৯৪৯

সালে এবং কে এস পি–যা গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক। কে এস পির নেতা ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। নব গঠিত দল দু'টি সহজেই পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের বৈষম্য তুলে ধরতে পেরেছিল।*

* মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫-৬

[২৭] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

[২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩

[২৯] পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।*

*তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪৩-৪৪

[৩০] আহম্মেদ শরীফ, *বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৭-৪৯; মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫-৬

[৩১] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

[৩২] *প্রাগুক্ত*

[৩৩] পাঞ্জাব ভাগ হলো, সেখানে নির্বাচনের প্রশ্ন আসল না। নবাব মামদোত পূর্ব পাঞ্জাবের লোক হয়েও পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হলেন। লিয়াকত আলী খান ভারতবর্ষের লোক হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ব্যতিক্রম ঘটলো সোহ্‌রাওয়ার্দীর বেলায়।

[৩৪] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫৯

[৩৫] আহম্মেদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[৩৬] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৭

[৩৭] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫

[৩৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১৫১

[৩৯] মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান বলতে সমাজ ব্যবস্থার সেই উপাদানগুলোকেই নির্দেশ করো হচ্ছে যার ওপর নির্ভর করে একটি জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্ব।

[৪০] প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত সেই বৈশিষ্ট্যগুলো, যেগুলোর প্রকৃতি শোষণমূলক প্রক্রিয়ার কারণে বিকৃত হলে হয়তো একটি জনগোষ্ঠী অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না, কিন্তু চেতনালোক হবে বিক্ষুব্ধ।

[৪১] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা : তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০,পৃ. ১৪

[৪২] *প্রাগুক্ত*

[৪৩] *প্রাগুক্ত*

[৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫

[৪৫] এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*, অবসর, ঢাকা, ২০১৩, ভূমিকা, পৃ. নয়

[৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. নয়-দশ

[৪৭] শহীদুল্লাহ মৃধা, *মহাস্থবির শীলভদ্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৩-৪৫; ভবেষ রায়, *হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ শত বাঙালি মনীষীর কথা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৩

[৪৮] রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শন : প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, সুরভী পাবলিকেশন, নরসিংদী, ২০১৬, পৃ. ১১৪

[৪৯] মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, 'শীলভদ্র : সপ্তম শতকের জগদ্বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ জুলাই ২০১৮

[৫০] এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. দশ

[৫১] *প্রাগুক্ত*

[৫২] হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন!
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
... ...
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,

... ...

'...যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে'

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে

মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥*

*এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. এগারো

[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪

[৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

[৫৫] *প্রাগুক্ত*

[৫৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭-১৯৮

[৫৭] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন*, ডানা প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২০

[৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬-৭

[৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

[৬০] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

[৬১] *প্রাগুক্ত*

[৬২] মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী-প্রভাব*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫

[৬৩] রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শন : প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

[৬৪] *প্রাগুক্ত*

[৬৫] মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী-প্রভাব*, *প্রাগুক্ত*

[৬৬] *বাংলাপিডিয়া*

[৬৭] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

[৬৮] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[৬৯] *প্রাগুক্ত*

[৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

[৭১] *প্রাগুক্ত*

[৭২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০

[৭৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

[৭৪] জওশন আরা জলি, 'মানবতাবাদী দার্শনিক ধারা ও বাঙালি মানস', *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, সংখ্যা ২৩, রাজশাহী, ২০১৬, পৃ. ১৫২

[৭৫] এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮

[৭৬] *প্রাগুক্ত*

[৭৭] রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শন : প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

[৭৮] এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

[৭৯] মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *বাংলাদেশ-দর্শন*, মিতা ট্রেডার্স, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪, পৃ. ৮

[৮০] *বাংলাপিডিয়া*

[৮১] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৯

[৮২] আমিনুল ইসলাম, 'বাঙালির দর্শন', শরীফ হারুন (সম্পা.), *বাংলাদেশে দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ.৭৬-৭৭

[৮৩] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

[৮৪] রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শন : প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

[৮৫] আজিজুর রহমান মল্লিক, 'বাংলা একাডেমীর ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ, ১৯৮৩', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *বাঙালির আত্মপরিচয়*, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৯০

[৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

[৮৭] রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শন : প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

[৮৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
[৮৯] এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩
[৯০] বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, 'শিল্পী এস. এম. সুলতান : বাঙালিত্বের চেতনাধারী চিত্র লেখক', *আইবিএস জার্নাল*, অষ্টাদশ সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ২০১১, পৃ. ১৪৫-১৪৬
[৯১] যতীন সরকার, *আমাদের চিন্তাচর্চার দিক্-দিগন্ত*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৮-৫৯
[৯২] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২
[৯৪] 'ভারতের দুই জাতির স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন একটা কৃত্রিম ব্যাপার নয়। এই আন্দোলনের ভিত্তি কেবল দুই জাতির শিক্ষা ও তমদ্দুনে নয়, ইহার ভিত্তিমূল দুই জাতির দুই বিশাল সাহিত্যিক ভাবাদর্শের ধারার সাথে সংযুক্ত। কৃত্রিম ও বিশাল এই দুই ভাবধারার প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যিক প্রতিভামাত্র। এ কথা প্রসঙ্গত স্বীকার্য যে, আজ ভারতের রাজনৈতিক জীবনের চিন্তাধারার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আরও অনেক নবাগত ভাব ও শক্তির ক্রিয়া অনুভূত হইতেছে। কিন্তু ব্যাপকতার দিক থেকে বঙ্কিম ও ইকবালের আদর্শানুসারীর প্রভাবই সর্বাগ্রগণ্য।'–(পাকিস্তান, মুজীবুর রহমান খাঁ, পৃ. ৭)*

*বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

[৯৫] 'বাস্তবপন্থী রাজনীতিক আজ স্বীকার করে নিচ্ছে–সুপ্রাচীন 'হিন্দু' আর 'মুসলমান'-এর মিলন এবং সমন্বয় সত্য নয়–সম্ভবও নয়। হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মীয় দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুসলমান একেশ্বরবাদী, হিন্দু বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। মুসলমানের ধর্মবাণীর মূল কথা বিশ্বভ্রাতৃত্ব, হিন্দু মনোভাবের গোড়ায় রয়েছে জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য। ...হিন্দু মুসলমানের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, ব্যক্তিগত আইন, কৃষি-সংস্কৃতি, তাহজীব-তমদ্দুন, জাতীয় গ্রন্থ, জাতীয় আদর্শ খুবই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সমন্বয়ের চেষ্টা, প্রতিক্রিয়া হয়েছে তত বেশি করে। সংস্কারক যখনই চেষ্টা করেছেন সমন্বয়ের তখনি সৃষ্টি হয়েছে নূতন আর একটি মতের। ... হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ শুধু ধর্মীয় বিরোধ নয়। একইসঙ্গে এ হচ্ছে ঐতিহাসিক বিরোধ–অর্থনৈতিক বিরোধ সাংস্কৃতিক বিরোধ।'–(পাকিস্তান, হাবীবুল্লাহ বাহার, পৃ. ৪৯)

'ভারতের ইতিহাসের গৌরব বা কলঙ্ক যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে সমানভাবে অনুভব করে তা অপ্রিয় হলেও কঠোর ও নির্মম সত্য। ভারতীয় ইতিহাসের যে অধ্যায় মুসলমানের নিকট গৌরবোজ্জ্বল, হিন্দুরা সেটাকেই তাদের জাতীয় কলঙ্ক বলে মনে করে থাকে। ইতিহাসে যে অংশ নিয়ে হিন্দুরা গর্ব অনুভব করে, মুসলমানেরা সেটাকে জাতীয় কলঙ্ক বলে মনে না করলেও তাতে গর্ব করার কিছু পায় না। ইতিহাসে যাঁরা মুসলমানের নিকট বীর ও আদর্শ শাসক বলে সম্মানিত হয়ে থাকেন হিন্দুরা তাঁদেরকেই অত্যাচারী নিষ্ঠুর বলে মনে করে থাকে। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস যে এক নয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারা যায় না।'–(সর্বহারাদের পাকিস্তান, তালেবুর রহমান, পৃ. ১২)*২

*২ *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩

[৯৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫
[৯৭] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[৯৮] আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষাআন্দোলন স্বাধীনতা*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৮৪
[৯৯] হাসান মোহাম্মদ, *জাতীয়তাবাদ : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃ. ১৭
[১০০] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বর্ষে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ২৪
[১০১] শিবনারায়ণ রায়, *বাঙালিত্বে খোঁজে এবং অন্যান্য আলোচনা*, দে'জ পাবালিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৬৩
[১০২] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[১০৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১
[১০৪] আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*, মহাকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৫
[১০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
[১০৬] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[১০৭] শিবনারায়ণ রায়, *বাঙালিত্বে খোঁজে এবং অন্যান্য আলোচনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪
[১০৮] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

[১০৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬
[১১০] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৪
[১১১] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১
[১১২] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
[১১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬; মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[১১৪] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪
[১১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[১১৬] শিবনারায়ণ রায়, *বাঙালিত্বের খোঁজে এবং অন্যান্য আলোচনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০
[১১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[১১৮] *প্রাগুক্ত*
[১১৯] *প্রাগুক্ত*
[১২০] *প্রাগুক্ত*
[১২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০
[১২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১
[১২৩] আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭
[১২৪] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[১২৫] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
[১২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
[১২৭] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[১২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[১২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[১৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[১৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫২
[১৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
[১৩৩] কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রথমা সংস্করণ ২০১৮, পৃ. ৯৫
[১৩৪] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৩
[১৩৫] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
[১৩৬] হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১
[১৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২
[১৩৮] বখতিয়ার খলজী যখন নদীয়া আক্রমণ করেন তখন লক্ষ্মণসেন নদীয়ায় অবস্থান করছিল। তাই ঐতিহাসিক মিনহাজ 'নদীয়া' কে সেন রাজাদের রাজধানী বলেন। কিন্তু সেনযুগের তাম্রশাসনসমূহে একথা স্পষ্ট যে তাদের রাজধানী ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর।*
* আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ. ১৩৪
[১৩৯] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
[১৪০] *প্রাগুক্ত*
[১৪১] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩
[১৪২] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[১৪৩] *প্রাগুক্ত*
[১৪৪] হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. সম্পাদকের ভূমিকা : আট
[১৪৫] অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০
[১৪৬] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩
[১৪৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩
[১৪৮] *প্রাগুক্ত*
[১৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[১৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
[১৫১] *প্রাগুক্ত*

[১৫২] *প্রাগুক্ত*
[১৫৩] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[১৫৪] ১৯৭১ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। একইসাথে তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর জীবনের প্রথম দিকের প্রকাশিত নামকরা উপন্যাস গ্রন্থ 'কিনু গোয়ালার গলি'।
[১৫৫] আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, *আমরা বাংলাদেশী*, *না বাঙালি*, অক্ষরবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯
[১৫৬] মুনতাসীর মামুনের বঙ্গীয় সাহিত্য পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত 'আনন্দ অনুষ্ঠানে' বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।
[১৫৭] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (প্রথম খণ্ড)*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. চার
[১৫৮] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৮২
[১৫৯] এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২
[১৬০] সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাঙলাদেশ', মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৭
[১৬১] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
[১৬২] শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যয়, *বাঙলা ও বাঙালী*, পাটনা, ১৯৯০, পৃ. ২
[১৬৩] আনিসুর রহমান (সম্পা.), *চর্যাপদ*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সংগ্রহ) ও অতীন্দ্র মজুমদার (অনু.), জ্ঞানের আলো, ঢাকা, পৃ. ৬৪
সফিউদ্দিন আহমদ, *সাহিত্যের সেকাল ও একাল*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৭৫৭
[১৬৪] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব', মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪
[১৬৫] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
[১৬৬] রাজিয়া সুলতানা (সম্পা.), *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪২৭
[১৬৭] ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার মুসলমানের আত্মপরিচয় (মধ্যযুগ)', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *বাঙালির আত্মপরিচয়*, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১০১-১০২
[১৬৮] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
[১৬৯] শামসুজ্জামান খান, 'বাংলা, বাঙালিত্ব : বাঙালি মুসলমানদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রসাধনা', *মাস্টারদা সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতা-২০১৬*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭
[১৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭
[১৭১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
[১৭২] *প্রাগুক্ত*
[১৭৩] ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার মুসলমানের আত্মপরিচয় (মধ্যযুগ)', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *বাঙালির আত্মপরিচয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
[১৭৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
[১৭৫] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 'কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ–১৯৫২, আগস্ট ২২', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *বাঙালির আত্মপরিচয়*, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৮৬; শামসুজ্জামান খান, 'বাংলা, বাঙালিত্ব: বাঙালি মুসলমানদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রসাধনা', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
[১৭৬] ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার মুসলমানের আত্মপরিচয় (মধ্যযুগ)', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *বাঙালির আত্মপরিচয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
[১৭৭] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[১৭৮] শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, *শরৎ সাহিত্য সমগ্র*, *ভলিউম ১*, সুকুমার সেন (সংকলন), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৩ বাংলা, পৃ. ২৬৮; গোলাম মুরশিদ, *বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৬০; শামসুজ্জামান খান, 'বাংলা, বাঙালিত্ব : বাঙালি মুসলমানদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রসাধনা', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
[১৭৯] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০
[১৮০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[১৮১] মৌলভী ইয়াকুবুদ্দীন, রফিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২
[১৮২] শামসুজ্জামান খান, 'বাংলা, বাঙালিত্ব : বাঙালি মুসলমানদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রসাধনা', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

[১৮৩] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রাষ্ট্র ও বাংলাভাষা', সুব্রত বড়ুয়া, ফরহাদ খান (সম্পা.), *অমর একুশে বক্তৃতা ১৯৮৫-৯৪*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৯
[১৮৪] সা'দত আলী আখন্দ, 'বাঙালী', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *আমাদের বাঙালীত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪
[১৮৫] হামেদ আলী, 'বাসনা', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
[১৮৬] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ-১৩২৬', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[১৮৭] সৈয়দ মোহম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৮; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৪
[১৮৮] কাজী নজরুল ইসলাম, *ভাঙার গান*, চতুর্থ কবিতা,
[১৮৯] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩
[১৯০] *প্রাগুক্ত*
[১৯১] কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাঙালীর বাঙলা', *বাঙালি বাংলাদেশ*, ১৪০০ সাল উদ্‌যাপন পরিষদ, ঢাকা, ১লা বৈশাখ ১৪০০, পৃ. ২২; *নজরুল রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৩২-২৩৪; শামসুজ্জামান খান, হাবীব-উল-আলম, ওবায়দুল ইসলাম, মোবারক হোসেন (সম্পা.), একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১১
[১৯২] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪
[১৯৩] মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮-১০৯
[১৯৪] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[১৯৫] ইসরাইল খান, পৃ. ৭১
[১৯৬] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮-২৮৯
[১৯৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮
[১৯৮] *প্রাগুক্ত*
[১৯৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯
[২০০] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫
[২০১] মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১
[২০২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২-১১৬
[২০৩] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[২০৪] *প্রাগুক্ত*
[২০৫] সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা), *আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, ভূমিকা, পৃ. ৮
[২০৬] *প্রাগুক্ত*
[২০৭] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫৬; মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৮১
[২০৮] সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা), *আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
[২০৯] মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[২১০] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (প্রথম খণ্ড)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩
[২১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪
[২১২] মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[২১৩] হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ : পাকিস্তান আন্দোলন*, *বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৫৮
[২১৪] মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[২১৫] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২
[২১৬] পলাশ রাউত, *স্লোগান চেতনায় প্রজ্জ্বলিত দুর্বার উচ্চারণ*, শোভা প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ২৯
[২১৭] সিদ্দিকুর রহমান স্বপন, *বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন স্লোগান প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার*, সুবর্ণ ও বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪২
[২১৮] সিকান্দার আবু জাফর, 'ইতিহাসচারিণী বাঙলা', *বাংলা ছাড়ো*, মাটিগন্ধা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪১

[২১৯] আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষাআন্দোলন স্বাধীনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭
[২২০] শামসুজ্জামান খান, 'বাংলা, বাঙালিত্ব : বাঙালি মুসলমানদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রসাধনা', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২
[২২১] *zuddhodolil.com*
[২২২] আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষাআন্দোলন স্বাধীনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮
[২২৩] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
[২২৪] আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষাআন্দোলন স্বাধীনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮
[২২৫] শিবনারায়ণ রায়, *বাঙালিত্বের খোঁজে এবং অন্যান্য আলোচনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০
[২২৬] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস* চতুর্থ খণ্ড (প্রথম পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৭৪
[২২৭] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, দ্বি-স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৯৬৭; আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষাআন্দোলন স্বাধীনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫
[২২৮] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭
[২২৯] মিজানুর রহমান, *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৩০
[২৩০] এ. কে. এম মোমিনুল ইসলাম, আবদুল রসুল ও বাংলার রাজনীতি, এম.ফিল থিসিস (অপ্রকাশিত), ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
[২৩১] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ, ২০১৫, পৃ. ২৬
[২৩২] হারুন-অর-রশিদ (বক্তৃতা), উপাচার্য, ডিরেক্টর ট্রেনিংয়ের আর্কাইভে সংরক্ষিত ভিডিও, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২ আগস্ট ২০১৫
[২৩৩] *প্রাগুক্ত*
[২৩৪] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭
[২৩৫] হারুন-অর-রশিদ (বক্তৃতা), উপাচার্য, *প্রাগুক্ত*
[২৩৬] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[২৩৭] *প্রাগুক্ত*
[২৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[২৩৯] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
[২৪০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬
[২৪১] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[২৪২] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
[২৪৩] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[২৪৪] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
[২৪৫] *প্রাগুক্ত*
[২৪৬] 'ছয় দফা নীতিমালায় উল্লেখিত হয় যে : ১. বাংলা হবে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র; ২. সংবিধান প্রণয়নের পর বাংলার আইন পরিষদ গঠিত হবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে; ৩. এভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক কী হবে; ৪. বর্তমান মুসলিম লীগ মন্ত্রিপরিষদ বিলুপ্ত করা হবে এবং তদস্থলে একটি সর্বদলীয় মধ্যবর্তী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে; ৫. বাংলার পাবলিক সার্ভিস বাঙালি দ্বারা গঠিত হবে এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে; ৬. সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি অস্থায়ী গণপরিষদ গঠন করা হবে যার সদস্যসংখ্যা হবে ৬১ (৩১ জন মুসলমান এবং ৩০ জন অমুসলমান)।' *১

*১. মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

[২৪৭] আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম অ্যাডর্ন প্রকাশক ২০১২, পৃ. ১২৭; হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[২৪৮] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[২৪৯] Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947*, UPL, Dhaka, 2015, pp. 294-295
[২৫০] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস* চতুর্থ খণ্ড (প্রথম পর্ব), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭২

[২৫১] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫প
[২৫২] হারুন-অর-রশিদ (বক্তৃতা), উপাচার্য, *প্রাগুক্ত*
[২৫৩] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
[২৫৪] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[২৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[২৫৬] হারুন-অর-রশিদ (বক্তৃতা), উপাচার্য, *প্রাগুক্ত*
[২৫৭] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[২৫৮] হারুন-অর-রশিদ (বক্তৃতা), উপাচার্য, *প্রাগুক্ত*
[২৫৯] হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
[২৬০] *প্রাগুক্ত*
[২৬১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[২৬২] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩
[২৬৩] ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
[২৬৪] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ ১৯৯৪, পৃ. ৪৬
[২৬৫] *প্রাগুক্ত*
[২৬৬] দেবেন সিকদার, *উপমহাদেশের কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি*, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১১০
[২৬৭] হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ : পাকিস্তান আন্দোলন*, *বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
[২৬৮] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৫
[২৬৯] হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ : পাকিস্তান আন্দোলন*, *বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬২
[২৭০] *bn.banglapedia.org*
[২৭১] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭
[২৭২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[২৭৩] *প্রাগুক্ত*
[২৭৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[২৭৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
[২৭৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[২৭৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[২৭৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
[২৭৯] *প্রাগুক্ত*
[২৮০] মাহফুজুর রহমান, *বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম, ২০১৪, পৃ. ২৭১
[২৮১] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[২৮২] মাহফুজুর রহমান, *বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১
[২৮৩] মামুন সিদ্দিকী, *শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৭
[২৮৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[২৮৫] *প্রাগুক্ত*
[২৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮
[২৮৭] মাহফুজুর রহমান, *বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১
[২৮৮] আন্দোলনের রূপরেখা ও কর্মসূচিটি প্রণয়ন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। এতে :

১. পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন
২. পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন
৩. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে সেখানকার জাতিসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসন
৪. রাজবন্দীদের মুক্তি
৫. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

৬. শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধি
৭. কৃষকের খাজনা-ট্যাক্স হ্রাস
৮. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন শীর্ষক কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের কথাও বলা হয়েছিল।*১
*১. মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

[২৮৯] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

[২৯০] খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক* (১৯৩৮-১৯৬৮), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৮২; মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস* দ্বিতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮

[২৯১] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

[২৯২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯

[২৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[২৯৪] *প্রাগুক্ত*

[২৯৫] খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক* (১৯৩৮-১৯৬৮), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

[২৯৬] মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৩৬; মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৬৯

[২৯৭] আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬-১২৪

[২৯৮] মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬-২৩৮

[২৯৯] হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ : পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬; হারুন-অর-রশিদ, 'পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু', এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ আয়োজিত ৭ম মাসিক সভা, ঢাকা, ১৪ আগস্ট ২০১৮, পৃ. ১৫

[৩০০] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ভূমিকা

[৩০১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২

[৩০২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[৩০৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[৩০৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[৩০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[৩০৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

[৩০৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[৩০৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

[৩০৯] *প্রাগুক্ত*

[৩১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

[৩১১] *প্রাগুক্ত*

[৩১২] মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১-২৪২

[৩১৩] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

[৩১৪] মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯-২৪০

[৩১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২

[৩১৬] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

[৩১৭] মোরশেদ শফিউল হাসান, *স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩

[৩১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪

[৩১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭-২৪৮

[৩২০] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০; হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ : পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[৩২১] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২০

[৩২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

[৩২৩] *প্রাগুক্ত*

[৩২৪] পলাশ রাউত, *স্লোগান চেতনায় প্রজ্জ্বলিত দুর্বার উচ্চারণ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[৩২৫] সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

[৩২৬] আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষাআন্দোলন স্বাধীনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

[৩২৭] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

[৩২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

[৩২৯] আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষাআন্দোলন স্বাধীনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

[৩৩০] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

[৩৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

[৩৩২] *প্রাগুক্ত*

[৩৩৩] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[৩৩৪] মুনতাসীর মামুন, *বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[৩৩৫] আনিসুজ্জামান, 'বাঙালির আত্মপরিচয়', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, কথাপ্রকাশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

[৩৩৬] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

[৩৩৭]

'১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পরেই অসাম্প্রদায়িকতার প্রতি সচেতনভাবে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম, ১৯৫৩ গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দের বর্জন–এসবই এক্ষেত্রে এককেটা মাইলফলকের মতো। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রাচনার কালে আওয়ামী লীগের নেতারা রাষ্ট্রের ইসলামি প্রজাতন্ত্র নামকরণে আপত্তি জানান ...'*

*আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

[৩৩৮] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

[৩৩৯] এস. ওয়াজেদ আলী, *ভবিষ্যতের বাঙালি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৭৩

[৩৪০] *প্রাগুক্ত*

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট (আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক)

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পূর্ববঙ্গ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে এ রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালিরা যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুক্ত হয়েছিল তা কতটুকু পূরণ হয় এ প্রসঙ্গে হারুন-অর-রশিদ বলেছেন,

> পাকিস্তান আন্দোলনকে ঘিরে বাঙালিদের মধ্যে স্বাধীনতার যে স্বপ্ন ছিল, ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সেটি ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কী বাঙালির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তি কী জাতি-প্রশ্ন কোনোটিরই মীমাংসা দিতে পারেনি। অন্যদিকে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর (মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ) পশ্চিম অংশের একধরনের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের পাশাপাশি চলে সাংস্কৃতিক বা জাতি-নিপীড়ন।[১]

অর্থাৎ শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বার্থের বিরোধী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং বাঙালিরা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। পাকিস্তান শাসনামলের পুরো সময়টাতেই এই রকম একটি দ্বান্দ্বিকরূপ বিরাজমান ছিল। পাকিস্তানের রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিরোধের মধ্য দিয়ে অগ্রগতি লাভ।

মুসলিম লীগ সরকার প্রথম থেকে বাঙালিকে রাজনৈতিকভাবে দমন ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করার নীতি গ্রহণ করে। রাজনৈতিক অধিকার হরণ এবং সবধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মতো নেতাকেও তারা ১৯৪৮ সালে ঢাকায় জনসভায় অংশগ্রহণে বাধা দেয়।[২] শাসকগোষ্ঠী কোনো বিরোধী দল ও মতকে সহ্য করতো না। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের ওপরে দমন-পীড়ন চালাতে থাকে। শুধু তাই নয়, সরকার বুঝতে পরেছিল ছাত্রছাত্রীরা তাদের শাসন-শোষণের রাস্তায় প্রধান বাধা হয়েছে দাঁড়াবে। তাই প্রথম থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয়। মুসলিম লীগ সরকারের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণের এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম থেকেই ছিল শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিনিয়ত সরকারের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করতো। ফলে ছাত্রলীগের কর্মীদের ওপর নেমে আসে অত্যাচার ও জুলুম। রাজশাহী সরকারি কলেজের একুশজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু তাই নয়, তাদেরকে রাজশাহী জেলা ত্যাগ করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এই একুশজনের বেশিরভাগই ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন।[৩] সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার সাথে প্রথম থেকেই কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতাও প্রতিবাদমুখর ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই পাকিস্তান গণপরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি বেগম শায়েস্তা একরামুল্লাহ এই মর্মে অভিযোগ করেন যে বাঙালিদের মধ্যে দ্রুত পশ্চিম পাকিস্তানের 'কলোনি'তে পরিণত হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। বিভাগ-পূর্ব বাংলার হিন্দু জমিদার-মহাজনদের স্থলে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে বাঙালিদের ওপর উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানি, বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের শাসন-শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৪] ১৯৪৯ সালে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে দিনাজপুরেও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়। ফলে, ছাত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানকে আহ্বায়ক করে সারাদেশে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্ব বাংলার সমস্ত জেলায় এই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। কমিটির পক্ষ থেকে বন্দি ছাত্রদের মুক্তি এবং তাদের ওপর হতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়।[৫] এই প্রথম পাকিস্তানে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির আন্দোলন ও জুলুমের প্রতিবাদ হয়। সভা বা শোভাযাত্রা করতে গেলে সরকারের গুন্ডারা মারপিট ও ভাঙচুর করতো। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। তার প্রমাণ পাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাতাশজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার।

বহিষ্কার আদেশে আবার ছাত্রদের মধ্যে ভাঙন ধরানো ও মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য একটা চেষ্টা মুসলিম লীগ সরকার করেছে। বহিষ্কার আদেশ বলা হয়, দবিরুল ইসলাম, অলি আহাদ, মোল্লা জালালউদ্দিন ও আবদুল হামিদ চৌধুরী–এই চারজন ছাড়া আর সকলে বন্ড ও জরিমান দিলে লেখাপড়া করতে পারবে। সরকার ছাত্রদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টায় অনেকটা সফল হয়। ছাত্রলীগের কনভেনর নইমউদ্দিন আহমেদ, সলিমুল্লাহ হলের ভিপি আবদুর রহমান চৌধুরী, দেওয়ান মাহবুব আলীসহ আরও অনেকে গোপনে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বন্ড দিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে ১৬ এপ্রিল রাতে ছাত্রলীগের সভায় তাদের বহিষ্কার করা হয়। ১৭ এপ্রিল এক সভায় ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। ১৮ তারিখ থেকে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ির নিচের ঘরগুলোতে একশজন ছাত্র পালাক্রমে অবস্থান করতে থাকে। তারা দাবি করে শাস্তি প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তাদের অবস্থান চলবে। ১৯ এপ্রিল বিকেলে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আটজনকে গ্রেফতার করে। ফলে পরের দিন থেকেই জনগণের মধ্যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। কিন্তু পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে ছাত্রনেতাদের সবাইকে প্রায় সরকার গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় ফলে আন্দোলন স্থবির হয়ে পরে।[৬]

তখন পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠেনি। ছাত্রছাত্রীরাই বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছিল। পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদদের মধ্যে উপলব্ধি আসে শুধুমাত্র ছাত্র প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে রাজনীতি করা যায় না। মুসলিম লীগ ছাড়াও একটা প্রতিষ্ঠান ছিল কংগ্রেস। গণপরিষদে ও পূর্ব বাংলার আইনসভায় কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য ছিল কিন্তু তাদের সকলেই হিন্দু ছিল। এরা বেশি কিছু বললেই 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া হতো। ফলে পুরানো মুসলিম লীগ কর্মীরা একটি নতুন দল গঠনের উদ্যোগ নেন।[৭] তাদের প্রচেষ্টায় ২৩ জুন ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ সরকার নতুন দল গঠনকে ভালো দৃষ্টিতে নেয় নি। সরকার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের দলীয় সভাসমূহে গোলযোগ সৃষ্টি এবং কর্মীদের ওপর হামলা ও নির্যাতন চালাতে থাকে। নির্যাতনের সম্মুখীন হওবার ফলে আওয়ামী লীগ একটি প্রতিবাদকারী দলে পরিণত হয়। মুসলিম লীগ ও ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এবং কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্য নিয়ে আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই সংগঠনের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে ওঠে।

আওয়ামী লীগ ছাড়াও পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন উপায়ে এবং নির্যাতনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি সমূহকে রাজনৈতিক কার্যক্রমে সর্বতোভাবে বাধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা কার্যকরের চেষ্টা ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। ফলে, প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রম বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার করা দুরূহ হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসি শাসন, শোষণ ও নিপীড়নে গণসংগঠনগুলোকে রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের অধিকাংশই কারারুদ্ধ হয় অথবা আত্মগোপন করেন। এ সময়ে বাংলাদেশের একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন ছিল 'ছাত্র ফেডারেশন।' কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে সংগঠনটির প্রতি মুসলমান ছাত্ররা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতো। ফলে ছাত্রলীগ (আগস্ট ১৯৪৭) এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)-এর নেতৃত্বেই মূলত ছাত্র রাজনীতি দেশের বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করে।

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পূর্ববঙ্গের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে। এর মধ্যে ১৯৪৮ সালে টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ব্যবস্থাপক সভায় প্রদেশের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'আমরা কি Central Government-এর গোলাম।'[৮] এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন,

> আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদান করব। অথচ Jute Tax এমনকি Railway Tax, Income Tax, Sale Tax নিয়ে যাবে Central Govt.। এই সব Tax এর শতকরা ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকি অংশ Central Govt. কে দেয়া হোক।[৯]

এই দাবি উত্থাপনের পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'যদি মন্ত্রীরা গরীব কৃষকদের মেরে মন্ত্রীত্ব করতে চান তাহলে তাহারা আর বেশিদিন মন্ত্রীত্ব করিতে পারিবেন না'।[১০] এছাড়াও ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা ব্যবহার করার জন্য তিনি বারংবার দাবি করেছিলেন।[১১] কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর এইসব ভূমিকা ক্ষমতাসীন দল ভালোভাবে নেয় নি। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় সরকার যা করতে চেয়েছিল, ভাসানীর রাজনীতি ছিল সেসবের বিরুদ্ধে। ফলে তাঁকে সংসদ থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত শুরু হয়।[১২] নির্বাচনি হিসাব দাখিল না করার অভিযোগে সরকার টাঙ্গাইলের নির্বাচন বাতিল করে।[১৩] বাতিল করার পূর্বেই ভাসানী সরকারের ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পেরে ইস্তফা দেন।[১৪] সরকার রাজপথে আন্দোলনকারী ছাত্রদের দমন করছিল। গণপরিষদে ও পূর্ব বাংলার আইনসভায় নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন প্রতিবাদমুখর হয় তখন সরকার কখনও সাম্প্রদায়িক আচরণের অভিযোগে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যা করতে থাকে কিংবা বিভিন্ন অজুহাতে তাদের সদস্যপদ কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু সরকারের এইসব কার্যক্রমকে জনগণ ভালো দৃষ্টিতে নেন নি। তার প্রমাণ আমরা পাই ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে। এ নির্বাচনে শামসুল হকের কাছে সরকারি মুসলিম লীগের প্রার্থী খুররম খান পন্নী পরাজিত হয়।[১৫] টাঙ্গাইলের জনগণ মূলত মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছিল। কিন্তু সরকার বিষয়টির প্রতি কোনো গুরুত্বই দেয় নি। বরং নির্বাচনি মামলা করে শামসুল হককে আইনসভায় যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।[১৬] ফলে, আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি ও শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন দেখা দেয়। জনপ্রিয় দাবি নিয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন করার ফলে দলটি দ্রুত জনগণের আস্থা অর্জন করে। বিরোধী দলের প্রধান দাবি ছিল নির্বাচনের জন্য।[১৭]

আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'ভারতীয় মুসলমানেরা স্বতন্ত্র জাতি এবং তাদের পৃথক বাসভূমি চাই এই প্রত্যয় ও দাবির ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তানের।'[১৮] স্বভাবতই ধর্মই ছিল পাকিস্তান জাতীয়তার ভিত্তি। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই মাউন্টব্যাটেন-পরিকল্পনা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যে দাবি ওঠে, তার মধ্যেই ছিল স্বতন্ত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর। এ ব্যাপারটিও আকস্মিক ছিল না। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা যে উর্দু নয়, বাংলা–সমাজে এ সত্য প্রতিষ্ঠা করতে অনেকদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে এসেছিলেন বাঙালি মুসলমান লেখক-সাংবাদিকরা। সে চেষ্টায় তাঁরা সফলও হয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেছিলেন যে, ইতিহাসের সূচনা থেকেই বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা ছিল, আছে এবং থাকবে।[১৯] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেছিলেন, বাংলা কেবল বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা নয়, হিন্দু-মুসলমান মিলিত বাঙালির জাতীয় ভাষা।[২০] ১৯৫১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় ৯৭% এবং পূর্ববাংলার ৮০% ছিল মুসলমান। কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীর ধর্ম এক হলেও তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন। ১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান জনগণের ৫৬.৪০% বাংলা ভাষা, ২৮.৫৫% পাঞ্জাবি, ৩.৪৮% পুশতো, ৫.৪৭% সিন্ধি, ৩.২৭% উর্দু এবং ২.৮৩% অন্যান্য ভাষাভুক্ত ছিলেন।

বহু ভাষাভাষীর দেশ পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। এই সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। তাদের একগুঁয়েমি ও অবিবেচক সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ববাংলার জনগণের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে, আর এই ক্ষোভ থেকে জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু করে বুদ্ধিজীবীমহল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ছাড়াও ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি বহু প্রখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত এবং অখ্যাত লেখক তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর ফলে পূর্ববাংলার শিক্ষিত সমাজ এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে একটি প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও বাংলাভাষার দাবিকে জোরদার করা হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে নবগঠিত ২/১টি রাজনৈতিক সংগঠনও বাংলা ভাষার প্রশ্নে বক্তব্য রাখে। ১৯৪৭

সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক যুবলীগের' এক কর্মীসম্মেলনে ভাষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়,

> পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে প্রস্তাব করিতেছি যে, বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।[২১]

আর একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষার প্রশ্নে সোচ্চার হয়। এই সংগঠনটির নাম 'তমুদ্দুন মজলিশ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে প্রতিষ্ঠার পর সংগঠনটি বিভিন্ন সাহিত্য-বৈঠক আয়োজন করে। এই সংগঠন ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা–বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকা মজলিশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম আন্দোলন সংঘটিত হয় ভাষাকেন্দ্রিক। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে আবদুল হক বলেছেন, 'ভাষা আন্দোলনই ছিল এদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল অবচেতন বাঙালি জাতীয়তাবাদী অনুভব।'[২২]

পাকিস্তানের ৩.২৭% ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল উর্দু তথাপি উর্দুকেই শাসকগোষ্ঠী স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকেট, মানি অর্ডার ফরম, রেলের টিকেট প্রভৃতিতে কেবল ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয় তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেওয়া হয়। এমনকি পাকিস্তান গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়।

শুধু তাই নয়, সংবিধান সভার বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের বেশিরভাগ সদস্যই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন। শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রসেঙ্গ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে বলেছেন,

> ১৯৪৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান সংবিধান সভার (কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) বৈঠক হচ্ছিল। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেই বিষয়ও আলোচনা চলছিল। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লীগ সদস্যের সেই মত।[২৩]

গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন।[২৪] ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব করেননি। যেহেতু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা বাংলা, সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।[২৫] তখন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় তার বিরোধিতা করেছিলেন।[২৬]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হিন্দু হওয়া তাঁর প্রস্তাবে শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। উক্ত প্রস্তাবকে তাঁরা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা বিনষ্ট করার প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন। গণপরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন যে, একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা বানচাল করার জন্যই বাংলাভাষার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছে। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। তাই পাকিস্তানের ভাষা মুসলমানদের ভাষা হওয়া উচিত। যেহেতু পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উর্দু, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়।[২৭] তিনি আরও বলেন, যাঁরা বাংলার দাবি তুলেছেন, তাঁরা এই নবীন রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিকদের ঐক্য নষ্ট করতে চাইছেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে *দৈনিক আজাদের* সম্পাদকীয়কে বলা হয়,

পাকিস্তান রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের পূর্ব্ব হইতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ শুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই বাদানুবাদের তীব্রতা বৃদ্ধি হয় এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করিয়া ছাত্র ও যুবক মহলে এই আশঙ্কা জাগে যে, পাকিস্তানে বাংলাভাষা উপেক্ষিত হইবে। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বুদ্ধিমান মানুষ এই আশঙ্কাকে অমূলক মনে করিয়াছিলেন, কারণ পাক-গণপরিষদের সদস্যগণের সংখ্যাগুরু অংশ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬১ ভাগেরও অধিক পূর্ব্ব-পাকিস্তানের, ও তাহাদের শতকরা ৯৯ জনেরও অধিক, বাংলাভাষী। এমতাবস্থায় বাংলাভাষা তো উপেক্ষিত হইতেই পারে না, অধিকন্তু ইহা সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু পাক-গণপরিষদের সিদ্ধান্তে পূর্ব্ব পাকিস্তানের আশাবাদী বিদগ্ধ সমাজের সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে। পাক-গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় এই আশঙ্কাই বদ্ধমূল হইতেছে যে, পূর্ব্ব-পাকিস্তানের জনগণের ভাষা আজাদ পাকিস্তানে কোন স্থান পাইবে না এবং ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ অগ্রগতি আশঙ্কাজনকভাবে ব্যাহত হইবে।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাক-গণপরিষদে বাংলাভাষাকে পরিষদের অন্যান্য ভাষার সহিত সমানাধিকার দানের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। পাক-ডোমিনিয়নের মোট ৬ কোটি ৯০ লক্ষ নাগরিকের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষাকে পরিষদের অন্যতম ভাষা বলিয়া দাবি করার মধ্যে অযৌক্তিকতা কোথায়, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না।

পাক-ডোমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খাঁ শ্রীযুক্ত দত্তের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে যাইয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, পাকিস্তান হইতেছে মোছলেম রাষ্ট্র এবং মুছলমানের জাতীয় ভাষা উর্দ্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে। জনাব লিয়াকত আলী পাকিস্তানকে মোছলেম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলেও কায়েদে আজম বহুবার তাঁহার ঘোষণায় ও বিবৃতিতে পাকিস্তানকে Secular State (ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সুতরাং জনাব লিয়াকত আলীর (বক্তব্যের) প্রথমাংশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিব না–কিন্তু শেষোক্ত অংশটি আমাদের হাস্যোদ্রেক করিয়াছে। উর্দ্দু মুছলমানের জাতীয় ভাষা হওয়ার অধিকার কবে এবং কোথায় অর্জ্জন করিল? বর্তমানে জনাব লিয়াকত আলী যে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী সেই রাষ্ট্রের এক নগণ্য সংখ্যক লোক উর্দ্দু ভাষাভাষী। সিন্ধু, সীমান্ত ও পাঞ্জাব উর্দ্দু ভাষী নহে। কাজেই পাকিস্তানের মুছলমান জনসাধারণের জাতীয় ভাষা উর্দ্দু বলিয়া দাবির মধ্যে কোন যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।

এইসব অযৌক্তিক তথ্যের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তানের জনগণের মনোভাবের উপরে নিষ্ঠুর আঘাত হানা হইয়াছে। দুইশত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসন যে কাজ করিতে সাহস পায় নাই, আজাদ পাকিস্তান তাহা অনায়াসে করিয়া বসিল। বৃটিশ আমলে মুদ্রা, নোট ও মানিঅর্ডার ফরমের উপর বাংলা সম্মানে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু নাগরিকদের মৌলিক অধিকারে এরূপ নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপ আজাদ পাকিস্তানে সম্ভবপর হইবে তাহা কেহ কল্পনা করে নাই। এবং ইহা সম্ভবপর হইল গণপরিষদে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের অক্ষমতার জন্য। গণপরিষদের সিদ্ধান্তে পূর্ব্ব-বাংলা আজ বিক্ষুব্ধ। ছাত্র, যুবক ও জনগণ তাহাদের ন্যায্য দাবির প্রতি উপেক্ষায় মর্ম্মাহত। এই অবস্থায় গণপরিষদের পূর্ব্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণের এখন হইতে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ, যাহাতে বাংলাভাষায় অধিকতর অসম্মান তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তায় না ঘটে... ।[২৮]

উল্লেখ্য *আজাদ* তখনও মুসলিম লীগের মুখপত্র। তারপরেও পত্রিকাটিতে জনগণের কণ্ঠ ফুটে ওঠে। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিগণের সিদ্ধান্তে জনগণের মতের প্রতিফলন ঘটেনি। বরং বলা যায়, ব্যক্তি স্বার্থে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বিতর্কের পর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আনীত প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হলে অগ্রাহ্য হয়। পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি মুসলমান সদস্যগণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় পূর্ববাংলায় গণ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। গণপরিষদে দেওয়া লিয়াকত আলী খানের ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ববাংলায় ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিক নির্বিশেষে সকল বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এক নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

ভাষা আন্দোলনের দু'টি পর্যায়–(ক) ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ও (খ) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) ঢাকার ছাত্রবৃন্দ ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বাংলাভাষার সমর্থনে স্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকায় মিছিল করে। মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে শেষ হলে সেখানে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করে তমুদ্দিন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম। সভায় বক্তারা বলেন–পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে প্রস্তাব করেছেন তা কোনো সাম্প্রদায়িক চিন্তা নয়, বরং সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীদের দাবি এই যে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করতে হবে। পাকিস্তানের মুদ্রায়, টিকিটে, মানি অর্ডার ফরমে কেবল উর্দুভাষা উল্লেখ থাকার কড়া সমালোচনা করা হয় এবং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাভাষা মুদ্রণ করারও জোর দাবি জানানো হয়।

বাংলাভাষার সংগ্রামকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ২ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকার ফজলুল হক হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই পরিষদে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রত্যেকটি থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা : তমুদ্দুন মজলিশ, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক, মুসলিম হলসহ অন্যান্য ছাত্রাবাস এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ছাত্র ফেডারেশনে কমিউনিস্ট দলের ছাত্র সংগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ (১৯৪৮) পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। উক্ত দিন ছাত্ররা বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবিতে সেক্রেটারিয়েটের বাইরে সমবেত হলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং ফলে কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল আলমসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বস্তুত, জেলের বাইরে এবং ভিতরে থাকার সময় শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার ভূমিকা পালন করেছিলেন। উক্ত সমাবেশে ছাত্ররা প্রাদেশিক গভর্নর খাজা নাজিমউদ্দীনের ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের কড়া সমালোচনা করে এবং গণপরিষদ থেকে পূর্ববাংলার সদস্যদের পদত্যাগের আহ্বান জানায়।[২৯]

এই প্রতিবাদ সভাকে সরকার হিন্দু তথা পাকিস্তানের শত্রুদের দ্বারা আয়োজিত এক গভীর চক্রান্ত বলে প্রচার করে। সরকার ঘোষণা করে যে, বাংলাভাষার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র।

ছাত্রদের আন্দোলন পরের দিনগুলোতে আরও জোরদার হতে থাকে এবং সাধারণ জনসাধারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ১৫ মার্চ আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। উক্ত আলোচনা সভায় ৮ দফা[৩০] চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়।

ছাত্রদের এই আন্দোলনে নাজিমউদ্দীন সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ববাংলা সফরে আসার আহ্বান জানান। সে অনুসারে গভর্নর জেনারেল প্রথম এবং শেষবারের মতো ১৯ মার্চ পূর্ববাংলা সফরে আসেন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তিনি স্বৈরাচারী মনোভাব দেখান। ২১ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন যে, তিনি কোনো শত্রুকে, এমনকি সে যদি মুসলমানও হয়, সহ্য করবেন না। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু–অন্য কোনো ভাষা নয়। জিন্নাহর এই ঘোষণায় সভার কোনো-কোনো অংশ থেকে মৃদু 'নো, নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উক্ত সভার তিনদিন পর (২৪ মার্চ, ১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন যে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন আসলে পাকিস্তানের শত্রুদের কারসাজি। তিনি আন্দোলনকারীদের 'পঞ্চমবাহিনী'রূপে অভিহিত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, বাঙালিরা তাদের প্রদেশের সরকারি ভাষারূপে যে-কোনো ভাষা নির্বাচিত করতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি ভাষা অবশ্যই হবে উর্দু। জিন্নাহর এ উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ 'না না' ধ্বনি উচ্চারণ করে।

জিন্নাহর এই স্বৈরাচারী মনোভাব পূর্ববাংলায় বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। ভাষার আন্দোলন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ২৪ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিনিধিদল জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপি থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিগুলো জানা যায়।[৩১] যাঁরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে তিনি এই দুটি ভাষণে এবং ২৮ মার্চে করাচি প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে পূর্ব বঙ্গবাসীদের উদ্দেশে এক বেতারভাষণে পুনঃপুনঃ বিদেশি এজেন্সির সাহায্যপুষ্ট, কমিউনিস্ট, পাকিস্তানের শত্রু, সংহতি বিনষ্টকারী, প্রাদেশিকতার উস্কানিদাতা, শান্তিবিনষ্টকারী, রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত, ঘরোয়া শত্রু, বিশ্বাসঘাতক, রাজনৈতিক সুবিধাবাদী, বোকার স্বর্গে বসবাসকারী, স্বার্থপর, পঞ্চম বাহিনী ইত্যাদি বহু তিরস্কার বর্ষণ করেন।[৩২]

জিন্নাহর পূর্ববাংলা সফর ভাষা-আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়। জিন্নাহ অনেককে বোঝাতে সক্ষম হন যে, ভাষা আন্দোলন ছিল কমিউনিস্টদের কারসাজি। দেশের সংহতি বিনষ্ট করাই উক্ত আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের অগাধ শ্রদ্ধাবোধ অনেক আন্দোলনকারীকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে ফেলে। তবে ভাষাকে ঘিরে ছাত্রদের মনে ক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ছাত্ররা ১৯৪৮-এর পর থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত প্রতি বছর ১১ মার্চ ভাষা দিবস পালন করতেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বাঙালি হয়েও বাংলা বর্ণমালাকে আরবিকরণের পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে ৯ মার্চ (১৯৪৯) মাওলানা আকরাম খাঁ-এর নেতৃত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি গঠিত হয়। এর তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। তারা এর তীব্র নিন্দা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদলিপি পেশ করে। ৩১ ডিসেম্বর (১৯৪৮) ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উক্ত প্রয়াসের সমালোচনা করেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে এবং পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা বর্ণমালার আরবিকরণ প্রয়াস নিয়ে বিতর্ক হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কমিটি ৭ ডিসেম্বর (১৯৫০) পেশকৃত রিপোর্টে বাংলা বর্ণমালা আরবিতে লেখার বিরোধিতা করলে সরকারের উক্ত প্রয়াস বাধাগ্রস্ত হয়।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে ভাষার প্রশ্নে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানিক মূলনীতি কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরে একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করে। উক্ত রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব হয়। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদ ঢাকায় একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটি ৪ ও ৫ নভেম্বর (১৯৫০) ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলন করেন এবং পাকিস্তানের সাংবিধানিক মূলনীতি সম্পর্কে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও বাংলা হবে বলে দাবি করা হয়। সংগ্রাম কমিটি ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবশেষে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে ভাষার প্রশ্নটি আপাতত চাপা পড়ে। তবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে না যায় সে উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন 'উৎসাহী ও সংগ্রামী' ছাত্র ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। আবদুল মতিন-এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

এরপর ১৯৫২ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় খাজা নাজিমউদ্দীনের এক উক্তিতে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ববাংলা সফর করতে এসে ২৭ জানুয়ারি ১৯৫২-তে এক জনসভায় তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরূপ ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই ঘোষণায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। খাজা নাজিমউদ্দীনের উক্তির প্রতিবাদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জানুয়ারি (১৯৫২) ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। ৩০ জানুয়ারির সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা শহরে ছাত্রধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৫২ সালে ভাষা

আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে বন্দি অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মীদের আন্দোলনের নির্দেশনা পাঠান এবং সহরাজনৈতিক বন্দি মহিউদ্দিন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে আমরণ অনশন পালন করেন। ভাষা আন্দোলনকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে '৩১ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।' সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমুদ্দুন মজলিশ, ইসলামি ভ্রাতৃসংঘ, যুব সংঘ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ২৮ মতান্তরে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সমর্থন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৩৩] ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহর মিছিল-মিটিংয়ে উত্তপ্ত ছিল। এ রকম একটি মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদরঘাটের ভিক্টোরিয়া পার্কে দিকে যাচ্ছিল। মিছিলে স্লোগান ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', তবে ঐ আওয়াজের সঙ্গে সংগতি রেখে বা নিজস্ব তাড়না থেকে কেউ কেউ ধ্বনি তুলেছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই'।[৩৪] এটি ছিল খুবই বিপজ্জনক। তাই নেতৃস্থানীয় দু'জন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ঐ স্লোগান দিতে নিষেধ করেন। কারণ, 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই' এই স্লোগান যদি শাসকদের কানে পৌঁছাত তবে তারা এটাকে অন্য রাষ্ট্রের শিশু পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ষড়যন্ত্র হিসেবেই চিহ্নিত করতো।[৩৫] ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল ঐ অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ হতে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ইংরেজি পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার* নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য সমস্ত ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪৪ ধারা জারি করার অর্থ একসঙ্গে ৪ জনের বেশি লোকের সমাগম, মিছিল, শোভাযাত্রা, সভা ও সমাবেশ করা আইনবিরোধী।

সরকারি ঘোষণায় বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় (২০ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত) ভোটাভুটিতে ১১ জন ১৪৪ ধারা না-ভাঙার পক্ষে ও ৪ জন ভাঙার পক্ষে ভোট দেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৪৪ ধারা না-ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নেতা অলি আহাদের আনীত একটি প্রস্তাব গৃহীত ও সংযোজিত হয়। ঐ প্রস্তাবটি ছিল, 'যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পথে নেমে পড়ে, তাহলে উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এই কমিটিও বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে।'

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ২৪ জমাদিয়ুল আউয়াল ১৩৭১ হিজরি। পূর্ব ঘোষণানুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা জমায়েত হতে থাকে। রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা দুজন দুজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে আসে। বেলা ১১টায় ছাত্রসভা শুরু হয়। সভায় 'সর্বদলীয় কর্মী পরিষদের' সিদ্ধান্তের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে কর্মপরিষদকে লুপ্ত ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙার পন্থা হিসেবে দশজন দশজন করে ছাত্র রাস্তায় মিছিল বের করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ পূর্বরাত্রে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত দিলেও ছাত্রসভার সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখিয়ে তা মেনে নেয় এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাদের অনেকেই ঐ দিন গ্রেফতার হন।

খণ্ড মিছিলগুলো যখন ১৪৪ ধারা ভাঙতে পথে নামছিল তখন রাস্তায় অপেক্ষমাণ পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু কতজনকে পুলিশ আটক করবে? অবশেষে পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। এতেও মিছিলকারীদের ঠেকাতে না পেরে নিক্ষেপ করে শত শত কাঁদুনে গ্যাস। পুলিশি হামলার মুখে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের মাঝখানের অনুচ্চ প্রাচীর টপকে মেডিকেল হোস্টেলের প্রধান ফটকের কাছে আবার জমায়েত হন।' উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলা আইন পরিষদে যোগদানকারী

সদস্যদের কাছে বাংলাভাষার দাবির কথা পৌঁছে দেওয়া। তখন জগন্নাথ হলের অডিটোরিয়ামে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সভা বসতো। আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ যেন অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করেন সে জন্য তাদেরকে অনুরোধ করাও ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচির অংশ ছিল। বশীর আল হেলাল ঐ দিনের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন,

> প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল নিয়ে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতার বরণ করতে থাকে। তখন ধীরে ধীরে ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে স্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিশবাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এমএলএ ও মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদে আসতে থাকেন। ছাত্ররা যতই স্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ হানা দেয়। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে তাড়া করতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভিতর ঢুকে পড়ে। হোস্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় ছাত্ররা বাধ্য হয় ইট-পাটকেল ছুঁড়তে। একদিকে ইট-পাটকেল, আর অন্যদিকে থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিচার্জ। ঘটনাস্থলেই আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ শহীদ হন। আর ১৭ জনের মতো গুরুতর আহত হন। তাদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাদের মধ্যে রাত আটটার সময় আবুল বরকত শহীদ হন।
>
> গুলি চালানোর সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্তনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্রছাত্রীদের চোখেমুখে যেন ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন ঝরে। মেডিকেল হোস্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশি হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলি চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবি জানানো হয়। ১৪৪ ধারার নাম-নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলি চালানোর সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট, বেতারকেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে।[৩৬]

২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় শহিদদের সংখ্যা ও পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরপরই নেতৃবৃন্দের আত্মগোপন করার কারণে লাশের পরিচয় ও সংখ্যা সম্পর্কে তারা অনেকেই অজ্ঞাত থাকেন, উপরন্তু রাতে পুলিশ কর্তৃক হাসপাতাল থেকে অধিকাংশ লাশ সরিয়ে ফেলার ফলেও পরবর্তীকালে নানান প্রশ্নের অবতারণা হয়। সকলেই যে ২১শে ফেব্রুয়ারিতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা নয়, আহতদের কেউ কেউ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। যেমন সালাম মৃত্যুবরণ করেন ৭ এপ্রিল (১৯৫২)। আবার ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি যে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় সেই মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়েও কেউ কেউ শহিদ হন। ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় উক্ত দিন ও পরে কমপক্ষে ৬ জন যে শহিদ হয়েছিলেন সে বিষয়ে সরকারি বিবরণী অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রথম শহিদ হয়েছেন রফিকউদ্দিন আহমদ। এছাড়া আবুল বরকত, শফিউর, আবদুল জব্বার, শহিদ অহিউল্লাহ, আবদুস সালাম শহিদ হন।

২১শে ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে এবং কমপক্ষে ২ জন মৃত্যুবরণ করে। ২১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি চারদিন 'ঢাকা বেতার কেন্দ্রে' পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ফলে কেবল সংবাদ বুলেটিন ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়নি। একুশের ঘটনার প্রতিবাদে *দৈনিক আজাদে*র সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করে। গভর্নর ও স্পিকারের কাছে লেখা পদত্যাগপত্রে তিনি লেখেন,

> বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নুরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক–এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে লজ্জাবোধ করিতেছি।

মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহিদদের স্মরণে একটি শহিদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুসারে ড. সাঈদ হায়দার নকশার পরিকল্পনা করেন। মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর ইট, বালি, রড, সিমেন্ট মজুদ ছিল।

২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মিনার নির্মাণে সেই রসদগুলো ব্যবহৃত হয়। অজ্ঞাতনামা দুই রাজমিস্ত্রি মিনার নির্মাণ করে। তাদেরকে সাহায্য করেন দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্র। শহিদ শফিউর রহমানের পিতা ২৪ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ উক্ত মিনারটি ভেঙে ফেলে।

২৫ মার্চ (১৯৫২) শহিদ আবুল বরকতের ছোটো ভাই আবুল হাসনাত ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মহকুমা হাকিমের এজলাশে মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৩৭ ও ১৩২ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা যায় না–এরই পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু আবেদনকারী অনুরূপ কোনো অনুমতিপত্র দাখিল করতে পারেনি তাই অভিযোগটি খারিজ করে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির পুলিশি ও মিলিটারি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লঙ্ঘন করার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা প্রবর্তনের জন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। যে সব রাজনীতিবিদ এতদিন ভাষা আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন তাঁরা (যেমন এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ) ২৩ ফেব্রুয়ারি 'সিভিল লিবার্টি কমিটি' বা 'ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি' নামে একটি সমিতি গঠন করে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ২৪ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে এক সভা অনুষ্ঠিত করে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সরকারকে বাংলাভাষার দাবি পূরণের জন্য ৫ মার্চ পর্যন্ত সময় দেয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে নতুন আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

সরকারও জেল-জুলুমের নীতি অবলম্বন করে। পুলিশ এমনকি চারজন গণপরিষদ সদস্যকে (আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, মনোরঞ্জন ধর ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জী) জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককেও (প্রক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. বি.সি চক্রবর্তী, অজিত কুমার গুহ প্রমুখ) গ্রেফতার করে।' ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেক রাজনৈতিক নেতা গ্রেফতার জেল-জুলুম এড়ানোর জন্য আত্মগোপন করেন। সরকার দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সারাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র বিলি করে। আন্দোলনকারীদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার একটি সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব পাশ করেন।

তাছাড়া প্রদেশবাসীর কাছে তাকে এবং সরকারকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য তিনি প্রদেশবাসীর উদ্দেশে রেডিওতে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি প্রমাণ করতে চান যে 'রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আসল প্রশ্ন নয়, ইহার পশ্চাতে সরকারকে বানচাল করার জন্য বিদেশী দালাল ও অন্যান্যদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নিহিত আছে।'

পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় গণপরিষদের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করলেও গণপরিষদের অধিবেশনে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধার সম্মুখীন হয়। পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগ-গণপরিষদ সদস্য নূর মোহাম্মদ বাংলাভাষা সংক্রান্ত পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সুপারিশের বিষয়টি গণপরিষদের অধিবেশনে উত্থাপন করলেও পূর্ববাংলার জন্য কোনো মুসলিম লীগ সদস্য তা সমর্থন করেননি। কেবল কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য সরদার শওকাত হায়াত খান (পাঞ্জাব), সরদার আসাদুল্লাহ জান খান (উ.প.সী.প্র) এবং শেঠ শুকদেব (সিন্ধু) বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি দেন। অবশেষে নূর মোহাম্মদ আনীত প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। এরপর প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তান সংবিধানের মূলনীতি কমিটির যে চূড়ান্ত রিপোর্ট গণপরিষদে উত্থাপন করেন তাতেও ভাষা প্রশ্নটি অনুল্লেখ থাকে। এর ফলে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়।

উর্দুভাষা বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা এবং মাতৃভাষায় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। ভাষা আন্দোলনের পর যে একুশ দফার আন্দোলন, তারও লক্ষ্য ছিল বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা; কেবল মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা নয়।[৩৭] একুশ দফার আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ হিসেবেই শুরু হয় সাধারণ নির্বাচনে, ধর্ম সম্প্রদায়গুলোর ভিন্ন ভিন্ন ভোটদান প্রথা বা স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা বিলোপ করে ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের একত্রে ভোটদান বা যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দাবি।[৩৮] তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এই যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দাবি তোলা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ নেতা ও দল এই দাবিতে সমর্থন জানান। তবে, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামিসহ সমমনা দলগুলো যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছিল।[৩৯] এ সময় আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হয়।

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। এরপর ৯ মে ১৯৫৪ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু ও বাংলা এবং অন্য আর কোনো ভাষা যা কোনো প্রাদেশিক পরিষদে সুপারিশ করা হবে। পার্লামেন্টের সদস্যগণ ইংরেজি ছাড়া উর্দু ও বাংলাতে বক্তব্য রাখতে পারবেন। গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এইভাবে বাংলাভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হলেও ১৯৬২-এর সংবিধানের 'আর্টিকেল ২১৫'-তে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বহাল রাখা হয়।

ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নও জড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় গণপরিষদে পূর্ববাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসন সংখ্যা দাবি করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদেরকে অধিক সংখ্যক নিয়োগের দাবি করা হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়। ভাষা আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। কিন্তু কালক্রমে এটি রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। অনেক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ফলে পূর্ববাংলায় স্বাধিকারের চিন্তাচেতনা শুরু হয়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন,

> বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের সব শ্রেণীর মানুষ যে সাড়া দিয়েছিল তার কারণ ভাষা কেবল মধ্যবিত্তের সম্পদ নয়, তা সকলেরই সাধারণ ও মিলিত সম্পত্তি, যাকে রক্ষা করা চাই, রক্ষা না-করলে স্বাধীনতা থাকবে না। মানুষ এটা বুঝে নিয়েছিল পাকিস্তানের সেই দিনগুলোতে। উপলব্ধিটা ক্রমাগত ব্যাপক ও গভীর হয়েছে, যে জন্য অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবি ক্রমান্বয়ে পরিণত হয়েছে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার দাবিতে। 'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই' বলে যে ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনিটা একদিন ছাত্রদের মিছিল থেকে চকিতে উঠেছিল, মিছিলের লোকরাই তাকে সেদিন থামিয়ে দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু পরে তাকে তাঁরা কেন, শাসকেরা থামাতে পারে নি, বন্দুক, কামান, গুলি, জঘন্যতম নৃশংসতা ইত্যাদি সত্ত্বেও নয়।[৪০]

পরবর্তী আন্দোলনসমূহে ভাষা আন্দোলন প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলন এক ধরনের প্রাদেশিকতাবাদের জন্ম দেয়। এরপর যখনই পূর্ববাংলার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো দাবি উচ্চারণ করা হয়েছে তখনই পূর্ববাংলাবাসীর সমর্থন অর্জন করেছে। বাংলা ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের বৈরী মনোভাবের কারণে এই দল থেকে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ প্রভৃতি নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের প্রাধান্য খর্ব হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এই দলের চরম পরাজয় ঘটে। ভাষা আন্দোলন ছাত্রসমাজকে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের মাত্র দুই মাসের মধ্যেই (এপ্রিলে) পূর্ববাংলায় ছাত্র ইউনিয়ন নামে ছাত্রসংগঠন জন্মলাভ করে। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে তাই দেখা যায় ছাত্রসমাজই ছিল মূল শক্তি। যে কোনো সরকারের যে কোনো অন্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারণ করে ছাত্রসমাজ। ভাষা আন্দোলন

ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতি সকল পেশার লোকদের মধ্যে ঐক্যের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, পরবর্তী আন্দোলনসমূহে আমরা তার পুনরাবৃত্তি দেখি।

ভাষা আন্দোলনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এর সঙ্গে জড়িত নেতৃবৃন্দ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবর্তন করেন। পার্লামেন্টের মধ্যে কংগ্রেস দলীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভাষার দাবিতে কথা বলেছেন, আর রাজপথে অকংগ্রেসীয়রা ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ নামের বৃহৎ রাজনৈতিক দলটি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করে এবং ১৯৫৫ সালে পার্টির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে পার্টিকে সকল ধর্মের লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফলে পরবর্তী আন্দোলনসমূহে নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাতে চলে যায়। ভাষা আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ছাত্রীদের বোরখা পড়ার অভ্যাস কমে যায়। পরবর্তীকালে সভা-সমিতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের ধারা সৃষ্টি হয়। রাজনীতিতেও মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল। ভাষা আন্দোলন থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।

নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্বকরণ

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার দীর্ঘ নয় বছর পর নানা জটিলতা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অবশেষে ১৯৫৬ সালে দেশে পার্লামেন্টারি ধাঁচের সংবিধান প্রণীত হয়। সংবিধান প্রণয়নে প্রথম এবং দ্বিতীয় গণপরিষদ ভূমিকা রাখে।[৪১] শুরুতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক উত্তর ভারত থেকে আগত মোহাজের ও পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের উর্দু-ভাষী রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে চলে যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ এই সময়ে পাকিস্তানের আটজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একমাত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছাড়া সবাই ছিলেন অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি। চারজন রাষ্ট্রপ্রধানের সকলেই ছিলেন অবাঙালি ও উর্দু-ভাষী।[৪২] পূর্ববঙ্গের শাসক দলকে নিয়ন্ত্রণ করেছে পাঞ্জাবি শাসকচক্র। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার হলেই তারা খুশি থেকেছেন এবং পরিণামে বাঙালিদের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। মুসলিম লীগের নেতারাও তা উপলব্ধি করেন এবং এ কারণেই ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন তারা বার বার পিছিয়েছেন।[৪৩] ১৯৪৯ সালে এই প্রদেশের উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের পর তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযান আরম্ভ করেন। বাংলার যে সব মুসলিম নেতা পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তাঁদেরকে ভারতের দালালরূপে চিহ্নিত করে তাঁদের ওপর জেল-জুলুম চালানো হয়। অপরদিকে প্রদেশের অন্যান্য উপ-নির্বাচনও স্থগিত রাখা হয়। এমনকি এই প্রদেশের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্তও স্থগিত রাখা হয়। ফলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।[৪৪] মূলত কয়েকটি উপ-নির্বাচনে সরকারি দলের বিপর্যয় দেখে নির্বাচনের দিন পিছানো হয়েছিল।[৪৫] অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, একটা সময় দেখা গেল প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে চৌত্রিশটি আসন শূন্য পড়ে আছে।[৪৬] শেষ পর্যন্ত ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকরা সর্বজনীন ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফল তাদের পক্ষে সন্তোষজনক হবে এ ভরসাও তারা করতে পারছিলেন না। এ সমস্যাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণ, পাকিস্তানের শাসক আমলাদের অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি, যাদের কোনো রকম সমর্থন ছিল না পূর্ববঙ্গে অথচ পূর্ববঙ্গবাসীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। শাসকদের মধ্যে আবার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পাঞ্জাবিরা যারা সামরিক-বেসামরিক দু'ক্ষেত্রেই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে নির্বাচন স্থগিত হয়।[৪৭]

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সংকট পথ প্রশস্ত করেছিল দু'টি রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টিতে, যে দু'টি সংগঠন অচিরেই পূর্ববঙ্গের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। এ দু'টি দল হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ–যা

গঠিত হয় ১৯৪৯ সালে এবং কে এস পি–যা গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক। কে এস পির নেতা ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। নবগঠিত দল দু'টি সহজেই পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের বৈষম্য তুলে ধরতে পেরেছিল। মূল বিষয়গুলো ছিল শাসন করছে অবাঙালি বিশেষ করে পাঞ্জাবি আমলারা। পূর্ববঙ্গের পাট বিক্রি করে অর্জিত হয় বৈদেশিক মুদ্রা আর তা ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নে। যে ভোগ্যপণ্য আমদানি করা হয় তা প্রথমে আসে করাচিতে তারপর ফের রফতানি করা হয় পূর্বাঞ্চলে। দাম তখন তার বৃদ্ধি পায়। নথিপত্রেই এর প্রমাণ ছিল ভূরিভূরি।[৪৮] জাতীয় পরিষদের নির্বাচনগুলো ১৯৫০-১৯৫১ সালে নিষ্পন্ন হলেও পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচন ১৯৫৪ সালের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নি। পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগের দুর্বল নেতৃত্বের স্বার্থেই যে এই নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছিল তা অতি স্পষ্ট।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ফলাফল নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার খাজা নাজিমউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে অপসারণ করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসায়। কারণ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। স্মর্তব্য যে, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে ঘোষণা দেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এক রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি বরকত-সালাম-রফিক-জব্বারসহ নাম না-জানা আরও অনেকে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন এবং মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, মওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, শামসুল হকসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। খাজা নাজিমউদ্দীনের দুর্বল নেতৃত্ব এই ধর-পাকড় ও রক্তারক্তির ফলে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তায় একদম ধ্বসে পড়ে।

নির্বাচন উপলক্ষ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে শেরে বাংলা ফজলুল হক, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীর যুক্ত নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের কোনো জোট গঠিত হতে পারে তা ধারণা করে নি। কারণ সেই সময় শেরে বাংলা ফজলুল হক পূর্ব-পাকিস্তানে অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি বৃদ্ধ বয়সে এই পদ ত্যাগ করে আবার রাজনীতিতে অবতীর্ণ হবেন এবং শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আতাঁত করবেন, এটা ছিল তাদের কল্পনাতীত।[৪৯] ১৯৫৪ সালে, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছিল মুসলিম লীগের কপালে কী আছে। গঠিত হলো যুক্তফ্রন্ট যার প্রধান শরিক ছিল আওয়ামী লীগ (মুসলিম শব্দটি তখন বাদ গেছে) ও কে এস পি। ফ্রন্টে আরও ছিল ডানপন্থি নিজাম-ই-ইসলামী ও বামপন্থি দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার হলো 'একুশ দফা' যা রচনা করেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ এবং যা তাঁর ভাষাই 'এই একুশ দফা মেনিফেস্টো পরবর্তীকালে পূর্ব-বাংলার ছাত্র-জনতার জীবন-বাণী হয়ে দাঁড়িইয়াছিল।'[৫০] অন্যদিকে, সরকারি মুসলিম লীগ একুশ দফার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন,

> ২১ দফাকে জনগণের শত্রুরা প্রথমঃ 'ইউটোপিয়া' ও মিথ্যা স্তোক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁদের মতে ২১ দফার বেশির ভাগ ওয়াদাই ইম্‌প্র্যাকটিকেবল। যুক্তফ্রন্টের নেতারা জানিয়া-শুনিয়াই এইসব মিথ্যা ওয়াদা করিয়াছেন।[৫১]

কিন্তু জনগণ যুক্তফ্রন্টের প্রতি আস্থা রাখে। ফলে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হলো মুসলিম লীগ। যুক্তফ্রন্ট তুলে ধরেছিল বাঙালিদের ওপর পাঞ্জাবিদের আধিপত্যের কথা। বাংলা ভাষার অবমাননার কথা, বৈষম্যের কথা। ৩১০ সদস্যের আইন সভায় মুসলিম লীগ পেল মাত্র ৯টি আসন এবং শতকরা আড়াইভাগ ভোট।[৫২] হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দী মোর্চা নির্বাচনে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। বাকি আসনগুলো অন্যান্য দল পায়।[৫৩] মার্চ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।[৫৪]

মুসলিম লীগের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ও ফলাফল বিশ্লেষণ

ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জাতি ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানবাদী চেতনার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে। সামন্ত-আদর্শপুষ্ট পুঁজিপতি শ্রেণি ও আমলানিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় প্রশাসন নির্বাচনের ফলাফল খুই উদ্বিগ্ন হয়।

নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়-বরণ করে মুসলিম লীগ দল ও সরকার নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করে। স্বয়ং নূরুল আমিন সাংবাদিকদের নিকট বলেন, 'পূর্ববঙ্গের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় নি।' পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি গিয়াসুদ্দিন পাঠান ৯ মার্চ (১৯৫৪) পূর্ববঙ্গের গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে মুসলিম লীগের অভিযোগ জানান। পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি মঈনউদ্দিন আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন,

> লীগ মনোনীত প্রার্থী ও তাঁহাদের এজেন্টদের নিকট হতে লীগ অফিসে এই মর্মে বহু লিখিত অভিযোগ এসেছে যে, অনেক প্রিসাইডিং অফিসার ও অনেক পোলিং অফিসার প্রকাশ্যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। কতিপয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বহু যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। তারা নিজেদের দলের জন্য ক্যানভাস করে। অধিকন্তু কয়েকজন মুসলিম লীগ ভোটারকেও টানাহেঁচড়া করেন।[৫৫]

আজাদ পত্রিকা ৯ মার্চের সংখ্যায় 'নির্বাচন সুষ্ঠু' হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিল, মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় বুঝতে পেরে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই ঐ পত্রিকায় ১১ মার্চ 'তদন্ত ও প্রতিকার' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় লেখা হয়। ঐ সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'যেসব ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাদের সুমহান দায়িত্ব পালন করেন নি কিংবা ইচ্ছা করে অন্যায় এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করেছেন তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।'[৫৬] এ নির্বাচনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত ছাত্ররা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা স্বেচ্ছায় গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল নির্বাচনি প্রচারে। যুক্তফ্রন্টের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যেও একটি বড়ো অংশ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ সিভিল সোসাইটির জয় যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছিল।[৫৭]

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে দলের নেতৃবর্গ নিজেদের ভাগ্যগড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়ে অবহেলা করেন। ফলে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দলের অনেক পুরাতন এবং জনপ্রিয় নেতা ও সদস্য বিভিন্ন কারণে দলত্যাগ করেন এবং নতুন দল (যেমন আওয়ামী মুসলিম লীগ) গঠন করেন। ফলে দলের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া মুসলিম লীগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে বহুমুখী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, সে জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগকেই দায়ী করেন এবং নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ে। মুসলিম লীগের পূর্ব বাংলা শাখা এবং পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকার এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। লবণ, কেরোসিন ও সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহবধূরাও মুসলিম লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।[৫৮] গৃহিণীদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। গৃহিণীরা সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মন্ত্রী আতাউর রহমানকে ঘেরাও করেন। সেটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে কোনো মন্ত্রীকে নারীদের নেতৃত্বে ঘেরাও আন্দোলনের প্রথম ঘটনা।[৫৯] গৃহিনীরা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। তাছাড়া তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না করে আপামর জনসাধারণকে ক্ষুব্ধ করে। দীর্ঘ ৭ বছরেও সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীর নিকট দলের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।

ফলে নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কোনো বক্তব্যই জনগণকে খুশি করতে পারে নি। অপরপক্ষে, ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী–এই তিনজনের নির্বাচনি প্রচারণার ফলে দেশময় যে প্রাণচাঞ্চল্য এলো, তাতে মুসলিম লীগের মতো ক্ষমতাসীন দল ভেসে গেল।

মুসলিম লীগের মুখপত্র *আজাদ* পত্রিকা এই দলের পরাজয়ের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করে,

> সাধারণভাবে লীগের পরাজয়ের যেসব কারণ সর্বত্র আজকাল আলোচিত হইতেছে সেসবের ভিতর রহিয়াছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের এবং লীগের কতিপয় নীতি ও কার্যের প্রতিবাদ। লীগের পরাজয়ের কারণগুলো হচ্ছে : (১) বাংলাভাষার দাবীর প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন-নীতি; (২) পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের নীতি, সমদর্শিতার অভাব; অবিচার ও শোষণ নীতি; (৩) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসন না-দেওয়ার প্রস্তাব ও মনোভাব; (৪) পূর্ব বাংলার জনগণের আর্থিক দুর্দশা; (৫) শাসনতন্ত্র রচনার বিলম্ব; (৬) লীগের

গণসংযোগের অভাব; (৭) লীগ ও মন্ত্রিত্বের একীকরণ; (৮) লীগের ভিতর বিপুল ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাব; (৯) দুর্নীতি দমনে সরকারী ব্যর্থতা এবং এইভাবে এই তালিকায় আরও কারণ যোগ করা যাইতে পারে।[৬০]

পূর্ব বাংলায় ৫৪-এর নির্বাচন ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন হয়েছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচনে সরকারি দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল অবাক করা ঘটনা। নির্বাচনে তৎকালীন সরকার কারচুপির প্রচেষ্টা করে নি। কিন্তু পূর্ব বাংলায় নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে মুসলিম লীগ বার বার নির্বাচন পিছিয়েছে। একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট বন্ধ হতে পারে না, একটি নির্দিষ্ট সময় থাকবে তারপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট দিনে ভোট হবে কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর সব দেশেই নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ থাকে অর্থাৎ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে একটি ব্যতিক্রমী বিষয় হলো সরকারি দল মুসলিম লীগ দাবি করে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নি। এবং লক্ষণীয় বিষয় কারচুপির এই অভিযোগটি করছে সরকারি দল। ৫৪-এর নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল এবং তারা ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার দাবির সপক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে ঐ দলের সদস্যসংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে পাকিস্তানের কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের এই পতনের পর আর কখনও তারা শক্তিশালী হতে পারে নি।

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে। এই চক্রান্ত তরান্বিত করে আমলারা। এ প্রসঙ্গে *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম* গ্রন্থে মুনতাসীর মামুন ও অন্যান্যরা বলেছেন,

> ১৯৫৪ সালের এই বিজয় ধরে রাখা দূরের কথা সংহতও করতে পারেনি পূর্ববঙ্গের রাজনীতিকরা। শাসক চক্রের চক্রান্ত তারা রুখতে পারেনি। এই শাসক চক্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল আমলা যারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণে, দীর্ঘদিন ধরে তারা অভ্যস্ত ছিল জনসমর্থনহীন মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণে। যুক্তফ্রন্টের জনসমর্থনের ভিত্তি ছিল বিরাট সুতরাং পাকিস্তানের শাসক আমলারা বুঝতে পারছিলো না একতরফাভাবে ক্ষমতাচ্যুত না করে কিভাবে এর ওপর আধিপত্য বিস্তার করা যায়। যুক্তফ্রন্টকে অপসারণের অন্য আরেকটি কারণ ছিল। পাকিস্তান তখন অপেক্ষা করছিলো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তিতে উপনীত হতে। এ চুক্তি হলে আমলাচক্রের হাতে আসবে প্রচুর সম্পদ এবং যুক্তফ্রন্ট ছিল এ ধরনের চুক্তির বিরুদ্ধে।[৬১]

সামন্ত-আদর্শপুষ্ট পুঁজিপাতি শ্রেণি ও আমলানিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় প্রশাসন নির্বাচনের ফলাফলে খুবই উদ্বিগ্ন হয়। এক দশকের আন্দোলন ও সংগ্রামী অভিজ্ঞতার যোগফল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবনে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তাবিকাশের লক্ষণসমূহ স্পষ্টতর হতে থাকে। সামন্ত-মূল্যবোধ ও ধর্মাদর্শপুষ্ট রাজনীতির প্রতি জনমানসের বিতৃষ্ণা ও অনাগ্রহ পাকিস্তানবাদী শাসনযন্ত্রকে করে তোলে ভীত ও সন্ত্রস্ত। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির কবল থেকে প্রকৃত রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রক্ষমতা স্থানান্তরিত হওয়ার আশংকায় নব্য-ঔপনিবেশিক পাকিস্তান প্রশাসন ষড়যন্ত্রের পথকেই গ্রহণ করলো অনিবার্য হিসেবে। জাতিক ও আন্তর্জাতিক বিচিত্র ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বশক্তির আদর্শ-পুষ্ট পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্র গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনকে করে তোলে অবশ্যম্ভাবী।[৬২]

আমলারা প্রথম থেকেই যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরাতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালাতে থাকে। যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এ লক্ষ্যে নির্বাচনের পর শাসকগোষ্ঠী ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান জানালেন। যদিও ফজলুল হককে তখনও যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হন নি। নেতা নির্বাচিত হলেন ২ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে। ৩ এপ্রিল মধ্যরাতের মধ্যে গভর্নর বললেন মন্ত্রিসভার নাম দিতে। মধ্যরাতের মধ্যে ফজলুল হক মাত্র তিনজনের নাম স্থির করতে পারলেন যাঁদের একজনও আওয়ামী লীগের ছিলেন না। এতে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিলের আগে ও পরে মন্ত্রিসভা নিয়ে নানারকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলে। ফলে, ভাসানী ও ফজলুল হকের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। বস্তুত মন্ত্রিসভা গঠন নিয়েই বলা যেতে পারে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। ফজলুল হকের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও

স্বার্থ ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হলেন।[৬৩] পরবর্তীকালে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। প্রথম দফায় মন্ত্রিসভা গঠনের এক মাস বারো দিন পর ১৫ মে তা সম্প্রসারিত হয়। এবার মন্ত্রিসভায় আরও ১০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হন ৭ জন আওয়ামী লীগের, ৩ জন কৃষক-শ্রমিক পার্টির।[৬৪]

নির্বাচিত হওয়ার পর ফজলুল হক ৩০ এপ্রিল সরকারি সফরে কলকাতা যান এবং এক সংবর্ধনা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগ-আপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙালীত্বকে কোনো শক্তিই কোনোদিন ভাগ করতে পারবে না। দুই বাংলার বাঙালী চিরকাল বাঙালীই থাকবে।'[৬৫] ফজলুল হকের এ সব মন্তব্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তথা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে অপসারণের উপায় খুঁজে পেল। মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরাতে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখল। তারা আদমজী জুট মিলে, কর্ণফুলী পেপারস মিলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর দোষ চাপাল।[৬৬] এরপরেও ক্ষান্ত হলো না, ফজলুল হককে বেকায়দায় ফেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কাজে লাগালো করাচিতে নিযুক্ত *নিউইয়র্ক টাইমসের* সংবাদদাতা জন পি ক্যালহানকে। ২০ মে ক্যালহানের নেওয়া ফজলুল হকের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হলো ঐ কাগজে। রিপোর্টের মূল বিষয় ছিল, ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা চান, কেননা শুধু ভৌগোলিক দিক দিয়েই পাকিস্তানের দু'টি অঞ্চল শুধু আলাদাই নয়, এর অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই আলাদা। ফজলুল হক এ রিপোর্টকে অসত্য উল্লেখ করে প্রতিবাদ জানায়। তিনি বলেন, 'পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের কথা তিনি বলেছেন স্বাধীনতার কথা নয়।' কিন্তু ক্যালাহান স্বীকারই করলেন না যে তাঁর রিপোর্টে তথ্যগত ভুল আছে।[৬৭]

কেন্দ্রীয় সরকার আসল উদ্দেশ্য ধামাচাপা দেওয়ার জন্য হক মন্ত্রিসভা সর্ম্পকে নানারকম কটূক্তি করতে লাগে। হক মন্ত্রিসভাকে অক্ষম, জাতীয় সংহতির প্রতি হুমকি, কমিউনিস্ট ও ভারতীয় এজেন্টদের আশ্রয়দাতা হিসেবে অবহিত করা হয়। ৩০ মে, ১৯৫৪ সালে কেন্দ্র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অপসারণ করলো।[৬৮] এভাবে সরকার গঠনের ৫৬ দিনের মধ্যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম হয়।[৬৯] ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয় যার মেয়াদ ছিল স্বল্পকালীন। পরবর্তী বছরে পুনরায় সরকার গঠিত হয় তবে ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ বিভেদের কারণে অর্জিত ঐক্য বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যুক্তফ্রন্টের সংহতি বিনষ্ট হলে কোয়ালিশন রাজনীতি, দুর্বল দল ব্যবস্থা এবং অস্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা পায়।[৭০] ফজলুল হককে কেন্দ্রীয় সরকার 'বিশ্বাস-ঘাতক' বলে চিহ্নিত করে। কারণ তার সরকার শুধু যে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ তা নয় একইসাথে প্রদেশকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে।[৭১] ফজলুল হকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল তার যে কোনো ভিত্তি ছিল না তা প্রমাণিত হলো তাঁকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও পূর্ববঙ্গের গর্ভনর হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, হক মন্ত্রিসভা অপসারণের ফলে জোরালো কোনো প্রতিবাদ হয় নি। বরং অনেক রাজনীতিবিদ নিজ সামান্য স্বার্থে এমন আচরণ করেছে যা সিভিল সমাজের বদলে আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকার গঠনে সাহায্য করে। অনেকে আতাঁত করে হতে চেয়েছেন ক্ষমতার অংশীদার এবং এ ধরনের আচরণই উন্মুক্ত করেছিল ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করতে।[৭২] ১৯৫৪ সালের এতবড়ো বিজয় যা ছিল সিভিল সমাজের বিজয় তা কেন রাজনীতিকরা ধরে রাখতে পারলেন না? কেন হটে আসতে হলো সিভিল সমাজকে? এবং এর জন্য কী চরম মূল্য দিতে হয়েছিল? এ সব প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহমদের লেখায়। তাঁর উদ্ধৃতি–

> যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে পূর্ব বাংগালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সৌভাগ্য সূর্য উদিত হইয়াছিল, প্রভাতেই এমনি করিয়া তাতে গ্রহণ লাগিল। পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, সে গ্রহণ আজও ছাড়ে নাই। পিছনের দিকে তাকাইয়া এত দিন পরেও আজ মনে হয়, যদি তিন প্রধানের বিরোধ না হইত, যদি যুক্তফ্রন্টের সর্বসম্মত মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিত, যদি হক সাহেব ও শহিদ সাহেব স্ব স্ব প্রিয়পাত্রের জন্য যিদ না করিতেন, যদি মওলানা ভাসানী নিরপেক্ষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, যদি হক সাহেব লিডার নিযুক্ত হইয়াই গণ-পরিষদের মেম্বরগিরি নিজে ছাড়িতেন এবং অন্যান্যদের ছাড়িবার নির্দেশ

দিতেন, যদি তিনি ২১ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে ধীরে ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেন, যদি হক সাহেব কলিকাতা সফরে গিয়া রাজনৈতিক দুশমনদের অজুহাত না দিতেন, তবে পূর্ব বাংলার ভাগ্যে কি কি কল্যাণ হইতে পারিত তা আজ সহজেই অনুমেয়। পূর্ব বাংলার সরকারের জনপ্রিয়তার সঙ্গে তার ঐক্য ও স্থায়িত্বের মুখে নির্বাচনে পরাজিত সরকারী দল আমাদের দাবী মানিয়া লইতেন, গণপরিষদে নয়া নির্বাচন হইত, নয়া নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা অবিলম্বে পূর্ব বাংলার গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচিত হইত; পাকিস্তানে গণতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে রূপায়িত হত পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান চরম দুর্ভাগ্যসমূহের একটিও ঘটিতে পারিত না।[৭৩]

১৯৫৪ সালের ঘটনাই আমরা দেখি ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আতাঁত করছে কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য দেখা দেয়। অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যাতে ঐক্য না থাকে সেজন্যে মুসলিম লীগ সরকার আমলাদের প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে গেছে এবং সফল হয়েছে।

রাজনীতিবিদদের অগণতান্ত্রিক আচরণ

পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদে বাঙালি মুসলিম লীগ সদস্যরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু প্রাদেশিক নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ায় ও যুক্তফ্রন্টকে অন্যায়ভাবে অপসারণ করায় তাদের জনপ্রিয়তা ও সম্মান হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে মুসলিম লীগ সদস্যরা উদ্যোগ নিলেন ১৯৩৫ সালের 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' সংশোধন করার। এই 'অ্যাক্ট'-এর একটি ধারা অনুযায়ী 'যে-কোনো মন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারতেন গভর্নর জেনারেল'। এ ধারাটি সদস্যগণ এরূপভাবে সংশোধন করতে চাইলেন যে, 'প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকে তবে তাঁকে অপসারণ করা যাবে না।' গভর্নর জেনারেল গুলাম মহম্মদ এ ধরনের উদ্যোগ মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। ১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর তিনি গণপরিষদ বাতিল করে দিলেন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা অন্যায়ভাবে অপসারণের পরও সিভিল সমাজ থেকে প্রতিবাদ না আসায় তিনি আরেকটি অন্যায় করার সাহস পেয়েছিলেন।[৭৪]

যুক্তফ্রন্টের নেতাদের পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থ বিসর্জন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

শুধুমাত্র কিছু দলীয় সুবিধার কারণে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেল। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের অভিমত হুবহু মিলে যায়। তিনি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ক্ষমতায় যাওয়া সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ক্ষমতায় যাওয়া যেতে পারে, তবে জনসাধারণের জন্য কিছু করা সম্ভব হবে না, আর এ ক্ষমতা বেশিদিন থাকবেও না। যেখানে আদর্শের মিল নাই সেখানে ঐক্যও বেশিদিন থাকে না।'[৭৫]

আদর্শ ও নীতির মিল না থাকায় যে বিভেদের সৃষ্টি হয় তাকে কাজে লাগিয়ে আমলাতান্ত্রিক শাসকচক্রের পক্ষে শাসনতন্ত্র রচনার সময় এমনসব ধারা রাখা সম্ভব হয় যাতে যুক্তফ্রন্টের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উহ্য থাকে এবং স্বাভাবিকভাবে আইনসভায় পূর্ববঙ্গের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কথা তা থেকে বঞ্চিত হয়। আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহ্‌রাওয়ার্দী তৈরি করলেন শাসনতন্ত্রের খসড়া (১৯৫৬ সালে যা গৃহীত হয় পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রূপে) এবং সে খসড়ায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কোনো উৎসাহই দেখালেন না অথচ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তা ছিল একটি দাবি। বরং পশ্চিম পাকিস্তানকে এক 'ইউনিট' করার প্রস্তাবে সমর্থন করলেন। এক ইউনিটের অর্থ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আসন সংখ্যা সমান করে দেওয়া।[৭৬] ফেডারেল কোর্ট পরামর্শে ৭ জুলাই, ১৯৫৫ সালে গুলাম মহম্মদ দ্বিতীয় গণপরিষদ আহ্বান করেন। পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে সমসংখ্যক সদস্য এতে যোগ দিলেন এবং এভাবে পূর্ববঙ্গের রাজনীতিবিদগণ আবার পশ্চিমা শাসকচক্রের আধিপত্য মেনে নিলেন। প্রতিরোধ করলে যেখানে তারা পেতেন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেখানে তারা মেনে নিলেন সংখ্যা সাম্য।[৭৭] পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ও গণপরিষদে সংখ্যার সাম্যের কারণে শাসক আমলাদের বাংলা ভীতি আর রইলো না। ফলে, একটি শাসনতন্ত্র রচনাতেও আর দেরি হলো না। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান[৭৮] চালু হয়। সংবিধানে পূর্ববঙ্গের নাম বদলে রাখা হয় পূর্ব-পাকিস্তান।[৭৯]

১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রবর্তিত হলে ফজলুল হক হলেন গর্ভনর জেনারেল এবং তার অনুগত আবু হোসেন সরকার হলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাদেশিক সভায় আবু হোসেন সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে হবে তাই সিভিল সমাজের নৈতিকতা ভঙ্গ করে তারা বিরত থাকলো আইনসভা আহ্বানে। একবার শুধু স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের জন্য সভা ডাকা হয়েছিল ।

মীর্জা ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা বাতিল করে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসালেন। মুসলিম লীগের ভাঙন সৃষ্টি করে ইস্কান্দার মীর্জা 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে এক নতুন দল গঠন করলেন। ডা. খান সাহেব হলেন এর নেতা। চৌধুরী মহম্মদ আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এবং যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে হতাশ ও ক্ষুব্ধ মুসলিম লীগাররা এতে যোগ দিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর রিপাবলিকান ও আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন করে সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করলো।[৮০]

১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে বললেন। আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে এর প্রতিবাদে হরতাল ডাকল। কিন্তু হরতাল ব্যর্থ হলো কারণ সোহ্‌রাওয়ার্দীর জন্য তেমন সহানুভূতি অবশিষ্ট ছিল না। ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ, বাজেট তখনও পাশ হয় নি এবং প্রাদেশিক আইনসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অধিবেশন চলবে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত, তখন আতাউর রহমান গর্ভনরকে অনুরোধ জানালেন সভা স্থগিত রাখতে। গর্ভনর ফজলুল হক এ দাবি প্রত্যাখান করে বললেন, পরিষদে আতাউরের সংখ্যাগরিষ্ঠাতা নেই। মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন গভর্নরকে বরখাস্ত করতে। ফজলুল হক পাল্টা শোধ হিসেবে আতাউর রহমানকে বরখাস্ত করে ৩১ মার্চ আবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করলেন। শুধু তাই নয়, স্পিকারের পরামর্শে সভা মুলতুবি করলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সেই রাত্রেই প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে ফোন করে জানালেন, গভর্নরকে বরখাস্ত না করলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী তখনই ফজলুল হককে বরখাস্ত করে মুখ্য সচিব হামিদ আলীকে পূর্ব-পাকিস্তানের অস্থায়ী গভর্নর নিয়োগ করলেন। ১ এপ্রিল, অবাঙালি সি এস পি হামিদ আলী আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত করলেন। বারো ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রিত্ব হারালেন সরকার। হামিদ আলী গভর্নর হয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে আতাউর রহমানকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করলেন।

১৯৫৭ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুসলিম লীগের পতনের কথা স্মরণ করে দিয়ে বলেনি,

> ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান কায়েম হবার পরে পাকিস্তানে অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। আমি নিজে ত বটেই, আজ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরও অধিকাংশ মুসলিম লীগের সভ্য ছিলেন। জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল তখন মুসলিম লীগের উপর। পাকিস্তানকে শক্তিশালী সুদৃঢ় ও দুর্নীতি-কালোবাজারী প্রভৃতি সর্বপ্রকার কলুষ থেকে মুক্ত করার, অপরিসীম আগ্রহ ও কর্মস্পৃহা তখন দেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। সরকারী কর্মচারিগণ তখন আট ঘণ্টার স্থলে প্রয়োজনবোধে ষোল এমন কি আঠারো ঘন্টা খাটছেন। ঘুষখোরী, মুনাফাখোরী প্রভৃতি ভাটার পথে। মুসলিম লীগ দেশবাসীর এই অকুণ্ঠ কর্মস্পৃহা; নিঃস্বার্থ দেশ-সেবা ও বিপুল স্বাদেশিকতার বলে বলীয়ান। কিন্তু মাত্র নয়টি বৎসর না যেতেই আজ মুসলিম লীগ জনসাধারণের মন থেকে ধুয়ে মুছে গেল। এত বড় একটা রাজনৈতিক দলের এরূপ অপমৃত্যু পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিগত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের যে হার হয়েছে সেরূপ হার পৃথিবীর কোন দেশে কোন ক্ষমতাসীন দলের হয়নি।[৮১]

এর পরে তিনি আরও বলেন, 'মনে রাখতে হবে অতন্দ্র দৃষ্টি এবং সর্বদা তীক্ষ্ণ প্রহরাধীন না রাখলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু যত শীগগির ডেকে আনে এত শীগগির আর কিছুতে আনে না। বিরোধী দল হিসাবে দু-একটা ভুল করলে সর্বসাধারণ অনেক সময় ক্ষমা করে থাকে; কিন্তু ক্ষমতাসীন দল হিসাবে ভুল করলে সে ভুলের ক্ষমা নেই।'[৮২]

১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বলেন, 'দলের কোন নেতা একইসঙ্গে মন্ত্রী এবং সম্পাদকের পদ দখল করে রাখতে পারে না।' শেখ মুজিবর রহমান স্বপ্রণোদিত হয়ে মন্ত্রিত্বের পদ ত্যাগ করে রাজনৈতিক মহলকে স্তম্ভিত করেন।

তিনি বলেন, মন্ত্রিত্বের চেয়ে আমার কাছে আওয়ামী লীগের সম্পাদকের দায়িত্ব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'[৮৩] করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী করায় এবং ঢাকাকে 'দ্বিতীয় রাজধানী' না করায় প্রথম থেকেই ভাসানী ক্ষুব্ধ ছিলেন।[৮৪]

১৯৫৭ সালের ১৪ জুন ঢাকায় এক বক্তৃতায় সোহ্‌রাওয়ার্দী ঘোষণা করেন, পূর্ব-পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন দাবির ৯৮ ভাগ পেয়েছে। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী ক্ষমতায় থাকলেও তার অবস্থান খুব বেশি শক্ত ছিল না। ইস্কান্দার মীর্জা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে এরই মধ্যে বদল করতে চাইলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী চাইলেন, আইনসভায় তাঁর শক্তি পরীক্ষা করতে কিন্তু মীর্জা এতে রাজি হলেন না কারণ তাতে গণপরিষদ হয়ে ওঠে নীতিনির্ধারক। তিনি বললেন, সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে হবে অথবা তাঁকে বরখাস্ত করা হবে। সোহ্‌রাওয়ার্দী পদত্যাগ করলেন। আই আই চুন্দ্রিগড় হলেন প্রধানমন্ত্রী; ৫৯ দিন পর প্রধানমন্ত্রী হলেন মালিক ফিরোজ খান নুন।[৮৫] ১৮ জুন প্রাদেশিক আইনসভায় আতাউর রহমানের সরকার পরাজিত হয়ে ১৯ জুন পদত্যাগ করলো। ২০ জুন আবু হোসেন সরকার হলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১ জুন তাঁর সরকার মুখোমুখি হলো অনাস্থা প্রস্তাবের। সঙ্গে সঙ্গে অধিবেশনকক্ষে উদ্ভব হলো এক অভাবনীয় পরিস্থিতির। শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলো, পদত্যাগ করলের আবু হোসেন সরকার। ২৫ জুন প্রেসিডেন্টের আদেশে স্থগিত হলো অধিবেশন। আওয়ামী লীগ অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নুনকে চাপ দিতে লাগল আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা নিয়োগে। এই চাপ সফল হলো এবং ১৯৫৮ সালের ২৫ জুলাই ক্ষমতা গ্রহণ করলেন আতাউর রহমান। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পক্ষে ও মীর্জার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। শেখ মুজিব এমনও বললেন যে, মীর্জা পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে তিনি না থাকলে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ এ ধরনের প্রচারণা চালায়।

স্পিকার আব্দুল হাকিম ছিলেন কেএসপির। আওয়ামী লীগ চাচ্ছিল তাঁকে হটাতে, কারণ তাদের সন্দেহ ছিল স্পিকারের প্রশ্রয়ে বিরোধী দল শক্তি সঞ্চয় করে পতন ঘটাতে পারে আওয়ামী লীগের। আওয়ামী লীগ সে সময় দলীয় ছয়জন সংসদ সদস্যকে সরকারি উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটারের পদ দেয়। এ কারণে, নির্বাচন কমিশন এক রায়ে জানাল যে, ছয়জনের আসন শূন্য হয়ে যাবে। সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রভাবে ফিরোজ খান নুন কেন্দ্রীয় এক অনুজ্ঞা বলে নির্বাচন কমিশনের রায় কার্যকর করা থেকে বিরত থাকে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ অধিবেশন শুরু হলে, বিরোধী দল এটিকেই আলোচনার প্রধান বিষয় করে তুললো। তারা দাবি তুললো, ঐ ছয়জনের সদস্যপদ বাতিল করতে হবে। স্পিকার জানায় এ বিষয়ে তিনি তাঁর রুলিং দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল আইনসভার পরিস্থিত। সভা যেন পরিণত হলো যুদ্ধক্ষেত্রে। স্পিকার সভা ত্যাগ করলেন। পরে, তাঁর বিরুদ্ধে পাশ হলো একটি অনাস্থা প্রস্তাব। শুধু তাই নয়, আরেকটি প্রস্তাবও পাশ হলো তাঁর বিরুদ্ধে যার মূল বক্তব্য ছিল, স্পিকার 'পাগল'। ২৩ সেপ্টেম্বর অধিবেশন বসলে দেখা গেল, বিরোধীদলের শক্তি হ্রাস পেয়েছে কারণ, আওয়ামী ইতোমধ্যে কয়েকজন কেএসপি সদস্যকে তাদের দলে টেনে নেয়। সরকার পক্ষ দাবি তুলল, ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী কাজ চালাবেন। বিরোধী দল তাতে আপত্তি তুলে বাধার সৃষ্টি করে। সরকার পক্ষ এমন ব্যবস্থা করলো যাতে স্পিকার সভাকক্ষে প্রবেশ করতে না পারেন। শাহেদ আলী বসলেন স্পিকারের আসনে। বিরোধী দল ক্ষিপ্ত হয়ে শুরু করলো ভাংচুর। শাহেদ আলী আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর স্থগিত হলো আইনসভা। ২৬ সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পরলোক গমন করেন।[৮৬] ১৯৫৮ সালে স্বয়ং ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন আইয়ুব খান।[৮৭]

যুক্তফ্রন্ট শাসনকাল পর্যালোচনা

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানি বেনিয়া পুঁজি ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশক্তির ধারক মুসলিম লীগ সর্ববিধ প্রয়াস সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট বিজয়লাভে সমর্থ হলো। নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়েই সূচিত হলো

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম গণতান্ত্রিক বিজয়। ১৯৫৪ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে এই প্রদেশে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসে।
বাংলাদেশের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তির বিজয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, বাংলাদেশে অবস্থানকারী অবাঙালি আমলা ও শিল্পপতিরা হয়ে ওঠে উদ্বিগ্ন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ম্যানিফেস্টোতে স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গ থাকায় পাকিস্তানি পুঁজির একচেটিয়া স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওবার আশংকা দেখা দিলো। কিন্তু মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে এবং সর্বোপরি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংখ্যালঘু সংসদ সদস্যদের ঘনঘন সমর্থন বদলের কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে থাকে। মাত্র চার বছরে সাতটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। ফলে বহু প্রত্যাশিত ২১ দফার দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি এবং দেশের উন্নয়ন সাধনের যে সুযোগ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ পেয়েছিলেন তা তারা নিজেদের সংকীর্ণ দলীয়স্বার্থে কাজে লাগাতে পারেন নি। উপরন্তু যুক্তফ্রন্টভুক্ত একটি দলের (কৃষক-শ্রমিক পার্টির) এমপি-দের দ্বারা অন্যদলের (আওয়ামী লীগের) সমর্থিত স্পিকারকে পিটিয়ে হত্যা করা চুয়ান্নোর নির্বাচনে গঠিত আইন পরিষদের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।[৮৮] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের পর হতেই পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়। প্রথমবার সাফল্যজনকভাবে আঘাত করে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা, নেজামে ইসলাম পার্টির মাধ্যমে। বিরানব্বই ক ধারা জারি হয়। দ্বিতীয়বার সাফল্যজনকভাবে আঘাত করেন সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীর মাধ্যমে। এই দুই নেতা তাদের পাতা ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ঐক্য ভেঙে যায়। রাজনীতিকদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবী মহলের মনে একটা আশংকার জন্ম হয়েছিল। সেই আশংকা সত্য প্রমাণ করে ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর সমগ্র দেশে মার্শাল ল’ জারি হয়। এ সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর *আত্মস্মৃতি*তে বলেন, ‘অবশেষে বুদ্ধিজীবী মহলের প্রায় সকলেই মনে মনে যা আশংকা করছিলেন, তাই ঘটেছে’।[৮৯] মার্শাল ল’ জারি হওয়ার পর মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গে ‘নাজাত’ দিবস পালন করে।[৯০]

সামরিক শাসন জারি

১৯৫৯ সালে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা দেখা দেয়।[৯১] কিন্তু স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যু মধ্যে দিয়ে সীমিত হয়ে এলো পাকিস্তানে পার্লামেন্টের গণতন্ত্রের দিন। ৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন আইয়ুব খানকে। তিন সপ্তাহ পর মীর্জা নিজেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। জেনারেল আইয়ুব খান হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেছেন। ক্ষমতার লোভে, কিছু পাওয়ার লোভে তারাও ইচ্ছেমতো ব্যবহৃত হয়েছেন। সামরিক আইন জারির পর সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে পিছু হটে যায় এবং তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দূরের কথা প্রতিবাদও হয় নি।[৯২] সামরিক শাসনের মাধ্যমে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন ঘোষণা, হুকুম ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, জনগণ প্রতিবাদ করার সুযোগ পেত না। লেলিন আজাদ এ সম্পর্কে বলেছেন,

> এমন কি পুলিশ ও মিলিটারীর হাতে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল যে প্রতিবাদ সভা বা ধর্মঘট তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মানুষ পথে ঘাটেও মুক্তভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। দেশের জনসাধারণ যেন এক অভিভাবকহীন অনাথ লোকালয়ে পরিণত হয়েছিল।[৯৩]

পাকিস্তানের প্রথম দশকের রাজনীতি অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতার আবর্তে ঘুরপাক খায়। কেন্দ্র এবং প্রদেশে ঘনঘন সরকার পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণীত হওয়ার পরও তা লক্ষ্য করা যায়। সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন্দ্র এবং প্রদেশে তাই কার্যকরী হতে পারে নি। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতার সংসদীয় রীতিনীতি সংবলিত সংসদ ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ইতিবাচক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নি। এ রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ নিজেদের অনুকূলে নিতে পাকিস্তানের ভূস্বামী,

আমলা এবং সামরিক বাহিনী কার্পণ্য করে নি। এভাবে সংসদীয় সরকার ও সংবিধানের অবসান ঘটিয়ে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়।[৯৪] আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তন পাকিস্তানের নব্য-উপনিবেশবাদী শাসনতন্ত্রের অন্তর্ঘাতক চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। বাঙালি পাকিস্তান এনেছিল আবেগ দিয়ে। আবেগটা ছিল এ রকম যে, সে মাথা তুলে দাঁড়াবে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে তার সন্তান বড়ো হবে। শাসকরা তার তোয়াক্কা করে নি।[৯৫] এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন বলেছেন,

> ...আইয়ুব খান বা পাকিস্তানের সামরিক জান্তার মূল লক্ষ্য ছিল রাজনীতিকে অরাজনৈতিক করে তোলা। রাজনীতিবিদদের হেনস্থা করা। পূর্ববঙ্গকে তাদের ভয় ছিল বেশি কারণ বাঙালিরা ‘কর্তৃত্ব মানে না’ অর্থাৎ তারা গণতন্ত্রমণা। ‘তারা ... বাঙালি সংস্কৃতির ধারক বাহক।’ শাসকরা এর বিপরীতে চাইছিল পাকিস্তানি সংস্কৃতির বিকাশ যার মূল উপাদান ধর্ম।[৯৬]

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সংসদের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল দুর্বল। মুসলিম লীগের একচেটিয়া মনোভাব সংসদকে নিয়ন্ত্রণসহ সরকার-অভিমুখী করে রাখে। সংসদের স্পিকারও ঈপ্সিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় নি।[৯৭] ১৯৫৪ সালে যখন প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরোনো অত্যন্ত প্রতাপশালী মুসলিম লীগ, যারা এনেছিল পাকিস্তান–সে দলটি হয়ে গেল একেবারে নিশ্চিহ্ন। ফলে সেই মুসলিম লীগ ও তাদের সহযোগীরা সৃষ্টি করলো ১৯৫৮-র।[৯৮]

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ায় পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা একবারে দূরীভূত হয়।[৯৯] অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণের পর আইয়ুব খানের জন্য ক্ষমতা গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা জরুরি হয়ে পড়ে; তাই তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, পূর্ববর্তী শাসনকালে দেশ ধ্বংসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আইয়ুব খান তার ক্ষমতা গ্রহণের আবশ্যকতা প্রমাণ করার জন্য বলেন যে, দেশের রাজনীতিবিদগণের ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থান্ধতা দুর্নীতি, দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা, দেশপ্রেমের অভাব প্রভৃতি কারণে তারা দেশের গঠনমূলক কিছু করতে পারেন নি। সামরিক আইন জারির কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় ১৫০ জন সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং প্রায় ৬০০ জন সাবেক জাতীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তদন্ত করে। রাজনীতিকগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর ‘নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ ১৯৫৯’ [Elective Bodies (Disqualification) Order 1959] সংক্ষেপে EBDO এবং PODO (Public Office Disqualification Order) বা সরকারি পদ লাভে অযোগ্যতা সংক্রান্ত আদেশ নামে দু'টি আদেশ জারি করেন। এই আইনে কেউ দোষী হলে তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে দেশের যে-কোনো নির্বাচিত সংস্থার সদস্য হওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য হবেন। অভিযুক্তরা অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হতেন। এবডো-র আওতায় সামরিক সরকার ৮৭ জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে অভিযুক্ত করেন। তাদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, খান আব্দুল গাফফার খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রমুখ অন্যতম।[১০০] গ্রেফতার করে শাসকগোষ্ঠী ক্ষান্ত হয়নি। বরং তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন জেলেও অব্যাহত থাকে। ১৯৬০ সালের ১৩ নভেম্বর C.I.D-র হেফাজতে বন্দি সাবেক ন্যাপ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নিখিল পাকিস্তান কমিটির অফিস সেক্রেটারী সৈয়দ হাসান নাছির প্রাণ হারায়।[১০১] শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেই নয়, এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও চাকরিচ্যুত করা হয়। যাঁরা চাকরিচ্যুত মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আজিজুর রহমান খান ও এ আই আমিনুল ইসলাম।[১০২]

সামরিক শাসন জারির পরপরই সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণ। দারিদ্র্যতার কষাঘাতে জর্জরিত ছিল এ অঞ্চলের মানুষ। কর্মসংস্থানের অভাবে অভাব অনাটন লেগেই থাকত। এর মধ্যে সামরিক সরকার পূর্বপাকিস্তানে জমিসহ বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্য ও ব্যবসায়ী পণ্যের ওপর অতিরিক্ত খাজনা আরোপ করতে থাকে। অর্থাৎ আইয়ুব খান তার সরকারের সক্ষমতা দেখানোর জন্য জনগণের ওপর করের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করে। এ সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর *আত্মস্মৃতি* প্রথম খণ্ডে লিখেছেন,

চাউলের মণ তখন তিরিশ টাকা। তহশিলদারের উপর সামরিক আইনে নোটিশ এলো, কৃষিঋণ সমেত সমস্ত বকেয়া খাজনা আদায় করতে হবে। কার্তিক মাস। দারিদ্র্য-পীড়িত এ-দেশের লোক এই অভাবের দিনে এ দায় কেমনে শোধ করবে, তাই ভাবছিলাম। গ্রামে গিয়েছিলাম। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়েছি, হোসেন মুনশি, মসজিদে ইমামতি করে। পেটে অন্ন নেই। সে দশটি টাকার জন্যে ধরনা দিল। তাকে কি করে বোঝাই যে আমরাও প্রায় তারই মতো অবস্থা, ঠাটটাই আছে, ভিতরে কিছু নেই।[১০৩]

এমনিতেই শাসকদের ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে সমাজে অর্থনৈতিক দৈন্যদশা বিরাজ করছিল। তার ওপর সামরিক শাসন আসার পর সুশাসন দেখাতে গিয়ে নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসে চরম অত্যাচার ও নির্যাতন।

মৌলিক গণতন্ত্র

সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা চলে। সক্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে করা হয় কারারুদ্ধ। জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা-বিকাশের গতিও এর ফলে বাধাগ্রস্ত হয়। পাঞ্জাবি বেনিয়া পুঁজিবাদী শক্তি তাদের শাসন ও শোষকে দৃঢ়মূল করার লক্ষ্যে রাজনীতির-ক্ষেত্রে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মৌলিক গণতন্ত্র তার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সংগ্রামশীল অগ্রযাত্রায় বিঘ্ন ঘটিয়ে পাকিস্তানি সেনাশাসকগোষ্ঠী 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র চালু করে। সংসদীয় সরকার ও সংবিধানের অবসান ঘটিয়ে সামরিক শাসক আইয়ুব খান অভিনব নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র চালু করেন।[১০৪] তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, পাকিস্তানের মতো একটি অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, চরম দরিদ্র, অশিক্ষিত দেশে পাশ্চাত্য-ধাঁচের গণতন্ত্র উপযোগী নয়। এখানে তাঁর মতে, নিচ থেকে ওপরে, স্তরভিত্তিক পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রযোজ্য। সংক্ষেপে, এই হলো আইয়ুবের তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' এর ধারণাগত ভিত্তি। মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' ঘোষণা করেন। এর দ্বারা দেশে ৫ স্তর বিশিষ্ট পিরামিড আকৃতির একটি কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। এই স্তরগুলো হচ্ছে ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল, বিভাগীয় কাউন্সিল ও প্রাদেশিক কাউন্সিল। ছোটো ছোটো শহরে টাউন কমিটি এবং বড়ো শহরে পৌরসভা গঠনের বিধান করা হয়। এই কাঠামোর সর্বনিম্নে গ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত ইউনিয়ন কাউন্সিল ও শহর এলাকার টাউন কমিটিগুলো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এর উপরের স্তরগুলো পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে গঠিত। আইয়ুবের এই 'মৌলিক গণতন্ত্র' 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' নামেও পরিচিত।

'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থাধীনে পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) করে মোট ৮০,০০০ (আশি হাজার) ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে দেশে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। এদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন বলে বিধান করা হয়।[১০৫] আইয়ুব তাঁর 'মৌলিক গণতন্ত্রের' অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল ব্যতীত অন্য সকল স্তর, দেশের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সবার জন্য পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। বস্তুত এ ব্যবস্থা না ছিল 'মৌলিক' না ছিল 'গণতন্ত্র'। গণতন্ত্রের মুখোশ পরে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক-বেসামরিক আমলাগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ ও কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তাই, যাতে দেশের চিহ্নিত বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকরী করে ফেলে স্থানীয় পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠীর একটি একক সমর্থন বলয় সৃষ্টি হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।[১০৬]

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যে সব আদর্শের কথা বলে শাসন-শোষণ পরিচালনা করছিল তার ভিত আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসে। এমনকি এ সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে সামন্ত মূল্যবোধ, ধর্মমোহ ও সাম্প্রদায়িকতাকে মূলধন করে ক্ষমতায় ছিল তা প্রায় পরাজিত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। আইয়ুব খান তাঁর শাসনব্যবস্থার সূচনায় ঐসব আদর্শকেই ব্যবহার করলো নব-আঙ্গিকে। তবে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে শোষণ করার আদর্শসূত্র হিসেবে ধর্মীয় অখণ্ডতার বোধ যে এ-পর্যায়ে শক্তিশূন্য হয়ে পড়েছিল, সামরিক শাসন তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। ধর্মতন্ত্রের ওপর সেনাতন্ত্রের এই বলশালী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পাকিস্তানবাদী চেতনার আভ্যন্তর-ক্ষয়েরই প্রমাণ।

মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন ও ১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সারা দেশে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে জনসাধারণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণকে অর্থাৎ মৌলিক গণতন্ত্রীগণকে (Basic Democrats বা B. D. Member) নির্বাচিত করেন। উক্ত নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের ৪০,০০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০,০০০ মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের পর আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ১৩ জানুয়ারি The Presidential (Election and Constitutional) Order, 1960 জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্রীগণ একটি রেফারেন্ডামের মাধ্যমে আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করে তাকে একটি সংবিধান প্রণয়নের অধিকার প্রণয়ন করবেন। প্রেসিডেন্ট পদে তার মেয়াদকাল শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য হবে না, বরং ভবিষ্যতে প্রণীত সংবিধানে যে মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হবে–সেই প্রথম মেয়াদকালের জন্য। এইভাবে আইয়ুব খান সামরিক শাসনকে আইনসিদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীরা ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সালে গোপন ব্যালটে 'হ্যাঁ-না' ভোট দিয়ে আইয়ুবকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন। ৭৮,৭২০টি ভোট পড়ে, তন্মধ্যে হ্যাঁ-ভোট ৭৫,২৮২টি ছিল।[১০৭] সামরিক শাসনের প্রতি যে মানুষের সমর্থন আছে তা আইয়ুব দেখাতে চাইলেন নির্বাচনের মাধ্যমে। ১৯৬০ সালের মধ্যে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন সমাপ্ত করলেন এবং আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর প্রদত্ত ভোটে ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৯৫.৬ শতাংশ।[১০৮] ১৯৬০ সালের নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন।

সামরিক আইন প্রবর্তন, প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা, গণতন্ত্রের অবয়বে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংগ্রামশীল চেতনাস্রোতকে সাময়িকভাবে স্তব্ধ করতে সক্ষম হলেও জাতিসত্তার গভীরে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও দ্রোহ ক্রমাগত পুঞ্জিভূত হতে থাকে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রতি মানুষের এতই বেশি ক্ষোভ, ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল যা *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সেই বিখ্যাত উক্তি 'চিনিল কেমনে' শিরোনামের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। একজন মৌলিক গণতন্ত্রীকে একটি ষাড় গুতা দিয়েছিল। এই কথাটি তৎকালীন সমাজের প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে ছিল।[১০৯] আইয়ুব খানের শাসনকালের এই নব প্রেক্ষাপট ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করে।

পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্ররা যে-কোনো সময় সেনা শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে–এ বিষয়ে সামরিক শাসকরা সচেতন ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের নতুন গর্ভনর আজম খান বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের উপদেশ দিতে লাগলেন এ বলে যে, রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের এড়িয়ে চলার জন্য। কিছুদিনের মধ্যেই সুর বদলে গেল জেনারেলের। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে তিনি ছাত্রদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে লাগলেন, যে সব ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হবে তাদের লাথি মেরে বের করে দেওয়া হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, কারণ তাদের ওপর ভর করেছে শয়তান। সামরিক শাসনামলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইউনিয়নের কর্মচাঞ্চল্য খানিকটা থমকে গিয়েছিল যদিও ইউনিয়ন স্থাপনে সরকার বাধা দেয় নি। ছাত্ররা তখনও সরাসরি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নামে নি। কিন্তু, যখনই সুযোগ এসেছে তা যত সীমিতই হোক তা সদ্ব্যবহার করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।[১১০] শাসকগোষ্ঠীর ধারণা ঠিক প্রমাণ করে, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, জাতিগত শোষণ-নিপীড়ন এবং গণবিরোধী শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে জাতীয় চেতনা পুনরুজ্জীবনে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আইয়ুব খান ক্ষমতা সংহত করার পর পাকিস্তানের দু' অঞ্চলের সংহতি বৃদ্ধি করতে এক ভাষার চালুর ওপর গুরুত্ব দেয় এবং তা বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তারা আইয়ুব খানের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন।[১১১]

১৯৬১ সালে আইয়ুব খান মুসলিম পারিবারিক আইন প্রবর্তন করেন।[১১২] 'পারিবারিক আইন ১৯৬১' প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'জাস্টিস রশিদ কমিশনের' সকল সুপারিশ গৃহীত না হলেও নারীসমাজের অধিকার অর্জনের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য

ঘটনা।[১১৩] অন্যান্য বিষয়ের সাথে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীদের সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার বিষয়ে যে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ছিল এই আইনের মাধ্যমে তা অনেকটা দূর করা হয়। বিশেষ করে দাদার বর্তমানে বাবার মৃত্যু হলেও নাতি-নাতনির সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু উলেমা সম্প্রদায়সহ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও ধর্মী নেতারা এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তারা মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১-কে কুরআন পরিপন্থি বলে অবহিত করেন।[১১৪] বাংলায় এই আইনের বিশেষত্ব হলো ধর্মীয় নেতারদের এই বিরোধীতে প্রতিরোধ করার জন্য নারীরা আন্দোলন-সংগ্রামে নামেন। ফলে নারীসমাজ নিজেদের অধিকার কীভাবে আদায় করতে হয় সে সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই নারীরা আন্দোলন-সংগ্রামে ছিল কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ নিয়ে আন্দোলনের পর থেকে সব আন্দোলনে তারা সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারী সমাজসচেতন হয়। সমাজের অর্ধেক অংশ প্রস্তুত হওয়ায় বাঙালিসমাজ আরও বেশি সুসংহত হয় এবং স্বাধিকার আদায়ের জন্য সক্ষমতা অর্জন করে।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সচেতনতা আসে, এই সচেতনতা তাদের জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। গৃহকর্মের পাশাপাশি বাইরে কর্মক্ষেত্রেও নারীরা চলে আসেন ফলে তারা স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে শুরু করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। ফলে মানসিকভাবে তারা স্বাধীন হয় ফলে মুক্তির আন্দোলনের পরবর্তী সময়গুলোতে সব আন্দোলনে তাদের অংশ নিতে দেখা যায়। আবার সব নারী আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত ছিল তা নয়, তবে নারীদের এইসব আন্দোলন নারী জাতিকে জাগিয়ে তোলে। অর্থাৎ নারীদের মুক্তির পাশাপাশি জাতীয় মুক্তির প্রক্রিয়ায় তারা সমাজকে মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। এটা নারীরা করেছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার মাধমে।

সমাজ ও মনজগতে একটা পরিবর্তন হলো নারীদের এইসব আন্দোলন। অর্থাৎ মানসিকভাবে সমাজকে মুক্তির জন্য ও আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা হয় এইসব আন্দোলনের মাধ্যমে। এ কাজে নেতৃত্ব দেয় রাজনৈতিক নেতারা। কিন্তু এর বাইরে সমাজকে সার্বিকভাবে প্রস্তুত করতে ভূমিকা পালন করে সমাজের প্রতিটি মানুষ। এর মধ্যে নারীদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজের অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি অধিবাসী নারী। তারা প্রস্তুত না হলে সমাজের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে না। তাদের স্বামী, সন্তান ও আত্মীয়-সজন সবাই এইসব আন্দোলন ও পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। যদি নারীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত না হতো তবে তাদের এই অংশগ্রহণ নিষ্কণ্টক হতো না।

১৯৬১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ দিবসে ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আয়োজিত প্রভাত ফেরিতে বাঙালিরা আইয়ুব খান ও তার মার্শাল ল বিরোধী–'ডাউন ডাউন মার্শাল ল' স্লোগান দেয়।[১১৫] এর মাধ্যমেই শুরু হয় সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। আইয়ুব আমলে ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সে জারি করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সের ১৩(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে উপাচার্য যে কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীকে যে কোনো সময় ছুটি নিতে বাধ্য করতে পারেন। আইয়ুব আমলে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সকে দেশের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ কালাকানুন বলে অভিহিত করেন ও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। দেশব্যাপী ঐ আইন বাতিলের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে।[১১৬]

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর গ্রেফতারের পরপরই ছাত্ররা তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ উগরে দিলো। তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকলো। সরকার ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের ওপর দমন নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন স্থিমিত করতে সক্ষম হয়। ১ ফেব্রুয়ারি, সোহ্‌রাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করলো। সরকারি নির্দেশে পরদিন ধর্মঘটের খবর ছাপা হলো না পত্রিকায়। দেয়ালে পোস্টার পড়ল–'সামরিক শাসন নিপাত যাক'।[১১৭] সরকারি পত্রিকায় আগুন দেওয়া হলো, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এই প্রথম প্রকাশ্যে রাস্তায় অনুষ্ঠিত হলো বিক্ষোভ। ৩ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের উপাচার্যের সঙ্গে এলেন কলাভবনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য।

বক্তৃতা করার আগেই ছাত্ররা আঞ্চলিক বৈষম্য, মৌলিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন শুরু করলো এবং মন্ত্রী মাইকের সামনে দাঁড়াতেই লাঞ্ছিত হলেন। ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ থেকে ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে। একদিনের ধর্মঘট চললো পাঁচদিন।[১১৮] ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে, সরকারি নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে কার্জন হলে কয়েক হাজার ছাত্র জমায়েত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নিন্দা করে রাস্তায় নেমে আসে। পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন উপাচার্য ড. মাহমুদ হাসান। ছাত্ররা ধাওয়া করলো সেনাবাহিনীর জিওসি-কে। ৭ ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব খানকে ঘেরাও করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। সাধারণ মানুষ যোগ দিলো ছাত্রদের সঙ্গে, অনুষ্ঠিত হলো বিশাল গণজমায়েত। পোড়ানো হলো আইয়ুব খানের ছবি। সরকার রাজনৈতিক নেতা, যেমন–শেখ মুজিব এবং সাংবাদিক, যেমন–মানিক মিয়া ও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হলো। টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে জমায়েত মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হলো। সেনাবাহিনী টহল দিতে থাকলো রাস্তায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ল মফস্‌সলে। ফলে, মফস্‌সলেও শুরু হলো সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, আইয়ুব খান শক্তি প্রদর্শন করে সফল হলো ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি অসন্তোষ দমনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, সামরিক শাসনামলের ইতিহাসে ঘটনাটি অসাধারণ। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি অসন্তোষের সাফল্য ছিল সীমিত। কিন্তু এ অসন্তোষ সামরিক শাসনের ভিত্তিতে অভিঘাত হেনেছিল এবং তখন থেকে সামরিক শাসকদের ভূমিকা আক্রমণাত্মক থেকে হয়ে উঠেছিল রক্ষণাত্মক। আরও লক্ষণীয় যে, ছাত্রদের যখন হল ত্যাগ করতে বলা হয় তখন সাধারণ মানুষ বেদনা বোধ করেছিল। ছাত্ররা নিজেদের বাড়িঘর অর্থাৎ গ্রামেগঞ্জে, মফস্‌সল শহরে তখন ছড়িয়ে পড়েছিল।[১১৯] ছাত্রদের এভাবে এলাকায় ফিরে আসায় গ্রামের মানুষরা তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইত, বুঝতে চাইত। আর এই বিষয়টাকে ছাত্ররা কাজে লাগায় সামরিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে ড. কামাল হোসেন স্মৃতিচারণ করেন সেই সময়ের কীভাবে তারা গ্রামের মানুষকে জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন,

> পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে তা সংস্কার করতে চায়। এ বিষয়ে গ্রামের মানুষ ছাত্রদের কাছে জানতে চাইলে, তখন ছাত্ররা গ্রামের মানুষকে বলত চাচা আপনারা যখন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখন কোন ভাষায়? স্বপ্নে বাবা-দাদার সাথে কোন ভাষায় কথা বলেন। তাদের উত্তর হতো বাংলা। তখন ছাত্ররা বলত আপনাদের পিতামাতা যদি স্বর্গ থেকে এসে আপনাদের সাথে বাংলায় কথা বলতে পারে তাহলে সেই ভাষা কীভাবে হিন্দুদের ভাষা হয়।[১২০]

এভাবে শুরু হয়েছিল সামরিক শাসনবিরোধী প্রচারণা এবং প্রস্তুত হয়েছিল সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের।[১২১] গ্রামের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের হল থেকে বের করে দেওয়া তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন ও দুঃখ পান। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা তাদেরই ছেলে মেয়ে। তাই তারাও কষ্ট পান।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলের ৪৪ মাসে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়নি, কিংবা কোনো বক্তব্য-বিবৃতি উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে ছাত্র, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং কিছু রাজনীতিবিদ নানান কৌশলে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সামরিক শাসনের সময়ে আইয়ুববিরোধী নীরব আন্দোলনের ইস্যু ও আন্দোলনের বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো–

১৯৬২-র ছাত্র-আন্দোলন

১৯৬১ সালের শেষের দিকে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়া এবং মণি সিংহ ও খোকা রায়ের মধ্যে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে ঐকমত্য হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আইয়ুব খান কর্তৃক শাসনতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করবে এবং তারপর ক্রমে ক্রমে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।[১২২] বৈঠকের এক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান এও বলেন যে, 'ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগ্রামে ঐ দাবি রাখতে হবে।'[১২৩]

তবে শেষ পর্যন্ত মুজিবের দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ঐ বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে কাজ করবে।'[১২৪]

সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রেফতারের প্রতিবাদ

এই বৈঠকের পরপরই ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) ছাত্রধর্মঘট আহ্বান করে। রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। প্রথম পর্যায়ের ধর্মঘট ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই আন্দোলন ৮ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১২৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একজন পুলিশের চর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদিরকে নাজেহাল করা হয়। উপাচার্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এক মাসের জন্য বন্ধ করে, ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। হল ত্যাগের সময় ছাত্ররা পুলিশের ওপর হামলা করে এবং বাসে আগুন দেয়। প্রথমবারের মতো সামরিক শাসন তথা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে অপমানজনক স্লোগান দেওয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখ রাজনীতিবিদগণ এবং অনেক ছাত্রনেতাকে সরকার গ্রেফতার করে। এইভাবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে সামরিক শাসনবিরোধী প্রকাশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।[১২৬]

সংবিধানবিরোধী আন্দোলন

সামরিক আইন চলাকালীন সময়েই ছাত্ররা আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধানবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ১ মার্চ ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা করা হয় (এবং তা কার্যকরী করা হয় ৮ জুন থেকে)।[১২৭] মযহারুল ইসলাম এই শাসনতন্ত্রের দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন :

> ১. সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। দেশের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্ট। তিনি সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। ২. জনগণের ওপর পূর্ণ অনাস্থা। তাদের প্রত্যক্ষ ভোটে দেশের সর্বময় ক্ষমতাধিকারী প্রেসিডেন্টকে নির্বাচনের অধিকার জনগণের নেই। সরকার কতিপয় দালাল সৃষ্টি করে দেবে–তারাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে।[১২৮]

আইয়ুব খানের ঐ শাসনতন্ত্রের সমালোচনায় আতাউর রহমান যথার্থই লিখেছেন,

> গণতন্ত্রের বর্হিবাস বহাল করা হয়েছে। অন্তর অসার। কেন্দ্রে ও প্রদেশে পরিষদ হবে। তাদের অধিবেশনও হবে। সেখানে বক্তৃতা, তর্ক বির্তক, প্রশ্নোত্তর সবই হবে। তার জন্য আইন কানুন ও প্রণীত হবে। অর্থাৎ সংবাদপত্রের খাদ্য পুরোপুরি থাকবে। পরিষদে সব বিষয়ে আলোচনা হবে। এমনকি বাজেটেরও। কিন্তু তার উপর ভোটাভুটি চলবে না। স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে যাবে। অর্থাৎ পরিষদ রবার স্ট্যাম্প, পঙ্গু ও ক্লীব। তবুও...সদস্যদের মান-মার্যাদ আছে। পদাধিকার আছে। বেতন আছে। ভাতা আছে। .. খরচও আছে। আপখোরাকী নয়। মন্ত্রিমণ্ডলীর থাকার ব্যবস্থা আছে...তাদের গাড়ী-বাড়ী থাকবে। আরদালী চাপরাশিও থাকবে। থাকবে না শুধু ক্ষমতা। ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে এবং তাঁরই হুকুমে গভর্ণর ও কর্মচারীরা ক্ষমতার অধিকারী হবেন।[১২৯]

উক্ত সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানিদের 'দাবি-দাওয়া' চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়। নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়, ভোটাধিকার সংরক্ষিত করে মৌলিক গণতন্ত্রী নামে একটি শ্রেণি সৃষ্টি করা হয়–যারা শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করবে। উক্ত সংবিধান (যা ব্যক্তি আইয়ুব খান দ্বারা নিজের স্বার্থে প্রণীত) ঘোষিত হওয়া মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং ক্লাস বর্জন শুরু করে। মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ছাত্রদের এ আন্দোলনের ছিল তীব্র। ১৯৬২ সালের ১ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও কলেজসমূহের অধ্যক্ষদের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে বৈঠকে আইয়ুব খান ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কে বলেন,

> ছাত্রদের অসন্তোষ পুরনো আমলের ঐতিহ্য। ঐ সময় নিজেদের স্বার্থে রাজনীতিবিদরা ছাত্রদের ব্যবহার করেছে। ছাত্ররা মানসিকভাবে পরিপক্ক নয় এবং জীবনের কোনো উদ্দেশ্য না থাকায় তারা বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে।...শাসনতান্ত্রিক সমস্য সম্পর্কে ছাত্রদের কোন ধারণা নেই এবং সে কারণে, শাসনতান্ত্রিক ব্যাপরে তাদের হস্তক্ষেপ না করাই বিধেয়।[১৩০]

এরপর সরকারও প্রচণ্ড ছাত্র-দমন শুরু করে। বহু সংখ্যক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। আইয়ুব খান শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিরূপ সব মন্তব্য করছিল এবং তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা বলে অবহিত করেন। তিনি প্রথম থেকে বুঝতে পেরেছিল ছাত্ররাই তার শাসককার্যে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আসবে। তাই তিনি ছাত্রদের প্রথম থেকেই দমনের নীতি গ্রহণ করেন। এ সময় ছাত্রদের ব্যাপকহারে গ্রেফতারের আরেকটি কারণ ছিল। ইতোমধ্যে নতুন সংবিধানের আওতায় সারাদেশে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হয়েছিল। ছাত্ররা উক্ত নির্বাচন বয়কটের জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের নির্বাচন বয়কটের আহ্বানে সাড়া না দিলেও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা (হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজিজুল হক, মোহসেন উদ্দিন আহমেদ) গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবি করেন। সে দাবিতেও সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেনি। অবশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং ৮ জুন (১৯৬২) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।[১৩১]

১৯৬২ সালের ২৫ জুন তারিখে নয়জন[১৩২] নেতা বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীদের অন্যতম আতাউর রহমান খান লিখেছিলেন, 'এই বিবৃতিই ছিল তৎকালে পাকিস্তানী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি।'[১৩৩] কিন্তু আইয়ুব সরকার এই বিবৃতিকে ভালোভাবে নেন নি। তাইতো প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নিজে রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে 'নিমকহারামির' অভিযোগ করলেন।[১৩৪] আইয়ুব খানের বিবৃতি সম্পর্কে আতাউর রহমান খান বলেছেন,

> এটা স্বাভাবিক। ক্রোধের উচ্ছ্বাস, ভয়েরও। রাজনীতিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, দেশের জনগণ তাঁদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য। তাহলেই খাঁ সাহেবের স্বপ্ন ভেঙে যায়। নিরাপদে সিংহাসনে বসে দশ কোটি মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে আছেন। এসব ভেঙে পড়ে ধূলিসাৎ না হয়ে যায় এই চিন্তায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।[১৩৫]

আইয়ুব খানের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৬২ সালের ৮ জুন পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান কার্যকর করা হয়। ঐদিন সামরিক আইন তুলে নেওয়া হয়। এর ফলে রাজনীতিবিদগণ ও ছাত্র সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ পায়। রাজনীতিবিদগণ প্রথমেই যে দাবিনামা উত্থাপন করে তা হলো সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া, দলীয় রাজনীতি শুরু করা ইত্যাদি।

সংবিধান কার্যকর হওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৬০ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য (৭৮ জনের মধ্যে) সরকারের নিকট দাবি করে যে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, বিচার বিভাগ কর্তৃক নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পার্লামেন্টের বাইরে নয় জন রাজনৈতিক নেতা এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে আইয়ুবের সংবিধানকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি করেন।

এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ৩০ জুন (১৯৬২) 'রাজনৈতিক দল আইন' শীর্ষক একটি বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করেন। বিলটি ১৪ জুলাই (১৯৬২) জাতীয় পরিষদে পাশ হয়।

বিলটির মাধ্যমে আইয়ুব খানবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে দমন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ১৯৬২ সালের ৮ জুলাই তারিখে পল্টন ময়দানে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেন। নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে ঐ সভায় শেখ মুজিবুর রহমান এবডোসহ সকল কালাকানুন বাতিল করে সোহ্‌রাওয়ার্দী, ভাসানীসহ প্রমূখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবি করেন।[১৩৬]

সোহ্‌রাওয়ার্দী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই বিরোধী মোর্চা গঠনে ব্রতী হলেন। তিনি কোনো দল পুনর্গঠন না করে ন্যূনতম দাবি নিয়ে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট বা এনডিএফ। তাদের দাবি হলো গণতন্ত্রায়ণ, প্রত্যক্ষ

নির্বাচন এবং সংসদীয় গণতন্ত্র। পূর্ব পাকিস্তানে এ সময় বিভিন্ন কারণে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলো।[১৩৭] মওলানা ভাসানী এনডিএফ-এর আন্দোলনের কারণে ১৯৬২ সালের নভেম্বরে মুক্তি পান। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নতুন রাজনৈতিকদল গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সময় জামায়াতে ইসলামী ও নেজামী ইসলামির কর্মকাণ্ড শুরু হয়। মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা জেলে থাকায় এবং এবডো আইনের আওতায় পড়ায় এসব দলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়। আইয়ুব খানের চক্রান্তে মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়। তার অনুসারীদের নিয়ে গঠিত হয় কনভেনশন মুসলিম লীগ (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩)। আইয়ুব বিরোধীরা গঠন করেন কাউন্সিল মুসলিম লীগ। আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন। কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন খাজা নাজিমউদ্দিন। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বদলে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করেন (৪ অক্টোবর, ১৯৬২)। জোটের নাম দেন ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট (সংক্ষেপে এন.ডি.এফ.)। সোহ্‌রাওয়ার্দী জীবিত থাকাকালীন আওয়ামীলীগ পুনরুজ্জীবিত হয়নি। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর তার মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন (তিনি ১৯৫৩ সাল থেকেই দলটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন)। ইতঃপূর্বে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ৩১ আগস্ট (১৯৬৩) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আইয়ুববিরোধী মঞ্চে সমবেত হওয়ার লক্ষ্যে গঠন করা হয় 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party বা COP)।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে ছাত্ররা আরেকটি আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। তা ইতিহাসে 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে অভিহিত হয়ে আছে।[১৩৮] আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের নামে যে চমক দেখান, শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা তার একটি। তিনি ১৯৫৯ সালের ১২ ডিসেম্বর শিক্ষা কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। সরকারিভাবে উক্ত কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮)। তদানীন্তন শিক্ষা সচিব এস. এম. শরীফকে সভাপতি করে এগারো সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের নাম শরীফ কমিশন। ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট কমিশন তার সুপারিশ পেশ করে। রিপোর্টটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে।[১৩৯] কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছিল তার মূল বক্তব্য ছিল শিক্ষা হচ্ছে বিনিয়োগ।[১৪০] এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী সভা-সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে, ছাত্রদের বেতন হ্রাস, তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল ও উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছাত্ররা এই আন্দোলন করে।[১৪১] এই কমিশন যে সকল সুপারিশ পেশ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল:

তিন বছরের বিএ পাস কোর্স পদ্ধতি চালু করা। (এর আগে দুই বছরের বিএ পাস কোর্স চালু ছিল)।

স্কুল-কলেজের সংখ্যা সীমিত রাখা, শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অভিভাবক এবং বাকি ২০ ভাগ সরকার কর্তৃক বহন করা।

৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা। এবং উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করার সুপারিশ করা হয়।[১৪২]

শরীফ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করে, স্নাতক শিক্ষাকাল দীর্ঘায়িত করে এবং পরীক্ষার মান কঠোর করে। ১৯৬২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হানে।[১৪৩]

হামুদুর রহমান শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি নবপর্যায় শুরু হয়। এই কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ঢাকা কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। তারা 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

এই ফোরামের ব্যানারে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঢাকা শহরের অন্যান্য কলেজেও (জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আযম কলেজ, ইডেন কলেজ) প্রতিবাদ সভা করে। শীঘ্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং 'ডিগ্রি স্টুডেন্ট ফোরাম' ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফোরামে' রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে নেতৃত্ব চলে যায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বের হাতে।

ছাত্রদের এই আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রথম দিকে সাড়া দেননি। তখনও প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল–এটাও সমর্থন না-দেওয়ার একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু শিক্ষা সংস্কারের বিরুদ্ধে ছাত্ররা শিক্ষকগণের উৎসাহ ও প্রেরণায় সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন।[১৪৪] বাষট্টির শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টবিরোধী আন্দোলন সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে তীব্র আকার ধারণ করে।[১৪৫] পুলিশ ঢাকা ও যশোরে মিছিলের ওপর গুলি করলে ঢাকায় গোলাম মোস্তফা নামক একজন কন্ডাক্টর নিহত ও সারা দেশে ১৫৩ জন আহত এবং গ্রেফতার করা হয় অসংখ্য। ঢাকায় কোর্টের নিকট পুলিশের এলোপাথারি গুলিতে নিহত বাস কন্ডাক্টর (৩৫)-এর পরিচিতি নং-১৮৬৮।[১৪৬] পরদিন আহত কিশোর ওয়াজিউল্লাহ্ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। এ সম্পর্কে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখে *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় ছাপা হয় :

> One person was killed and over hundred injured after police firings preceded by tear-gassing and lathi charge on demonstrating crowds in different parts of the city yesterday (Monday). The demonstrations followed procession by students and members of the public on the city observed complete hartal in support of the students demand for scrapping of the Education commission's Report.[১৪৭]

'গুলি ও নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে' সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ দশজন রাজনৈতিক নেতা বিবৃতি প্রদান করেন।[১৪৮] ছাত্র সমাজের আহ্বানে সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে তিনদিনব্যাপী শোকদিবস পালিত হয়। ২২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকায় পুনরায় ধর্মঘট শুরু হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা, খাদ্য ও তথ্য উজির ফজলুল কাদের চৌধুরী লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, সরকার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের মূল বিষয়বস্তু রদবদল না করে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রকৃত অসুবিধাসমূহ দূরীকরণে প্রস্তুত আছে।[১৪৯] আন্দোলনের একপর্যায়ে সরকার শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত করতে বাধ্য হয়। ফলে ছাত্ররা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। এই আন্দোলনের বড়ো সাফল্য এই যে, ছাত্ররাই পরবর্তীকালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস'রূপে পালিত হতো এবং আজো ছাত্রসমাজ এ দিবসটি গুরুত্ব সহকারে পালন করে।[১৫০] ঐ আন্দোলনের প্রভাবে নিষ্ক্রিয়প্রায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পুনরায় সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এবং ঐ আন্দোলনের প্রভাবে জাতীয় চৈতন্যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে। বিশেষ করে এনডিএফ-এর গণতন্ত্রায়ণ আন্দোলন আর ছাত্রদের কালাকানুন-বিরোধী আন্দোলন যৌথভাবে এক নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করে।[১৫১] ১৯৬২ সালের অক্টোবরে আবদুল মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ড. এম. ও. গণিকে উপাচার্য নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের দমনের জন্য ছাত্রদের মধ্যে একটি পেশাদার বাহিনী গঠন করেন যা পরিচিত হয়ে ওঠে এন.এস.এফ. (ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রন্ট) নামে। এন.এস.এফ. প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের শুরু করে।[১৫২]

১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় পুরোটা সময় জেলে ছিলেন।[১৫৩] ১৯৬২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ১৯৬২ সালে জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি দিয়ে সহযোগিতা চেয়েছিলেন।[১৫৪] কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের এই চিন্তা তাৎক্ষণিক ছিল না। এ প্রসঙ্গে শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী লিখেছেন,

> একথা চিন্তা করা ভুল হবে যে মুজিব একরকম তাড়াহুড়ো করেই ১৯৬২ সালে স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজাতে মনস্থির করেছিলেন। এমন নয় যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধেও চাকে ঢিল ছুড়লে যে ঝামেলা হতে পারে সে সম্পর্কে

অবগত ছিলেন না। দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-উভয়ের কাছেই বিপুল পরিমাণ আনবিক অস্ত্রের মজুদ ছিলো যা দিয়ে দশবার এই পৃথিবী ধ্বংস করা সম্ভব। এই দুই পরাশক্তি আপন আপন দর্শনের সংঘাতে আটকে ছিলো। এই পরাশক্তিগুলির মধ্যে মিত্র কারা মুজিব তা খুব ভালো করে জানতেন। তাঁর চিন্তা ছিলো এই কৌশলগত দাবার বোর্ডে বাঙলাদেশের অবস্থান নিয়ে।[১৫৫]

অর্থাৎ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিপক্ষে যে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছিল তা একটি নতুন মোড় নেয় ১৯৬২ সালে। ছাত্রছাত্রী, সংস্কৃতিকর্মী ও রাজনীতিবিদরা এই সময় বাংলাদেশকে নিয়ে ভিন্নভাবে ভাবা শুরু করে। বিশেষ করে মুজিবুর রহমান কীভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা যাবে তা নিয়ে সক্রিয়ভাবে ভাবনা এ সময় থেকে শুরু করেন।

৬২-এর আন্দোলনের ফলে আইয়ুব সরকার কিছুটা নমনীয় হয়ে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সীমিত আকারে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করা অনুমতি দেয়। অন্যদিকে, বিএনআর (Bureau of National Reconstruction) এবং 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করে বাংলা বানান ও লিপি সংস্কারসহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যকে পাকিস্তানি আদর্শায়িত করার উদ্যোগ নেয়। এর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে (১৯৬৩ সালের ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর) যে ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ পালন করা হয় তার মধ্যে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়ানোর অভিপ্রায় ছিল।[১৫৬] অবশ্য শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্ত থেমে থাকেননি।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে আঞ্চলিক বৈষম্য কেন্দ্রীয় সরকার করছিল তা ১৯৬৩ সালের দিকে পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়। ৬ ডিসেম্বর *দৈনিক আজাদ*-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে চিত্রটি তুলে ধারা হয়,

> ন্যায় ও সুবিচারের নীতি লইয়া যদি পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করেন, তবে জনসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নীতি নির্দ্ধারণ তাঁহারা না করিয়া পারেন না। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে এক কোটি বিশ লক্ষ বেশী। প্রত্যেক মানুষের প্রতি সুবিচারের নীতি মানিয়া লইলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক অধিক অর্থ বরাদ্দ করিতেই হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাগমের যদি আরও একটি দিক আমরা দেখি, তাহা হইলেও পূর্ব্ব পাকিস্তানের অর্থপ্রাপ্তির সবলতর দাবীটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমরা পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার্জ্জনের কথা লক্ষ্য করিয়াই এ মন্তব্য করিতেছি। পূর্ব্ব পাকিস্তান গত দুই বছরে পাট, পাটজাত দ্রব্য এবং চা রফতানী করিয়া ৩৪২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করিয়াছে। আর এ সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান তুলা, তুলাজাত দ্রব্য এবং চামড়া রফতানী করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা হইল ১৫১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু ব্যাপারটা বিসদৃশ ঠেকিতেছে এজন্য যে, এ সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হইল ৬৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়া হইয়াছে ১২৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা।[১৫৭]

দৈনিক আজাদে ঐ সম্পাদকীয়তে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও চিত্র ফুটে ওঠে,

> কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তরীণ অর্থ বণ্টনের নীতিতে এ গলদ বারবার মানুষকে পীড়া দিয়াছে ও দিতেছে। ইহার উপর কেন্দ্রীয় বরাদ্দের হিসাবের বাইরেও পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা বিভিন্ন ধারায় নামিয়া আসিতেছে। সিন্ধু উপত্যকা পরিকল্পনা, লবণাক্ততা বিরোধী পরিকল্পনা প্রভৃতি বৈদেশিক সাহায্যের সিংহের ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানেই যাইতেছে। নির্ম্মিত রাজধানী করাচীকে রাতারাতি পরিত্যাগ করিয়া এছলামাবাদের নির্ম্মীয়মান নয়া রাজধানী বিপুল খরচের লাভ মুনাফার প্রত্যক্ষ ভাগ সেখানেই যাইতেছে।[১৫৮]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ

১৯৬৪ সালে একের পর এক অনেকগুলো আন্দোলন হয়। এ সময় আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅসন্তোষকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে কাশ্মীরের এক মসজিদের নবির রক্ষিত চুল চুরি যাওয়া বিষয়কে কাজে লাগিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে।[১৫৯] চৌষট্টির প্রথম আন্দোলন ছিল অবাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে। ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারি সরকারের ইঙ্গিতে অবাঙালি মুসলমানেরা ঢাকা শহরে এবং তারপর আশেপাশে

ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। ফেব্রুয়ারির এই দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং তা বাঙালি-অবাঙালির দাঙ্গায় মিলিত হয়। এই দাঙ্গায় হিন্দুদের রক্ষা করতে যেয়ে আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী এবং ১৬ জানুয়ারি ঢাকায় নটরডেম কলেজের ক্যাথলিক ফাদার নোভাক নিহত হন। মোহাম্মদপুরের বিহারিরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের মেয়েদের হোস্টেলে আক্রমণ চালায়। *ইত্তেফাক*-সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নেতৃত্বে 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠিত হয় এবং কমিটির উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারি তারিখে *ইত্তেফাক*, *আজাদ* ও *সংবাদ* পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়।[১৬০] *দৈনিক ইত্তেফাকে* দেশবাসীকে সাম্পদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়,

> সীমান্তে অপর পারে যাহাই ঘটুক, আমাদের স্বদেশভূমিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ও আত্মঘাতী রক্তপাত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এ দেশের কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী সকলের প্রতি আমরা পুনর্বার আকুল আহ্বান জানাইতেছি।[১৬১]

জাতি, মানবতা ও সভ্যতার চির দুশমন সমাজদ্রোহীরা নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকা ও ঢাকায় যে ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধের জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশবাসীর কাছে পত্রিকাটি আবেদন জানায়।[১৬২] ফলে ঢাকার সচেতন ছাত্রসমাজ এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং দাঙ্গায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে।[১৬৩]

পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও বৈষম্য স্পষ্টকরণ

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়। দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও সাফল্যেও চিত্র দেশি-বিদেশি অর্থনীতিবিদরা তুলে ধরেছেন। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সম্ভাবনা' নামক পুস্তিকায় ড. মোহাম্মদ কুদরত-ই খুদা পাট, চামড়া, মৎস্য, নিউজপ্রিন্ট, চা, দেয়াশলাই ছাড়াও যে সমস্ত সম্পদ সারাদেশে কমবেশি পাওয়া যায় অথচ অবহেলিত এ থেকে কী ধরনের শিল্প কারখানা গড়া যেতে পারে তার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন। তিনি লবণ, লবণের আনুষঙ্গিক শিল্প, চিনামাটি, পাটখড়ি, নাইলন, রয়েল বা কৃত্রিম রেশমশিল্প পাটবীজের ব্যবহার, নারিকেল, শ্বেতসার, খাদ্য সংরক্ষণ, তৈল সম্পদ প্রভৃতি শিল্পের বিপুল সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন।[১৬৪] লবণ শিল্প সম্পর্কে ড. খুদা বলেন,

> ১৫০ একর জমিতে চল্লিশ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন করা সম্ভব। বিশিষ্ট পরিকল্পনা সহ এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে যেমন জমির দিক থেকে খরচ কমানো সম্ভব তেমনি অন্যধারেও খরচ কমিয়ে একে প্রকৃত পক্ষে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে। এই লবণ কারখানার মাত্র লবণ প্রস্তুত করেই তারা কর্তব্য শেষ করে না। লবণ আংশিকভাবে দেশের খাদ্যের উৎপাদনরূপে ব্যবহৃত হলেও লবণের আরও বহুবিধ ব্যবহারের সম্ভব একাধিক রাসায়নিক কারখানা এর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এমন একটি প্রতিষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে স্বর্ণ-খনির মতই প্রতিপন্ন হবে।[১৬৫]

শিল্প কারখানায় পাটখড়িও সারাদেশে সত্যকার রূপালিরূপে সারাদেশের সম্পদ বাড়াতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি এ রকম তেরোটি শিল্পের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেন।

I.N. Mukherji লিখেছেন,

> While Islamabad earmarked substantial outlays for the Indus Basin Replacement Project for agricultural advance, it could at last have shown a similar gesture in respect of flood control measures in East Bengal. Only an independent Bangladesh would adopt such an order of priority in the seheme of planning which would make agriculture viable.[১৬৬]

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূল বাঁধ, সেচ সার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হলে কৃষিজাত উৎপন্ন বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে। এ সমস্ত ব্যাপারে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হলে বাংলাদেশ সারা পাকিস্তানের 'শস্যভাণ্ডারে' পরিণত হতে পারে।

কিন্তু দেখা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা বরং অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হতে থাকে। ভারতবিভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশের যে অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার হয় তাতে তাদের বিকাশের স্তরে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্য ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তান শিল্প ও বাণিজ্যে ছিল পশ্চাৎপদ। কিন্তু আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পশ্চিম পাকিস্তান দ্রুত উন্নতি করতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানিদের সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ ছিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক শোষণ করা। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য ১৯৫১-৫২ সালেই স্পষ্ট হয় এবং তা পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অধিকমাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ফলে দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যও বাড়তে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ আর্থিক বছরে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের মধ্যে বৈষম্যও বাড়তে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ আর্থিক বছরে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের ৫৭.৫৯ ভাগ অর্জিত হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে।

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থব্যয় করেন তার প্রায় ৯০% ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। উক্ত সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় হয় ১৬৮১ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু এই অর্থের মধ্যে মাত্র ৪২৭ মিলিয়ন টাকা সেখানে ব্যয় করা হয়।

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে প্রদেশদ্বয়ের উন্নয়ন খরচ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকার যেখানে মাত্র ৫১৪.৭ মিলিয়ন টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ করেছে, সেই একই সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার উন্নয়ন খাতে খরচ করেছে ১,৪৯৬.২ মিলিয়ন টাকা।

এইভাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে দুই প্রদেশের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ১৯৫১-৫২ সালে যেখানে ছিল ১৮%, ১৯৫৪-৫৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪%।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৫৯) উন্নয়ন বৈষম্য

পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হয় জুলাই ১৯৫৫ সালে। এতে দুই প্রদেশের মধ্যে বিরাজমাণ বৈষম্য কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে এই পরিকল্পনা বৈষম্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়। পরিকল্পনা মেয়াদকালে পশ্চিম পাকিস্তানে পাবলিক সেক্টরে যেখানে ব্যয়র পরিমাণ ছিল ৪,৯৬৪ মিলিয়ন টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় মাত্র ৯৮৩ মিলিয়ন টাকা (মোট ব্যয়ের মাত্র ১৬.৫%)।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করেও সেখানে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হতো, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সম্পূর্ণ খরচ করা সম্ভব হতো না। *The Economic Survey of East Pakistan* ১৯৬৪-৬৫ থেকে জানা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রকল্প পরিকল্পনা ছিল তার মাত্র ৩৭% অর্জিত হয়েছিল, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জন ছিল ১০০%। উক্ত সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু বিনিয়োগ যেখানে ছিল ২০৫ টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে এই পরিমাণ ছিল মাথাপিছু মাত্র ৮০ টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের মাথাপিছু আয় ৫% বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব পাকিস্তানিদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ১% কমে যায়। ফলে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য ১৯৫৪-৫৫ সালের ২৪% থেকে বেড়ে ১৯৫৯-৬০ সালে ২৯% হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫) বৈষম্য

এই পরিকল্পনাতেও দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনার আশাবাদ ব্যক্ত করা হলেও কীভাবে তা অর্জন করা হবে সে বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। বরং বিনিয়োগের হার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বেশি ধার্য করা হয়

(পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু যথাক্রমে ১৯০ ও ২৯২ টাকা)। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে ৪৪% এ দাঁড়ায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৈষম্য

দুই প্রদেশের মধ্যে বিরাজমাণ বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এই পরিকল্পনায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ ধার্য করা হয় ২৭,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ২৫,০০০ মিলিয়ন টাকা। পাবলিক সেক্টরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ১৬,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৪,০০০ মিলিয়ন টাকা। কাগজে কলমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ বেশি দেখানো হলেও, কারচুপি করে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিশাল পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা হয়। যেমন Indus Basin Development Works-এর জন্য ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকৃত বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ৯,০৪৩.৩৮ মিলিয়ন টাকা খরচ করা হয়। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্পের নামে ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দের বাইরে ৫,৯০০ মিলিয়ন টাকা খরচ করা হয়। অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে (যা এই প্রদেশের জন্য অতি জরুরি ছিল) কোনো অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ২৭,০০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও বাস্তবে খরচ করা হয় ১০,৯৭০ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ মোট বরাদ্দের প্রকৃত খরচের পরিমাণ ছিল পাবলিক সেক্টরে ৪৩% এবং প্রাইভেট সেক্টরে ৩৫% মাত্র। ফলে কেবল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে ২৩% বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

পাকিস্তানের রাজধানী এবং সকল সামরিক ও বেসামরিক বিভাগসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় সেগুলোর ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, স্টাফদের বাসাবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতিতে যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন নির্মাণ ও সরবরাহ কাজে যে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তার একচেটিয়া সুযোগ লাভ করে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। কেবল করাচিকে রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তুলতেই ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যয় হয় ৫,৭০০ মিলিয়ন টাকা। এই অর্থ ছিল উক্ত সময়ে পাকিস্তান সরকারের মোট ব্যয়ের ৫৬.৪% যে সময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট সরকারি ব্যয়ের হার ছিল মাত্র ৫.১০%।

১৯৬১ সালে সামরিক সরকার প্রথমে রাওয়ালপিন্ডিতে এবং পরে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানিদেরকে খুশি করার জন্য আইয়ুব খান ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। কিন্তু ১৯৬৭ সাল নাগাদ ইসলামাবাদের উন্নয়নে যেখানে ৩,০০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়, সেখানে ঢাকার উন্নয়নে ব্যয় হয় মাত্র ২৫০ মিলিয়ন টাকা।

এইভাবে রাজধানী শহর নির্মাণের নামে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়।

সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় প্রতিরক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ (রাজস্ব বাজেটের প্রায় ৬০%) তা প্রায় পুরোটাই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৪৭-৫৬ সময়কালে প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয় ছিল ৪৫৬৫.৭ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে মাত্র ১৬৭.২ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে। একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত প্রতিরক্ষা সদর দফতরগুলো প্রশাসনিক খরচ ছিল ২,৫৬৩.৯ মিলিয়ন টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে এই খাতে কোনো বরাদ্দ ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ পাচার

পাকিস্তানের দুই অংশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সময়কালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিল ৪৯২৪.১ মিলিয়ন টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল ১৬,৬৩৪.৬ মিলিয়ন টাকা। স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্য-ঘাটতি পূরণ করা হয়। ১৯৪৭-৬৬ সময়ে পাকিস্তানের মোট রফতানিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিল ৪২%, অথচ মোট আমদানিতে তার অংশ

ছিল ৬৯%। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রফতানি খাতে অবদান ৫৮% হলেও সেখানে আমদানি হয় মাত্র ৩১%। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল পাট রফতানি। কিন্তু পাট রফতানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয় তা ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। আবার দুই অঞ্চলের মধ্যে যে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য হয় তাতেও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি রফতানি হলেও, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানি হয় কম। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাহাজভর্তি পণ্য এনে পূর্ব পাকিস্তানে চড়া দামে বিক্রি করা হলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোনো পণ্য না নিয়ে জাহাজগুলো খালি অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়া হতো।
ব্যাংকিং সেক্টরেও পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত থাকে। ১৯৬৩ সালে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৩৬, যার মোট ১১৩০টি শাখার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র মাত্র ৩৬২টি (৩২%)। স্বভাবত ব্যাংকিং খাতের সেবা পশ্চিম পাকিস্তানিরাই বেশি লাভ করে। ব্যাংকিং সেক্টরের মাধ্যমে যে বিনিয়োগ করা হয় তার ৯০ ভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তান।
অবশেষে তেইশ বছরের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য করার পর বাঙালিরা ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতা লাভ করতে ব্যর্থ হলে তারা বাধ্য হয় স্বাধীনতার চিন্তা করতে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীরাই বাঙালিদেরকে বাধ্য করে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করতে। যদিও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে, কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে এক অঘোষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৬৪ সালে আক্রমণ তীব্রতর করে তোলে যুক্তরাষ্ট্র। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের এই হামলা বন্ধের দাবিতে ঢাকার বার কাউন্সিলে সর্বদলীয় ছাত্র-জনতার এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এই জমায়েতের আয়োজন করা হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অবিলম্বে ভিয়েতনাম থেকে হাত গুটানোর আহ্বান করা হয়।
ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ ব্যাপারে তিনদিন ধরে বিতর্ক চলে। ছাত্রলীগের যেসব নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট বিরোধী ছিল তারা এ প্রস্তাব গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু প্রস্তাবকরা যুক্তি প্রদর্শন করে যে, এই কমিউনিজমের ব্যাপার নয়, এটা আগ্রাসনের ব্যাপর। যে কোনো আগ্রাসনকে ছাত্রলীগের নিন্দা করা উচিত। অবশেষে তিনদিন পর সর্বসম্মতভাবে ছাত্রলীগ স্রম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।[১৬৭]

সমাবর্তন বিরোধী আন্দোলন

চৌষট্টিতে ছাত্রদের আরেকটি আন্দোলন গড়ে ওঠে রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। বাষট্টি সালেই মোনায়েম খান ছাত্রসমাজের বিরূপতা অর্জন করেন। গভর্নর হিসেবে মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর জন্য আইয়ুবের একজন বিশ্বস্ত, অনুগত ও প্রভুভক্ত চাকরের দায়িত্ব পালন করেন। গভর্নর হয়েই তিনি ছাত্রদের দমনের কাজ শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণের জন্য ড. এম. ও. গণিকে উপাচার্য নিয়োগ করেন। ছাত্রদেরকে দমনের জন্য এনএসএফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) নামে একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এনএসএফ এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর মোনায়েম খানের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করছিল। স্বভাবতই তিনি ছাত্র সমাজের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। এই মোনায়েম খান যখন সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে ছাত্রদেরকে ডিগ্রি প্রদান করতে যান তখন ছাত্ররা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।[১৬৮] এ প্রসঙ্গে আবদুল করিম মন্তব্য করে বলেন,

> আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে কয়েক বৎসর সামরিক অফিসারদের এবং সিভিল সার্ভেন্টদের সাহায্যে স্বৈরাশাসন চালান, পরে মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অদ্ভুত গণতন্ত্র চালু করেন। তিনি এক কনভেনশনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং নিজেই তার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি মোনায়েম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। নতুন গভর্ণরের খায়েশ হল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন এবং উপাচার্য মাহমুদ হোসেন সাহেবকে ছাত্রদের ডিগ্রী দৌওয়ার জন্য সমাবর্তণ উৎসবের আয়োজন করার অনুরোধ করেন।...কিন্তু এইবার ছাত্রদের ডিগ্রী দেওয়ার জন্য সমাবর্তন উৎসবের ব্যবস্থা করা হলে ছাত্ররা মোনায়েম খানের নিকট থেকে ডিগ্রী না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।[১৬৯]

ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেন একটি সম্ভাব্য সংঘাতের পরিস্থিতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষার জন্য সমাবর্তন বন্ধ করে দেন। ছাত্ররা স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন শুরু করে।[১৭০] সমাবর্তন উৎসব প্রথম ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ মার্চ ১৯৬৪ তারিখে। এরপর ২২ মার্চ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের তারিখ। রাজশাহী উৎসব প্যান্ডেলে ছাত্ররা কালো পতাকা টাঙিয়ে দেয় এবং ডিগ্রি হাতে মোনায়েম খানের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। ২১ মার্চ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় সভার আয়োজন করে। মোনায়েম খানের আগমনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা ও অসন্তোষ দেখা দেয়। এ সভা পণ্ড করার জন্য সরকার সমর্থক ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশনের (এনএসএফ) সদস্যরা সেখানে হামলা চালায়।[১৭১] ঢাকার সমাবর্তনের দিন মোনায়েম খান সমাবর্তন প্যান্ডেলে প্রবেশ করা মাত্র ছাত্ররা আইয়ুব মোনায়েম বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। ছাত্র-পুলিশ খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। সমাবর্তন উৎসব হলো লন্ডভন্ড। এর পরিণতিতে এলো পুলিশ ও এনএসএফের সম্মিলিত ছাত্র নির্যাতন। ডিগ্রি প্রত্যাহার, বহিষ্কার, গ্রেফতার, হুলিয়াজারি এসব মিলিয়ে এক তাণ্ডবনৃত্য চলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানে ১৪শত স্কুল ও ৭৪টি কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এর ১২শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।[১৭২] সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ২৬ জন ছাত্রকে ৫, ৩, ২ ও ১ বছর মেয়াদের বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হয়। রাশেদ খান মেনন বহিষ্কৃত হন পাঁচ বছরের জন্য। প্রয়াতা বিচারপতি জাকির আহমদ ও হায়াত হোসেনের বহিষ্কারাদেশ ছিল তিন বছরের। ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণি এবং আসমত আলী শিকদারের এমএ ডিগ্রি প্রত্যাহার করা হয়।[১৭৩] এছাড়া সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নরের আগমনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে সরকার ৪৬ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[১৭৪] একইসঙ্গে সরকার ২৭ এপ্রিল ১৯৬৪ সাল থেকে ছাত্র আন্দোলন-সম্পর্কিত সবরকম সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ছাত্রদের ওপর গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাকির আহমদ ও আহম্মদ ফারুক ঢাকা হাই কোর্টে রিট আবেদন করেন। মামলাটি 'জাকির আহমদ বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অভিহিত হয়।[১৭৫] ৮ জুলাই ঢাকা হাই কোর্টেও স্পেশাল বেঞ্চ ছাত্র বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত অবৈধ বলে ঘোষণা করে সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করে।[১৭৬]

১৯৬৪ সালের মে মাস থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্যে চটকল শ্রমিক, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফসহ অন্যান্য মিল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের বিক্ষোভ-আন্দোলন চলে। এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তৎকালীন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি। আন্দোলনরত শ্রমিক জনতার ওপর সরকার ও সরকারসমর্থিত শ্রমিকরা ক্রমাগত অত্যাচার-নির্যাতন চালায়।[১৭৭] ১২ অক্টোবর ১৯৬৪-তে হতে প্রদেশের বিভিন্ন চটকলে শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে খুলনার খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এ সম্পর্কে *দৈনিক আজাদ*-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়,

> ঘটনা সম্পর্কে নানা রকমের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং শ্রমিকদের মাঝে দাঙ্গার ফলে আহত নিহতদের সম্পর্কেও নানা রকম কথা শোনা যাইতেছে। পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলেও সেখানে শ্রমিকরা হতাহত হইয়াছে। ১৪ই অক্টোবর তারিখে সরকারী প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে একজন শ্রমিক নিহত হইয়াছে এবং দাঙ্গায় চারজন শ্রমিক প্রাণ হারাইয়াছে। অগ্নিকাণ্ড এবং লুঠতরাজের কথাও প্রেসনোটে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ৩৭২ জন দাঙ্গাকারীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।... যে কোন একটা অজুহাত দেখা দিলেই খুলনার এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি

হইয়া যায় এবং ক্ষয়ক্ষতিও রোধ করা সম্ভব হয় না, এ ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর হইয়া আছে। ভিতরে যে কি আছে তাহাও বুঝা যাইতেছে না। ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করাই বর্ত্তমানে প্রধান কাজ হইয়া উঠিয়াছে।[১৭৮]

পাকিস্তানে প্রশাসনিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশের রাজধানী গড়ে উঠে প্রথমে করাচি ও পরে ইসলামাবাদ।[১৭৯] পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থদৃষ্টি থেকে আবুল ফজল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তরের সমালোচনা করেছেন। একে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি আইয়ুব সরকারের প্রচণ্ড আঘাত বলে গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে *সমকালীন চিন্তা* গ্রন্থের 'কেন্দ্রীয় রাজধানী বনাম পূর্ব পাকিস্তান' প্রবন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন, 'পাকিস্তানের বৃহত্তর জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকা কখনো ইসলামাবাদকে রাজধানী হিসেবে মেনে নেয়নি–তাদের সম্মতি চাওয়াও হয়নি কোনোদিন, এ এক সম্পূর্ণ 'আরোপিত' সিদ্ধান্ত।'[১৮০] (করাচি ও ইসলামাবাদ) এ দুটো শহরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা গড়ে উঠে। মোটকথা সমস্ত সুযোগসুবিধার সিংহভাগ–ব্যবসাবাণিজ্য, চাকুরি, বৈদেশিক সাহায্য বন্টন প্রভৃতি পায় পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চল এবং বঞ্চিত হয় বাংলাদেশ।[১৮১] পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও অর্থবিভাগে এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদসহ সাধারণভাবে চাকুরিতে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি বঞ্চনার শিকার হয়। এ ব্যাপারে উপযুক্ত লোকের অভাবে'র অজুহাত দেওয়া হয়। কিন্তু এ যুক্তি নাকচ করে দিয়ে আবুল ফজল মন্তব্য করেছেন, 'এ অভিযোগ আর সাফাই দিয়েই একদিন হিন্দুরা পাকিস্তান দাবীর ক্ষেত্র নিজের হাতেই তৈয়ার করে দিয়েছিল।'[১৮২]

পাকিস্তানের প্রশাসনে যে বৈষম্য আছে সে বিষয়ে *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের বৈষম্যের প্রতিবাদে পত্রিকাটির সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তার রাজনৈতিক মঞ্চ কলামে উল্লেখ করেছিলেন,

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই পর্যন্ত যে অবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে পদে পদে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যনীতি অনুসৃত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিয়াছিলাম যে, কেন্দ্রীয় চাকুরী-বাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা শতকরা ৫৬/৭০ ভাগ ব্যয়িত হয়, সেখানের পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা উল্লেখের একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক অংশের মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের পুঁজি শতকরা ১০ ভাগও পাকিস্তানে গঠিত হয় নাই। তা ছাড়া বৈদেশিক লোনেরও সিংহভাগ ব্যয়িত হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানে। ইহার পর আবার করাচি হইতে ফেডারেল রাজধানী অপসারণ করিবার কালে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথা বিবেচনা না করিয়াই পিন্ডি ও ইসলামাবাদে ফেডারেল রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া জাতীয় সম্পদ হইতে তথায় শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এমতাবস্থায় পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানীদের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাঁহাদের সমানাধিকার রহিয়াছে এবং এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া কালক্রমে তাহারা সকল বৈষম্য ও অবিচার অবসান ঘটাইতে পারিবে।[১৮৩]

২০ এপ্রিল ১৯৬৫ সালে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় পাকিস্তান প্রশাসনের বাঙালির সংখ্যা নিয়ে একটি উপ-সম্পাদকীয় ছাপা হয়। সেখানে বলা হয়,

> ...বিদেশে পাকিস্তানী দূতাবাস ও বাণিজ্য মিশনগুলিতে কর্মরত চাকুরীয়াদের ব্যাপারে একটি তুলনামূলক তথ্য খবরে উল্লেখিত হইয়াছে। প্রকাশ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত পাকিস্তানী দূতাবাস, কুটনৈতিক মিশন ও বাণিজ্য মিশন সমূহে কর্মচারীদের সংখ্যা আঠারো হাজারের কম নয়। এই আঠারো হাজার কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীর এই নিদারুণ সংখ্যাল্পতা শুধু তথ্য হিসেবেই চমকপ্রদ নয়, ইহার তাৎপর্যও নানা দিক হইতে বিচার্য। পাকিস্তানের সরকারি রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয়িত হয় দেশরক্ষা খাতে। দেশরক্ষার পরেই যে খাতে অধিক রাজস্ব ব্যয়িত হয়, সেটা হইতেছে প্রশাসনিক বিভাগ। দেশরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা কত তার কোন সঠিক তথ্য জানা না থাকিলেও উহা যে তিন চার পার্সেন্টের বেশ নয় তাহা কোন কোন ভূতপূর্ব জাতীয় পরিষদ সদস্যের বক্তৃতাদি হতে জানা গিয়াছে। প্রশাসনিক বিভাগের পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা অন্য অঞ্চলের চাইতে অনেক কম।...জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই বিভাগের

খরচের যে প্রভাব, পূর্ব পাকিস্তানীরা তাহা হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের আর্থিক জীবনের পক্ষে যে ইহা খুবই ক্ষতিকর তাহা বলিবার প্রয়োজন পড়ে না।[১৮৪]

ঢাকায় একটি দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে তোলার সান্ত্বনা দেওয়া হয় সত্যি কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ ছিল প্রশাসনিক দিক থেকে বঞ্চনার অনুভূতি।[১৮৫] এই বঞ্চনা থেকে ঢাকার প্রতি একটা আগ্রহের বোধ জন্মে বাঙালির মধ্যে। ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে তাই বহুল উচ্চারিত স্লোগান ছিল 'পিণ্ডি নয় ঢাকা'।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষাণা করা হয়। ছাত্র ও রাজনীতিবিদরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন সম্মিলিত বিরোধী দল থেকে মোহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রার্থী হবে। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা সম্মিলিত বিরোধী দলের বা 'কপ' (কম্বাইনড অপোজিশন পার্টি) প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে শহর থেকে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে কাজ করেছেন।[১৮৬] সর্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবিতে ১৯ মার্চ ১৯৬৪ পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলামি প্রভৃতি দল এই হরতাল আহ্বান করে।[১৮৭] ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলামি এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের একটি প্রস্তাব সমর্থন করে এবং 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party বা COP) নামে একটি জোট গঠন করে।[১৮৮] অন্যদিকে নির্বাচনি প্রচারণায় আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন পরিচালিত কনভেনশন মুসলিম লীগ পাকিস্তান রাষ্ট্রে একজন মহিলা প্রার্থী হিসেবে মিস ফাতেমা জিন্নাহর প্রার্থীতা নিয়ে ধর্মীয় বৈধতার প্রশ্ন তোলে। আইয়ুব খানসহ তাঁর সমর্থকরা ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে কোনো মহিলার মনোনয়ন অবৈধসহ অন্যান্য অরাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বক্তব্য নিয়ে প্রচারণা চালায়।[১৮৯]

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল

১৯৬৪ সালে নভেম্বর মাসে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কপ দাবি করে যে পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৬৫ ভাগ ও পূর্ব-পাকিস্তানে শতকরা ৮৫ ভাগ নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রী তাদের দলের, অপরপক্ষে কনভেনশন মুসলিম লীগ দাবি করে যে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের প্রার্থী যথাক্রমে শতকরা ৮৩.১ এবং ৮৫ ভাগ।[১৯০] এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

সারণি ১.৩ : ৮ জানুয়ারি (১৯৬৫) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনি ফলাফল নিম্নরূপ :[১৯১]

প্রদেশ	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা	অবৈধ ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত বৈধ ও অবৈধ ভোটের মোট সংখ্যা	প্রত্যেক প্রার্থীর লব্ধ ভোটের শতকরা হার
পূর্ব-পাকিস্তান	১. আইয়ুব খান ২. জনাব কে.এম. কামাল ৩. মিয়া বশীর আহমদ ৪. মিস ফাতিমা জিন্নাহ	২১,০১২ ৯৩ ১১ ১৮,৪৩৪	২৭৪	৩৯,৮২৪	৫৩.১২ ০.২৩ ০.০২ ৪৬.৬০
পশ্চিম পাকিস্তান	১. আইয়ুব খান ২. জনাব কে.এম. কামাল ৩. মিয়া বশীর আহমদ ৪. মিস ফাতিমা জিন্নাহ	২৮,৯৩৯ ৯০ ৫৪ ১০,২৫৭	৫৩৬	৩৯,৮৭৬	৭৩.৫৬ ০.২৩ ০.১৪ ২৬.০৭
পাকিস্তান সর্বমোট	১. আইয়ুব খান ২. জনাব কে.এ. কামাল ৩. মিয়া বশীর আহমদ ৪. মিস ফাতিমা জিন্নাহ	৪৯,৯৫১ ১৮৩ ৬৫ ২৮,৬৯১	৮১০	৭৯,৭০০	৬৩.৩১ ০.২৩ ০.০৮ ৩৬.৩৬

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাধারণ জনগণের মধ্যে মিস ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গেলেও নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায় যে, আইয়ুব খান যেখানে ভোট পান ৪৯,৯৫২; মিস ফাতিমা সেখানে মাত্র ২৮,৬৯১ ভোট পান।[১৯২] প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ৯৯.৬২ ভাগ। আইয়ুব খান বিজয়ী হয়েছিলেন ৬৩ ভাগ পেয়ে আর ফাতেমা জিন্নাহ পেয়েছিলেন ৩৬ ভাগ। পূর্ব-পাকিস্তানের ১৭টি জেলার মধ্যে ১৩টিতে জিতেছিলেন আইয়ুব খান। এতৎসত্ত্বেও লক্ষণীয় যে, আইয়ুবের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রবল চাপ থাকা সত্ত্বেও ৩৬.৬০ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রী আইয়ুবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংখ্যা ছিল ২৬.০৭ ভাগ।[১৯৩] ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে নির্বাচিত ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে ভোটদাতা ছিলেন। মৌলিক গণতন্ত্রীরা তাদের এতসব সুযোগ-সুবিধা হাতছাড়া করে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন এটা ভাবার কোনো কারণ ছিল না। কারণ, ফাতেমা জিন্নাহ জিতলে, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। মৌলিক গণতন্ত্র থাকবে না। তবু, আইয়ুববিরোধী ভোটের সংখ্যা এটাই প্রমাণ করে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের সিভিল সমাজ পিছুহটে যায় নি। ছাত্রদের কৃতিত্ব এই যে, তারা আইয়ুববিরোধী নির্বাচনি প্রচারণা ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের বিষয়টি এক করে তুলেছিলেন।[১৯৪] নির্বাচনে ঢাকা শহরে আইয়ুব খানবিরোধী যে জনমত সৃষ্টি হয়েছিল তা নির্বাচনি ফলাফলের ওপর প্রভাব পড়ে। নির্বাচনে ঢাকা শহরে আইয়ুব খান পরাজিত হন।[১৯৫] মিস ফাতেমা জিন্নার অনুকূলে নির্বাচনি প্রচারণা চালানোর সময় শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের মধ্যে আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র ও সরকারবিরোধী মনোভাব এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৯৬]

১৯৬৫ সনের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস্ জিন্নার পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবদুল হক বলেন, ‘সম্মিলিত বিরোধী দল পরিতাপের বিষয়, পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সুবিদিত অভিযোগগুলির প্রশ্নে, তার প্রতি অবিচারগুলির প্রশ্নে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে নির্বাচনি অভিযানকালে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।’[১৯৭]

তাঁর হয়তো নিখিল পাকিস্তান ঐক্যের খাতিরে এবং প্রতিপক্ষের ভয়ে এসব প্রশ্নের ওপর বেশি জোর দেওয়া সংগত ছিল না মনে করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরায় এক রাষ্ট্র হলেও বাস্তবকে অস্বীকার না করলে একথা মানতেই হবে যে, রাষ্ট্রের দুই অংশ আসলে সহস্রাধিক মাইল দ্বারা বিভক্ত দুটি স্বতন্ত্র দেশ এবং এই দুদেশের অধিবাসীরাও স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী।[১৯৮]এদের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বতন্ত্র, সমস্যা স্বতন্ত্র, প্রগতির ধারা স্বতন্ত্র, এদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধাও বিপুল বৈষম্য বর্তমান। এইসব কারণে তাঁদের স্বার্থ এক রকম হতে পারে না। এই মৌলিক কথাটা উপলব্ধি না করলে পূর্ব পাকিস্তানিদের দুঃখ কোনোকালে ঘুটবে না।[১৯৯]

আবদুল হক পাকিস্তানিদের অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সম্মিলিতভাবে নির্বাচনকালে বাংলার স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার বিপক্ষে বলেন,

> তাঁরা কি সার্বজনীন ভোটাধিকারের পরিণতি সম্পর্কে অবগত নন? সার্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ পূর্ব পাকিস্তানে ভোটের সংখ্য বেশী হওয়া। এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অর্থ আজ হোক কাল হোক, কোন পূর্ব পাকিস্তানী প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য বর্তমান অপেক্ষা অনেক খর্ব হয়ে যাওয়া।[২০০]

অতএব ওখানে কিছু গণতন্ত্রমনা লোক থাকলেও অধিকাংশ লোক সর্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাইতে পারে না। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক নির্বাচনি ঐক্য গড়তে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিকস্বার্থকে চাপা দেওয়া হয়েছে এবং তার ফল এখন এই প্রদেশের জনসাধারণকেই ভুগতে হবে।[২০১]

আবদুল হক আরও বলেন,

> বস্তুত এ যাবৎ লব্ধ আমাদের রাজনৈতিক ও অন্যবিধ অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে, একান্তভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অভিযোগগুলো এবং তার প্রতিকার স্বরূপ স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে সর্বাগ্রগণ্য করে এবং তার সঙ্গে সাম্প্রতিক নির্বাচনের অন্যান্য লক্ষ সংযুক্ত করে এ প্রদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য গঠন করা উচিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ কতোটা তা মানতো না মানতো তা বড় প্রশ্ন ছিল না। কারণ, প্রাদেশিক দাবি দূরে থাক, সার্বজনীন দাবীগুলির প্রতিও তারা সাম্প্রদায়িক নির্বাচনে ব্যাপক সমর্থন জানায়নি।[২০২]

পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে এ প্রদেশের দলগুলোর নির্বাচনে নামা উচিত ছিল। এতে অবিলম্বে সাফল্য আসুক বা না আসুক অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতো। এর একট অনুষঙ্গ হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক তৎপরতা প্রসারিত করা মাত্র। সম্মিলিত বিরোধীদল পূর্ব পাকিস্তানেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তার নেতৃত্ব করাচিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটের আশায়।'[২০৩]

পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের হীনম্মন্যতা ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে এবং বিভাগকালেও লক্ষ করা গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা ধরেই নিয়েছিলেন যে অবাঙালি উর্দু হিন্দিভাষী মুসলমান বা পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলমানদের তুলনায় তাঁরা হীন। তাই পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সামনে নিজের স্বার্থের বা ন্যায়ের পক্ষেও কথা বলতে পারেন নি। বলাবার আগেই তাঁরা মনে মনে ধরে নেন যে, এই দাবি তারা মানবে না। তাই ১৯৬৫ সনের নির্বাচনে তাঁরা একজন পূর্ব পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী দাঁড় করাতে পারেননি বা দাঁড় করাননি। অথচ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙালিরাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন।[২০৪] এ প্রসঙ্গে আলোচনায় আবদুল হক লিখেছিলেন :

> এ প্রদেশে যোগ্য লোক কেউ ছিলেন না একথাটা শুধু বহুধা বিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ঈর্ষাপরায়ণ এবং হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন নেতৃবৃন্দই বলতে পারেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনের তাৎপর্য পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা বিবেচনা করা এবং আত্মজিজ্ঞাসায় নিয়োজিত হওয়া এখন তাঁদের প্রধান কর্তব্য। এবডোকৃত নেতাদের বাইরেও প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য লোক এ প্রদেশে একাধিক ছিলেন। দলীয় সংস্কার ও দলীয় স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত অনেক রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিই তাঁদের নাম বলতে পারবেন।
>
> অতএব, সাম্প্রতিক এবং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া দায়িত্ব-সচেতন ব্যক্তিদের কর্তব্য।...একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে,...কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী, খাজা নাজিমুদ্দীন ও

> সোহ্‌রাওয়ার্দী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, চুন্দ্রিগড় ও ফিরোজ খান নুন...রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন।
>
> কিন্তু লক্ষণীয় যে, দু'একজন ছাড়া এঁদের অন্ততঃ অর্ধেক বাঙালি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এমনকি এ যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত গভর্ণরদের এক তৃতীয়াংশও বাঙালি নন। এটা এ রাষ্ট্রের শতকরা ৫৫ জনের পক্ষে আদৌ গৌরবের কথা নয়। এর পেছনে নানা রকম কূটকৌশলের ব্যাপার আছে, কিন্তু এটা বাঙালির অতি-সাফল্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং রাষ্ট্রীয় অভিভাবকের জন্যে সর্বদা পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকারও প্রমাণ। কিন্তু এমন আর কতদিন চলবে?[২০৫]

আবদুল হক মন্তব্য করেন: ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে পূর্ব পাকিস্তানে যোগ্য নেতৃত্বের অনুশীলন ও বিকাশের সাধনা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।[২০৬]

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করতো। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ আগস্ট পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত 'তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে বলেছেন, 'সেনাবাহিনী তাঁর (আইয়ুব খান) ওপর ক্ষুণ্ন, জনগণ তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত। পূর্ব পাকিস্তানে হলো অন্যরকম প্রতিক্রিয়া। সতেরো দিনের বিচ্ছিন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চয়তা স্বায়ত্তশাসনের দাবি সামনে নিয়ে এলো।'[২০৭] শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, এ যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়, বিশেষ করে পাঞ্জাবে। এ প্রসঙ্গে ড. কামাল হোসেন বলেন,

> ...পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীতে আইয়ুবের জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যেই নেমে গিয়েছিল, কারণ যে জনপদ বেহাত ও সৈন্যহানি হয়েছিল তার বিপুল অংশই ছিল পাঞ্জাবি। তাসখন্দ ঘোষণার মাধ্যমে আইয়ুব পরিস্থিতি ও ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন বটে, তাবে তা তাঁর নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর পরিবর্তে আরও ক্ষতি করে বসল। কেননা, পাঞ্জাবিদের কাছে তাসখন্দ ঘোষণা ছিল 'সবকিছু বেচে দেওয়ার' সামিল, সোভিয়েত চাপের মুখে ভারতকে তৃপ্ত করার ব্যবস্থা।...প্রবীণ পাঞ্জাবি রাজনীতিকেরা এই অবস্থাকে একটি অসন্তুষ্ট সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ স্থাপনের এবং সেই সঙ্গে আইয়ুবের পতন ঘটনোর সুযোগ হিসেবে দেখলেন।[২০৮]

তিনি বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, 'পূর্বাঞ্চলে বাঙালিরা যুদ্ধের প্রতি পুরোপুরি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখাল। তাদের মধ্যে এক সার্বিক নিঃসংগতার উপলব্ধি কাজ করেছিল। তারা নিজেদের অনাবৃত ও অরিক্ষিত বোধ করলো।'[২০৯]

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময় শাসকগোষ্ঠী রেডিও পাকিস্তান ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। তখন যুদ্ধের মতো বিশেষ সময়ে সংবাদপত্রসমূহ এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতিবাদের মুখে আবার রবীন্দ্রসংগীত প্রচার শুরু করে।[২১০]

'তাসখন্দ চুক্তি' সম্পাদনের পর আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাস চলছিল। প্রেসিডেন্ট আসার পর বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে দেখা করে এর প্রতিকার চায়। প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য সুফিয়া কামাল প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি তাসখন্দ চুক্তি করে এতবড় পাক-ভারত যুদ্ধ থামিয়ে দিতে পারলেন। সে তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডগোল তো সামান্য। এ পারবেন না একি হয়?'[২১১] আইয়ুব খান এর উত্তরে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'ওঁহা তো আদমি হে, ইহাঁতো ছব হেওয়ান হে।'[২১২] [ওরাতো সব মানুষ, আর এগুলোতো সব জানোয়ার] প্রেসিডেন্টের এই চরম অপমানজনক মন্তব্যের উত্তর দেন প্রতিনিধি দলের সদস্য সুফিয়া কামাল। তিনি বলেছিলেন, 'তব আপ হেওয়ানকে প্রেসিডেন্ট হোয়া?'[২১৩] [তা হলে আপনি কি জনোয়ারদের প্রেসিডেন্ট?]

প্রেসিডেন্টের পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। আলোচনাও ভেঙে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত অবস্থা প্রকাশিত হয়। তদুপরি যুদ্ধজনিত কারণে অর্থনীতিতে অহেতুক চাপ পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে পাঞ্জাবি নেতাদের এক বৈঠকে আইয়ুবের কাছ থেকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় ও একটি 'জাতীয় সরকার' গঠনের দাবিতে বিরোধী শক্তিগুলোকে একত্র করতে সক্রিয় হলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, তাঁদের দাবির সঙ্গে বাঙালিদের সম্পৃক্ত করা গেলে আইয়ুবের ওপর চাপ সত্যিই কার্যকর হবে। *দৈনিক ইত্তেফাকে*র সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয় মুজিবকে তাদের সাথে যুক্ত করার জন্য। তারা একইসাথে বলেন সেনাবাহিনী তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। অর্থাৎ তারা পূর্বেই সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করেছিল। মানিক মিয়ার মনে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা হলো, 'আইয়ুবের কাছ থেকে আরেক দল পাঞ্জাবি নেতার কাছে যদি ক্ষমতার হাতবদল ঘটে তাহলে কি বাঙালিদের দুর্দশা, তাদের ওপর জমে থাকা অবিচারের প্রতিকার হবে?'[২১৪] তাই, মানিক মিয়া বৈঠকে তাদের কাছে জানতে চান, 'বৈঠকে উপস্থিত নেতারা রাজধানী কিংবা সশস্ত্র বাহিনীগুলোর যেকোনো একটির সদর দপ্তর পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর অথবা দুই প্রদেশের সংখ্যাসাম্যভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের বদলে জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবে রাজি হবেন কিনা।'[২১৫] মানিক মিয়ার প্রশ্নের জবাবে বলা হলো, 'আসুন, আগে তো আমরা আইয়ুবের কাছ থেকে ক্ষমতা নিই। তারপর দেখা যাবে আমরা কীভাবে তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করি।'[২১৬]

বাঙালিরা ভোলেন নি যে পাকিস্তানের প্রথম দশকে ঐ সব রাজনীতিকই যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তাঁরা কী রকম সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের বঞ্চিত করেছেন, বৈষম্যের শিকারে পরিণত করেছেন। 'এক ইউনিট' ও 'সংখ্যাসাম্য' তাঁদের মস্তিষ্কপ্রসূত।[২১৭] তাই এ ধরনের কোনো জোট বাঙালির কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি।

১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। তিনি বিরোধী দলীয় বাঙালি নেতাদের তাঁর সঙ্গে বৈঠকের আমন্ত্রণ জানালেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করার জন্য একটি অভিন্ন দাবিনামার ব্যাপারে অন্যান্য বাঙালি নেতাকে[২১৮] রাজি করানোর উদ্দেশ্যে অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা চালায়। এসব আলোচনায় তিনি চাপ দেন যে দাবিনামায় বাঙালির স্বার্থ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অতিগুরুত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পরিসীমা ব্যাখ্যা করে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দফা থাকতে হবে। এ সময়ই এ-সংক্রান্ত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দফা লিখিত আকারে তৈরি হয়। প্রবীণ নেতারা এসব দফার পেশ করতে অস্বীকৃতি জানান।[২১৯] কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐ সব দাবিদাওয়া ছিল 'ছয় দফা'র পূর্বগামী।[২২০]

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরপরই স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তাদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। শুধু ঘোষণা দিয়েই শেখ মুজিব ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে, যা আইয়ুব খান কর্তৃক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তারিখে) শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। উক্ত কনভেনশন মূলত পাকিস্তানের ডানপন্থি দলসমূহ নিয়ে গঠিত ছিল।

কনভেনশনে উপস্থিত ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিলেন মাত্র ২১ জন। উক্ত ২১ জনের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলের অপর ৪ জন নেতা। ন্যাপ এবং এনডিএফ উক্ত কনভেনশনে যোগদান করেনি। এই কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি-উত্থাপনের সুযোগলাভে বঞ্চিত হয় এবং এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব তার ছোটো প্রতিনিধিদল নিয়ে সম্মেলনস্থান ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করেন ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬। ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপা হয়।[২২১] কারণ আইয়ুব-মোনায়েম চক্র এই কর্মসূচি সংবাদপত্রে প্রকাশে বাধা দেয়।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর থেকে ফিরে ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে ৬ দফা প্রসঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি দু'কলাম জুড়ে *দৈনিক আজাদের* এ সংক্রান্ত সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'লাহোর সম্মেলনের কোটারী বিশেষের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের অভিযোগ, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি আলোচিত হয় নাই।'[২২২] *দৈনিক ইত্তেফাক* এ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে এ সম্পর্কে সংবাদ ছাপায়, 'দেশের উভয় অংশের মধ্যে অটুট ঐক্য ও সুদৃঢ় সংহতি গড়ে তোলার জন্য আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা কর্তব্য নির্দেশ করেছেন।'[২২৩]

শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফার ভিত ছিল ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের সম্মেলন। উক্ত সম্মেলেন আয়োজন করে পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ড। মূলত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের[২২৪] মতামত নেওয়ার জন্য সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনের মতামত নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে পাকিস্তানের পরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্য একটি যুক্তিসংগত ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো হিসেবে দ্বৈত অর্থনীতির ধারণাকে বেশ জোরের সঙ্গে উপস্থাপন করে। পরবর্তী বছরগুলোতে পরিকল্পনা এবং নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বৈত অর্থনীতি মতবাদকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটি গভীর বিভাজন সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তান সন্দেহ করেছিল যে, দ্বৈত অর্থনীতি মতবাদ অবশেষে দুটি রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টির দিকে ঠেলে দেবে।[২২৫] তবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের সন্দেহ নতুন নয়। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করলে তাকে ভারতের ষড়যন্ত্র ও দেশকে বিভাজনের প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। দ্বৈত অর্থনীতি মতবাদের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল, হাজার মাইলেরও বেশি দূরত্বেও কারণে দেশের দুই অংশ, পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে শ্রমিক যাতায়াতের স্বল্পতা এবং বাণিজ্য-পণ্য পরিবহনের দীর্ঘ সময় ও উচ্চমূল্য। এই কারণে একই মুদ্রাব্যবস্থা সত্ত্বেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের রূপটি ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের। অতএব পশ্চিমে ক্রমবর্ধমান ও উচ্চহারে বিনিয়োগে যে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পূর্বের শ্রমিকদের অংশগ্রহণ অসম্ভব ছিল।[২২৬] অর্থাৎ দ্বৈত অর্থনীতি মতবাদের মূলে রয়েছে আন্তঃআঞ্চলিক শ্রমশক্তির যাতায়াতের সুযোগহীনতা। এর ফলে পশ্চিমের বিনিয়োগ পূর্বের শ্রমশক্তির যাতায়াতের সুযোগহীনতা। এর ফলে পশ্চিমের বিনিয়োগ পূর্বের শ্রমশক্তির জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয় না।[২২৭] সম্মেলনের প্রতিবেদনটি শেষ হয় এভাবে,

> উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে...পাকিস্তানকে দুটি অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। অবশ্য, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বৈদেশিক সম্পদ সংগ্রহ ও একত্রীকরণের জন্য পাকিস্তানকে একটি অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে দেখা যেতে পারে।
>
> প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা...কিছু কিছু পরিসংখ্যান, যেমন জাতীয় আয়, দেনাপাওনার হিসাব এবং অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী সম্পদের পরিমাণ সম্পূর্ণ অঞ্চলভিত্তিতে করা। এটি ছাড়া পাকিস্তানে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মৌলিক বা বাস্তব ইস্যুগুলিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে না।[২২৮]

কিন্তু দ্বৈত অর্থনীতি মতবাদকে আইয়ুব খান দেশ-বিভাজন মতবাদ হিসেবে মনে করতেন।[২২৯] ১৯৬২ সালে ঢাকায় প্রকাশিত *বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই শীর্ষক* এক পুস্তিকায় ছয় দফার বীজ আরও স্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ পুস্তিকায়

বলা হয়, বৈষম্যরোধের একমাত্র কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ঐ পরিবর্তনের রূপরেখা হিসেবে প্রস্তাব করা হয় যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দিয়ে পরিবর্তে দুটি শক্তিশালী আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থা গঠন করতে হবে এবং অর্থ ও অর্থনীতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়গুলোকে (দেশের দুই অংশের জন্যে) দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে।

পুস্তিকায় এ পরামর্শও দেওয়া হয় যে বৈদেশিক সাহায্যের চাহিদা দুই অঞ্চলের জন্য পৃথকভাবে নির্ণয় করতে হবে এবং বৈদেশিক সাহায্যনীতি প্রণয়নে আঞ্চলিক সংস্থাগুলো সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। ঐ পুস্তিকায় উত্থাপিত এসব সুপারিশের মাঝে রোপিত ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আঞ্চলিকীকরণের ধ্যানধারণার বীজ। যেমন : করারোপ, অর্থনৈতিক ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন, সম্পদ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদেশের (রিজিয়ন) কাছে হস্তান্তর।

অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণে দেখানো হয় যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সম্পদ পাচারের মূলে রয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বৈদেশিক দ্রব্য রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য অবাধে বরাদ্দ করা হচ্ছিল। বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলোর কাছে পশ্চিমাঞ্চলের প্রকল্পগুলো যতটা সক্রিয় উৎসাহের সঙ্গে তুলে ধরা হতো পূর্বাঞ্চলের বেলায় তা করা হতো না। পশ্চিমাঞ্চলের সেচ, কৃষি ও শিল্পে বিপুল ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ দেশের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য ক্রমেই প্রসারিত করে চলছিল।[২৩০] সেইসময় রেহমান সোবহান *ফোরাম* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকায় তৎকালীন সময়ের প্রায় সব অর্থনীতিবিদগণ লিখতেন। সেইসব লেখায় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি উঠে এসেছিল।[২৩১] ড. কামাল হোসেন ৬ দফা ও এর অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে বলেছেন,

> এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ছয় দফা কর্মসূচি যখন চূড়ান্তভাবে প্রস্তাবিত হলো, তখন এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো বাধাটি আসে এর বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যসংক্রান্ত দফাগুলোর ক্ষেত্রে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যে হাতিয়ারের জোরে দেশের অর্থনীতির ওপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম হচ্ছিল, সে হাতিয়ার তারা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না।[২৩২]

৬ দফা উত্থাপনের পরপরই সরকারি মহলসহ বিরোধী রাজনীতিবিদদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড সমালোচনার ঝড় ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী আব্দুল হাই চৌধুরী ১৪ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে তাঁর ভাষা 'কন-ফেডারেশন' গঠনের প্রস্তাবকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলে অভিহিত করেন।[২৩৩]

এই অবস্থায় ৬ দফার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে **১৭** ফেব্রুয়ারি **১৯৬৬** ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ৬ দফাকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগী হন।

এই দাবিগুলো সম্পর্কে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা অবগত ছিলেন না। বিষয়টি উপস্থাপনের পূর্বে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদন নেওয়া হয়নি। ফলে **২১** ফেব্রুয়ারি **১৯৬৬** আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে[২৩৪] ৬ দফা প্রস্তাব পেশ করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়। অনেক নেতা-কর্মী ক্ষুব্ধ হন, এবং অনেকে হন বিভ্রান্ত। তবে '৬ দফার প্রতি আওয়ামী লীগের তরুণ-নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেলো।' প্রবীণ নেতাদের আপত্তি বা গড়িমসি সত্ত্বেও তরুণ কর্মীরা 'বাঙালির দাবি ৬ দফা', 'বাঁচার দাবি ৬ দফা', '৬ দফার ভিতরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিহিত' ইত্যাদি স্লোগান সংবলিত পোস্টারে পোস্টারে দেয়াল ছেয়ে ফেলেন। কেবল তাই নয়, ওয়ার্কিং কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই **২১** ফেব্রুয়ারি (**১৯৬৬**) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা-কর্মসূচি' শীর্ষক এক পুস্তিকা বিলি করা হয়। উক্ত পুস্তিকায় ৬ দফার দাবিগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

ছয় দফার বিবরণ

এক. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপ গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

দুই. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

তিন. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। এর যে কোনো একটি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়:

'(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

চার. সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।'

পাঁচ. এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয় :

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।
২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।
৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।
৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।
৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।'

ছয়. এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।[২৩৫]

আওয়ামী লীগের সভায় ছয় দফার অনুমোদন

১৩ মার্চ ১৯৬৬ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। মওলানা তর্কবাগীশ এবং আরও কিছু প্রবীণ নেতা ছয় দফার বিরোধিতা করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদিত হলেও তা পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কাউন্সিল অধিবেশন বসে ১৮ ও ১৯ মার্চ ১৯৬৬। পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ৬ দফার বিরোধিতা করে সভাস্থল ত্যাগ করলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়ে যান। এই সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। তাছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হয়।

ছয়দফা সম্পর্কে মুজিবের ব্যাখ্যা

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তারিখে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব তাঁর দলের ছয় দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, পাক ভারত যুদ্ধের পর এটা পরিষ্কার হয়েছে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে হলে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এর উভয় অংশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রকে শক্তিশালী করলেই যে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হবে-এমনটি ঠিক নয়।

বরং একটি যুক্তরাষ্ট্রের সকল ফেডারেটিং ইউনিটগুলোকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে এবং এর উভয় অংশের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করতে হলে ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে।

আওয়ামী লীগ যে সময় ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের কিছু দল ও নেতাও সংসদীয় গণতন্ত্র কিংবা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করছিলেন। যদিও এসব দল কিংবা নেতা শেখ মুজিব-বিরোধী ছিলেন কিন্তু শেখ মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে তারা উপেক্ষা করতে পারেননি।

জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা নূরুল আমিন, যিনি এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং যার মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয় সেই নূরুল আমিনও বলতে শুরু করেন যে, দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি নির্ভর করে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের আলোকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে। তিনি মন্তব্য করেন যে আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট-শাসিত সরকার দিয়ে দেশের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়।

পূর্ব পাকিস্তানের আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হলো দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। তার মতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকি ক্ষমতা প্রদেশসমূহকে প্রদান করতে হবে।

তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ডেপুটি নেতা (১৯৬৫-৬৯) শাহ আজিজুর রহমান ১৯৬৫-৬৬ সালের জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমেই পাকিস্তানকে শক্তিশালী করা সম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ করা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি একটি সর্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ছয়দফার দাবিতে আন্দোলন জোরদার হতে থাকলে। উপায়ান্তর না দেখে আইয়ুব খান দমননীতির প্রয়োগ শুরু করেন। আইয়ুব খান উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘোষণা করেন যে, 'দেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টা সরকার সহ্য করিবে না। প্রয়োজন হইলে 'অস্ত্রের মুখে' উহার জবাব দেওয়া হইবে।'[২৩৬] ছয়দফার প্রবর্তক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আইয়ুব খানের বক্তব্যের জবাব দেন ৬ দফার দাবিকে সাংগঠনিকস্বরূপ দিয়ে ও দাবি বাস্তবায়নের জন্য একটি গণআন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

ছয়দফার প্রচারণা ও সরকারি দমন নীতি

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হয়। এ পটভূমিকায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের নাগরিক সমাজকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ছয় দফা এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মতো কাজ করেছিল। আওয়ামী লীগের প্রবীণ কিছু নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করলেও তরুণরা তা লুফে নেয়। পোস্টারে লেখা হতে থাকে 'বাঙালীর দাবী ৬ দফা', বাঁচার দাবী ৬ দফা।'[২৩৭] ১৯৬৬ সালের মার্চ-এপ্রিলে ৬ দফার স্বপক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী গণসংযোগ শুরু করেন। কিন্তু সরকার বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের জনসভার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে থাকে। সরকারের বাধা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাচারের কারণে ছয়দফা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল।[২৩৮] এতে করে আইয়ুব-মোনায়েম চক্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় জেল-জুলুম। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির ভিত্তি ছয় দফা আন্দোলন। ছয় দফা বহুদিন পর বাঙালিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল এবং সে কারণে ক্রমেই শেখ মুজিব সবাইকে ছাড়িয়ে পরিণত হয়েছিলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতায়। এরপরই সরকার খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের ওপর।[২৩৯] শেখ মুজিব যেখানেই জনসভা করতে যান সেখানেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। একটা মামলা দায়ের করা হয়, আবার জামিনও দেওয়া হয়। ৬ দফার প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮ মে ১৯৬৬ শেখ মুজিব দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। এই গ্রেফতারের

পূর্বে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৫০ দিনে তিনি ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন।[২৪০] এ সময় শেখ মুজিব এবং ৬ দফা সম্পর্কিত সংবাদ পত্র-পত্রিকার প্রধান শিরোনামে পরিণত হয়। এই সময়সীমার মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ৬ দফার পক্ষে যে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন, তা সত্যিই এক অকল্পনীয় ব্যাপার। সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচারের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে এক আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এ প্রসঙ্গে রওনক জাহান বলেন,

> Six Point movement, whose main thrust was demand of autonomy for East Pakistan is regarded as the turning point in Mujib's rise to charismatic leadership.[২৪১]

শুধু শেখ মুজিবই নন, ১০ মে ১৯৬৬ সালের মধ্যে দলের প্রায় ৩৫০০ নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন।[২৪২] ৭ জুনের ঘটনার পর সরকার আরও বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালের ১৩ জুনের মধ্যে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় স্তরের নেতারাও গ্রেফতার হন। আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার করা অব্যাহত থাকে। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই ৯,৩৩০ জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[২৪৩]

কিন্তু শেখ মুজিব তার আগেই সবকিছু গুছিয়ে এনেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কর্মী বাহিনী যাতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে সেভাবেই গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সংগঠনকে। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগও ছয়দফার প্রচারণায় জড়িয়ে পড়ে। সে-সময় আবদুর রাজ্জাক ৬ দফার ৫০,০০০ হাজার লিফলেট ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে বিলি করেছিলেন। ন্যাপের যে-অংশ ৬ দফার সমর্থক ছিলেন তারা সংবাদ পত্রিকা থেকে ৬ দফার লিফলেট ছাপিয়ে দিতেন।[২৪৪]

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ জুন ১৯৬৬ গোটা প্রদেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। দেশের শ্রমিক শ্রেণি প্রথমবারের মতো একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এতদিন শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে আওয়ামী লীগের তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না। কিন্তু ৭ জুনের হরতালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকরা জড়িয়ে পড়ে।[২৪৫]

৭ জুন ১৯৬৬ সালে হরতাল পালনের সংবাদ বিষয়ে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে ৮ জুন *দৈনিক ইত্তেফাকে* শুধুমাত্র সরকারি প্রেসনোট ছাপা হয়। ৭ জুনের নৃশংস দমননীতির প্রতিবাদ করে ৮ জুন দৈনিক সংবাদ প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়। ৯ জুন প্রকাশিত সংবাদ-এ বক্স আইটেম করে পাঠকদের সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়।[২৪৬]

৮ জুন ১৯৬৬ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশের গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত তিনটি মুলতুবি প্রস্তাব স্পিকার বাতিল করেন। প্রতিবাদে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন। একই দিন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনেও মুলতুবি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন।

১৫ জুন ১৯৬৬ *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৬ জুন নিষিদ্ধ হয় *দৈনিক ইত্তেফাক*।[২৪৭] ছয় দফার প্রচারে পত্রপত্রিকা ও এর সম্পাদকদের ভূমিকা শেখ মুবিজুর রহমানের মন্তব্যের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। তিনি বলেন,

> ছয় দফার আন্দোলন যে আজ এত তাড়াতাড়ি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে এখানেও মানিক ভাইয়ের লেখনী না হলে তা সম্ভব হতো কিনা তাহা সন্দেহ! আমি (শেখ মুজিবুর রহমান) যাহা কিছু করি না কেন, তাহা মানিক ভাইয়ের দোষ, সরকারের এটাই ভাবনা। ভারতবর্ষ যখন পাকিস্তান আক্রমণ করল তখন যেভাবে ইত্তেফাক কাগজ সরকারকে সমর্থন দিয়েছে এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে-ত্যাগের জন্য ও মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য, ইত্তেফাকের পাতা খুললেই তাহা দেখা যাবে।... খবরের কাগজের স্বাধীনতার উপর পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতেছে। এমনকি মানিক মিয়ার মতো সম্পাদককেও দেশ রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করতে একটু লজ্জা করল না।...[২৪৮]

১৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি ৫২(২) ধারা বলে প্রদত্ত এক আদেশে নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করেন। ফলে *ইত্তেফাক* বেশ কয়েকদিন প্রকাশ করা যায় নি।[২৪৯]

১৮ জুন তারিখে পূর্ব পাকিস্তান গণ পরিষদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ একটি মুলতুবি প্রস্তাব এবং একটি অধিকার প্রস্তাব আনলে স্পিকার সেটা বাতিল করেন। ফলে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ স্বল্পকালের জন্য ওয়াক আউট করেন।[২৫০]

পরবর্তীকালে ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ সর্বসম্মত রায়ে সরকার কর্তৃক পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৫২ (৫২) (খ) দফা বলে *ইত্তেফাকের* মুদ্রণালয় নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্তকরণকে অবৈধ ও আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন ঘোষণা করে।

আন্দোলনের শুরুতেই এ রকম দমন-পীড়নে আন্দোলন কিছুট থমকে যায়। সরকারি দমননীতির প্রাথমিক জবাব হিসেবে হাইকোর্টে একাধিক রিট পিটিশন দায়ের করে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আদালতে তোলা হয়।[২৫১]

ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পাকিস্তান আমলে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে। বলা যেতে পারে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের পথে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। ড. কামাল হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন,

> ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম প্রকাশ পেতে থাকে সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক দাবির আকারে। এই দাবিগুলো প্রথমে ৬ দফা ও পরে ১১ দফার আকারে উত্থাপিত ও সন্নিবেশিত হয়। এই সাংবিধানিক দাবিগুলোর মূলে ছিল মুক্তি ও ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের আকুতি। এমন এক সাংবিধানিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা সেখানে কাজ করছিল, যার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন ঘটবে।[২৫২]

অর্থাৎ বাঙালির সাংবিধানিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে। এ আকাঙ্ক্ষা পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে নয়, বরং একটি স্বাধীন দেশ হবে এবং সেখানে যে সংবিধান হবে তাতে বাঙালির আশা-আকাক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। এটার অন্যতম কারণ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি যে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে তার কারণে। তাই বলা যায়, বৈষম্য-শোষণের বিরুদ্ধে ছয় দফা দাবি একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবিকে 'বাঙালির বাঁচার দাবি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ছয়দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্পদ, অভ্যন্তরীণ রাজস্বও আয় বৈদেশিক আয়ের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করা হয়। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতাও দাবি করা হয়। ১৯৬৬ সালে ঘোষিত ছয় দফা দাবির সঙ্গে ১৯৪৭-৬৫ সময়ে ঘোষিত দাবির মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্বে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাদানের দাবি জানানো হয়, ছয় দফায় সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের যেন নিজে নিজেই আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে পারে কেন্দ্রের কাছে সে অধিকার চাওয়া হয়। অর্থাৎ ছয়দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়।

ছয়দফা দাবিকে বাঙালির 'মুক্তিসনদ' বলা হয়। ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতঃপূর্বে ভাষার দাবিতে ভাষা আন্দোলন, ছাত্রদের দাবিভিত্তিক শিক্ষা আন্দোলন হলেও ছয়দফার আন্দোলন ছিল সর্বস্তর ও পেশার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন পূর্বের আন্দোলনগুলোতে ছাত্ররাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ছয়দফার আন্দোলন ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পরিচালিত সুসংগঠিত আন্দোলন। এ আন্দোলনে মুখ্যভূমিকা পালন করে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ। শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং সারাদেশে জনসভা করে এ আন্দোলনকে প্রদেশব্যাপী ছড়িয়ে দেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদেরকে ধরপাকড় ও জেল-জুলুমের মাধ্যমে সাময়িকভাবে আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারলেও ছয়দফার দাবিগুলোকে বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। এর প্রমাণ হচ্ছে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় ছাত্রদের যে এগারোদফা দাবি ঘোষিত হয় তার মধ্যে

ছয়দফার মূল বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে ছয়দফা দাবিসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়। ছয়দফা এতটাই জনসমর্থন লাভ করেছিল যে, বঙ্গবন্ধু ছয়দফাকেই নির্বাচনি ম্যান্ডেট হিসেবে ঘোষণা করেন। ছয়দফা ও এগারো দফার আন্দোলনের সময় বাঙালির মধ্য যে সচেতনতা ও ঐক্য গড়ে ওঠে তার ফল পাওয়া যায় সত্তরের নির্বাচনে। নির্বাচনি প্রচারণায় বলা হয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য দূর করা সম্ভব ছয়দফার বাস্তবায়নের মাধ্যম। পূর্ব পাকিস্তানবাসী তা বিশ্বাস করে এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়ী করে। আর ছয়দফার বিরোধীদের অপমানজনক পরাজয় ঘটে।

৭০-এর নির্বাচনের মাধ্যমে ছয়দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণের রায় পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তা আর অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। কিন্তু নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ফলে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, ছয়দফা আন্দোলনে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

শাসকগোষ্ঠীর বিপক্ষে কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলন

ব্রিটিশ আমলের মতো কৃষকদের পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে বাধ্য করতো ভুট্টা চাষের জন্য।[২৫৩] একইসাথে তারা বিকল্প খাদ্য অভ্যাস গড়ার জন্য গম ও ভুট্টা উৎপাদন এবং খাদ্য তালিকায় আটা অন্তর্ভুক্ত করা জন্য চেষ্টা করে। পাবনায় আমদানি করা বিষাক্ত ভুট্টার রুটি ভক্ষণের ফলে ১৭ মার্চ ১৯৬৬ দু'জনের প্রাণহানি ঘটে। পাবনা সদর হাসপাতালে ১৭০ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে ভর্তি হন। ঐ দিন পাবনায় ১৫ হাজারেরও বেশি লোকের একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে স্লোগান ছিল–'আমরা বাঙালি ভুট্টা খাব না'।[২৫৪] বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কায়েকবার কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করে। গুলিবর্ষণের ফলে ১ জন নিহত ও ১২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন জায়েদী'র বাড়ির সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[২৫৫] ব্রিটিশ আমলে নীলচাষের বিরুদ্ধে পাবনা অঞ্চলের কৃষক যেমন বিদ্রোহ করেছিল, তেমনি পাকিস্তান আমলেও ঐ অঞ্চলের কৃষকগণ ভুট্টা চাষের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেছিল।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে জন-জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। ফলে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ১৯৬৭ সালের ১৩ মার্চ প্রদেশের ৬টি চটকলের ৪৭ হাজার শ্রমিক ৩ দফা দাবির ভিত্তিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। রেশনে শ্রমিকদের ২০ টাকা মন দরে চাউল ও ১০ ঢাকা মন দরে আটা সরবরাহ, অতিরিক্ত বেনিফিট প্রদান ও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি–এই তিন দফা দাবিতে চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের ধর্মঘটের আহ্বানে আদমজী জুট মিল, ঢাকা জুট মিল, পাকিস্তান ফেব্রিক, নিশাত জুট মিল ও পাক জুট মিলের শ্রমিকগণ সাড়া দিয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে।[২৫৬]

রাজনৈতিক দিক থেকেও ১৯৬৭ সাল ছিল সবর। এ বছর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও জোটবদ্ধতার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ-এর মধ্যে দ্বিধাবিভক্তিরও সৃষ্টি হয়। সূচনা হয় সশস্ত্র রাজনৈতিক ধারারও। দুই সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ও চীনের মধ্যে তাত্ত্বিক কারণে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব পড়ে দেশের বাম রাজনীতির ওপর।[২৫৭]

সরকার দমননীতির শিকার হয় দৈনিক পত্রিকাসমূহ। ২২ মে ১৯৬৭ তারিখে ঢাকা'র ডেপুটি কমিশনারের নামে পেশকৃত ডিক্লারেশনের আবেদনপত্র নাকচ করে দিলে প্রদেশের অন্যতম প্রাচীন সংবাদপত্র *দৈনিক সংবাদ*-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সম্মিলিত বিরোধীদল ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ অধিবেশন বর্জন করে। ২০ জুন ঢাকা'র ডেপুটি কমিশনার *দৈনিক সংবাদ*-এর ডিক্লারেশন প্রদান করার পরপরই বিরোধীদলীয় সদস্যগণ তাঁদের ১৮

দিনব্যাপী পরিষদের অধিবেশন বর্জন প্রত্যাহার করেন।[২৫৮] সংবাদপত্র বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু এইভাবে পূর্ব কখনও রাজনীতিবিদরা সংবাদপত্রের পক্ষে অবস্থান নেন নি।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে ৭ দিনের সফরে ঢাকা'য় আগমনের প্রাক্কালে ঢাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল চলাকালে পুলিশ ও ইপিআরের গুলিতে দু'জন নিহত ও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়।[২৫৯] ঐ রাতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান হোটেল শাহবাগে মুসলীম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্যদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন, 'বিরোধীদল জনগণকে বিপথে চালিত করছে এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত করছে।' তিনি আরও বলেন, ' বিরোধীদল হরতাল, বিক্ষোভ, মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে দেশকে পৃথক করতে চায়।'[২৬০] পুলিশের গুলির প্রতিবাদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, পিপলস্ পার্টি ও পিডিএম-এর ডাকা ৮ ডিসেম্বরে হরতালে তিনজন নিহত এবং শতাধিক আহত হন।[২৬১]

১৯৬৭ সাল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮-১৯৬৮ আইয়ুব খানের শাসনামলকে 'উন্নয়ন দশক' বা 'ডিকেড অফ ডেভেলপমেন্ট' হিসেবে পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সারা পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয় এক নজিরবিহীন প্রচারণা। এ প্রচারের মাধ্যমে এ ধারণাই সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয় যে, আইয়ুব খানের সময় পাকিস্তান ও বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং তাকে হটানো মুশকিল। আইয়ুব খান ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এ প্রচারণা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়। দু'টি ঘটনা এর ভিত্তি স্থাপন করে। পূর্ব-পাকিস্তানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে লাণ্ডিকোটালে চোরাকারবারী পণ্য নিয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ।[২৬২]

আগরতলা মামলা

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। ফলে ছয় দফার আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার এবার নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে শাসকগোষ্ঠী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগরতলা মামলাটি একটি মাইলফলক। এই মামলাটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। এ বিষয়ে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালের একটি ঘটনা ড. কামাল হোসেন তুলে ধরেছেন,

> ডিসেম্বরের শেষ সপ্তায় আমার ব্যারিস্টার সহকর্মী আমীর-উল ইসলাম আমাকে জানালেন যে তিনি কারাগারে তাঁর এক মক্কেলের সঙ্গে দেখা করেছেন, যিনি গ্রেপ্তারের পর মারাত্মকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন এবং তাঁর শরীরের নির্যাতনের অনেক চিহ্নও রয়েছে। ওই বন্দী জানিয়েছেন যে নির্যাতনকালে তাঁকে একটি 'ষড়যন্ত্র' মামলায় বেশ কিছু লোককে জড়িয়ে জবানবন্দি দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে আমীর-উল ইসলাম খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং কী করা উচিত সে ব্যাপারে উপদেশ চাইলেন। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হলো বিষয়টি হাইকোর্টের গোচরীভূত করতে এবং ওই বন্দীর শরীর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠনের আরজি জানানোর জন্য অতি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে। সেদিনই সন্ধ্যায় নির্যাতনের অভিযোগ এবং ওই বন্দীকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠনের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হলো। পিটিশনটি খুবই সাড়া জাগায় এবং মেডিকেল বোর্ড গঠনে আদালত সম্মত হন। ওই বন্দী ছিলেন কামালউদ্দীন আহমেদ, যিনি পরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১ নম্বর রাজসাক্ষী হন।[২৬৩]

এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পাকিস্তান সরকার মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে একটা মামলা দাঁড় করে এবং ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ঘোষণা করে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ৭ই জানুয়ারি সংবাদপত্রে 'পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র' সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হলো, জানানো হলো এ কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে ২৮ জনকে। গ্রেফতারে সংখ্যা পরবর্তীকালে দাঁড়ায় ৩৫ জনে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত এ মামলার মূল বক্তব্য ছিল, ভারতীয়র সাহায্যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কিছু কর্মচারী পূর্ব-

পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে সরকার পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়। সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযুক্তরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে গোপন বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ কারণে মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। সরকারি নথিতে মামলার নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। এটি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। শেখ মুজিব তখন জেলখানায় বন্দি। সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আরও ৩৪ জনকে এই মামলার আসামি করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এই বলে যে, আসামিগণ ভারতের যোগসাজশে পূর্বপাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। অভিযোগে আরও বলা হয় যে, আসামিগণ ত্রিপুরা প্রদেশের আগরতলায় বসে এই ষড়যন্ত্র করেছিল। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা, সিভিল সার্ভিসের দুইজন কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে জড়িত এবং তাঁকে এক নম্বর আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়।[২৬৪] এর জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এই মামলার সরকারি নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। লোকমুখে এই মামলা পরিচিতি লাভ করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে। শেখ মুজিবুর রহমান এই মামলার নামকরণ করেছিলেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা' নামে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ছিল এই প্রচেষ্টা, তাই এটি ষড়যন্ত্র হতে পারে না। সে জন্যই একে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু আগরতলা মামলা নামে।

এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল–পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনা অফিসারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিব ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য ১৯৬২ সালে তিনি গোপনে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা যান। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ভূমিকা ছিল বেশি।

এখন এটি প্রমাণিত যে, এই মামলার ভিত্তি ছিল। তবে বিভিন্ন তথ্য দেখে, স্মৃতিচারণ পড়ে মনে হয়, পাকিস্তান সরকার বা কুশীলবরা যেভাবে বিষয়টি সাজিয়েছিল আসলে সেটি তেমন কিছু ছিল না। তবে, অভিযুক্তরা দেশকে মুক্ত করার জন্য ভেবেছিলেন, একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।[২৬৫]

আগরতলা মামলার অভিযুক্ত তৎকালীন ক্যাপ্টেন শওকত আলীর স্মৃতিকাহিনি পড়ে এ ধারণা হয় যে, তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে পাকিস্তান সরকার মামলা সাজিয়েছিল। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রধানত নৌ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন ১৯৬২-৬৩ থেকে এবং অধিকাংশই ছিলেন নিম্ন পর্যায়ের অফিসার। ক্যাপ্টেন শওকতরা প্রধানত একই উদ্দেশ্যে আলাপ করছিলেন মূল বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে। সিভিল সার্ভিসের রুহুল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান, খান শামসুর রহমান ও অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গেও হয়তো তাঁদের আলাপ হয়েছিল; কারণ এরা সবাই ছিলেন বাঙালি প্রেমী। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কোনো পরিকল্পনা তাঁরা নিতে পারেননি। শওকত আলীদের কাছে মনে হয়েছে মোয়াজ্জেম হোসেন তাড়াহুড়া করছেন এবং গোপনীয়তা সম্পর্কেও তিনি সজাগ নন। ফলে সেনাসদস্যরা ধরা পড়েন। শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রয়াসের সঙ্গে হয়তো সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। প্রশ্রয় হয়তো ছিল। কিন্তু তিনি যে মুক্তির প্রচেষ্টায় আগরতলা গিয়েছিলেন তা সত্য; স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন তাও তো সত্য। গোয়েন্দ দফতর তা জানতো। পাকিস্তান সরকার তাঁকে হেনস্থা করার জন্য এ মামলা করেছিল। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে তারা প্রচার করতে চেয়েছিল–শেখ মুজিব ভারত বা হিন্দুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভাঙতে চাচ্ছেন।

এই মামলার ফল হয়েছিল উল্টো। গ্রেফতারকৃতদের প্রথম নামের তালিকায় শেখ মুজিবের নাম ছিল না। তাঁকে পরবর্তীকালে প্রধান আসামি করা হয়। এ ষড়যন্ত্র মামলার খবর প্রথমে বাঙালিদের বিমূঢ় করেছিল। স্পষ্টত তারা এটি

বিশ্বাস করে নি। বরং এ বিশ্বাসই দৃঢ়ীভূত হয় যে, যেহেতু ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল সেহেতু শেখ মুজিব ও বাঙালিদের দমনের জন্যই তারা এ মামলা দায়ের করেছিল। আর শেখ মুজিব তো ১৯৬৬ সাল থেকে জেলে। এই সময় আইয়ুব খান-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি প্রধান হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে গঠন করে 'ড্যাক'।

ইতোমধ্যে মামলার শুনানি শুরু হলে পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রচার করতে থাকে অভিযুক্তদের প্রতি কী অত্যাচার করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আগরতলা মামলায় আহমেদ ফজলুর রহমান-এর আইনজীবী ড. কামাল হোসেন বলেন,

> মামলার অগ্রগতি এবং প্রতিদিনের কাজের আক্ষরিক বিবরণাদি দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ফলাও করে প্রকাশিত হওয়ায় মামলাটির ব্যাপারে জনমনে প্রচণ্ড কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। আইয়ুব সরকার যদি ভেবে থেকে থাকে যে মামলাটি শেখ মুজিবকে জনগণের কাছে কলঙ্কিত করবে, তাহলে ঘটনাটি ঘটে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙালি জনগণের স্বার্থপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নির্যাতিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি জনমনে প্রগাঢ় সহানুভূতি অর্জন করে। বাঙালির দুঃখ-দুর্দশা ও দাবিদাওয়াগুলো এর ফলে ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে বাঙালির চেতনা প্রবলতর হয়।[২৬৬]

ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হতে থাকে। পাকিস্তান সরকারও আন্দোলন দমনে গুলির পথ বেছে নেয়। ইতোমধ্যে ছাত্রসহ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। পুলিশের নিপীড়নে আহত হয়েছেন অনেকে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয়। হাসপাতালে জহুরুল হক মারা গেলে ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকাবাসী রাস্তায় নেমে আসে। আইয়ুব খান পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি এক গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন ও প্যারোলে শেখ মুজিবকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা মামলা শুধু প্রত্যাহার নয়, বিনা শর্তে সকল অভিযুক্তকেও মুক্তি দেয়। এই মামলার ৩৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে ছিলেন–শেখ মুজিবুর রহমান, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত এলএস সুলতান উদ্দিন আহমেদ এলএফসিডিআই নূর মোহাম্মদ, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ, অবসরপ্রাপ্ত কর্পোরাল আবদুস সামাদ, অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার দলিল উদ্দিন, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক, বিভূতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী) বিধানকৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুল রাজ্জাক, অবসরপ্রাপ্ত ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এবি খুরশীদ, খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান সিএসপি, একেএম শামসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারী, সার্জেন্ট শামসুল হক, শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আব্দুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এম নুরুজ্জামান, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট এম রহমান, অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার তাজুল ইসলাম, আলী রেজা, ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ ও লেফটেন্যান্ট আব্দুর রউফ।

আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বেলা এগারোটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২-ক এবং ১৩১ ধারা অনুসারে। মামলার চার্জশিটে ছিল ১০০ অনুচ্ছেদ। সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন।[২৬৭] প্রখ্যাত আইনজীবী আব্দুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি আত্মপক্ষ সমর্থকদের দল গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন আব্দুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌঁসুলী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি.এইচ খান। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস এ রহমান। অপর দুই বিচারপতি

ছিলেন এম আর খান ও মকসুদুল হাকিম। ২৯ জুলাই ১৯৬৮ মামলার শুনানি শুরু হয়। এ সময় স্যার টমাস উইলিয়াম ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন। শুধু তাই নয়, সরকারি ছাত্র সংগঠন এন এস এফ একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখে। এই ছাত্র সংগঠনের নেতারা সবসময় ছুরি নিয়ে ঘুরত।[২৬৮] ইতোমধ্যে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে ও বিনাশর্তে ৩৫ জন অভিযুক্তকেই মুক্তি দেয়। ফলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দায়েরকৃত রিট আবেদনে ট্রাইব্যুনালের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আর কিছু ছিল না।

সরকার ভেবেছিল, এ ধরনের মামলায় শেখ মুজিবের ইমেজ বা জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে। কিন্তু ভুল হয়েছিল সরকারি হিসেবে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন তাঁর জবানবন্দিতে–

> কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।[২৬৯]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। এ আন্দোলনে শহিদ হন আসাদ, মতিউর, রুস্তম। এ ছাড়া মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ঢাকা সেনানিবাসে ১৫ ফেব্রুয়ারি গুলিবিদ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন,

> ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, ভোর পাঁচটায় অবাঙালি সৈনিকেরা আমাকে ও এল, এস সুলতান উদ্দিন আহমদকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কামরার বাহিরে আনতে চেষ্টা করে। আমরা তোদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলি এবং তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেই। আমাদের পাশের কামরায় থাকতেন সার্জেন্ট জহুরুল হক, ক্লার্ক মুজিবুর রহমান ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক। আমাদের নিকট ব্যর্থ হয়ে অবাঙালি সৈনিকরা জহুরুল হকের কামরা খুলে দেয়। তাই তিনজনেই সরল বিশ্বাসে কামরা থেকে বের হয়ে আসেন এবং কিছু দূর যেতে না যেতেই তাদের উপর গুলি চালানো হয়। ফলে সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক গুরুতররূপে আহত হন। ক্লাক মুজিবুর রহমান দ্রুত মাটিতে শুয়ে পড়ায় অক্ষত থাকেন। আমরা ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখি আমাদের কামরার সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় জহুরুল হক ও ফজলুল হক ছট্‌ফট করছেন। এক পর্যায়ে জহুরুল হককে পানি বলে চিৎকার করতে শুনি এবং সাথে সাথে দেখি যে, পানির বদলে হত্যাকারীরা বুটের আঘাত তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে। মৃত্যুপথ যাত্রী জহুরুল হকের উপর এই অমানবিক অত্যাচারের দৃশ্য যদি আমি আলোকচিত্রে তুলে রাখতে পারতাম তাহলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হত না।[২৭০]

অন্যদিকে রাজশাহীতে ইপিআরের গুলিতে নিহত হন ড. শামসুদ্দোহা। এবং সে সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি আর আইয়ুব খানের নিয়ন্ত্রণে আসে নি। তাকে আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। আইয়ুব খানের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে জারি করেন সামরিক আইন।[২৭১]

আবুল কাসেম ফজলুল হক উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

> উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কর্মধারা ও স্লোগানের মধ্যদিয়ে বিপুল জনগণের অসংহত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল। তখনকার ক্ষমতাসীন সরকারের কঠোর দমননীতি জনগণের প্রতিবাদের স্পৃহাকে উত্তেজিত করেছিল। সে অবস্থায় রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব গোষ্ঠীস্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে জনগণের কাঁচা অনুভূতি ও অপরিণত আকাঙ্ক্ষাকে উত্তেজিত করেছিল মাত্র, ...। ঘটনা চলাকালে গণঅভ্যুত্থানকে পত্র-পত্রিকায় 'স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান' বলে অভিহিত করা হয়েছিল।[২৭২]

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মকাণ্ড ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, আর নেতৃত্বও ছিল স্বতঃস্ফূর্ততার দ্বারা প্রভাবিত। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সময় আবদুল হক সমকালে 'নেতৃত্ব ও গণচেতনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছিলেন জনগণের ভূমিকা কী হওয়া উচিত। তিনি বলেছিলেন,

> জনগণ যেমন নেতৃত্ব কামনা করে বা জনগণ যেমন নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম, তেমন নেতৃত্বই সাধারণত তারা লাভ করে থাকে। তবু কখনও কখনও অসাধারণ ব্যক্তির জন্মলাভ হলে তাঁর দ্বারাও জনগণ সঠিকতা অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠিত হয়ে থাকে। তবে জাতির কল্যাণকামী অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব জাতির জন্য সৌভাগ্য সচরাচর ঘটেন বলেই জাতিকে শেষ পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত শক্তির উপরেই নির্ভর করতে হয় এবং এছাড়া গত্যন্তর থাকে না।[২৭৩]

বঙ্গবন্ধু হলেন সেই নেতা যাঁকে বাংলার মানুষ কামনা করেছিল। যার নেতৃত্বে বাঙালি আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাধিকার অর্জনের পথে অগ্রসর হয়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে মিছিলে মিছিলে যেসব স্লোগান উঠেছে, তার এক পক্ষে শোনা গেছে–'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না–তা হবে না তা হবে না', 'শোষকের গদিতে–আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো', 'মুক্তির এই পথ–বিপ্লব বিপ্লব', 'মুক্তি যদি পেতে চাও–হাতিয়ার তুলে নাও', 'জাগো জাগো–সর্বহারা জাগো', 'জেলের তালা ভাঙব–রাজবন্দিদের আনব', 'ছয় দফা না স্বাধীনতা–স্বাধীনতা স্বাধীনতা', 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা–কায়েম কর, কায়েম কর', 'আপস না সংগ্রাম–সংগ্রাম সংগ্রাম', 'গোলটেবিল না রাজপথ–রাজপথ রাজপথ', 'জনতার বিপ্লবী ঐক্য–গড়ে তোল, গড়ে তোল', 'তোমার নেতা আমার নেতা–মওলানা ভাসানী', 'মুক্তির মতবাদ–মার্কসবাদ-লেনিনবাদ', 'মাও সে তুং-এর চিন্তাধারা–বিশ্বকে দিচ্ছে নাড়া', 'মাগো তোমায় মুক্ত করব–শপথ নিলাম শপথ নিলাম' ইত্যাদি।[২৭৪]

দেশব্যাপী এরই পাশাপাশি স্লোগান শোনা গেছে–'আইয়ুবশাহী আইয়ুবশাহী–ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক', 'ছয় দফা মানতে হবে–নইলে বাংলা ছাড়তে হবে', 'আগরতলা মিথ্যা মামলা–মানি না মানি না', জেলের তালা ভাঙব–শেখ মুজিবকে আনব', 'জেলের তালা ভেঙেছি–শেখ মুজিবকে এনেছি', 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা–তোমার-আমার ঠিকানা', 'তোমার দেশ আমার দেশ–বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'মহান নেতা, মহান দেশ–শেখ মুজিব বাংলাদেশ', 'বীর বাঙালি জেগেছে–রক্তসূর্য উঠেছে' ইত্যাদি।[২৭৫]

এই স্লোগানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কিছু কিছু স্লোগান জনগণের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে এবং সেগুলো তৎকালীন নেতৃত্বকে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করা হয়েছে। আবার কিছু স্লোগান নেতাদের কাছ থেকে এসেছে যেগুলো আবার সাধারণ মানুষের কাছে আর স্লোগান হয়ে থাকেনি। সে স্লোগানগুলোকে সাধারণ মানুষ চলার পথের দিকনির্দেশনা হিসেবে দেখেছেন। এই স্লোগানগুলো বাঙালিকে জাগিয়ে তুলে এবং বাঙালিকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নেয়।

আর প্রতিক্রিয়াজাত গণসমর্থনহীন স্লোগান ছিল–'নারায়ে তাকবির–আল্লাহু আকবার', 'জাগো জাগো–মুসলিম জাগো', 'বিশ্ব মুসলিম–এক হও এক হও', 'পাকিস্তানের উৎস কি–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'বাঁচলে গাজি–মরলে শহিদ', 'তোমার নেতা আমার নেতা–বিশ্বনবী মুস্তফা', 'কমিউনিজম না ইসলাম–ইসলাম ইসলাম', 'পিকিং না মক্কা–মক্কা মক্কা', 'মস্কো না মক্কা–মক্কা মক্কা', 'ওয়াশিংটনা না মক্কা–মক্কা মক্কা', 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন–দিতে হবে দিতে হবে', 'পাকিস্তান পাকিস্তান–জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' ইত্যাদি।[২৭৬]

এই তিনটি ধারার মধ্যে প্রথম ধারা মোটামুটি শক্তিশালী ছিল, দ্বিতীয় ধারা সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল, তৃতীয় ধারার প্রতি জনসমর্থন অল্পই ছিল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর ২৩ ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবেগমণ্ডিত ভাষণে বলেছিলেন,

> সংগ্রাম করিয়া আমি আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালোবাসার ডালি মাথায় নিয়া দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে পারিব না। বঞ্চিত বাঙালি, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পাঠান আর বেলুচের মধ্যে কোন তফাৎ নাই কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে দেশের উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হইল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদী।[২৭৭]

শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা প্রচারের মাধ্যমে স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিতে মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। ১৯৬৮ সালে শুরু হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। শেখ মুজিবুর রহমান মামলার জবানবন্দিতে যা বলেছিলেন আসলে তাই ছিল যথার্থ কারণ–

> কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয়দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।[২৭৮]

বাঙালির ধারণাও তাই ছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথায় প্রকাশিত হয়েছে।

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলন

আগরতলা মামলার বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। প্রতিবাদী মানুষ আসামিদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। ১৪ জানুয়ারি এক জনসভায় ভাষণে মওলানা ভাসানী বলেন, 'অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনবোধে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করা হইবে।'[২৭৯] অচিরেই এই আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। একটি ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারণে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা দ্রুত পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গ্রেফতারকৃত নেতা মুক্তি লাভ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রেসকোর্স ময়দানে এক বিরল গণসংবর্ধনায় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ জনতার পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করে। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

এগারো দফা আন্দোলন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন ও আইয়ুব খানবিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল তখন নেতৃত্বের পুরো ভাগে চলে আসে ছাত্ররা। ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯-এ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া ও মেনন গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশে নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।[২৮০] এই পরিষদ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এগারো দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগারো দফা কর্মসূচির ভিতর ছয় দফাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু দাবি। এগারো দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলের কথা বলা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, নিরাপত্তা আইন ও জরুরি আইন প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে ক্রমে ছয় দফা ও এগারো দফার মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে থাকে।

বাংলাদেশে অনেক গণআন্দোলন হয়েছে তবে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনকেই একমাত্র গণঅভ্যুত্থানরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে ১৯৫২ সালের পর গণতন্ত্র রক্ষায় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই ছিল একমাত্র আন্দোলন যা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

পাকিস্তানের তেইশ বছরের শোষণ-বঞ্চনার ফলে ১৯৬৯ সালে বিস্ফোরণমুখর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তারপরে একথা বলতে হবে ১৯৬৮-৬৯-এর ঘটনাবলিই মূলত এ অভ্যুত্থানের তাৎক্ষণিক পটভূমি তৈরি করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ করতে হয় ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কথা। ঐ সময় অনবরত এ প্রচারই বার বার করা হয় যার মূল কথা হলো–'ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির চেয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসের আকাঙ্ক্ষাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূল কথা।'

১৯৬৫ সালের যুদ্ধ শেষ হলো তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে। পাকিস্তান যে কাঙ্ক্ষিত জয় পায়নি তার প্রমাণ তাশখন্দ চুক্তি করতে বাধ্য হওয়া। এ অঞ্চলের বাঙালি এত প্রচার প্রপাগান্ডার পরও অনুধাবন করতে পেরেছিল পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত রাখা হয়েছে। ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করতো তাহলে নিমিষেই তা দখল করতে পারত।[২৮১] এতদিন কেন্দ্রীয় সরকার যে তত্ত্ব দিয়ে আসছিল তা হলো, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত। এখন দেখা গেল তা শূন্যগর্ভ বক্তব্য মাত্র। পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ এভাবে অভিঘাত ফেলেছিল বাঙালির ওপর।

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে তা মূলত সাংস্কৃতিক কিন্তু তাও মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।[২৮২] অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায় ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাদের লেখা বাংলাদেশ সিভিল সমাজের আন্দোলন গ্রন্থে লিখেছেন-

> রাজনৈতিক ফ্রন্টের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও এ সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা পূর্ব বঙ্গবাসীর বাঙালিবোধকে তীব্র ও সংহত করে তোলে এবং এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীরা। এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ থেকে এখন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সবসময় একটি আদর্শগত লড়াই চলেছে। গত ৪৬ বছরে অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় ছিল যে সব সরকার তারা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সিভিল সমাজকে দমিত করতে চেয়েছে। অন্য দিকে, মধ্যবর্তী কারকরা সবসময় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে যাতে সায় দিয়েছে সাধারণ মানুষ। এ লড়াইয়ে প্রগতির ধারা জয়ী হয়েছে এবং বাঙালিবোধকে সবসময় বাঁচিয়ে রেখে রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।[২৮৩]

সংস্কৃতির এ বিষয়টি সবাই উপেক্ষা করেছেন ইতিহাস রচনায় যা যৌক্তিক নয়। এসব ঘটনার প্রথমটি হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিষিদ্ধ করা। জাতীয় সংসদে মুসলিম লীগ নেতা ও ১৯৭১ সালে দালাল খান এ সবুর উল্লেখ করেন, ১ বৈশাখ ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন বিদেশি [অর্থাৎ হিন্দু] সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। তথ্য মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেন রবীন্দ্রসংগীত প্রচার রেডিও থেকে প্রায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পাকিস্তানি আদর্শের সঙ্গে না মিললে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। খাজা শাহাবুদ্দিনের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে কিছু বুদ্ধিজীবী সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এদের মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে *দৈনিক আজাদ*-পত্রিকায়–

> রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশনকে পবিত্র রাখার প্রয়োজন ছিল।[২৮৪]

বাঙালি এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এবং প্রবলভাবে ঐ বছর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে। এটি ছিল পশ্চিমা ও তার সহযোগীদের ইসলামের নামে সাংস্কৃতিক নিপীড়নে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এরপর বাংলা ভাষা সংস্কার করে 'জাতীয় ভাষা' সৃষ্টির প্রয়াস পায়। ১৯৬৮ সালে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল। আইয়ুব খানও এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যার মূল কথা, 'সকল আঞ্চলিক ভাষা একত্রিত করে যৌথভাবে একটি মহান পাকিস্তানী ভাষা উদ্ভাবন করা।' এবারও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবীসহ অন্যান্যরা প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। সিভিল সমাজের প্রতিবাদে এবারও পিছু হটে যায় সরকার। এ পটভূমিতে ১৯৬৮ সালে, লেখক

সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ, মীর্জা গালিব, ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন ও কাজী নজরুলের ওপর পাঁচদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আবুল হাশিম বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন–

> যাহারা ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন, তাহারা শুধুই মূর্খ নহেন, দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিতও। তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ, না বোঝেন ইসলাম। তাহারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া রবীন্দ্র-বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।[২৮৫]

৬৮-এর শেষের দিকে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জীবনে নতুন চেতনা প্রবাহের জন্ম হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়েছে। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ১৮ জানুয়ারি। ১৯ জানুয়ারি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা নেমে আসে রাস্তায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু করেন ছয় দফা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে। আরও কিছু ঘটনা এ সময় ঘটে যা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তপ্ত করে তোলে।[২৮৬] মওলানা ভাসানীর আহ্বানে বাংলাদেশের মানুষ তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে।[২৮৭] মওলানা ভাসানীর হরতালের আহ্বান জানান। ডিসেম্বরে কয়েকটি সফল হরতাল হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কয়েকজন। এ পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী 'ঘেরাও কর্মসূচি' নামে নতুন এক আন্দোলনের ডাক দেন বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডাকসু ও চারটি ছাত্র সংগঠনের সাতজন নেতা প্রণীত ১১ দফা কর্মসূচি। ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১১ দফা ঘোষণা করেন। মূলত ৬ দফার বিস্তারিত রূপই ১১ দফা। কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বাঙালিদের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনই ছিল এর মূল বক্তব্য। এগারো দফার সংক্ষিপ্ত সার এখানে দেওয়া হলো–

> ১. সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। ছাত্র-বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। হল হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে। ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।
>
> ২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে।
>
> ৩. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা-এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ। দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহি:বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করত সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি-বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারের আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি; গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।[২৮৮]

ঘোষণার তিনদিন পর ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট একটি যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে। আইয়ুববিরোধী এ মোর্চার নাম দেওয়া হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি' বা 'ডাক'।

ন্যাপ ভাসানী ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। 'ডাক'ও ঘোষণা দেয় ৮ দফার। তারা দেশে–'(ক) ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা কায়েম (খ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (গ) অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার (ঘ) পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত কলাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল (ঙ) খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দি, রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সব গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার (চ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারার আওতায় জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার (ছ) শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (জ) নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর বিধিনিষেধসহ সংবাদ পত্রের উপর জারিকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার... দাবি করেন।'

মওলানা ভাসানী ১৪ জানুয়ারি হাতিরদিয়ায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিব।'

শেখ মুজিবের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা ও রাজনৈতিক দলের ৮ দফা বাঙালিকে আবার উজ্জীবিত করে তোলে। ৬ দফা ও ৮ দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেগুলো ১১ দফার মধ্যেই ছিল। ঐ সময় ছাত্ররা ছিলেন চালিকাশক্তি। তাই আমরা দেখি আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতেই। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে ছাত্ররা যে আন্দোলনের শুরু করে ১৯৬৯ সালের শুরুতেই দেখা যায় তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

১৭ জানুয়ারি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর আগেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। পুলিশ যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের ওপর। ১৮ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাকা হয় ধর্মঘট। পুলিশি নির্যাতন অব্যাহত রাখা হয়। এ সময় সরকারি ছাত্রদল এনএসএফ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ২০ জানুয়ারি এক মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান শহিদ হন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়।

আসাদের শহিদ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আন্দোলনের চরিত্র পালটে যায়। বিকালে শহিদ মিনার থেকে শুরু হয়ে এক বিশাল শোক মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ২১ তারিখ হরতাল ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। বিকেলে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। তারপর আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে বের হয় লক্ষাধিক লোকের মিছিল।[২৮৯] কিন্তু শাসকগোষ্ঠী আসাদ হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি। তারা মাইককে মিছিলকারীদের হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু জনতা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মিছিল চালিয়ে যায়। এ বিষয়ে তোফায়েল আহমেদ বলেন,

> ...মেডিকেলের সিঁড়িতে আসাদের লাশ রাখা হলো। তাঁর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত শার্টটি আমরা আমাদের সংগ্রামের ঝাণ্ডা করে আকাশে উড়িয়ে দিলাম। আমরা সবাই ছুটে গেলাম শহীদ মিনারের চত্বরে। শহীদ আসাদের মৃত্যুর খবর ঘোষণা করলাম শোকার্ত বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝে। আর সেই রক্তাক্ত ঝাণ্ডা সামনে রেখে আমরা শপথ করলাম আসাদের এই রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেবো না। আমাদের সকল সত্তা সকল অস্তিত্ব আমাদের রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। শহীদ মিনার থেকে শুরু হলো শোক মিছিল।... শোকমিছিল মুহূর্তে লক্ষ মানুষের মিছিলে পরিণত হয়েছে। আসাদের মৃত্যু খবর সমস্ত ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে–চারিদিক থেকে মানুষ আসছে। শোক মিছিলের সম্মুখভাগ যখন শেরেবাংলা সোহ্‌রাওয়ার্দীর মাজারের কাছে এসে গেছে তখন মাইকে পুলিশের অথবা ইপিআর-এর কণ্ঠস্বর-ডোন্ট ক্রোস, ডেঞ্জার! ডেঞ্জার ডোন্ট ক্রোস। কিন্তু শোক মিছিল শোকে আর ক্ষোভে বিহ্বল। ডেঞ্জার শব্দের কোনো মূল্যই নেই সেই মিছিলের কাছে। মিছিল থামলো না, মিছিল এগিয়ে গেল। সামনে তাক করা অগণিত রাইফেল আর রাইফেলের সামনে পেতে দেয়া লক্ষ মানুষের বুক। মিছিল ডেঞ্জার ক্রোস করে এগিয়ে আমাদের রক্তাক্ত লাল ঝাণ্ডা নিয়ে।[২৯০]

মিছিল রক্তাক্ত লাল ঝান্ডা আসাদের শার্ট নিয়ে লিখলেন কবি শামসুর রাহমান–

> আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
> সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
> আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।[২৯১]

২১ জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতালের পর পল্টনে বিশাল সমাবেশ হয়। ঐ সমাবেশ থেকে ২২ জানুয়ারি কালোব্যাজ ধারণ এবং সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন, ২৩ জানুয়ারি মশাল মিছিল এবং ২৪ জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতালের কর্মসূচি দেওয়া হয়। এসব কর্মসূচি বিষয়ে তোফায়েল আহমেদ বলেন,

> ২২ জানুয়ারি (১৯৬৯) আমি এমন কোনো বাঙালি দেখিনি যাঁর বুকে কালো ব্যাজ নেই। ঘরে অফিসে গাড়িতে সর্বত্রই কালো পতাকা উড়ছে। সেদিনের কালো পতাকা ছিল শোকের, ঘাতকদের প্রতি ঘৃণার এবং সংগ্রামের দৃঢ়প্রত্যয়ের। ২৩ জানুয়ারি শহরের সমস্ত অলিগলি থেকে মশাল মিছিল একটির পর একটি। সমগ্র ঢাকা শহরটি হয়ে উঠেছিল মশালের শহর। ২৪ জানুয়ারি অর্ধদিবস হরতাল পালিত হলো। সর্বাত্মক হরতাল। আমাদেরও যেন অভিজ্ঞতা বাড়ছিল। আগে কখনোই বুঝতে পারিনি সাধারণ গোবেচারা অচেনা অজানা মানুষগুলো বঙ্গবন্ধুকে এত ভালবাসে-এত গভীর সম্পর্ক তাঁর সাথে। সকলেরই একই প্রশ্ন–বঙ্গবন্ধু কবে মুক্তি পাবে। কবে আগরতলা মামলা উঠিয়ে নেয়া হবে। যদি সরকার না মানে তাহলে? এমন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে যেন আমরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারি। এখনই আমাদের এমন সংগ্রাম শুরু করা উচিত যেন আইউবের পতন ঘটে, আইউব-মোনেমের পতন না হলে বঙ্গবন্ধু ছাড়া পাবে না। এ ধরনের আলোচনাই ছিল ঢাকা শহরের আলোচনা।[২৯২]

২১ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিনই মিছিল হয়েছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু সিভিল সমাজ ক্ষুব্ধ হলে কী করতে পারে তার উদাহরণ ২৪ মার্চ। ঢাকা শহরের রাস্তায় সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসে। পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্র মতিয়ুর, শ্রমিক রুস্তম। তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে লক্ষাধিক শোকাভিভূত জনতার সামনে মতিয়ুরের বাবা সামান্য একজন ব্যাংক কর্মচারী ঘোষণা করেন, 'এক মতিয়ুরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিয়ুর পেয়েছি।' পরদিনও ইপিআর পুলিশ বাহিনীর তাণ্ডব ও গুলিবর্ষণে এক মহিলা নিহত হন।[২৯৩]
আইয়ুব খান পরিস্থিতি বুঝে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে রাজবন্দিদের জেলে রেখে আলোচনা হবে না। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় এলে কালো পতাকায় ঢাকা শহর ছেয়ে যায়। তাঁর কুশপুত্তলিকা ও বই পোড়ানো হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় শুধু রাজবন্দিদের মুক্তি নয়, মোনায়েম খানেরও পদত্যাগ দাবি করা হয় এবং ১১ দফা আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষে শপথ গ্রহণ করে ছাত্র-জনতা। জনতার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু স্থানের নামকরণে। আইয়ুব নগরের নাম হয়ে যায় শেরে বাংলা নগর, আইয়ুব গেটের নাম রাখা হয় আসাদগেট, আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নামকরণ করা হয় মতিয়ুর শিশুপার্ক।[২৯৪] ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, পল্টনের ভাষণে তোফায়েল আহমেদ বলেছিলেন,

> আজ এই বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নিচ্ছি আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে যতদিনে কারাগার থেকে মুক্ত না করতে পারবো ততদিনে আমাদের সংগ্রাম থামবে না। এক মুহূর্তের জন্যও আমরা বিশ্রাম নেবো না।[২৯৫]

১২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করলে 'ডাক' ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল আহ্বান করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। মানুষ আবার রাস্তায় নেমে আসে। পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, প্রয়োজনে জেলের তালা ভেঙে শেখ মুজিবকে মুক্ত করা হবে। সে মুহূর্তে নতুন এক স্লোগানের জন্ম নেয়, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।'[২৯৬] সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা শেষে লক্ষ মানুষ ঢাকার রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগিয়ে দেয় দু'জন প্রাদেশিক মন্ত্রী, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি এস,এ রহমানের বাসভবনে। শহরের পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় জনতার হাতে। সন্ধ্যায় জারি করা হয় কার্ফ্যু।[২৯৭]
১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনী বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। রাতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা শহরে। কার্ফ্যু ভেঙে মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। আন্দোলনরত জনগণ স্লোগান দেয়, 'কারফিউ ভাঙব রাস্তায় নামব'।[২৯৮] সরকারি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিরা মুক্তিলাভ করেন।[২৯৯] শেখ মুজিবুর রহমান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে নির্মলেন্দু গুণ তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেছেন,

> ১৯৬৬ সালে ৮ মে'র গভীর রাতে ৬ দফা কর্মসূচী প্রদানের অভিযোগে দেশরক্ষ আইনে যে শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়েছিলেন, আর ১৯৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি যে শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন–নাম বিচারে এক হলেও, বাস্তবে ঐ দুই মুজিবের মধ্যে ছিল আসমান-জমিন ফারাক।
>
> আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি ছিল তাঁর জন্য এক অগ্নি-পরীক্ষার মতো। সেই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আকাশস্পর্শী জনপ্রিয়তা নিয়ে তিনি কারাগার থেকে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসেন। তাঁর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় পরিণত হয়। এই বাংলার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যে-নেতার সন্ধান করছিল, শেখ মুজিবের মধ্যে তারা তাদের সেই প্রত্যাশিত নেতার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়।[৩০০]

মুক্তি দেওয়া হয় রাজবন্দিদেরও। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শেখ মুজিবকে। লক্ষ মানুষের সমাবেশে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন ১১ দফা তিনি সমর্থন করেন কারণ এর মধ্যে অন্তর্গত ৬ দফাও।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানেও। লান্ডিকোটাল থেকে কিছু ছাত্র চোরাপথে আনীত কিছু পণ্য কিনে ফেরার পথে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের জের ধরে জুলফিকার আলী ভুট্টো দৃশ্যপটে আসেন। এবং পূর্ব পাকিস্তানের মতো একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিক্ষোভ শুরু হয়। তবে, তা পূর্ব পাকিস্তানের মাত্রায় পৌঁছেনি। এখানে উল্লেখ্য যে, উনসত্তরের ঘটনাবলি যা উনসত্তরের গণআন্দোলন নামে খ্যাত তা শুধু ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা গ্রহণ করেছিল সহিংস রূপ।[৩০১]

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল, এমনকি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে না দাঁড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মত এর বিপক্ষে ছিল। মুক্তি পাবার পর শেখ মুজিবকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব সম্মত হলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। এবং 'ডাক' নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকে বসলেন। মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকের বিরোধিতা করে এতে যোগ দেননি। অন্তিমে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ঢাকা ফিরে এসে ১৪ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা পেলে তিনি ৬ দফা আদায় করে আসতে পারতেন। তা পারেননি বলেই বৈঠক ত্যাগ করেছেন। অসহযোগী যে কজন নেতাকে তিনি কুচক্রী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা হলেন–হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, ফরিদ আহমদ ও মাহমুদ আলী।[৩০২]

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সম্পূর্ণ সিভিল সমাজ অস্থির, উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মোনায়েম খানের অপসারণের দাবিতে হরতাল আহ্বান করা হয়। ২১ মার্চ ড. এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এর আগে রাতে সপরিবারে মোনায়েম খান পালিয়ে যান। ২৪ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানে আবার জারি করা হয় সামরিক আইন। ঐতিহাসিক সালাহ্উদ্দীন আহমদ আইয়ুব খানের শাসনামল সম্পর্কে বলেছেন,

> আইয়ুব খানের দশ বছরের শাসনামলে (১৯৫৮-১৯৬৯) পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পতে থাকে।[৩০৩]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত জাতীয় সংহতির অজুহাত দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রে জাতীয় সংহতি আসেনি। বরং সংহতির নামে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও প্রকট হয়।

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে সিভিল সমাজের সফল উত্থান হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবী শাসন থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সিভিল সমাজ মাঝে মাঝে পিছু হটেছে বটে কিন্তু পর্যুদস্ত হয় নি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রথম পর্যায়ে দোদুল্যমানতা, ভয় ও স্বার্থদ্বন্দ্বে মনপ্রাণ দিয়ে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হননি। কিন্তু বাংলাদেশের সিভিল সমাজের অন্তর্নিহিত একটি শক্তি আছে যা প্রবাহিত হয় ফল্গুধারার মতো। এ ফল্গুধারার উৎস মধ্যবর্তী কারকদের অগ্রসরমান অংশ সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্ররা যা সবসময় সিভিল সমাজপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে এবং কখনও পিছু হটেনি। গোটা উনসত্তরের আন্দোলন ছাত্ররাই সংগঠন করেছে, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের বাধ্য করেছে ঐক্যবদ্ধ হতে। অন্তিমে, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতার চাপে পড়ে রাজনৈতিক নেতারা তাদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এবং সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা বা বাংলাদেশ গঠনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার যাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান যিনি অচিরেই পরিচিত হয়ে উঠলেন বাংলার বন্ধু বা 'বঙ্গবন্ধু' নামে। বাংলাদেশে সিভিল সমাজের প্রতীক হয়ে উঠলেন তিনি।[৩০৪]

১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায় কতজন আত্মাহুতি দিয়েছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। মোহাম্মদ হাননান বিভিন্ন সূত্র থেকে একটি হিসাব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী এই এক দশকে নিহত হয়েছেন ১২১ জন। এবং এর মধ্যে ৬৯ সালেই ৬১ জন। ৬১ জনের পেশাওয়ারি ভাগ এ রকম–শ্রমিক ২৯, ছাত্র ২১, কৃষক ৩, শিক্ষক ২, চাকুরিজীবী ৩, সৈনিক ১, গৃহবধূ ১, অজ্ঞাত ১।[৩০৫]

এখানে অবশ্য উল্লেখ করতে হয় স্বাধীনতার দলিলপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৬৯ সালে নিহতের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। সুতরাং ঐ ভিত্তিতে মোহাম্মদ হান্নানের হিসাবের সঙ্গে আরও ৩১ জন যোগ করলে ৯ বছরে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫২ জন। ১৯৬৯ সালের নিহতের মধ্যে ছিলেন ৩৪ জন শ্রমিক, ২০ জন ছাত্র, ৭ জন সরকারি কর্মচারী, ৫ জন খুদে ব্যবসায়ী ও একজন স্কুল শিক্ষক।[৩০৬]

লক্ষণীয় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রান্তিক কারকরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। অনেক সময় তা সহিংস রূপ ধারণ করেছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত ধ্বংস করার জন্য ছাত্রনেতারা আন্দোলনের সময় মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে, অনেক জায়গায় মৌলিক গণতন্ত্রীরা পদত্যাগে রাজি না হলে মানুষ তাদের বাধ্য করেছিল পদত্যাগ করতে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের সুনজরে দেখার কোনো কারণ ছিল না। অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজনৈতিক শক্তিরও অধিকারী হয়েছিল। এবং এ দুটির মিলিত শিকার ছিল বঞ্চিত গ্রামবাসীরা। এ ছাড়া, চোর, ডাকাত, গোরু চোর, টাউট এবং মৌলিক গণতন্ত্রীদের দালালদের অনেক ক্ষেত্রে গণআদালতে বিচার করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি এ সুযোগে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য লুটপাটে অংশ নিচ্ছিল। ছাত্র বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো ঘটনাবলি এবং এতে তারা হয়ে উঠেছিলেন উদ্বিগ্ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রায় দশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারীর সংখ্যা ছিল ২৫০০ থেকে ৩০০০ মাত্র।[৩০৭]

বাঙালি উদ্যোক্তা ও রাজনৈতিক মুক্তি

পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ বলতে বাঙালিদের দ্বারা বিনিয়োগ বোঝাতো না। কারণ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ধনিক শ্রেণির অভাব ছিল বা অন্যভাবে বলা যায়, ধনিক শ্রেণি গড়ে ওঠে নি। এ প্রসঙ্গে রেহমান সোবহানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> পাকিস্তানে গণবিতর্কের মূলকথা ছিল বিনিয়োগের স্থান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্বাচন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ যাতে সেভাবেই হয় সেজন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ও সম্পদকে কাজে লাগানো। কিন্তু কার্যত বাঙালি মুসলিমদের দুর্বল ব্যবসায়িক যোগ্যতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০৮]

পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করতে হলে সম্পদ যাতে বাঙালিদের হাতে যায় সে ব্যবস্থা করতে হতো। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তা করে নি। বরং অবাঙালিদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি চলে যায়। পঞ্চাশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ষাটের দশকে সামরিক শাসনের মধ্যেও ব্যবসায়ীরা বাঙালির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের চেষ্টা করতো।[৩০৯] ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলেও বাঙালিসমাজে বিত্তের বিকাশ শুরু হয় ষাটের দশকে। এই দশকে আইয়ুব খান তার অশুভ ভামমূর্তি ঢাকার জন্য বৈদেশিক সাহায্য দেশের সমৃদ্ধি ঘটানোর পদক্ষেপ নেয়। এই বৈদেশিক সাহায্যের বড়ো অংশ পশ্চিম পাকিস্তান পেত এবং ক্ষুদ্র একটা অংশ পেত পূর্ব পাকিস্তান।[৩১০] তার পরেও প্রথম বারের মতো এ সময় বাঙালি সমাজের কেউ কেউ বিত্তবান হয়ে ওঠে। তার অন্যতম কারণ ছিল ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর মাড়োয়ারি ও হিন্দু পুঁজি এ দেশ থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়েছে। তখন শত্রু সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট শূন্যতা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাকে আশ্রয় করে এ দেশে দ্রুত একটি বাঙালি ধনিকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে।[৩১১] জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তাদের কেউ কেউ সমর্থন করেছিল, সেটাকে হাতিয়ার হিসেবে

ব্যবহার করে রাষ্ট্র থেকে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য। ১৯৫৮ সালের ২-৪ মে মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রফিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, সাইফুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী এবং এ কে খান অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।[৩১২] শুধু চট্টগ্রামের এই সাহিত্য সম্মেলনেই নয়। পূর্বপাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ব্যবসায়ী, শিল্পপতিগণ তাদের সাধ্যমতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাদের লক্ষ্য ছিল একটি পূর্বপাকিস্তানকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মুক্ত দেখা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের প্রণোদ্দনা প্রদানকারী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে যাতে মুক্ত করা যায় দেশের অর্থনীতিকে। বাঙালি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যেন নিজেরাও স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উৎপাদন করতে পারে শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মতো। বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যবসায়ীরা নীরবে আর্থিক সহায়তা করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন,

> ষাটের দশকের সূচনা থেকে আমাদের দেশে যে নব্য ধনিকসম্প্রদায়ের উদ্ভব শুরু হয় সেই বিকাশমান শক্তি নিজেদের আত্মপ্রসারের স্বার্থে, এক দশক যেতে-না-যেতেই, অপ্রতিহত ও অদমিত নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়ে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় বিকাশের সম্ভাবনাকে একটি স্থায়ী ও ব্যাপক রূপ দেবার চেষ্টা করেছে।[৩১৩]

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় বেশকিছু বাঙালি ধনী ব্যবসায়ী আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অর্থ দিয়ে তারা সাহায্য করেছিলেন আওয়ামী লীগকে। তারা চেয়েছিল, স্বাধীনতা এলে এবং পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের তাড়াতে পারলে তাদের আর্থিক সুবিধা হবে।[৩১৪]

পাকিস্তান আমলে ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালি প্রায় দেখাই যেত না। পাকিস্তানের বেসরকারি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতো যে বাইশটি পরিবার তাদের মধ্যে দুটি পরিবার ছিল পূর্ব পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে। একটি হলো এ কে খান পরিবার। অন্যটি ইস্পাহানি (অবাঙালি) পরিবার। এর বাইরে আরও অর্ধশতাধিক জমিদার পরিবার ছিল।[৩১৫] অল্প সময়ের জন্য আওয়ামী লীগ যখন প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা পেল, তখন মদত করার মতো বাঙালি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক ভিত গড়তে ১৯৬০'র দশকের প্রথম দিকে আইয়ুব সরকার প্রথমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভোলাপমেন্ট ব্যাংক অফ পাকিস্তান (আইডিবিপি)-এর মতো ডেভোলাপমেন্ট ফাইন্যান্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এবং পরে ইক্যুয়িটি সাপোর্ট প্রদানকারী ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভালাপমেন্ট করপোরেশন (ইপিআইডিসি) তৈরি করে। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের লক্ষ্য ছিল বাঙালি শিল্পপতি বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থানে সাহায্য করা। সূচনাকারী বাঙালি ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত পাট ও বয়নশিল্প এবং কিছু ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলো ছিল ১৯৬০-এর দশকে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় মদতপ্রাপ্ত উদ্যোগের অংশ। এই নতুন শ্রেণির উত্থানে প্রাদেশিক সচিবালয়ের বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তাদের ভূমিকা এবং তৎসহ ১৯৬০-এর দশকে আইডিবিপি-ও বাঙালি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাহবুব রশিদের অবদান উল্লেখনীয়।[৩১৬] একটি বাঙালি উদ্যোক্তাশ্রেণি গড়ে তোলার জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে রেহমান সোবহান বলেন,

> আই.ডি.বি.পি.'র মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠাসমূহ পরিচালনার দায়িত্বগ্রহণ এবং কেন্দ্রে সচিবপদে বাঙালির নিযুক্তিলাভ শুরু হবার পরেই কেবল বাঙালি ব্যবসায়ীদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, সুযোগের পাল্লা তাদের দিকে ঝুঁকছে। সুতরাং পাকিস্তান যেমন চিনিওটি ও মেমনদের অবিভক্ত ভারতের মাড়োয়ারি ও গুজরাটি ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল, তেমনি কেন্দ্রে বাঙালিদের ক্ষমতালাভ এবং প্রদেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বর্ধিষ্ণু বাঙালি ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের জন্য অবাঙালি বাণিজ্যিক প্রাধান্য থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ এনে দেয়।[৩১৭]

গোড়ার দিকে অবাঙালি ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় কাজ করা বেশিরভাগ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালি ব্যবসায়ী আওয়ামী লীগকে জোরদার সমর্থন জুগিয়েছে। তাদের আশা ছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে অবাঙালি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার শক্তি জোগাতে তাদের পর্যাপ্ত সাহায্য করবে।[৩১৮] ১৯৬০-এর আইয়ুব সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওবার পর বাংলাদেশের শিল্প সম্পদের তিন শতাংশ মাত্র নতুন বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণির দখলে ছিল।

ব্যক্তিগত সম্পদের বড়ো ভাগের মালিক ছিল অবাঙালিরা, স্বাধীনতার আগে যারা সেসব ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়েছিল।[৩১৯]

১৯৬৯ সালে বাঙালি জাতীয়বাদী গণঅভ্যুত্থানের পর পিডিএফআই-গুলো পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের ঋণদান তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় এবং বাংলা আবেদনকারীদের ঋণদান বৃদ্ধি করে। রেহমান সোবহান এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন,

> বাঙালিদের ব্যবসায়ে ও শিল্পোদ্যোগে যোগ্যতা কম থাকায় ই.পি.আই.ডি.সি-এর নেতৃত্বে সরকারি খাতকে পূর্ব-পাকিস্তানে শিল্পায়ন জোরদারকরণে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। সরকারি খাতকে বেসরকারি ব্যবসায়িক উদ্যোগের স্থান গ্রহণ করতে হয়। পূর্ব-পাকিস্তানি আমলাতন্ত্র অর্থনীতিতে অবাঙালিদের অধিকতর প্রভুত্ব নিরোধের গুপ্ত কৌশলরূপে সরকারি খাতের সম্প্রসারণকে ব্যবহার করে। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে ই.পি.আই.ডি.সি বাঙালিদেরকে পাটশিল্পে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এটি বাঙালি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় ১০টি পাটকল স্থাপনের জন্য ৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে। পি.পি.এফ.আই-সমূহ থেকে অধিকতর সাহায্য পাওয়ার ফলে মিলগুলোর বাঙালি মালিকদেরকে মিল স্থাপনে প্রয়োজনীয় মোট বিনিয়োগ ১৭ কোটি ৪০ লাখ টাকার শতকরা মাত্র ২০ ভাগ দিতে হয়। ই.পি.আই.ডি.সি সুবিধাজনক শর্তে ২ কোটি ৪৭ লাখ টাকা নিয়ে একটি কাপড়ের মিল ও ৩ কোটি ১৯ লাখ টাকায় একটি চিনিকল থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে বাঙালি উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দেয়।[৩২০]

একটি বাঙালি উদ্যোক্তশ্রেণি গড়ে তোলার উপর্যুক্ত প্রয়াসসমূহের ফল হিসেবে স্বাধীনতা অর্জনকালে আধুনিক শিল্পখাতে স্থির পরিসম্পদের ১৮ শতাংশ ছিল বাঙালিদের হাতে। বাঙালি উদ্যোগ ও মালিকানার বেশিরভাগই সীমাবদ্ধ থেকে যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কারখানায়।

১৯৬৯-৭০ সালে শীর্ষ ১০ বাংলাদেশি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা পরিবারের শীর্ষে ছিল এ কে খান পরিবার। এছাড়া গুলবক্স ভূঁইয়া পরিবার, জহুরুল ইসলাম পরিবার, মো. ফকির চাঁদ পরিবার, মকবুল রহমান পরিবার, জহিরুল কাইয়ুম পরিবার, আলহাজ মুসলিমউদ্দিন পরিবার, আলহাজ শামসুজ্জোহা পরিবার, খান বাহাদুর মুজিবর রহমান, আফিলউদ্দিন আহমেদ পরিবার ও এমএ সাত্তার পরিবার।

এসব ধনী পরিবারের বাইরেও বনেদি আরও কিছু পরিবার ছিল। এর মধ্যে অন্যতম চট্টগ্রামের রাউজানের তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার ও অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরী ও আনোয়ারা উপজেলার আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর পরিবার।

এছাড়া ছিল নারায়ণগঞ্জের ওসমান পরিবার। বিপুল অর্থের মালিক ছিল তেওতা জমিদার পরিবার। তেওতা জমিদারির আওতাভুক্ত ছিল ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা এবং দিনাজপুরসহ রংপুর ও বর্ধমানের কিছু অংশ। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে একসময় প্রভাব বিস্তার করে ফরিদপুরের জমিদার পরিবার। এর একটি কীর্তিপাশা জমিদার পরিবার। তারা ঝালকাঠি জেলার বৈদ্য বংশীয় জমিদার। বরিশালের মাধবপাশা জমিদার পরিবারও ধনী ছিল। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার বকুল কিশোর আচার্য চৌধুরীর (ডাবল এমএ) পরিবার।[৩২১] এইসব ব্যবসায়ী ও পরিবার সবাই যে আওয়ামী লীগকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে নি।

আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান যখন সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন তখন ভাসানী নির্বাচনে যোগ দিতে অনীহা প্রকাশ করলেন। হয়তো ভোটের থেকে সে মুহূর্তে তাঁর কাছে ভাতের দাবি বড়ো মনে হয়েছিল বা সংসদীয় শান্তির বদলে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চেয়েছিলেন। এ দিক বিবেচনা করলে ভাসানীর মধ্যে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের দুর্বলতার দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতীকের মতো। সেগুলো হলো–প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকের দোদুল্যমানতা, বিভ্রান্তি, সিদ্ধান্তহীনতা। ভাসানী তাঁর এই বৈপরীত্য ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন ন্যাপের ছাত্র সংগঠনে যা ১৯৭০ সালে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছাত্রলীগ। জাতীয়তাবাদী ধারা বেগবান

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রলীগও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং ১৯৭০ সাল থেকে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলা শুরু করে।[৩২২]

উপর্যুক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলো, সিভিল সমাজ সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে তখন, যখন সমাজের তিনটি পর্যায়ের দাবি ও ক্ষোভ একই মোহনায় মিশেছে। এবং এতে মধ্যবর্তী কারকরা, বিশেষ করে ছাত্ররা পালন করেছে সংযোগকারীর ভূমিকা। তবে প্রান্তিক পর্যায়কে আন্দোলনে সংযুক্ত না করা পর্যন্ত সিভিল সমাজের স্বপ্ন সে ভাবে পূরণ হয়নি। বাংলাদেশে এখনও যখন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা ওঠে, তখনই সবার মনে ভেসে ওঠে উনসত্তরের গণআন্দোলনের কথা।[৩২৩]

৭০-এর নির্বাচন

জাতীয়জীবনে ষাটের দশকের গণজাগরণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও যুগান্তসৃষ্টিকারী। সত্তরের নির্বাচন ছিল ষাটের দশকের গণজাগরণের ফসল। ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ সালে এক বেতারভাষণে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন–জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। শুধু তাই নয়, তিনি অধিকতর স্বায়ত্তশাসনেরও প্রতিশ্রুতি দেন।[৩২৪] মার্চ মাসের ৩০ তারিখে ইয়াহিয়া 'শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো' বা 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার, ১৯৭০' ঘোষণা করেন। এই কাঠামোর আওতায় নির্বাচন ও সংসদ গঠিত হওয়ার কথা। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শুধু ছাত্ররাই নয়, রাজনৈতিক নেতারাও এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে এটি 'জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বানচালে'[৩২৫] প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক নেতারা 'শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো'র প্রতিবাদ জানালেও নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।[৩২৬] ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ঐ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি। পরে তা ৭ ডিসেম্বর পুনর্নির্ধারিত হয়।[৩২৭]

১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ–

সারণি : প্রদেশ এবং দলভিত্তিক নিম্নরূপ :[৩২৮]

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	প্রদেশ অনুসারে ফলাফল							মোট আসন
–	–	পূর্ব-পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ. প. সী. প্র	বেলুচি-স্তান	উপজাতি এলাকা	মহিলা	–
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	×	×	×	×	×	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	১২২	×	৬৪	১৮	১	×	×	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৩২	×	১	১	৭	×	×	×	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১১৯	×	৭	×	×	×	×	×	৭
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	৯৩	×	×	×	৬	১	×	×	৭
মারকাষ-ই-জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	?	×	৪	৩	×	×	×	×	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬১	×	×	×	৩	৩	×	×	৭
জামায়াতে ইসলাম	২০০	×	১	২	১	×	×	×	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১২৪	×	২	×	×	×	×	×	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১০৮	১	×	×	×	×	×	×	১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৩০০	১	৩	৪	×	×	৭	×	১৪
মোট	-	১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দু'টি রাজনৈতিক দল প্রধান্য দেখা যায়। নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি নেতা নূরুল আমিন, অপরটি একজন স্বতন্ত্র সদস্য। ৭০-

এর নির্বাচনের ফলাফল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারণে বাঙালির পক্ষে আসে এ সম্পর্কে মন্তব্য করে শেখর দত্ত বলেন,

> ...ষাটের দশকে গণজাগরণ জাতীয় নেতা, জাতীয় দাবি ও জাতীয় ঐক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল সত্য। কিন্তু এই সত্যকে প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল। কারণ ঔপনিবেশিক শাসক-শোষকগোষ্ঠী কখনো বাস্তবতা স্বীকার করে না, দেয়ালের লিখনও পাঠ করতে পারে না। লক্ষ্য অর্জনে ষাটের দশক জাতিকে কৌশলে নমনীয় হতে শিখিয়েছিল। তাই জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক শাসনের মধ্যে নির্বাচন নিশ্চিত করার কৌশল নেন। এই কৌশলে বাঙালি জাতি বিজয়ী হয়। পাকিস্তানি শাসক-শোষকগোষ্ঠী এবং ডান-বাম সকল দল-মহল-গোষ্ঠী-ব্যক্তির হিসাব-নিকাশ ভুল প্রমাণিত করে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও দলের নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেন এবং পূর্ব বাংলা তথা ৬-দফা ও ১১-দফার পক্ষে কথা বলার আইনসম্মত অধিকার পান। নির্বাচনের এই রায় ছিল যুগান্তসৃষ্টিকারী এবং এই রায়ই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের দিকে দেশবাসীকে পরিচালিত করে।[৩২৯]

অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।

সারণি : পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল[৩৩০]

দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	×	২
পাকিস্তানী পিপলস পার্টি	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	×	×	×
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	×	১
জামায়াতে ইসলামী	১	×	১
নেজামে ইসলামী	১	×	১
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	×	×	×
মারকাজে আহলে হাদীস	×	×	×
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (হাজারী)	×	×	×
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (নূরানী)	×	×	×
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭	×	৭
মোট	৩০০	১০	৩১০

নির্বাচনি ফলাফল ছিল ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি আমলাতন্ত্রের কাছে অপ্রত্যাশিত। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ইয়াহিয়া দিয়েছিলেন বটে কিন্তু বোধহয় ভেবেছিলেন, কোনো একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। সেক্ষেত্রে শাসক আমলাচক্রের প্রধান হিসেবে দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারবেন, যেমনটি গুলাম মহম্মদ ও ইস্কান্দার মীর্জা করেছিলেন ১৯৫৮ সালের

আগে। আওয়ামী লীগ যে শুধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তাই নয়, ঐ সময় আওয়ামী এমপিদের ঐক্য ছিল দৃঢ়। এবং তা পার্থক্য সূচিত করেছিল প্রাক ১৯৫৮ পর্বে সঙ্গে। ঐ পর্বে এই ঐক্য ছিল না দেখেই আমলাচক্র ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পেরেছিল। এবং বোধহয় এ কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনি ফলাফল নস্যাতের জন্য সামরিক সমাধান বেছে নেয়।[৩৩১] শুধু তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদগণ এতে প্রতিনিয়ত উস্কানি দিতো। জুলফিকার আলী ভুট্টোর উক্তি থেকে তা পরিষ্কার হয়। তিনি ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে বলেছেন,

> পাঞ্জাব ও সিন্ধু পাকিস্তানের শক্তি-দুর্গবিশেষ (এই দুই প্রদেশে পি. পি. পি. বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছে)। পি. পি. পি.-কে বাদ দিয়ে সংবিধানও রচিত হতে পারে না, সরকারও গঠিত হতে পারে না...। গত তেইশ বছর পূর্ব পাকিস্তান দেশ শাসনে ন্যায্য হিস্যা পায় নি, তাই বলে আগামী তেইশ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর প্রভুত্ব করবে তা হতে পারে না।[৩৩২]

ভুট্টোর বক্তব্য দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়। এক. পাকিস্তানি নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয় যে তাঁরা তেইশ বছর পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেছে। দুই. শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ভয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা পেলে পশ্চিম পাকিস্তানকে একই রকমভাবে শোষণ করবে। তাই কোনো ভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত নয়। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে সেনা মোতায়েনের জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। এজন্য প্রথমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের শুরুর তারিখ নির্ধারণ করে সময় ক্ষেপণের কৌশল গ্রহণ করে এবং পরে আলোচনার নামে। অবশেষে ২৫ মার্চ কালোরাত্রিতে পাকিস্তান বাহিনীর অতর্কিত হামলার মাধ্যমে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহিদের রক্তের পিচ্ছিল পথ বেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭১ পর্যন্ত যে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় পাওয়া যায়–

১. পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বাধীনভাবে শাসন করতে দেয় নি নানা অজুহাতে। তার প্রমাণ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন।
২. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক ও বিরোধী রাজনীতিবিদরা অর্থাৎ দুই পক্ষই বিতর্কিত করে তুলেছিলেন।
৩. বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে দমন করার চেষ্টা করেছে ধর্মীয় অজুহাতে।
৪. অর্থনৈতিকভাবে বাঙালিকে শাসকগোষ্ঠী দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।

আইয়ুব খান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের শাসন কার্য চালিয়ে নেন, রাজনীতিবিদদের শাসন করতে না দেওয়ায় ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু নির্বাচন না হলে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্ন ওঠে তাই আইয়ুব খান মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনের আয়োজন করতেন। নির্বাচনের ফলাফল যাতে পক্ষে যায় তাই 'হ্যাঁ-না' ভোট করেছেন। অর্থাৎ নির্বাচনি প্রক্রিয়া ধ্বংস করেন। গণতান্ত্রিক ধারা যাতে না থাকে তাই তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেছেন। এ ধরনের গণতন্ত্র অভিনব। তখন রাজনৈতিক সমাজের প্রবল বিরোধিতা করতে পারতেন কিন্তু তা তারা করেন নি। বরং অনেকেই তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়া বিনষ্ট করতে সহযোগিতা করেছেন। অন্তিমে তা রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধেই গেছে।

আইয়ুব খানের পরে আমরা দেখি দাবি এসেছে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচন বিষয়টি যে মূল সে বিষয়টি আবার প্রতীয়মান হলো। ঐ নির্বাচনের দাবিতেই ১৯৭০ সালে নির্বাচনি প্রক্রিয়া বেশ কয়েকটি সংস্কার আনা হয়। যেমন : সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোটদান পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র বাতিল করা, যার মাধ্যমে সর্বজনীন ভোটাধিকার সীমিত করা হয়েছিল। ফলে এক দিক থেকে বলা যেতে পারে ১৯৫৪-এর নির্বাচনের পরে ১৯৭০ সালেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনি প্রক্রিয়ার অধীনে। এবং এই দুইটি নির্বাচনেই বাঙালিরা তার

মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে। এবং তা ছিল কেন্দ্রীয় দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। বাঙালির গণতন্ত্রের প্রতি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তা ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেন। তারা নির্বাচনি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করেন অথবা সেই প্রক্রিয়াটি বিতর্কিত করে তোলার চেষ্টা করেন। যাতে মানুষের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা প্রক্রিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আসে এবং পরে সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ দেখায়।

এইভাবে পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংসের ব্যবস্থা করে যা বাংলাদেশে পরবর্তীকালে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং যাকে আমরা বলা হয় গণতন্ত্রের 'পাকিস্তানিকরণ'।

পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার আদায় করতে গিয়ে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটি জন্ম নেয়। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫২ সালে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ভয়ে শাসকগোষ্ঠী বারবার নির্বাচন পিছিয়েছেন। নিজেদের সুবিধামতো সময়ে তারা ১৯৫৪ সালে নির্বাচন দেয় কিন্তু তাদের ভরাডুবি ঠেকাতে পারেন নি। নির্বাচনে পরাজিত সরকারি দলই ভোট কারচুপির অভিযোগ করে। কিন্তু বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে সে রকম কোনো অভিযোগ ওঠে নি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে পরাজিত হয়ে মুসলিম লীগ সরকার সবসময় জোটের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চেষ্টা করে। তারা ঘনঘন নির্বাচিত সরকারকে বহিষ্কৃত করতে থাকে। এর ফলে ৭ বার নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং ৩ বার গভর্নর জেনারেলের শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিদায় জানিয়ে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতায় আসেন সামরিক আইন জারির মাধ্যমে। ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য আবিষ্কার করেন নতুন এক পন্থা যা 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে পরিচিত। মৌলিক গণতন্ত্রীদের 'হ্যাঁ-না' ভোটে ১৯৬০ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ক্ষমতাকে বৈধ করেন। অর্থাৎ আইয়ুব খান প্রচলিত গণতন্ত্রের কাঠামোতেই আঘাত করেন এবং নিজের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি তৈরি করেন। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিন হন। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। শাসকগোষ্ঠী ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের গড়িমসি করে। নির্বাচনের ফলাফল না মেনে উল্টো বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য শুরু করে গণহত্যা। শুরু হয় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের। নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয় এবং যাত্রা শুরু করে নতুন করে। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে ম্যানডেট পায় তার ওপর ভিত্তি করে মুজিব নগর সরকার গঠিত হয় এবং এই সরকারের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৯৭০-এর নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খান ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে। ইয়াহিয়াকে তিনিই সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ সালে ঘোষণা করেন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি বা রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। নির্বাচিত সরকার সংবিধান প্রণয়ন করবে এবং রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করবে। নির্বাচনের আগে ইয়াহিয়া আরও দু'টি কাজ করেন যা সুদূরপ্রসারী অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। তিনি এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করেন। পাকিস্তানে আগে ছিল দুই ইউনিট। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান সবসময় একটি প্রদেশ ছিল। আর চারটি প্রদেশ মিলে গঠিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান। এখন তা পাঞ্জাব, সিন্দু, বেলুকিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে চারটি প্রদেশে বিভক্ত হলো। দ্বিতীয়ত ঘোষণা করা হলো ভোট হবে 'এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি'তে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান যে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রদেশ তা স্বীকৃতি পেল।

ইয়াহিয়া খান 'স্থিরীকৃত' বলে আরও কয়েকটি ঘোষণা করেন–

১. দেশের সরকার হবে হবে সংসদীয় পদ্ধতির অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ফেডারেল পার্লামেন্ট
২. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার থাকবে যা আইন ও আদালতের মাধ্যমে সুরক্ষা পাবে।

৩. বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে এবং তা হবে সংবিধানের রক্ষক।
৪. ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়েছিল সুতরাং সংবিধানের ভিত্তি হবে ইসলামি ভাবাদশ।

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন।

১. ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং
২. ১৯৭০ সালের ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদগুলির নির্বাচন হবে। পরের বছর নির্বাচনের আগে ২৮ মার্চ 'আইন কাঠামো আদেশ' বা করেন। এই কাঠামো অনুযায়ী–

ক. জাতীয় পরিষদের সদস্যসংখ্যা হবে ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে ১৩টি আসন অর্থ্যাৎ মোট ৩১৩।

খ. ১৯৬৯ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী প্রদেশগুলির আসন ভাগ হেব। পূর্ব পাকিস্তান পাবে ১৬১টি সাধারণ ৭টি মহিলা আসন। এরপরে স্থান পাঞ্জাবের। ৮২টি সাধারণ ও ৩টি মহিলা আসন।

গ. প্রাদেশিক পরিষদে একেকটি প্রদেশের সদস্যসংখ্যা ভোটার অনুযায়ী নিধারিত হয়। এতেও পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে ৩০০টি সাধারণ ও ১০টি মহিলা আসন। পাঞ্জাবে ১৮০ ও ৬টি মহিলা আসন।

ঘ. সবাই প্রত্যক্ষ ভোটেই নির্বাচিত হবেন।

এ কাঠামোয় আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল–ক. পাকিস্তানের সব এলাকার জনগণ সবরকম জাতীয় প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এবং খ. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এবং প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্য সবরকম বৈষম্য দূর করা হয়।

তাছাড়া সংবিধানের উপক্রমণিকায় এই মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে–

ক. পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্না মোতাবেক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন গড়ে তুলতে পারেন। এবং

খ. সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্ম পালন এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে সব রকমের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা ভোগ করতে পারেন।

নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট সংবিধান প্রণয়নের জন্য তার সুযোগ সুবিধামতো দফায় পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। প্রতিনিধিরা ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান বিল প্রণয়ন করবেন এবং প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করবেন। ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট ও যদি বিল অনুমোদন না করেন তাহলে পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট সাময়িক বাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যই শেষের বিধানটি করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, পাকিস্তানের কোনো রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সেরকম আভাসই দিয়েছিল। সুতরাং ইয়াহিয়া খান বা সামরিক বাহিনির কর্তৃত্বও থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলো যে এ ধারায় সমালোচনা করেনি তা নয়। তবে, সর্বশেষে পূর্বপাকিস্তানে ভাসানী ন্যাপ ছাড়া সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণে মনস্থ করে।

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। নির্বাচনি প্রচারণায় আওয়ামী লীগের স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা'। বঙ্গবন্ধু ১ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে টিভি রেডিওতে যে বক্তৃতা করেন সেখানে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ম্যানিফেস্টোর রূপরেখা পাওয়া যায়।

১. স্বাধীনতার ২৩ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।
২. ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহাসুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি তাহলে কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তিসনদ ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়িত করা যাবে।

৩. আমরা সংখ্যালগিষ্ঠদের উপনিবেশ হয়ে থাকতে চাই না। আমাদেরকে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মূলত ৬ দফার ওপরই তিনি জনগণের ম্যান্ডেট চেয়েছিলেন।

মুসলিম লীগের তিনটি অংশ [কাউন্সিল, কনভেন্স ও কাউয়ুম] বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করে। ৬ দফা বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়বে এই ছিল তাদের বক্তব্য। জমায়েতের বক্তব্য মোটামুটি ছিল একইরকম তবে তারা ইসলামি শাসন প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। ন্যাপ (ওয়ালি), বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-এ বিশ্বাসী ছিল। জাতীয় পরিষদে পূর্বপাকিস্তানের জন্য রক্ষিত ১৬২ আসনে ১৭টি দল ও স্বতন্ত্র মিলে ৭৬৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নির্বাচনের তারিখ ছিল ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর। কিন্তু বন্যার কারণে তা নির্ধারিত হয় ৭ ডিসেম্বর, প্রাদেশিক পরিষদের ১৭ ডিসেম্বর। কিন্তু ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দুইলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। সব দল নির্বাচন পেছানোর পক্ষপাতী হলেও আওয়ামী লীগ তাতে অস্বীকৃতি জানায়। কেন্দ্র এই ঘূর্ণিঝড়ে ত্রাণকাজে অবহেলা দেখায় ফলে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাঙালির অভিযোগ আরও তীব্র হয়। বিপুল উদ্দীপনায় ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে। তাদের আসনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬০+৭= মোট ১৬৭টি। জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আসন পায় যথাক্রমে ৬৪, ১৮ ও ৩১টি। ৫টি মহিলা আসন নিয়ে তার সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৮৮টি। মুসলিম লীগের দুই অংশ পায় ১৬, ন্যাপ ৭ ও স্বতন্ত্র ১৮টি। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৮৮টি। মহিলা সদস্য নিয়ে তার আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৮, পিডিপি ২, ন্যাপ ১, ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ৭টি।

আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো আসন পায় নি। তেমনি পিপলস পার্টিও পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন পায় নি। বাঙালি ৬ দফার প্রতি তাদের সমর্থন জানায়। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন :

> I warmly thank the people for having given a historic verdict in favour of our Six-point Program. We Please to implement this verdict. There can be no constitution except are which is best on the point Program.[৩৩৩]

স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু তা করা হয় নি। ৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সৈয়দ আলী আহসানের সাথে আলোচনায় বিশিষ্ট শিল্পপতি এ কে খান বলেছিলেন,

> পাকিস্তান শাসন করছে পাঞ্জাবের সেনাবাহিনী এবং সরকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এরা কোনক্রমেই ক্ষমতা আপন হস্তচ্যুত হতে দিতে চায় না। পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা ক্ষমতায় আসবে এটা তারা কখনই মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু ক্রমশঃ সময় যতই পার হচ্ছে সেনাবাহিনীতে বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সিনিয়র প্রশাসনিক পদেও বাঙালীরা প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এগুলো সবই পাঞ্জাবীদের জন্য অসুবিধাজনক। তাই তারা নিজের স্বার্থেই একদিন চাইবে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। ইতোমধ্যেই তারা শতকরা নব্বইটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। পশ্চিম পাকিস্তান উৎপন্ন পণ্যের বাজার সন্ধান করছে মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান না থাকলেও যাতে তাদের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকে সে চেষ্টা তারা করে যাচ্ছে। বর্তমানে আন্দোলন চলছে সে আন্দোলন না হলেও একদিন পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবেই-এটা আমি দেখতে পাচ্ছি।[৩৩৪]

ইয়াহিয়া বা কেন্দ্রীয় শাসকরা আশা করেন নি আওয়ামী লীগ পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করবে। অন্যদিকে ভুট্টো দেখলেন, তিনি ক্ষমতার অংশীদার হতে পারবেন না। সুতরাং তিনি ইয়াহিয়ার খানের সঙ্গে গোপন আঁতাত বা ষড়যন্ত্র করেন যাতে শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা সৃষ্টি করা হয়। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে বাঙালি বিদ্বেষ শুরু হয়। বাঙালি বিদ্বেষ প্রসঙ্গে শিল্পী মুর্তজা বশীরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো,

> সত্তর সালে করাচিতে প্রবলভাবেই বাঙালি বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেল। আমার ঘনিষ্ঠ দুজন পাকিস্তানি বন্ধু যখন দুটি ভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ল, তখন আমি বুঝলাম অবস্থা কতটা সঙ্গিন। শাকের আলী এক পার্টিতে

> আমাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। আমিও তাকে গালিগালাজ করি। অপর ঘটনায় তো দলবদ্ধ বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলাম। উত্তেজিত পাকিস্তানিরা সেদিন আমার ওপরে চড়াও হওয়ার জন্য ফুঁসছিল।[৩৩৫]

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ও শেষে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা জন্য ঢাকায় আসেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর দাবিতে অনড় থাকেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন ৩ মার্চ ঢাকায় পরিষদের অধিবেশন বসবে। ভুট্টো অধিবেশন বয়কটের ঘোষণা দেন। ভুট্টো জানিয়ে দেন পশ্চিম পাকিস্তান তিনিই শাসন করবেন অর্থাৎ পাকিস্তান গড়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। ক্রমাগত হুমকি দিয়ে তিনি পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুললেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তিনি যেহেতু ৬ দফার ম্যান্ডেট পেয়েছেন সেহেতু তার ভিত্তিতেই তিনি সংবিধান প্রণয়ন করবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন–

> সংক্ষেপে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আবার হিন্দুস্থান যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সে জন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আহ্বানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[৩৩৬]

১ তারিখে এ ঘোষণার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। বঙ্গবন্ধু ২ তারিখ সারা দেশে হরতাল ডাকেন। ২ তারিখ ডাকসু কলাভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে। ৩ তারিখ ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানে এক জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার অসহযোগ আন্দোলন ও জনতার ন্যায়সংগত আন্দোলনকে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ৪ মার্চ লুটতরাজ এবং অরাজকতা বলে মন্তব্য করে।[৩৩৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠন পত্রিকাটির এরূপ ভূমিকার নিন্দা জানায় এবং বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশনের তীব্র সমালোচনা করে পত্রিকাটি বর্জনের আহ্বান জানায়।[৩৩৮]

২ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত হরতাল ঘোষণা করা হয়। কারফিউও বলবৎ ছিল। কিন্তু, কারফিউ ভেঙে সাধারণ মানুষ মিছিল করেন। গুলি করে নিরাপত্তা বাহিনি তাদের হত্যা করে। সারা প্রদেশ অচল হয়ে পরে। ইয়াহিয়া খান আবার ৬ তারিখ ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। একইসঙ্গে বেলুচিস্তানের কসাই নামে খাত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। বেসামরিক পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনা পাঠানো হতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন তিনি ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান, বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা আহ্বান করেন।

৭ই মার্চ রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ কয়েকটি কারণে বৈশিষ্ট্যময়। আজ পর্যন্ত কোনো জনসভায় এত মানুষ হয় নি। প্রতিরোধের একটি ভঙ্গি নিয়ে মানুষ এসেছিলেন। কারো হাতে ছিল বৈঠা, কারো হাতে লাঠি, আবার একইসঙ্গে ছিল একটি উৎসবমুখর ভাব। স্লোগান ছিল জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধুর জীবনে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা ছিল এ বক্তৃতা। অন্যান্য কোনো বক্তৃতার সঙ্গে তা তুলনীয় নয়।

বঙ্গবন্ধু তার আবেগময় ভাষণে ঘোষণা করেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তিনি যোগ দিতে পারেন যদি চারটি শর্ত মেনে নেওয়া হয়। সেগুলো হলো–

১. সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে
২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে
৩. এ পর্যন্ত যতজনকে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে
৪. অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এই শর্তগুলো মানলে তিনি বিবেচনা করবেন ‘আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না।’ বঙ্গবন্ধু একইসঙ্গে প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেন। অবশ্য, এই ঘোষণার আগেই সাধারণ মানুষ সবকিছু প্রায় অচল করে দেয়। ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই অবস্থা চলেছিল এবং তাই অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত।

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ভাষণে জনগণকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। ভাষণের শেষে ঘোষণা করেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা না করে উল্টো সামরিক পথ বেছে নেয়। সে উদ্দেশ্যে সরকার ৭ই মার্চ জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে জে. টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিন্তু ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকীসহ সকল বিচারপতি জে. টিক্কা খানের শপথ পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানান।[৩৩৯] ফলে তাঁকে সামরিক শাসনকর্তা হিসেবেই দায়িত্ব পালন করতে হয়।

একদিকে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে ‘বীর বাঙ্গালী অস্ত্রধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর’ এরূপ বৈপ্লবিক জাগরণ, অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধান করতে পাকিস্তানি সামরিক শাসকের পক্ষে অনাগ্রহ–এ দু’য়ের কারণে বোঝা যাচ্ছিল একটি সর্বাত্মক সশস্ত্র সংগ্রাম অত্যাসন্ন।[৩৪০]

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্যদের আনা হতে থাকে। ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের মুক্তিকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তুত।

১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ৩৫টি নির্দেশ পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে বিকল্প একটি ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। ২৫ মার্চ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলে।

জুলফিকার আলী ভুট্টো অন্যদিকে ঘোষণা করেন, পাকিস্তান দুটি অঞ্চল সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হোক। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন আবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য। আসলে এটি ছিল অজুহাত। পাকিস্তান থেকে আরও সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সময় ক্ষেপণের কৌশল ছিল। জেনারেলদের ধারণা ছিল কঠোর হাতে বাঙালিদের দমন করলে এই আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই দেখা গেল এই আলোচনা ফলপ্রসূ হলো না। তার সঙ্গে ভুট্টো ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারাও ঢাকায় এসেছিলেন।

২৫ মার্চ রাতে কাউকে না জানিয়ে ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো ও অন্যান্য নেতারা ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐ রাতেই পাকিস্তান বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকা শহরের বাঙালিদের ওপর। শুরু হয় জ্বালানো পোড়ানো ও গণহত্যা। ১৯৪৭-৭১ সালের ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি রাজনীতিবিদগণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করেছে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক পর্যায়ে ৩৭টি হরতাল এবং জাতীয় পর্যায়ে ৪৭টি হরতাল হয়।[৩৪১] কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী গণতন্ত্রের ভাষা বুঝতে অক্ষম ছিলেন। তাই, তারা বেছে নেয়ে হত্যা ও নির্যাতনের পথ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গণহত্যার বিপরীতে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ওয়ারলেসে তারবার্তা ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি বলেন–

> This may be my last mesasge, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of cocupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. Sheikh Mujibur Rahman.[৩৪২]

মধ্যরাতের পর পাকিস্তান বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যায়। ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকেই সারা দেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সাধারণ মানুষ। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর তা মানুষের

মনে উৎসাহের সৃষ্টি করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিছুদিনের মধ্যেই গণহত্যা, লুণ্ঠন, নির্যাতনের মাধ্যমে সারা দেশে কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

উপসংহার

১৯৫০-এর দশক ছিল জনগণের ক্ষমতার উত্থানের দশক। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সদ্যোজাত জাতীয়তাবাদ বিপুল শক্তি অর্জন করে, ১৯৫৪ সালে শাসক মুসলিম লীগ দলের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফলে তা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু জনগণের শক্তির এই প্রকাশকে পরবর্তীকালে টেকসই প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংহত করা সম্ভব হয় নি। জনগণের ক্ষমতাকে খর্ব করে একটি স্বৈরাচারী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করা হয়, যার মাধ্যমে জনগণকে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

১৯৫৮ সালের পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে পাকিস্তানি শোষণ ও বাঙালির প্রতিরোধের বিভিন্ন পর্যায়কে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এইসব রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা করা হয়েছে ঐ সময়কে বোঝার জন্য। যাতে এইসব রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে ত্বরান্বিত করতে অন্য কী কী বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়েই এই গবেষণার কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে। এই উপলব্ধি থেকেই বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের অনালোচিত দিক যেগুলো রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রভাবিত করে তা উদ্‌ঘাটন করাই উদ্দেশ্য। এই সকল কর্মকাণ্ডে কবি-সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও নারী-পুরুষদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কী প্রভাব ফেলে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বায়ান্নো-পরবর্তী বছরগুলোতে একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল সংগ্রামী মানসিকতার নিদর্শন। এদেশের মাটিতে শোষণমুক্ত এক সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শপথের দিন ছিল এই দিন; কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি জাতীয়তাবাদ চেতনার বিকাশের সঙ্গে একুশে হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নতুন শপথের হাতিয়ার।[৩৪৩]

আমাদের সাংবিধানিক দাবিগুলোর মধ্যে যে স্বপ্নগুলো রোপিত ছিল তা হলো–এমন একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ক্ষমতার মালিক প্রকৃতপক্ষেই হবে জনগণ। জনগণের সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এমন একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদ যা গঠিত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে। এই জাতীয় সংসদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করবে। খুব জোরালোভাবে এই প্রত্যাশা আমাদের পরিবর্তনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটাতে সক্ষম হবেন।[৩৪৪] এই ছিল বাঙালির লক্ষ্য। কিন্তু এই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধু রাজনৈতিকভাবে অর্জন করা সম্ভব হয় নি। এই অর্জনগুলোকে ত্বরান্বিত করে–শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিল্পকলা ও সংবাদ-সাময়িকপত্র। কীভাবে এইসব উপাদান রাজনৈতিক অর্জনকে ত্বরান্বিত করে তা অভিসন্দর্ভে দেখানো হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকাভাষ্য

[১] হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ : পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৫৫

[২] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, জুন ২০১৩, পৃ. ১০৮

[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

[৪] হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ : পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*

[৫] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১১৭

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

[৮] সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা), *আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, ভূমিকা, পৃ. ৮

[৯] *প্রাগুক্ত*

[১০] *প্রাগুক্ত*

[১১] *প্রাগুক্ত*

[১২] *প্রাগুক্ত*

[১৩] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫, ১০১

[১৪] সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা), *আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি*, *প্রাগুক্ত*

[১৫] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫, ১১৯

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

[১৭] সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা), *আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-৯

[১৮] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস* চতুর্থ খণ্ড (প্রথম পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৭২

[১৯] *প্রাগুক্ত*

[২০] *প্রাগুক্ত*

[২১] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৭

[২২] আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ভূমিকা

[২৩] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

[২৪] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭২-৪৭৩

[২৫] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৫৪-৫৮

[২৬] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৩

[২৭] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১০৬

[২৮] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৩-৪৭৪

[২৯] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮৮

[৩০] ১. ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বাংলাভাষা প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদিগতে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫. আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ববাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপরে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।*

*মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

[৩১] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮-১০৯

[৩২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৬

[৩৩] বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৭৭

[৩৪] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রাষ্ট্র ও বাংলাভাষা', সুব্রত বড়ুয়া, ফরহাদ খান (সম্পা.), *অমর একুশে বক্তৃতা ১৯৮৫-৯৪*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৪

[৩৫] *প্রাগুক্ত*
[৩৬] বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩-৩২৪
[৩৭] আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, *আমরা বাংলাদেশী, না বাঙালি*, অক্ষরবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৭
[৩৮] *প্রাগুক্ত*
[৩৯] *প্রাগুক্ত*
[৪০] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রাষ্ট্র ও বাংলাভাষা', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯
[৪১] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২০
[৪২] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫৯
[৪৩] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪
[৪৪] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪৩-৪৪
[৪৫] এমাজউদ্দীন আহমদ, 'বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের রূপ', মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪২
[৪৬] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
[৪৭] *প্রাগুক্ত*
[৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬
[৪৯] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬
[৫০] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৫২
[৫১] *প্রাগুক্ত*
[৫২] যুক্তফ্রন্ট শুধু মুসলমান আসনেই নির্বাচন করেছিল এবং ২৩৭টি মুসলিম সিটের মধ্যে পেয়েছিল ২২৮টি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৪৩টি, কে এস পি ৪৮টি, নেজাম-ই-ইসলাম ২২টি, গণতন্ত্রী পার্টি ১৩টি ও খেলাফতে রাব্বানী ২টি।*১
*১ মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬
[৫৩] সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা), *আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি*, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. ৮-৯
[৫৪] *প্রাগুক্ত*
[৫৫] *দৈনিক আজাদ*, ১০ মার্চ ১৯৫৪
[৫৬] *প্রাগুক্ত*, ১১ মার্চ ১৯৫৪
[৫৭] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪-৫
[৫৮] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭
[৫৯] মালেকা বেগম, *সুফিয়া কামাল*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৪৪
[৬০] *দৈনিক আজাদ*, ২২ মার্চ ১৯৫৪
[৬১] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
[৬২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮
[৬৩] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬
[৬৪] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
[৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২
[৬৬]

১৫ই মে ফজলুল হক যে-দিন আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করলেন সে-দিন দাঙ্গা বাধানো হয় আদমজীতে। প্রশাসন তখনও মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণে ছিল না । তাই দেখা যায়, যতক্ষণ না বেশ কিছু হত্যাকাণ্ড হয় ততক্ষণ প্রশাসন নীরব ছিল।*১ দাঙ্গায় দেড় হাজারের মতো শ্রমিক নিহত হয়।

বাঙালি শ্রমিকদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ছিল অধিক। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সেই দাঙ্গার পেছনে কমিউনিস্টদের সরাসরি হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তোলে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক তৎক্ষণাৎ সে অভিযোগ খণ্ডন করে আদমজী কর্তৃপক্ষের একতরফা নীতিকে ঘটনার জন্য দায়ী করেন।*২ ২৩শে মার্চ ১৯৫৪ চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিলে

বাঙালি বনাম বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তাতে ১৩ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে।*৩ কেন্দ্রীয় সরকার যে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে কয়েকদিনের মধ্যে। আদমজীর দাঙ্গার দু'দিন পরে প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মীর্জাকে গর্ভনর করে পাঠানো হয় পূর্ববঙ্গে। মীর্জা ঢাকায় পৌঁছার দু'দিন পর ১৯৫৪ সালে ১৯শে মে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির একজন স্থপতি ছিলেন মীর্জা নিজে। যুক্তফ্রন্ট যে এর বিরোধী তা তিনি জানতেন। ১৯৫৪ সালের ১৪ই এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের পক্ষে মওলানা ভাসানী চুক্তির বিরোধিতা করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মীর্জা ও তাঁর অনুসারীরা ভাবছিলেন, এ চুক্তি বাতিলে যুক্তফ্রন্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

*১ মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

*২ *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

*৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

[৬৭] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

[৬৯] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩

[৭০] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

[৭১]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (যিনি ছিলেন একজন বাঙালি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পুতুল মুসলিম লীগের সদস্য) ঐ দিন এক বেতার ভাষণে ফজলুল হককে চিহ্নিত করলেন একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে যিনি মূলত পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যহীন। মোহাম্মদ আলী অভিযোগ করে বলেন, 'যুক্তফ্রন্ট প্রদেশের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিল এবং তা পরিণত হচ্ছিল সে শক্তিতে যা প্রদেশকে বিরুদ্ধাচারী করে তুলেছিল কেন্দ্রের, এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের বিরুদ্ধে।'*১ যে মন্ত্রিসভা সব নিয়ম-কানুন মেনে ক্ষমতায় এসেছে, দু'সপ্তাহের মধ্যে তাকে বাতিল করা কোনোক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

*১ মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

[৭২] *প্রাগুক্ত*

[৭৩] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬

[৭৪] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

[৭৫] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

[৭৬] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, *৮*

[৭৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১১

[৭৮] ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান চালু হয়।

[৭৯] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

[৮০]

যত দিন যেতে লাগল আওয়ামী লীগে ভাসানী, সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপে মধ্যে ফাটল তত জোরদার হতে লাগল। ভাসানী অনুসারীদের দাবী ছিল এবং যাতে তারা দীর্ঘদিন ধরে ছিল সোচ্চার তা হল–পূর্ব-পাকিস্তানে সত্যিকার স্বায়ত্তশাসন এবং পাশ্চাত্যের সামরিক চুক্তিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপ এ নীতি মানতে রাজী ছিলেন না। সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আতাউরের নিয়ন্ত্রণে তখন ছিল পৃষ্ঠপোষকতার আধার–লাইসেন্স, পারমিট, সরকারী-আধাসরকারী পদে চাকরি। আর এ সব তাঁরা এমনভাবে বিতরণ করতে লাগলেন যাতে দলে তাদের অনুসারী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায় ভাসানীর অনুসারী সংখ্যা। ১৯৫৭ সালের ২৪শে জুলাই ভাসানী আওয়ামী লীগের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে (২৫ ও ২৬শে জুলাই) ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। এখানে কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এ অঞ্চলের প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকরা বা রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে যে সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তা দেখান নি এবং অধিকাংশ সময় এর বিপরীতে গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী স্বার্থকে। বাংলাদেশের পরবর্তী ঘটনাসমূহও তা-ই প্রমাণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে

ঘায়েল করার জন্য তারা আমলাতন্ত্রের সাহায্য নিতে গররাজী ছিলেন না এবং আমলাতন্ত্রও নিজেদের আধিপত্য ও ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ করত এ সুযোগ।

[৮১] সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা), *আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

[৮২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

[৮৩] খান মাহবুব, *বাংলার সাহিত্য সম্মেলন*, একাত্তর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৪৪

[৮৪] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৪৯

[৮৫] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

[৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১৪

[৮৭] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

[৮৮] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

[৮৯] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি* অখণ্ড, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৭৯

[৯০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০

[৯১] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৪৩; আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৬

[৯২] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫

[৯৩] লেলিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২০২

[৯৪] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৯৫] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫

[৯৬] মুনতাসীর মামুন, *রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আমাদের হলেন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৯

[৯৭] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

[৯৮] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

[৯৯] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩

[১০০] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০-১৫১

[১০১] মামুন সিদ্দিকী (সম্পা.), *সেলিনা বানু : সংগ্রামী নারী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬৫

[১০২] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩২৩

[১০৩] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি* প্রথম খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩৬

[১০৪] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

[১০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪

[১০৬] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪

[১০৭] *প্রাগুক্ত*

[১০৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

[১০৯] জাহীদ রেজা নূর, 'রাজনৈতিক ভাষ্যকার : সিরাজদ্দীন হোসেন', *প্রথম আলো*, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩

[১১০] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

[১১১] *প্রাগুক্ত*

[১১২] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪২

[১১৩] বহুবিবাহ প্রথাকে নিরুৎসাহিত করা, স্ত্রীকে যথেচ্ছ তালাক দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করা, বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা, মেয়ের বিয়ের বয়স ১৬ ও ছেলের ২১ নির্ধারণ করা, মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোহরানা দাবিমাত্র পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা প্রভৃতি আইনের ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে।*

*মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৪৮

[১১৪] *প্রাগুক্ত*

[১১৫] রাশেদ খান মেনন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সময়', আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *চোখের দেখা প্রাণের কথা*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৩৫

[১১৬] মুজিবর রহমান (সংকলক ও সম্পাদক), *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার কথা*, রাঢ়বঙ্গ প্রকাশনী, রাজশাহী, মার্চ ২০১৫, পৃ. ২১২
[১১৭] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[১১৮] *প্রাগুক্ত*
[১১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[১২০] কামাল হোসেন (বক্তৃতা), 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ১৯৭২-১৯৭৫', *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ডিরেক্টর ট্রেনিংয়ের আর্কাইভে সংরক্ষিত ভিডিও, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ আগস্ট ২০১৫
[১২১] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[১২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[১২৩] *প্রাগুক্ত*
[১২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[১২৫] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৭০
[১২৬] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*
[১২৭] *প্রাগুক্ত*
[১২৮] মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২০৮
[১২৯] আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৯৮
[১৩০] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[১৩১] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
[১৩২] নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, ইউছুফ আলী চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া, সৈয়দ আজিজুল হক ও মাহমুদ আলী।
[১৩৩] মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১
[১৩৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[১৩৫] আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪
[১৩৬] মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬
[১৩৭] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪৩
[১৩৮] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫
[১৩৯] *প্রাগুক্ত*
[১৪০] মুনতাসীর মামুন, *রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আমাদের হলেন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৯-২০
[১৪১] *আজাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
[১৪২] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, পৃ. ২৮
[১৪৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪
[১৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪
[১৪৫] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[১৪৬] *দৈনিক আজাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
[১৪৭] *পাকিস্তান অবজারভার*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
[১৪৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* দ্বিতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯
[১৪৯] *দৈনিক আজাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
[১৫০] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪-১৫৫
[১৫১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪
[১৫২] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
[১৫৩] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৯
[১৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
[১৫৫] শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী, *ভারত, মুজিবুর রহমান, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান* (অজানা তথ্য), তানভীর চৌধুরী (অনু.), সঞ্চিতা, নারায়ণগঞ্জ, ২০১৯, পৃ. ৪০-৪১

[১৫৬] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের ইতিহাস*, বিজয় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৬

[১৫৭] *দৈনিক আজাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৩; রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৪৫

[১৫৮] *প্রাগুক্ত*

[১৫৯] জেমস জে নোভাক, *বাংলাদেশ : জলে যার প্রতিবিম্ব*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৭১

[১৬০] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৬

[১৬১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ জানুয়ারী ১৯৬৪

[১৬২] *ঐ*, ১৪ জানুয়ারী ১৯৬৪

[১৬৩] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

[১৬৪] কে, এম, মোহসীন, 'বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক দিক : ঐতিহাসিক পটভূমি', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭৮-১৯৭৯, পৃ. ৮১-৮২

[১৬৫] এম, কুদরাত-এ খুদা, *পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-সম্ভাবনা*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৬-৭; কে, এম, মোহসীন, 'বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক দিক : ঐতিহাসিক পটভূমি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

[১৬৬] I.N. Mukherji, `Economic Development of Bangladesh : A Probe into viability' S.P. Varma & Virendra Narain (Ed.), *Pakistan Political System in Crisis, Emergence of Bangladesh*, Jaipur, 1972, P. 166

[১৬৭] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-১৩৩

[১৬৮] Rounaq Jahan, *Pakistan : failure in national integration*, Oxfort University Press, 1973, PP. 163-164

[১৬৯] আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবন* প্রথম খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৭৫-২৭৬

[১৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬

[১৭১] Rounaq Jahan, *Pakistan : failure in national integration, ibid*

[১৭২] মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭

[১৭৩] মোনায়েম সরকার, *আত্মজৈবনিক*, ভাষাচিত্র, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৫৩

[১৭৪] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৫৫

[১৭৫] মোনায়েম সরকার, *আত্মজৈবনিক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

[১৭৬] *দৈনিক আজাদ*, ৯ জুলাই ১৯৬৪

[১৭৭] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

[১৭৮] *দৈনিক আজাদ*, ১৬ অক্টোবর ১৯৬৪; রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯২-৪৯৩

[১৭৯] কে, এম, মোহসীন, 'বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক দিক : ঐতিহাসিক পটভূমি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[১৮০] আবুল ফজল, *সমকালীন চিন্তা*, চট্টগ্রাম, ১৯৭০, পৃ. ৪০-৪১

[১৮১] কে, এম, মোহসীন, 'বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক দিক : ঐতিহাসিক পটভূমি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[১৮২] আবুল ফজল, *সমকালীন চিন্তা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

[১৮৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ অক্টোবর ১৯৬৪

[১৮৪] *ঐ*, ২০ এপ্রিল ১৯৬৫

[১৮৫] কে, এম, মোহসীন, 'বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক দিক : ঐতিহাসিক পটভূমি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[১৮৬] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

[১৮৭] *সংবাদ*, ২০ মার্চ ১৯৬৪

[১৮৮] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

[১৮৯] *পাকিস্তান অবজারভার*, ২ অক্টোবর ১৯৬৪

[১৯০] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০

[১৯১] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, *পটভূমি*, *১৯৫৮-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭

[১৯২] মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০

[১৯৩] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

[১৯৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[১৯৫] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২
[১৯৬] মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ৪৩৭
[১৯৭] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
[১৯৮] *প্রাগুক্ত*
[১৯৯] *প্রাগুক্ত*
[২০০] *প্রাগুক্ত*
[২০১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০
[২০২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০
[২০৩] *প্রাগুক্ত*
[২০৪] *প্রাগুক্ত*
[২০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১
[২০৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১
[২০৭] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬
[২০৮] কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১১
[২০৯] *প্রাগুক্ত*
[২১০] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯-১৮০
[২১১] সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭১
[২১২] *প্রাগুক্ত*
[২১৩] *প্রাগুক্ত*
[২১৪] কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
[২১৫] *প্রাগুক্ত*
[২১৬] *প্রাগুক্ত*
[২১৭] *প্রাগুক্ত*
[২১৮] শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও নূরুল আমীন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।
[২১৯] কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[২২০] *প্রাগুক্ত*
[২২১] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[২২২] *দৈনিক আজাদ*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
[২২৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
[২২৪] এম এন হুদা, এ এফ এ হুসেইন, মাযহারুল হক, এম টি হক, এ সাদেক, এম এ রাজ্জাক, নুরুল ইসলাম ও এ ফারুক।*
* নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২১
[২২৫] *প্রাগুক্ত*
[২২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[২২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[২২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[২২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[২৩০] কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[২৩১] হায়দার আকবর খান রনো, *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪১
[২৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০
[২৩৩] *দৈনিক আজাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
[২৩৪] ১৯৬৬ সালে গঠিত আওয়ামী লীগের নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সহ-সভাপতি–সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এম. এনসুর আলী, মজিবর রহমান ও শাহ আজিজুর রহমান; সাধারণ সম্পাদক–তাজউদ্দিন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক–মিজানুর রহমান চৌধুরী।

[২৩৫] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০-২৬৯
[২৩৬] *সংবাদ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
[২৩৭] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫
[২৩৮] Mohammad Asghor Khan, *General in Politics : Pakistan 1958-1981*, UPL, Dhaka, 1983, P. 19
[২৩৯] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫
[২৪০] আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৯
[২৪১] Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics, Problem and Issues,* UPL, Dhaka, 1980, P. 29
[২৪২] আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২
[২৪৩] কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
[২৪৪] আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
[২৪৫] অজয় দাশগুপ্ত, *সংবাদপত্রে হরতালচিত্র ১৯৪৭-২০০০*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৯
[২৪৬] *প্রাগুক্ত*
[২৪৭] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র*, *পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩২
[২৪৮] শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৯৬-৯৭
[২৪৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ জুলাই ১৯৬৬
[২৫০] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.১১৯
[২৫১] কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
[২৫২] কামাল হোসেন, 'বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন : স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৪
[২৫৩] পাকিস্তানিরা বাঙালির খাদ্য অভ্যাস নিয়ে শাসকগোষ্ঠী সবসময় ব্যঙ্গ করত।
[২৫৪] *সংবাদ*, ১৮ মার্চ ১৯৬৭
[২৫৫] *ঐ*
[২৫৬] *ঐ*, ১৪ মার্চ ১৯৬৭
[২৫৭] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[২৫৮] *সংবাদ*, ২১ জুন ১৯৬৭
[২৫৯] *দৈনিক আজাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৮
[২৬০] *ঐ*
[২৬১] *ঐ*
[২৬২] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[২৬৩] কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[২৬৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[২৬৫] শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী, *ভারত*, *মুজিবুর রহমান*, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান* (অজানা তথ্য), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
[২৬৬] কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[২৬৭] মামুন সিদ্দিকী, *শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩১
[২৬৮] বদরুদ্দীন উমর, *আমার জীবন* তৃতীয় খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৬
[২৬৯] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮
[২৭০] মামুন সিদ্দিকী, *শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪
[২৭১] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩
[২৭২] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৬৪
[২৭৩] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, পৃ. ১১১
[২৭৪] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[২৭৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২
[২৭৬] *প্রাগুক্ত*
[২৭৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

[২৭৮] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[২৭৯] *দৈনিক আজাদ*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৯
[২৮০] মামুন সিদ্দিকী, *শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[২৮১] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[২৮২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[২৮৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
[২৮৪] *প্রাগুক্ত*
[২৮৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[২৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[২৮৭] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
[২৮৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৫-৪০৮
[২৮৯] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
[২৯০] তোফায়েল আহমেদ, *ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২০-২১
[২৯১] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২২৬
[২৯২] তোফায়েল আহমেদ, *ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২
[২৯৩] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
[২৯৪] *প্রাগুক্ত*
[২৯৫] তোফায়েল আহমেদ, *ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[২৯৬] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
[২৯৭] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
[২৯৮] মুনতাসীর মামুন (বক্তৃতা), 'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা ও তাঁর বাস্তবায়ন', জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, সুফিয়া কামাল মিলনয়াতন, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২৪ আগস্ট ২০১৯
[২৯৯] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[৩০০] নির্মলেন্দু গুণ, *মহাজীবনের কাব্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৮১
[৩০১] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[৩০২] *প্রাগুক্ত*
[৩০৩] সালাহ্উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১২১
[৩০৪] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
[৩০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪; মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ওয়ার্সী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৬-১৭৮
[৩০৬] Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh,* University Press limited, Dhaka, 1986, P. 238; মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫
[৩০৭] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২
[৩০৮] রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৬-৪৭
[৩০৯] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৯
[৩১০] আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *নিষ্ফলা মাঠের কৃষক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৭
[৩১১] এম এম আকাশ, *বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১০২
[৩১২] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
[৩১৩] আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *নিষ্ফলা মাঠের কৃষক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
[৩১৪] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[৩১৫] গোলাম মওলা, 'হারিয়ে যাওয়া ২২ ধনী পরিবার', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৮ মে ২০১৭

[৩১৬] রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন : পূর্ণতার সেই বছরগুলো*, SAGE Publications India Pvt. Ltd, New Delhi, 2016, পৃ. ১৭১
[৩১৭] রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[৩১৮] রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন : পূর্ণতার সেই বছরগুলো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০
[৩১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১
[৩২০] রেহমান সোবহান (রচনা সংকলন), *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৭
[৩২১] গোলাম মওলা, 'হারিয়ে যাওয়া ২২ ধনী পরিবার', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৮ মে ২০১৭
[৩২২] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২
[৩২৩] *প্রাগুক্ত*
[৩২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩
[৩২৫] *প্রাগুক্ত*
[৩২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[৩২৭] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৯-২৮০
[৩২৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, *পটভূমি*, *১৯৫৮-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৬
[৩২৯] শেখর দত্ত, *ষাটের দশকের গণজাগরণ : ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা প্রভাব*, সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৫৩৬
[৩৩০] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, *পটভূমি*, *১৯৫৮-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৬
[৩৩১] মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
[৩৩২] আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ ১৯৫৩-'৯৩*, নূরুল হুদা (সম্পা.), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮০
[৩৩৩] Golam Morshed, 'Pakistan 1971 Elections and the liberation of Bangladesh : A political Analysis', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol, XI, 1988, PP. 109-110; মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২০০
[৩৩৪] সৈয়দ আলী আহসান, *জীবনের শিলান্যাস*, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৭৬
[৩৩৫] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪১৪
[৩৩৬] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, *পটভূমি*, *১৯৫৮-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৬
[৩৩৭] *পাকিস্তান অবজারভার*, ৪ মার্চ ১৯৭১
[৩৩৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৭১
[৩৩৯] *ঐ*, ১০ মার্চ ১৯৭১
[৩৪০] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১-২০২
[৩৪১] অজয় দাশগুপ্ত (সংকলন ও সম্পাদিত), *সাত দশকের হরতাল ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৭
[৩৪২] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১
[৩৪৩] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
[৩৪৪] কামাল হোসেন, 'বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন : স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৫

তৃতীয় অধ্যায়

মননচর্চা ও মানসজগৎ

যেকোনো দেশের রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ কাঠামোয় মৌল ও আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রথমত মানসজগৎ পরিবর্তন করতে হয়। মানস পরিবর্তন হলো এমন একটি মৌলিক বিষয় যেটি ছাড়া জাতির পক্ষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। মানসজগৎ পরিবর্তিত হয় মননচর্চার মাধ্যমে। মননচর্চার মাধ্যমে চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসে যা সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মননচর্চা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে একটি জাতিকে আরও উন্নতস্তরে পৌঁছে দেয় এবং জাতি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যে পর্যায়ে অবস্থান করছে সেটাকে কর্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে দেশকাল সমাজের প্রেক্ষাপটে বা সমাজের চাওয়া অনুযায়ী উপযোগী করে তোলে। অর্থাৎ জনগণ যা চাচ্ছে, মানুষ যা চাচ্ছে সেরকম করে তৈরি করা। মননচর্চা হতে পারে–গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ও শিল্পকলাসহ শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে। ষাটের দশকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মননচর্চা মাধ্যমে কীভাবে বাঙালির মানসগঠন ও পরিবর্তন হয় যা বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টিতে অবদান রাখে সেই বিষয়টি এ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি আলোচনা করতে গেলে আমরা শুধু রাজনৈতিক পটভূমিই আলোচনা করি। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে অন্য যে সব বিষয় ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই রকম একটি বিষয় হলো সাহিত্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের[১] জাতীয় সংগ্রামের প্রেরণাশক্তি হিসেবে সাহিত্য, অন্য যে কোনো মাধ্যমের চেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। এর কারণ, গণচিত্তের সংস্কৃতিবোধ ও রাজনীতিচেতনায় একমাত্র শিল্প-সাহিত্যই বিচিত্রভাবে প্রভাব ফেলতে পারে।[২] মুক্তিযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং শৈল্পিক প্রভাবও প্রতিফলিত রয়েছে বাংলাদেশের সাহিত্যে।[৩]

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং কালকে ধারণ করে হয় কালোত্তীর্ণ। সাহিত্যে কখনো কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফুটে ওঠে জাতির জীবনছবি, রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস। কালের ব্যবধানে সাহিত্য বিবেচিত হয় ইতিহাসের উপাদান হিসেবে। তাই প্রাচীনযুগের 'চর্যাপদ' ও মধ্যযুগের 'মঙ্গলকাব্য'গুলো কেবল সাহিত্য নয়–ইতিহাসের আকরও বটে। কোনো সাহিত্যকর্ম যখন রচিত হয় তখন তাতে সমকালের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি ঘটনাবলির প্রতিফলন ঘটে বা ছাপ পড়ে। কালের ব্যবধানে সেই বর্তমান পরিণত হয় দূর অতীতে। কয়েক দশক পরে নতুন কালের পাঠক সেই সাহিত্যকর্মে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পান। অর্থাৎ সাহিত্যে বিধৃত চিত্র, বর্ণনা বা ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া যায় রচনাকালের কিংবা বর্ণিতকালের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, চিত্র বা চরিত্র সম্পর্কে ধারণা। এভাবে আমরা সাহিত্য থেকে মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ইত্যাদির অতীত সম্পর্কে জানতে পারি।[৪] সাহিত্যে যে কোনো মুক্তিকামী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়। বাংলা সাহিত্যেও ফুটে ওঠেছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট।[৫]

১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগের পরবর্তী সময়প্রবাহে বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকরা কিছু সময়ের জন্য ছিলেন দ্বিধান্বিত। অর্থাৎ পাকিস্তানবাদ এবং ধর্মীয় জীবনভাবনা ও মূল্যবোধের প্রাধান্য দিয়ে একদল সাহিত্যিক এ সময় তাঁদের সাহিত্য কর্ম রচনা করেন। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি প্রায়শই তাঁদের রচনার ক্ষেত্রে অবহেলিত হয়েছে। ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যে প্রতিবাদী সচেতনতার জন্ম দেয় তা ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে ছিল পাকিস্তানবাদ জীবনভাবনা ও মূল্যবোধের বিপরীত।[৬] আমাদের কবি-সাহিত্যিকগণও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমান্তরাল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালির সাংস্কৃতিক নবজাগরণে সাহিত্যিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে; কিন্তু সেখানেও অবরুদ্ধ হলো না তাঁদের সৃষ্টিশীলতার অভিযাত্রা–রচিত হলো 'কবর'-এর মতো নাটক, অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প ও উপন্যাস।[৭] সমাজজীবনে যে দ্বন্দ্ব, গতি, সংকট ও সংঘর্ষ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিরাজ করছিল তা এ-যুগের সাহিত্যকে করেছে প্রভাবিত।

মধ্যবিত্তের প্রত্যাশা-অপ্রাপ্তি, সংগ্রাম, স্বপ্নভঙ্গ এ সময়ের সাহিত্যের মূল উপজীব্য। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বময় প্রকাশ ঘটেছে বিষয়ভাবনায়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সাহিত্য ও সমাজের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক বিষয়ে বলেছেন, 'সাহিত্য গড়ে ওঠে সমাজে, সমাজ-শাসিত ব্যক্তিমানসের স্বাধীন সৃষ্টিনিকেতন। সুতরাং সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ-দেশ-কালের ওতপ্রোত সম্পর্ক এবং ব্যক্তিমানস কদাচ উপেক্ষণীয় নয়।'[৮]

তাই, সাহিত্যে একটি জাতির ব্যক্তিত্ব নিহিত থাকে। বাংলা সাহিত্যে সবসময়ে বাঙালি ব্যক্তিত্ব বিরাজমান রয়েছে।[৯] সাময়িকভাবে তা হয়তো দাবিয়ে রাখা সম্ভব কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে বাঙালির ব্যক্তিত্ব যাকে বলা যায় বাঙালিত্ব। আর বাঙালিত্বের মূল বিষয় হলো–অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে যা বার বার ফুটে ওঠে। ধর্মীয় বা শাসকগোষ্ঠীর অপচেষ্টার কারণে মাঝে মাঝে হয়তো তা খেই হারিয়ে ফেলেছে কিন্তু সময়ের ব্যবধানে আবার তা ফিরে এসে স্বরূপে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের কবিদের রচনায় সমাজের দুর্দশার চিত্র ওঠে এসেছে। অর্থাৎ ধর্মের অন্তরালে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উপজীব্য ছিল–মানুষ ও সমাজ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সেন যুগে সংস্কৃতচর্চার পরিমণ্ডলে বাংলাভাষা ছিল উপেক্ষিত। তুর্কী আমলে (১২০১-১৩৫০) সমাজের উচ্চমঞ্চে ও সেনরাজ দরবারে সংস্কৃতচর্চা বেশ প্রবল ছিল।[১০] কিন্তু স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয়।[১১] এ যুগে বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় সমৃদ্ধ হয়। মুসলমান সুলতানগণ একইসঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম কবিকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেন।[১২]

পাকিস্তান আমলে প্রথম পর্যায়ে কবি সাহিতিকদের একটি অংশ ইসলামি অনুপ্রেরণামূলক সাহিত্য রচনা করলেও ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য সংগ্রামী বাঙালি ব্যক্তিত্বের প্রত্যাশা ও আবেগের ধারক হয়ে ওঠে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির ফলে তা ব্যাহত হয়। সামরিক আইন ও আইয়ুব খানের শাসন উপেক্ষা করে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত বাঙালির ব্যক্তিত্ব ছিল প্রতিবাদে প্রতিরোধে দুর্বার, মধ্যবিত্ত নেতৃত্বাধীন, গণতান্ত্রাভিলাষী। এ সময়ের বাংলা সাহিত্যও ছিল মূলত এই সংগ্রামেরই প্রতিফলন। ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রশ্নে স্বাধিকারের আন্দোলন ও সংগ্রামের পথ ধরেই মূলত অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে বাঙালি এগিয়ে গেছে। তাই ভাষার হরফ-বদল, ভাষা-সংস্কার, রবীন্দ্র-বর্জন প্রভৃতি সকল সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিরোধী চক্রান্ত বাঙালি নির্ভুলভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে।[১৩]

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা চলে। সক্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে করা হয় কারারুদ্ধ। জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা-বিকাশের গতিও এর ফলে বাধাগ্রস্ত হয়। পাঞ্জাবি বেনিয়া পুঁজিবাদী শক্তি তাদের শাসন ও শোষণকে দৃঢ়মূল করার লক্ষ্যে কেবল রাজনীতি-ক্ষেত্রেই নানামুখী পদক্ষেপ নিলেন না–সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তারা সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আইয়ুব খান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 'বিপ্লব' সাধনের অংশ হিসেবে সাতাশটি কমিশন গঠন করেন। অবশ্য অধিকাংশ কমিশনের উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই সাতাশটি কমিশনের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিএনআর, প্রেস ট্রাস্ট, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড (পূর্বাঞ্চল শাখা) ইত্যাদি সংস্থা যেমন প্রতিষ্ঠা করা হলো, তেমনি আদমজী, দাউদ ও অন্যান্য পুরস্কার প্রবর্তন এবং উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।[১৪] শাসকগোষ্ঠীর এ প্রলোভনের ফাঁদে পড়েছিলেন অনেক বড়ো বড়ো লেখক। তাই ষাটের দশকে এ দেশের লেখকদের চিন্তাধারা এবং কর্মধারায়ও ছিল বড়ো পার্থক্য। এ সম্পর্কে আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেছেন,

> কিছুসংখ্যক লেখক নিজের অন্তরের নির্দেশ পরিহার করে, বাহ্যস্বার্থের বশীভূত হয়ে অপক্রিয়াশীল কায়েমি-স্বার্থবাদী শক্তির তল্পিবাহক ও চাটুকার হিসেবে কাজ করেন এবং তাদের উচ্ছিষ্ট লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করেন। আবার কিছু লেখক আন্তরিকভাবেই রক্ষণশীল চিন্তাধারা ও কর্মধারার অনুসারী হন। রক্ষণশীলদের ভূমিকাও কল্যাণকর হতে পারে; কিন্তু অপক্রিয়াশীলদের ভূমিকা অত্যন্ত কুৎসিত। যে লেখকরা প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছিলেন, যাঁরা প্রগতিশীল বলে

> আত্মপরিচয় দিয়েছেন ও মহতের কাতারে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন, ... তাঁদেরই ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয় চিন্তা করে এই ব্যর্থতার কথা বলছি। অপরপক্ষ থেকে তো আশা করার কিছুই ছিল না।[১৫]

Bureau of National Reconstraction বা বিএনআর ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার নামে যে গোপন প্রতিবেদন তৈরি করে, তার মধ্যেই বাঙালির স্বাধীন সাংস্কৃতিক সত্তা বিনাশের পাকিস্তানি চক্রান্ত সুস্পষ্ট। বাঙালি-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে তারা ভারতীয় ও হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব শনাক্ত করে এবং পাকিস্তানের ধর্মাদর্শ-অনুযায়ী তাকে পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৬] ইসলামের ইতিহাস ও কিংবদন্তি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ধর্মীয় উদ্দীপনামূলক নাটক রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধভিত্তিক নাটক রচনার জন্য মুনীর চৌধুরীর নাম মনোনীত হয়। রফিকউল্লাহ খান এক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীকে মনোনীত করার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন,

> এ সময় মুনীর চৌধুরী ছিলেন পূর্ববাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি তথা নাট্যাঙ্গনের এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র মুনীর চৌধুরীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলো। তাঁকে দিয়ে লেখানো হলো–'রক্তাক্ত প্রান্তর'। মুনীর চৌধুরী অতীত ইতিহাসকে নাটকের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করলেন সত্য, কিন্তু নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো ব্যক্তিজীবনের হৃদয়যন্ত্রণা এবং যুদ্ধবিরোধী দৃঢ় প্রত্যয়, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মান্ধতা নয়।[১৭]

মুনীর চৌধুরী নাটক রচনা করেছিল কিন্তু সরকারের যে উদ্দেশ্য ছিল তা তিনি সফল হতে দেননি। কারণ তিনি সাম্প্রদায়িকতার ফাঁদে পা দেননি। সামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তা সত্ত্বেও তিনি উদার মানবতাবাদী প্রগতিশীল ও যুদ্ধবিরোধী চেতনাসমৃদ্ধ নাটক লিখেন।

পাকিস্তানি প্রশাসন লেখকদের নানা প্রলোভনে বিভ্রান্ত করতে উদ্যোগী হয়। এইসব প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' বা Pakistan Writer's Guild (৩১ জানুয়ারি, ১৯৫৯)। 'লেখক সংঘ' গঠন উপলক্ষ্যে ১৯৫৯ সালের ২০-৩১ জানুয়ারি করাচিতে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের ২১২ জন লেখকের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বপাকিস্তান থেকে ৪৭ জন লেখক-শিল্পী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। লেখক সংঘের ১২ সদস্য বিশিষ্ট পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৫৯ সালেই গঠন করা হয়। 'লেখক সংঘ'-প্রদত্ত নানামুখী সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অর্থনৈতিক দিকটি ছিল উল্লেখযোগ্য–যার আকর্ষণে অনেক প্রগতিশীল লেখকও জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে আপোসকামী হয়ে ওঠেন।[১৮]

লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখায় আশ্রয় গ্রহণকারী শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন দ্বিধান্বিত। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিক উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে বাঙালি আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানের প্রশ্নে দ্বিধামুক্ত হওয়ার অবকাশ পেলো বহুলাংশে। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠী, আমলাশ্রেণি এবং ধর্মান্ধ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথকে অনুশীলন ও অধ্যয়নের পরিবর্তে সংকীর্ণ ও আরোপিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পাকিস্তানি আদর্শের বিরোধী বলে রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনের পক্ষে প্রচার চালায়। কিন্তু শাসকশক্তির এ ধরনের সিদ্ধান্ত জাতিসত্তার নব-উজ্জীবনের কার্যকারণ হয়ে ওঠে। শাসকগোষ্ঠীর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপিত হয় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জনজীবনের ব্যাপক স্তরে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গ বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ ও বেগম সুফিয়া কামালকে কেন্দ্র করে এবং ঢাকা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বে তিনটি কমিটি গঠিত হয় বিশ্বকবির জন্মশতবার্ষিক উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে। ঐ তিনটি কমিটি শেষ পর্যন্ত সমন্বিতভাবে চারদিনব্যাপী বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতির মন-মনন, আবেগ, বিশ্বাস ও সংগ্রামের সঙ্গে এত নিগূঢ়ভাবে সংলগ্ন যে, জাতীয়জীবনের যে-কোনো অভিঘাত-আন্দোলন সর্বাগ্রে তাঁকেই স্পর্শ করে যায়। কালান্তরে রবীন্দ্রনাথ এ-কারণেই বার বার পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠেন বাঙালির জীবন ও শিল্পে, মেধা ও সৃষ্টিতে। নব্য-উপনিবেশপীড়িত ভূখণ্ডের চেতনালোকে একটা প্রেরণা, বিক্ষোভ, প্রত্যাশা ও সংগ্রামের উৎস হিসেবে অনির্বাণ জ্বলে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সুবিশাল সৃষ্টিলোক।

আইয়ুব খানের শাসনকালে বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যবহ ঘটনা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যসপ্তাহ' উদ্যাপন। সামরিক প্রশাসন যখন বিএনআর ও পাকিস্তান লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে, রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উদ্যাপনকে বাধাগ্রস্ত করে, বাংলা বানান ও লিপিসংস্কারে প্রয়াসী হয়ে সুদীর্ঘকালের বাঙালি ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে পাকিস্তানবাদী আদর্শে রূপদানের হীন চক্রান্তে লিপ্ত, তখন ১৯৬৩ সালের ২২-২৮ সেপ্টেম্বর ভাষা ও সাহিত্যসপ্তাহ উদ্যাপিত হয়। বিচিত্র অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে যেমন তুলে ধরা হয়, তেমনি জাতিসত্তার আত্ম-আবিষ্কারের প্রেরণা-উৎসও নির্দেশিত হয়। সে-কালের সাংস্কৃতিক জীবনে এটি একটি সাড়া-জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক অকৃত্রিম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে-অস্ফুট বিকাশ শুরু হয়েছিল সেকালে, তাই টেনে নিয়ে গেছে সবাইকে অনুষ্ঠানে দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকালে যে-ছাত্র আন্দোলন চলছিল, তার অন্যতম প্রেরণা ছিল নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ।[১৯]

৪৭ পূর্ব নাটক, উপন্যাস, কবিতা ও গল্পতে ধর্ম ও পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে রচনার প্রাধান্য ছিল। অপরদিকে ভাষা আন্দোলনের পর বাঙালিত্বের বিকাশ ও জাগরণ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে পরিস্ফুটিত হতে থাকে। বাঙালিত্বেও বিকাশ হতে থাকে এর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে। এ প্রসঙ্গে আলী ইমামের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য, চর্যাপদের ঐতিহ্য ধারাবাহিকভাবে নদী পরবর্তী অঞ্চলের পলল মাটির জলজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য। পাললিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালি চেতনা গড়ে ওঠেছে।[২০]

বাঙালিত্বের প্রভাব, পাললিক সংস্কৃতির প্রভাব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিদ্যমান ছিল তা ধীরে ধীরে আরও দৃশ্যমান ও স্পষ্ট হতে থাকে। অপরদিকে বাঙালিত্বের এই ধারাকে অবদমন করার জন্য আবার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লেখকগণ পাকিস্তানকেন্দ্রিক ও ধর্মকে কেন্দ্র করে রচনা করতে থাকে। ফলে দ্বান্দ্বিকরূপ আরও স্পষ্ট হয় এবং শেষ অবধি বাঙালিত্বের প্রভাব বেশি প্রসারিত হয় তা বাঙালিকে নতুন দেশ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতীয়বাদের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিকতা গড়ে উঠে তা কীভাবে ষাটের দশকের সাহিত্যে ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং তা কীভাবে জন-জাগরণে ভূমিকা রাখে করে তা কালক্রম অনুযায়ী তুলে ধরা হলো–

কবিতা

১৯৪৭-এর দেশবিভাগ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে শুধু দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে বিচ্ছিন্ন করে নি বরং বাংলা কবিতার আবহমান ধারায় স্থাপন করে এক ছেদচিহ্ন।[২১] ফলে অবিভক্ত বাংলায় যে ধারায় কবিতা রচিত হচ্ছিল তাতে আসে পরিবর্তন। বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে যে দোদুল্যমানতা ১৯৪৭-৭০ কাল-পরিসরে পরিব্যাপ্ত ছিল তার দ্বন্দ্বময় উপস্থিতি কবি-সাহিত্যিকদের চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই দ্বন্দ্বময় রাজনীতি ও সংস্কৃতিচিন্তা বিকাশের ইতিহাসের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে পূর্ববাংলার কবিতার ধারাটি বিকাশ লাভ করেছে।[২২] ৪৭ পরবর্তী প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল ভোগ-বিলাসমুক্ত শোষণহীন সমাজসৃষ্টি, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠীর অনাচারের প্রাবল্য ও এর বিরুদ্ধে নির্যাতিত জনসাধারণের প্রতিবাদ।[২৩] সমকালীন কবিমন একটা অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বৈরী রাজনীতি ও সংস্কৃতিচিন্তা দ্বারা। বায়ান্নো সালের ভাষা আন্দোলন সেই সংশয়কে কেবল দূরীভূত করলো না, বরং রূপান্তর সাধন করলো বাংলাদেশের কাব্যযাত্রার সামগ্রিক গতিবিধিকে। বাংলা কাব্যের ধারায় একুশ একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতে অবদান রেখেছে। রেনেসাঁ যেমন ইউরোপ তথা তাবৎ বিশ্বের মানবচৈতন্যে পরিবর্তন এনেছে, সাহিত্য ও শিল্পকে নবতর অভিধায় ব্যঞ্জিত করেছে; ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব যেমন সাহিত্য ও শিল্পে বৈপ্লবিক ধারা এনেছে, তেমনি বাংলা কাব্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে–মহান একুশ। একুশের চেতনা বাংলা কবিতাকে বাস্তব জীবনমুখী, সংগ্রামমুখী ও মৃত্তিকাস্পর্শী

করেছে।[২৪] কিন্তু **১৯৫৮** সালের সামরিক শাসনের উত্থান কাব্যযাত্রার সেই জীবনময় গতিবেগকে প্রতিহত করলো। শিল্পীর স্বাধীনতার জন্য গণতন্ত্র একটি মৌলিক পূর্বশর্ত, সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সামরিক শাসকগোষ্ঠী অবরুদ্ধ করে রেখেছিল।[২৫] তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সাহিত্যিকগণ সামরিক সরকারের বিধি-নিষেধ ভেঙে নিজেদের স্বাভাবিকতার দিয়ে এগিয়ে যায়। কারণ তারা দ্রষ্টা। দেশ-জাতি কোনো পথে যাবে তাদের দূরদৃষ্টি দিয়ে তা অনুধাবন করেন এবং সেই অনুযায়ী জাতিকে নির্দেশনা দেন। এ প্রসঙ্গে গীন্‌স্‌বার্গের উক্তি প্রণিধানযোগ্য[২৬],

> ..সমাজ ও সাধারণ সামাজিক মানুষ দেশকাল ও সরকার শাসিত কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব সমকাল-বন্ধন-ভেদী; কেবল যুগের প্রবাহে ভাসমান নয়, অনিবার্য আগামীর নির্দেশক; কখনো হয়তবা তিনি মানব সভ্যতার 'early warning radar system'.[২৭]

গীন্‌স্‌বাগের এই উক্তির প্রতিফলন আমরা এ সময়কার বাংলাদেশের কাব্যে দেখতে পাই। বাংলাদেশের কবিগণ তৎকালীন রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তারাও রাজনৈতিক গতি প্রবাহকে প্রভাবিত করেছে, তৈরি করেছেন সাধারণ মানুষের মানসজগৎ। এভাবেই তৎকালীন কবিগণ বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমিতে পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শুধু এই সময়েই নয়, বাংলার রাজনীতিতে কবি-সাহিত্যিকদের এই ভূমিকা সবসময় দেখা গেছে। ব্রিটিশবিরোধী একটি সফল আন্দোলনের পর এ দেশের কবিরা শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা তাদের কবিতাতে তুলে ধরার পাশাপাশি নান্দনিক নির্মাণকলার দিকে নজর দিচ্ছিলেন। তাই চল্লিশের দশকের কবিদের একটি বড়ো অংশ মার্কসবাদী সাম্য এবং মুসলিম কবি ইসলামের ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। ষাটের দশকে পাকিস্তানকে টিকে রাখতে চায় এমন কিছু কবি ছাড়া সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে খুব শিগগিরই গণআন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।[২৮]

কবিতায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালিত্বের দ্বন্দ্ব

পাকিস্তানি রাষ্ট্রের সূচনাপর্ব থেকে শাসকগোষ্ঠী নিজ দেশের একাংশকে শোষণ করার নীতি অবলম্বন করে। শাসকগোষ্ঠীর শোষণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বাঙালিত্বের ঐক্যবোধের উন্মেষ হয়। এ শোষণ-প্রক্রিয়া শাসকগোষ্ঠী দুইভাবে করে–এক. আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে; দুই. কুসংস্কার-বিশ্বাস ও ধর্মভীতির সাহায্যে।[২৯] পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রভাবে **১৯৪৭**-এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ইসলামি বিষয় অবলম্বনে কবিতা-রচনার রেওয়াজ শুরু হয়। পাকিস্তানের আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তা অব্যাহত থাকে।[৩০] পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার সর্বস্তরে। অর্থাৎ পাকিস্তানবাদী ধারা ছিল–ধর্মাশ্রয়ী ও সামন্ত মূল্যবোধের পৃষ্ঠপোষক। অন্যদিকে পূর্ববাংলার তরুণদের মনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবেদন হ্রাস পেতে থাকলে পাকিস্তানবাদী ধারাটি ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে আসে।[৩১] ফলে পূর্ব বাংলার তরুণদের মধ্যে দৃশ্যমান হয় প্রাকৃতিক ঐতিহ্য মিশ্রিত আবহমান বাঙালি ধারা। যা প্রগতিশীল ধারা বলে পরিচিত। একদিকে ইরান ও আরবের সংস্কৃতি ও পুরাকথা, উপন্যাস এবং কুরআন-হাদিসে উল্লিখিত কাহিনি, মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব এবং ভাবধারার ঐতিহ্য এ সময়ের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য।[৩২] অন্যদিকে বাংলার যে চিরয়াত ঐতিহ্য ও তার ব্যবহার। বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য যে কবিতার বিষয় হতে পারে এই ধারার কবিগণ তা নিজেদের রচনায় মাধ্যমে তুলে ধরতে পেরেছেন। পঞ্চাশের দশকে সৃষ্ট নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বারা কবিতায় একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। এই কবিগণ বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যকে তাদের কবিতার প্রধান উপজীব্য করলে এই ধারাটি শক্তিশালীরূপে বিকাশ লাভ করে।[৩৩]

আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদসহ এক ঝাঁক কবি এ ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। দীর্ঘ গ্রামজীবন-অভিজ্ঞতার সাথে নগরজীবন ও শিল্প-অন্বেষার সমন্বয় এ পর্যায়ের কবিতায় স্বতন্ত্র অভিনিবেশ যুক্ত করেছিল। লোকজ জীবন ও সংস্কৃতি থেকে কাব্য-উপাদান আহরণ করে তার মধ্যে

সঞ্চার করেছেন নগরচেতনা ও গতি। জীবনাবেগের এই নবতর উন্মোচন বাংলা কবিতার ধারায় এক বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল সংযোজন।[৩৪] কবি আল মাহমুদ-এর *সোনালি কাবিন* কাব্যের 'সোনালি কাবিন' কবিতায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় :

বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই
দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর,
লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই
হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর।
কথার খেলাপ করে আমি যদি জবান নাপাক
কোনদিন করি তবে হয়ো তুমি বিদ্যুতের ফলা,
এ-বক্ষ বিদীর্ণ করে নামে যেন তোমার তালাক
নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা।
রাতের নদীতে ভাষা পানিউড়ী পাখির ছতরে,
শিষ্ট ঢেউয়ের পাল যে কিসিমে ভাঙে ছল ছল
আমার চুম্বন রাশি ক্রমাগত তোমার গতরে
ঢেলে দেবো চিরদিন মুক্ত করে লজ্জার আগল
এর ব্যতিক্রমে বানু এ-মস্তকে নামুক লানৎ
ভাষার শপথ আর প্রেমময় কাব্যের শপথ।[৩৫]

'সোনালি কাবিন' কাব্যে কবি বাংলা প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, নারী ও প্রেম, কৃষ্টি প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল–ধর্ম ও আরব-পারস্য মিথ। এর পরিবর্তে এ সময়কার বাংলার তরুণ কবিগণ বাংলার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লিখে নিজ সংস্কৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো শুরু করেন। কৌম সমাজোদ্ভূত অনার্য নায়ককে দেখা যায়–*সোনালী কাবিন*-এ।[৩৬] বাংলার লোকজীবন-সংস্কৃতি-সন্ধানী অন্যতম কবি আল মাহমুদ তাঁর *লোক লোকান্তর* (১৩৭০) কাব্যে যে জীবন পটভূমির কথা বলেছেন, সেখানে স্পষ্ট বিক্ষোভের কথা নেই সত্যি, কিন্তু জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে জাতীয় মানসের এক নবতর বিন্যাস সাধিত হয়েছে।[৩৭] অর্থাৎ বাংলার ঐতিহ্য নিয়ে রচিত তাঁর কবিতাগুলো বাঙালিত্বের চেতনা বৃদ্ধি করে।

পূর্ববাংলার প্রবহমান ঐতিহ্য, লোকজ জীবন, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শহিদ দিবস ও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে বিষয় করে রচিত জাতীয়তাবাদী-চেতনামূলক কবিতা-রচনার সূচনা হয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনটি এ-ধারার পথিকৃৎ। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এ-ধারার আর কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নজরে পড়ে না, যদিও পূর্ববাংলার স্বাতন্ত্র্যবিনাশক পাকিস্তান সরকারের নীতির প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিত্ববোধটি যে সংহত হচ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যায়, শেখ মোছলেম আহমদ-এর একটি কবিতায়। যেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দেওয়া আর নিরাপদ নয়, বরং মুসলমান বলাটাই সুবিবেচনাপ্রসূত। কবির এই কথার দ্বারা পাকিস্তানি শাসকদের যে শোষণ ও নির্যাতন তা ফুটে ওঠে। ৪৯নং চর্যায় কবি ভুসুকু 'আজি বঙালী ভইলি'[৩৮] যে নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন, রূপান্তরিত প্রেক্ষাপটে এ সময়কার বাঙালি কবিও তদ্রুপ নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। যেখানে একটি জাতি শাসকদের চাপে নিজের পরিচয় তুলতে ধরতে পারে না। সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটতে থাকায় কবিতার নববিকাশ লক্ষণীয় হয়। এই সময়ে একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ক কবিতাবলিতে প্রকাশিত হয়েছে অসহায়তা ও আশাভঙ্গের চিত্র। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও কবিচিত্তে তার অনিবার্য উপস্থিতি নিয়ে পূর্ববাংলা নতুন তাৎপর্যে ধরা দিতে শুরু করেছে এ সময় রচিত সৈয়দ আলী আহসান-এর 'আমার পূর্ববাংলা', অথবা 'সম্ভাব্য অনন্যা'র ও 'সূর্য অন্যতর' কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলিতে। 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতায় বাংলার প্রকৃতির কথা তুলে ধরেছেন,

আমার পূর্ববাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
... ...
আমার পূর্ব-বাংলা বর্ষার অন্ধকারে
অনুরাগ
হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া
সিক্ত নীলাম্বরী

'আমার পূর্ববাংলা' কবিতায় একসাথে সমগ্র বাংলাদেশের একটি অখণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। অর্থাৎ কবিগণ শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু এড়াতে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।

এই ধারার বিকাশে আরও বৈচিত্র্য ও গভীরতা এসেছে শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে রচিত কবিতাসমূহের মাধ্যমে। এ কবিতাগুলোয় মুখ্য হয়েছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবাদী বক্তব্য; বাংলাভাষা সংস্কারের মুখে রচিত হয়েছে আবেগোদ্বেল কবিতা, পূর্ববাংলার জনজীবনের দুর্দশাকে কবিগণ কবিতায় এনেছেন বেদনা ও দরদের সঙ্গে, কেউ কেউ লোকায়ত ঐতিহ্যকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে উপজীব্য করেছেন বাংলার প্রাণশাক্তিকে উপলব্ধি ও আবিষ্কারের আশায়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রবল প্রতাপে অবক্ষয়ী সমাজের প্রচলিত রীতির প্রতি তাদের আস্থা আর ছিল না।[৩৯] **১৯৬৯-৭১**-এর পর্বে কবিতায় এই বোধ আরও তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে হাজির হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিচিত্র বিধান নিয়ে কবিগণের রচিত ব্যঙ্গ কবিতা 'আর্তনাদে বিবর্ণ' ও 'বৃশ্চিক লগ্ন'-এ পূর্ববাংলাকে মুক্ত করার বাসনা প্রকাশ পায়। রাজনৈতিক ধারার কবিতায় কবির উচ্চারণ এ পর্বে আত্মকুণ্ডলায়ন থেকে বের হয়ে আসা প্রদীপ্ত ধ্বনি। শামসুর রাহমানের *নিজবাসভূমে*, সৈয়দ শামসুল হকের *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* ও নির্মলেন্দু গুণের *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* প্রভৃতিতে কবিগণ হয়ে ওঠেছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের খোলস-ভাঙা বৃহৎ বাঙালিসমাজের আবেগের প্রতিনিধি। **১৯৭১** সালে ফেব্রুয়ারি-মার্চে রচিত অধিকাংশ কবিতা পূর্ববাংলার স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও সংগ্রাম বিষয়ক।[৪০] এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ বিশেষ করে ভিয়েতনাম, কঙ্গো, কোরিয়া শোষকদের তাড়িয়েছে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে।[৪১] এ আন্দোলনগুলোর প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও প্রেরণা বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কবিগণের মানসজগতে পরিবর্তন

পূর্ব বাংলার কবিগণের অধিকাংশেরই মানসভিত্তি গঠিত হয়েছিল তিরিশ-চল্লিশের দশকে, বিভাগোত্তরকালে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের চেতনায় ঐ প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। এদের একাংশ কাব্য-নির্মাণের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী পর্যায়েও রয়ে গেলেন পাকিস্তানিপন্থি, অতীতপন্থি ও প্রগতিবিমুখ। অন্যদিকে একদল কবি ছিলেন, যাঁদের কাব্যরচনায় উন্মেষ ঘটেছিল সমাজ, কাল ও জীবনের সাম্প্রতিকতার অঙ্গীকার। তাঁরা সমাজকাঠামোর অন্তর্গত স্বরূপকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন।[৪২]

দেশবিভাগের পর বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের যেসব কবি পাকিস্তানকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন এবং পরবর্তীকালে তারাই আবার পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতি হতাশা ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়ে সব থেকে বড়ো উদাহরণ সিকান্দার আবু জাফর। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সিকান্দার আবু জাফর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধানযোগ্য,

> ... সিকান্দার আবু জাফরের মানসপটভূমি গড়ে উঠেছে চল্লিশের বাংলা কাব্যভাবনার এক শক্তিশালী অংশকে কেন্দ্র করে। তিনি তাই কাল ও সমাজসচেতন, বৃহৎ বক্তব্য-সন্ধানী, উচ্চকণ্ঠ ও স্পষ্টভাষী। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সুকান্ত

ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর সমমর্মিতা তাই প্রত্যক্ষ। কালসচেতনার কারণেই চল্লিশের বাঙালি মুসলমান কবিদের মতোই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনেরও পতাকাবাহী।[৪৩]

কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় সেই সিকান্দার আবু জাফর বাঙালিদের জাগরণের মূল কবিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অর্থাৎ দেশবিভাগের পর বাংলা সাহিত্যের কবিদের অনেকেই যারা পাকিস্তানিবাদী কবিতা রচনা করেছেন তারাই আবার বাঙালিদের জাগরণে ভূমিকা পালন করছে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সিকান্দার আবু জাফর সম্পর্কে যে মন্তব্য তা এ সময়কার অনেক কবির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। কীভাবে কবি মানসের এই পরিবর্তন হয়েছে তা এখানে তুলে ধারা হয়েছে–সিকান্দার আবু জাফর-এর দ্বিতীয় কাব্য *তিমিরান্তিক* (১৯৬৫)-এ রয়েছে পাকিস্তান আমলের প্রথম ছ-সাত বছরের কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে। সংগতকারণেই প্রথম দিকের কবিতাসমূহ প্রবল আশায় দীপ্ত। 'নবাঙ্কুর' কবিতায় তিনি বলেছেন, অত্যাচারীর দিন শেষ হয়েছে, এবারে বঞ্চিত ও পীড়িতেরা মাথা তুলে দাঁড়াবে।

অন্ধকার ফাটলের লক্ষ লক্ষ মুখে
অজ্ঞাত বীজের বুকে প্রভাতের জেগেছে অঙ্কুর
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্য নহে বেশী দূর॥[৪৪]

ব্রিটিশ শাসনের ফলে বাংলায় অন্ধকার নেমে এসেছিল। কবি ব্রিটিশ শাসনের অবসানকে প্রভাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেই সাথে আশা করেছেন নব্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। যেখানে থাকবে না কোনো শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতন। নব্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে বাঙালিরা খুব ভালো থাকবে এমনটি তিনি আশা করেছেন।

সিকান্দার আবু জাফর নয়, পাকিস্তানের সৃষ্টিতে তৎকালীন বেশিরভাগ কবির মতোই কবি সৈয়দ আলী আহসান খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। অন্ধকার থেকে আলোর অভ্যুদয়ের সঙ্গে তিনি এর তুলনা করেছেন। কবি আবেগদীপ্ত ভাষা লিখেছেন,

এসেছে নতুন দিন,
ভয় নাই আর, আলোক উঠেছে হাসি,
গভীর তিমির বেদনায় গড়ে ঢুলে।
ঋয় নাই আর ভয় নাই,
শংকাহরণ, অভয়মন্ত্র, শোন শোন কান পাতি।[৪৫]

শুধু সিকান্দার আবু জাফর বা সৈয়দ আলী আহসান নয় এই সময় বেশিরভাগ কবি তাদের কবিতায় সমৃদ্ধ শোষণ মুক্ত পাকিস্তানের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই কবিগণের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ১৩৫৭ সালে সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'আমি আর কবিতা লিখিনা' কবিতায় তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়,

সেদিনের সেই ইতিহাস
আজ আর সত্য নয়
মৃত্যুহীন পৃথিবীর অশেষ যন্ত্রণা
আজ হলো একান্ত অক্ষয়
তাই আজ আমি আর কবিত লিখিনা।[৪৬]

যে পাকিস্তানি কবি আশা করেছিলেন তা বাস্তবে দেখতে পাননি। তাই কবি হতাশ হয়ে এ ধরনের কবিতা লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কবির রচনায় ঐতিহ্য-চেতনা, সৌন্দর্যবোধ এবং স্বদেশপ্রীতি সবই খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* (১৯৬২) কাব্যগ্রন্থের 'আমার পূর্ববাংলা' তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কবিতায় নব্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের সমাজে যে কালো মেঘের ছায়া ঢেকে ফেলেছে সে বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে ফুটে তুলেছেন। এর ফলে তাঁরা আশা-নৈরাশ্যের তিমিরে ঢেকে যায়। এই পরিবর্তন প্রথম কবিতায় আসে ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক হয়ে।

একুশের ঘটনা বাংলা কবিতায় কী ধরনের পরিবর্তন এনেছিল তা বোঝা যাবে একুশের আগে ও পরে প্রকাশিত দুটি সংকলনের কবিতা তুলনা করলে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত *নতুন কবিতা* সংকলনের কবিতাগুলো ছিল স্বপ্নিল মাধুর্য ও স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরা। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনের কবিতা হয়ে উঠেছিল শোকাবহ বেদনা ও ক্ষুব্ধ অঙ্গীকারে উচ্চকিত ও দৃপ্ত। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত *নতুন কবিতা* সংকলনে শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন :

চাঁদ ফুল পাখি মেঘ নক্ষত্র শিশির
আর নারীর প্রণয়
আজো মিথ্যা নয়।[৪৭]

কবি প্রকৃতি ও নারীকে নিয়ে কবিতা লিখছেন। সৌন্দর্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। সেই কবি ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনে তিনি লিখেছিলেন :

আর যেন না দেখি কার্তিকের চাঁদ কিংবা
পৃথিবীর কোনো হীরার সকাল,
কোনোদিন আর যেন আমার চোখের কিনারে
আকাশের প্রতিভা, সন্ধ্যানদীর অভিজ্ঞান আর
রাত্রির রহস্যের গাঢ় ভাষা কেঁপে না ওঠে।
...   .
তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব,
পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করে দাও
উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্বর অস্তিত্ব
নিশ্চিহ্ন করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও।[৪৮]

কবিকণ্ঠে এভাবেই প্রভাব পড়েছিল বেদনা, ক্ষোভ ও যন্ত্রণার। একুশের চেতনা বাংলা কবিতার অঙ্গনে জন্ম দিয়েছিল সমাজ-সচেতন, দায়বদ্ধ অনেক নতুন কবির, যাঁরা নারী ও নিসর্গকে নিয়ে রোমান্টিক ভাবালুতায় নিমগ্ন হওয়ার পথ থেকে সরে এলেন। তাঁরা কবিতায় লিখলেন রক্ত আর অশ্রুর কথা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা। সমাজ ও মানুষ, স্বদেশ ও বিশ্বকে নিয়ে ভাবলেন এবং মানব মুক্তির স্বপ্ন দেখলেন। তাঁদের কবিতায় ফুটে উঠল স্বদেশের রক্তাক্ত ছবি। কবিতা তাঁদের হাতে হয়ে উঠল সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার।[৪৯] এই ধারার কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমান ছাড়াও আরও ছিলেন–হাসান হাফিজুর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ও আবদুল গনি হাজারী। তাদের কবিতায় সম্পূর্ণ কাব্যিক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে–ভাষা আন্দোলন। কিন্তু সিকান্দার আবু জাফর প্রথম দিকে একুশে ফেব্রুয়ারিকে নির্লিপ্ত দর্শক হয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন।[৫০] পরবর্তীকালে তিনি 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৪) নামে কবিতা *তিমিরান্তিকে* (১৯৬৫) ও *বৈরীবৃষ্টিতে* (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থে একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে লিখেছেন।[৫১] পাকিস্তানের পরবর্তী সময়ে তিনি আবার পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামের প্রতি হতাশা ব্যক্ত করেছেন। কবিতা, নাটক ও গান মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের মানসগঠন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

পাকিস্তানি আমলের প্রথম পর্যায়ের ঘটনাবলির নীরব দর্শক সিকান্দার আবু জাফর-এর নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পূর্বেই এলো পাকিস্তানি দুঃশাসনের দারুণ আঘাত। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলেন। এরই সাথে জনগণের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে নেমে আসে অন্ধকার। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর সিকান্দার আবু জাফর ১৯৫৯ সালে 'অনিবার্য' কবিতাটি লেখেন। সে সময় জনতার ন্যূনতম অধিকারকে দাবিয়ে রাখবার, জনগণের অভ্যুত্থানকে জোর করে পদানত করে রাখবার যে চেষ্টা তারই ইঙ্গিত এবং ভবিষ্যতের বিদ্রোহ ও আশা, দুই-ই কবিতাটিতে স্পষ্ট।[৫২]

এখন গভীর রাত্রি। নেমেছে অরণ্যে

তাই শূন্য নিস্তব্ধতা জটিল মৃত্যুর
নিস্তব্ধতা ঘুম নয়-ঘুম ঘুম ভান।[৫৩]

কবি সিকান্দার আবু জাফর একই কবিতার শেষ স্তবকে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে বর্তমান দুর্দিন, অনাচার অত্যাচারের মধ্যেই নিহিত ভবিষ্যৎ স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ।

মাটির বুকের শব্দে তবু সন্তর্পণে
বিষণ্ন চেতনা মেলে ইতিহাস খোঁজা
রাত্রি যত সুগভীর-সরব ক্রমশ
অনিবার্য প্রভাতে জীবন্ত প্রত্যয়।[৫৪]

সামরিক শাসনকে কবি গভীর রাত্রির সাথে তুলনা করেছেন। সামরিক শাসনের নিষ্পেষিত জাতি। কথা বলার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। মানুষের প্রতিবাদ করার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু মানুষের মনে অসন্তুষ্টি বিরাজ করছিল। মানুষ যে প্রতিবাদ করতে পারছে না এটাকে কবি ঘুমের সাথে তুলনা করতে নারাজ ছিল। এটাকে কবি ঘুমের ভান বলেছেন। যেকোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটবে এবং মানুষ প্রতিবাদ করবে। কারণ, দ্রোহ হলো বাংলার অন্যতম ঐতিহ্য। যখনই বাঙালিকে শোষণ করা হয়েছে তখনই এই ভূখণ্ডের মানুষ প্রতিরোধ করেছে, বিদ্রোহ করেছে। সামরিক শাসক আয়ুইব খানের আমলে শোষণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাই প্রতিরোধ ছিল অনিবার্য। কবির ভাষায়ও তার আভাস পাওয়া যায়।

কবি সিকান্দার আবু জাফর দেশবিভাগ, ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত আইয়ুব শাসনকে এ রূপক ধরে ১৯৫৯ সালে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতা লিখেছেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পরই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রাথমিক বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। কবি এদেশীয় একটি শ্রেণির পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হীনভাবে হাত মেলানো ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৫৫]

আগোছালো ঝড়ে এলোমেলো ভাঙা
শাখার স্বপ্ন কিছুক্ষণের বোবা সন্ত্রাসে তখন ক্লান্ত .....
সেই অবসরে কিছু কুণ্ঠিত
এসেছিল এক
যাত্রী।[৫৬]

পরবর্তী পর্যায়ে সেই কুণ্ঠিত যাত্রী দুর্বার গতি পেয়ে–

হঠাৎ হ'ল সে
ঘোড়সওয়ার। .....
মুটি ভরে নিল অনেক অজেয়
ব্যাপ্তি
এখানেই তবু স্থবির হ'ল না
অকরুণ ইতিবৃত্ত।[৫৭]

সচেতন ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব কবি বাঙালির মধ্যে ফোটাতে চেয়েছেন সেই আত্মবিশ্বাস যা তাঁকে পৌঁছে দিবে কাঙ্ক্ষিত চাওয়ায়। তাই কবি লিখেছেন,

কারো অযাচিত করুণায় নয়,
সূর্যের দান নিজেই সে নেবে
চিত্তে।[৫৮]

পাকিস্তানকে যে-কবি ভেবেছিলেন নিরাপদ আশ্রয়, সে-কবির স্বপ্নসাধ ভেঙে খান-খান হয়ে গিয়েছিল। *বৈরী বৃষ্টিতে* কবির অভিজ্ঞতা আরও নতুন সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। বাবাকে লেখা পুত্রের 'ঈদের চিঠি' (১৩৬৫) তে দরিদ্র গণ-মানুষের

প্রতি কবির সহানুভূতি যেমন হৃদয় মথিত করে উত্থিত হয়েছিল, তেমনি নতুন আবাসভূমি পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। যে বছরের কথা কবি লিখেছেন, সে-বছরে বন্যায় প্লাবিত সারা দেশে হাহাকার উঠেছিল। বন্যায় ভেসে গেছে জরাজীর্ণ কুটির; নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেছে ছোটো খোকা, মাটির অভাবে লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল বন্যার পানিতে, বন্যার পর এলো নতুন সংকট–দারিদ্র্যের আঘাতে ছিন্নমূল হলো বহু পরিবার, ক্ষুধার তাড়নায় যুবতি লালসার পণ্য হয়ে চলে গেছে। খাদ্য আর সাহায্য এলেও গরীবের ঘরে তা গেলো না।[৫৯] এসব দেখেশুনে ক্ষুব্ধ কবি *বৈরী বৃষ্টিতে* (১৯৬৫) কাব্যে 'ঈদের চিঠি' কবিতায় পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন–

ইঁদুরের হাত থেকে শস্যকণা বাঁচাবার
ভার নিল যাঁরা,
তারাও ইঁদুর হলো প্রথম সুযোগে।
সারা দেশ ঘিরে আছে আত্মকেন্দ্র
চিন্তার বিলাস,
মানুষের শবদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে
শকুন হবার সাধ জেগে আছে সকলের বুকে।[৬০]

কবি এই কবিতায় স্পষ্টভাবে পাকিস্তানি শাসকদের বিপক্ষে বলেছেন। তিনি ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাননি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই শাসকগোষ্ঠী শোষণকারীতে পরিণত হয়। বাঙালির অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সিকান্দার আবু জাফর আশায় ছিলেন যে স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তা বিলম্বে হলেও বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু আশার পূরণের কোনো লক্ষণ তিনি দেখতে পেলেন না বরং দীর্ঘ অপেক্ষার পালা শেষ হলো। ১৩৫৯ সালের প্রথম দিকে *তিমিরান্তিক* কাব্যে কবি '১৩৫৯' কবিতাটিতে নিজেদের দেশের (পাকিস্তানের) সমাজ ব্যবস্থাকে কল্পনা করেছেন একটি কবরের সঙ্গে; অবশ্য একইসঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, এ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে, মানুষ রুখে দাঁড়াবে এবং মানুষের অকল্যাণ একদিন লাশ হবে–

কোনো একদিন
এ-কবরখানা বিস্ফোরণে গুঁড়ো হবে
লীন হবে সুবিশাল একটি কবরে,
মানুষের অকল্যাণ লাশ হবে
সেদিন সেখানে।[৬১]

অর্থাৎ ব্রিটিশ শোষণ থেকে মুক্ত পাকিস্তানকে কবি নিজের স্বপ্নের দেশ হিসেবে দেখেছিল। সেই কবি পাকিস্তানকে কবরের সাথে তুলনা করছেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করছেন বাংলা মানুষ রুখে দাঁড়বে। সেদিন অকল্যাণ দূর হবে এবং শোষণ মুক্ত দেশ পাবে বাংলার জনগণ। কিন্তু সে আশা বাস্তবে আর আসেনি। তাই, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতৃষ্ণা চলে আসে। তাদের স্বপ্ন ভঙ্গের জন্য জনগণ দায়ী করে শাসকগোষ্ঠীকে। সাধারণ মানুষের মনে যে বিতৃষ্ণা, হতাশা ও ক্ষোভ সেগুলোকে কবি তার কবিতায় রূপান্তর করেন। তাই কবি সিকান্দার আবু জাফর *বাংলা ছাড়ো* কাব্যে পাকিস্তানিদের বাংলা ছাড়ার কথা বলছেন। কবির ভাষায়–

অসম্মানের বিষে
তিক্ত প্রাণের শ্বাপদ নখের জ্বালা,
কাজ কি চোখের প্রসন্নতায়
লুকিয়ে রেখে প্রেতের অট্টহাসি!
আমার কাঁধেই নিলাম তুলে আমার যত বোঝা;
তুমি আমার বাতাস থেকে
মোছো তোমার ধূলো,

তুমি বাঙলা ছাড়ো।[৬২]

কবি যে পাকিস্তানিদের বাংলা ছাড়ার কথা বলেছেন তা তার নিজের কথা নয়। বাংলার জনগণের মনের কথা কবি তার কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিল। বাংলার মানুষ দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর এই শোষণের ফলে যে বঞ্চনাবোধ তা লুকিয়ে রাখতে কবি নারাজ। কবি নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের কাধে নেওয়ার কথা বলেছেন এবং পাকিস্তানি শাসকদের বাংলা ছেড়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ বাঙালির স্বাধীনতার কথা বলছেন কবি। কবিগণ শাসকগোষ্ঠীর শোষণের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর বিপক্ষে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন। কবিগণ লেখার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

কবিতায় পাকিস্তানি রাজনীতির প্রতিফলন

সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর পূর্ববাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের আদর্শ-বিরোধী বিভিন্ন শক্তির বিকাশ ঘটে। এই শক্তিগুলোর মূল ভিত্তি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা। এভাবে পরস্পরবিরোধী দুই শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতি প্রবাহিত হচ্ছিল।[৬৩] এই দুই শক্তির মধ্যে বিরোধ শুধু রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা ক্রমশ প্রসারিত হয় শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তায়ও। মুসলিম লীগের আদর্শ-বিরোধী বাঙালির ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের মূল অবলম্বন ছিল ভাষা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত করে। এরপর থেকে বাংলা ভাষা আন্দোলন ও ভাষাকেন্দ্রিক বিভিন্ন রচনা হতে থাকে। একুশের প্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম রচিত হয় একটি কবিতা। চট্টগ্রামের সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক এবং *সীমান্ত* পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবুল আলম চৌধুরী একুশের ঘটনার কথা শুনে সে দিনই লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত কবিতাটি : 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি।'[৬৪] পাকিস্তান সরকার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কবিতাটি নিষিদ্ধ করে। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাঁকবদলের প্রতিটি পর্যায়ে এই কবিতাসহ একুশের বিভিন্ন কবিতা সাধারণ জনতাকে অনুপ্রেরণা দান করে। শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা জোগায়। পুরো পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলাদেশের কবিগণ পাকিস্তানি শোষকদের বিপক্ষে কবিতা রচনা করেন। তারা বাঙালিকে ভুলতে দেন নি, তাদের সাথে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৫২ সালে কী করেছিলেন।

পাকিস্তানপন্থি রক্ষণশীলরা প্রতিনিয়ত প্রগতিশীলদের সকল প্রকার কার্যক্রমের বিপক্ষে সমালোচনামূলক কবিতা রচনা করে। রক্ষণশীল কবিদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল নতুন শক্তিসমূহ ও এতে বিশ্বাসী নেতা-কর্মীরা।[৬৫] ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কাগমারীতে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন করেছিলেন। কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ছিল বাঙালিত্বের পক্ষে একটি বড়ো পদক্ষেপ। যা পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একটি বাঁকবদলকারী ঘটনা। সম্মেলনের পরিকল্পনা ও সাফল্যে বিচলিত হয়ে রক্ষণশীল দলগুলো এর নানারূপ সমালোচনা শুরু করে।[৬৬] রক্ষণশীল দলগুলোর সাথে সাথে রক্ষণশীল কবি-সাহিত্যিকরাও তাদের লেখার মাধ্যমে প্রগতিশীল ও বাঙালিত্বের বিপক্ষে আক্রমণ করতে থাকে। কবি গোলন্দাজ তাঁর রচিত ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনকে এবং সম্মেলনের সাথে যুক্ত কবি-সাহিত্যিকগণের ওপর আক্রমণ করেন :

ভোঁতা বুদ্ধি মোথা কাজী
      আশীর্বাণী বচন পান,
আসল কথা রাখেন চাপা
      মা প্রকৃতির সুসন্তান ॥
নাটের গুরু বিরোধ স্যান্ডাল
      খোঁজেন কোথা শ্রী হনুমান,
মিলনকেন্দ্র হচ্ছে খাঁটি
      ভাবেন তারা নয় অনুমান ॥

...   .

'বিশ্বশান্তি' বিড়ি টেনে

ওরাং ওটাং দেয় শ্লোগান,

মোহান্তজী দেয় শুনিয়ে

'সেলামেলাকম পাকিস্তান'॥[৬৭]

এখানে কাজী ও বিরোধ স্যান্ডাল নামের আড়ালে যথাক্রমে কাজী মোতাহার হোসেন ও প্রবোধকুমার সান্যালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং মওলানা ভাসানী হয়েছেন মোহান্তজী। ভাসানী সম্মেলনে পাকিস্তানি আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় সত্তাকে 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' জানিয়েছিলেন। শেষোক্ত অংশটি তার ইঙ্গিতবহ।

পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে যে কবি-সাহিত্যিকরা 'জিন্দেগানীর দূত' হিসেবে দেখেছেন। সেই পাকিস্তানের যাত্রাপথকে কবি আবদুল গণি হাজারী, 'নমরুদের পথ' হিসেবে চিহ্নিত করে। কবি পাকিস্তানবাদের বিরোধিতা করে এবং তার বিরুদ্ধে কবিতা লেখার সূচনা করেছিলেন। নমরুদের সেই পথ থেকে উত্তরণের প্রেরণা হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন একুশের চেতনাকে। তাঁর *সামান্য ধস* (১৯৫৯) কাব্যগ্রন্থের 'ভালোবাসি বলেই' কবিতার অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

অনেক মৃত্যুকে বুকে করে আমাদের বেঁচে থাকা

অনেক ঝড়ের পীড়ন পাঁজরার তলে

...   .

এত মৃত্যুর কথা স্মরণ করেই

আমাদের আয়ু মৃত্যুহীন

আর তোমায় ভালোবাসি বলেই

জীবন আমার

এত সহজে প্রাণ দিয়ে যাই।[৬৮]

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে ভালোবাসার জন্য বাহান্নের একুশে ফেব্রুয়ারিতে জীবন দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলেরা। বাঙালিরা ছেলে হারানোর সেই যন্ত্রণার কথা ভুলতে পারে নি। শহিদ জননীদের কান্নার ধ্বনি এরপর থেকে বাংলার আকাশ-বাতাশকে নিস্তব্ধ করে রাখতো। এ কান্না ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করে বাঙালি প্রতিনিয়ত তার প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। মাতৃভূমিকে ভালোবেসে তাই বাঙালি প্রতিটা মুহূর্তে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন বাঙালির জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রেরণার একটি উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির পর থেকে পাকিস্তানের সার্বিক ব্যবস্থায় আরও অবনতি হয়। প্রকাশ্যে রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। জনগণের বাক্ ও চিন্তার স্বাধীনতা রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটা ক্ষেত্রে বাঙালিকে শোষণ করা হয় আরও বেশি মাত্রায়। কবি বুলবুল খান মাহবুব তার কবিতায় পাকিস্তানের রাজনীতির কয়েকটি বছরের ঘটনা তুলে ধরেছেন। তিনি 'কয়টি বছর আটান্ন থেকে' শিরোনামে কবিতায় রূপকভাবে পরিস্ফুটিত করেন পাকিস্তানের তৎকালীন পরিস্থিতি–

কয়টি বছর আটান্ন থেকে

সূর্য আর আলো দেয়নি; চাঁদ

মৃত জ্যোৎস্নার কফিনে বন্দী শুধু

জ্বলে জ্বলে পুড়ে আলো দিয়েছিলো

কয়েকটি উল্কা শিশু

তবু তো আমরা হেঁটেছি।[৬৯]

কবি বলেছেন সূর্যালোক ও চাঁদের জ্যোৎস্না নষ্ট হয়ে সারা দেশটা গভীর অন্ধকারে ডুবে গেছে এবং অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে চলছে একদল মানুষ। সামনে কোনো আলো দেখতে পাচ্ছে না। তৎকালীন পাকিস্তানের এই অবস্থার জন্য দায়ী মূলত শাসকগোষ্ঠী। যাদের উৎখাত করে সমাজে শান্তি আনতে হবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এদের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। 'রক্তের কারুকাজ' কবিতায় কবি বুলবুল খান মাহবুব-এর বক্তব্য আরও জোড়ালো ভাবে ফুটে ওঠেছে–

এই বাংলার সুনীল আকাশে এখনো শকুনী চিল
স্পর্ধায় ওড়ে, সাথীরা শুনেছ আগামী দিনের ডাক
বিক্ষোভে আর অগ্নি শপথে গড়ো মিছিল
মাঠে বন্দরে এক হয়ে গেছে অযুত লাখ।[৭০]

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও বাংলা শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত হচ্ছিল। এ শোষণে তাদের কোনো রাখঢাক ছিল না। বাংলার মানুষ এ শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তাগাদা অনুভব করছিল। সেই অনুভব একে একে গোটা জাতির মধ্যে স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কবি বুলবুল খান মাহবুব-এর 'আজকের কবিতা' ও 'আমার' প্রভৃতি কবিতায় এ-বক্তব্যের সমর্থন পাই।

পাকিস্তানি সামরিক শাসনের মর্মান্তিক নিষ্পেষণ জাতীয় চৈতন্যে যে দুর্বার বিক্ষোভ ও আন্দোলনসজাগতা সঞ্চার করেছিল জাতির সেই প্রতিরোধমুখীন প্রতিক্রিয়াকে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ ব্যক্ত করেন প্রবহমান উচ্ছলতায় :

হঠাৎ একি, গোখবোর মতো ফুঁসিয়ে ওঠে
প্রাণচঞ্চল মিছিলের মুখ :
পুলিশ এসেছে।
কাঁধে কাঁধে বন্দুক
আর ওদের মোটা ঠোঁটে সত্যকে দমিয়ে দেবার এক আসুরিক দম্ভ।[৭১]

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারির পর থেকে জনগণ বিভিন্ন সময় তীব্র প্রতিবাদে জেগে ওঠার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে শাসকগোষ্ঠী পুলিশকে লেলিয়ে দেয়। শাসকগোষ্ঠী জনগণের প্রতিবাদকে নির্যাতন ও হত্যার মাধ্যমে দমন করার চেষ্টা করে। কবি আলাউদ্দিন আল আজাদসহ এক ঝাঁক তরুণ কবি জাতির সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপনা সঞ্চার করার চেষ্টা করেন। ভাষা আন্দোলন সেই জাগরণে অপ্রতিরোধ্য প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার করে। শহিদ মিনার বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীকারের স্থানে পরিণত হয়। অপরদিকে, শাসকগোষ্ঠীর কাছে শহিদ মিনার আতঙ্কের স্থানে পরিণত হয়। তাই, তারা বার বার আঘাত হনেছে শহিদ মিনারে। কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর কবিতায় বিষয়টি তুলে ধরেছেন :

স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
এক কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো, যে ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুড়ে ঝটিকা ধুলোয় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
... ...
ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি পরিবার।[৭২]

ভাষার ভিত্তিতে যে বাঙালি জাতি গড়ে ওঠেছে তা শহিদ মিনার ভেঙে দুর্বল করা যায় নি। বরং বাঙালিকে তা আরও উজ্জীবিত করেছে। বাঙালি ঐতিহ্যগতভাবেই স্বাধীনচেতা। সাময়িকভাবে তারা বিদেশি শক্তির দ্বারা হয়তো শোষিত হয়েছে কিন্তু বেশিদিন তা মেনে নেয়নি, তারা বিদ্রোহ করেছে। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, জনতা যারা প্রতিনিয়ত উৎপাদন

করে যাচ্ছে কবি তাদেরকেই নায়ক বলে অবহিত করেছে। বাঙালি জাতির মধ্যে যে একতা গড়ে উঠেছে তা স্মৃতির মিনার ভেঙে শেষ করা যাবে না বলে কবি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদই শুধু নয় আন্তর্জাতিকতাবাদের একটি প্রভাব আমরা তৎকালীন রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে লক্ষ করি। ১৯৬০ সালে সিকান্দার আবু জাফর-এর লেখা একটি কবিতা 'স্বামীর লাশ প্রার্থী পলিন লুমুম্বাকে'। আততায়ীর হাতে নিহত কংগোর নেতা প্যাট্রিসলুমুম্বাকে কেন্দ্র করে ঐ কবিতা রচিত হলেও কবি একই ধরনের সাম্রাজ্যলোভী অভীপ্সা বাংলায় দেখতে পেয়েছেন। ফলে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা সেই সঙ্গে প্রচণ্ড সাহস ও আশাবাদের কথা ধ্বনি হয়েছে কবিতাটির শেষ স্তবকে।

কোথায় লুকোবে তবু ওরা সেই লাশ?
কোথায় তেমন সুগোপন
নির্বিঘ্ন কবর?
লুমুম্বার মৃতদেহ বিস্ফোরণ প্রতীক্ষায়
প্রজ্বলিত বারুদ এখন
লুমুম্বার মৃতদেহ এখন আফ্রিকা।[৭৩]

এছাড়াও প্যাট্রিসলুমুম্বাকে নিয়ে আসাদ চৌধুরী রচনা করেন বিখ্যাত কবিতা 'ইতিহাসের আরেক নায়ক'। এই কবিতাগুলো তৎকালীন বাঙালির রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রভাবিত করে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে এটি তার সাথে তুলনা করলে ভুল হবে না। লুমুম্বার মৃত্যু যেমন আফ্রিকায় জনমনে বিস্ফোরণ গঠিয়েছিল তেমন বাহান্নে সংঘটিত ঘটনা বাঙালিকে জাগিয়ে তোলে। কবিতায় শোষকগোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে কত মানুষকে হত্যা করা হবে বা কোথায় তাদের লাশ গোপন করা হবে। বাংলার মানুষ প্রস্তুত নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে তৈরি করার জন্য। কিন্তু ৫৮ সালে পাকিস্তানি সামরিক শাসক ক্ষমতায় এসে বাঙালিকে অবরুদ্ধ করে শোষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করতে থাকে। এই হতাশার আবেষ্টনীকে অতিক্রম করে সংগ্রাম ও আত্মবিশ্বাসের আগুনে প্রোজ্জ্বল কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ উচ্চারণ করেন :

হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।

কবি জনগণের একতা আশা করেছে। একতা শাসকদের শোষণ থেকে বাংলার জনগণকে রক্ষা করবে। আচ্ছন্ন চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে প্রেরণার দৃঢ়তর অভিব্যক্তি নিয়ে কবি এগিয়ে যান। তাই *মানচিত্র* (১৯৬১) কাব্যেও 'শান্তিগাঁথা' কবিতায় কবি বলেছেন :

শান্তি শিবিরে লৌহ সেনানী আমরা
        শ্বেত-কপোতের পাখার ছায়ায় দুর্জয় ব্যূহ রচেছি
সৌরবলয়ে সূর্যের মতো প্রহরা,
                লৌহ সেনানী আমরা।
গ্রাম-নগরে ও পথে-প্রান্তরে দিই ডাক
স্বদেশ আমার হুঁশিয়ার
রণদৈত্যের অক্ষৌহিণী তোলে হাঁক,
        পৃথিবী আমার হুঁশিয়ার॥[৭৪]

এই কবিতার মাধ্যমে কবি বাঙালির যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা তার প্রতি আস্থা জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষকে সদা জাগ্রত ও প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। যাতে প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

ভাষা-আন্দোলন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন ও রক্তপাতের দর্শক কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ। চোখের সামনে কবি দেখেছেন কীভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের শোষণ করছে। এইসব আন্দোলনের সাক্ষী কবির মনে স্বাধীনতার বিষয়টি বার বার উঁকি দিয়েছে। কবির কাছে 'স্বাধীনতা' জীবনেরই অভিব্যক্তি। তাই কবি স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেছেন–

স্বপ্নের মতো শুনেছি তোমার নাম!
এখন জেনেছি তুমিই
জন্ম
তুমিই বৃদ্ধি, তুমি পূর্ণতা, তুমি
ক্ষুধার শান্তি ভ্রান্তি-হন্ত্রী,
সৃষ্টির অটুট আলোকচ্ছটা।[৭৫]

১৯৬২ সালের কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ *ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ* কাব্যগ্রন্থে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষিত মধ্য বিত্ত শ্রেণিকে তা প্রভাবিত করেছে। তারা আবার সাধারণ জনগণের কাছে নিজেদের শিক্ষাকে পৌঁছে দেন। এভাবে স্বাধীনতার স্বাদ সম্পর্কে কবি-সাহিত্যিকগণ জনগণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। এভাবেই আন্দোলন-সংগ্রামে কবি স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রেরণার শব্দময় উৎসভূমি নির্মাণ করেছেন। কবির আশাবাদ এবং সংগ্রামী মনোবল আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৭৬] শুধু তাই নয়, এই সময় শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সাথে যোগাযোগ করেন।[৭৭] তাই বলা যায়, কবিতাটি একেবারেই কাকতালীয় নয়।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন বলেন, 'পূর্ববঙ্গের ইতিহাস দ্রোহের।'[৭৮] যে জাতির মধ্যে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা আছে তারা সবকিছু ভেঙে নতুন করে গড়ার ক্ষমতা রাখে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পূর্ববাংলায় অনেক আন্দোলন হয়েছে। ইংরেজদের আমলে কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন, আইয়ুব খানের আমলে খালিশপুরের শ্রমিকদের আন্দোলন ও ছাত্রদের ১৯৬২-র শিক্ষা-আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ আন্দোলনগুলো সামগ্রিকভাবে এক সূত্রে গাঁথা–সে-সূত্রে হচ্ছে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পূর্ববাংলার জনগণ সবসময় শাসকদের বিরুদ্ধে এভাবেই প্রতিরোধ গড়েছে। বুলবুল খান মাহবুব 'আমরা থাকবো', '১৭ই সেপ্টেম্বর', 'নতুন উপমা'–কবিতা তিনটি এই উপলক্ষ্যে রচিত।

আমার সমস্ত চেতনা উন্মুখ
খালিশপুর কি সবার অজান্তে
নতুন তীর্থ হল। আমরা কি সূর্যোদয়ের দিকে
আর এক ধাপ এগিয়েছি।[৭৯]

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাখঢাক না রেখে নিজ দেশের জনগণের একটি অংশের (পূর্ব পাকিস্তান) ওপর শোষণ ও দমন-পীড়ন চালায়। বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য চটকল শ্রমিক, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফসহ অন্যান্য মিল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের বিক্ষোভ-আন্দোলন চলে। এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তৎকালীন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি। আন্দোলনরত শ্রমিক জনতার ওপর সরকার ও সরকারসমর্থিত শ্রমিকরা ক্রমাগত অত্যাচার-নির্যাতন চালায়।[৮০] এর প্রতিবাদে প্রদেশের বিভিন্ন চটকলে শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে খুলনার খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। পুলিশের গুলি বর্ষণের ফলেও সেখানে অনেক শ্রমিক হতাহত হয়।[৮১] কিন্তু শ্রমিক জনতা হতাশ হন নি। বরং জনগণ শাসকগোষ্ঠী শোষণ ও অত্যাচারের বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হয়। যা তাদেরকে আরও সামনের দিকে ও নতুন আগামীর দিকে তাকাতে উৎসাহ দেয়। সেই আগামী হলো স্বাধীনতা। ষাটের দশকের ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি ধারণ করেছে নবতর বৈশিষ্ট্যে আর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্যভূমিতে সঞ্চার করেছে শক্তি ও সাহস। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার শোষণ বাঙালিকে সক্রিয় করে তোলে মহত্তর জাতীয় সংগ্রামে, অনাগত সম্ভাবনা স্বাধীনতার দিকে।[৮২] কবি হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর কবিতার মাধ্যমে একটা নবতর

জীবনজিজ্ঞাসাকে অভিব্যক্ত করেছে। যেখানে আছে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক উত্তরণে নিদের্শনা। তাঁর কবিতায় মার্কসবাদী চেতনালব্ধ বিশ্বদৃষ্টি সূচনা করেছে বাঙালির জীবনভাবনার অনুরণন প্রত্যাশাদীপ্ত পরিবর্তন। আন্দোলন, রক্তপাত ও উজ্জীবনের পটভূমিতে রচিত কবিতায় কবি মুখ্যত জাতীয় চেতনারই সংগ্রামী মুখপাত্র। যা তাঁর *বিমুখ প্রান্তর* (১৯৬৩), *আর্ত শব্দাবলী* (১৯৬৮), *অন্তিম শরের মতো* (১৯৬৮) কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যেখানে মরামাটি ফুঁড়ে জীবনের ছায়া জেগে ওঠে, যেখানে বায়ান্নোর স্মৃতি বহ্নিমালা অবিরাম জ্বলতে থাকে সংগ্রামদীপ্ত চেতনায়। *বিমুখ প্রান্তর* সেই জীবনমানসেরই কাব্যরূপ। তাই কবি *বিমুখ প্রান্তর* (১৯৬৩) কাব্যের 'অমর একুশে' কবিতায় নির্দ্বিধায় বলতে পারেন :

এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ কটি বছরের
ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি,
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি
এবার আমরা তোমার।[৮৩]

ফ্যারাউন বলতে কবি আইয়ুব খানকে বুঝিয়েছেন। আইয়ুব খানের শাসনের বাঙালির জীবন নিষ্পেষিত। এই সামারিক শাসকের শোষণে বাংলা নিঃস্ব হয়েছে। কবি সেখানে দাঁড়িয়ে এই শাসনের শেষ দেখতে পাচ্ছে। জনগণ এই অবস্থার বিপরীতে এবার মুক্তির পথ খুঁজে নেবে।

আইয়ুব খানের শাসনামলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে কবিরা কবিতা লিখেছেন তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। তাদের ওপর সবসময় নেমে এসেছে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-নির্যাতন। খুব সহজে তাদের লেখা কবিতা প্রকাশ হয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে চালানো হয়েছে সেন্সর। সবরকম প্রতিকূলতা দূর করে তাদের কবিতা লিখতে হয়েছে। এ রকমই একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হুমায়ুন আজাদ তাঁর রচিত *আমার নতুন জন্ম* গ্রন্থে,

> আমি ১৯৬৪-৬৫ সালে একটি কবিতা লিখেছিলাম। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই কবিতাটির একটি লাইন ছিল 'আজ রাত্রে সারা বঙ্গে আমি হই একমাত্র কবি'। আমি এই কবিতাটি কবি আহসান হাবীবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। আহসান হাবীব বললেন যে, বঙ্গ তো লেখা যাবে না। কারণ '৬৫ সালে বঙ্গ লেখা যায় না। আমকে বঙ্গে শব্দের স্থলে অন্য কোনো শব্দ লেখার পরামর্শ দেন। আমি শব্দটি পরিবর্তন করি কিন্তু পাকিস্তান ব্যবহার করি নি। ... আমি বঙ্গের জায়গায় 'আজ রাত্রে আমি হই সারাবিশ্বে একমাত্র কবি' লিখি। তারপর আমার লেখাটি প্রকাশ হয়। এই হচ্ছে পাকিস্তান সময়ের অধিকারের চিত্র। একটি শব্দ প্রয়োগের অধিকার তখন ছিল না।[৮৪]

এখানে দুইটি বিষয় পরিষ্কার এক, বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রাসন ও পাকিস্তানি আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। দুই, লেখকের বা কবির পাকিস্তানি আধিপত্যকে স্বীকার না করে নেওয়া। পুরো ষাটের দশকে পাকিস্তানে এই রকমের ঘটনা বার বার ঘটেছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখনই চেষ্টা করেছে বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে দমিয়ে রাখার তখনই বাঙালিরা প্রতিরোধ করেছে। শৃঙ্খলা ভেঙে বাঙালিত্বের জয় ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করেছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই শাসকগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করতে থাকে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন জোগানো ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আর একটি বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তান আমলে শাসকগোষ্ঠী নানান ভাবে বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। এভাবে শত শত শ্রমিককে হত্যা করে। শাসকগোষ্ঠী শুধু দাঙ্গা বাঁধিয়ে ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে ক্ষান্ত হয়নি। তারা সরকারের বিভিন্ন বাহিনীকে লেলিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের ওপর এবং তাদের অধিকার খর্ব করে। মানুষের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে দমন করা হতো নির্মমভাবে। এ রকম সময়ে সিকান্দার আবু জাফর *বৈরী বৃষ্টিতে* (১৯৬৫) 'কুকুরগুলোকে' শিরোনামে একটি কবিতায় প্রতীকীভাবে পাকিস্তানি শাসকদের নিজেদের সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন–

শিকারী তোমার কুকুরগুলোকে রোখো
জঙ্গলে আজ জন্তুরা চিন্তিত।

জনপদ মাঠ নদী বন্দর
গ্রাম নগরের থেকে
কুকুর-এস্ত মানুষের দল
জঙ্গলে আশ্রিত!
পশুদের তাই চরম দুর্ভাবনা :
এত ঠাঁই কোথা জন্তুর পৃথিবীতে?

কুকুরের দাঁত ক্ষত-বিক্ষত
হৃদয় চেতনা সাধ
ভাগাড়ে যখন শকুন-ভক্ষ্য
একাকার শবদেহ,
তখনি মানুষ ছেড়েছে নগর-গ্রাম;
জঙ্গল তবু ভাগাড়ের চেয়ে ভালো।

শিকারী তা'হ'লে কুকুরগুলোকে রোখো,
অন্তত বোঝো পশুদের দুর্দশা। (১৩৭০)[৮৫]

পাকিস্তানি শোষকদের শোষণের ফলে বাংলায় যে দুর্দশা নেমে এসেছিল কবি তা সুন্দরভাবে ফুটে তুলেছে। বাঙালির যে অসহায়ত্ব কবি তা প্রতীকীভাবে তুলে ধরেছেন। শোষকদের অত্যাচারে জনজীবন অচল হয়ে গেছে। স্বাভাবিক জীবনযাপন বাঙালির জন্য কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাই কবি শোষকদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সতর্ক করে দেন। সিকান্‌দার আবু জাফর-এর *কবিতা* **১৩৭২**[৮৬] কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে ঐ সময়ের বাঙালির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। ঐ সময়ে যে আন্দোলন সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছিল তা *কবিতা* **১৩৭২** কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা–'সংগ্রাম চলবেই'[৮৭]-এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। বৃহত্তর জন-জীবনের অঙ্গীকারে কবিসত্তা আন্দোলিত হয়।[৮৮] সংগ্রামের সামগ্রিক পটভূমিতে, সমষ্টি-অস্তিত্বের গভীর অনুভবে কবি রচনা করেছেন 'সংগ্রাম চলবেই' কবিতা :

জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই
... ...
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি
সকল বিরোধ বিধ্বংসী
এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া জানবোই
আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নতুন সূর্যশিখা জ্বলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।[৮৯]

কবি সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে একটি সুন্দর সকালের স্বপ্ন দেখেছেন। আর এই প্রতিবন্ধকতা দূর হবে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সিকান্‌দার আবু জাফরের কবিতায় সমন্বিত গণ-আন্দোলন এভাবেই ফুটে ওঠেছে। জনগণের কণ্ঠস্বর কবিতা হয়ে দৈনিকের সম্পাদকীয়তে স্থান করে নিয়েছে। ইতিহাসের যে অনিবার্য গতিপ্রবাহ ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের সফলতার ইঙ্গিত বহন করে, সিকান্‌দার আবু জাফর তাঁর কবিতায় সেই আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বসূরি হিসেবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ইতিবাচক পদক্ষেপের সাথে সমান্তরাল গৌরবময় ভূমিকা

নির্মাণ করেছেন।[৯০] এই কবিতাটি পরবর্তীকালে গান হিসেবে সুর করা হয়। সুরকার শেখ লুতফর রহমান একটি স্মৃতিচারণায় এই গান রচনার নেপথ্য-ইতিহাস বর্ণনা করেছেন,

> ১৯৬৪ সালে করাচি থেকে দেশের মাটিতে পা রাখার অল্পদিনের ভেতরেই 'মৌলিক গণতন্ত্র'র ধারায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। একদিকে মিস জিন্নাহ, অন্যদিকে আইউব খান। মিস জিন্নাহকে জয়ী করাবার জন্য সারা বাংলার মানুষ তখন উত্তাল। গণজোয়ারের ঢেউ সর্বত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য মিস জিন্নাহ আইউবের কাছে হেরে গেলেন। আর সেই সময়ই কবি ও 'সমকাল'-সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর লেখেন তাঁর সেই যুগান্তকারী কবিতা। পরদিন 'ইত্তেফাক'-এ সেই কবিতা ছাপা হলে কামাল লোহানী আর মনু তাই হাতে করে সুর করার জন্য ভোরবেলা আমার কাছে এসে হাজির। কালবিলম্ব না করে দীর্ঘ ওই কবিতাটির চারটি স্তবকের কেবল সুর করি–'জনাতার সংগ্রাম চলবেই।/আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই ॥...।[৯১]

কবিতাটির মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এমন প্রত্যক্ষভাবে, এরূপ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ভঙ্গিতে এবং আত্মবিশ্বাসে ইতঃপূর্বে কবি আর কোথাও কথা বলেন নি।[৯২] অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জনতার হয়ে কবি এই কবিতার অন্য স্তবকে বলেন–

> জনতার সংগ্রাম চলবেই
> আমাদের সংগ্রাম চলবেই
>
> হতমানের অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
> বাঁচবার অধিকার কাড়তে
> দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
> অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
> চলবেই চলবে।[৯৩]

জনতার সংগ্রাম পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা বাঙালিদের অপমান ও অপদস্থের বিপক্ষে। পাকিস্তানি শাসকদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সুখ-সমৃদ্ধির আশায় বাঙালির এই সংগ্রাম। বাঙালি প্রাণপণে এই সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং যতদিন সফলতা না আসবে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তির আন্দোলনে এই কবিতা স্লোগানে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই কবিতা ও গানটি আমাদের প্রতিটি সংকটে গীত হয়েছে। অর্থাৎ কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো বাংলার জনগণ নিজের করে নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। কবি সিকান্দার আবু জাফর আশা করেন একদিন বাঙালি নতুন সূর্যের মুখ দেখবে। কবির এই আশাবাদ কবিতায় প্রতিফলন ঘটে–

> এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
> কোনদিন আমরা যে ভাঙবোই
> মুক্ত প্রাণের সারা জানাবোই
> আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
> নতুন সূর্য শিখা জ্বলবেই।[৯৪]

পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা বাঙালিদের ওপর যত অন্তরায় আসে তা ভাঙার শপথ নেয়। তাদের শোষণের ফলে যাতে বাঙালি হতাশ না হয়ে পরে সেজন্য তাদের উজ্জীবিত করে। নতুন ভবিষ্যতের ও শোষণ মুক্ত দেশ গঠনের জন্য এই ইস্পাতকঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। শুধু তাই নয় কবি তার কবিতায় দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজনে রক্ত দেওয়ার কথাও বলেছেন–

> দিয়েছি ত' শান্তি আরো দেবো স্বস্তি
> দিয়েছি ত' সম্ভ্রম আরো দেবো অস্থি
> প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত।[৯৫]

'সংগ্রাম চলবেই' কবিতাটি অসাধারণ পঙ্‌ক্তি 'প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত' পরবর্তীকালে সত্য ও প্রযোজ্য হয়ে উঠেছিল।[৯৬] বাংলার লাখো ছাত্র জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই কবিতার মাধ্যমে। তাই আমরা দেখি একনদী রক্ত দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা এসেছে।

'সংগ্রাম চলবেই' যখন বাঙালির আত্মার স্লোগানে পরিণত হয়, তখন পাকিস্তানি শোষকেরা নিজেদের স্বার্থহাসিলের জন্য তাদের পুরাতন কৌশল ধর্মকে ব্যবহার করে। অদৃষ্টবাদ পরলোক ও বেহেশতের চিন্তা গরিবকে বঞ্চনা করার উপায়রূপে অবলম্বিত হয়। ভুখানাঙ্গা মানুষেরা বেহেশতের আশায় ইহলোকের সুখ বিসর্জন দেয়। সমাজপতিরা নিয়ত পরামর্শ দেয় দুঃখবিপদে ধৈর্য ধারণ করতে। এই বিষয়টি অবলম্বিত হয়েছে *তিমিরান্তিক* (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের ব্যঙ্গ কবিতা 'আকাল'-রচনায়।

ইহকাল সব নয় জানবে
পরকাল রয়েছে অনন্ত
সবুর করতে হবে নির্বাক
দুহাতে কুড়াতে হবে পুণ্য
তবে তো লভ্য হবে স্বর্গ
তবে তো জীবন হবে ধন্য।[৯৭]

অন্যদিকে ধর্মের বিপরীতে ছিল বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। বাহান্নের পর থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বিপদের সময় ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে প্রেরণা দেয়। ভাষা আন্দোলনের সকল অঙ্গীকার ফুটে উঠেছে বাংলায় যত সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে। কবি সাহিত্যিকগণ ভাষা আন্দোলন নিয়ে কবিতা লিখে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা জনগণকে কখনও ভুলতে দেননি পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালিকে কীভাবে ভাষার জন্য নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। কবি সিকান্‌দার আবু জাফর বাঙালির সংগ্রামের যে চেতনা তাকে বৃহত্তর জনজীবনসংগ্রামের সাথে একাত্ম করে দিয়েছেন। *বৈরী বৃষ্টিতে* কাব্যগ্রন্থের 'একুশে ফেব্রুয়ারী' কবিতায় দেখা যায়, ভাষা আন্দোলন কীভাবে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে শক্তি ও সাহস জোগাচ্ছে :

দেশের মানুষ একটি দণ্ডে
একাত্ম হয়েছিল,
স্নায়ুগ্রন্থিতে পাঁজরে ও পেশীতে
মেনে নিয়েছিল একটি অঙ্গীকার
সেদিন প্রথম
এবং প্রথম নতুন দিগ্বলয়ে
সঞ্চরমান এ-দেশের ইতিবৃত্ত।
চেতনার পথে দ্বিধাহীন অভিযাত্রা
নানানমুখীন হাজার লোকের
একত্র অস্তিত্ব
একুশে ফেব্রুয়ারী।[৯৮]

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য আসে। এ ঐক্যই বাঙালিকে প্রতিনিয়ত পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জোগান দেয়।[৯৯]

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ-নিষ্পেষণ চালাতে থাকে। কখনো ভাষার ওপর আঘাত, কখনো সামরিক শাসন জারি করে বা অন্য কোনো অবয়বে বাঙালির গণতান্ত্রিক অধিকারহরণ করা হয়। অধিকার দাবি বা আদায় করতে গেলেই শাসকগোষ্ঠীর খড়্গ নেমে আসে বাঙালির ওপর। ফলে জাতীয়জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুর্দশা। পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় যত অসংগতি তা অন্যান্য অনেক কবিদের মতো আবদুল গনি হাজারীকে প্রবলভাবে

আলোড়িত করেছিল। যার ফলে, জাতীয়জীবনের নেতিবাচক প্রবণতাসমূহকে তিনি তীক্ষ্ণ কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। তার *সূর্যের সিঁড়ি* (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থে 'গতরাত্রির দুঃস্বপ্ন, প্রত্যেকরাত্রি' কবিতায় অসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জীবনের মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরেছেন :

> প্রাকার নয় আমাদের
> পত্রিকায় ছাওয়া তাবুর ফানুস
> স্টাফ রিপোর্টারের নিহত আইটেম
>   নিহত
>   নিহত :
>   আমাদের ব্লুপ্রিন্টে রক্ত
>   পাঁচটি বিবেকী প্রাণের মূল্য
>   অন্তহীন হিসেবের স্বীকার
>   পর্দাহীন চোখে বিনিদ্র চক্রান্ত
>   এবং সহস্র প্রশ্নের করাঘাতে
>   পিঠ-চেপে বসে থাকা।[১০০]

পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের দৈনন্দিন ফিরিস্তি এই কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। সংবাদপত্র ও স্বাধীন চিন্তার ওপর হস্তক্ষেপ, রাখঢাক না রেখে শোষণ ইত্যাদি তুলে ধরেছেন কবি। দেশের তৎকালীন যে অবস্থা, প্রশ্নের মাধ্যমে কবি তা কবিতায় তুলে ধরেছেন। স্টাফ রিপোর্টাররা মূল ঘটনাকে তাদের খবরে বা নিউজে স্থান দিতে পারে না, তারা সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ যে খবর সেগুলো ছাপাতে পারে না বরং যে খবরগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয় তা প্রকাশ করতে হচ্ছে। যেটাকে নিহত আইটেম বলছে।

তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণির প্রবল প্রতাপে বিক্ষুব্ধ, ঘৃণায় কুঞ্চিত কবি সিকান্দার আবু জাফর তাদেরকে দেখতে চেয়েছেন ঈশ্বরের প্রতীকে। তাই কবি ১৯৬৫ সালে 'কত ঈশ্বর' কবিতাটি রচনা করেন। এটি একটি রূপক কবিতা। এ শাসক শ্রেণি, যাদের হাতে পুঞ্জীভূত ছিল সমস্ত ক্ষমতা এবং ক্ষমতাকে যারা অন্যায়ভাবে অপব্যবহার করছে তাদের প্রতি কবি গভীর বিদ্বেষে বলেন–

> ঈশ্বর মহাশক্তিমান
> দানব হবার দুঃসাহস
> তাই তাঁর কাছে অবশ্যই।
> এবং নিরবে মার খাবো
> তাই তাঁর হাতে দিনান্ত।[১০১]

পাকিস্তানি শাসকদের কবি ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাধর দানব হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাই কবির মতে মার খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। মার খাওয়াটাই হচ্ছে নিয়তি। আবার পরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে কবি রুখে দাঁড়ানোর জন্য গভীর আত্মবিশ্বাসে বলেন–

> স্খলিত জীবন শক্তিতে
> তবু জীবনের তপস্যা
> বাঁচতেই হবে একান্ত
> মার খাব মরব না।[১০২]

ধ্বংসের মধ্যেও কবি আশার স্বপ্ন দেখে। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে বার বার মার খেলেও কবি আশা ছাড়তে অপারগতা প্রকাশ করছেন। কবি স্বপ্ন দেখেন একদিন এই দুঃস্বপ্ন দূর হবে। পূর্ববাংলার মানুষ এই অসহ্য অবস্থার প্রতিকারকল্পে মরিয়া হয়ে ওঠেছিল।[১০৩] নিয়তিকে মেনে নিয়ে মার খেয়ে না মরে বাঁচার জন্য তপস্যা করার কথা বলেছে। শুধু তাই

নয়, কবি শামসুর রাহমান বাংলা মায়ের সাহসী সন্তানদের অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে পৌরাণিক সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তিনি উন্মোচন করেন স্বদেশের কোনো পটভূমিকে। তিনি একজন বীরকে স্মরণ করেছেন যে না থাকায় তাঁর মাতৃভূমি আজ অরক্ষিত। শত্রুর দ্বারা দখল হয়েছে।

তুমি নেই তাই বর্বরের দল করেছে দখল
বাসগৃহ আমাদের[১০৪]

এই পঙ্‌ক্তির মধ্যামে ঐ সন্তানের অপেক্ষার কথা কবি জানান দিচ্ছেন যারা বাংলার স্বাধীনতা, সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে পারে। তিনি তরুণদেরকে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে বাংলা মায়ের তাদেরকে এখন প্রয়োজন। তাই এখনই তাদের জেগে উঠতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে শোষণ ও নির্যাতনের। গড়ে তুলতে হবে তাদের কাঙ্ক্ষিত বাসস্থান। যে বাসস্থান এখান বেদখলে আছে। স্বাধীনতার নামে নতুনরূপে শোষকগোষ্ঠী বাঙালিকে শোষণ করছে। স্বাধীনতা হরণ করেছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এখানে 'তুমি' অর্থাৎ টেলেমেকাস যেন হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীর অনুপস্থিত সত্তা–যাকে কবি শামসুর রাহমান কামনা করেন চূড়ান্তভাবে। যার ফলে, এ-অনুষঙ্গে নিজের আত্ম-আবিষ্কারকে কবি ব্যক্ত করতে পারেন নির্দ্বিধায় :

ইথাকায় রাখলে পা দেখতে পাবে রয়েছি দাঁড়িয়ে
দরজা আগলে, পিতা, অধীর তোমারই প্রতীক্ষায়।
এখানো কি ঝঞ্ঝাহত জাহাজের মাস্তুল তোমার
বন্দরে যাবেনা দেখা? অস্ত্রাগারে নেবে না আয়ুধ
আবার অভিজ্ঞ হাতে? তুলবে না ধনুকে টঙ্কার?[১০৫]

ঐ বীর সেনানির অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে পুরো জাতি। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণে দেশ অস্থিসার হয়ে গেছে। এই শোষণ থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য তারা কখন আসবে, কখন দায়িত্ব নিবে দেশের। সেই অধীর অপেক্ষায় সারা দেশ। শোষণের হিংস্র নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত স্বদেশভূমি প্রতি দেশবাসীর ছিল পরম ভালোবাসা। জীবনের বিপর্যস্ত পটভূমিতে নৈরাশ্য, বেদনা বা হাহাকারের পরিবর্তে অপরিমেয় বিশ্বাসে উজ্জীবিত হতে হবে। তাই কবি হাসান হাফিজুর রহমান *আর্ত শব্দাবলী* (১৯৬৮) কাব্যগ্রন্থের 'অনন্য স্বদেশ' কতিায় বলেন :

আমার হৃৎপিন্ডের মত
আমার সত্তার মত
আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মত
সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ
আমার দেহের আনন্দ কান্নায় তোমাতেই আমি সমর্পিত[১০৬]

কবিতার মধ্যে দিয়ে কবির দেশ প্রেম ও দেশের প্রতি ভালোবাসার কথা ফুটে ওঠেছে। দেশের জন্য কবি নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতির কথা বলেছেন। একই কাব্যে স্বৈরশাসককে 'নকল রাজা' আখ্যা দিয়েছেন কবি। স্বৈরশাসকের পরাক্রম যে সাময়িক যে বিষয়ে কবির কোনো সংশয় ছিল না।[১০৭]

কবি হাসান হাফিজুর রহমান-এর দেশের প্রতি ভালোবাসা ও চেতনা সংগ্রামে দৃঢ়তায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তৎকালীন সময়ের সমস্ত অসংগতিকে স্বীকার করেও তাঁর শপথ ও শক্তিসাধনা নিবেদিত হয়েছে সম্ভাব্য সংগ্রামের পথপরিক্রমায়। কবি একগুচ্ছ শপথ ও অঙ্গীকার করেছেন প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন। কোনো শক্তির সাধ্য নেই প্রিয় মাতৃভূমির ওপর আঘাত করবে এবং তার যে স্বাতন্ত্র্য তা ম্লান করবে :

আমার স্বপ্নকে দিলাম তোমাকে
তোমার পবিত্র অঙ্গের প্রহরী,
আমার শপথকে দিলাম তোমাকে
তোমার অমোঘ সঙ্গীন

আমার ঐক্যকে দিলাম তোমাকে
তোমার অজেয় শক্তি
এমন সম্পূর্ণ উৎসর্গকে পেরিয়ে কার কলংক হাত
স্পর্শ করবে তোমার অম্লান স্বাতন্ত্র্য?
তোমার অনন্যতাকে ক্ষুণ্ন করবে এমন সাধ্য কার?[১০৮]

মাতৃভূমি শাসকদের শোষণের নির্মম থাবায় ক্ষতবিক্ষত। সাধারণ জনগণ হচ্ছে শোষিত ও নিষ্পেষিত। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই শোষণ কবি হাসান হাফিজুর রহমানকে একটা সিদ্ধান্ত বা মীমাংসায় উপনীত হতে সহায়তা করেছে। তাই কবি তাঁর গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন–জাতীয় সংগ্রামের অন্তর্গত বহির্গত-উভয় স্রোতের সাথেই সংলগ্ন। পাকিস্তানি শাসকশক্তির দ্বারা যাতে প্রিয় স্বদেশভূমি আরও বিপর্যস্ত ও রক্তাক্ত না হয়, প্রাণের ঔজ্জ্বল্য ও শক্তি যেন হ্রাস না পায়। তাই স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে স্বপ্নময় সম্ভাবনার লক্ষ্যে জনসাধারণকে উজ্জীবিত ও প্রাণপ্রদীপ্ত করে নির্মাণ করেন অনবদ্য পঙ্‌ক্তিমালা :

বিপদে বিপন্ন মুখ দেখিনি তোমার
বরাভয়ে সর্বংসহা স্বদেশ আমার।[১০৯]

হাজার বছরের বাংলার ইতিহাসে বার বার বিভিন্ন বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছে এই ভূখণ্ডের জনগণকে। কিন্তু কখনই তারা ভেঙে পড়ে নি। সাহসের সাথে বিপদকে মোকাবেলা করেছে। প্রতিরোধ করেছে সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা। প্রতিরোধের ঐতিহ্য বাঙালির চিরন্তন। একথা বলে কবি জনগণের মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই ভূখণ্ডে বিগত দিনে বাংলার স্বাধীনতায় যারা শক্তির বিষদাঁত বসাতে এসেছিল তারা পরাজিত হয়েছে। কবি সিকান্‌দার আবু জাফর বাঙালির সেই বিদ্রোহী চরিত্রের কথা স্মরণ করেছেন। কবি 'যে কোন মূল্যে' কবিতাটিতেও দৃঢ় প্রত্যয় ও আশার সুর উচ্চারণ করেন। এই কবিতাটিতে জননী জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বলেছেন–

শক্তির লোলুপ দণ্ডে ছিন্ন করে দিতে
অতর্কিতে যারা এসেছিল
তাদের অনেকে
বিস্তীর্ণ ইক্ষুর ক্ষেতে গোধূমের ক্ষেতে
এখন সারের কীট জন্ম জন্মান্তের।[১১০]

এই ভূখণ্ডে প্রাচীনকাল থেকে ক্ষমতার দণ্ড ও প্রতাপ নিয়ে যারা দখল করেছে, শোষণ করতে এসেছে তাদের পরিণতি হয়েছে কীটের মতো তা স্মরণ করে দিতে চেয়েছেন কবি সিকান্‌দার আবু জাফর। তিনি শোষক ও শোষিতকে একইসাথে উদ্দেশ্যে করে এই কবিতা রচনা করেন। একদিকে কবি শোষকদেরকে সর্তক করে দিয়েছেন বাংলায় আঘাত করলে কী পরিণতি হয়। অপরদিকে বাঙালিকে তাদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ কওে দিয়েছেন। বাঙালিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন শোষকদের বিরুদ্ধে। প্রাচীনকাল থেকে যখনই বিদেশিদের দ্বারা বাংলা আক্রান্ত হয়েছে, তখনই বাংলার দামাল ছেলে তা জীবন দিয়ে রুখে দিয়েছেন। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য কবি দামাল ছেলেদের জীবন দেওয়ার কথা গর্বের সাথে তুলে ধরেন। জীবনের বিনিময় হলেও জন্মভূমিকে কবি মুক্ত দেখতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন–

প্রাণ যদি ছুড়ে দিতে হয়
তুচ্ছ তৃণ পালকের মতো
তবু তাঁর বিনিময়ে বারম্বার পেতে হবে
তৃপ্ত জননী
মুক্ত শুদ্ধ অঞ্চলের প্রশান্ত বাতাস।[১১১]

১৯৬৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা-দখলের দশ পছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'উন্নয়ন দশক' পালন শুরু হয়, যার প্রতি জনসাধারণের কোনো সমর্থন ছিল না। সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও দুঃসহ দারিদ্র্যের চাপে মানুষ যখন বিব্রত তখন মহাসমারোহে 'উন্নয়ন দশক' উদ্‌যাপন করা তাদের কাছে নির্দয় প্রহসন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।[১১২] ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী যে আন্দোলন শুরু হয়, ক্রমেই তা সারা পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে।[১১৩] পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনে যায়। আইয়ুব খানের উন্নয়নের বিষয়ে যে প্রহসন তা নিয়ে অনেক কবিই কবিতা লেখেন। গোলাম সারওয়ার আইয়ুব খানের উন্নয়নের প্রহসন নিয়ে রচনা করেন 'ফুসমন্তর, চিচিং ফাঁক' কবিতা।

খয়ের খাঁরা গর্তে ঢোকে
হুজুর ব্যাপার কি?
অগ্রগতির দশ বছরের
এ কোন বুজুরকি![১১৪]

সামাজিক বৈষম্য-অসংগতির বিরুদ্ধে কবিতা রচনার পাশাপাশি কবিগণ এ সময় এসেও একইসাথে বাঙালিকে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের কথা বার বার স্মরণ করে দেন। ১৯৬৮ সালের এসে কী-ভাবে ভাষা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার করে তা আল মাহমুদের এই কবিতায় উপলব্ধি করা যায় :

তাড়িত দুঃখের মত চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল
রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে
তীরের ফলার মত
নিক্ষিপ্ত ভাষা চিৎকার:
বাঙলা, বাঙলা–
...   .
উদয়ের প্রান্তদেশে ভেসে ওঠে কালের কহ্লার
আর সমস্ত রাজপথে ফেব্রুয়ারির নিঃশঙ্ক পাখির আওয়াজ
রক্তাক্ত ফুলের মত সঙ্গীতজ্ঞ ভাইদের মুখাবয়ব।
বাঙলা বাঙলা ...
আমার নিদ্রিতা মায়ের নাম ইতস্তত উচ্চারিত হলো।[১১৫]

কালের কলস (১৯৬৮)-এ কবি আল মাহমুদ যে উৎসের দিকে প্রসারিত করে দেয় তাঁর মানসদৃষ্টিকে, সেখানে চেতনায় তরঙ্গিত হয় বেদনা ও অঙ্গীকারের এক অনির্বাণ প্রত্যাশা।[১১৬] শাসকগোষ্ঠী যখন উন্নয়নের দশক উদ্‌যাপন নিয়ে ব্যস্ত তখন কবি জনসাধারণকে তাদের দুঃখের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেন। শাসকগোষ্ঠীর হাতে তাদের সন্তানকে জীবন দিতে হয়েছিল।

হরফের রদবদল বিষয়ে আইয়ুব খান সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে ৪১ জন সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সাংবাদিক বিবৃতির মাধ্যমে সরকার ও দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন, "তাঁর এটি কিছুতেই মেনে নিতে পাবেন না। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'বাংলা হরফের রদবদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে'।"[১১৭]

এ সময় কবি শামসুর রাহমান 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতা লেখেন। কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি :

হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।
তোমাকে উপরে নিলে, বলো তবে কী থাকে আমার?
উনিশ শো' বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।

... ...

এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি।[১১৮]

এ সময় কবি সাহিত্যিকদের অনেকে ভাষা নিয়ে কবিতা লেখেন। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

পূর্ব পাকিস্তানে এই আন্দোলনের শুরু হয় ১৯৬৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর, যেদিন মওলানা ভাসানী মিছিল সহকারে লাটভবন ঘেরাও করতে গিয়েছিলেন। আন্দোলন প্রাথমিকভাবে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে হলেও তা ছিল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। এই আন্দোলনের বর্ণনা দিয়ে কবি ইন্দু সাহা লিখেছেন :

ক্রুদ্ধ জনতা গর্জায় তার
পুরোভাগে ভাসানী
জাগে বিদ্রোহে মিছিলের মুখ
নতুন দিনের বাণী। (১৯৬৮–৬ই ডিসেম্বর)[১১৯]

কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দ্বারাও বাঙালির লক্ষ্য অর্জিত হয় না। বরং শাসকগোষ্ঠী তাদের ষড়যন্ত্র আরও বৃদ্ধি করতে থাকে। যাদের নেতৃত্বে বাংলার জনগণ প্রতিরোধের স্বপ্ন দেখছিল, তাদের হেনস্তা করে সব আন্দোলন স্তিমিত করার অপচেষ্টা করে। পাকিস্তানি সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাঙালির প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ সম্পর্কে কবি সিকান্দার আবু জাফর 'আগরতলা ধর্ষিত বন্ধুকে' কবিতা লিখেন জননায়ক শেখ মুজিবর রহমানকে উদ্দেশ্য করে।[১২০] মুজিব কীভাবে ও কেন পাকিস্তানি শোষকদের তোপের মুখে পড়ল তা তুলে ধরেন–

আমার মায়ের কোলে তুমি
লাখের সেরা সোনা ছেলে
মায়ের ঘরে রোজ দিয়েছ
প্রাণের জ্বালায় প্রদীপ জ্বেলে
তাই মনিবে চোখে তুমি
সতীন পুতের টাট্টু ঘোড়া।[১২১]

কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাংলার নেতাদের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমিত করতে পারে নি। পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা হত্যার মাধ্যমে যে দমাবার চেষ্টা করে সে বিষয়ে অনেক কবিতা রচিত হয়। সন্তোষ গুপ্ত তাঁর 'রক্তিম বিস্ফোরণ' কবিতায় শহিদ আসাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন :

পূর্বে ও পশ্চিমে সংঘবদ্ধ প্রতিশ্রুতি
একক অভিন্ন
অসমাপ্ত শহীদ মিনারে আর নয়
শোকার্ত স্মরণ
এতো আসাদের মৃত্যু নয়–আসন্ন
রক্তিম বিস্ফোরণ।[১২২]

৬৯ সালে আসাদের মৃত্যু বাংলার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের স্বাধীনতার বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে। তারা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। তরুণ কবি-সাহিত্যিকরাও শোষণ-বিরোধী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল এবং আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। ফলে গণমানব জেগে ওঠে, বাঁচার দাবি আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই চারদিকে বিদ্রোহের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। আন্দোলনে সর্বস্তরের জনগণ সম্পৃক্ত হলেও বাকি যারা আছে, তাদেরকেও এতে শামিল হতে হবে বলে 'প্রতিরোধের ঝড় স্পন্দন' কবিতায় কবি শাহ আলম দুলাল তুলে ধরেছেন :

জনতার ধন জনতাই পাহারা দেবে আজ
বিদ্রোহ তাই চারিদিকে বিদ্রোহ সাজ।

আজো বাকী যারা প্রস্তুতি নাও
লাখো কণ্ঠে শোষণের হিসাব চাও।[১২৩]

পাকিস্তানি শাসকদের ওপর বাঙালি জনগণ আর ভরসা রাখতে পারছিল না। বাংলার জনগণ যেন নিজেদের সম্পদের দায়িত্ব পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ওপর না রাখে এবং নিজের দায়িত্ব তারা বুঝে নেন সে বিষয়ের ওপর কবি জোর দেন। জনগণের সম্পদের অপব্যবহার, শোষণ-নির্যাতন তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বাংলার জনগণ। যারা এই আন্দোলনে এখনও যোগ দেননি কবি তাদেরকে আন্দোলনে যোগদান করার আহ্বান জানায়। শাসকদের শোষণের হিস্যা চেয়ে আন্দোলন শুরু করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বহুদিন ধরে এ দেশীয় জনগণকে ধর্মের সম্মোহনে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যখন সেই সম্মোহন ভেঙেছে তখন তারা ধর্মের স্বরূপ বুঝেছে। পবিত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে তখন আর 'সুপ্রাচীন স্বাদ' বজায় রাখতে পারে নি। ধর্মকে ঔপনিবেশিক শোষণে একটা প্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল জনগণ তা বুঝে যায়। ফলে পাকিস্তানি শোষকদের যে মুখোশ জনগণের সামনের পরিষ্কার হয়। তাদের শাসন ও শোষণের কৌশল আর কাজে লাগে না। জনগণ নিজের স্বাধীন সত্তার অনুসন্ধান করতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ব্যবহার করেছে অনেকটা ঔপনিবেশিক কারণেই। এটা বুঝতে মানুষের খুব বেশিদিন সময় লাগে নি। কবি সিকান্‌দার আবু জাফর তাই 'কালান্তর সেতু' কবিতায় লিখেছেন–

ডুবে গেলে সম্মোহিত চেতনার
আদিগন্ত চর
প্রসারিত ঔপনিবেশিক মানচিত্র যখন
চিনলো সবাই নির্ভুল'
...   .
ঔপনিবেশিক মানচিত্রে তখন
সুস্পষ্ট নিরেট প্রাচীর
এই পবিত্র ধর্মের দেশে তার পর
নির্বিবাদে মানুষেরা বিস্মৃত ধর্মের
সুপ্রাচীন স্বাদ।[১২৪]

'কালান্তর সেতু' হলো নতুন চেতনার উদ্বোধন এবং প্রাচীন সম্মোহনকে ঝেড়ে ফেলার কবিতা। কবি সিকান্‌দার আবু জাফর *বৃশ্চিক লগ্ন* কাব্যগ্রন্থের 'ইতিহাসের নীলাম' কবিতাটি। এটি ছিল ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের সময়। সুবিধাবাদী দালাল শ্রেণি এবং তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে রচনা করেন। তিনি কবিতায় বলেছেন,

যতই মুখোশ নাও না মহারাজ
ধুলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে তাজ।[১২৫]

এতদিনের অত্যাচারের চূড়ান্ত প্রতিশোধের উপযুক্ত সময় এসেছে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। প্রাণ ভয়ে ভীত শাসকগোষ্ঠী এবং দালালরা পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু কবি বলেছেন,

পালিয়ে যাবে?
                    রাস্তা কোথায় বলো?
সব রাস্তায় তোমার তোলা
                    দেয়াল টলোমলো?[১২৬]

কবি সিকান্‌দার আবু জাফর *বাঙলা ছাড়ো* কাব্যগ্রন্থের 'ইতিহাসচারিণী বাঙলা'র রচনাকাল ১৯৬৯ সাল।[১২৭] এই কবিতায় কবি বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও শোষিতের পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁর বিবরণ দেন–

কুণ্ঠিত কৃষকের লুণ্ঠিত মজুরের

লাঞ্ছিত শ্রমিকের বাঙলা
জরামারীজীর্ণ ভাগ্য-বিদীর্ণ
জেলে তাঁতি মাঝিদের বাঙলা।
শোষিতের বাঙলা পতিতের বাঙলা
পীড়িতের জননী বাঙলা
ভিখারীর বাঙলা ভুখারীর বাঙলা
অনাথের জননী বাঙলা।[১২৮]

বাংলা হলো মেহনতি মানুষের। এই বাংলা তাদের কঠোর পরিশ্রমে গড়ে ওঠা। কবি তা লেখার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। শাসক যারা শোষকের ভূমিকায় ছিলেন বাংলা তাদের নয়। তাই বাংলাকে রক্ষার দায়িত্ব ও ঐ সব মেহনতি মানুষের। শাসকগোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করা চলবে না। প্রয়োজন শাসকগোষ্ঠীকে হটিয়ে দেওয়ার কথা কবি জোর দিয়ে বলেছেন।

কবি সিকান্‌দার আবু জাফর তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলায় যে শোষণ চালায় তার কথা তুলে ধরেছেন। শুধু শোষণ নয় পাকিস্তানি শাসকদের পরিপূর্ণ রূপ তুলে ধরেন 'কেঁদেই চলেছে' কবিতায় :

মিলিটারী মেশিনগানের অট্টহাসি
পুলিসের একছিদ্র বাঁশীর সঙ্গত
সাইকেল-রিকশার ঘণ্টা মোটর-বাসের চাকার শীস
রেডিও পাকিস্তানের দরসে কোরান
সরোদ খবর অথবা লোকসঙ্গীতে
সব রকম শব্দই বুড়ীদের চোখে
কান্না গলানোর মন্ত্র।

সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ধর্মকে ব্যবহার করে যে রাষ্ট্র পরিচলিত হচ্ছিল তার প্রতি জনগণের আস্থা শূন্যতে পৌঁছে গিয়েছিল। মিয়াজানের বুড়ী বিধবা হয়েছে। শাসকদের হাতে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এখানের কবি শাসকদের আজরাইলের সাথে তুলনা করেছেন।

বাংলা ছাড়ো কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা 'কেঁদেই চলেছে'। কবি এটি রচনা করেন–১৯৬৯ সালে। দেশব্যাপী তখন চলেছে চরম বিশৃঙ্খলা। অবিচার অনাচার আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এই পটভূমিতেই 'কেঁদেই চলেছে' রচিত। প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে আরও বৃহত্তর প্রতিবেশ। কবি স্মরণ করেছেন ১৯৪৬-এর দাঙ্গা, আকাল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯-এর পুলিশি এবং মিলটারি অত্যাচার এবং হত্যার কথা। মিয়াজানের বুড়ি, বশীরের নানি এরা সবাই এই অনাচারের বলি। পরিবারের আট পোষ্যর জোগানদার মিয়াজান ১৯৬৯-এর হত্যা যজ্ঞের বলি। আর স্বামীর লাশ প্রাপ্ত মিয়াজানের বুড়ির শোকাতুর কান্নার মধ্য দিয়ে কবি স্মরণ করেছেন তার অতীতকে। মিয়াজানের বুড়ি অতীতে ছেচল্লিশের দাঙ্গায় কলেজ স্ট্রিটে তার পিতাকে হারিয়েছে আর কর্লু টোলায় বাপের সহকর্মী গোয়ালা অবনী ঘোষকে, যৌবনে আকালে তার পুত্র মরেছে।[১২৯] এমনি করেই কবি চিত্রিত করেছেন বশীর মোহাম্মদের নানিকে সে হারিয়েছে তার নাতি, জামাই এবং মেয়েকে সমাজের অন্যায় বিচারে। লম্পট মনিবের লাম্পট্যে আত্মাহুতি দিয়েছে বশীরের মা। আর স্মৃতি বহন করে কাঁদছে বশীরের নানি।

শুধু এরাই নয়, এই ঘুণ ধরা পক্ষপাতদুষ্ট সমাজে এমনি করে আত্মাহুতি দিয়েছে রমজানের দাদী করিমের ফুফু, অতীনের মাসিমা, আশেকের চাচি এবং আরও অনেকে এবং কাঁদছে আজীবন। অথচ এত আত্মাহুতির পরেও এ কান্নার বিরাম নেই, প্রতিকার নেই। বার বার সমাজের অবিচার, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা, মিলিটারীর মেশিনগান ঝাঁজরা করেছে এদের বুক, নর্দমা থেকে উঠে আসছে ময়াজানের মতো অনেক মৃতদেহ।[১৩০] কবি অবিভক্ত ভারতবর্ষ

থেকে স্বাধীন হয়ে পাকিস্তানে কোনো নতুন কিছু পায়নি বরং পূর্বের তুলনায় খারাপ হয়েছে সে কথা কবিতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন–

জীবনের অসহ্য অশ্লীল ইতিহাস ছত্রে ছত্রে লিখে
বারম্বার নিজেকে চিনে সেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় আজীবন
কাঁদছে রমজানের দাদী করিমের ফুফু
অতীনের মাসীমা, কাঁদছে মহেন্দ্রের দিদি
কাঁদছে আশেকের চাচী রহমানের খালা;
অদৃষ্টের জানালা-দরোজা ঘুলঘুলি-ঢাকা
ইতস্ততঃ রক্ত আর হাড়ের দেয়াল তবু ক্রমাগত উঁচুতে,
এবং চিরটা কাল খচ্চরগুলোর যথেচ্ছ আহারের জন্যে
মাঠে মাঠে জন্মাচ্ছে সুস্বাদু ঘাস।[১৩১]

কবি সিকান্দার আবু জাফর জনগণের হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন এতদিন যারা শোষিত পীড়িত হয়েছেন তারা আর লাঞ্ছিত হয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকবে না। তারা এ শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করবে–

অন্ধকারে আর নহে মা
এবার তোমার সকল ছেলে
নিত্য আলোর হাট বসাবে
ঘৃণার ধূপে দুঃখ জ্বেলে।[১৩২]

পাকিস্তানি শাসকদের দস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে কবি সিকান্দার আবু জাফর *বাঙলা ছাড়ো* কাব্যগ্রন্থের 'ইতিহাসচারিণী বাঙলা' (১৯৬৯) কবিতায়। এবং তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন শাসকদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হবে, বহু প্রতীক্ষার অবসানের পর আসবে গণতন্ত্র, যার নায়ক হবেন শেখ মুজিব।[১৩৩] কবির ভাষায়–

ভেঙে যাবে দস্যুর শত ষড়যন্ত্র
জনগণ বাঙলার পাবে গণতন্ত্র
দুর্বার ছেলেদের দুর্জয় মন্ত্র
জয় জয় জননী বাঙলা ॥[১৩৪]

'৬৯-এর গণআন্দোলনের সময়ে রচিত সিকান্দার আবু জাফরের পাঁচটি কবিতা-গান 'অবাক দেশের জাতীয় সঙ্গীত', 'অবাক দেশের নাম সঙ্গীত', 'অবাক দেশের বিলাপ সঙ্গীত', 'অবাক দেশের প্রেম সঙ্গীত', 'অবাক দেশের সাধন সঙ্গীত' ব্যঙ্গবিদ্রূপের চূড়া স্পর্শ করেছে।[১৩৫] এ পাঁচটি কবিতার অবাক দেশটি হচ্ছে পাকিস্তান।[১৩৬] পাকিস্তানে বিভিন্ন বিষয়ে যে অসংগতি সেই বিষয়গুলোকে অবলম্বন করেই এই কবিতাগুলো রচিত হয়।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনকে শাসকচক্র শত চেষ্টাতেও বানচাল করতে পারে নি। পূর্ব-বাংলার জাগ্রত জনতার কাছে 'কারফিউ'-এর মতো ভয়াবহ বাধাও নেহাত তুচ্ছ হয়ে যায়। তার প্রামাণ্যচিত্র উনসত্তরে প্রকাশিত একটি ছড়া :

কারফিউরে কারফিউ
দুয়ার খোলে কে
রাঙা বরণ ছেলেরা লাল
লাল মোরগের পাখার ঝাপটা
বাজলো খোয়াড়ে
উটকোমুখো সান্ত্রী বেটা
হাঁটছে দুয়ারে।
খড়খড়িতে চোখ রেখে কে
বেড়াল ডাকে মিউ
খোকন সোনার ভেংচি খেয়ে

পালাল কারফিউ।[১৩৭]

দুর্বার গণ-আন্দোলনের কাছে শাসকচক্রকে মাথা নোয়াতে হয়। জনগণের আন্দোলন সফল হয়। আইয়ুব খান ক্ষমতার জোরে এই আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল কিন্তু তা তো পারেনেনি বরং নিজের পতন ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। অনেকে এই আন্দোলনকে সমাজকাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার প্রয়াস হিসেবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে–এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে-দেশে এই লক্ষ্যে যে সংগ্রাম চলছিল, সেগুলোর সঙ্গে তাঁরা তাঁদের সাযুজ্য লক্ষ করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের উচ্ছেদ করে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করবেন। এই অপশক্তির প্রতিভূ পাকিস্তান সরকারকে উৎখাত করাও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। সেফাতুন নেছা, তাঁর 'আমরা লড়ছি, রক্ত পলাশ' কবিতা রচনা করেন।

প্রতীক্ষিত দিন অনাগত দেখে
এবং অজস্র ঊষর রজনী আশায় আশায় থেকে
অবশেষে আমাদের জীবনে এসেছে সংগ্রাম।
মুক্তির, জীবনের, আনন্দের এবং আর যা কিছু ভাল তার জন্য
তাই আজ আমরা লড়ছি প্রাণপণে।[১৩৮]

আইয়ুব খানের পতন হয় ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে। তৎকালীন শাসক ক্ষমতা হস্তান্তর করে আবার এক সামরিক শাসকচক্রের হাতে। সামরিক শাসকচক্র ধাপ্পা দিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রবল শক্তি অর্জন করে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত হন। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের পতন ঘটলেও বাঙালির জীবনে সুদিন ফিরে আসে নি। বাঙালিদের শোষণ করার যে ধারা তা অব্যাহত ছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পূর্বের মতোই শোষণ চলছিল। সারাদেশ আশা করছিল এমন একজন আসবেন যিনি বাঙালিকে পথের দিশারি দেখাবে। কবি মযহারুল ইসলাম 'বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'একটি সূর্যের হাত ধরে' কবিতায় শেখ মুজিবুর রহমানকে সেই আলোর দিশারী সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যিনি এদেশের রাজনীতিতে প্রখর উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ করে অন্ধকারকে দূর করে এবং দেশবাসীর মনে আস্থা এনে দিয়েছেন।

অতঃপর আমরা সূর্যের আলোয় অবগাহন করে
শস্য-শ্যামল আমাদের মাটিতে
দাঁড়ালাম প্রত্যয় ও বিশ্বাসে
বাড়ালাম হাত প্রশান্ত ভরসার দিগন্তে।[১৩৯]

কবি শামসুর রাহমান বাংলা মায়ের যে সাহসী সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তিনি 'টেলেমেকাস' কবিতায় যে বীরকে স্মরণ করেছেন তিনিই হলেন–বঙ্গবন্ধু। শামসুর রাহমান বলেন,

তুমি কি এখনও আসবে না? স্বদেশেল পূর্ণিমায়
কখনও তোমার মুখ হবে না কি উদ্ভাসিত, পিতা
পুনর্বার? কেন আজও শুনি না তোমার পদধ্বনি?
এদিকে প্রাকারে জমে শ্যাওলার মেঘ, আগাছার
দৌরাত্ম্য বাগানে বাড়ে প্রতিদিন। সওয়ারবিহীন
ঘোড়াগুলো আস্তাবলে ভীষণ ঝিমোয়, কুকুরটা
অলিন্দে বেড়ায় শুঁকে কত কী-যে, বলে না কিছুই।[১৪০]

এই কবিতায় শেখ মুজিবুর রহমানের কথাই বলা হয়েছে। যিনি বাঙালির আশ্রয়স্থলে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বগুণের কারণ বাঙালির মধ্যে আস্থা ফিরে আসে যে তারা পারবে। বঙ্গবন্ধু জনগণের মনের মধ্যে (We shall overcome some day) গানের প্রেরণা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। এই গানটি ছিল ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠস্বর। এই গান বিশ্বের নিগৃহীত, প্রতিবাদী ও আশাবাদী মানুষের সব চেয়ে আপন গানে পরিণত

হয়। এই গান অন্যান্য দেশের মানুষের মতো বাংলার মানুষকেও উদ্দীপ্ত করেছে। শুধু এই গানই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন বিপ্লবী নেতা বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এ রকম একটি নাম মাও সে-তুং। চীনদেশের এই নেতার অনুসৃত বিপ্লবী রণকৌশল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের অনেকে গ্রহণ করেছে এবং সে-কায়দায় যুদ্ধ চলছে ইন্দোচীন, মধ্যপ্রাচ্য, রোডেশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায়। ইন্দু সাহা 'মহান মুক্তিসূর্য মাও'-এর জন্ম কামনা করেছেন পূর্ববাংলায়, কারণ এদেশও চঞ্চল হয়ে ওঠেছে শোষকদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য।

গান গাই শঙ্কাহীন-বিজয়ের গান
গান গাই আমাদের প্রাণে প্রাণে জন্ম নিক
মহান মুক্তি সূর্য মাও–
আমরা এখন পদ্মার ঘূর্ণী ভেঙ্গে উজান চলেছি–
সামনে উপদ্রুত বঙ্গোপসাগর। (মাও সে তুং)[১৪১]

বঙ্গবন্ধুই হলো কবির চাওয়া সেই মাও সে তুং। যিনি বাঙালিকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন ৬ দফা প্রদান করে এবং কীভাবে লক্ষ্য অর্জন করা যাবে তার জন্য সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

গগন তানুর[১৪২] রচিত দুটি কাব্য–*হাতিয়ার তুলে নাও* (১৯৬৮) ও *মিছিলের আর্তনাদ* (১৯৭০)।[১৪৩] তিনি কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষের শোষণ-বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছেন। শুধু বঞ্চনার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। আশাবাদের কথা শুনিয়েছেন। উদ্বুদ্ধ করেছেন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আন্দোলনের প্রেরণা থেকে। *হাতিয়ার তুলে নাও*- এর ভূমিকায় গোলাম কিবরিয়া সম্পর্কে সমমনোভাবাপন্ন কবি ইন্দুসাহা লিখেছেন,

> তিনি সব ক্ষেত্রে পৃথিবীর নিপীড়িত, অবহেলিত আর অত্যাচারিত'র প্রতি সহানুভূতিতে নম্র। বিশেষ করে কৃষকের দুরবস্থার কথা, শ্রমিকের দুরবস্থার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সহজতর ভাষায় বলতে চেয়েছেন। ...আছে নতুন দিনের আহ্বান। আছে নতুন সূর্যালোকে স্নাত নতুন উত্তাপের প্রার্থনা। এ আহ্বান, এ প্রার্থনা আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ।[১৪৪]

মানুষের প্রতি মমতা, শোষকদের প্রতি ঘৃণা, লক্ষ্য হাসিলের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার কারণে ভিয়েতনাম, কঙ্গো, এঙ্গোলা, রোডেশিয়া মধ্যপ্রাচ্য–জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধে লিপ্ত সব অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কবি একাত্মতা অনুভব করেছেন এবং রুশ-চীন বিপ্লবের আদর্শে সংগ্রামে অগ্রসর হতে তাঁদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন :

চেয়ে দেখো ঘরে ঘরে মহান মাও-লেনিন
ঐতো সামনে শুভদিন
হাতিয়ার কাঁধে তোলো বন্ধু
হাতিয়ার কাঁধে তোলো। (হাতিয়ার কাঁধে তোলো)[১৪৫]

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে। পাকিস্তান ঔপনিবেশিক মনোভাব দিয়ে পূর্ববাংলাকে শাসন-শোষণ করছে, এই সত্যটিও সর্বত্র বিস্তৃত হয়। তা-থেকে মুক্তিলাভের জন্য অনেকে স্বাধীনতা চিন্তা শুরু করেন।[১৪৬] এই গণ-অভ্যুত্থানে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী কবিতা-রচনার দিকে কবিদের ঝোঁক পড়ে ও অনেক সুন্দর-সুন্দর কবিতা রচিত হয়। এর প্রভাবে সেকালে প্রকাশিত বুর্জোয়া মানবতাবাদী কবিতাগুলো দেখি সমষ্টির ভাবনার প্রকাশ। শেষপর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'মিছিলের আর্তনাদ' ও 'ঝড় আসছে'। এ-দুটো কবিদের বিপ্লবী সাম্যবাদী মনোভাব খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ইন্দু সাহার কাব্য *ঝড় আসছে* (১৩৭৬) প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত এ কাব্যের ভূমিকার একটি বক্তব্য থেকে কবির মনোভাব সম্পর্কে জানা যায়,

> পৃথিবীর নিরন্ন মানুষ পেটভরে খেতে পাক-সমস্ত পরাধীনতা দূর হয়ে সমগ্র বিশ্ব মুক্তি পেয়ে প্রাণ খুলে হাসুক, তার ব্যবস্থা শিল্পের লালিত্য দিয়ে চলে না। প্রয়োজন হাতিয়ারের, প্রয়োজন সূর্যের মতোন দুর্বার স্পর্ধায় মাথা তুলবার মতোন শক্তির।[১৪৭]

ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার পর থেকে বাঙালির যে কোনো জাতীয় বিপর্যয়ের সময় তা প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানও বাঙালির জীবনে সেই রূপ ভূমিকা রাখা শুরু করে। শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারকে প্রতিরোধ করার জন্য আপামর জনতা সেদিন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। প্রাণ দিয়েছিল উদ্যমী তরুণ আসাদ। কবি শামসুর রাহমান এ সম্পর্কে বলেন,

> পাকিস্তানের স্বৈরতন্ত্র বিলাসী একনায়ক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রীপ্রেমীদের আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছিল, যা ১৯৬৯ সালে চূড়া স্পর্শ করে। প্রতিবাদী মিছিলের পর মিছিলে প্রকম্পিত হতে লাগল ঢাকার পথ। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি। সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। মিছিলের শ্লোগানে শুধু রাজপথই ঝংকৃত হচ্ছে না, হচ্ছে মুক্তিকামী বাঙালিদেরও মনপ্রাণ। দুপুরে রওয়ানা হলাম দৈনিক পাকিস্তান-এর দিকে। পথে যানবাহন নেই। ঝকঝকে রোদে পথ হাঁটছি। নানা চিন্তা ভিড় করছে মনে। গুলিস্তান সিনেমা হলের কাছে আসতেই যেন সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেলাম। একটু পরেই রাস্তায় অসামান্য এক মিছিল। প্রতিবাদী মিছিলের পুরোভাগে। একটু পরেই রাস্তায় অসামান্য এক মিছিল। প্রতিবাদী মিছিলের পুরোভাগে একজন যুবকের হাতে অন্যরকম একটি পতাকা। লাঠির ডগায় জড়ানো রক্তাক্ত শার্ট। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে শার্টটি একজন সদ্য শহীদের। আমি তাকিয়ে রইলাম আসাদের শার্টের দিকে। তখন হৃদয়ে আমার তোলপাড়, কান্না স্তব্ধ দু'চোখে।... [১৪৮]

তার নামে ঢাকার মোহাম্মদপুরে, রাজপথে, গেইট নির্মাণ আর পথচারীর মুখে আসাদের নাম উচ্চারণ সাধারণের বোধের অন্তরালে বহন করছে বাঙালি জাতিসত্তার ঐতিহ্যিক অনুভূতির মাহাত্ম্য। তেমনই স্বদেশনিবিড় উপলব্ধির কথামালা সাজিয়ে তোলেন স্বদেশের মাটির-প্রত্যাশার-প্রাপ্তির সার্বক্ষণিক সঙ্গী কবি শামসুর রাহমান–

> ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
> মায়ের উঠোন ছেড়ে এক সে-শার্ট
> শহরের প্রধান সড়কে
> কারখানার চিমনি-চুড়োয়
> গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
> উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
> আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
> চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।
> আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
> সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
> আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।[১৪৯]

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলায় যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, মানুষের প্রাত্যহিত সংগ্রাম-সংঘাতে এই কবিতা প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের প্রথম শহিদ 'আসাদ' এজন্যেই কবি শামসুর রাহমানের কাছে আর একক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকে না, পরিণত হয় অখণ্ড বিপ্লবীচৈতন্যের প্রতীকে, আকাঙ্ক্ষার রক্তাক্ত বহ্নিমালায় :

> আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা
> সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
> আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।[১৫০]

বাঙালি জাতির চূড়ান্ত আঘাতের প্রস্তুতির বিষয়টি এ সময় কোনো কোনো কবিতায় উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, এই সময় যারা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছে এবং দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেননি, তাদের সম্পর্কে কবি সুফিয়া কামাল লেখেন 'ঊনসত্তরের এই দিন' কবিতায়। কবিতাটি হলো,

> মুক্তিকামী সংগ্রামী যাহারা।
> তাহাদের সাথে রব চিরদিন।[১৫১]

এবং চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এজন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কথা কবিতাগুলোতে বলা হয়। শিহাবউদ্দিন আহমেদ ১৯৬৯ সালে তাঁর 'রক্তে রাঙ্গা প্রভাব' কবিতায় এ বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন–

ওরাতো জানেনা এই বাংলার মানুষ
আরো বেশী আঘাত আর উৎপীড়নের জন্য
প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ–
আত্মবলিদানের আনন্দ-গানে উদ্দীপ্ত
যতক্ষণ না তারা পেয়েছে মুক্তির স্বাদ
পলাশীর মাঠে আর ব্যর্থতা নয়
এবার সময় এসেছে প্রচন্ড শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার।[১৫২]

৭০-এর নভেম্বরের ১২ তারিখে 'গোর্কি' নামে মহাপ্লাবন ও ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। শামসুর রাহমান এ সম্পর্কে বলেন, 'বাংলাদেশের উপকূলে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে পারে, এ রকম একটি আবহাওয়া-পূর্বাভাস প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই পূর্বাভাস কোনও মহলেই তেমন গুরুত্ব পায় নি।'[১৫৩]

'গোর্কি'-বিধ্বস্ত উপকূলীয় এলাকা পরিদর্শন করা তো দূরের কথা, পাকিস্তান-এর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীন সফর করে ফেরার পথে ঢাকায় যাত্রাবিরতি করলেও তিনি উপকূলীয় অঞ্চলে যাওয়া তো দূরের কথা কোনো নির্দেশনা না দিয়েই এয়ারপোর্ট থেকে চলে যান। মওলানা ভাসানী উপদ্রুত এলাকা সফর করে লাখ লাখ মানুষের লাশ ও দুর্দশা দেখে ঢাকায় ফিরে এসে এক জনসভায় অসামান্য এক বক্তৃতা দেন পল্টন ময়দানে। তিনি পাকিস্তান-এর ইয়াহিয়া খান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের লক্ষ্য করে শূন্যে হাত তুলে উচ্চারণ করেছিলেন, 'ওরা আসে নি।'[১৫৪] এই একটি বাক্যই যথেষ্ট ছিল পাকিস্তানি শাসকদের ধিক্কৃত করার জন্যে। ভাসানীর সেদিনের ভাষণের পর কবি শামসুর রাহমান 'সফেদ পাঞ্জাবি' নামে একটি কবিতা লিখেন,

শিল্প, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহা-প্লাবনের পর নূহের গম্ভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তুরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তাঁর বিচূর্ণিত দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু-হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলিময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদ দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখলো চেনা পল্টন নিমেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়, ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ।[১৫৫]

৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বাঙালিকে শোষণ করে। কিন্তু ৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ বাংলার মানুষকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। স্বজন হারানো বেদন আবার তাদের মধ্যে জেগে ওঠে। উপদ্রুত এলাকা সফর করে ফিরে এসে ১৯৭০ সালের ২৮ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান বলেন, 'ঘূর্ণিঝড়ে দশ লাখ লোক মারা গেছে, স্বাধিকার অর্জনের জন্য বাংলার আরও ১০ লাখ লোক প্রাণ দেবে।'[১৫৬]

সংগ্রামদীপ্ত ঐক্যচেতনা স্বাধীনতা-পূর্ব কাব্যগুলোতে উন্মুখ হয়। ষাটের দশকের কবি নির্মলেন্দু গুণের *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* (১৯৭০) কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সংগ্রামী জীবনচেতনা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। একজন কবিকর্মীর অন্বেষা তাঁকে পরিণত করেছে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিকের স্বগোত্রীয়। 'হুলিয়া' কবিতায় যেখানে 'সারি সারি চোখের ভিতরে বাংলার ভবিষ্যৎকে' প্রত্যক্ষ করেন কবি, সেখানে জীবনচেতনার এই নবতর অঙ্গীকার তাঁর মধ্যে সঞ্চার করে এক উদ্ধত উন্নত আহ্বান, রক্তাক্ত সূর্যোদয়ের অনুভূতি[১৫৭] :

> আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে
> যুবক গ্রীষ্মে ফাল্গুন পলাতক
> পলিমাখা চাঁদ মিছিলে চন্দ্রহার
> সূর্য ভেঙ্গেছে অশ্লীল কারাগার।
> ... ...
> মানুষের হাতে হত্যার অধিকার?
> পুষ্পের নীচে নিহত শিশুর শব
> গোরস্থানেও ফসফরাসের আলো
> অর্জুন যাবে স্বপ্নের সম্ভবে
> আগুন লেগেছে রক্তের মাটির গ্লোবে।[১৫৮]

কবিতার প্রভাব জনজীবনে কী-রকম পড়েছিল তা সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম-এর ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। তিনি 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' কাব্যগ্রন্থের তৎকালীন প্রভাব পরিস্ফুটিত হয়। কবিতার ভেতরে এক রকম আগুনের উত্তাপ ছিল। যার জন্য তৎকালীন সময়ের তরুণদের ছিল অপেক্ষা। নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় স্বপ্ন ছিল দিনবদল আর স্বাধীনতা নিয়ে, শ্রেণিসংগ্রাম আর বিপ্লব নিয়ে।[১৫৯] শুধু গুণের নয়, এই সময়ের প্রায় কবিতাতে এই ধারা অব্যাহত ছিল।

প্রেমাংশুর রক্ত চাই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো সেই সময় একটি প্রজন্মকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন, গোড়াসুদ্ধ। ৭০-এর নভেম্বরের পর গুণ নিজের কবিতা দিয়ে দুনিয়াটা বদলানোর পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাঁর চিন্তা মানুষ নিয়ে, সময় নিয়ে, মানুষের সংগ্রাম নিয়ে। তাঁর কবিতায় প্রেমও আছে যা সমর্পিত বিপ্লবে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এ সম্পর্কে বলেছেন,

> 'হুলিয়া' কবিতায় আমরা প্রত্যেকে নিজেদেরই আবিষ্কার করতাম, যেন মাথায় হুলিয়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরাও, সেই বিপ্লবীর বেশ ধরে আমরাও মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে পৌঁছে গেছি গ্রামের বাড়িতে, এবং 'মা আমাকে ক্রন্দনসিক্ত একটি চুম্বনের মধ্যে/ লুকিয়ে রেখে অনেক জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে/ পুকুরের জলে চাল ধুতে গেলেন...'।[১৬০]

পাকিস্তানি সরকার কীভাবে দমন-পীড়ন চালিয়েছিল তা সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের কথায় ফুটে ওঠে। সত্তরের ডিসেম্বরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গণভোটের ফলাফল দেশে পশ্চিমা শাসকচক্র হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাদের সর্বময় কর্তৃত্ব বাঙালির হাতে চলে যাবে এবং দুই যুগ ধরে বাঙালিকে শোষণ ও শাসন করার আর কোনো ক্ষমতা থাকবে না, এই আশংকায় তারা আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফন্দি-ফিকির আঁটতে থাকে।[১৬১] বাঙালিরা সে সম্পর্কে সজাগ ছিল। তাদের কাছে মনে হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা সময়গুলো নষ্ট হয়েছে। পাকিস্তানি শোষকদের কবি বাংলা ছাড়ার আদেশ দিচ্ছেন এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ভার তুলে নেওয়ার কথা বলেছেন 'বাঙলা ছাড়ো' কবিতায় :

> রক্তচোখের আগুন মেখে ঝলসে-যাওয়া
> আমার বছরগুলো
> আজকে যখন হাতের মুঠোয়
> কণ্ঠনালীর খুনপিয়াসী ছুরি,

কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে
কেউটে সাপের ঝাঁপি!
আমার হাতেই নিলাম আমার
নির্ভরতার চাবি; তুমি আমার আকাশ থেকে
সরাও তোমার ছায়া,
তুমি বাংলা ছাড়ো।[১৬২]

বাঙলা ছাড়ো কাব্যগ্রন্থের নামকরণ এই কবিতার নামেই হয়। ৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১৬৩] শোষণকারীর মুখোশ কবির কাছে খুলে গেছে। বিগত বছরগুলোর তিক্ত এবং বেদনাময় স্মৃতি কবির মনে যে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে সেই সমস্ত বেদনা এবং ঘৃণার আগুন একত্রিত হয়ে যেন 'বাঙলা ছাড়ো'র প্রথম স্তবকে জ্বলে উঠেছে। এটি যেন কবির কথা নয় বাংলা জনগণের কথা কবির কলম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।[১৬৪]

কবি 'বাঙলা ছাড়ো' কবিতায় বাংলা মানুষের চাওয়া কী ছিল আর পাকিস্তানি শোষকের দল কীভাবে শোষণ করেছে সে চিত্র তুলে ধরে বলেছে–

মেঘ চেয়েছি ভিজিয়ে নিতে
যখন পোড়া মাটি
বারেবারেই তোমার খরা
আমার প্রীতি তোমার প্রতারণা
যোগ-বিয়োগে মিলিয়ে নিলে
তোমার লাভের জটিল অংকগুলো,
হতাশ্বাসের ধুলো।
আজকে যখন খুঁড়তে গিয়ে
নিজের কবরখানা
আপন খুলির কোদাল দেখি
সর্বনাশা বজ্র দিয়ে গড়া[১৬৫]

এই কবিতার মাধ্যমে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বাঙালির ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাকে বাংলা থেকে বিদায় হতে বলেছেন। কবিতার মাধ্যমে যে প্রতিবাদের ভাষা কত তীব্রতর হতে পারে এ থেকেই তা বোঝা সম্ভব হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালির একাত্মতার স্বপ্ন যখন মিলিয়ে গেল, প্রীতির বিনিময়ে বাঙালিরা যখন পেল প্রতারণ; খরা ও হতাশা যখন স্থায়ী হতে শুরু করলো, তখন শেষবারের মতো এদেশের মানুষ মাথাচাড়া দিয়ে ডাক দিলো–তোমরা বাংলা ছেড়ে যাও।

কাজ কি দ্বিধার বিষণ্নতায়
বন্দী রেখে ঘৃণার অগ্নিগিরি।
আমার বুকেই ফিরিয়ে নেবো
ক্ষিপ্ত বাজের থাবা;
তুমি আমার জলস্থলের
মাদুর থেকে নামো,
তুমি বাংলা ছাড়ো।[১৬৬]

আবদুল মান্নান সৈয়দ *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ডে*র ভূমিকা সিকান্দার আবু জাফরের 'বাঙলা ছাড়ো' কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "'বাঙলা ছাড়ো' কবিতা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার কবিতা-ভিত্তি রচনা করেছিলেন।"[১৬৭]

১৯৭১ সালে রচিত তাঁর 'জনতাকে দেখছি' কবিতায় বর্গীদের তাড়িয়ে নতুন দেশ গড়ে তোলার শপথ তিনি করেন–

বর্গীরা এসেছে আবার দেশে
দেখছি
জনতা-চোখ জ্বলছে
বর্গী তাড়ানোর নতুন গানে
'বাঙলাদেশ' মুক্ত করেই
নতুন করে গড়বে তারা
জীবনবোধের অন্য মানে।[১৬৮]

'বাঙলা ছাড়ো' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা হলো–'তখন রাত্রিশেষ'। কবিতাটিতে কবি নতুন ভোরের নতুন আলো, তথা নতুন দিনের প্রত্যাশার কথা বলেছেন। বাদুড়, প্যাঁচা, শেয়াল এরা সব রাত্রিচর জীব। তাই তারা যতই প্রহর ঘোষণা করুক না কেন, যতক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হবে না, ততক্ষণ প্রভাতের আশা দূরাশা।
তেমনি কবির বক্তব্য–শকুন, শেয়াল, বাদুর প্যাঁচারূপী অত্যাচারীর অত্যাচারের দেয়াল যতক্ষণ অটুট থাকবে, যতক্ষণ না তাদের হুমকির প্রাচীর ভেঙে দেওয়া যাবে, ততদিন বাংলার সুদিন আসবে না। আর এ অত্যাচারীর দেয়াল ভাঙতে হলে–

ঘুমিয়ে থাকা দেশের মানুষগুলো
হঠাৎ যখন বন্ধ চোখের জান্‌লা দুয়ার খুলে
অনুভূতির আলোয় মোছে
অচেতনার ধূলো,
আঁধার ভেঙে এগিয়ে আসে
নতুন ভোরের চাকা
রাত্রি পড়ে ঢাকা।[১৬৯]

'আর কতকাল দেরী' কবিতা রচনাকাল ৩০ জানুয়ারি ১৯৭১। যখন চলছে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এবং প্রতিশোধের তীব্র আগুন। সেই ডামাডোলের মধ্যে বসেও কবি সিকান্‌দার আবু জাফর খুঁজেছেন মুক্তি ও স্বাধীনতা। চারদিকে দেখছেন আসন্ন ঝড়ের সংকেত। তাই কবি লিখেছেন–

প্রতিদিনের প্রবঞ্চনা লুকিয়ে রাখে যারা
তাদের হাতেই জীবনমরণ
দুই সীমানার চাবি,
জীবনটাকে কাড়তে হলে
নির্বিচারে মানতে হবে
লক্ষ মরার দাবী।[১৭০]

নজরুলের বিদ্রোহীচেতনা ও সুকান্তর শ্রেণিচেতনার অনুসরণে, কখনো-কখনো দুয়ের সমন্বয়ে বিদ্রোহ-বিপ্লব-গণজাগরণমূলক কিছু কবিতা পাকিস্তান আমলে রচিত হয়েছে। পুরো পাকিস্তান আমল ধরে রচিত হলেও, ১৯৬০ সালের পর থেকে এ ধরনের কবিতার সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। ধারাটি বেশি উৎকর্ষ লাভ বা বিকাশ হয়নি। কারণ, অনেকে কাব্য রচনার পর এ-বিষয়ে লেখার উৎসাহ হারিয়েছেন শাসকগোষ্ঠীর চাপে ও নির্যাতনে।[১৭১] তবে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীচেতনার জয় হয় মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে কবিতার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছেন,

> ষাট গিয়ে সত্তরে ঠেকল, দেশের রাজনীতি উত্তপ্ত হলো, মানুষ পথে নামল। স্কুলের শিশুও জানল, সামনে পরিবর্তন। কবিতাকে ছুটি দিয়ে এই সময় মানুষের তো সংগ্রামের মিছিলে নামারই কথা। কিন্তু ছুটি কী দেবে মানুষ, উল্টো কবিতাকে তারা হাতে তুলে নিল ঝান্ডার মতো।[১৭২]

আন্তর্জাতিক তৎকালীন বিষয়াবলিও বাঙালির জাতীয়তাবাদ পরিস্ফুটনে ভূমিকা রাখে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কর্তৃক কঙ্গোর মুক্তিকামী জনতার নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা ১৯৬১ সালে নিহত হন। এ হত্যাকে উপলক্ষ্য করে রচিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিভিন্ন কবিতা ও প্রবন্ধের সংকলন 'আফ্রিকার হৃদয়ে সূর্যোদয়' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। যা বাংলার তরুণদের উৎসাহিত করে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানের জন্য। ১৯৬২ সলের প্রকাশিত হয় দুটি সংকলন–'শ্যামলী দেশের ক্ষত প্রান্তর' ও 'শান্তির স্বপক্ষে আমাদের কবিরা'। প্রথমটিতে মেহনতি মানুষের দুঃখ-কষ্ট, পূর্ববাংলার সামগ্রিক দুর্দশা এবং তার অবসানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টিতে কয়েকজন নবীন ও প্রবীণ কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলো যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিকামী চেতনায় প্রদীপ্ত। 'মিছিল' কাব্যগ্রন্থে ধনী ও গরিবের জীবনের ব্যবধান ও সংগ্রামের মাধ্যমে তার অবাসন করার কথা আছে।[১৭৩]

নাটক

সমাজ ও জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পকর্ম হলো নাটক। তাই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব নাট্যসাহিত্যে পড়া খুবই স্বাভাবিক। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি এবং সমাজের ব্যক্তি তথা শ্রেণিসমূহকে সামাজিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করার একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া হলো রাজনীতি। এ রাজনীতি সবকালেই ছিল জীবনসম্পৃক্ত। জীবনসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এ রাজনীতি ভবিষ্যৎ সুন্দর সমাজ গড়ার পথ নির্দেশ করেছে। সমাজ ও দেশ যখন রাজনীতি সম্পৃক্ত তখন সাহিত্য-শিল্প-সমাজ ও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আর নাটক যেহেতু সমাজ ও জীবন নিয়েই নির্মিত ও আবর্তিত, তাই নাটকে মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি সমাজের নানাবিধ অনাচার, শোষণ-বঞ্চনা, কুসংস্কার, অর্থহীন যুক্তিহীন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আচার প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-চেতনা থাকাও স্বাভাবিক। তাই নাটক যৌথ শিল্পের সব দাবি পূরণ করেও সমকালীন সমস্যায় রাজনৈতিক অবস্থার ধারক হয়ে উঠতে পারে খুব সহজেই। এটি বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় শোষিত লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমস্বার্থবোধ এবং সহমর্মিতায় অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সংকল্প মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। প্রত্যেক যুগেই অত্যাচারিত শোষক গোষ্ঠী যখন সমাজ বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে তখন তার বিপক্ষে বঞ্চিত গণমানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের তাগিদ অনুভূত হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। নাটকও এর ব্যক্তিক্রম নয়।[১৭৪] আমরা স্মরণ করতে পারি নীলকরদের অত্যাচার-অবদমন ও শোষণের বাস্তবচিত্রভিত্তিক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৯৬০) নাটকের কথা। এই নাটকের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াতেই এদেশে জোরপূর্বক নীলচাষ বন্ধ হয়েছিল, শোষকের শাস্তির বিধান হয়েছিল। শোষিতের পক্ষে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত সমর্থন দিতে বাধ্য হয়েছিল 'নীলদর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু ও এর প্রভাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির সজাগতা তথা মানবিকতার প্রশ্নে।

পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুটি পৃথক খণ্ডিত স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থানের দূরত্বের সঙ্গে মানসিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব বিদ্যমান ছিল। এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও ছিল না।[১৭৫] ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান আলাদা হলেও পাকিস্তানের একটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান তখনও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের মতোই পূর্ববাংলার জনগণকে শোষণ করে আসছিল। ভাষা আন্দোলনের পর দুইবার সামরিক শাসন এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদির কারণে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারেনি। '৪৭-পরবর্তী এবং '৭১-পূর্ববর্তী এই মধ্যবর্তী কালপর্বের পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভাঙাগড়া, ঘনঘন রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন, সর্বোপরি পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক সরকারের স্বৈরশাসন বাংলা নাটকের অগ্রযাত্রাকে করেছে বাধাগ্রস্ত, বিপর্যস্ত কখনো নিষিদ্ধ। ১৯৫৮-এরপর পূর্ববাংলার জনগণ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকারের শোষণ-নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এ রকম অবস্থায় নাটকে সমকালের বাস্তবচিত্র তুলে ধরা নাট্যকারদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসনের একটা পর্যায় যাত্রা ও নাটকের মঞ্চায়নই ছিল নিষিদ্ধ।[১৭৬] ইংরেজ সরকার পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধীনতার চেতনা যেন নাটকের মধ্য দিয়ে প্রসার লাভ

করতে না পারে তার জন্য ১৮৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করেছিল যা পাকিস্তান সরকার স্বার্থরক্ষা করবে বিবেচনা করে বহাল রেখেছিল।[১৭৭] এই আইনের আওতায় পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী নাটক মঞ্চায়ন করার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। অর্থাৎ ৪৭-এর দেশভাগের পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়নে বাঙালির সব আশা-আকাঙ্ক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বাঙালি তার নাট্যচর্চা অব্যাহত রেখেছে।[১৭৮] কারণ নাট্যকলার প্রতি বাঙালির সহজাত আকর্ষণবোধ তীব্র ছিল। নাট্যচর্চা বাঙালির জীবনধারার সঙ্গে মিশে ছিল। এ সময় বাঙালি নাট্যকারগণ ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক নাটক রচনার মাধ্যমে জনগণকে সমকালের বিভিন্ন আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। কখনোবা নিয়েছেন প্রতীক বা রূপকের আশ্রয়। অর্থাৎ সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থার চিত্র তাঁরা অনেকেই নাটকে তুলে ধরেছেন।[১৭৯]

নাটকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালিত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব

পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে একাধিক মুসলিম নাট্যকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ৪৭ পর্যন্ত হিন্দু ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যবিত্ত হিন্দুরা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আধিপত্য করছিল। দেশবিভাগের পর তাদের অধিকাংশ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করলে স্থানীয় মুসলমান নাট্যকারদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটে।[১৮০] এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিত্রে দুটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে দেখতে পাওয়া যায়–এক. রক্ষণশীল ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং অন্যটি প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী। অবশ্যম্ভাবীভাবে নাট্যকলাতেও এ দুটি গোষ্ঠীর মতবাদ প্রতিফলিত হয়।[১৮১]

রক্ষণশীল মৌলবাদী ধারার নাট্যকারেরা প্রধানত ঢাকার বাইরে মফস্‌সলগুলোতে অধিক মাত্রাই আধিপত্য বজায় রাখেন। তাদের নাটকের বিষয় কখনো মোগল ইতিহাস, কখনো মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, কখনো দেশীয় মুসলিম ঐতিহ্য; আবার কখনো বা পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।[১৮২] এ ছাড়া তাঁরা সামাজিক ও অন্যান্য শ্রেণির নাটকও লিখেছেন। এই ধারার উল্লেখযোগ্য নাট্য রচয়িতারা হচ্ছেন–আকবর উদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) ও ইব্রাহীম খলিল (জন্ম ১৯১৬)। আকবর উদ্দীনের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে–'সিন্ধু বিজয়' (১৯৩০), 'সুলতান মাহমুদ'; রূপকাত্মক নাটকের মধ্যে–'বন্দীমুক্তি' (১৯৫৪) এবং সামাজিক নাটকের মধ্যে–'আজান' ও 'অভিশাপ' উল্লেখযোগ্য। শাহাদাৎ হোসেন লিখেছেন কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক নাটক যেমন 'মসনদের মোহ', 'সরফরাজ খান', 'আনারকলি' ইত্যাদি। ইব্রাহীম খাঁ রচিত নাটকের মধ্যে 'কামালপাশা', ও 'আনোয়ারপাশা' এবং ইব্রাহীম খলিলের 'স্পেন বিজয়ী মুসা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৮৩]

প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধারার নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরা এই সময় তাদের নাট্যচর্চা ঢাকাতেই বাজায় রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সঙ্গে এই কর্মীরা যুক্ত ছিলেন। এই মতবাদের নাট্যকারগণ প্রধানত 'জীবন ঘনিষ্ঠ ও সমাজ-স্পর্শী' নাটক রচনা করেন। সামাজিক সমস্যা, নিপীড়িত শোষিত মানুষের দুর্দশার চিত্র, সমসাময়িক নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রশাসন তথা সরকারের আমলাতন্ত্র ইত্যাদি ছিল তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তু। এছাড়াও তাঁরা সামাজিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও নাটক রচনা করেন। এই শ্রেণির উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন–শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৯), নুরুল মোমেন (১৯০৮-১৯৯০), আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৯১৭১), ওবায়েদ-উল-হক (১৯১১-২০০৭) এবং সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)। এঁদের নাটকগুলোর মধ্যে শওকত ওসমানের 'তস্কর ও লস্কর', 'কাঁকরমণি', 'আমলার মামলা'; নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস', 'রূপান্তর', আসকার ইবনে শাইখের 'বিরোধ', 'পদক্ষেপ', আবুল ফজলের 'প্রগতি', কায়েদ-এ-আজম'; জসীমউদ্‌দীনের 'পদ্মাপার', 'বেদের মেয়ে'; মুনীর চৌধুরীর 'স্বামী সাহেবের অনশন ব্রত', 'বেশরিয়তি'; ওবায়েদ-উল-হকের পাঁচটি একাঙ্কিকার সংকলন 'দিগ্বিজীয়

চোরাবাজার', সৈয়দ আলী আহসানের 'কোরবাণী' উল্লেখযোগ্য।[১৮৪] এই দুই শ্রেণির নাট্যকারদের রচিত নাটকের মাধ্যমে পাকিস্তানের রাজনীতির যে দ্বন্দ্বিক রূপ তা ফুটে ওঠে।

নব্যসৃষ্ট পাকিস্তানে নাট্যকার

নানারকম অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে বাঙালি স্বাধীন দেশের জন্ম দেয় তার প্রথম ধাপ ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার স্থলে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চাইলে বাঙালি এ আন্দোলন করে। ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয়জীবনকে সবদিক থেকে নাড়া দিয়েছিল। অর্থাৎ এর প্রভাব সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পড়েছিল। ফলে শিল্প-সংস্কৃতি নতুন মোড় নিয়েছিল। নাট্যক্ষেত্রেও ভাষা আন্দোলনের প্রভাব পড়ে।[১৮৫] ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন রক্ষণশীল মৌলবাদী ও গণতান্ত্রী-মানবতাবাদী শক্তির মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছিল। রঙ্গমঞ্চের পর্দাতেও আমরা উল্লিখিত ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করি।[১৮৬] বিশেষ করে গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী নাট্যকারগণ তাদের নাটকসমূহে 'রাজনৈতিক অঙ্গীকার দ্বারা চিহ্নিত সামাজিক বিষয়াদি' তুলে ধরে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।[১৮৭] ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত সময়ে প্রদর্শিত নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী এবং আনিস চৌধুরীর নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপ ছিল বেশি। এই নাটকগুলোতে সমাজের অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদই প্রধান হয়ে ওঠে। এই পর্বে মুনীর চৌধুরী একুশের চেতনার ভিত্তিতে সূচনা করলেন এক নতুন নাট্য আন্দোলন। ১৯৫৩ সালে আন্দোলনের বন্দি হিসেবে তিনি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বসে ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচনা করেন 'কবর' এবং সেখানেই তা প্রদর্শিত হয়।

১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত কালপর্বে নাটকগুলো হলো–আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র'; আসকার ইবনে শাইখের 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'দুরন্ত ঢেউ'; শওকত ওসমানের 'বাগদাদের কবি'; ওবায়েদ-উল-হকের 'এই পার্কে'; জসীম উদ্‌দীনের 'মধুমালা', 'পল্লীবধূ'; আজিমুদ্দীন আহমদের 'মহুয়া'। এর মধ্যে আসকর ইবনে শাইখের 'দুরন্ত ঢেউ' গ্রন্থভুক্ত নাটিকা 'দুর্যোগ' বায়ান্নোর প্রতিবাদের পটভূমিকায় রচিত।[১৮৮] সুকুমার বিশ্বাস মন্তব্য করেন, 'বায়ান্নর বাংলা ভাষা আন্দোলন নাট্যকারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।'[১৮৯]

১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছিল তখন আসকার ইবনে শাইখ 'দুর্যোগ' নাটিকা রচনা করেন। নাটিকাটিতে প্রচলিত শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তরুণ আমজাদের নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার চিত্র তুলে ধরেছেন। নাটকের মধ্য দিয়ে দুই প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার যে পার্থক্য আছে তা উঠে এসেছে। পাকিস্তান সরকারের আমলা আখতার সাহেব একমাত্র কন্যা রাজিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমজাদকে লালন-পালন করেন। কিন্তু আমজাদ তার বাসনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। আখতার সাহেব স্ত্রী মাজেদার কাছে আক্ষেপ করে বলেছেন :

> আখতার॥... আমার মুখ পুড়িয়েছে সে। আপিসের অনেকেই জানে, এই আমজাদের সঙ্গেই আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। এ অবস্থায় ওইসব পুচকে ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করা তার ঠিক হয়েছে।[১৯০]

তৎকালীন সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণার ধারক ও বাহক আখতার সাহেব–যিনি জন্মগতভাবে সামন্ত ঐতিহ্যে লালিত, তীব্র অহংবোধ ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর আভিজাত্যের বেড়াজাল ভেঙে মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে আসতে পারেননি, বরং ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। নবীন ও প্রবীণের এই বিরোধর চিত্রটি নাট্যকার নিম্নে উদ্ধৃত সংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন :

> আখতার॥ ছেলেদের এই আন্দোলনে তুমি নেতৃত্ব নিয়েছো?

আমজাদ॥ ওদের সঙ্গে কাজ করছি আমি।

আখতার॥ সরকারের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ, সরকার নীরবে সহ্য করবে না জান?

(আমজাদ নিরুত্তর) ...

তোমায় এসব ছাড়তে হবে। তুমি ছাত্র, লেখাপড়াই তোমার একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। তাছাড়া তোমার সামনে এবার এম.এ আর সি.এস.পি. দুটো পরীক্ষা রয়েছে। ভাল করে না পড়লে...

আমজাদ॥ সি.এস.পি. পরীক্ষা আমি দেব না।

আখতার॥ দেবে না? কারণ

(আমজাদ নিরুত্তর)

এই সমস্ত নোংরা রাজনীতি করবে তুমি?

আমজাদ॥ রাজনীতি নয়, দেশের সেবা আমরা জীবনের ব্রত।

আখতার॥ কিন্তু আমি তা চাইনা। এ তোমার ব্রত হোক।

আমজাদ॥ এ আমার আদর্শ।

আখতার॥ তুমি এ বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ?

আমজাদ॥ আদর্শ আমার স্থির লক্ষ্য।[১৯১]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর–শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে চিন্তা-চেতনার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শিক্ষিত তরুণ এবং ব্রিটিশ ভারতে যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের মধ্যে মতগত পার্থক্য ছিল। বঞ্চনা-প্রসূত অভিজ্ঞতার ফলে এবং ক্ষোভবশত হিন্দু শোষণমুক্ত বয়স্করা ক্ষতি স্বীকার করেও পাকিস্তানের স্থায়িত্ব রক্ষায় তৎপর ছিলেন। অন্যদিকে শিক্ষিত তরুণ সমাজ বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থেকে আন্দোলন ও বিক্ষোভের মাধ্যমে তাদের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। দুর্যোগ নাটিকার 'আখতার সাহেব' ব্রিটিশ শোষণ, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধ ও সংঘাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার কারণে তিনি পাকিস্তানের নিরাপত্তা কামনা করেছেন। কিন্তু আমজাদ নব্যশিক্ষিত তরুণ যুবক, সে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে মেনে নিতে পারেনি। দেশের দুর্দিনে তাই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত জনতার স্লোগানমুখর মিছিলে সে হারিয়ে গেছে। এভাবে দেশের তরুণ ছাত্রসমাজ প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে মানবিক মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।[১৯২]

পঞ্চাশ-ষাটের দশকের শক্তিশালী নাট্যকার হিসেবে বাঙালিত্বের পক্ষে নাটক লিখে প্রশংসিত হয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯১২-৭১), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১), আনিস চৌধুরী (১৯২৯-৯০), সাঈদ আহমদ (১৯৬৩-২০১০), শওকত ওসমান (১৯২১-৯৮) ও আসকর ইবনে শাইখ (১৯২৫) প্রমুখ কৃতীব্যক্তিত্ব।[১৯৩] অন্ধবিশ্বাসের মোহভঙ্গ, প্রাচীন মরচে-ধরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ও আধুনিক শুদ্ধজীবনবোধের জয়গান ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। দেশীয় বিষয়বস্তুকে তিনি পাশ্চাত্য ভাবধারার আলোকে উপস্থাপন করেছেন। শওকত ওসমান কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও নাটক রচনায় তাঁর দক্ষতা স্বীকার্য। *আমলার মামলা* (১৯৪৯), *তস্কর লস্কর* (১৯৫৫) প্রভৃতি নাটকে সাফল্য অর্জনের পর তিনি আর নাট্যকর্মের সাথে ঘনিষ্ঠ থাকেন নি। আসকার ইবনে শাইখ *অগ্নিগিরি* (১৯৫৯), *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫) প্রভৃতি নাটকে বাঙালির শোষণ ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরে বাঙালিত্বের জাগরণের পক্ষে লিখেছেন। আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র* (১৯৬৩)-এ স্কুল মাস্টার মজিদের যে-সমস্যা ও করুণ অবস্থা কিংবা *এ্যালবাম* (১৯৬৫) নাটকে বিত্তবান ও বিত্তহীনের যে জীবনালেখ্য বিধৃত, তা আমাদের সমাজব্যবস্থার স্বরূপকেই চিহ্নিত করে। সাঈদের নাটকের উপকরণও আমাদের সমাজ-জীবন থেকে গৃহীত। তাঁর *কালবেলা* (১৯৬১), ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বসের পটভূমিকায় এবং *মাইলপোস্ট* (১৯৬৪) দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের তীব্র আর্তনাদের প্রেক্ষাপটে রচিত।[১৯৪] যা তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বাঙালির জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উল্লিখিত নাটক ও নাট্যকাররা ছাড়াও এ পর্যায়ে আর এক দল নাট্যকার ছিলেন, 'যাদের সৃষ্টিকর্মে ভাষা আন্দোলনের চেতনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না বরং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ তাদের কর্মকাণ্ডকে আচ্ছন্ন করে রাখে।'[১৯৫]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে যে বাংলা নাট্যচর্চা, সেখানে মুসলিম ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য পেয়েছে।[১৯৬] এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও তাঁদের সৃষ্টিকর্মগুলো হলো–আকবর উদ্দীনের 'নাদির শাহ'; ইব্রাহীম খলিলের 'ফিরিঙ্গিরাজ'; ইব্রাহীম খাঁর 'ঋণ পরিশোধ' এবং আবদুল হকের 'অদ্বিতীয়া'।[১৯৭] এছাড়াও যারা বাঙালিত্বের পক্ষে বা মানবতার পক্ষে বলেননি বা বলতে পারেননি কিন্তু মানসিকভাবে পাকিস্তানপন্থি তারা নিজেদের নাটকে হালকা[১৯৮] জীবনবোধের প্রাধান্য দিয়েছিল।

নাটকে পাকিস্তানি রাজনীতির প্রতিফলন

১৯৫৮-১৯৭১ পর্যন্ত সময়ে বাংলা নাটককে দুইটি পর্যায় ভাগ করা যেতে পারে। একটি হলো–বাঙালির প্রতিরোধের কাল যার সময়সীমা (১৯৫৮-৬৭) এবং আরেকটি হলো–বাঙালির বিস্ফোরণের কাল যার সময়সীমা (১৯৬৮-১৯৭১)।[১৯৯] ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে সামন্তচেতনা, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির পুনরুজ্জীবন স্পষ্টতর হয়। সামরিক প্রশাসনের রাজনৈতিক নিপীড়ন, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র এ সময় তীব্র আকার ধারণ করে। এ সময় বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক ও মার্ক্সীয় চেতনা দৃঢ়তর রূপ নেয় যা সমাজ ও দেশকাল ছাপিয়ে নাট্যচর্চা ও নাট্যসৃষ্টিতেও লক্ষ করা যায়।[২০০]

এ পর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ', 'উজানে মৃত্যু'; সাঈদ আহমদের 'কালবেলা'র মতো বৈচিত্র্যময় ও নিরীক্ষাধর্মী নাটকের পাশাপাশি মুনীর চৌধুরী, আসকার-ইবনে-শাইখ, নুরুল মোমেনের বেশ কয়েকটি নতুন নাটক পাওয়া যায়। এ নাটকগুলোর মধ্যে মুনীর চৌধুরীর (*রক্তাক্ত প্রান্তর*, *চিঠি*, *মর্মান্তিক*, *দণ্ডধর*); আসকার-ইবনে-শাইখের (*অগ্নিগিরি*, *অনুবর্তন*, *বিলবাওরের ঢেউ*, *রক্তপদ্ম*, *এপার ওপার*, *অনেক তারার হাতছানি*); নুরুল মোমেনের (*যদি এমন হতো*, *আলোছায়া*, *নয়া খান্দান*, *আইনের অন্তরালে*) উল্লেখযোগ্য।

এই পর্যায়ে আরও যে কজন নাট্যকার নাটকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তাঁরা হলেন–আলাউদ্দিন আল আজাদ (*মরক্কোর যাদুকর*, *ইহুদির মেয়ে*, *মায়াবী প্রহর*, *ধন্যবাদ*); আযীমউদ্দীন আহমদ (*মা*, *অহঙ্কার*, *কাঞ্চন*); আনিস চৌধুরী (*মানচিত্র*, *এ্যালবাম*); বজলুর রশীদ (*উত্তর ফাল্গুনি*, *সংযুক্তা*, *ত্রিমাত্রিক*, *শিলা ও শৈলী*, *সুর ও ছন্দ*); সিকান্দার আবু জাফর (*সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, *মহাকবি আলাউল*, *মাকড়সা*, *শকুন্ত উপাখ্যান*); রাজিয়া খান (*আবর্ত*); লায়লা সামাদ (*বিচিত্র*); ফররুখ আহমদ (*নৌফেল ও হাতেম*) প্রমুখ নাট্যকাররা।

১৯৫৮-৬৭ কাল পর্যায়েও 'ড্রামা সার্কল' নাট্য মঞ্চায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে সামন্ত মূল্যবোধাশ্রয়ী শক্তি তথা সরকারি প্রশাসনযন্ত্রে সকল অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে 'ড্রামা সার্কল'-ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাজ ও রাণী*, *তাসের দেশ* এবং *রক্তকরবী* মঞ্চস্থ করে।[২০১] 'ড্রামা সার্কল' এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের নাটকসহ রূপান্তরিত ও অনূদিত বেশ কটি নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *বহিপীর* (১৯৬১) এবং সাঈদ আহমদের *কালবেলা* (১৯৬২) প্রদর্শন করে পূর্ববাংলার নাট্যাঙ্গনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপীয় চেতনা প্রভাবিত নাট্যচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৮-১৯৭১ কালপর্বে বাংলাদেশের মানুষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সোচ্চার হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেতনা যেমন শক্তিশালী রূপ নেয়, তেমনি সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনেও এই চেতনার উপস্থিতি লক্ষণীয়। নাট্যচর্চা তথা নাটকের ধারায় এই চেতনার উপস্থিত দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর নাটক আর কেবলমাত্র চার দেয়ালের আলোকোজ্জ্বল পাদপীঠে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নাটক নেমে এসেছে জনতার কাতারে-রাজপথে, মিছিলে।[২০২]

এই পর্বে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও তাঁদের নাটকগুলো হলো শওকত ওসমান (*ক্রীতদাসের হাসি*); ওবায়েদ-উল-হক (*রুগ্না পৃথিবী*); আসকার-ইবনে-শাইখ (*লালন ফকীর*, *প্রচ্ছদপট*); নুরুল মোমেন (*শতকরা আশি*, *যেমন ইচ্ছা তেমন*, *রূপলেখা*, *হোসেন সফদারের উইল*); আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (*একে একে এক*, *ধান কমল*, *রূপান্তর*); মুনীর চৌধুরী

(ছয়টি একাঙ্কিকা সংকলন–*পলাশী ব্যারাক*, *ফিটকলাম*, *আপনি কে*, *একতালা দোতালা*, *মিলিটারী* এবং *বংশধর*); সাঈদ আহমদ (*মাইলপোস্ট*, *তৃষ্ণায়*), জিয়া হায়দার (*শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*)।[২০৩]

১৯৪৭-১৯৭১ কাল পরিসরে ছয়শোর অধিক নাটক রচিত, কয়েকশো নাট্য সংগঠন, হল সংসদ ও অন্যান্য সংস্থা অসংখ্য নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। এই নাটক মঞ্চায়নে দুটি ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয়–এক, মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক মার্ক্সীয় চেতনা এবং দুই, সামন্ত ও ধর্মীয় চেতনাজাত। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও এ দুটি ধারা লক্ষণীয়।[২০৪] ষাটের দশক থেকে মুক্তাঙ্গনে নাটক মঞ্চায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নাটককে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। এ পর্বেই পথনাটক *জনে জনে জনতা*, *পোস্টার* প্রভৃতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[২০৫] ষাটের দশকে রচিত নাটকগুলোতে পাকিস্তানের শাসকদের অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে নাট্যকারগণ প্রতীকী আশ্রয় নিয়ে বাঙালির পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং বাঙালিকে জাগিয়ে তোলার কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও আমরা পেয়েছি নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সিকান্দার আবু জাফর, সাঈদ আহমদ, মমতজ উদ্দীনের মতো শক্তিশালী, প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার এবং তাঁদের রচিত বেশকিছু সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন নাটক।

এ সময় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির জাতীয়তাবাদী উত্থান বিনাশের জন্য চক্রান্ত শুরু করে। তারা বাঙালি-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে ভারতীয় ও হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব শনাক্ত করে এবং পাকিস্তানের ধর্মাদর্শ-অনুযায়ী তাকে পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিংবদন্তি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে ধর্মীয় উদ্দীপনামূলক নাটক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ রকম কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

মরক্কোর যাদুকর (১৯৫৯)

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর পাকিস্তানে শ্বাসরুদ্ধকর বিভীষিকাময় পরিবেশ বিরাজ করছিল। এ রকম এক পরিবেশে আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৫৯ সালে লিখেছেন 'মরক্কোর যাদুকর' নাটকটি। এটি রূপকের আশ্রয়ে লেখা। নাটকের নায়ক আলাদ্দিন অন্যায়-অত্যাচার-অসুন্দর আর অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী চরিত্র। নাট্যকার আলাদ্দিনকে সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব এবং সত্য সুন্দর ন্যায় ও কল্যাণের প্রতীক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলাদ্দিন হলেন সংগ্রামী জনতার প্রতিনিধি এবং এখানে জাদুকর বলতে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বোঝানো হয়েছে। জাদুকরকে এঁকেছেন অসুন্দর জড় স্বার্থবাদী আর অসত্যের প্রতীক হিসেবে। স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলিত অবরুদ্ধ সময়ে রূপক আশ্রয় ব্যতীত অন্যায় আর অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কাহিনি রচনা করা কোনো লেখকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না।[২০৬]

ন্যায় আর কল্যাণের প্রতীক সংগ্রামী আলাদ্দিন অন্যায় অত্যাচার আর অশুভ শক্তির প্রতীক জাদুকরকে যখন বলেন,

> : একে ফাঁসী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই হিংসা দ্বেষ অত্যাচার অনাচারপূর্ণ পৃথিবীতে হবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও শান্তির মহাযুগের শুভ অভ্যুদয়।[২০৭]

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে বাংলায় দুদির্নের অবসান হবে বলে নাট্যকার আশা করেন। নাট্যকারের উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। তিনি মূলত ফাঁসি বলতে আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকের পতনকে বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা নাটকে দেখি আলাদ্দিন অন্যায় ও অশুভ শক্তির প্রতীক জাদুকরকে ফাঁসি দিতে ব্যর্থ হলেও হতাশ হয় না, বরং জনতাকে আহ্বান জানায় :

> : বন্ধুগণ, ভয় পাবেন না, নিরাশ হবেন না, চিন্তার কোনো কারণ নেই। জাদুকর বেঁচে থাকছে, তার মানে হল আমরা হব আরও সতর্ক। হব নির্ভীক সৈনিক। যে ছদ্মবেশেই থাকুক না কেন, আমাদের চোখে ওর কারচুপি ধরা পড়বেই। আমাদের সৃষ্টি ও অগ্রগতিকে সে কিছুতেই রোধ করতে পারবে না, দরকার হলে আমরাও আমাদের শান্তি ও স্বাধীনতার বৃক্ষকে নিজেদের রক্ত ঢেলে সঞ্জীবিত রাখব। আজ থেকে আমরা তার বিরুদ্ধে এক অবিচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রাম ঘোষণা করলাম।[২০৮]

আইয়ুব খান যখন সামরিক শাসন জারি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলো তখন যাতে জনগণ হতাশ না হয় সেজন্য নাট্যকার জনগণকে নিরাশ না হতে বলেন। তিনি বলেন এতে বরঞ্চ আরও বেশি সচেতন হওয়া যাবে। নিজেদের

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে করার প্রতি গুরুত্ব দেন এবং প্রয়োজনে রক্ত দিতে হবে এ কথা জনগণকে জানিয়ে দেন। আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের প্রারম্ভেই নাটকে এ ধরনের বিষয় ও সংলাপ নিয়ে আশা খুব কঠিন ছিল। নাট্যকার এ নাটক রচনা করে যেমন সাহসের পরিচয় দিয়েছেন একইসাথে নাটক দ্বারা জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছে। '৫৯ সালে তিনি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য রক্ত দেওয়ার কথা বলেছেন। জনগণের ইস্পাতকঠিন মনোবল নাট্যকার উপলব্ধি করে তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেন শাসকদের প্রতিরোধ করে নিজের স্বাধীন বজায় রাখার জন্য। এবং বাংলার মানুষ নাট্যকারের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেন এবং লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যায়।

মাকড়সা (১৯৬০)

১৯৬০ সালে রচিত *মাকড়সা* নাটকটি সিকান্দার আবু জাফর-এর সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এটি একটি রূপকধর্মী নাটক। পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহের বাণী উচ্চারিত এই নাটকে।[২০৯] মাকড়সা প্রসঙ্গে ইসমাইল মোহাম্মদ লিখেছেন, "পাকিস্তানি নিগড়ে আবদ্ধ লাঞ্ছিত লুণ্ঠিত বাঙ্গালীর অন্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফল্গুপ্রবাহের একটি মূল্যবান দলিল 'মাকড়সা'।"[২১০] আলোচ্য নাটকে প্রধান চরিত্র মোট পাঁচটি। একজন আসামি, আর বাকি চারজন ফরিয়াদির মধ্যে একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ, একজন স্কুল শিক্ষক, একজন তরুণী এবং একজন চাষী।[২১১] আদালতের কামরায় কৌতূহলী জনতা মামলার শুনানির জন্য উৎকণ্ঠিত এবং উত্তেজিত। একদিকে পুলিশের হেফাজতে দাঁড়িয়ে আছে আসামি। বিচিত্র বেশবাস। নরখাদকের ক্রুর দৃষ্টি তার চোখে। সারামুখে ছড়িয়ে আছে অশ্লীল উপেক্ষার হাসি। অন্যদিকে পাঁচজন সাক্ষী এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে সবারই উন্মাদের মতো চেহারা। আচরণও অসংযত। মাঝে মাঝে একজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠছে 'আমার স্বপ্ন ফিরিয়ে দাও'।[২১২] আদালতের কামরায় স্বপ্নচুরির অভিযোগে অভিযুক্ত আসামির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঁচ ফরিয়াদি বিচারকের কাছে তাদের স্বপ্ন ফেরত চাইছে। ফরিয়াদিদের একজন চিৎকার করে বলছে আমার স্বপ্ন চুরি করে নিয়ে গেছে। কী স্বপ্ন চুরি করেছে আসামি জানতে চাইলে সাক্ষীরা তাদের স্বপ্নের কথা জানায়।

> সাক্ষী-১ : আমার আলোর স্বপ্ন হুজুর। বরফ ঢাকা হিমালয়ের চূড়ার মত ধপধপে সাদা উজ্জ্বল ভোরের স্বপ্ন।
>
> দ্বিতীয় সাক্ষীর স্ত্রী কোথায় জানতে চাইলে বিচারককে সে জানায়–
>
> সাক্ষী-২ : তা তো জানি নে হুজুর। কোনো নতুন ঘরে নতুন শয্যায় সে তার বাসর সাজিয়েছে কি না আমি তাও জানি নে। আমার জীবন থেকে সে হারিয়ে গেছে। হয়তো ফুল-সাজানো ফাল্গুনের প্রলোভন তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।[২১৩]

এভাবেই পাঁচজন ফরিয়াদি তাদের চুরি হওয়া স্বপ্নের কথা জানায়। ফরিয়াদিগণ বাংলারই লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত গণমানসের প্রতীকমাত্র। নাট্যকার সাক্ষীদের চুরি হওয়া স্বপ্নের অন্তরালে তুলে ধরেছেন এক বাস্তব স্বপ্ন-চুরির কথা। ১৯৪৭ সালে যে আদর্শের, যে ঐক্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল এবং যে স্বপ্ন দেখেছিল অখণ্ড পাকিস্তানবাসী কিছু দিন যেতে না যেতেই ভাষাগত অনৈক্যের কারণে সেই স্বপ্নভঙ্গের সূচনা হয়। বাংলাভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, গণতন্ত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ববাংলার জনগণের স্বপ্নকে যে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসক চুরি করেছিল তারই বিরুদ্ধে জনগণকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান রূপকের মাধ্যমে নাট্যকার *মাকড়সায়* তুলে ধরেছেন। বাঙালি স্বপ্ন দেখেছিল আলো, স্বাধীনতা আর মুক্তির। বিভিন্ন ফরিয়াদির কণ্ঠে তারই ঘোষণা, সেই স্বপ্নের কথা। এ মুক্তি সুন্দর আলোর মতো, সোনালি দিনের মতো–

> সাক্ষী-১ : হঠাৎ একটি চোরা কুঠুরী থেকে বেরিয়ে আসে ভিন্ন জাতের আর একটি শাবক। রূপা রঙের পালক ঢাকা এক টুকরো সকাল পালিয়ে আসে, অমাবস্যার দরজা ভেঙে। হাজার বছর ধরে একটি সোনালী দিন ছেনে তৈরী করা এক তাল মাখন সেই শাবকটি।[২১৪]

কিন্তু বুকের অন্ধকার নিভৃত চোরা কুঠুরীতে লুকিয়ে রেখে লালিত করা এই শাবকরূপে স্বপ্ন বার বার ভেঙে গেছে শাসকের আঘাতে। সেই ব্যর্থ স্বপ্নের বিদ্রোহের প্রতীক 'মাকড়সা'।

আসামির কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খান। আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ, আসামি তাদের স্বপ্ন চুরি করেছে। আসলে দু'শো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মুক্তি। কিন্তু তা ঘটেনি, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তন করা হলে সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বিচিত্র পেশার ফরিয়াদি যারা বার বার লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত হয়েছে তারা যেন পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই ফরিয়াদির মতোই বাংলার লাখো মানুষের স্বপ্ন সেদিন স্বৈরাচারী স্বপ্নভঙ্গের কথাই নাট্যকার রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় জর্জরিত মানুষ থেমে থাকবে এটা নাট্যকারের কাম্য নয়। নাট্যকার হতাশায় বিশ্বাসী নন, তিনি আশাবাদী। তাই সাক্ষীদের কারো কারো মধ্য দিয়ে তিনি সেই আশার কথা ব্যক্ত করেছেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন; নিজেদের স্বপ্নকে রক্ষা করতে বলেছেন। দ্বিতীয় সাক্ষীকে বলতে দেখি–

> : ভাই সব, ঝাঁপিয়ে পড়ুন একসাথে। এ সকলেরই বাঁচার সংগ্রাম। স্বপ্নচোর ঐ খুনে লোকটাকে ধ্বংস না করলে কারও মুক্তি নেই। একে একে সকলের স্বপ্নইও কিনে নেবে। নিঃস্বপ্ন হয়ে যাবে সমস্ত দেশ।[২১৫]

এ সংলাপের মধ্য দিয়ে আসলে পূর্বপাকিস্তানের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন স্বৈরাশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ২য় সাক্ষীর এ সংলাপে।

বহিপীর (১৯৬১)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর'-এ সমাজের ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের চেহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে অঙ্কিত রয়েছে।[২১৬] সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের সঙ্গে নবজাগ্রত চেতনার সংঘাত এবং নবজাগ্রত চেতনার বিজয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে নাটকটির যবনিকাপাত ঘটেছে।[২১৭] পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সামন্তযুগীয় মূল্যবোধকে মূলধন করে বাঙালিকে শোষণ ও শাসন করে যাচ্ছিলেন। এর বিরুদ্ধে বাঙালি তরুণ সমাজ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অন্তিমে তারুণ্যের জয় হয় নাট্যকার তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। ১৯৬১ সালে যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতায়। সেই সময় এই ধরনের নাটক রচনা বাঙালি তরুণ সমাজকে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের জাতীয় মুক্তির চেতনাকে জাগ্রত করতে।

শকুন্ত উপাখ্যান নাটক (১৯৬১)

১৯৬১ সালে শকুন্ত উপাখ্যান নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাসাহিত্যে আঙ্গিক নিরীক্ষায় নতুনধারা সৃষ্টি করেন সিকান্দার আবু জাফর। ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সময়ের পটভূমিতে কতগুলো পাখির রূপকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার রচনা করেন *শকুন্ত উপাখ্যান* নাটক। নাটকটি *সমকাল* পত্রিকায় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।[২১৮] *শকুন্ত উপাখ্যান* নাটকে ময়ূর ও রাজহংসের অধিকারভুক্ত দুটি এলাকার ভয়াবহ যুদ্ধ-সংঘটনের কাহিনিকে নাট্যকার রূপকতত্ত্বের আরোপ করেছেন।[২১৯] নাটকটি যে আসলেই একটি রূপক সে সম্পর্কে নাট্যকার প্রথম দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলনের আগেই নেপথ্য থেকে ঘোষণার মাধ্যমে তা বুঝিয়ে দেন–

> : স্মরণাতীত কালের কাহিনী। ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে, জীবজন্তু, পশুপাখি তখন কথা বলতে পারত। চিন্তায়, জ্ঞানে, বিচার-বুদ্ধিতে তারা ছিল আজকের মানুষের মতোই উন্নত। তাদের নানা দেশ ছিল, শাসক ছিল শাসনপদ্ধতি ছিল, মন্ত্রী ছিল, উপদেষ্টা ছিল, আর ছিল বীরত্ব এবং দেশপ্রেম। সে যুগেও কোনো না কোনো কারণে যে কোনো দুই দেশের ভিতরে লড়াই বেধে যেত। আমাদের এ নাটক ময়ূর ও রাজহংসের অধিকারভুক্ত দু'টি স্বতন্ত্র দেশের মর্মান্তিক যুদ্ধ কাহিনী।[২২০]

অর্থাৎ এই নাটিকাটির কোনো পাত্র-পাত্রীই মানুষ নয়, সমস্ত চরিত্রই কতগুলো বিভিন্ন জাতের পাখি। নাট্যকার ময়ূর ও রাজহংস এই দুটি পক্ষীর অধিকারভুক্ত দুটো রাজ্যের রূপকের অন্তরালে সমকালীন পাকিস্তানের দুটো অংশের ক্ষমতাধর

শাসকের মধ্যে যে বৈরী ভাব ছিল তা তুলে ধরতে চেয়েছেন। দুটো অঞ্চলের ক্ষমতাধর পক্ষীর মধ্যে যে ক্ষমতা, দম্ভ এবং যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা তার রূপকে তুলে ধরেছেন পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের অবস্থা।

কালবেলা (১৯৬১)

সাঈদ আহমদের প্রথম নাটক *দ্য থিং* বা *কালবেলা*। ১৯৬১ সালে রচিত নাটকটি প্রথমে ইংরেজিতে করাচিতে 'ভিশন' নামের একটি পত্রিকায়। *কালবেলা* নাটকে উনেন যেন *ওয়েটিং ফর গডো* নাটকের বালক, যে পুরোহিতের বার্তা নিয়ে আসে। *কালবেলার* উপেং পুরোহিত যেন বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো* নাটকের গডো। যার প্রতীক্ষায় অপেক্ষারত থাকে ভ্লাডিমির ও এস্ট্রাগন। কিন্তু সে কখনোই আসে না আর সে কারণে তাদের অপেক্ষাও কখনো শেষ হয় না। কিন্তু সাঈদের নাটকটিতে পুরোহিতের আবির্ভব ঘটে। তবে চরিত্রদের মুক্তি ঘটে না, উল্টো বিলয় ঘটে। নাটকের ১ম অঙ্কে ঘূর্ণিবাত্যার আশংকা। রহস্যময় মেয়েটি ভবিষ্যৎ বার্তার ঘোষণা করে। দ্বিতীয় অঙ্কে ঘূর্ণিবাত্যার মাধ্যমে সকলকে নিশ্চিহ্ন হতে দেখা যায়। মেয়েটি প্রথমে হাসে তারপর কাঁদে। ১ম অঙ্কে মেয়েটি নিবেদিতা যে বর্তমানের আধারে ভবিষ্যতের বাণী বহন করে। বর্তমান খেলাচ্ছলে কাটে কিন্তু প্রকৃতির ছোবলে মানবতার অস্তিত্বের বিনাশ ঘটে। চরিত্রগুলো বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির চেয়ে সমস্ত ব্যক্তিত্ব এই নাটকের বিষয়বস্তুর উন্মোচনের জন্য প্রযুক্ত হয়। মোড়ল চরিত্রের নাম ও উপস্থিতির মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রচ্ছায়া লক্ষ করা যায় এই নাটকে। চর আলেকজান্ডার নামের মধ্যে স্পষ্টতই এই দৈশিক রূপরেখা পাওয়া যায়। সাইক্লোনের তাণ্ডবে নিত্য ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের মানুষেরও এক নিত্যসম্পর্ক রয়েছে। নিয়তিবাদী সমাজের রূপরেখায় মানুষের নিরস্তিত্বের আশংকার প্রতিফলন ঘটে এই নাটকে। এর রচনাকালের পটভূমির দিক থেকে ষাটের দশক। পাকিস্তানের সামরিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি সে সময়কার দমনের বাস্তবতা তুলে ধরে। এবং ঘোর বিপদাপন্ন মানুষের মধ্যে অপরাধী, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সাথে আহাম্মদ, মুনীর ও মোড়ল যেমন রয়েছে তেমনি আছে উনেন ও উপেং উপজাতি। এর মাধ্যমে বাঙালির জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রকল্পনা বিস্তার লাভ করেছে। কারণ বাঙালি জাতির বাইরেও বহুজাতিগত অস্তিত্বের আভাস মেলে এই চর আলেকজান্ডারে। কিন্তু এর পাশাপাশি, নিশ্চিতভাবে নাটকে আত্মস্থ স্থান ও কালের বিমূর্তায়নের পদ্ধতি, উপরে উল্লিখিত দৈশিক ও কালিক প্রেক্ষাপটকে অতিক্রম করে। বরং রহস্যময় ও অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক শক্তিমত্তার কাছে মানবতার পরাজয় রূপায়ণের মধ্যে এমন এক জীবনসম্ভাবনার রূপরেখা তৈরি করে এই নাটক, যাকে মানবশর্তের মধ্যে নিহিত বেদনার ভাষা দিয়েও বুঝতে হয়।[২২১]

রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২)

Bureau of National Reconstruction বা বিএনআর পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নাটকটি রচনার জন্য মুনীর চৌধুরীর নাম মনোনীত করে। এ সময় মুনীর চৌধুরী ছিলেন পূর্ববাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি তথা নাট্যাঙ্গনের এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র মুনীর চৌধুরীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলো। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে তাঁকে দিয়ে লেখানো হলো 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২)। মারাঠাদের বিরুদ্ধে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়। এ-বিজয়গাথাই সাম্প্রদায়িক-চক্র সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করতে চেয়েছিল।[২২২] মুনীর চৌধুরী অতীত ইতিহাসকে নাটকের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করলেন সত্য, কিন্তু নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো ব্যক্তিজীবনের হৃদয়যন্ত্রণা এবং যুদ্ধবিরোধী দৃঢ় প্রত্যয়, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মান্ধতা নয়। রক্তাক্ত প্রান্তর-এ যুদ্ধবিরোধী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনাই শিল্পরূপ দিয়েছেন। যুদ্ধজনিত আর্থসামাজিক ও ব্যক্তিক ক্ষয়-ক্ষতিই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে, বিজয়ের আনন্দ-উল্লাস নয়।[২২৩] এ নাটকে ইতিহাস মুখ্য নয়–উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। এ প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরী বলেছেন :

> ...যুদ্ধের ইতিহাস আমার নাটকের উপকরণ মাত্র, অনুপ্রেরণা নয়। ইতিহাসের এক বিশেষ উপলব্ধি মানবভাগ্যকে আমার কল্পনায় যে বিশিষ্ট তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে তোলে নাটকে আমি তাকেই প্রাণ দান করতে চেষ্টা করেছি।[২২৪]

অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুনীর চৌধুরীকে দিয়ে নাটক রচনা করে নিলেন তা সফল হয় নি। কারণ শাসকগোষ্ঠী এ নাটকে মুসলিমদের জয়গান করতে চয়েছিল। অর্থাৎ তারা দেখাতে চেয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিজয়। এ নাটক ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও নাটকে শেষ পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনারই প্রাধান্য পেয়েছে। যা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী।

ইহুদির মেয়ে (১৯৬২)

ইহুদির মেয়ে নাটকটি রচনা করেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। নাটকে ইয়াকুব কন্যা দিনাকে দেখে মুগ্ধ হয় সালেমের রাজপুত্র সেচেম। দিনা ও সেচেম পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে। উভয়ের সম্মতিক্রমে দিনার পিতা ইয়াকুবের নিকট সেচেমের বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। ইয়াকুব রাজি হলেও তার পুত্রদের মধ্যে লেভি ও সেমিয়ন বংশমর্যাদার অজুহাতে এ বিয়েতে অসম্মত হলো। সেচেমের পিতা হামরকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হলো, সেচেম দিনা কেউ কাউকে ত্যাগ করতে রাজি না। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে লেভি ও সেমিয়ন আলেজের রাজধানী আক্রমণ করে সেচেমকে নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রেমিকের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে অস্থির হয়ে দিনা আত্মহত্যা করলো। বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের কারণে একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকার মিলন সম্ভব হলো না।

শেতাঙ্গ আমেরিকার বাসিন্দারা গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায় অথচ অশেতাঙ্গদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করে, ঘৃণাভরে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে, মানবতার এই অপমান, অভিজাত-অনভিজাত ভেদাভেদ সমাজ সংসারের জন্য যে কল্যাণ বয়ে আনে না নাট্যকার সেটিই তুলে ধরেছেন। এই নাটকের বিষয়বস্তু তখন বাংলাদেশের ছাত্র-শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় আবরণে বাংলাকে শাসন ও শোষণ করতো। তারা বাঙালিদেরকে মুসলমান ভাবতো না। বাঙালির প্রতি শাসকগোষ্ঠীর যে অন্যায় তা এই ভূখণ্ডের মানুষজনকে শাসকশ্রেণির শৃঙ্খলা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

চিঠি (১৯৬২)

১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মুনীর চৌধুরী রচনা করেন *চিঠি*। এটি একটি কমেডি নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন আন্দোলন-সমস্যা চিত্র অঙ্কিত হয়েছে *চিঠি* নাটকে। ষাটের দশকে স্বৈরাচারী সরকারের শাসনামলে পূর্ববাংলায় যে সব আন্দোলন হয়েছিল ছাত্রসমাজই মূলত সেই সব আন্দোলনের মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। *চিঠি* নাটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে কিছু ছাত্রছাত্রীর আন্দোলন। স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের শাসনামলে সারাদেশে প্রকাশ্য রাজনীতি বন্ধ থাকলেও ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রেফতার হলে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট, মিছিল এবং আমতলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সভা করে। সরকারের একজন পুলিশ ও একজন মন্ত্রীকেও নাজেহাল করে। সোহ্‌রাওয়ার্দী ছাড়াও '৬২ তেই ছাত্ররা আইয়ুব খানের সংবিধান ও শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ১৯৬২ সাল ছিল ছাত্র আন্দোলনের কাল। মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রাজনীতিসচেতন শিক্ষক হিসেবে এসব আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন। আর সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি রচনা করেন *চিঠি* নাটক।

চিঠি নাটক সম্পর্কে সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা কামালে মন্তব্য যথার্থ, 'যে রুদ্ধ পরিবেশে রাজনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষাদানে অস্বীকৃতির অভিপ্রায়ই রাজনৈতিক আন্দোলনের চারিত্র্য পাবে–তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ... সংলাপে লেগেছে সংগ্রামী আদর্শের উত্তাপ।'[২২৫]

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের নির্ধারিত তারিখ পিছিয়ে দেবার দাবি যে রীতিমতো একটা আন্দোলনে পরিণত হতে পারে এবং তাতে যে একটা আদর্শভিত্তিক সংগ্রামের তীব্রতা আরোপিত হতে পারে, এই অসংগতিকে নাট্যকার শানিত বিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন এ নাটকে। চিঠি নাটকে মুনীর চৌধুরী হালকা রসের মধ্য দিয়ে সমকালীন পূর্ববাংলার ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই তুলে ধরেছেন।

রক্তপদ্ম (১৯৬২)

১৯৬২ সালে আসকর ইবনে শাইখ *রক্তপদ্ম* নাটকটি রচনা করেন। *রক্তপদ্ম* ইতিহাস-আশ্রিত নাটক। নাট্যকার পরাধীন ভারতবর্ষের সিপাহি জনতার বিদ্রোহ, সংগ্রাম, আত্মত্যাগকে পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যেন সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। তাইতো শেরখানের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

> নওজোয়ান। কোনো ভয় নেই। এগিয়ে যাও। মনে রেখো তোমার দেশ, তোমার ভাই-বোন, তোমার দিকে চেয়ে আছে। আজ তোমার সামনে এসেছে শুভ লগ্ন। তোমার দেশে ওই সাদা বানর, ওই কটা চোখের ব্যাপারীরা তোমার মালিক সেজে বসেছে। এ তোমার লজ্জা, তোমার অপমান। আজ সুযোগ এসেছে। প্রতিশোধ নেবার সুযোগ।[২২৬]

নাট্যকার এ নাটকে ছাত্র-জনতাকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাদেরকে দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পুরো জাতি যে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে তা তিনি সুন্দরভাতে তুলে ধরেন। তিনি তরুণদের বিদেশি শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

ধন্যবাদ (১৯৬৪)

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় আলাউদ্দিন আল আজাদের সামাজিক নাটক *ধন্যবাদ*। নাটকটিতে একদিকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের অনাহার আর অর্ধাহারে নির্মম মৃত্যু। অপরদিকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের মদতপুষ্ট এক শ্রেণির অসৎ রাজনীতিক কীভাবে দেশপ্রেমের ছদ্মাবরণে দুর্নীতি আর অপকর্মে লিপ্ত হয় এবং নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে সচেতন ও সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে পথভ্রষ্ট করে তারই চিত্র। ষাটের দশকের সমাজের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার এ নাটকে। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকারের মন্ত্রী ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য দেশসেবার নামে দুর্নীতির মাধ্যমে দেশের সমাজের যে ক্ষতি করেছে সচেতন নাট্যকারের দৃষ্টি তা এড়ায় নি। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার দাপটে অন্যায় অবিচারের ফলে সাধারণ জনগণ শুধু তাদের জমি বাড়িঘর; ভিটেমাটিই হারায়নি, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু খাবার না পেয়ে অনাহারে গরিবের এই মৃত্যুর মতো চরম সত্যকেও ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতার দাপটে যে মিথ্যে হিসেবে প্রমাণ করে সেই বিষয়টিও এ নাটকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

সোনাকান্দি গ্রামের আদম আলি ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করলেও ভণ্ড ও ঘুষখোর ডাক্তারের রিপোর্ট এবং তদন্তকারী দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা খোদাদাদ খান জোর করে প্রমাণ করে যে–

> : ... ক্ষুধার জ্বালায় মরে যাওয়াটা সরকারি নীতি নয়। তাই কেউ আত্মহত্যা করতে চাইলেও আগে পেট ভরে খেয়ে নিতে হবে। এখন আদম আলি নামে যে লোকটি, মরবার আগে তার গাঁটের মধ্যে অনেক টাকা ছিল, কাজেই তার পেট ভরা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উপরন্তু সের পাঁচেক চাল ডাল তো গামছায় বাঁধা ছিলই। সুতরাং সে ক্ষুধার জ্বালায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেনি। অনশনে যখন মরেনি, তখন আমাশয়ে মরেছে, তা মেনে নিতে কারুর আপত্তি থাকতে পারে না।[২২৭]

শুধু আদম আলিই নয় সত্যসন্ধানী যুবক আনিসও রেহাই পায় নি তাদের হাত থেকে। দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর নেতা, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকজনদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করলে সেও তাদের টার্গেটে পরিণত হয়। তাদেরই একজন রাজা আলি আনিসকে নানা প্রলোভন দেখায়–

> :... রিমেম্বর, চান্স ইজ লাইফ। ভালো চান্স পেলে তুমি একটা কিছু হয়ে যেতে পারবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেকেন্ড ইয়ারে আছ, সিরিয়াসলি পড়াশোনা করে পরীক্ষাটা দাও। ইউনিভার্সিটির খরচের জন্য ভাবতে হবে না।[২২৮]

শুধু দেশের প্রলোভনই নয়, বিদেশের রঙিন স্বপ্নও দেখায় রাজা আলি আনিসকে–

> : ... যদি ফরেন যেতে চাও তারও ব্যবস্থা সহজেই করে দেয়া যাবে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, জার্মেনী যে দেশে ইচ্ছে যেতে পার।[২২৯]

কিন্তু আনিস শিক্ষিত, সচেতন, দেশপ্রেমিক সত্যসন্ধানী যুবক। তাই কোনো প্রলোভনই তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। সে প্রতিবাদী কণ্ঠে তীক্ষ্নস্বরে স্পষ্ট ভাষায় দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করে–

> : চুপ করুন। আমি সব বুঝতে পেরেছি, আর হিপোক্রেসি করবেন না। কিন্তু জেনে রাখুন, আগুনকে ছাই চাপা দিয়ে রাখা অসম্ভব। বাতাস পেলে সে দাউ দাউ করে জ্বলবেই।[২৩০]

ধন্যবাদ নাটকে আলাউদ্দিন আল আজাদ পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের নিষ্ঠুর নির্যাতনে এদেশের মানুষের করুণ পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি দেশপ্রেমিক সচেতন শিক্ষিত যুবক ও সাধারণ জনগণ যে সেই নিষ্ঠুর শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেছিল তাও তুলে ধরেছেন। উল্লেখ নাট্যকার নিজেও দেশের নানা আন্দোলনে পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের প্রলোভনে তখন অনেকেই আন্দোলন ছেড়ে চাকরিতে যোগদান করেন, আবার অনেকেই দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো প্রলোভনই নাট্যকারকে আন্দোলন প্রতিবাদ থেকে দূরে রাখতে পারেনি। যার ফলে নাট্যকারকে জেলও খাটতে হয়েছিল।

তৃষ্ণা

সাঈদ আহমদ রচিত *তৃষ্ণা* নাটকটি (১৯৬৪-১৯৬৬) সময়ের মধ্যে রচিত।[২৩১] নাটকটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> আমার ধারণা কোনো রূপকথা বা লোক কাহিনী সমকালীন সমাজের স্থায়িত্ব লাভ করে না যদি না সে গল্প সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক অর্থবহ হয়ে ওঠে। সে সময়ে দেশ, সমাজ এমনকি আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও চিরন্তন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি সমস্যার প্রেক্ষিতে শিয়াল ও কুমীর ছানার গল্প আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত বলে মনে হয়েছে।[২৩২]

এ নাটকে একটি সমস্যা ব্যক্ত হয়েছে বলে নাট্যকার নিজেই বাণী দিচ্ছেন–"এ সমস্যা হলো মানুষের অস্তিত্বের এবং টিকে থাকার সমস্যা। বড়ো মাছ ছোটো মাছকে উদরসাৎ করে। বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র শক্তিকে ধ্বংস করে, এই তো স্বাভাবিক, চিরন্তন সত্য।" বাংলার লোককাহিনির ভিত্তিতে নাট্যকার জ্ঞানের কাঠামোকে রূপায়িত করেছেন। জ্ঞানগত কাঠামোর নির্যাস হলো শক্তি। শক্তির কাঠামো কাজ করে কেবল শক্তির মাধ্যমে নয়, হেজিমনির ভিত্তিতেও। হেজিমনি হলো বলপ্রয়োগে আদায় করা সম্মতির মাধ্যমে শোষণ বা ক্ষমতার চর্চা। ফলে, এই নাটকটি এক দিক থেকে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জবরদস্তিমূলক সম্মতি-আদায়ী সামরিক শোষণপ্রক্রিয়ার নাট্যভাষ্য। তবে এ নাটক কেবল সমকালীন নয়, নাট্যকারের অভীপ্সা হলো চিরকালীনতা।

সাঈদ আহমদ নাটকটিতে বিস্ট ফ্যাবল বা পশুদের আচার-আচরণ কথাবার্তার মাধ্যমে নীতিকথার অবতারণা করেছেন। শিয়াল ও কুমিরের লোককাহিনির আড়ালে আলোচ্য নাটকে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এবং একইসঙ্গে সেই শোষণ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। রূপকথার মাধ্যমে আধুনিক জীবন যন্ত্রণা ও শ্রেণি সংগ্রাম উপস্থাপন করে সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের নাটকের ধারায় সংযোজন করেছেন একটা নতুন মাত্রা। *তৃষ্ণায়* নাটকে দেখা যাবে উপকথার পশুপাখিদের মতোই গাধা, শিয়াল, কুমির ও কুমিরের বাচ্চারা অ্যানথ্রোপোমরফিক অর্থাৎ যে পশুরা মানুষের মতন। নাটক রচনাকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রতাপশালী দমন অর্থাৎ শৃগাল নামক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে কুমির নামক বাঙালির সন্তানদের দ্বিজাতিতাত্ত্বিক বিভাজনের প্রক্রিয়ায় সমর্পণের মাধ্যমে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যে আদতে নিঃশেষকরণেরই এক ভ্রমাত্মক ও মর্মান্তিক উদ্যোগ তারই এক সমকালীন রূপায়ণও ঘটে।[২৩৩] নাট্যকার বলেন, 'শিয়াল পণ্ডিত ও কুমিরের সাতটি ছানাকে আমাদের জীবন নাট্যের অঙ্গনে আমি যেন এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পেলাম। ক্ষিপ্র বুদ্ধির অধিকারী এবং টিকে থাকার সংগ্রামে পৃথিবীর সুযোগ্য সন্তান শিয়াল কি চিরকাল এমনি করে কুমিরের অসহায় শিশুদের উদরসাৎ করে যাবে; নাকি মা কুমির তার প্রজনন যন্ত্রাগারে সাত নয়, সত্তর নয়, হাজার হাজার সন্তানদের জন্ম দিয়ে শিয়ালের মোকবিলা করবে। শিয়াল আর কত খাবে, একদিন নিশ্চয় তার বিতৃষ্ণা আসবে, খেতে খেতে অসুস্থ হয়ে পড়বে। শিয়াল ও কুমির ছানার গল্পকে অপরিবর্তিত রেখে আমার নিজস্ব ব্যাখ্যায় ও দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নাটক লেখার তাগিদ অনুভব করলাম, ফল–'তৃষ্ণায়'।'[২৩৪] এর আগে বাংলাদেশে লোককাহিনিকে ভিত্তি করে আধুনিক জীবন চেতনাজাত কোনো নাটক লেখা হয়নি। মানুষ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে এবং

প্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে অপশক্তি ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিরন্তর যে লড়াই করে চলেছে এ কথাটিই 'তৃষ্ণায়' বলতে চেয়েছে নাট্যকার। আবার কোনো ক্ষমতামত্ত শাসকগোষ্ঠীর সাথে জনগণের সম্পর্কের ফাটল হিসেবে এই দ্বিতীয় রূপায়ণকেও এক কালাতীত পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করা যায়। জোনাথন সুইফট যেমন *গালিভর'স ট্রাভেলসে* আইরিশ-ইংলিশ ক্ষমতা-সম্পর্কটি তলে রেখে আরও অনেক অর্থ ঠেসে দিয়ে একে মানুষের রোমাঞ্চকর অভিযানেরও কাহিনিতে পরিণত করেছিলেন। সাঈদ আহমদও পরিচিত একটি রূপকের মাধ্যমে একইসঙ্গে জাতিতাত্ত্বিক বিরোধ ও ক্ষমতা চর্চার ধরনকে ইঙ্গিত করেছেন এবং এর একটি চিরন্তন মানবিক আবেদন সৃষ্টি করতেও তৎপর হয়েছেন।[২৩৫]

অনেক তারার হাতছানি (১৯৬৫)

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয় আসকার ইবনে শাইখের প্রতিবাদী চেতনায় পরিপূর্ণ নাটক *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫)। ১৮৫৭ সালে এদেশে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহকে সমকালের (১৯৬২) পাকিস্তানি স্বৈরশাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। সেই সিপাহি বিদ্রোহ যেমন ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্যাতনের শৃঙ্খল থেকে এদেশ ও তার মানুষকে মুক্ত করার প্রয়াস, তেমনি এই পাকিস্তানি আমলেও দেশপ্রেমিক সংগ্রামী ছাত্র জনতার রক্তাক্ত আন্দোলন সংগ্রাম ছিল বিদেশি, বিভাষী, বিজাতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, সেই সময়ের পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নীল নকশা অনুযায়ী অগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, নানান চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে এ দেশের তরুণ ছাত্রসমাজ বার বার বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছে, তবু পিছপা হয়নি। তাই গৌরবময় রক্তাক্ত ইতিহাস চেতনার সঙ্গে গৌরবোজ্জ্বল ৫২'র ভাষা আন্দোলন ও তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সংগ্রামী চেতনাকে একাকার করে পরোক্ষভাবে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অত্যাচার, জেল-জুলুম-নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তরুণ ছাত্রসমাজকে প্রতিবাদ প্রতিরোধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নাটকে হাসানকে, দাদু ইতিহাসের গৌরবময় অতীত স্মরণ করিয়ে দেন :

> হাসান! তোর দেহের শিরায় শিরায় বইছে এমন রক্ত, তোর খান্দানে এমন ঐতিহ্য, দুঃখের সাগড়ে পাড়ি জমাতে যা ভয় পায় না। জুলুমের প্রতিবাদে মৃত্যুর সঙ্গে যা পাঞ্জা ধরায়, প্রিয়জনের চোখে পানি মুছিয়ে দিয়ে যা চলার পথকে এগিয়ে দেয়। সে রক্ত, সে ঐতিহ্য, তোমার হাসান, তোমার।[২৩৬]

নাট্যকারের আদর্শায়িত চরিত্র পাগলাটে অধ্যাপকের শানিত সংলাপ যেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের ছাত্র জনতার আন্দোলন সংগ্রামের উত্তাল দিনগুলোকেই সামনে নিয়ে আসে। একইসঙ্গে ইতিহাস চেতনার পুনরুল্লেখের মধ্য দিয়ে নাট্যকার এদেশের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন অন্যায় অবিচার নিপীড়ন আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে।[২৩৭] ১৯৬৪ সালের কোনো এক অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে ভিক্টোরিয়া পার্কের শহিদ মিনারে মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একদল তরুণ পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে গেল। সেখানে থাকেন এক পাগলাটে ভদ্রলোক, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সন্তানহারা এক দুঃখিনী জননীর। সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় স্বৈরাচারী শক্তির করাল গ্রাসে নিহত যুবক রহিমের খোঁজে তার দাদু ও হতভাগিনী মা এসেছেন।[২৩৮] নাটকের এক প্রান্তে আছে স্বদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ, অন্যপ্রান্তে আছে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। ১৮৫৭ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চিত্র তুলে ধরে নাট্যকার দেশের তরুণ সমাজকে জাগিয়ে তুলেছে।[২৩৯]

কবর (১৯৬৬)

কবর[২৪০] নাটকটি ১৯৬৬ সালে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে।[২৪১] একটি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিরোধধর্মী জীবনদর্শনের গাঢ় অনুভূতিময় প্রকাশের কারণে নাটকটি সর্বজনীনতা অর্জন করেছে এবং সকল রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধেমৃত্যুহীন প্রতিরোধের মহৎ প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে।[২৪২] একুশের অনির্বাণ চেতনা ও অপরিমেয়

আত্মত্যাগের ঘটনা শৈল্পিক উৎকর্ষে প্রতিভাসিত হয়েছে কবর নাটকে। এই নাটকে উঠে এসেছে সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদ চরিত্র যাদের গুলি করে হত্যা করা যায়, কিন্তু তাঁরা তাঁদের সংকল্পে থাকেন অটুট।[২৪৩] স্বৈরাচারী শাসকবর্গের নির্দেশে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের রাতের অন্ধকারে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করার জন্য নিয়ে আসা হয়।[২৪৪] কিন্তু নিহত ছাত্র যখন কবরে যেতে অস্বীকার করে। নেতা–যিনি অল্পক্ষণ আগেই মদ্যপান করেছিলেন–তাকে এই ভাষায় অনুরোধ করেন :

> জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাও নি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মত ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে তুমি বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনো মরেনি–তাদের নামে মিনতি করছি তুমি যাও, যাও, যাও।[২৪৫]

এই নাটক আমাদের নাট্যসাহিত্যের পাশাপাশি জনজীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। 'কবর' নাটকটি সম্পর্কে কবীর চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> একটা বিশেষ বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও গভীর অনুভূতিময় প্রকাশের জন্য বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় নিরীক্ষাধর্মী অভিব্যক্তিবাদী আঙ্গিকের গুণে, এবং আবেদনবিস্তারী, সংলাপের ঔজ্জ্বল্যে 'কবর' বিশেষকে অতিক্রম করে সর্বজনীনতা অর্জন করেছে, এবং আমাদের নাটকের ভুবনে একটা পালাবদলকারী দৃষ্টি উন্মোচক ভূমিকা পালন করেছে।[২৪৬]

কবর নাটকটি পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনসাধারণের মধ্যে এক নতুন জাতীয়চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ চেতনা ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। বাঙালির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে।[২৪৭] একুশের চেতনা বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে বাঙালির জাতীয় চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। যে চেতনার ফলে পুরো পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি রুখে দাঁড়ায়।

ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬৮)

শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) উপন্যাস অবলম্বনে শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদার যৌথভাবে রচনা করেন নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি'। নাটকটি পুথিঘর থেকে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়।[২৪৮] ২ ও ৩ মে, ১৯৬৩ সালে নাটকটি কার্জন হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়।[২৪৯] নাটকে প্রতীকাশ্রয়ে তৎকালীন পাকিস্তানিদের বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা হয়েছে। বাগদাদের বাদশা হারুন-অর-রশিদের শাসনামলে গোলাম বেচাকেনা হতো। বাদশার হুকুম ছাড়া গোলামদের কোনো কিছু করার স্বাধীনতা ছিল না, এমনকি প্রেম, ভালোবাসা বিয়ের অধিকার পর্যন্ত ছিল না। বাদশা হারুন-অর-রশিদ ক্রীতদাস তাতারি ও বাঁদি মেহেরজানের প্রণয়ে বাধা সৃষ্টি করে। একরাতে বাদশা তার কেনা গোলাম তাতারির হাসিতে মুগ্ধ হন। বিত্ত-বৈভব থাকা সত্ত্বেও বাদশা হাসতে পারেন না। অথচ নিঃস্ব রিক্ত তাতারি স্ত্রী মেহেরজানের সান্নিধ্যে প্রাণ খুলে হাসতে পারে দেখে বাদশা তাতারি ও মেহেরজানের বিয়ে অবৈধ বলে ফতোয়া জারি করেন। মেহেরজানকে তাতারির কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তাতারি আমৃত্যু বাদশা হারুনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়।

নাটকে তাতারি বাঙালি জনতার এবং বাদশা হারুন আইয়ুব খানের প্রতীক। তাতারির হাসি উপন্যাসে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ধনদৌলত, বিভিন্ন নারীর যৌবন ও রূপের জৌলুস কোনো কিছুদিয়েও বাদশা তাতারির মুখে হাসি ফোটাতে পারেন নি। ভালোবাসার মেহেরজানকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তাতারির সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের হাসিও হারিয়ে যায়। নানা ধরনের অত্যাচার, এমনকি মৃত্যু অনিবার্য বুঝতে পেরেও তাতারি হাসে না। বরং সে জানিয়ে দেয় মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের চিরন্তন সত্য কথা–

: শোন হারুণর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বাঁদী কেনা সম্ভব। কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না।[২৫০]

তাতারির উচ্চারিত সংলাপই এই নাটকের মূল বিষয়। অর্থাৎ 'ক্রীতদাসের হাসি অবিক্রিত' এই নাটকের মূল জীবনদর্শন। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রই প্রতীকধর্মী। বাদশা হারুন-অর-রশিদ চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকারদ্বয় স্বৈরাচারী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকের অত্যাচার, নির্যাতন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন। রক্ষণশীল ইসলামি ধারার তোষামোদকারীদের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন আলেম আব্দুল কদ্দুসের চরিত্রে। বিবেকবান মানুষের প্রতীক যেমন কবি ইসহাস তেমনি শাশ্বত মানবতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাতারি ও মেহেরজানকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–

> এতে নির্যাতিত মানুষের তিক্ত প্রতিবাদের এক রূপক কাহিনির মাধ্যমে নাট্যকারদ্বয় এই মর্মবাণী উপস্থাপন করেন যে, ঐশ্বর্য দাস ক্রয় করতে পারে বলে, তবে তা কখনো ক্রীতদাসের হাসিটুকু কিনতে সক্ষম নয়।[২৫১]

ক্রীতদাসের হাসি নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে সমকালীন স্বৈরাচারী শাসকের শাসনামলে পূর্ববাংলার স্বাধীনতাহীন, শৃঙ্খলিত বাঙালির দুঃখ বেদনাকে সঠিক শব্দ প্রয়োগে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে তুলে ধরে নাট্যকারদ্বয় সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

যতীন সরকার *ক্রীতদাসের হাসি* রচনার পটভূমি সম্পর্কে বলেন,

> বিগত (উনিশ) শতকের ষাটের দশকটিতে পাকিস্তানি ফৌজি শাসনের জাঁতাকলের পেষণে আমাদের দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। সেই দমবন্ধ করা পরিবেশেও দম ফেলার সুযোগ সন্ধান করেছিলন শওকত ওসমান। সুষ্ঠু ইতিহাস চর্চার পথও যখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন ইতিহাসকে রূপকথার মোড়কে ঢেকে তিনি লিখেছিলেন 'ক্রীতদাসের হাসি'।[২৫২]

রামেন্দু মজুমদার বলেন,

> ...শওকত ওসমানের উপন্যাস *ক্রীতদাসের হাসির* মধ্যে আরব্য রজনীর কাহিনির আড়ালে যে তদানীন্তন পাকিস্তানের একনায়ক আইয়ুব খানকেই কল্পনা করা হয়েছে, তা পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেননি। রূপক হিসেবে আরব্য রজনীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। সেটা আগে বুঝতে পারলে বইটিকে আদমজী পুরস্কার দেয়ার বদলে হয়তো নিষিদ্ধই ঘোষণা করা হতো। তবে প্রগতিশীল বাঙালি বিচারকরা বিষয়টি বুঝতে পেরেও তা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন।[২৫৩]

অবশ্য সনৎকুমার সাহা পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

> ... এমনও হতে পারে, সম্মাননা জানিয়ে কেউ কেউ তাঁকে দলে টানতে চেয়েছেন, অথবা, তাঁর মুখবন্ধ করতে চেয়েছেন। তেমন হলে দুটোই ব্যর্থ হয়েছে। লেখকের সততা তিনি কারো কাছে বন্ধক দেননি। এমনও অবশ্য হতে পারে, যাঁরা তাঁকে পুরস্কৃত করেন, তাঁরা সবাই তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত নন। নামের প্রতিষ্ঠাকেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন।[২৫৪]

১৯৬৯ সালে ঢাকা টেলিভিশনে নাটকটি অভিনীত হয়।[২৫৫] শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রাক-স্নাতক পর্যায়ে একে অবশ্যপাঠ্য করা হয়েছিল।[২৫৬] এই নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যখন মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা ছিল তখন প্রতীকাশ্রয়ে নাটকটি প্রচারিত হওয়ায় জনগণ সাহস পায় এবং প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে।

পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)

১৯৬৯ সালে মুনীর চৌধুরীর *পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য* নাট্য সংকলনটি প্রকাশিত হয়। সংকলনভুক্ত নাটিকাগুলো হলো–'পলাশী ব্যারাক', 'ফিটকলাম', 'আপনি কে', 'একতালা-দোতালা', 'মিলিটারী' ও 'বংশধর'। নাটিকাগুলো কৌতুকাবহ হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে পরোক্ষ সমালোচনা রয়েছে।

পলাশী ব্যারাক (১৯৬৯)

'পলাশী ব্যারাক' ব্যঙ্গাত্মক নাটক। নাটকটির ঘটনাকাল ১৯৪৮, ঘটনাস্থল নিম্নশ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের বসবাসের জন্য নির্মিত ঢাকার পলাশী ব্যারাক। নিম্নবিত্ত কেরানি জীবনের অমানবিক বেদনার কাহিনি।[২৫৭] চরিত্রগুলো মুখ্যত কেরানি। এই নাটকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে জীবনের অসংগতিকে অতিক্রম করে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।[২৫৮] ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি নানাবিধ সমস্যা-সংকটের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করে। এর মধ্যে সবচেয়ে তীব্র সমস্যা ছিল সরকারি চাকুরেদের আবাসিক সংকট। সরকার নিম্ন বেতনভুক কেরানিদের বসবাসের জন্য ঢাকার পলাশীতে এক ব্যারাক নির্মাণ করেছে। এর নামই পলাশী ব্যারাক। এই পলাশী ব্যারাকের কুঠুরিগুলো ছিল ক্ষুদ্র আয়তনের এবং কুঠুরগুলোর তুলনায় মানুষ ছিল অনেক বেশি। ফলে বসবাসকারীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। তাদের জীবন কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল 'পলাশী ব্যারাক' নাটকে তারই নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অর্থাৎ সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রকাঠামোর সমস্যা এবং নিম্ন বেতনভুক্ত ব্যারাকবাসীর করুণ জীবনচিত্র।[২৫৯] এ নাটিকায় মুনীর চৌধুরী কৌতুকাবরণের মধ্য দিয়ে নব্য পাকিস্তান সরকারের অব্যবস্থার প্রতি আঘাত করেছেন ব্যারাকবাসীর প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণাকে রঙ্গব্যঙ্গে চিত্রিত করে। *পলাশীর ব্যারাক* নাটকের কাহিনিতে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের যে প্রধান তিনটি সমস্যাকে ধারণ করেছে, তা হচ্ছে : আবাসিক সমস্যা, দেশের উর্ধ্বে ব্যক্তি স্বার্থের প্রাধান্য তথা আমলাতান্ত্রিক সুবিধাভোগ এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক বিপর্যয়। আবাসিক সমস্যা বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে, একদিকে গ্রামপ্রধান পূর্ব বাংলার মানুষ চাকরির জন্য ঢাকা শহরে ভিড় করেন, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ ঢাকায় ফিরে আসেন। অপর দুটি সমস্যা দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে উৎসারিত। সরকার বিশেষ করে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের একক অবস্থানের জন্য যে ব্যারাক স্থাপন করেন তার দুর্বল নির্মাণ কাঠামো, পানি সমস্যা, অপর্যাপ্ত প্রক্ষালনকক্ষ, খাদ্য এবং সর্বোপরি আর্থিক দুরবস্থার নাট্যিকরূপ দিয়েছেন নাট্যকার।[২৬০] একইসঙ্গে দেশের জনগণকে বোঝাতে চেয়েছেন যেখানে সরকারি বেতনভুক কর্মচারীদের অবস্থা এত করুণ। সেখানে সাধারণ মানুষ আর কী আশা করতে পারে।

ফিটকলাম (১৯৬৯)

পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য সংকলনের দ্বিতীয় নাটিকাটি হলো–'ফিটকলাম'। এটিও ১৯৪৮ সালের ঘটনা নিয়ে রচিত। পাকিস্তানের শত্রু খোঁজার লক্ষ্যে রাজপথে গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতাকে বিদ্রুপ করেছেন নাট্যকার। 'ফিটকলাম' শব্দটি ফিফথ কলাম এর অপভ্রংশ বা বিকৃত রূপ। ফিফথ কলাম অর্থাৎ পঞ্চম বাহিনী বলতে দেশ বিভাগোত্তর নব্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকারবিরোধী প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের বোঝানো হতো। মুসলিম লীগের সংকীর্ণ ও ধর্মীয় রাজনীতির বাইরে এ রাজনীতিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গোয়েন্দা বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে ছদ্মবেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। ঢাকার জনাকীর্ণ রাজপথে রিকশা আরোহী জনৈকা বোরখা পরিহিতাকে পলাতক রাজনৈতিক কর্মী সন্দেহে সিআইডি পুলিশের পরিচয়ে এক যুবক বোরখা উন্মোচন করতে তৎপর হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশপাশের লোকজনের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা থেকে প্রতিবাদ পর্যন্ত হয়।

সিআইডি যখন শিশুরাষ্ট্রের নিরাপত্তার অজুহাতে রিকশা আরোহিণীর বোরখা উন্মোচন করতে চায়–তখন বলেন :

> ভাইসব। আমরা সি আই ডির লোক–জাতির মেরুদণ্ড, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার, আমরা গোয়েন্দা পুলিশ। দেখুন, আপনাদের চোখের সামনে, এই পঞ্চম বাহিনীর দল আমাদের পর্যন্ত কি রকম নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। নিজের চোখের ঠুলি খুলে ফেলুন, চিনে রাখুন এদেরকে।

তখন উপস্থিত মুসল্লির প্রতিক্রিয়া ভিন্ন রকম :

> এটা ইংলিস্তান নয়, পাকিস্তান। ইসলামিক স্টেট। যার খুশি সে মুখ বুক উরু দেখাক। কিন্তু যে তা চায় না, তার ঈমান আমি শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়ে রক্ষা করব।[২৬১]

দোকানি, পথচারী এবং সিআইডি-র তর্কের মধ্য দিয়ে বোরখা পরিহিতার সকলের অলক্ষ্যে অন্তর্ধানে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে এর তীক্ষ্ণ কৌতুকাবহ সংলাপে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দোকানি কটাক্ষ করে বলেন :

> মাইয়া মানুষ শ্যাষে ফিট কলাম হইয়া গেল? ওস্তাদ, একটা ভাল মওকা হইচে, ফিট কলাম মাল হইলে আর এত বেচায়নী কিসের, "লুইটা লও, লুইটা লও" কিংবা "বোরখা পড়লেই মরদ যদি আওড়ৎ হইবার পারে তবে আওড়াৎ দেখলে গুণ্ডা সিআইডি হইবার পারব না ক্যান?" রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ বেচায়েন হয় না? সবই এক জাসের সাব–[২৬২]

নাট্যকার চমৎকার কৌশলে বিভাগোত্তর কালের নব্য পাকিস্তান সরকার ও তার লালিত গুন্ডাদের সাম্প্রদায়িক চেহারাকেও উন্মোচন করেছেন ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যবাণে। সরকার সমর্থক পান্ডা চরিত্রটি তাদের অপকর্মের প্রতিবাদকারি চশমাধারী ভদ্রলোকটিকে সহজেই দেশদ্রোহী হিসেবে অভিহিত করে।

নাটকে শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গোয়েন্দা পুলিশের নির্মম তৎপরতা, অপরদিকে মুসল্লির শরিয়তের বিধি নিষেধ প্রচারে কঠোর প্রবণতা এবং অন্যান্যদের নানা মন্তব্য, টীকাটিপ্পনী ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা আছে।

এ নাটকে ফুটে উঠেছে কীভাবে সরকার ভিন্ন মতকে দমন করার জন্য তার বাহিনীকে লাগিয়ে দিয়েছে। ফলে এইসব ভিন্ন মতাবলম্বী প্রগতিশীল রাজনীতিকরা ছদ্মবেশে চলাফেরা করে। সরকার এই দমনের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের দেশদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

আপনি কে (১৯৬৯)

পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য সংকলনের তৃতীয় নাটিকাটি হলো–'আপনি কে'। নাটিকাটিও গোয়েন্দা পুলিশের কর্মতৎপরতাকে কেন্দ্র করে রচিত। তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের পেছনে পাকিস্তানি মুসলিম লীগ সরকারের গোয়েন্দা নজরদারি ছিল প্রতিমুহূর্তে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ ছাত্র-ছাত্রী শহর থেকে অনেক দূরে গেছে বনভোজনে। অতি উচ্ছ্বাসে তারা ভুলে খাদ্যদ্রব্যাদি ট্রেনে ফেলেই নেমে পড়েছিল। মধ্যাহ্নে যখন ক্ষুধার জ্বালা তুঙ্গে তখন তাদের খাবারের কথা মনে পড়ে। এমন সময় স্বর্গীয় দূতের মতো খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ে উপস্থিত হয় এক আগন্তুক। এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে সকলে আগন্তুক ব্যক্তিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে ওঠে। কিন্তু আগন্তুকের নির্লিপ্ততা তাদের হতবাক করে। তখন সবাই এক সঙ্গে জানতে চায় : '...সত্যি আপনি কে? মর্তের না উর্ধ্বের? সব বিশ্বাস করতে রাজী আছি।'[২৬৩] অবশেষে আগন্তুক জানায়, 'আমি সামান্য লোক। ...সামান্য চাকুরী করি। কিছু অন্যরকম খবর ছিলো তাই আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলাম।'[২৬৪] তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ সরকারের গোয়েন্দা নিয়োজিত করা ছিল সাধারণ ঘটনা। কর্তৃপক্ষের ভীতি ও সতর্কতা এত বেশি ছিল যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিছক বিনোদনমূলক বনভোজনের মধ্যেও তারা রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার লক্ষণ খুঁজে পেতো। আর সরকারের ভীতি ছিল মূলত ছাত্র রাজনীতি নিয়ে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বনভোজনের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতার গন্ধ খুঁজে পেতে সরকার গোয়েন্দা প্রেরণ করে। নাট্যকার এই তুচ্ছ কাহিনির মধ্য দিয়েই সন্দেহপ্রবণ পাকিস্তানি সরকারকে কটাক্ষ করেছেন কৌশলে। পাকিস্তানি প্রশাসনযন্ত্রের বাঙালির বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতার চিত্র এখানে পরিস্ফুট।

একতালা দোতালা (১৯৬৯)

পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য সংকলনের চতুর্থ নাটিকাটি হলো–'একতালা দোতালা'। নাটিকাটির বিষয়বস্তু অতিসাধারণ। কিন্তু এই অতিসাধারণ কাহিনির মধ্য দিয়েই নাট্যকার কৌতুকাবরণে সমাজের অসংগতিকে তুলে ধরেছেন আকর্ষণীয় সংলাপে। বস্তুত মুনীর চৌধুরীর অধিকাংশ নাটিকাতেই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অসংগতি, ক্ষোভ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও কটাক্ষ কৌতুকাবহের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। একতালার বাসিন্দা বাঙালি ডাক্তার যুবকের সঙ্গে দোতালার বাসিন্দা পশ্চিম

পাকিস্তানি অবাঙালি যুবতির প্রেম, বিরোধ, সংঘাত এবং শেষ পর্যন্ত মিলন। এই ক্ষুদ্রপরিসরের মধ্যেই নাট্যকার পশ্চিম পাকিস্তানিদের আক্রমণ এবং বাঙালিদের প্রতি আক্রমণের মধ্যেদিয়ে দাঁতভাঙা জবাবে জয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন–

> দুলাভাই। সাবাস, সাবাস জোয়ান। বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করেছ। এইত চাই। কেবল মুখ বুঁজে সহ্য করো বলেই, ওদের সাহস এত বেড়ে গেছে।
>
> বশীর। জানতেই হবে। না জানলে টিকে থাকবে কি করে? চুপ করে সব মেনে যাও বলেই ওরা ভাবে আমরা ভীতু, দুর্বল। রুখে দাঁড়াও দেখবে সব ঠাণ্ডা।[২৬৫]

এ সংলাপের মধ্যে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বসময়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় একথা দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলা যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাটিও এ নাট্যে স্পষ্টভাবেই উপস্থাপিত।

মাইলপোস্ট (১৯৬৯)

সাঈদ আহমদের দ্বিতীয় নাটক *মাইলপোস্ট*।[২৬৬] অ্যাবসার্ডধর্মী এ নাটকের বিষয়বস্তুও ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, মহামারি ও দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের সমস্যা। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রাজপথে'র দিকনির্দেশক জড়বস্তু *মাইলপোস্ট*।[২৬৭] নাটকের সূচনাতে মাইলপোস্টকে ঘিরে একটি তাৎপর্যময় ইঙ্গিত রয়েছে। রাজপথের চৌকিদার প্রায়শই মাইলপোস্টের দিক নির্দেশকারী গন্তব্য ফলকগুলোকে তার ইচ্ছামতো বদল করে দেয়। এটি প্রচলিত নিয়ম ও নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ।[২৬৮] দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা এ নাটকটি প্রসঙ্গে নাট্যকার জানান : 'দুর্ভিক্ষ যে শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সংকটের তীব্র আর্তনাদও–এই সত্য প্রকাশের তাগিদে মাইলপোস্ট লেখা হয়।'[২৬৯]

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে বেশকিছু কৃষক আন্দোলন যেমন তেভাগা, নানকার, টঙ্ক ও নাচোলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় এগুলোর কোনোটিই পারফরম্যান্স দর্শকদের মধ্যে কোনো খোরাক জোগাতে পারেনি। এ রকম একটি সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রায় ১৫ বছর পর, জামিল আহমেদ উল্লেখ করছেন যে, ১৯৬৫ সালে বাস্তব ও থিয়েটার, উভয়ক্ষেত্রেই যখন শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রতিরোধের রূপায়ণ থেকে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে, ঠিক সেই সময় সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* নাটকটি বাংলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয়। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *মাইলপোস্ট* পাঠ করে জামিল আহমেদ বিচার করছেন, 'জনগণ যদি তাদের জীবন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকে তবুও স্যালভেশন বা পরিত্রাণ অসম্ভব কিনা এই সংশয়ে ভোগে নাটকটি।' তাই সাঈদ আহমদের এই নাট্যভাষ্যকে জামিল আহমেদ 'মেটাকমেন্টারি' বা 'মহাভাষ্য' আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, এই নাটকটি ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে একান্তই এক ভুল প্রতিরূপায়ণ। কারণ পাকিস্তানের জন্মের পর বৃহত্তম গণজাগরণের ঐ সময়টাতেই রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে অনেকে জীবনোৎসর্গ করেছিল এবং প্রায় সর্বস্তরের কৃষক-লেখক-শিল্পী-ছাত্র-শ্রমিক এমনকি সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে নিম্ন ও মধ্য বেতনভোগী কর্মচারীরাও তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হয়ে আইয়ুব খানের পতন ঘটিয়েছিল। ফলে, নাটক ও সমকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে যুক্তি ও তথ্যের নিরিখে জামিল আহমেদের মূল্যায়ন হলো, সাঈদের *মাইলপোস্ট* নাটকে দেখা যায় জনগণ জীবনোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকলেও পরিত্রাণ অসম্ভব–এই মেটাকমেন্টারি সেই সময়ের অর্থাৎ ৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের বাস্তবতা ও এর ফলাফলের নিরিখে সত্য নয়, বরং জীবনের বিনিময়ে রাজনৈতিক পরিত্রাণ আসে।[২৭০]

স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাসখানেক আগে অর্থাৎ ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে লেডি গ্রেগরির, *দি রাইজিং অব দি মুন* অবলম্বনে মমতাজ উদ্‌দীন রচনা করেন *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* নাটক। কিন্তু নাট্যকার নিজের স্বাধীনতা ইচ্ছে মতো প্রয়োগ করার ফলে নাটকটিকে মৌলিক মনে হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে রচিত এ নাটকে নাট্যকার পাকিস্তান সরকারের বেতনভুক্ত দারোগার মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ভূমিকা কী ছিল তারই চিত্র তুলে ধরেছেন। সামান্য বেতনভুক্ত সরকারের দারোগা নূর মোহাম্মদ, তার দুই পুলিশ সহকর্মী খলিলুর রহমান, আব্দুল বারেক মণ্ডল এবং জনৈক লোক এই চারটি

চরিত্রকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বের বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে নাটকটির কাহিনি। রাতারাতি প্রমোশন, দুই হাজার টাকা পুরস্কার এবং প্রাপ্ত পুরস্কারের টাকায় ঘটা করে মেয়ের বিয়ের দেওয়ার আশায় সরকারের নির্দেশে দারোগা নূর মোহাম্মদ এক দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নেতাকে ধরার জন্য রাতে ফেরিঘাটে দুই সহকর্মীসহ পাহারা দিচ্ছিলেন। দুই সহকর্মীকে তাদের দায়িত্ব পালনে পাঠিয়ে নূর মোহাম্মদ যখন এক ফেরিঘাটে টহল দিচ্ছিল তখন গরীবুল্লাহ নামক জনৈক লোকের সঙ্গে দেখা হয়। লোকটির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হয় দারোগার। লোকটি দারোগাকে ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের কথা, দেশাত্মবোধক কবিতা, গান, গল্প শোনালে দারোগার মধ্যেও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। লোকটি দারোগার কাছে জানতে চায়–

> : আপনি তো ব্রিটিশ আমলে ছাত্র। দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনার মনটাতে হাহাকার করতো না।
>
> : করতো না কি গরীবুল্লাহ, ইংরেজকে তাড়াবার জন্য কত কী করতাম। লাঠি চালাতাম, রক্তের মধ্যে আগুন ধরে যায় এমন সব গান শিখতাম।[২৭১]

লোকটি আবারও তাকে জিগ্যেস করে যে–

> : মালিক আপনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন দেশের জন্য আপনার মন কাঁদত?
>
> : এখনো কাঁদে। যদ্দিন বাঁচব দেশের জন্য কাঁদব। দেশকে ভালবাসা তো পাপ নয়। যারা স্বাধীনতা, তোমার আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তাদেরকে আমি ভালবাসি গরীবুল্লাহ।[২৭২]

এভাবেই কথোপকথনের মাধ্যমে গরীবুল্লাহ দারোগার মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। যার ফলে দারোগা যখন জানতে পারে যে, এই গরীবুল্লাহই সেই বিপ্লবী মোয়াজ্জেম যাকে ধরার জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে তখন দারোগা সহকর্মী দলিল বিপ্লবী মোয়াজ্জেমকে হত্যা করতে চাইলে দারোগা নূর মোহাম্মদ দলিলকে গুলি করে হত্যা করে এবং রক্ষা করে দেশপ্রেমিক বিপ্লবী মোয়াজ্জেমকে। শত দুঃখ-অভাব-অনটন থাকলেও দারোগা এদেশের সন্তান। নিজের পদোন্নতি, মেয়ের বিয়ের জন্য সে দেশের সঙ্গে বেইমানি করতে পারে না। জীবনের জন্য, জীবিকার জন্য পাকিস্তান সরকারের গোলামি করলেও নূর মোহাম্মদ বুঝতে পেরেছে সরকারের ষড়যন্ত্র। সরকার যে কৌশলে একজন বাঙালিকে আরেকজন বাঙালির শত্রুতে পরিণত করে চক্রান্তে লিপ্ত তা বুঝতে তার বাকি থাকে না। নাটকের শেষ সংলাপে নাট্যকার দারোগার মধ্যে যে বিবেকবোধ, দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন–

> : আমি নিজেই বড় সাহেবের কাছে হাজির হব মিঞা। বড় সাহেবকে বলব, জ্বি-হ্যাঁ আমি নূর মোহাম্মদ ছোট দারোগা, বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ছেড়ে দিয়েছি আর আমার সিপাহী দলিলুর রহমানকে গুলি করেছি।[২৭৩]

দেশিবিদেশি শব্দে হাস্যরসাত্মক সংলাপের মাধ্যমে রচিত *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত অন্যতম নাটক। এ নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মূলত পূর্ববাংলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য স্বৈরাচারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং নাট্যকারের স্বদেশপ্রীতিরও প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া সময় ও বিষয় বিবেচনা করে দেশাত্মবোধক গান সংযোজন নাটকটির যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিলগ্নে এদেশের জনগণের মনে পুঞ্জিভূত ক্রোধ, বিদ্রোহ ইত্যাদির পটভূমিতে মমতাজ উদ্‌দীন আহমদই প্রথম নাটক রচনা করেন।

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ নিজের রচিত নাটক সম্পর্কে বলেন,

> স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের হাতিয়ার ছিল নাটক। খোলা মঞ্চে স্বাধীনতার জন্যে নাটক। মঞ্চের তিন দেয়াল আলোর ঝকমকানি, অভিনয়ের সুধা তখন বাঞ্ছিত ছিল না, নাটককে সরাসরি মাঠে নামাতে হয়েছে ফাল্গুনের খোলা বাতাসের মতো; গ্রীস্মের নিকটবর্তী সূর্যের মতো। ছলাকলা দিয়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এবং বৈশাখের খরতাপকে তো সম্মোহিত করা যায় না।[২৭৪]

এদেশের জনগণকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মমতাজ উদ্‌দীন রচনা করেন রূপকাশ্রয়ী দুটো নাটক *এবারের সংগ্রাম* ও *স্বাধীনতার সংগ্রাম*।

এবারের সংগ্রাম (১৯৭১)

মমতাজ উদ্‌দীন মুক্তিযুদ্ধের শুরুর কয়েকদিন পূর্বে রচনা করেন–*এবারের সংগ্রাম* নাটকটি। বাদশা, উজির, সিপাহি ইত্যাদি চরিত্রের রূপকের আড়ালে নাট্যকার তুলে ধরেছেন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকের অত্যাচারের কাহিনি। দীর্ঘ তেইশ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষকে শাসনের নামে শোষণ করেছে। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবহেলিত বাংলার মানুষের মনে পুঞ্জিভূত ক্ষোভের প্রকাশ বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান।[২৭৫] ১৯৬৯ সালে ২৫ মার্চ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা পাওয়ার পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন নাট্যকার মমতাজ উদ্‌দীন *এবারের সংগ্রাম* নাটকের প্রথম দৃশ্যেই বাদশার সংলাপে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তা তুলে ধরেছেন এভাবে–

> : আসসালামু আলায়কুম। প্রিয় দেশবাসী, ভাইয়ো আউর বাহিনো। আমি কে? আমি হলাম এই দেশের বাদশা। এই যে মস্তবড় দেশের লম্বা চওড়া দেখছ, আমি এর তামাম জানমালের মালিক। আমি কী করতে পারি? আমি সবকিছু করতে পারি। যদি বলি চুপ করে আমার হুকুমে বসে থাক, তোমরা বসে থাকবে, আর যদি বলি খাড়া হো যাও, তোমরা খাড়া হয়ে যাবে। যদি খাড়া না হও তাহলে? তাহলে আমার সিপাহসালারকে বলব ডাণ্ডা লাগাও। ব্যস্ ডাণ্ডা দিয়ে তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবে। তখন কী হবে? লহুর দরিয়া বহে যাবে। সেটা কি ভাল হবে? কভি নাহি।[২৭৬]

বাদশার এই সংলাপের মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়া খানের অমানবিক স্বৈরাচারী শাসন জুলুমের চিত্র ফুটে উঠেছে। এরপর একে একে ইয়াহিয়া, ভুট্টোর ষড়যন্ত্র, ছয়দফা আন্দোলনের গণপরিষদের বৈঠক বাতিল এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক সৈনিক গভর্নর শপথ পড়াতে অস্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলোও নাট্যকার অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে এই নাটকে তুলে ধরেছেন।[২৭৭] অধিকারসচেতন এই বাঙালিদের সম্পর্কে উজির বাদশাহকে সাবধান করছে :

> : পূর্বেদেশের মানুষ ছয়টা মনতরের একটা মনতরও ছাড়বে না। সবকটা মন্তরে একটা একটা করে বুঝে নিলে ওদের দিলে শান্তি পয়দা হবে।[২৭৮]

এই ছয়টা মনতর যে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা দাবি তা বোঝার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ১২ নভেম্বর রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলে এক ভয়াবহ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। এ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১০ লক্ষাধিক লোকের সলিলসমাধি হয় এবং বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতিসাধনসহ প্রায় ৩০ লক্ষ লোক ছিন্নমূল হয়ে পড়ে। এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগণিত মানুষের মৃত্যুর জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা ছিল অনেকাংশে দায়ী। উপগ্রহ থেকে ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে বহু মানব দরদি ছুটে আসেন। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে স্বৈরশাসক যে তার জন্য কোনোরকম সাহায্য সহযোগিতাই করেনি সেই বাস্তব বিষয়টিও নাট্যকার উজিরের সংলাপে তুলে ধরেছেন–

> : পূর্বদেশে বড় তুফানে যখন দশ লাখ লোক সমুদ্দরের পানিতে মরে গেল, আমরা কেই দেখতে যাইনি, ওদের পেটে খাবার নাই, আমরা খেতে দেইনি, ওদের ছাত্রদের গুলি করে মেরেছি। ওদেশে কলকারখানা করি নি, বন্যাতে সয়লাব হয়ে গেল, আমরা এখানে শুকনাতে বসে ফিক ফিক করে হেসেছি হুজুরে হামরাহি।[২৭৯]

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা যে সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময় থেকে একাত্তর পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সবক্ষেত্রেই পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে সেই বিষয়টিও সমকালসচেতন নাট্যকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। দৃষ্টি এড়াইনি পূর্ববাংলার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারী মানুষের ছয় দফা দাবির প্রসঙ্গটি। নির্মম, নিষ্ঠুর টিক্কা খানের হাতে ইয়াহিয়ার পূর্বপাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টিও উঠে এসেছে বাদশার সংলাপে–

: জিত রাহো দিল্লের সিপাহসালার। না, না। তুমি তো এখন শুধুমাত্র সিপাহসালার না। তুমি আমার কমবখত পূর্বরাজ্যের মালিক। হাঁ তোমাকে আমি সেই রাজ্যের নয়া মালিক বানিয়ে দিলাম।[২৮০]

এই টিক্কা খান যে কীভাবে তার বর্বরোচিত শক্তিকে পূর্ববাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক মানুষের ওপর প্রয়োগ করেছে সিপাহসালারের সংলাপে তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে–

: আইন, আইন, আইন। কিসের আইন, কার আইন? এখানে কোন আইন নাই। আমি আইন, আমার শক্তি আইন, আমি তোমাদের মালিক।[২৮১]

নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক যাদের হাতে অস্ত্র ছিল না কিন্তু ছিল গভীর দেশপ্রেম, তারা বসে থাকে নি। আইয়ুব, ইয়াহিয়া, টিক্কা খানের বিরুদ্ধে তারা বরাবরই ছিল প্রতিবাদী। নাট্যকার এই নাটকে 'মানুষ' চরিত্রটিকে পূর্ববাংলার নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক জনতার আকাঙ্ক্ষার কথা–

: আমি মরব, আমার ভাই মরবে, বোন জীবন দিবে। আর আমাদের দামাল ছেলেরা লড়াই করবে। আমাদের এক এক ফোঁটা রক্তে একশোটা বিদ্রোহী ছেলে জন্ম নিবে ওরা লড়বে। আজীবন লড়াই চলবে।[২৮২]

এবং নাটকের একেবারে শেষে এই মানুষ চরিত্রটি যখন বলে–

: 'এবারের সংগ্রাম', তখন তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ জনতাও বলে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ : স্বাধীনতার সংগ্রাম।[২৮৩]

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক বিপ্লবী জনগণকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে এবারের সংগ্রাম যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তা অনস্বীকার্য। নাটকটি সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে–

বিষয়টি এতো সমসাময়িক এবং নাট্যকার এতো চমৎকারভাবে সেটি উপস্থাপিত করেছিলেন যে, জনতা যেন প্রতিটি সংলাপের সঙ্গে যথার্থই একাত্ম হয়ে প্রতি মুহূর্তে সোচ্চার প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেছিলো।[২৮৪]

'এবারের সংগ্রাম' নাটকের শেষে 'মানুষ' চরিত্রের সংলাপের মধ্যে নাট্যকার বাঙালিদের দৃঢ় মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

মানুষ ॥ পালিয়ে যাবে কোথায়? এদেশের কোন ঘরে তার আশ্রয় জুটবেনা। মাইলকে মাইল মানুষের মিছিল নিয়ে এদেশের সবখানে ওর তল্লাশী চালাবে। খুঁজে বের করবই জুলুমবাজকে। আমার ছেলের রক্তের দাম আমি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেব। ভাইসব, সূর্যেও আগুনে শরীরকে তাতিয়ে নাও। এস, ঘর ছেড়ে বাইরে এস শ্যামল ঘাসের দেশে।
ঐক্যবদ্ধকণ্ঠ ॥ এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম।[২৮৫]

স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৭১)

১৯৭১ সালের **২১** মার্চ মমতাজ উদ্‌দীন মুক্তিযুদ্ধ সূচনার কয়েকদিন পূর্বে রচনা করেন নাটক *স্বাধীনতার সংগ্রাম*। **২৪** মার্চ লাখ লাখ জনতার সামনে মঞ্চস্থ এই নাটক বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী জনতাকে সেদিন সাহসী ও অনুপ্রাণিত করেছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। স্বদেশপ্রেমিক নাট্যকার মমতাজ উদ্‌দীন *এবারের সংগ্রাম* নাটকের মতো এ নাটকেও রূপকের মাধ্যমে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি নাট্যকার শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সপক্ষে বাঙালির প্রতিবাদ এবং রুখে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে অঙ্কন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক যে কী পরিমাণ নিষ্ঠুর, বর্বর ছিল, কী পরিমাণ অত্যাচার করেছিল নিরীহ পূর্ববাংলার জনগণের ওপর **১**ম দৃশ্যেই নাট্যকার বর্গী ও হুকমত-এর সংলাপের মধ্য দিয়ে সেই চিত্র তুলে ধরেছেন–

হুকমত : জাহাজে জাহাজে সিপাহী লিয়ে আসেন। এ মুল্লুকের ঘরে ঘরে দেশের দুশমন কা বাচ্ছা তড়পচ্ছে।
বর্গী : আর কত দিন তড়পাবে! এসব ফুসরফাসুর আলাপ আলোচনার মধ্যে আমার বিশ্বাস নাই। ঘরে ঘরে ঢুকে পড়। টেনে আন, ন্যাংটা করে চাবুক চালাও, সব বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের পিয়ারা কায়েদে আজম স্যার, মিল্লাত সাহাব নাই। দেশটা মগের মুল্লুক হয়ে গেল নাকি![২৮৬]

শুধু দেশের সম্পদ, দেশের জনগণের ওপরই নয়, সাতচল্লিশের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা যে এদেশের ভাষা সংস্কৃতির ওপরও একের পর এক আঘাত হেনেছিল সেই চিত্রও লক্ষ করা যায় বর্গীর সংলাপে–

: ছিড়ে ফেলে পাপ ক্ষয় কর। লেখার নকশা দেখ? অ, আ, ক, খ। উর্দু জবান শেখ না। শিখ না। যখন দোজখের আগুনে জ্বলবে তখন বুঝবি কায়দে আজম সাহেবের ব্রেন কত ঝকমকে ছিল। দুখু মিঞা, বেকুবের মতোন দাঁড়িয়ে থেক না, পোস্টার ছিড়ে নিয়ে এস।[২৮৭]

যত অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা করুক, যতই ভয়-ভীতি, অস্ত্র দেখাক এদেশের মানুষ যে জীবন দিয়েও দেশকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। মৃত্যুর সামনে দাড়িয়ে জহুরুলের দৃপ্ত কণ্ঠে সেই ধ্বনিই যেন উচ্চারিত হয়–

: আমার আঙুলের মধ্যে চারটা করে মোটা মোটা সুঁই গলগল করে ভরে দিয়েছে। দশ হাজার পাওয়ার লাইটের নিচে চোখ খুলে তিন দিন তিন রাত বসেছিলাম দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছে। আমার বুকে আর পিঠে তোমার সিপাহীরা শঙ্খ মাছের চাবুক মেরেছে, তবু আমি বেঁচে আছি, আমি বেঁচে থাকব, বাংলার স্বাধীনতার জন্য বেঁচে থাকব।[২৮৮]

জহুরুলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের সংলাপ–

: আমি আবার বেঁচে উঠব। যতবার মারবে ততবার বাঁচব।[২৮৯]

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত মুনীর চৌধুরীর কবর নাটকে কবর থেকে উঠে আসা ছায়ামূর্তিরাও বলেছিল মাটির যত গভীরে তাদের পুঁতে রাখা হোক দেশকে শত্রুমুক্ত করতে প্রয়োজনে তারা কবর থেকে উঠে আসবে। একাত্তরে দেশকে পাকিস্তানি শত্রুদের কবর থেকে মুক্ত করার জন্য কবর থেকে উঠে আসা একজন যেন জহুরুল। ঝাকড়ু জীবনধারণের জন্য পাকিস্তানি হানাদারদের কাজ করলেও এক সময় সেও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে দুখু মিঞা। ঝাকড়ু 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে অত্যাচারিত বর্গীকে ঝাঁপটে ধরে। লক্ষ টাকা দিয়েও হানাদার বাহিনী ঝাকড়ুর দেশাত্মবোধকে কিনতে পারে না। ঝাকড়ু স্পষ্ট জানিয়ে দেয়–

: টাকা দিয়ে আমার ঈমান লিতে পারবি না বর্গী।[২৯০]

দুখুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় স্বাধীনতাকামী লক্ষ বাঙালির অন্তরের কথা–

: তেইশ বছর সহ্য করেছি, ভালবেসেছি, দয়া করেছি। কিন্তু তোমরা ভাল হবার নও। এখন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তোমাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেব। তোমাদের পালাবার পথ গুড়ো করে দেব আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষ। লজ্জায় অপমানে আর পরাজয়ের যন্ত্রণায় তোমাদের সৈন্যবাহিনী পাগল হয়ে যাবে। এবার যুদ্ধ।[২৯১]

দুখুর কথা শেষ হতেই গ্রেনেড ও গুলির শব্দ শোনা যায়। এর মাঝেই দুখু দৃপ্তকণ্ঠে সমগ্র বাঙালিকে আহ্বান জানায় যুদ্ধের জন্য। ঘোষণা করে সেই অবিস্মরণীয় বাণী, যে বাণী ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উচ্চারণ করেছিলেন–

: এবারের সংগ্রাম; স্বাধীনতার সংগ্রাম।[২৯২]

এই সংলাপ উচ্চারিত হওয়ার পর সেদিন সত্যি সত্যি কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন যে, সেদিন এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম এই সংলাপটি উচ্চারিত হওয়ার পর–

জনতা বিশাল ক্রোধে ও বিশাল উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। বাস্তবে ঠিক সেই মুহূর্তের খবর এলো, 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র আনার পথে প্রতিরোধ সরাবার জন্যে ক্যান্টনমেন্ট থেকে খান সেনারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

শোনা মাত্র হাজার হাজার মানুষ আশপাশ থেকে লাঠি সংগ্রহ করে ছুটলো নাসিরাবাদের দিকে। সেখানে গড়ে তুললো প্রতিরোধ। সৈন্যরা আসতে পারে নি।[২৯৩]

নাট্যকার নিজে তাঁর এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন–

'স্বাধীনতার সংগ্রাম' লিখেছি একাত্তরের একুশে মার্চ। চট্টগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে এ নাটকের রচনা। সেদিন ছিল ২৪ মার্চ, চট্টগ্রাম কলেজ মাঠে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। বন্দরে জ্বলছে আগুন, পথে পথে ব্যারিকেড। দশ সহস্র দর্শক এ নাটক দেখে ভীষণ রকম আলোড়িত হয়ে শত্রু চরিত্রগুলোকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছে। অভিনয়ের শেষে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে মিছিল করে দর্শক ছুটে গেছে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে।[২৯৪]

এবারের সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সংগ্রাম নাটক দুটো সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য–

স্বাধীনতা আন্দোলনের অব্যাহতি আগে, যথাক্রমে ১৪ ও ২১ মার্চ ১৯৭১, মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ রচিত নাটক দুটির শিল্পমূল্য যাই হোন না কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাবাহী নাটকের পথিকৃৎ হিসেবে ঐতিহাসিক মূল্যের দাবি রাখে।[২৯৫]

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই নাটক দুটি চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দান ও লালদীঘির ময়দানে লক্ষাধিক সমাবেশে অভিনীত হয়েছিল। নাটক যে গণ-আন্দোলনকে কীভাবে সরাসরি উদ্দীপ্ত করতে পারে তার উদাহরণ এ দুটি নাটক। নাটক দুটি একাত্তরে চট্টগ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছিল, এত ঘৃণা মানুষ কখনো দেখেনি, কখনো অনুভব করেনি। বাঙালি বুঝতে পেরেছিল তাঁরা বাঙালি, তাঁদের ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি একান্তভাবেই শুধু তাঁদেরই।

পাকিস্তানের নাট্য ইতিহাস ও নাট্য মঞ্চায়নের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, নাট্য মঞ্চায়নে নতুনত্ব না থাকলেও আধুনিক জীবনবোধ এবং আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে গণচেতনা জাগ্রত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন নাট্যকর্মীরা। নাট্যসাহিত্যেও এই গণচেতনা লক্ষণীয়। নাটকের ক্ষেত্রে আমাদের যে অগ্রগতি তার পেছনেও একুশের চেতনা ফেলেছে অসামান্য প্রভাব। ভাষা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার সময়েই এ নিয়ে নাটক লেখা হয়েছে। ১৯৫১ সালে লেখা আসকর ইবনে শাইখের নাটকটির নাম *দুর্যোগ*। এরপর থেকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের পর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে বাষট্টিতে। স্বৈরাচারবিরোধী এ আন্দোলন ধীরে ধীরে ছাত্রজনতার বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত হয়। আধুনিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ প্রাগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণির কর্মকাণ্ডে তারা নানাভাবে বাধা প্রদান করতে থাকে, তবুও ছাত্র-জনতার আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ষাটের দশকের পুরো সময় ছিল ছাত্র-জনতার আন্দোলনের তরঙ্গিত অধ্যায়। এই সময় সামরিক শাসনে অবরুদ্ধ থেকে গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী প্রগতিশীল মধ্যশ্রেণির নাট্যকর্মীরা সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবিতে যতটা উচ্চকিত ছিলেন তাদের সেই রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রতিবাদের ধারায় কিছুটা ভাটা পড়ে। কিন্তু থেমে যায় নি। কেউ কেউ রূপকের আশ্রয় নিয়ে, কেউ বা ঐতিহাসিক কাহিনির প্রেক্ষাপটে সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়কে তুলে ধরেছেন। ১৯৬০ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটকে দেশকাল, রাজনৈতিক সংঘাত ও সমাজজীবনের বিচিত্র চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ সময়ে রচিত নাট্যসমূহ বাঙালি জাতির জীবনালেখ্য হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের অগ্নিকুণ্ডে ৬৬-র ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সংঘটিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরশাসক আইয়ুবের পদত্যাগ, সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ ও পুনরায় সামরিক শাসন জারি এবং ছাত্র গণ আন্দোলনের চাপে ৭০-এর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক জটিলতা কিছু কম ছিল না। সেই সময়ে সামাজিক মেলোড্রামার পাশাপাশি তাই সংগতভাবেই প্রগতিশীল ও রাজনীতি-সচেতন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এই আলোচিত নাটকগুলো ঢাকাসহ দেশব্যাপী মঞ্চায়ন করে। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'কবর', 'ক্রীতদাসের হাসি', 'তৃষ্ণায়', জিয়া হায়দারের 'শুভ্রাসুন্দর কল্যাণী আনন্দ' প্রভৃতি। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী নাট্যকাররা স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে আত্ম-আবিষ্কারে অধিক যত্নশীল হয়ে পড়েন।

উপন্যাস

৬০-এর দশকের পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে যে সব উপন্যাস রচিত হয়েছে সেগুলোই আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক দশক পূর্বে ও পরে এদেশের ব্যক্তি ও সমাজ মানসিকতার যে চিন্তা-স্রোত বয়ে গেছে, তারই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলা উপন্যাসে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।[২৯৬] রাজনীতি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাহিত্য হচ্ছে সমাজ মানুষের মানস ফসল। লেখকের প্রবণতা অনুসারে সাহিত্যে তাই রাজনীতির প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। আর দেশ, কাল ও সমাজের পটভূমিতে জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণ যেহেতু ঔপন্যাসিকের

লক্ষ্য তাই সমাজ ও রাজনীতি উপন্যাসের বিশেষ উপাদান হিসেবে উপস্থিতিও স্বাভাবিক।[২৯৭] ষাটের দশকে বাঙালির জাতীয় চৈতন্যের উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিকদের চেতনালোকও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তির আত্মগত বৃত্ত ভেঙে তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে জনজীবনের ব্যাপক পরিসরে। শোষণ-নিপীড়ন ও অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত জাতিসত্তার মুক্তিকামী চেতনার অঙ্গীকার এ-সময়ের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই আলোড়িত করেছে প্রবলভাবে।[২৯৮] পৃথিবীর সবদেশের সব সমাজে কোনো না কোনো প্রকার রাজনীতি বর্তমান থাকে। কলোনিশাসিত সমাজের বিকাশপ্রক্রিয়ায় এ রাজনীতি আরও বেশি দ্বন্দ্বময় ও জটিল হয়ে থাকে।[২৯৯] সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি তাদের শ্রেণিস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সেই রাজনীতির জন্ম দেয় ও তাকে টিকিয়ে রাখতে তৎপর থাকে। আর সমাজের সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনাও সেই রাজনৈতিক খাতেই প্রবাহিত হয়। আবার সেই সমাজের মধ্য থেকেই সমাজসচেতন সমাজকল্যাণকামী চিন্তাশীল মানুষের উদ্ভব ঘটে এবং তাঁরা সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নততর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনাও সমাজ মানুষ কর্তৃক অনুসৃত হয়। ঔপন্যাসিকগণ হলো সমাজের সেই চিন্তাশীল মানুষ যাদের রচনার মধ্য দিয়ে জনগণ সচেতন হয় এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। শুধু দেশের নয়, পৃথিবীর অন্য দেশের সমাজের উন্নততর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাও ঐ সময় আমাদের সমাজকে কম বেশি আলোড়িত করে।

বাংলা উপন্যাসে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালিত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব

একটি অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো ঐ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের ঔপন্যাসিক-শিল্পরূপকে করে দেয় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। দীর্ঘকালে ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলা উপন্যাস এক গতিশীল ও জীবনমুখী চরিত্রধর্ম অর্জন করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে বাংলা উপন্যাসে যে ধর্মনিরপেক্ষ গণস্বাধীনতার তাগিদ ক্রমেই পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল, সেটা আর বাস্তবরূপ নিতে পারেনি। বরং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতাকামী চৈতন্য নিক্ষিপ্ত হলো এক অন্ধকার সমাজগহ্বরে। যেখানে ধর্মাদর্শের প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলিত করা হলো পাকিস্তানের নব্য-ঔপনিবেশিক কাঠামোতে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ রূপান্তরিত হলো জাতিশোষণ ও শ্রেণি-শোষণের বিশ শতকীয় জটিল প্রক্রিয়ায়। জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ে নতুন ব্যাখ্যা দানেরও চেষ্টা হলো। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশসূত্রে যে গুণগত পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল, বাঙালি জীবনে তার প্রতিষ্ঠা হলো বাধাগ্রস্ত। দাঙ্গা, মহামারি, দারিদ্র্য, উদ্বাস্তু সমস্যা, নিপীড়ন, সংস্কৃতি-বিলোপের চেষ্টা প্রভৃতি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে নিক্ষেপ করলো গভীর সংকটাবর্তে। এ-সংকট তার অস্তিত্ব, আত্মপরিচয়, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানের সংকট।[৩০০] আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা-অনুসন্ধানের প্রেরণায় বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা পাকিস্তানের সূচনাপর্বে জাতীয় চৈতন্যের মর্মমূল-উৎসারিত সত্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জাতি ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানবাদী চেতনার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে।[৩০১]

রাষ্ট্র ও সমাজবিন্যাসের নতুন রূপের ফলে উপন্যাসের বিষয়-উৎসও হয়ে উঠলো স্বতন্ত্র। বাঙালি চেতনায় প্রগতিশীল এবং রাষ্ট্রীয় বিন্যাসে এ বিষয়ে অধোগতির ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজ অগ্রসর হতে থাকলো।

স্বাধীনতা-পূর্বকালে কলোনি-শোষণ ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ হিসেবে মিথ-এতিহ্য ও ইতিহাস-অবলম্বী রূপক ও প্রতীকী উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে। ষাটের দশকের সমরাস্ত্রশাসিত সময়খণ্ডে *আরব্য-রজনী* ও শাহ্‌নামার মিথ-কথা অবলম্বনে উপন্যাস রচিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে পশ্চিম এশীয় পুরাণকথা নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়। একইসঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ঔপন্যাসিকগণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছে–বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোকপুরাণ অবলম্বনে রচিত উপন্যাসের মাধ্যমে।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের প্রতিক্রিয়ায় নব্য-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর নীতির কারণে বাংলাদেশের প্রগতিশীল ধারা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয় এবং বিপন্ন হয়ে পড়ে প্রগতিশীলরা। ১৯৫২-এর বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিবাচক ফল বাঙালি সৃষ্টিশীল আবেগকে করে তোলে তরঙ্গস্পন্দিত ও জনজীবনমূলস্পর্শী। জাতির সৃষ্টিশীলতার সেই প্রস্তুতি পরিণতি পাওয়ার পূর্বেই ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়।[৩০২] সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পরিবর্তে বেশিরভাগ সাহিত্যিক নীরবতা অবলম্বন করে। কিছুটা বিলম্বে হলেও জাতীয়চৈতন্যের সেই অগ্নিমুখী আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে ঔপন্যাসিকরা মনোযোগী হলেন। এ-ক্ষেত্রে সমকালীন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রামের সূচিমুখ-তীব্রতা এবং বস্তুনিষ্ঠ মূর্ত-অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা ঔপন্যাসিকদের উদ্বুদ্ধ করেছে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এ ধারাকে সাহিত্যে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* (১৯৬৫), আলাউদ্দিন আল আজাদের *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪), সরদার জয়েনউদ্‌দীনের *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৭), জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯), জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* (১৯৬৯) এবং সত্যেন সেনের *উত্তরণ* (১৯৭০) ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

আইয়ুব খানের এক দশক স্বৈরশাসনকবলিত সমাজ ও রাষ্ট্র অধিকাংশ ঔপন্যাসিককেই করেছে অন্তর্মুখী জীবনচেতনায় বিশিষ্ট। তারা সামরিক শাসনের নিষ্পেষণ-নিপীড়নে ভয়ে দ্রোহ ও প্রতিবাদের পরিবর্তে জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তাচিন্তায় আত্মমুখী ও পলায়নপর নীতি অবলম্বন করেন। ষাটের দশকে রচিত উপন্যাসকে বিষয়গত দিক থেকে কয়েকটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা যায়–এক. আত্মগত চেতনা প্রবল মধ্যবিত্তজীবন যেখানে পলায়ন, অস্তিত্বশঙ্কা ও মনস্তাপে দীর্ণ, বিচূর্ণ জীবনানুভূতিই মুখ্য; দুই. বিবর্তনশীল গ্রামজীবন নাগরিক শিক্ষা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাত নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ পটভূমিতেও রূপান্তর অনিবার্য করে তুলেছে। ধর্মভীতি, সমরাস্ত্রভীতি ও অস্তিত্বভীতির অন্ধকার থেকে প্রতিবাদী প্রাণের উন্মেষ প্রধানত ব্যক্তিচিহ্নিত হলেও সংঘচেতনার ইঙ্গিতও সেখানে সুস্পষ্ট; তিন. মিথ-ঐতিহ্য ও ইতিহাসচেতনা : প্রথম পর্যায়ের আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানের দ্বিধান্বিত পদযাত্রা এ-পর্যায়ে কিছুটা দ্বিধামুক্ত ও মীমাংসাপ্রবণ। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে যেমন এ-পর্যায়ের ঔপন্যাসিকরা নবচেতনায় গ্রহণ করেছেন, তেমনি, মিথিক উপকরণের মধ্যে সন্ধান করেছেন বিশ্বপ্রাণের সংগ্রামী জীবনচেতনার ভাবনাবীজ। অর্থাৎ বাংলাদেশে বাংলাদেশের উপন্যাসের দেশজ চেতনাস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনাপ্রবাহ; এবং চার, রাজনীতিচেতনা : সময়, সমাজ ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাঙালিজীবনের অবস্থান নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* এবং জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে বাঙালির রাজনীতিচেতনার ক্রমবিবর্তনের সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ-ধারায় সত্যেন সেন সংযোজন করেন এক নতুন মাত্রা। তাঁর *উত্তরণ* উপন্যাসে কৃষিজীবনমূল-উদ্ভূত চরিত্রের আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও আত্মরূপান্তরের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও তার অব্যবহিত ঘটনাপ্রবাহে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি অতি দ্রুত রূপান্তরিত হয়েছে। আইয়ুবি দশকের বৃত্তাবদ্ধ অন্ধকার গহ্বর থেকে তাঁদের ঘটেছে আত্মমুক্তি। জাতিসত্তার প্রশ্নে মীমাংসিত ও সংঘবদ্ধ মধ্যবিত্তমানস স্বাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হয়ে উঠেছে সংগ্রামশীল। ফলে, নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনও হয়েছে জাতীয় রাজনীতির তরঙ্গ-কম্পনে আলোড়িত ও প্রাণচাঞ্চল্যপূর্ণ। এ পর্বের উপন্যাসের প্রতিরূপকের আশ্রয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিকের অন্তরিত প্রতিবাদ ও দ্রোহ। এ-ধারার রূপনির্মিতির ক্ষেত্রে শওকত ওসমানের সাফল্য ও সিদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে প্রকরণসতর্কতার ফলে উপন্যাস হয়ে ওঠে চরিত্রপ্রধান, মনোবিশ্লেষণময়, রূপক-প্রতীকধর্মী এবং মিথ-আশ্রয়ী।

ঔপন্যাসিকগণের মানসজগতে পরিবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে তিন দশকব্যাপী বাংলাদেশে যে নব্যশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়, তা একটি

সংঘবদ্ধ শ্রেণিচরিত্রের রূপ নেওয়ার পূর্বেই কার্যকর হয় ভারত বিভাগ। ফলে এ অঞ্চলের যে প্রগতিশীল চরিত্র তা অল্প সময়ের জন্য হলেও ব্যাহত হয়। এ সময়ের ঔপন্যাসিকগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের বাইরে-বৃহৎ মানব ধারণায় পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারেনি।[৩০৩] এ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জটিল, দ্বন্দ্বময় ও বহুভঙ্গিম চারিত্রই নিরূপণ করেছে বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশের চেতনাপ্রবাহ। সময়, সমাজ ও জীবনের উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধারণ করার ফলেই এ-পর্যায়ে রচিত উপন্যাস তাৎপর্যমণ্ডিত ও স্বতন্ত্র।[৩০৪] মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৩) *আনোয়ারা*, কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) *নদীবক্ষে (১৯১৯)*, কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) *আবদুল্লাহ (১৯৩৩)*, আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) *চৌচির* (১৯২৭), *সাহসিকা* (১৩৫৩) এবং *প্রদীপ* ও *পতঙ্গ* (১৩৩৭-৩৮), হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) নদী ও নারী (১৯৪৫), অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* ও শওকত ওসমানের *জননী* ইত্যাদি উপন্যাসে প্রকৃতি ও একটা বিকাশশীল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত জীবনের রূপকল্প হিসেবে ফুটে ওঠেছে। মুসলমান ঔপন্যাসিকদের প্রয়াসকে পাকিস্তানের সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম পর্যায়ে অনেক সমালোচক ঐতিহ্য বলে বিবেচনা করতো।[৩০৫] এই মুসলিম ঔপন্যাসিকদের[৩০৬] রচিত উপন্যাসকে পূর্ব-পাকিস্তানি উপন্যাসের ঐতিহ্য হিসেবে আলোচনার মধ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মোহাবিষ্ট আলোচকের বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। এতে মুসলমানিত্ব ও পাকিস্তানিত্বকে অভিন্নভাবে দেখা হয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযুক্ত হতে পারে কিন্তু সেটা ঐতিহ্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এর প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে ঐ ঔপন্যাসিকদের প্রয়াসের মধ্যে এমনসব কৃতিও আছে, যা মুসলমানিত্ব বা পাকিস্তানিত্ব কোনোটারই ইঙ্গিতবহ নয়।

আবার এ-সব ঔপন্যাসিকের অনেকেই পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তানি জাতীয়তার প্রতি আস্থাজ্ঞাপনে অনীহা প্রকাশ করেছেন এবং কেউ কেউ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয় বরং শৈল্পিক ও মানবীয় দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন।[৩০৭] আমাদের ঔপন্যাসিকরা বাঙালির স্বাতন্ত্র্যচেতনার অভিব্যক্তিতে উচ্চকণ্ঠ হতে পারে নি পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকটাই। কারণ ছিল একাধিক–ক. পাকিস্তানি জাতীয়তায় ঔপন্যাসিকদের আস্থা, খ. শিল্পীর স্বাধীনতার সমস্যা, গ. সরকারি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা। এ-সব কারণে উপন্যাসগুলোর বাঙালির স্বাতন্ত্র্য-চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত চিত্রগুলো পাকিস্তানি শোষণ কবলিত বাঙালি মধ্যবিত্তের নানাবিধ বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ ও হতাশার সাধারণ চিত্রের বৃত্তে আবদ্ধ। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তার ধারণা জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' ব্যতিরেকে আর কোনো উপন্যাসে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেনি।[৩০৮]

ঔপন্যাসিকদের মানসিক যে রূপান্তর হয়েছে তা তুলে ধরার জন্য একটি উদাহরণ তুলে ধরছি–ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে বেশিরভাগ মুসলিম ঔপন্যাসিক সাম্প্রদায়িক চিন্তার ভিত্তিতে উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু শওকত ওসমান সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীচিন্তার বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। শওকত ওসমানের প্রথম দুটি উপন্যাস হলো–*জননী*[৩০৯] ও *বনী আদম*। এই দুটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু মুসলিম জাতির আত্মসন্ধান ও মুসলিম সমাজ হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত মানবতার জয়গান তুলে ধরেছেন। মানবতার পক্ষে সবসময় তিনি কথা বলেছেন, কোনো সংকীর্ণতার পরিচয় তার এ সময়ের রচনায় পাওয়া যায় না। তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হলো–*জননী* উপন্যাসটি।[৩১০] যে শওকত ওসমান প্রথম পর্যায়ে উপন্যাস রচনা করেছেন–মুসলমান জাতির আত্মসন্ধান নিয়ে তিনি পরবর্তীকালে ৬০-দশকে রচনা করেন–*ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), *চৌরসন্ধি* (১৯৬৬), *সমাগম* (১৯৬৮), *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭০)। এই উপন্যাসগুলো বাঙালির স্বাধিকার ও স্বতন্ত্র জাতির হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রেরণা দেয়।

এভাবে আমরা দেখতে পাই ঔপন্যাসিকগণ যারা ইসলাম ও মুসলিম সমাজ ইত্যাদি এক সম্প্রদায়ের বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। তারা আবার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের লেখার মধ্য বাঙালি জাতির মুক্তির কথা বলছেন। এই রূপান্তরিত বাঙালি জাতিকে মুক্তির জন্য প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উপন্যাসে পাকিস্তানি রাজনীতির প্রতিফলন

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের বাইরে আরও রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়, যাদের নীতি ও আদর্শ ছিল–অসাম্প্রদায়িকতা, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা। এভাবে পরস্পরবিরোধী দুই শক্তির দ্বন্দ্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তায়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রতিফল আমরা দেখতে পাই শাসকগোষ্ঠীর '৫২ সালের বাংলা ভাষার ওপর আঘাতের পর। এরপর থেকে বাংলা উপন্যাসেও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ভাষা আন্দোলনের চেতনার প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন উপন্যাসে[৩১১] ভাষা আন্দোলন অনুষঙ্গ হিসেবে কিংবা কোনো চরিত্রের স্মৃতিতে বার বার ফিরে এসেছে। এসব উপন্যাসে একুশের স্মৃতিচারণ করা ও শহিদ দিবস পালনের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। একইসঙ্গে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগের সমালোচনা করা হয়েছে। শাসকগোষ্ঠী যখনই বাঙালিদের শোষণ করার চেষ্টা করেছে ভাষা আন্দোলন থেকে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে বাঙালিকে সাহস ও উৎসাহ জুগিয়েছে। একদিকে, রক্ষণশীল মৌলবাদী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থিত ঔপন্যাসিক এবং অন্যদিকে ভাষা আন্দোলন ও গণতন্ত্রী-মানবতাবাদী আদর্শে পুষ্ট ঔপন্যাসিক। পাকিস্তান শাসনকালে বাংলার রাজনীতির মতো ঔপন্যাসেও একই ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যার ফলাফল হলো বাঙালিত্বের পরিস্ফুটন ও পরিণতি।

এ সময় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির জাতীয়তাবাদী উত্থান বিনাশের জন্য চক্রান্ত এবং পাকিস্তানের ধর্মাদর্শ-অনুযায়ী তাকে পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরদিকে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে বাঙালিরা চেষ্টা করে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা তৈরির। এ রকম কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো–সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু* উপন্যাসটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প কিছু কাল পরেই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে সরল ধর্মপ্রাণ গ্রামীণ মানুষের সমাজ পরিবেশে ধর্ম ব্যবসায়ী প্রতারকদের শোষণ ও অত্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে ব্যক্তির জীবন-জিজ্ঞাসাকে মূর্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ধর্মাশ্রয়ী শোষণ-নিপীড়ন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ইঙ্গিতময় তাৎপর্য পেয়েছে।[৩১২] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শাসকগোষ্ঠী সাধারণ জনগণকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলার গ্রাম ও সমাজ-জীবনের এক ধ্রুপদি জীবনধারার মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর সেই চরিত্র *লালসালু* উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি এতে বাংলার লোকায়ত সংস্কার ও ধর্মাচরণের নেপথ্যে তথাকথিত ধর্মধ্বজাধারী ও ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের স্বরূপ গভীর জীবনবোধ ও মমত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেন।[৩১৩] ধর্মবিশ্বাস কিন্তু ওয়ালীউল্লাহর আক্রমণের লক্ষ্য নয়, তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মব্যবসা এবং ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব। অর্থাৎ স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণির লোক যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানান ভণ্ডামি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আঘাত তার বিরুদ্ধে। লেখক সামাজিক এই বাস্তবতার চিত্রটিই এঁকেছেন 'লালসালু' উপন্যাসে, উন্মোচিত করেছেন প্রতারণার মুখোশ। পাকিস্তান দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন হয়। এরপর থেকে শাসকগোষ্ঠী ধর্মের অপব্যবহার করে মানুষ ও মানবতাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মের অপপ্রয়োগ করছে এর বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিক তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছেন। এই উপন্যাসে আব্দুল মজিদ হলো পাকিস্তানি শাসকের চরিত্র এবং আক্কাস হলো শোষিত বাঙালির একটি চরত্রি। যার মাধ্যমে পুরো জাতিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসের যে বিষয়টি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সহজ সরল বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ধর্মীয় অজুহাতে শোষণ।

ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২)

ক্রীতদাসের হাসি আদমজী পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস। বিষয় এবং পরিচর্যার উপন্যাসটি অভিনব।[৩১৪] মানবীয় মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার চিরন্তন সংঘাতের স্বরূপ রূপক ফর্মের আশ্রয়ে রূপ লাভ করেছে *ক্রীতদাসের হাসি*।[৩১৫] শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) উপন্যাসটিতে প্রতীকাশ্রয়ে তৎকালীন পাকিস্তানিদের বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা

হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনসুর মুসা বলেন, "শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসী' আমাদের জীবনেরই কোনো জটিলতর সমস্যার প্রকাশ করেছে দূরাগত ঐতিহ্যের আশ্রয়ে।"[৩১৬] কাহিনি শুরু হয়েছিল প্রাত্যহিক ঘটনার সাধারণ বর্ণনায়, এর অগ্রগতির পথে দেখা গেল একটি অস্পষ্ট রোমান্টিক দ্বন্দ্ব ও বিস্ময়, কাহিনির পরিণতিতে এলো একটি স্বাপ্নিক পরিবেশের মুগ্ধতা নিয়ে। সোবাহান সাহেব, মৌলানা জালাল ও মাসুদের ভ্রমণ পথে এলো রউফনের চরিত্র; সঙ্গে এলো রউফনের দাদা শাহ সাহেব; তারও সঙ্গে এলো 'আলেফ লায়লা ও লায়লানে'র অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। আমরা পাণ্ডুলিপিখানা উল্টিয়ে গেলাম আরব্য রজনীর সেই স্বপ্নভরা দিনগুলোতে; পরিচয় হলো খলিফা হারুন-অর-রশিদ, বেগম জোবায়দা, হাবসী ক্রীতদাস তাতারি, আর্মানিবাঁদী মেহেরজান, কবি আবু নওয়াস, আবুল আতাহিয়া এবং রাজ জল্লাদ মশরুর ইত্যাদির সঙ্গে। পলাশপুরে যে কাহিনি শুরু হয়েছে খলিফার প্রাসাদে তা পৌঁছলো, কারণ লেখক যে জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ পলাশপুরের পরিবেশে তার অবারিত মুক্তি সম্ভব নয়। তাই লেখক আশ্রয় নিয়েছেন ঐতিহ্যের নিরাপদ দুর্গে।[৩১৭] বাগদাদের বাদশা হারুন-অর-রশিদ অত্যাচারী। সে ক্রীতদাস তাতারি ও বাঁদি মেহেরজানের প্রণয়ে বাধা সৃষ্টি করে। তাতারি আমৃত্যু বাদশা হারুনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়। এখানে তাতারি বাঙালি জনতার এবং বাদশা হারুন আইয়ুব খানের প্রতীক। তাতারির হাসি উপন্যাসে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ক্রীতদাসের হাসি অবলম্বনে পরবর্তী সময়ে নাটক হয়েছে। নাটক অংশে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪)

আইয়ুবি দশকের ধর্মভীতি ও সমরাস্ত্র-শাসিত সমাজজীবনের অন্তর্ময় রূপ বিধৃত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) উপন্যাসে। ঐ উপন্যাসের নায়ক যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর ব্যক্তি-পরিচয়, অভিজ্ঞতালোক আত্মজিজ্ঞাসা ও সত্যসন্ধানের মধ্য দিয়ে একটা কালের সমষ্টি-অস্তিত্বের সমগ্র রূপ উন্মোচিত হয়েছে।[৩১৮] *চাঁদের অমাবস্যা*-র আরেফ আলীর আর্থ-সামাজিক, পরিস্থিতি, মানসগড়ন, পেশাগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি থেকে বাংলাদেশের গ্রামজীবনের রূপ অনুধাবন করা সম্ভব :

> ক. আরেফ আলীর বয়স বাইশ-তেইশ। কিন্তু তার শীর্ণ মুখে, অনুজ্জ্বল, চোয়ালে বয়োতীত ভাবঃ যৌবনভার যেন বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি। সে-মুখে হয়তো যৌবনকণ্টক জন্মেছিলো, কখনো যৌবনসুলভ পুষ্পোদগম হয় নাই। কয়েক বছর আগে মাদ্রাসা-হাদিসের প্রভাবে দাড়ি রেখেছিলো, আজ সে-দাড়ি নাই। কিন্তু এখনো মনে হয় থুতনির নিচে কেমন উলঙ্গতার ভাব। খাড়া নাক চিকন, কপাল ঈষৎ সমুন্নত, চোখে একটু কাঠিন্যভাব।[৩১৯]
>
> খ. দক্ষিণে তিন মাইল দূরে তার নিজের গ্রাম। দরিদ্র সংসার, হাতের তালুর মত এক টুকরো জমিতে জীবনধারণ চলে না। টেনে-হিঁচড়ে আই.এ. পাশ করে সে দেশে ফিরে আসে। পড়তে পারলে আরো পাশ করতো, কিন্তু কলেজের ফি, বইখাতা কেনার পয়সা আর যোগাড় হয় না। তাছাড়া জেলা শহরে ঘুপ্সি-আস্তানায় থাকলেও খরচ হয়। এক রত্তি শাক-সব্জির জমিটাও বিক্রি করে উচ্চশিক্ষার পশ্চাতে ছোটার অর্থ হয় না।[৩২০]

জীবনের কশাঘাতে জর্জরিত ছিলেন আরেফ রহমান। এটা শুধু আরেফ রহমানের জীবনের বর্ণনা নয়, বেশিরভাগ বাঙালির একই অবস্থা ছিল। শ্রেণি-বিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজের বিচিত্র শর্তবন্দি ও শৃঙ্খলিত জীবনপ্যাটার্নের অনুগামী হওয়াই আরেফ আলীর জন্য স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত উপভোগ ও স্বার্থচিন্তা *লালুসালু*-র মজিদের মতো আরেফ আলীকেও পরিণত করতে পারতো বিমিশ্র অস্তিত্ববলয়ে বন্দি।[৩২১] জীর্ণ অর্থনৈতিক কারণেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে স্কুলের সামান্য আয়ের চাকরি এবং বড়ো বাড়ির আশ্রয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে হয় তাকে। এক অভূতপূর্ব ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ও তার প্রতিক্রিয়া আরেফ আলীর চেতনালোক ও জীবনমূলকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। সে আলোড়নে কেবল ব্যক্তিচিত্ত নয়, সমষ্টি, এমনকি প্রশাসনযন্ত্রও প্রবলভাবে নাড়া খায়। সমাজবিকাশের ধারায় আরেফ আলী অতীত-বর্তমান ও সম-সময়ের জীবনরূপ গোটা সমাজব্যবস্থার অন্তর-বাহিরের সমগ্রতায় অভিব্যক্ত হয়েছে *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসে।[৩২২]

এ উপন্যাসের কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি যুবতি নারীর মৃত্যু। জ্যোৎস্না রাতে এক নগ্ন নারীর লাশ আবিষ্কার করে গ্রামের তরুণ স্কুল মাস্টার। খুনী সেই দরিদ্র স্কুল মাস্টারের আশ্রয় দাতা পরিবারেরই একজন। কাজেই বিষয়টা চেপে যায় তিনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। একদিকে সত্য প্রকাশ করতে না পারার বেদনা অন্যদিকে তার আশ্রয় এবং শিক্ষকতা পেশাটা হারানোর ভয়। এই শিক্ষক শুধু যে একটা হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অবগত তা নয়, হত্যাকারীর আহ্বানে লাশ গুম করার ব্যাপারে একজন সহকারীও।[৩২৩]

একজন নিম্ন আয়ের শিক্ষিত, অবিবাহিত, স্বপ্নচারী ও দোদুল্যমান গ্রামীণ যুবকের কাছে নিম্নোক্ত অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব :

> শীতের উজ্জ্বল জ্যোস্নারাত, তখনো কুয়াশা নামে নাই। বাঁশ ঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। চোখটা খোলা মনে হয়, কিন্তু সত্যিই হাত-পা নড়ে।[৩২৪]

এই 'অকল্পনীয় ঘটনা এবং অভাবনীয় অভিজ্ঞতার' সংঘাত আরেফ আলীর অস্তিত্বমূলকে প্রবলভাবে প্রকম্পিত করে। তার স্বপ্নচারী, রোম্যান্টিক এবং অন্তর্ময় মনোজগৎ-এর ফলে রক্তাক্ত হয়। এবং যখন তার-ই আশ্রয়দাতা বড়োবাড়ির ঋষিকল্প কাদেরকে হত্যাকারী হিসেবে শনাক্ত করে, তখন, ঘটনার আকস্মিকতা ও বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় এক আতঙ্কগ্রস্ত সত্তায় পরিণত হয় আরেফ আলী।

> তারপর হঠাৎ যুবক শিক্ষকের মাথায় বিপুলবেগে একটা অন্ধ ঝড় ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে বুঝতে পারে না কী করবে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে শুরু করে। তার সমস্ত চিন্তাধারা যেন হঠাৎ বিচিত্র গোলকধাঁধায় ঢুকেছে এবং সে গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে দৌড়াতে শুরু করে। কিন্তু কোথাও মুক্তিপথের নির্দেশ দেখতে পায় না। সে দৌড়াতেই থাকে।[৩২৫]

আরেফ আলীর ঈষৎ স্বপ্নময় ও অন্তর্মুখী চৈতন্যের এই নব-অভিজ্ঞতা ষাটের দশকে সামরিক শাসন-পীড়িত বাংলাদেশেরই প্রতিরূপ। ভাষা আন্দোলনের রক্তোজ্জ্বল চেতনা এবং ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত জাতিসত্তার কাছে সেনাতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের আগ্রাসি রূপ ব্যক্তিক ও সামূহিক অস্তিত্বের প্রশ্নে অভাবনীয়, বিভ্রান্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক সত্যে পরিণত হয়েছিল।[৩২৬]

বিভাগোত্তর দ্বিতীয় দশকের গ্রামজীবন, তার বহির্কাঠামো, অন্তর্সংঘাত এবং পরিবর্তনশীলতা লক্ষণসমূহ এ-উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। আরেফ আলীর ব্যক্তি-পরিচয় ও মানসগঠনের মধ্যে নবোদ্ভূত গ্রামীণ মধ্যবিত্তের বিকাশ সম্ভাবনা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি দাদাসাহেব আলফাজ চৌধুরীর পরিবার ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান।

অন্যদিকে, পরাধীন, শোষণমূলক ও শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের বৈষম্যময় জীবনবিন্যাসের রূপও এ-উপন্যাসে অভিব্যক্ত। 'প্রাক্তন জমিদার বা ভূমি মালিক অভিজাত, উঠতি মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন শ্রমজীবী পরিবারের বাসস্থান এই গ্রামে শ্রেণি-বৈষম্য প্রকট–বিভিন্ন শ্রেণি মানসিকভাবেও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এই সমাজ চিরাচরিত ধর্মীয় আচার পালনে নিষ্ঠার পরিচয় রাখলেও সত্যনিষ্ঠ নয়। সত্যাশ্রয়ী হতে গেলে সে সামাজিক ও সরকারি আইন-রীতি এবং তার বাস্তবায়নকারী শক্তি সম্পদ-প্রতিপত্তির পক্ষেই অবস্থান নেয়, দুর্বলদের পক্ষে নয়।' নবোদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চেতনায় সত্য-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও ধর্মভীতি, রাষ্ট্রভীতি, অস্তিত্বভীতি প্রভৃতির টানাপোড়েন সৃষ্টি করে সংকটাবর্তের। সে সংকটমুক্তির সাধনাই ষাটের দশকের বাঙালির জীবনসাধনা। কেননা, এ-উপন্যাসের আরেফ আলী বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই প্রতিনিধি। অভ্যস্ত জীবনে, ঘুণ-পোকার মতো বেঁচে থেকে সে নিঃশোষিত হয়নি। পরিণাম ভয়শূন্য ও অন্ধকারময় প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে আরেফ আলী শেষ পর্যন্ত সত্য উচ্চারণ করেছে, বরণ করেছে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব। কেননা, অমাবস্যা সত্য নয়, অমাবস্যা ক্ষণস্থায়ী, আলোই একমাত্র সত্য ও স্থায়ী। তার কারাবরণও তাই

প্রতিরূপকী মূল্য পায়, ক্ষমতাবানদের স্বেচ্ছাচার দাদা সাহেব-কাদেরদের ভোগবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে বৃহত্তর মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রামী ও সংঘবদ্ধ হতে ডাক দেয়। শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও অবদমনের বিরুদ্ধে বন্দি বিবেকের আর্তনাদ ও বিদ্রোহ এ-উপন্যাসকে করেছে জীবনবোধের নতুন মাত্রায় উন্নীত। 'সামরিক শাসনপীড়িত দুর্ভাগা বাংলাদেশের' অনুভব এ-উপন্যাসের বক্তব্যকে সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্যে উন্নীত করেছে।[৩২৭]

হাজার বছর ধরে (১৯৬৪)

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনকে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে জহির রায়হানের (১৯৩৩-১৯৭২) *হাজার বছর ধরে* (১৯৬৪) উপন্যাসে। সময় ও সমাজের চলিষ্ণুতার পটভূমিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে গভীরতর অর্থে কোনো গুণগত পরিবর্তন ছিল অনুপস্থিত। রাষ্ট্র-কাঠামোর আপাত-উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও জাতিশোষণ, শ্রেণিশোষণ ও ধর্মশোষণ রূপবদল করেছে মাত্র–সমাজদেহ থেকে অপসারিত হয়নি। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনহীনতা বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনকে সেই প্রথাজীর্ণ, নিস্তরঙ্গ অবকাঠামোর মধ্যে করে রেখেছে অবরুদ্ধ। জহির রায়হান অন্তরঙ্গভাবে জীবনের এই স্বরূপসত্য উন্মোচন করেছেন *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিচিত্র অন্তঃঅসংগতির মধ্যেও তিনি সন্ধান করেছেন জীবনের চিরায়ত আবেগী স্পন্দন।[৩২৮]

জহির রায়হান বাংলাদেশের গ্রামজীবনকে অভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলেও একটু নিরাসক্ত দূরত্ব উপন্যাসবিন্যস্ত জীবনকে করেছে বহুমাত্রিকতায় বিশিষ্ট। সুরত আলী এবং তার ছেলের ভিন্ন পরিস্থিতিতে পুথি পড়ার মধ্যে প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরের অন্তর্বর্তী সংগতি বিদ্যমান। এবং সেই অনুচ্চসুরে কমলাসুন্দরী, ভেলুয়াসুন্দরী কিংবা গাজী-কালুর পুথি পাঠের মতোই বিলম্বিত তালে বহমান বাংলাদেশের গ্রামজীবন। কোনো পূর্ণায়ত চরিত্র সৃষ্টির পরিবর্তে ঔপন্যাসিক সন্ধান করেন জীবনের এক অখণ্ড রূপ। যেখানে বুড়ো মকবুল, সুরত আলী, ছমির শেখ, গনু মোল্লা, রশীদ, আবদুল, মন্টু, টুনি, আম্বিয়া, হালিমা, হীরণ, সালেহা, আমানা, ফাতেমা–প্রভৃতি চরিত্র সেই অখণ্ড পূর্ণবৃত্ত জীবনের একেকটা রূপ বা খণ্ডবৃত্ত। এদের জীবন অতিসাধারণ, বড়ো মাপের ঘটনাহীন। 'তাদের জীবনের দিগন্ত প্রসারিত নয়, তাদের জীবনে চিরসঙ্গী দারিদ্র্য, ঈর্ষা, কলহ আর অবুঝ ভালোবাসা। জহির রায়হান এই জীবনের চিরন্তনতার বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন এই উপন্যাসে। সামন্ত সমাজের অন্তঃঅসংগতি, শ্রমনির্ভর শোষণ মূলক সমাজে নারীর বিপন্ন অস্তিত্ব, মানবতার চরম পরাভব এবং রোম্যান্টিক সম্ভাবনার আবেগসিক্ত চিত্ররূপ নির্মাণে অনেকাংশে সমর্থ হয়েছেন জহির রায়হান। বুড়ো মকবুল যখন 'জোড়া বউকে ঢেকির উপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে,' তখন পাশের বাড়ি থেকে আম্বিয়ার যে গান ভেসে আসে, তার মধ্যে সমাজ-অন্তরালে বন্দি নারীর অচরিতার্থ-ব্যর্থ-যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের করুণ আর্তনাদই যেন শব্দময় রূপ লাভ করে : 'স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুধের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেলো বইলারে।'[৩২৯]

শোষণমূলক, শ্রেণিবিভক্ত ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে পরিণত করা হয় ভারবাহী পশুতে। এখানে বুড়ো মকবুল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিরূপ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে শোষণ করে যাচ্ছিল। বাঙালি যে স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিল তা পূরণ হয় নি। তাদের অধরা স্বপ্ন আন্দোলন-সংগ্রাম ছাড়া কোনো দিনই ধরা দেবে না তা উপর্যুক্ত বাক্যের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন।

সংশপ্তক (১৯৬৫)

শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* উপন্যাসে বাঙালির মানবীয় আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটেছে। জাতিসত্তার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মুক্তিচেতনা ঔপন্যাসিকের জীবনাদর্শের মৌল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৩৮-১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় বাঙালির জীবনসত্য এ-উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে উপমহাদেশে যে মুক্তিসংগ্রাম চলছিল, তার দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার জটিল প্রশ্নের উদ্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধাবসান ও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগের পর মুক্তিসংগ্রামের

পালাবদল এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সূচনা–এই কয়েকটি পর্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের দু'টি গ্রাম বাকুলিয়া ও তালতলির চরিত-কথা *সংশপ্তক* উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে।[৩৩০] উপন্যাস-কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু বাকুলিয়ার সৈয়দ পরিবার। প্রাচীন মুসলিম পরিবারের ধর্মীয় ও প্রথাবদ্ধ সংস্কারচেতনা সত্ত্বেও তাদের আভিজাত্য ইংরেজি শিক্ষায় বিঘ্ন ঘটায় না। সৈয়দ সাহেব ইংরেজি শিক্ষিত হলেও বিশ্বাস ও জীবনাচরণে পুরোপুরি মুসলমান। আভিজাত্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকায় সৈয়দ পরিবার থেকে সামন্ত মতাদর্শের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হয় না। সৈয়দ সাহেবের সন্তান কলেজছাত্র জাহেদ পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই কলকাতায় অধ্যায়নকালে দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক হয়ে পড়ে এবং সামন্ত আদর্শনির্ভর সংগঠন মুসলিম লীগে যোগদান করে। কিন্তু বাস্তব-অভিজ্ঞতা ও চরিত্রনিহিত কল্যাণ-চিন্তায় জাহেদ প্রথমে দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং পরে শ্রমিককর্মী হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। বিভাগোত্তরকালে ঢাকায় শ্রমিক রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার দায়ে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে তিনি নিজগ্রাম বাকুলিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে নতুনভাবে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন গ্রামীণ জনসাধারণকে শ্রেণিসংগ্রামের আদর্শে উজ্জীবিত করতে সমর্থ হন। কিন্তু পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের শ্যেনদৃষ্টি সেখানেও নিক্ষিপ্ত হয় এবং পরিণামে বাঙালি মুসলমানের 'স্বপ্নের ভূখণ্ড' পাকিস্তানের পুলিশ জাহেদকে গ্রেফতার করে।[৩৩১]

জাহেদ চরিত্রের মাধ্যমে শহীদুল্লা কায়সার শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের আত্মরূপান্তরের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। যে মুসলমান সম্প্রদায় পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আন্দোলন করেছিল, সেই মুসলিম শ্রেণির ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে। তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয় এবং প্রস্তুতি শুরু করে নিজেদের সার্বিক মুক্তির জন্য।

সংশপ্তক উপন্যাসে শিক্ষিত, সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের প্রতিভূ সেকান্দর মাস্টার তার সমাজজ্ঞান, সময়জ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান এবং রাজনীতিসচেতনতা নিয়ে মহাকালের মতো এই উপন্যাসে উপস্থাপিত।[৩৩২] উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার অনুসারী জাহেদের সঙ্গে কথোপকথনের সেকান্দর মাস্টারের আত্মস্বরূপ সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত :

> সহসা দু হাত বাড়িয়ে সেকান্দরের পথটা আগলে দাঁড়ায় জাহেদ, হাতের মুঠোতে পেচে ধরে ওর জামার গলাটা, তারপর তীরের মত ছুঁড়ে মারে প্রশ্নটা, বল, তুমি মুসলমান কিনা?
>
> না।
>
> তবে তুমি কি?
>
> মানুষ।
>
> অপমানবোধে মুখটা লাল হয়ে আসে জাহেদের। তুমি কি বলতে চাও আমি মানুষ নই?
>
> না। তুমি মুসলমান।
>
> আলবৎ। আমি প্রথমে মুসলমান তারপর মানুষ। ...
>
> ভুল করছ জাহেদ, ভুল করছ। প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্যই তো ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়।[৩৩৩]

ধর্ম ও মানবতার মধ্যে দ্বান্দ্বিকতা এই উপন্যাসে খুবই স্পষ্ট। উপন্যাসের মৌলপ্রবাহ সেকান্দর মাস্টারের অনুসৃত আদর্শের ধারায়ই গতিশীল হয়ে উঠেছে। 'সেকান্দার মাস্টার হচ্ছে সেই কর্মীদের একজন যারা মুক্তিসংগ্রামকে তার মহাবৈপ্লবিক বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতেও পল্লী গ্রামের সাধারণ মানবমানবীর নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ সংগ্রাম বলে প্রমাণিত করেছে।' সেকান্দর মাস্টারের মধ্যে যে বিপ্লবী গণচেতনার অঙ্কুর ক্রমান্বয়ে বৃক্ষপ্রতিম হয়ে ওঠে–জাহেদ, রাবু, মালু প্রমুখের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তা পরিণামে একট সংঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণিচরিত্রে রূপ নেয়। এই চরিত্রপুঞ্জই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসেনানী।[৩৩৪]

শহীদুল্লা কায়সার তাঁর উপন্যাসে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে চলচ্ছবি নির্মাণ করেছেন, সেখানে মনুষ্যত্বের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাই প্রধান হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে পুলিশ-কর্তৃক জাহেদের ধৃত হওয়া এবং সেকান্দর মাস্টারের

আশাবাদ এক সদর্থক চেতনায় উদ্দীপ্ত। যে-চেতনায় শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* উপন্যাস হয়ে উঠেছে 'ইতিহাসবোধ ও সংগ্রামী জীবনচেতনার ক্রমধারার শিল্পরূপ।'

অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৭)

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৭) উপন্যাসের কাহিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। উল্লিখিত সময়কালের অসংখ্য ঘটনা–বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, দেশবিভাগ-উত্তর বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কবি রহমতের স্মৃতিকথনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-আক্রান্ত বাঙালি জীবনের সামগ্রিক ভাঙা-গড়ার কাহিনি ও দেশবিভাগোত্তর ঢাকার পটভূমিকায় উন্মোচন ঘটেছে।[৩৩৫] স্বপ্নের ভূখণ্ড পাকিস্তান সৃষ্টির পরে পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক হায়াত খাঁ টঙ্গী সোনার গাঁ জুট মিলে শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ কালে পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। অনেক সূর্যের প্রত্যাশায় লালিত ভূখণ্ডের এই ট্রাজিক স্বরূপ নির্দেশের মধ্যদিয়েই উপন্যাসের সূচনা। ঔপন্যাসিকের আত্ম-অভিজ্ঞতা কবি রহমতের স্মৃতিকথনের মধ্য দিয়ে *অনেক সূর্যের আশা*-য় শব্দরূপ পেয়েছে। ঔপন্যাসিক বিস্তৃত ক্যানভাসে অঙ্কন করেছেন 'যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মানুষের নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সংকট, মানুষের জীবনযুদ্ধের বহুভুজ চিত্র।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় উপমহাদেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দ্বিজাতিতত্ত্বের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। বাঙালি মুসলমানদের ভাবাবেগ পাকিস্তান আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যা অনুমেয় ছিল তা বাস্তবরূপ লাভ করে। হায়াত খাঁর মতো শ্রেণিসচেতন রাজনৈতিক কর্মীও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল অনেক সূর্যের প্রত্যাশায়। কিন্তু স্বশ্রেণির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় নব্য-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে তার মর্মন্তুদ মৃত্যু ঘটে। উপন্যাসের সূচনায় ঔপন্যাসিক এই স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডিকে সুকৌশলে উপস্থাপন করেছেন। ট্রাজিক বেদনার এই শূন্যতার অনুষঙ্গে অতীতের অসংখ্য চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। কবি রহমত, হায়াত খাঁ, ছবির মিয়া, সাজাহান চৌধুরী, কবি নিজাম, কমলকুমার রায়, হেনার মা, লুসি সাইপ্রিন, মিস রডারিক, কাজী গিয়াসুদ্দিন, আবদুল হামিদ, ফজলুল করিম, পাণ্ডে জী, মি. গাঙ্গুলী, সুলতান মিয়া, জামরুল, ভীমরুল প্রমুখ চরিত্রের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা ও জীবনযন্ত্রণা যুদ্ধ-আক্রান্ত সময় ও সমাজের পট উন্মোচিত হয়েছে। ঘটনা ও ক্রিয়ার কার্যকারণ-শৃঙ্খলা সর্বত্র রক্ষিত না-হলেও একটা বিপর্যস্ত কালের অন্তর-বাহিরের সমগ্রতা বিধৃত হয়েছে এ-উপন্যাসে।[৩৩৬] যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এ-উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। কংগ্রেস-মুসলিম লীগের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মতৎপরতা, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রসঙ্গে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল করেছে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখবো :

> সুবেহ সাদিকের আলোয় আলোয় পূর্ব আকাশ আলোর বন্যায় নেয়ে উঠছে, ঝলমল করে রেঙে উঠছে দিগন্ত!...ঐ ওখানে আলোর পারে সে দেশ–স্বপ্নের দেশ...। যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, নেই অভুক্ত জনমানব। গরীব-কাঙ্গাল, রাজা-জমিদার সব সেখানে সমান, সব একই মানুষ।[৩৩৭]

কিন্তু সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে স্বাধিকার আদায়ের জন্য বাঙালিকে আবার মাঠে নামতে হয়েছে। যারা একদিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছিল। সেই পাকিস্তানে তাদের স্বপ্নতো পূরণ হয়েনি বরঞ্চ তাদের ওপর চালানো হয়েছে গুলি। ফলে বাঙালি বাধ্য হয়েছে নিজের জন্য ভিন্ন একটা বাসস্থানের কথা ভাবতে।

নোঙর (১৯৬৭)

আবু রুশদের *নোঙর* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে।[৩৩৮] দেশ বিভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লগ্নকে কেন্দ্র করে আবু রুশদ 'নোঙর' উপন্যাসটি রচনা করেন। *নোঙর* উপন্যাসে দেশবিভাগ হওয়ার সময় যারা মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত

হয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে পাকিস্তান চলে আসে, তাদের আদর্শের দৃঢ়তা, নতুন দেশ গঠনের অনুপ্রেরণা, ভবিষ্যতের কল্যাণ স্বপ্ন, ব্যক্তিগত বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব উজ্জ্বল এবং অন্তরঙ্গভাবে চিত্রিত হয়েছে।[৩৩৯] *নোঙর* উপন্যাসে ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও প্রেক্ষাপট বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে একজন অবাঙালি বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করলে তার বিরুদ্ধে একজন বাঙালি তরুণের তীব্র প্রতিবাদের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে।[৩৪০] এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই পাকিস্তান প্রাপ্তির আনন্দোল্লাস ও পাকিস্তানকেন্দ্রিক স্বপ্ন-কল্পনার সঙ্গে পাকিস্তানোত্তর দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বিরোধের সূত্রে নায়কমনে হতাশা দেখা দিয়েছে।[৩৪১] অর্থাৎ যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজ দেশ ত্যাগ করে পাকিস্তানকে তাদের দেশ হিসেবে বেছে নিয়েছিল তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয় শাসকদের ব্যর্থতার জন্য।

সমাগম (১৯৬৭)

শওকত ওসমানের *সমাগম* উপন্যাসটি ১৯৬৭ সালে রচিত হয়।[৩৪২] *সমাগম* উপন্যাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কালের নানা মনীষীদের একই স্থানে উপস্থিত করে স্ব স্ব জীবন দর্শনের ভিত্তিতে তাঁদের জীবনবোধের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।[৩৪৩] প্রকাশের অনেক পরে 'সমাগম' রচনার পটভূমি বর্ণনা করে শওকত ওসমান লিখেছেন–

> এই উপন্যাস ঠিক উপন্যাস নয়। ছয়ের দশক। ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সামরিক শাসন চালু আছে। দুর্দান্ত প্রতাপে। শ্বাসরুদ্ধ, বাকরুদ্ধ আবহাওয়া। সেই পরিবেশ থেকে রেহাই পেতে এক কল্পরাজ্যে পৌঁছেছিলাম। বাঙলাদেশের সাংবাদিক জুহা ও তার স্ত্রী জাউদুন কবি আলাওলের পত্র পান, আতিথেয়তা গ্রহণ সেখানে মূল উদ্দেশ্য। তিনশ' বছর পূর্বে স্বর্গবাসী মর্ত্যধামে আগমন প্রয়াসী। তখন সাংবাদিক ও তৎপত্নী স্থির করল যে তারা আরো কিছু মেহ্মানকে দাওয়াত দেবে। তদনুসারে দেশী অতিথি হাজী মহসীন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ। বিদেশী মেহ্মান থাকবে টলস্টয় রাশিয়া থেকে, ফ্রান্সের রম্যাঁ রলাঁ, আয়ারল্যাণ্ডের জর্জ বার্ণাড শ'। আর থাকবে সাংবাদিকের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। ... এই দেশী বিদেশী অতিথিদের নিয়ে পার্টি। অবসর বিনোদন মুখ্য উদ্দেশ্য। সকলে বাক্‌পিয়াসী। ফলে পার্টি বেশ জমে উঠেছিল নানা পরিক্রমায়। সামরিক আইন চালু থাকার ফলে যে কথা প্রবন্ধ আকারে কোথাও লেখা বা ছাপা অসম্ভব ছিল, তাই এই হট্টগোলের ফল্গু স্রোতধারা।[৩৪৪]

এই মনীষীগণ তাদের দৃষ্টি তৎকালীন বিশ্বসংকটের দিকে নির্দেশ করেছেন। রফিকউল্লাহ খান এই রচনার সারাংশ করে বলেছেন, 'উপন্যাসটির আদ্যন্ত অভিব্যক্ত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরূদ্ধে মানবিক ঘৃণা ও ক্ষোভ। উচ্চারিত হয়েছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার জয় গান।'[৩৪৫]

নিজ নিজ সময় ও সমাজলালিত জীবনাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য সত্ত্বেও উপন্যাসে সমাগত মনীষীদের মধ্যে এক নিগূঢ় ঐক্যসূত্র বিদ্যমান এবং তা হলো এঁরা সবাই মানবদরদি-শোষণ, অবিচার ও যুদ্ধবিরোধী-মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ; দেশপ্রেমিক হয়েও বিশ্ব-মানবের কল্যাণের আদর্শে আস্থাবান। এঁদের মূল বক্তব্য থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হলো; জাতীয়তাবাদের জন্ম ব্যক্তিতান্ত্রিকতা থেকে-তার বিকৃতি সাম্রাজ্যবাদ এবং পরিণতি যুদ্ধ। চেতনার এই মৌল ঐক্যে মনীষীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় : 'মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক, ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদীগণ ও তাদের অনচরেরা ধ্বংস হোক।', 'মানুষের নির্বোধতর সংগঠন হিসাবে ধ্বংস হোক যুদ্ধ।', 'সুখীতর, আরও সমৃদ্ধিতর হোক আগামী দিনের পৃথিবী।'[৩৪৬]

এই উপন্যাসের বিশেষত্ব হচ্ছে, সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতায় থাকাকালীন যেখানে পাকিস্তানে কোনো ধরনের মতো প্রকাশের সুযোগ ছিল না, সেই সময় ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান *সমাগম* উপন্যাসে শোষণ, অবিচারের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে কথা বলেছেন। অবরুদ্ধ পরিবেশেও জনগণকে লড়াইয়ের প্রেরণা জোগায়। এই উপন্যাসে বাঙালি ঐ সময়ের আন্দোলনের রূপরেখা কী হওয়া উচিত তার ধারণা পায় এবং সে অনুযায় বাঙালি তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালিত করে।

গঙ্গাপারের খেয়া (১৯৬৮)

গঙ্গাপারের খেয়া (১৯৬৮) উপন্যাসটি ইন্দু সাহা দেশের তৎকালীন পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচনা করেন। কালটি হচ্ছে আইয়ুবি একনায়ক শাসনের কাল। এই সময়ে পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার প্রচলন হয়। আইয়ুবের মৌলিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শাসন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্তরা গ্রামাঞ্চলে যে শাসন-শোষণ চালায় তার বিরুদ্ধে গ্রামজীবনে চাপা বিক্ষোভের সূচনা হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হলে গ্রামাঞ্চলের যুব সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং শোষকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এখানে কলিমের বক্তব্যে এই বিক্ষোভের পরিচয় পাই :

> গেরামে একটা ইস্কুল ঘর নাই, পানির কল নাই, অসুখ বিসুখ অইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, বরষা নামলে আমরা রাস্তার অভাবে হাটে বাজারে যাইতে পারিনা। মুন্সীর কাছে আমরা মেলা হাতে পায়ে ধরছি। মুন্সী আমাগো কুত্তার মতোন দূর দূর কইরা বার কইরা দিছে। আর তার বাড়িত্ দালান উঠছে, গরীব চাষীগো টাকা পয়সা ধার দিয়া পরে তাগো শও শও বিঘা জমিন নিজের নামে লেইখা নিছে। জোর জবরদস্তি কইরা লোকের ঘরবাড়ি দখল করছে। গভরমেন্টের ঘর থিকা যা গেরামের উন্নতির জন্য মুন্সীর হাতে আইছে, মুন্সি তা নিজেই মাইরা দিছে।[৩৪৭]

অন্যদিকে কলিমের অভিজ্ঞতায় গ্রাম ও শহরের যে রূপটি ধরা পড়েছে তা হচ্ছে–একদিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন আরেকদিকে বিলাস বিভবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ঐশ্বর্যবান মানুষের কুকুরেরও আভিজাত্য আছে আরেকদিকে নিঃস্ব নিঃসহায় কলিমদের সমাজের নারীর নারীত্ব পদে পদে অপমানিত হয়, ক্ষুধার জ্বালায় পঁচিশ 'ন' পয়সা কিংবা একটা চকচকে আধুলির বিনিময়ে তার সতীত্বকে বিক্রি করে, আর তার মাতৃত্বের গ্লানিকর পরিণাম ঘটে সদ্যজাত শিশুকে নর্দমায় ফেলে দেওয়া।[৩৪৮]

গ্রামজীবনের এই শোষণ ও শহরজীবনের মানুষে এই সীমাহীন বৈষম্য দুই-ই একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার ফল এবং তা থেকে যেমন আইয়ুবি শাসন-শোষণ বিচ্ছিন্ন নয় আবার আইয়ুবি শাসন-শোষণই তার একমাত্র রূপ নয়।[৩৪৯] তবে আইয়ুব শাসনের পতন ঘটলে এ অবস্থার অবসান ঘটবে এমনটি আশা বাঙালিদের। সেই আশা থেকেই তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। যাতে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নেওয়া যায়।

অগ্নিসাক্ষী (১৯৬৯)

১৯৬৮-৬৯-এর গণ আন্দোলন ও চূড়ান্ত পর্বের গণ-অভ্যুত্থান জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* (১৯৬৯) উপন্যাসের মূল বিষয়। আন্দোলন ও অভ্যুত্থানকে ঘিরে সমাজজীবনের যে ছবি উপন্যাসে ধরা পড়েছে তা সংক্ষেপে এই–

সমাজজীবনে দুর্নীতির সীমাহীন দাপট। শহরজীবনের কিছু চাকুরে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে, ঢাকা শহরে দালান নির্মাণ করে শহরের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটাচ্ছে তারা একদিক থেকে। কিন্তু তাদের উন্নতির প্রধান মাধ্যম হচ্ছে দুর্নীতি। নীতিবান সৎ সরকারি কর্মচারীর আর্থিক জীবনের সীমাবদ্ধতা তার পারিবারিক জীবনে নানা সংকটের জন্ম দিচ্ছে। মধ্যবিত্তের মান বাঁচিয়ে চলার পথ খোলা নেই। ফলে ভিতরে ভিতরে তাদের মধ্যে ক্ষোভ জমছে, এই ক্ষোভ থেকে তারা হয়ে উঠেছে গণ-আন্দোলনের সমর্থক।

বিদ্যমান আর্থিক পরিস্থিতির সুযোগ না পেয়েও মধ্যবিত্তের একটি অংশ আবার ভীষণভাবে আন্দোলনবিমুখ। এদের কারও কারও কাছে ঘৃণার বিষয়ও এ-সব আন্দোলন। এ অবস্থাটি শুধু যে বয়স্ক প্রবীণদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তা নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত সন্তানদের অংশ বিশেষের মধ্যেও তা লক্ষণীয়। তারাও আন্দোলনবিরোধী এবং স্থিতাবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিসন্ধানী। কিন্তু ধীরে ধীরে এই বিমুখ অংশের অনেককে দ্রুত সচেতন হয়ে উঠতে দেখা যায়। আন্দোলনে আগ্রহী হয়ে ওঠে অনেকে এবং সক্রিয় অংশও নিচ্ছে তাদের কেউ কেউ। আবার আন্দোলনে আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ বৈষয়িক বিবেচনায় পারিবারিক সদস্যদের আন্দোলনে মেতে ওঠার ব্যাপরটি মেনে নিতে পারছে না। কোনো কোনো পরিবার আবার এ ব্যাপারে একেবারেই ভ্রুক্ষেপহীন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিতা-মাতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় সন্তানদের উৎসাহ জোগাচ্ছে।

ছাত্র রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাদের মধ্যে দেশপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও আদর্শবান নেতা ও কর্মীর অভ্যুদয় ঘটছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশে দেশে বঞ্চিত মানুষের পক্ষে প্রগতিশীল শক্তি বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও মুক্তিসংগ্রাম থেকে তার শিক্ষা নিচ্ছে ও তা তাদেরকে সাহস ও প্রেরণা জোগাচ্ছে। এদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে পাকিস্তানের জন্মসূত্রের ফাঁক ও ফাঁকি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও দেশীয় পুঁজিপতিদের সম্পর্কের স্বরূপ ও বিভাগোত্তর পাকিস্তানি পুঁজিবাদীদের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েমের নানা ছলাকলা।[৩৫০]

শাসকশ্রেণি ও তাদের সহযোগীগোষ্ঠীর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ দেশবাসী। গ্রামজীবনে জোতদার মাতব্বর মৌলিক গণতন্ত্রীদের দৌরাত্ম্যে ও দাপটে জনজীবনে নেমে এসেছ নানাবিধ সংকট। আর এই প্রতিকূল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সচেতন করা ও তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজেই অংশ নিচ্ছে আর এর ফলে কৃষকরাও ধীরে ধীরে শহরের শ্রমিকদের মতো অংশ নিচ্ছে আন্দোলনে। ছাত্র-আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী চরিত্র অর্জন করছে।

এই ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনের শহিদ বুলনের পরিবারকে ঘিরেই মূলত উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯-এর আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে ক্ষেত্রবিশেষে শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ছে। গণ-অভ্যুত্থানের শহিদ বুলনদের পরিবার এরূপ একটি পরিবারের অন্তর্গত। বুলনের ছোটো বোন ফারিয়াও বুলনের পরে জড়িয়ে পড়ে এ গণসংগ্রামে। ছেলে যে আন্দোলনে মেতে উঠেছে এজন্য দোষ দিতে পারে না বুলনের বাবা। কারণ স্বৈরাচারী শাসকদলের বিরুদ্ধে তারও অভিযোগের অন্ত নেই। তিনিও প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ। ছেলে মেয়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে মায়েরও রয়েছে বিরক্তির পরিবর্তে নীরব সমর্থন, কখনও তা প্রকাশ্য রূপ নিতেও দেখা যায়।[৩৫১]

১৯৬৮-৬৯-এর গণ-আন্দোলন ও অভ্যুত্থান উপন্যাটির বিষয় হলেও উপন্যাসের বর্ণনায় ছাত্রদের আন্দোলনই প্রাধান্য পেয়েছে। ছাত্ররা দেশের মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করতে চেষ্টা করেছে। ১৯৬৮-৬৯-এর আন্দোলনে, অভ্যুত্থানে এদের অংশগ্রহণ ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মিলে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতেও তারা সোচ্চার ছিল। এ সময়েই তাদের মধ্যে আবার উপদলীয় কোন্দল ও বিভক্তিও দেখা দিতে শুরু করে। কোনো কোনো উপদল স্বাধীন পূর্ববাংলার দাবিও তুলতে থাকে।[৩৫২]

আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯)

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকে বিষয় করে লেখা জহির রায়হানের উপন্যাস *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯)। এ উপন্যাসে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিসত্তার মর্মচেতনাকে এক বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে ধারণ করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনে জহির রায়হানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এ উপন্যাস রচনা প্রেরণ হিসেবে কাজ করেছে। এ উপন্যাসের কাহিনির ব্যাপ্তিকাল মাত্র তিনদিন দুই রাত। কিন্তু এই সীমিত পরিসরেই নানা ঘটনা-উপঘটনার মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে একুশে উদযাপনের উদ্যোগ, পরিস্থিতিগত উত্তেজনা, একুশের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন বানচালে সরকারি তৎপরতা ইত্যাদি সুবিন্যস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে ফ্লাশব্যাকে বর্ণিত হয়েছে বায়ান্নোর একুশের ঘটনা। উপন্যাসের শেষ হয়েছে একুশের চেতনাকে হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত করার প্রয়াসের মাধ্যমে।[৩৫৩]

রাজা উপাখ্যান (১৯৭০)

শওকত ওসমানের *রাজা উপাখ্যান* (১৩৭৭) মহাকবি ফেরদৌসীর *শাহনামা* কাব্যের অসমাপ্ত কল্পিত অংশ অবলম্বনে রচিত হয়েছে।[৩৫৪] এ উপাখ্যানে এক অভিশপ্ত রাজার কাহিনি আছে। কাহিনিটি রূপকথার মতো শোনালেও তার মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ রয়েছে। আইয়ুবের স্বৈরশাসনের কবর থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা খুব সুষ্ঠুভাবে বোঝা যায়।[৩৫৫] অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা জাহ্হক দৈববাণী কর্তৃক অভিশপ্ত হলে দু'টি বিষাক্ত কালো গোক্ষুর সাপ তাঁর গলদেশ বেষ্টন

করে থাকে। এবং সাপ দু'টির প্রতিদিনের খাদ্য হিসেবে নির্দেশিত হয় বিশ থেকে পঁচিশ জন যুবক-যুবতি অথবা জ্ঞানী বৃদ্ধের মগজ। রাজা জাহুক যদি খাদ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁর মগজই হবে সাপ দুটির ভক্ষ্য। রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য সিপাহি-সান্ত্রীরা নিরপরাধ যুবক-যুবতি এবং ইলমদার বৃদ্ধদের বন্দি করে আনে সাপের আহার্য হিসেবে। প্রাণ-উৎসর্গকারীদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায় তাদের অকাল ও মর্মান্তিক পরিণতির কার্যকারণ।[৩৫৬] ঘিলু সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন সে রাজ্যের বহু যুবক ও জ্ঞানী বৃদ্ধকে প্রাণ দান করতে হয়। দারিয়ূস ও জার্জিস এ সংগ্রহ করে প্রভূত বিত্তশালী হয়েছে। এমন এক সময় এসেছে যখন দেশে যুবক ও জ্ঞানী বৃদ্ধের মহার্ঘতা দেখা দিয়েছে, তখন দারিয়ূস ও জার্জিসকেও প্রাণ দিতে হয়েছে। এক সুদর্শন গ্রাম্য যুবক হরমুজকেও এ জন্য রাজবন্দীশালায় নিয়ে আসা হয়।[৩৫৭] অপরপক্ষে, মাতৃহীনা রাজকুমারী গুলশানের নিঃসঙ্গ জীবন ক্রমাগত অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। পিতার জীবনরক্ষার জন্য প্রাণদানকারীদের প্রতি মমতত্ববোধ থেকে সে বন্দিশালায় গমন করে এবং হরমুজ নামক এক সুদর্শন যুবকের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। হরমুজকে রাজকুমারী বন্দিদশা থেকে মুক্তি দান করলে হরমুজ তা প্রত্যাখ্যান করে। রাজদুহিতা গুলশানের নিকট থেকে হরমুজ শাপগ্রস্ত জাহুক রাজার কাহিনি শোনেন।[৩৫৮] এরপর সকলে নিরপরাধ দেশবাসীর মুক্তির জন্য হরমুজ রাজাকে অভিশাপ-মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে।[৩৫৯] হরমুজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজার শাপমুক্তির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।[৩৬০] তখন হরমুজ দুই গোক্ষুর সাপের মধ্যে খাদ্য বন্টনের বৈষম্য সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে বৈরিতার উদ্ভব ঘটায়। ফলে সুন্দ উপসুন্দের মতো দু বিষধর সর্প পরস্পরকে আক্রমণ করে দু সাপই মারা যায়। রাজা জাহুক অভিশাপ-মুক্ত নব জীবন লাভ করে।[৩৬১] হরমুজ তার তপস্যা সাফল্য অর্জন করে।[৩৬২] রাজা জাহুক শাপমুক্ত হয়ে জীবনসংক্রান্ত এক নতুন বোধে উপনীত হয় :

> আমি জাহুক বাদশা নই। আমি নতুন রাজ্য গড়ব, যেখানে মানুষের জন্য কোন মানুষকে জুলুম ভোগ করতে হবেনা। যে সকলের গোলাম হতে পারবে সে-ই হবে সকলের বাদশা।[৩৬৩]

এ-উপন্যাস প্রকাশকালে বাংলাদেশে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের অবসান হয়েছে; এবং বাঙালি জাতির গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রাম অর্জন করেছে ইতিবাচক চরিত্র। সম্ভবত এ-কারণেই *ক্রীতদাসের হাসি*-র ব্যক্তিস্বতন্ত্রচেতনা থেকে এ-উপন্যাসের বিষয়ভাবনার অগ্রগতি সমষ্টিজীবনের মধ্যে পথসন্ধান করেছে। একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক হরমুজ সামূহিক চৈতন্য আয়ত্ত করে রাজাকে শাপমুক্ত করে অসংখ্য অমূল্য প্রাণ রক্ষা করেছে। এবং তাঁর এই বোধ রাজকন্যা গুলশানকে বিয়ে করে রাজত্ব লাভের মতো ব্যক্তিগত সুযোগ প্রত্যাখ্যানের প্রেরণা-উৎস হিসেবেও কাজ করেছে। এ-দিক থেকে *রাজা উপাখ্যানে*-র জীবনসংক্রান্ত তত্ত্ব অধিকতর তাৎপর্যবহ ও সঙ্কেতময়।

রাজা উপাখ্যান উপন্যাসবিধৃত রাজা জাহুকের বন্দিশালা ষাটের দশকের স্বৈরশাসনকবলিত পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশের রূপক। এ-সময়ের আত্মবিবরকামী ও পালয়নপর সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তশ্রেণির সামনে হরমুজকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন শওকত ওসমান। এ-চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে শ্রেণি-বিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজে ব্যক্তিস্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করার নিয়মের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ। শোষণ-অবরুদ্ধ সমাজজীবনে ব্যক্তিস্বার্থ নয়, বিচ্ছিন্নতা নয়–সামূহিক জীবনচৈতন্যে উত্তরণই হলো প্রত্যাশিত। শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার-শৃঙ্খল জর্জরিত সমাজের প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রতীকী ইঙ্গিতে 'রাজা উপাখ্যান' অনন্য।[৩৬৪]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির দেশে শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেকে নিয়ন্ত্রণ করারও সমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করে। শাসকগোষ্ঠীর শোষণে শহরের নানাস্তরের মধ্যবিত্তদের জীবনে নেমে আসে সংকট। নির্মম অসহায়তার শিকার হয় শহরের নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন শ্রমজীবীর দল। শহরের বিকাশোন্মুখ মধ্যবিত্তের বিকাশও ব্যাহত হয়। জোতদার মাতব্বরদের নানারূপ অত্যাচার ও খাজনা বৃদ্ধিতে, মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুর্নীতি ও দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক জনজীবন। এই পরিস্থিতিতে শহর-গঞ্জ গ্রাম সর্বত্রই জনজীবনে জমতে থাকে ক্ষোভ। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত যে-কোনো আন্দোলন জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের

সহায়ক। শিল্প-সাহিত্য এই বিকাশকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারে। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের প্রাণাবেগ শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কীভাবে গতির সঞ্চার করেছে তার ভাবাবেগ বর্জিত মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচ্যকালের উপন্যাসও এই আন্দোলনের প্রতিফলন আছে।[৩৬৫] একুশের অনেক উপন্যাসে দেখা গেছে লেখক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বাংলা ভাষাবিরোধী ভূমিকার উর্ধ্বে রাখতে প্রয়াসী হয়। আবার নিজের চাকরির স্বার্থে ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টায় একুশের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়।[৩৬৬] তবু উপন্যাসগুলোতে একদিকে যেমন বাঙালির চেতনাকে জাগ্রত করেছে একই ভাষা শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের ফলে উপন্যাসিকগণ পরিমার্জিতরূপে তাদের লেখা লেখছে তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণকে বার বার আমাদের স্মরণ করে দেয়।[৩৬৭] একুশের সাহিত্যে এ দেশের কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিকের নবতর জীবনবোধ। পাকিস্তানি আমলের সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় জজবা থেকে বাঙালি জাতিসত্তায় উত্তরণের ক্ষেত্রে বাঙালির জীবনে যে অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার উন্মেষ ঘটেছিল তার প্রভাব পড়েছে একুশের সাহিত্যে মাধ্যমে। বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার প্রতি গভীর মমতার উন্মেষ ঘটিয়েছে তা ভাষা আন্দোলনের রক্ত আর অশ্রু-ঝরা সংগ্রামী ইতিহাস একাত্তরের সংগ্রামী ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।[৩৬৮] প্রতিটি পর্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাহিত্যও সমভাবে ভূমিকা পালন করে। কখনো আন্দোলনের বিষয়বস্তু নিয়ে উপন্যাস রচিত হয় আবার কখনো সাহিত্য আন্দোলনকে বেগবান করার প্রেরণা দেয়। পাকিস্তান আমলের পুরোটা সময় আমরা এ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনে ছাত্র, শহরের শ্রমজীবী ও গ্রামের কৃষকের সাথে সাহিত্যিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে ৬৯ সালে এই আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং স্বাধীনতার দিকে আরও একধাপ বাঙালি এগিয়ে যায়। বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্তের জীবনদর্শন ও অস্তিত্বজিজ্ঞাসার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস; যে মধ্যবিত্তশ্রেণি দেশবিভাগকালীন অশক্ত, অসংঘবদ্ধ অবস্থা থেকে ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ৫৪-ও নির্বাচনি সাফল্য, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও ৭১-এর স্বাধীনতা-যুদ্ধেও চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে–তার দ্বন্দ্বময়, রক্তাক্ত ও সংগ্রামী অগ্রযাত্রার ইতিহাস।[৩৬৯]

ছোটোগল্প

১৯৪৭-এর দেশভাগের পর থেকে ৭১-এর স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঝড় বয়ে যায়, তার প্রভাব এদেশের সমকালীন ছোটোগল্পেও পড়েছে।[৩৭০] বিশ্বজিৎ ঘোষ ষাটের দশকের গল্পসাহিত্য নিয়ে বলেছেন,

> ষাটের দশকে বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে সূচিত হয় একটি নতুন স্রোত। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কল্লোল আর সংক্ষোভের পট রচিত এ কালের গল্প প্রকৃত অর্থেই উদ্ভাসিত করেছে ষাটের উন্মাতাল বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের সংক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীকে।[৩৭১]

ষাটের দশকে ছোটোগল্পের দুটি বিশেষ দিক লক্ষণীয় হয়ে ওঠে–সমকালীন ঘটনার ব্যাপক প্রতিফলন এবং ব্যক্তিসত্তার বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র ও সমাজ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৫৮-র সামরিক শাসন, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের ছোটোগল্প।

ভাষা আন্দোলনের পরের বছরই এর গৌরবময় স্মৃতিকে ধারণ করে কবি হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একুশের সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারি*। এর অনুসরণে পরবর্তীকালে বহুসংখ্যক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। *সমকাল*, *কণ্ঠস্বর*, *পূর্বমেঘ*, *উত্তরণ*, *ছোটগল্প*, *পূর্বপত্র*, *সাম্প্রতিক*, *গণসাহিত্য*, *বিপ্রতীপ* প্রভৃতি একুশে ফেব্রুয়ারি-রই সার্থক উত্তরাধিকারী। এ চেতনায় ছোটোগল্পও সমৃদ্ধ হতে থাকে প্রচুর গল্পকারের লেখনী-প্রভাবে। ষাটের দশকের ব্যক্তিসত্তা ও চৈতন্যে আমরা আবার দুটি প্রবণতা লক্ষ করি। একদিকে রয়েছেন সেইসব শিল্পী, যাঁরা সামরিকশাসনের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে আশ্রয় নিলেন বেতার-টেলিভিশন, বিএনআর-

প্রেসট্রাস্টের নিরাপদ সৌধে। এঁদের রচনায় এল পলায়নী মনেবৃত্তি। অপরদিকে আছেন সেইসব শিল্পী যাঁরা বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশে বাস করেও সমকালচঞ্চল জীবনাবেগ, যুগসংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দ্রোহ-বিদ্রোহ অঙ্গীকার করে গল্পের শরীরে জ্বেলে দিয়েছেন সমাজ-প্রগতির আলোকবর্তিকা। স্বৈরশাসনের শৃঙ্খলে বাস করেও এঁরা ছিলেন সত্যসন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী এবং প্রগতিশীল সমাজভাবনায় উচ্চকিত।[৩৭২]

বাংলা ছোটোগল্পে তৎকালীন রাজনীতি কী প্রভাব পড়েছিল সেসম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন,

> স্বপ্ন, যুদ্ধ, স্বপ্নভঙ্গ-একের পর এক তরঙ্গের ঝাপটা উঠেছে- আন্দোলন হয়েছে বারে বারে আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন, আমাদেও জনমানুণের অনেক প্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত অতলস্পর্শ অনুভূতি বিচিত্রায় ঝংকৃত হয়েছে। এই চলিষ্ণু বিচিত্রিত ঝংকার স্বাভাবিকভাবে এক একটি ছোটগল্পের তন্ত্রীতেই আঘাত তুলতে পারতো সবচেয়ে বেশি, চিরকালের জন্যে রেখায়িত হয়ে থাকতে পারতো, ছোটগল্পের পক্ষেই সহজসম্ভব ছিলো এই ঝংকার ও রণনগুচ্ছকে পুঞ্জীভূত করে রাখা–কিন্তু ছোটগল্প তাতে ব্যর্থ হয়েছে।[৩৭৩]

কিন্তু ছোটোগল্পে সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে যতটুকুই প্রকাশিত হয়েছে তা জাতির মানসগঠনে নিতান্তই কম নয়। যদিও সমালোচকগণ এতে সন্তুষ্ট নন।

পঞ্চাশের দশকের অনেকে ষাটের দশকের ছোটো গল্প লিখছেন আবার এ সময়ে একদল নতুন লেখকের আবির্ভব হয় যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন–ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-১৯৮৬), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৮), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০3), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২), সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (১৯৩৩-১৯৯৮), লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯), সুচরিত চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯৪), আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১) হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), শওকত আলী (১৯৩৬-১৯১৮), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১৯৩৯), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯), হাসনাত আবদুল হাই (১৯৩৯), রাহাত খান (১৯৪০), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-১৯১০), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭) প্রমুখ গল্পকারের আত্মপ্রকাশ ঘটে ষাটের দশকের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে।

আমরা বর্তমান আলোচনায় গল্পকারদের রচিত ষাটের দশকে গল্পগুলোকেই শুধু বিবেচনায় আনব। অর্থাৎ গল্পকারদের ষাটের দশকের আগের ও পরের গল্পগুলোকে বর্তমান গবেষণায় বিবেচনা করবো না।

আলাউদ্দিন আল আজাদের উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প হলো–*অন্ধকার সিঁড়ি* (১৯৫৮), *উজান তরঙ্গে* (১৯৫৯), *যখন সৈকত* (১৯৬৭) প্রভৃতি।

শওকত ওসমান গ্রামীণ ও শহুরে জীবন চিত্রণে দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হলো–*প্রস্তরফলক* (১৯৬৪), *উভশৃঙ্গ* (১৩৭৫), *উপলক্ষ্য* (১৩৭৫), *নেত্রপথ* (১৯৬৮) এবং *প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৯) ইত্যাদি।

ষাটের দশকে রচিত বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প গ্রন্থ হলো–*অবিচ্ছিন্ন* (১৯৬০), *দূর দূরান্ত* (১৯৬৮) ও *বিশাল ক্রোধ* (১৯৬৯) প্রভৃতি।

সৈয়দ শামসুল হক শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ও গ্রামীন জীবনকে আধুনিক শিল্পচেতনায় উপস্থাপনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর *তাস* (১৯৫৪), *শীতবিকেল* (১৯৫৯), *রক্তগোলাপ* (১৯৬৪), *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭) প্রভৃতি গ্রন্থে।

হাসান আজিজুল হকের *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য* (১৯৬৪) এবং *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* (১৯৬৭) প্রভৃতি গল্প গ্রন্থে সমাজজীবনকে গভীর ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সংক্ষুব্ধ সমকালকে গল্পের মৌল উপাদান হিসেবে মানব সমাজ ও জীবনের অস্তিত্বের সংকট, জীবনের ক্লিন্নতা প্রভৃতি উপজীব্য করে রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থ–*দুর্বিনীত প্রধান* (১৯৬৫), *বহে না সুবাতা* (১৯৬৭) ও *সীতাংশু তোর সমস্ত কথা* (১৯৬৯) ইত্যাদি।

আবদুল মান্নান সৈয়দও সমকালকে তাঁর গল্পের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত একটি গল্প গ্রন্থ হলো–*সত্যের মতো বদমাশ* (১৯৬৮)।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *আমাকে ছাড়া অনেক কিছু*, *আঁধির যতো শত্রুমিত্র*, *এই যে তুমুল দৃষ্টি*, *সবখানেই চড়া রোদ*, *শাসন নেই ধমক নেই*, *চেয়ে দেখি কত কিছু* এবং *একই টেবিলে দশজন*। তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থটি হচ্ছে *বুধবার রাতে*।

লায়লা সামাদের উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প হলো–*দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে* (১৯৬৩) ও *কুয়াশার নদী* (১৯৬৫) প্রভৃতি।

ময়ূরের পা (১৯৫৮)

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসনজারির পর লেখকগণের জন্য তাদের স্বাভাবিক লেখা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। এর মধ্যেও একুশে লেখকগণের কাছে হয়ে ওঠে প্রেরণার উৎস। মঈদ-উর-রহমানের *ময়ূরের পা* (১৯৫৮) গ্রন্থের ‘সিঁড়ি’ গল্পে বর্ণিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের দুর্দমনীয় প্রভাবে ভীত পাকিস্তান সরকারের দমন নীতির দিক। ভাষা আন্দেলনের কর্মী সিরাজকে কারাবন্দি করা হলে পরিবারে তৈরি হয় সংকট। দুবছর পর তার মুক্তির দিন ঘনিয়ে এসে পরিবারটি আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু নতুন করে আবার তাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়।[৩৭৪]

এভাবে একুশের গল্পগুলোর ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে ভাষা আন্দোলনের ঘটনাধারা, পুলিশের বর্বরতা, ভাষা আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সরকারের নিষ্ঠুর মনোভাব, তাদের বিরুদ্ধে ধরপাকড়, গ্রেফতার, হুলিয়া ইত্যাদি পুলিশি তৎপরতা, শহিদদের আত্মদান, সারাদেশে ঘটনার খবরের দ্রুত বিস্তার, একুশের ঘটনাকে ঘিরে সর্বস্তরের মানুষের আবেগ-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আন্দোলনে যোগ দেওয়া না দেওয়া নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, পাকিস্তানি স্বাধীনতা সম্পর্কে মোহমুক্তি, ভাষা আন্দোলনের যুগান্তকারী প্রভাব ইত্যাদি।[৩৭৫]

মৌসুমী (১৯৬০)

ছোটোগল্প ‘মৌসুমী’ বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের *অবিচ্ছিন্ন* (১৯৬০) গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। গল্পের মূল বিষয় হলো আপন পুত্রকে ঘিরে মধ্যবিত্ত পিতা স্বপ্নরচনা করেছে। ‘মৌসুমী’ গল্পে পিতার আকাঙ্ক্ষা পুত্র শওকত প্রতিষ্ঠিত হোক। আপন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুত্র শওকত (‘মৌসুমী’) ছিল একটি বর্ণময় স্বপ্নকল্পনা :

> ভেবেছিল পাশ করে বেলোলেই চাকরী, মাইনে শ’পাঁচেক। নির্জন রাস্তার ওপর লাল ক্যানায় ঘেরা বাড়ী। পিয়ানোর ওপর শাদা দুটি হাত।[৩৭৬]

চাকরি প্রাপ্তির সংবাদে স্বপ্নকাতর শওকত হয়ে ওঠে সজীব, উচ্ছল। পুত্রের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা পিতারই স্বপ্ন-কল্পনার প্রতিরূপ। পিতা আরও স্বপ্নরচনা করেন শওকতের প্রতিষ্ঠার আর অপর পুত্ররা বি.এ পাশ করবে, আর কোনো ভাবনা থাকবে না। পুত্রদের সুখেই হবে পিতার আনন্দ। কিন্তু শওকতের চাকরির সংবাদটি সঠিক ছিল না, সেটা ছিল একটি তথ্যবিভ্রাট। পুত্রের স্বপ্নভঙ্গ পিতাকে করে তোলে আশাহত, বেদনাবিক্ষত।[৩৭৭]

গল্পের নায়ক শওকতের বা তাঁর পিতার স্বপ্নভঙ্গ বা আশাহত বিষয়ে শুধু বার্তা দেওয়া হয় নি এ গল্পে। ‘মৌসুমী’ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে তৎকালনী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অধীন বাঙালি জাতির প্রত্যেকটি পরিবারের চিত্র। যেখানে চাকরির স্বপ্ন দেখা যায় কিন্তু তা পাওয়া যায় না।

তালাক (১৯৬২)

‘তাকাল’ গল্পটি *আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৬২)-অন্তর্ভুক্ত। পল্লীগ্রামের একটি সাধারণ বিষয়কে উপজীব্য করে গল্পের কাহিনি গড়ে উঠেছে। জয়তুন পাঁচ ছেলের মা। তার স্বামী আইজদ্দিন। দুজনের সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল।

আইজদ্দিন তেমন সবলকায় নয়। অন্যদিকে জয়তুন একজ লম্বা, স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী নারী। তবু পুরুষ বলেই আইজদ্দিনের পৌরুষ কখনো কখনো বিদ্রোহ করে বসে। একদিন সারাদিন কাজ করে এসে ঘরে ফিরে সে স্ত্রীর কাছে ভাত চায়। কিন্তু ঘরে চাল ছিল না বলে ভাত রান্না হয় নি বলে স্ত্রী জানায়। ঘরে চাল না থাকলে ভাত রান্না হবে কিভাবে, এই যুক্তি তখন আইজদ্দিনকে শান্ত করতে পারলো না। সে স্ত্রীর পিঠের উপর কিল বসিয়ে দেয়। 'জয়তুনের সহ্য হলো না। দুহাতে জাবলে ধরল সে আইজদ্দিনকে ঘরের খামের সঙ্গে।'[৩৭৮]

ঘটনা আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়। প্রচণ্ড শক্তিশালিনী জয়তুন যখন আইজদ্দিনকে কিছুতেই ছাড়লো না, তখন সে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনবার তালাক বাণী উচ্চারণ করলো। ইতঃমধ্যে পাড়ায়ও এ খবরটি পৌঁছে গেলো। মুনসি সাহেব ফতোয়া দিলেন, দুজনের কারো মুখ আর দেখা চলবে না।

এই নিয়ে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে নানা কথার রঙ্গরসের ফোয়ারা বয়ে গেলো। এ গল্পের কাহিনি বাস্তব। গ্রামের মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিধানের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এই বিধানের জন্যেই সামান্য মৌখিক একটি মাত্র বাক্যের অসীম দাপটে আইজদ্দিন-জয়তুনের দীর্ঘদিনের সংসারটি মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। বাক্যটি ধর্মীয় বিধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে এর কোনো সংস্কার কিংবা সমাধান করার উপায় নেই।

১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন প্রবর্তনের পর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও ধর্মী নেতারা যখন এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই সময় আবু জাফর শামসুদ্দীন 'তালাক' গল্পটি রচনা করেন। এই গল্পটি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি করে।

জোঁক (১৯৬৩)

আবু ইসহাকের 'জোঁক' গল্পটি কৃষিপ্রধান বাংলাদেশকে উপজীব্য করে লেখা। এখানকার বেশিরভাগ জমির মালিক কৃষক নয়, শহরে নগরে বাস করে এমন বিত্তবান এক শ্রেণির মহাজন। জমির চাষবাস করে ভূমিহীন চাষীরা। কিন্তু জমির ফসলের গোটা অংশ ভোগ করে মালিক। জোঁক যেমন নীরবে মানুষের রক্ত শোষণ করে, এরাও তেমনি হতভাগ্য মেহনতের ফসল ছিটেফোঁটা তাদের দিয়ে বাকিটা দ্বিধাহীনভাবে নিজেদের সম্পদ হিসেবে গণ্য করে। চাষীদের ন্যায়সংগত দাবির একটি প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে 'তে-ভাগা' প্রথা চালু করা হয়, অর্থাৎ জমির ফসলে দুইভাগ পাবে চাষী, একভাগ মালিক। তবে চাষী যদি মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা আগে থাকতেই নিয়ে নেয়, তাহলে চাষী ও মালিকের মধ্যে সমান সমানভাবে ফসলের ভাগ হবে। কিন্তু 'জোঁক' গল্পের লেখক দেখিয়েছেন মালিক কৌশলে চাষীদের টিপসই নিয়ে তাদের ধার গ্রহণের অজুহাত দেখিয়ে নিজে ফসলের তিনভাগ নিয়ে চাষীকে এক ভাগ দেয়। চাষীরা তার প্রতিকার করার জন্যে একজোট হয়। জোঁকের মতো রক্ত শোষণকারী মহাজনদের কৌশলগত শোষণের এই চিত্র তুলে ধরেছেন আবু ইসহাক তাঁর এই গল্পে।

চাষীদের পাট কাটার সময় তখন। পচা পানির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সারা গায়ে তেল মেখে ওসমানও তার বর্গায় পাওয়া জমির পাট কাটার জন্যে একবুক পানিতে ডুবে ডুবে পাট কেটে আনে। একটা জোঁক তার পায়ে আঠার মতো লেগে আছে। তার ছেলে তোতা রক্ষচোষা জোঁকটি বাপ্‌কে দেখিয়ে দেয়। ওসমান কাস্তে দিয়ে জোঁকটাকে দু'টুকরো করলে তাজা রক্তে মাটি ভিজে যায়।

রক্তচোষা এই কদাকার প্রাণীটির সঙ্গে চাষীদের শোষণকারী মহাজন শ্রেণির আশ্চর্য মিল রয়েছে। সেই কথা মনে করেই হয়তো ওসমান দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবে, 'এত পরিশ্রমের ফসল তো, তার একার নয়। সে-ত শুধু ভাগচাষী।'[৩৭৯]

এখানে মহাজন হলো পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর প্রতীক। আর চাষীরা হলো শোষিত বাঙালি জাতির প্রতীক। পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী কীভাবে প্রকাশ্যে ও কৌশলে বাঙালিকে শোষণ করে যায় তা 'জোঁক' গল্পের মধ্যে ফুটে ওঠেছে।

প্রতিবিম্ব (১৯৬৩)

নিম্নশ্রেণির কর্মচারীর বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনের কাহিনি শুনিয়েছেন লেখক 'প্রতিবিম্ব' গল্পে। অফিসের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বড়ো কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী লেখক পাঞ্জাবি ছেড়ে কোট আর পাজামা ছেড়ে প্যান্ট ধরতে বাধ্য হন। অবশ্য কোট-প্যান্ট তিনি কিনেন ভিক্টোরিয়া পার্কের পুরোনো কোট-প্যান্টের দোকান থেকে। সেই পুরোনো কোটের পকেটে এক মর্মান্তিক চিঠি আবিষ্কার করেন তিনি। কোটের আগের মালিক জনৈক নূর মোহাম্মদ মনসুর নামক কোনো এক ব্যক্তিকে চিঠিতে কোট কেনার ইতিহাস শোনায়। সরকারি অফিসের বড়ো কর্তা নিয়ম অনুযায়ী দুই এক বছর পরপর বদলি হন। এক একজন বড়ো কর্তা এক এক রকম মন-মানসিকতা ও মেজাজ নিয়ে আসেন। বড়ো কর্তা এসেই পোশাক বদলের নির্দেশ জারি করেন। সেই সূত্রে নূর মোহাম্মদকে জামা ছেড়ে শেরওয়ানি, আবার শেরওয়ানি ছেড়ে কোট পরিধান করতে হয়। একদিন অন্য এক চিফ ম্যানেজারের আবির্ভাব হয়। নূর মোহাম্মদ যথানিয়মে সেদিন স্যুট পরিহিত ছিল। বলা বাহুল্য তার চাকরিটি ছিল স্টোর-কিপারের। চিফ ম্যানেজার সন্দেহ করলেন,

> পাঁচ পাঁচটা মানুষের ভার বহনকারী একশো টাকা মাইনের স্টোর-কিপার এই মাগ্‌গী-গণ্ডার বাজারে চুরি না করে স্যুট হাঁকায় কেমন করে।[৩৮০]

সুতরাং বড়ো সাহেবের নির্দেশে নূর মোহাম্মদ অচিরেই স্টোর থেকে বদলি হয়, তার কিছুদিন পরই ছাঁটাই। এই নির্মম ইতিহাস পড়ার পর লেখকের মনে ভাবান্তর হয়। তিনি দেখেন ধনুর্দোলায় তাঁর পুরোনো কোটা ঝুলছে, আয়নায় তার প্রতিবিম্ব। তাঁর মনে হলো জীবনের নিষ্ঠুরতা যেন দাঁত বের করে হাসছে।

'প্রতিবিম্ব' ষাটের দশকের প্রতিটি চাকরিজীবী বাঙালিকে নাড়া দেয়। কারণ বেশিরভাগ বাঙালি যারা চাকরি করতে খুব ছোটো পদে। তাদের সবার সাথেই প্রায় অফিসের যে ধরনের আচরণ করা হয় তা এই গল্পে কিছুটা ফুটে ওঠেছে।

বর্ণামৃত (১৯৬৪)

শওকত ওসমান-এর *প্রস্তর ফলক* (১৯৬৪) গল্পগ্রন্থে একটি গল্প 'বর্ণামৃত'। এই গল্পের হাসিব যখন বুঝেছিল এ মুর্খের দেশে ভণ্ডামির আশ্রয় না নিলে কিছু করা সম্ভব নয়, তখন সে এক ভণ্ড হাকিম অর্থাৎ ভিষক সেজে বেশ পশার জমিয়ে ফেলে। ঘটনাচক্রে একদিন তার বন্ধু বেলায়েতের সাক্ষাৎ পায় সে। পরে তাকে সে তার সৌভাগ্যের ইতিবৃত্ত বেশ রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করে। পরদিন দুই বন্ধু বেড়াতে গিয়ে এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় হাকিম-বন্ধু হাসিব অকস্মাৎ তার পাগড়ির লেজে মুখ ঢাকে। বেলায়েত এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জানতে চাইলে হাসিব নির্বিকারে বলে,

> শোন তা-হলে। আমি হাকিমী শিখিনি, হাকিমীর কিছুই জানিনে। কবরস্থানে যাঁরা শুয়ে আছেন, তাঁদের অনেকে আমার রোগী। অনেকে তাড়াতাড়ি আগেই গেছে। অবশ্য আমাকে টাকা দিয়েছে সে জন্যে। আমার কি চক্ষুলজ্জা নেই? চশমখোর হতে তো পারিনে। আমাকে মুখ ঢাকতে হয়–।[৩৮১]

'বর্ণামৃত' গল্পের মাধ্যমে লেখক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একটি রূপ পাঠকের সমানে তুলে ধরেন। গল্পের নায়ক হাসিব যেমন ভণ্ডামি করে, সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে নিজে ধনী হয়েছে। ঠিক তেমনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মের ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে বাংলার মানুষকে শোষণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সকল প্রকার উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করে।

জয়

আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠগল্প ১৩৭১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থের একটি গল্প 'জয়'। গল্পটি পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত হলেও তা *শ্রেষ্ঠগল্প* মাধ্যমে আবার প্রকাশিত হয় এবং তা তৎকালীন সমাজের সাথে ঘটনাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ। 'জয়' গল্পে লেখক তথাকথিত ধর্মের ধ্বজাধারী একশ্রেণির মোল্লা সম্প্রদায়ের মুখোশ উন্মোচন করছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন ধর্মবোধ এবং ধর্ম উন্মাদনা এক নয়। অর্থাৎ 'জয়' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্মান্ধতা। হাজী সাহেব ধর্ম সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

বিয়ের মসলিসে হাজী সাহেবের কানে একটি বিশেষ খবর এল 'মদ্‌রসে আউআলে'র মাধ্যমে। কন্যার পিতা বুকে হাত রেখে নামাজ পড়েন। অর্থাৎ তাঁরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং এ বিয়ে হতে পারে না। এই শ্রেণির মোল্লা জাতীয় অর্ধামিকের প্রতি লেখক শেষের দিকে যে শ্লেষোক্তি করেছেন তাতে গল্পের রস যেমন ঘনীভূত হয়েছে তেমনি বক্তব্যের সবলতাও প্রকাশিত হয়েছে।

> জমিদার সাহেব বধূ লইয়া ফিরিতেছেন। সমস্ত গ্রাম নৌকাঘাটে আসিয়া উপস্থিত। নৌকা হইতে নামিয়া হাজী সাহেব উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ইসলাম কী–সমবেত জনতা চিৎকার করিয়া উঠিল–জয়। বধূশূন্য পাল্কী তাহাতেই ভরিয়া উঠিল।[৩৮২]

আবুল ফজল এই ছোটোগল্পের মধ্য দিয়ে যে সমাজে ধর্মের প্রভাবে বিরুদ্ধে বলেছেন তা নয়, একইসাথে তিনি ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী প্রতিটা ক্ষেত্রে যে ধর্মের ব্যবহার করে সেই বিষয়ের প্রতি অনাস্থা তুলে ধরে প্রতিবাদ জানান।

হাকিম

আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠগল্প ১৩৭১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থের একটি গল্প 'হাকিম'। এই গল্পে বাংলাদেশের চিরকালীন দারিদ্র্য, নিপীড়নকে চিত্রিত করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত আছে অসহায় পিতামাতার সন্তান বাৎসল্য। এই করুণ রসই 'হাকিমে'র মূল প্রেরণা। আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত আবদুল্লাহ্‌র একমাত্র স্বপ্ন ছেলে আলমগরি হাকিম হবে।

আবদুল্লাহ্ এ উচ্চাশায় অনড়। এই চিন্তাতে সে দারিদ্র্য ও দুর্দশাকেও আমল দেয় না। ছেলের শিক্ষার জন্য সর্বস্ব সে হারিয়েছে বাকি ছিল শুধু ভদ্রাসনটুক। পৈত্রিক ভিটেমাটি মহাজনের কাছে বন্ধক দিতে হয়। দলিল সম্পন্ন করার সময় মহাজন অভিনব প্রস্তাব করে বসল–

> ... তারপর হৃষিকেশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আর একটা আলাদ দলিলে তোমাকে লিখে দিতে হবে, ভবিষ্যতে তুমি বা তোমার বংশধরগণ কোনদিন গো কোরবাণী করবে না, মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যেতে কোনদিন মিছিলকে বাধা দেবে না এবং ভবিষ্যতে তুমি ও তোমার বংশধরগণ ভোটের সময় আমার বংশধরদের কথামত ভোট দেবে।[৩৮৩]

অনন্যোপায় আবদুল্লাহ্‌কে এই নিদারুণ শর্ত মেনে নিতে হলো। চরম দারিদ্র্যের ও নিপীড়নের মধ্যে আবদুল্লাহ্‌র স্বপ্ন দেখার ছবিটি আকর্ষণীয়।

এই গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন বাংলাদেশের মানুষ শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা কীভাবে শোষিত হচ্ছিলেন তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ব বাংলার মানুষের যে অর্থনৈতিক দুর্দশা তা তুলে ধরা হয়েছে। নাগরিকের স্বাভাবিক বিকাশগুলো রোধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলার মানুষ আশা ছাড়েনি বরং লড়াই করে গেছেন। এছাড়া মৌলিক গণতন্ত্র আইয়ুব খান যেরকম করেছিলেন, ঠিক সেই রকমই হাকিম গল্পে হৃষিকেশ বাবু আবদুল্লাহ্ও তার পরিবার ভোট কাকে দিবে তা ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব আদায় করে নেয়। বাংলার জনগণ এভাবেই শোষিত হয়েছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে।

একজোড়া প্যান্ট (১৯৬৭)

'একজোড়া প্যান্ট' ছোটোগল্পটি আবু জাফর শামসুদ্দীনের *একজোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটিতে মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী শ্রেণির স্বপ্নরচনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। 'একজোড়া প্যান্ট' গল্পে নায়ক ওয়াবেদ মিঞা সমস্যাকীর্ণ জীবনে সচ্ছলতা অর্জনের ভাবনায় হয়ে ওঠে অস্থির, চাকরিতে পদোন্নতি পেলে এই সচ্ছলতা প্রাপ্তির পথ সুগম হবে। 'একজোড়া প্যান্ট' গল্পের ওয়াবেদ মিঞা পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষায় স্বপ্নের জাল বোনে,

> প্রমোশন, ইউডি এসিস্ট্যান্ট। বেতন দু'শ থেকে সাড়ে তিনশো–বাসা বদলে খাঁটি দালনে বসবাস–স্ত্রীর জন্য চারগাছা সোনার চুঁড়ি দেনাশোধ–পুত্রদের পড়াশোণার খরচ–কত কি কল্পনার জাল বোনেন।[৩৮৪]

শেষ পর্যন্ত পদোন্নতি হয়নি, আশাভঙ্গের বেদনায় হয়েছে তার মস্তিষ্ক বিকল। পূর্ব বাংলায় যখন অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। অর্থনীতিবিদগণ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এবং সেগুলোকে ইস্যু করে

রাজনীতিবিদগণ রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রদান করেন। শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৬ দফা হলো সেই কর্মসূচিরই অংশ। সেই সময়ই সাহিত্যিকগণ তাদের রচিত গল্পের মাধ্যমে বৈষম্য তুলে ধরেন। আবু জাফর শামসুদ্দীন দেখিয়েছে বাঙালিরা কত ছোটো পদে চাকরি করে এবং তাদের কোনো পদোন্নতির ব্যবস্থাও নেই। 'একজোড়া প্যান্ট' গল্পটি একটি উদাহরণ। এটি সারাদেশের সাধারণ মানুষের চিত্র ছিল।

ঘরে ফেরা (১৯৬৭)

'ঘরে ফেরা' গল্পটি সৈয়দ শামসুল হকের *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'ঘরে ফেরা' গল্পে সাহিত্যিকের আপন ঘর হয়ে উঠেছে প্রিয়তর, স্বপ্নময় ও স্বস্তিস্পর্শী। সাহিত্যিকের ঘর আছে, আশ্রয় নেই। দীর্ঘ প্রবাসযাপনের পর গল্পের নায়ক সাহিত্যিক ('ঘরে ফেরা') স্বদেশে ফিরেছে গৃহসজ্জার সৌখিন সামগ্রী নিয়ে।[৩৮৫] কিন্তু ঘর রয়েছে তালাবদ্ধ, বেদখল, সম্ভব হল না তার গৃহপ্রবেশ :

> ট্যাকসিতে জানালার পর্দা, ল্যাম্প কার্পেট আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজারে ঘুরে বিদেশে পয়সা বাঁচিয়ে কিনেছিলাম। কোথায় রাখবো কি করব? তার চেয়ে বড়কথা, আজ রাতে আমি ঘুমুবো কোথায়?[৩৮৬]

সাহিত্যিকের আপন ঘর আপন থাকে না, হয়ে যায় পরের ঘর, ঘরের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। সাহিত্যিক হারিয়েছেন ঘরের দখল। তাই তিনি আশ্রয়হীন। বাঙালিরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশের অংশ হয়েও কখনো তারা স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে নি। বরং নিজেদের আবাসভূমি, মাতৃভূমি অন্যের দ্বারা দখল হয়ে আছে। নিজেদের সেখানে স্বাধীনভাবে বসবাসের কোনো অধিকার নেই।

নেমক হালাল (১৯৬৮)

শওকত ওসমানের *উভশৃঙ্গ* (১৯৬৮) গল্পগ্রন্থের একটি গল্প 'নেমক হালাল'। একটি প্রথম শ্রেণির কামরার সম্মুখে ভিখিরি ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল। সলিম, রহিম ও ফতু এই পরিবেশে অপাংক্তেয়। এই বগীর যিনি (স্বামী-স্ত্রী) আরোহী তাঁর পরিচ্ছদ ও অবয়বে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে। স্বামী-স্ত্রী কারুর কাছেই এর এতটুকু বদানত্য পেল না। স্ত্রীর অনুরোধেও ভদ্রলোকের হাতে দুটো পয়সা উঠল না। তার ভাষা এরা হলো 'জঞ্জাল'। এরা ঘুরে বেড়ায় কাজ কাম করে না। পয়সা দিলে কুঁড়ে হয়ে যাবে।

ভদ্রলোকের এর মধ্যে পিপাসা পেছে গেছে। রসগোল্লায় তা মেটে নি। কচি সবুজ ডাব এসে গেল। ভিখিরি ছেলেরা হৈ চৈ করে উঠল তাদের জন্য যেন সামান্য রাখেন। ভদ্রলোক ডাব খেয়েও সুখ পান না। ভেতর থেকে বায়ু উদ্গীরণ হচ্ছিল তাই বলে ওঠেন 'আলহামদুলিল্লাহ্'। ইতিমধ্যে সাহেব-বেগম গাড়ীতে উঠে বসেছেন। হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ল ..গলাকাটা ডাব দুটো যেন তেড়ে আসছে।[৩৮৭]

সর্বহারা সংগ্রামী দলও যে শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে সাহেবের প্রতি সলিমদের অবজ্ঞাসূচক উক্তি ও মাথাকাটা ডাবগুলো ছুড়ে দেওয়াতে সে প্রমাণ পাওয়া গেল।

পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যপীড়িত তা এই গল্পে তুলে ধরেছেন। লেখক এখানে বাঙালি ও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক ও অবস্থান গত পার্থক্য দেখিয়ে প্রতিরোধ করার সাহস যোগান।

রাতা (১৯৬৮)

শওকত ওসমানের *উভশৃঙ্গ* (১৯৬৮) গল্পগ্রন্থের একটি গল্প 'রাতা'। 'রাতা' গল্পটি অনেকটা রূপকাশ্রয়ী। করিমা বিবি মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছেন নাতি মাজেদের হাত ধরে। করিমা বিবির নিজের সংসারে খাদ্য পর্যাপ্ত নয়। তবু মেয়ের বাড়ি যাওয়ার সময় লৌকিকতা রক্ষা করতে হয়। তাই গৃহপালিত রাত (মোরগ)টি নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন।

ইচ্ছা ছিল রাতাকে বিক্রি করে মেয়ে হাতে কিছু টাকা দিয়ে আসবেন। কিন্তু পথের মধ্যে রাতা হঠাৎ করে হাত থেকে ছুটে যায়। রাতাকে ধরার পরে পথিমধ্যে জাবাই করতে হয়েছিল।[৩৮৮] মোরগটি ছিল নিমিত্ত মাত্র। জবাই হয়েছে শোষিত নিপীড়িত মানুষ।

'রাতা' গল্পটিতে মানুষের সাধকে উৎসর্গ করার বিবরণ আছে। এই মোরগটি ছিল মাজেদ ও করিমা বিবির অত্যন্ত প্রিয় পোষা প্রাণী। কিন্তু তাদের রাতাকে পথের মধ্যেই জবাই করতে হলো।

সমস্ত গল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ যে ছবির অবয়ব তা তদানীন্তন পূর্ব বাংলার একটি ছবি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত হয়ে মানুষ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল এই চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। বাঙালিরা যেন বার বার পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বলির শিকার না হয় সেই বোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তৎকালীন সময়ে সামরিক শাসন জারি থাকায় লেখক বাঙালি জনগোষ্ঠীর অবস্থা রূপকার্থে তুলে ধরেছেন।

নেত্রপথ (১৯৬৮)

শওকত ওসমানের *নেত্রপথ* (১৯৬৮) গল্পগ্রন্থের একটি গল্প 'নেত্রপথ'। গল্পকথক প্রতিদিন পাখিদের গান শুনে যেত। হঠাৎ একদিন ঘুঘু, টিয়া, মণিয়া, কোকিল, দোয়েল কারুর সাড়া শব্দ পেলেন না। পাখির রাজ্যে এই এই মৃত্যুশীলত নীরবতা কেন?

একটু পরেই রহস্যের অবসান হলো। ঘাতকের মতোই দুজন পাখিধরা চিড়িমারের সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। এরাই একে একে গায়ক পাখিদের বন্দি করেছে। 'এই গানের পাখী ধরে তোমাদের কি হবে?–সাহেব, সেই জন্যই তো এদের আগে ধরা উচিত। এরা গান গাইলে গান শুনে শুনে জঙ্গলের সমস্ত পাখী নড়ে চড়ে, লাফালাফি করে। আমাদের তো ব্যবসা মাটি। তখন পাখী ধরব কি করে? তাই আগে এ গুলো ধরলাম দু'তিনদিন পরে এসে দেখবেন, এই জঙ্গল থেকে আমরা কত রোজগার করি।'[৩৮৯]

পাখিকে কেন্দ্র করে লেখক এখানে যে পটভূমি নির্মাণ করেছেন তা মূলতঃ চিরায়ত মানব গোষ্ঠীর। সাধারণ মানুষের কথার কলতান, গানের সুর, আনন্দধ্বনি তথা মানবাধিকার চিরকাল নিষ্পেষিত হয়েছে নির্মম শাসকের হাতে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতেও বাঙালি নির্যাতিত হয়েছে। বিশেষ করে যারা পথ নির্দেশক ছিলেন তাদেরকে দমন করার চেষ্টা করেছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তার প্রধান উদাহরণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যখন ৬ দফার ভিত্তিতে বাঙালি স্বাধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করছিল, ঠিক তখনই আন্দোলন দমন করার জন্য শাসকগোষ্ঠী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সফল হয় নি। বাঙালি তাদের আধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করে যায় এবং বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করেন।

ইস্রাফিলের বেটা (১৯৬৮)

আবুল মনসুর আহমদ রচিত 'ইস্রাফিলের বেটা' আবেহায়াত (১৯৬৮) গল্পগ্রন্থের একটি গল্প। গল্পের প্রধান পুরুষ একজন পির। পির সাহেবের পেশার কল্যাণে যথেষ্ট বিত্ত সম্পত্তি ছিল। শরিয়ত মতে চারটি বিবিও তিনি ঘরে তোলেন। তবে পির সাহেবের একটা দুঃখ এই যে চার বিবি তাঁর ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তাঁকে যে নয়টি সন্তান উপহার দেয়, তারা সবাই কন্যা। এদিকে শরিয়ত মতে চার বিবির অতিরিক্ত বিবি ঘরে আনা জায়েজও নয়। অথচ পুত্র সন্তানের অভাবে তাঁর বংশটিও শেষ হয়ে যাবে। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বড়ো বিবির বয়স বেশি, তাকেই তালাক দিয়ে সন্তান ধারণে সক্ষম এক নারীকে ঘরে তুলবেন। তালাকের কথাটা বড়ো বিবিকে জানানোর অভিপ্রায়ে যেদিন তিনি তাঁর কাছে যান, সেদিনই তিনি জানতে পারেন, ঋতুবন্ধের বয়সেও বিবি তখন অন্তঃসত্ত্বা। পির সাহেব খুশি হয়ে আল্লাহর কাছে পুত্র-সন্তান প্রার্থনা করেন। যথাসময়ে বড়ো বিবি স্বামীকে পুত্র-সন্তানই উপহার দেন। কিন্তু সন্তান দেখার সৌভাগ্য বিবির হলো না। সন্তান প্রসবের পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। দীর্ঘকালের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী মৃত বড়ো বিবির মুখের দিকে পির সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, 'তাঁর চোখ হইতে দুই ফোঁটা পানি গড়াইয়া গাল বাহিয়া দাড়িতে মিলাইয়া যায়।'[৩৯০]

এই গল্পে লেখক স্বার্থন্বেষী পীরের অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ের বার্তা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু একইসাথে নারীদের যে বঞ্চনা সেই বিষয়টিও সুন্দরভাতে তুলে ধরেছেন। পুত্র সন্তান লাভের আশায় বিবিকে তালাক দেওয়ার কথা চিন্তা করেন পির সাহেব। ধর্মীয় বিধিনিষেধকে কৌশলে এড়িয়ে যাবার জন্য একজন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা ভাবেন। যেখানে তার চারজন স্ত্রী

বর্তমান ছিল। ধর্মকে যেখানে শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছিল, সেখানে সাধারণ মানুষতো ব্যবহার করবেই। ধর্মীয় আবরণে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে শোষিত হতে হয়। জনগণের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে –১৯৬১ সালে আইয়ুব খান মুসলিম পারিবারিক আইন প্রবর্তন করেন।[৩৯১] কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও ধর্মী নেতারা এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তারা মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১-কে কুরআন পরিপন্থি বলে অবহিত করেন।[৩৯২] কারণ এই আইনের ফলে তারা ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে আর ব্যবহার করতে পারবে না।

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন সংঘবদ্ধ ও চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এ পর্যায়ে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি বামপন্থি ছাত্রনেতা আসাদ শহিদ হলে সমগ্র বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই উত্তাল সময়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী জাগরণের ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছে বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩৬) তাঁর 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯' গল্পে। গল্পে একমাত্র চরিত্র বাঙালি নাসির প্রায় একযুগ ধরে করাচিতে একটি দৈনিকে চাকরি করেন। উনসত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি প্রতিদিন ঢাকার খবর পড়ে আর মানসিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। ঢাকার খবর বলতে কার্ফু, গুলি, হরতাল, জখম আর মৃত্যু। নাসির ভাবে, এই খবরগুলোই সম্পূর্ণ খবর নয়, এসব দেখে ভিতরের খবর বোঝা যায় না। তিনি অস্থিও হয়ে ওঠেন। অন্তঃস্থ কোনো খবর জানার জন্য খবরের কাগজে চোখ মেলে বসে থাকতে থাকতে তার চোখ ব্যথা করে। করাচির অন্য মানুষেরা কিছু বুঝতে না পারলেও নাসির অনুভব করে, কারফিউ-নির্যাতনের তোয়াক্কা না করে ঢাকা তথা বাংলাদেশ জেগে উঠেছে। বাঙালি জাতি রুখে দাঁড়িয়েছে; দাসত্বের শৃঙ্খল তারা ভাঙবেই। বাঙালির এই জাগরণের সাথে তিনি একাত্ম বোধ করেন।[৩৯৩] নাসিরের এই পরিবর্তনের চিত্র লেখকের ভাষায় পরিস্ফুটিত হয়েছে,

> দেশপ্রেম বলতে যা বোঝায় তার প্রভাব নাসিরের ওপর নেই। দেশের বস্তুগত কিংবা ভাবগত কোনরূপ তার কাছে সত্য নয়। কিন্তু আজ, কিংবা ক'দিন ধরে তার মস্তিকে গুণগুণ করছে: ঢাকা ঢাকা, খবর কাগজের ঘটনাগুলি চোখে বাড়ি মারছে, লাফিয়ে উঠছে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার বুকে, ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে তার চেতনা, অনুভূতি, হৃদয়; অবুঝ একটা বোধ তাকে জড়িয়ে ধরছে। একটা অজানা অভিজ্ঞতার মধ্যে সে প্রবেশ করছে। জয় ও দায়ন্তের মধ্যকার একটা বাস্তবতার সে বাসিন্দা, ঢাকা মুখে রক্ত তুলে রুখে দাঁড়িছেছে ঐ বাস্তবতার বিরুদ্ধে, সেই চিৎকার কানে বাজছে অনবরত।[৩৯৪]

কার্ফু দ্বারা বন্দিত্ব অনুভব করার জন্য নাসির দুইদিন ঘর থেকে বের হয় না। এই দুইদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্যাতন, মোনায়েম খানের নির্যাতন, ঢাকার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি কথা ভাবতে ভাবতে প্রতিরোধের শক্তি তার মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে। করাচি শহরে তিনি একা হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন,

> ঢাকা তার বুকের মধ্যকার ঢাকা প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে, ঢাকা তার বুঝের মধ্যে জ্বলছে মশালের মতন, ঐ মশাল নেভে না, কখনোই না।[৩৯৫]

নাসির ঢাকা ফেরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেননা, বাঙালির জাতীয় জাগরণের সাথে তিনিও একাত্ম হয়ে গেছেন। গল্পটিতে ঢাকা শহরে বাঙালির অভূতপূর্ব জাগরণ এবং শাসকগোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতনের সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে ব্যক্তি নাসিরের মধ্যে জাতীয় চেতনা স্ফুরণের চিত্র।

আরো দু'টি মৃত্যু (১৯৭০)

আরো দু'টি মৃত্যু (১৯৭০) হাসান হাফিজুর রহমানের প্রথম গল্প গ্রন্থ।[৩৯৬] গল্পটি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত। চলমান ট্রেনে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জকে লেখক নিপুণ কৌশলে এ গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পের সূচনাংশ নিম্নরূপ–

> নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদ যাচ্ছে যে রাত্রির ট্রেনটা, এই যে স্টেশনে এসে থামল, মাত্র দু'মিনিট দাঁড়ায় এখানে। অন্ধকার রাত কিছুই চোখে পড়ছে না। স্টেশন ঘরটার জানালা ও দরজায় যে আলোর আভাস ছিল চোখের ওপর অকস্মাৎ ঝাপটা দিয়ে চলে গেছে ট্রেন থামতে না থামতেই। কামরাগুলোর আলোকিত গহ্বরকে চারদিক থেকে মুড়ে দিয়েছে কালো রাত।[৩৯৭]

এই অংশে 'আলোকিত গহ্বরকে...কালোরাত' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গল্পের মূল বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জাতীয়জীবনের চলমানতার সঙ্গে ট্রেনকে পরস্পরিত করেছেন লেখক, যেখানে কখনো কখনো জীবনের নিরাপত্তা, মানবিক চেতনা, শুভবুদ্ধি হয় বিপন্ন, বর্ধিষ্ণু জনস্রোত কখনো হয়ে ওঠে ধারণ-অযোগ্য এবং কখনো উচ্চারিত হয় 'এহানে জাগা নাই, এহানে জাগা নাই'।[৩৯৮] কিন্তু জীবনের গতি এতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে না, যথাসময়ে ঘণ্টি বেজে ওঠে স্টেশনের, ট্রেনের চলার গতিও থাকে অপ্রতিহত। এভাবেই একটা শ্বাসরুদ্ধকর সামাজিক অবস্থা ও তার মর্মন্তুদ প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে গল্পে।

ট্রেনের স্টেশন ত্যাগের মূহূর্তে এক হিন্দু ভদ্রলোক ও প্রায় ত্রিশ বছর বয়সের এক মহিলা ট্রেনে ওঠেন। মেয়েটি ছিল সন্তান সম্ভাবা। বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যায় অন্তর্ময় অনুভবের উন্মোচন ঘটেছে, '...একজন প্রসব-উন্মুখ মেয়েকে পথ হাঁটিয়ে আনা, গাড়ির ঝাঁকুনিতে অন্য কোথায়ও নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। এদের সম্পর্কে অন্তত এতটুকু কল্পনাতে আসেনি আমার। কিন্তু এখন ভাবতেই সারা দেহ শির শির করে উঠল। কেমন মানুষ। লোকটাকে ধিক্কার দেব মনে করলাম, মনে করলাম অভিসম্পাত করবো। সেজন্য মুখ ফেরালাম। কিন্তু তখনি মনে হলো এ-ছাড়া হয়তো এদের কোনও উপায় ছিল না। মৃত্যু এদের সবদিক ঘিরে আছে।'[৩৯৯]

৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এই দম্পত্তি বাধ্য হয়েছিল ঘরবাড়ি ত্যাগ করতো। ত্যাগ না করলেও তাদের মৃত্যু ছিল অনিবার্য। বাঁচার আশায় তারা বাড়ি ছেড়ে ছিল। তারা নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদ ট্রেনের যাত্রী হলো। সেই সূত্রে বক্তা বলেন,

> ট্রেনটা নিরাপদ, এমন মনে করার কোনো কারণ আছে বলে ভাবা যায় না। ট্রেনেও খুনখারাবি হচ্ছে। একজন হিন্দুর পক্ষে বিপদটা এখানেও কম নয়। লোকটা এ কথা জানে বলেই মনে হলো। উটপাখি যেমন বালুতে মুখ লুকিয়ে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করে, তেমনি আমাদের কারো দিকে একবার পর্যন্ত না তাকিয়ে ভয় আর আশঙ্কা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখছে মনে হলো।[৪০০]

কিন্তু সেই আশা তাদের আর পূরণ হয়নি। গল্পে প্রসবযন্ত্রণাকাতর মেয়েটি এক পর্যায়ে দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হয়, 'মেয়েটা সেখানে থাকতে পারলা না আর। বেদনা এখন সারা দেহে সংক্রমিত হয়ে পেশীগুলো উৎক্ষিপ্ত করছে। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পায়খানার ভেতর চলে গেল, নিজেকে প্রাণান্ত চেষ্টায় হেঁচড়িয়ে টানতে টানতে।'[৪০১]

একটা নবজন্মের সম্ভাবনা ও ফলাফল দর্শনের জন্য উদগ্রীব বর্ণনাকারী ট্রেনের শেষ গন্তব্যে পৌঁছে অবিশ্বাস্য ও ভয়ঙ্কর পরিণতি প্রত্যক্ষ করে। পায়খানার ভেতর এক অদৃশ্য হিংস্র দানবের পৈশাচিক নখর নির্মমভাবে হত্যা করেছে মেয়েলোকটিকে, তার গর্ভনিহিত নবজীবন সম্ভাবনাকে। মাতৃত্বের এই করুণ পরিণাম বাঙালি জাতির স্বদেশভূমির সঙ্গে পরস্পরিত হয়েছে যেন–যার অন্তর্নিহিত নবজীবন সম্ভাবনা বার বার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্মম নখরে হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। কাহিনির অভ্যন্তরে মৃত্যু রহস্যের উন্মোচন হয় এক আসন্নপ্রসবা নারী ও তার আগত-প্রায় সন্তানের বীভৎস মৃত্যুতে।

গল্পে আশ্রয়হীন, মৃত্যু-চিন্তায় অস্থির, চারদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা অথচ মরতে চাচ্ছে না, পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংগ্রামশীল–এমন একটি পরিবারের অবস্থা চিত্রায়ণ করা হয়েছে। গল্পে মূলত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ৪৭-এর পর থেকে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করতো। এর ফলে সাধারণ মানুষের সম্পদ ও জীবনের ক্ষয় হতো। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চিরকাল ছিল তা নষ্ট হয়। লেখক শাসকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্র বাংলার মানুষের সমানে তুলে ধরেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীন প্রচেষ্টা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা তুলে ধরে ধারণ মানুষকে সচেতন করেন।

বাংলাদেশ কথা কয় (১৯৭১)

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনের মতো শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পসঙ্কলন *বাংলাদেশ কথা কয়* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির সম্পাদকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য,

> ভাষা আন্দোলন থেকে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্য নানা মোড় ফিরেছে, সমৃদ্ধ হয়েছে, জনমানসের প্রতিরোধ চেতনাকে বিস্তার লাভে আরও সাহায্য করেছে। বর্তমানে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের গল্প ও কবিতা ভূমিকা তা গৌণ নয়। *বাংলাদেশ কথা কয়* গ্রন্থে সন্নিবেশিত বাংলাদেশের কয়েক তরুণ ও প্রবীণ কথাশিল্পীর লেখা গল্পগুলো তাই নিছক যুদ্ধ-সাহিত্য নয়; বরং বাঙালী জাতীয় মানসের বর্তমান বিপ্লবী প্রতিরোধ চেতনার কয়েকটি রূপরেখা।[৪০২]

সঙ্কলনটিতে মোট ১৬টি গল্প স্থান পেয়েছে। এসব গল্পে মুক্তিযুদ্ধের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ষাটের দশক বাংলাদেশের ছোটোগল্পে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে এ দশক অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্র-পত্রিকাও এ সময় থেকেই প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হতে থাকে। দেশে আসতে শুরু করে বিদেশি প্রগতিশীল সাহিত্যের অনূদিত গ্রন্থাদি। গল্পকারের সংখ্যাপ্রাচুর্যেও এ দশক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সময়ে ষাটের দশকের ধারাই আরও গতিশীল হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত নতুন নতুন গল্পকারের[৪০৩] আবির্ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ছোটোগল্পের জগৎ। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প শক্তিশালী অবস্থান করে নয়। পুরো পাকিস্তান আমলে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মুর্তজা বশীর, আবদুল গাফফার চৌধুরী, জহির রায়হান, রাবেয়া খাতুন প্রমুখ গল্প লেখার মাধ্যমে সমাজের অসংগতিগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। এইভাবে মনন চর্চার মাধ্যমে সাধারণে মানসগঠনে তাঁরা সহায়তা করেন। পরিবর্তিত মানস নিয়ে বাঙালি জাতি তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন দেশ অর্জনের পথে অগ্রসর হন। যেখানে তাদের শাসক অন্য কেউ হবে না। নিজেদেরকে ভাগ্য নিজেরা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তারা এ পথে অগ্রসর হন।

প্রবন্ধ

একটি জাতির মনন বা চিন্তাচর্চার ইতিহাস জানার পক্ষে প্রবন্ধসাহিত্যের গুরুত্ব অত্যধিক। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় অনেক লেখক-সাহিত্যিক পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং পাকিস্তানকে নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাই প্রথম শুধু প্রথম দিকে নয়, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রাবন্ধিকদের মধ্যে একটি দোলাচল ছিল। কিন্তু ৫২-এর পর সংখ্যাগরিষ্টের চিন্তা জগতে পরিবর্তন আসে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত প্রবন্ধকারদের মধ্যে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, ক্ষোভ, আত্মজিজ্ঞাসা, মানসিক টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে জাতির মানস-বিকাশ প্রক্রিয়া চলে তার ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে।

৬০-এর দশকে পূর্ব বাংলায় যাঁরা প্রবন্ধচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন মানসপ্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তাঁদেরকে মোটাদাগে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমদলের মত হলো উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথা অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন থেকেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে এর পূর্বাংশের অধিবাসীদের কর্তব্য হলো এক 'পাকিস্তানি' সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য কাজ করা। অর্থাৎ এই ধারার প্রাবন্ধিকরা প্রায় সকলেই স্বতন্ত্র পাকিস্তানি/পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা[৪০৪] ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার কথা বলেছেন।

দ্বিতীয়ধারা প্রাবন্ধিকগণ প্রায় সকলেই পাকিস্তানকে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। এরা প্রাথমিকভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকলেও রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব ও ভূমিকাই এঁদের অবস্থান স্পষ্ট হয়।[৪০৫]

দেশ বিভাগের পর প্রথমেই ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালির মাতৃভাষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। অথচ বাঙালিত্বের সাথে মুলমানিত্বের কোনো দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি প্রাবন্ধিকগণ প্রথম পাকিস্তানি ধারার বিপক্ষে গিয়ে প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। ভাষা বিতর্কে প্রথম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রবন্ধে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় এ প্রবন্ধে তিনি বলেন,

> কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ... ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্ত প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং বাংলা; কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেই মাতৃভাষারূপে চালু নয়। ... যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।[৪০৬]

ভাষা আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকীতে আবদুল্লাহ আল-মুতী তাঁর 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) প্রবন্ধে বলেছেন,

> একুশে ফেব্রুয়ারীর পেছনে দেশজোড়া এই বিপুল জমায়েত সম্ভব হয়েছিল, কেননা এ-তো শুধু ভাষা আর সংস্কৃতির প্রশ্নই ছিল না, এর সাথে জড়িত ছিল আমাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনতার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী, বাঙালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নও।'[৪০৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী পূর্বাঞ্চলের প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক মনোভাব প্রদর্শন করে। তার সূত্র ধরে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপনিবেশবাদী চরিত্রটি ক্রমে পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। শুধু ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নেই নয়, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলা এই বৈষম্য-বঞ্চনার শিকার হয়। যার অশুভ প্রতিক্রিয়া একদিকে যেমন কৃষি-শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ এতদঞ্চলের জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে, তেমনি অন্যদিকে পূর্ব বাংলার মানুষকে পাকিস্তান রাষ্ট্র-কাঠামোর অধীনে তাদের প্রকৃতি অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কেও সচেতন করে তুলতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে আবদুল গনি হাজারী তাঁর *বন্দী বিবেক* গ্রন্থের 'পাকিস্তানী আদর্শ' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্তানের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই করাচীর কল্যাণে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের কাজ চলেছে অকল্পনীয় দ্রুততার সঙ্গে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে কঠিনতম প্রতিযোগিতার আঘাতে পূর্ব বাংলার মধ্যম শ্রেণীর (পূর্ব বাংলার সব ব্যবসায়ীই মধ্যম শ্রেণীর) ব্যবসায়ীরা ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে হয়েছে উৎখাত। পূর্ব পাকিস্তানের কৃষির প্রতি অমার্জনীয় অবহেলা কৃষককে করে তুলেছে নিরন্ন, শিল্পোন্নয়নে গাফিলতির জন্য বেকার সমস্যা হয়েছে প্রকট, শিক্ষার ভবিষ্যত হয়েছে অন্ধকার। সকলের শেষে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যখন শুনলো তাদের স্বপ্নের পাকিস্তানে তাদের নিজ ভাষার পর্যন্ত কোন অধিকার নেই তখন তাদের আর কোনই সন্দেহ রইল না যে, যাদের হাতে তাদের শাসনভার অর্পণ করা হয়েছে তারা তাদের মিত্র নয়, তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে কোনই সম্পর্ক নেই। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক আলোড়ন দেখা দিল তার কারণ এইখানে।[৪০৮]

পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর ভাষা ও সাংস্কৃতিক অবদমন, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের অস্বীকৃতি, এসবের পেছনেও আসলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করে। আর ধর্মকে এক্ষেত্রে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। পাকিস্তানি শাসকদের তরফে তাদের শোষণ-শাসনের স্বার্থে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং ভাষা ও সংস্কৃতির

প্রশ্নেও নিজস্ব ঐতিহ্য বা স্বকীয়তার নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা, এ-সম্পর্কে আবদুল গনি হাজারী তাঁর 'পাকিস্তানি আদর্শ' (১৯৫৮) প্রবন্ধে লিখেছেন,

> ইসলামকে কার্যকরীভাবে তাঁদের কুটিল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার যে উপায় তাঁরা উদ্ভাবন করলেন, তা হলো দু-মুখী। একদিকে তাঁরা রাজনৈতিক ফ্রন্টে ইসলামের নামে শোষক ও শোষিতের সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে 'কায়েদে আজম' ও ' কোরান-সুন্নার'র (দেশ বা জনগণের স্বার্থে নয়) আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান করবেন এবং রাষ্ট্রের শৈশবাবস্থায় সকল প্রকার দাবী-দাওয়ার কথা ভুলে থাকবার উপদেশ দেবেন; অন্যদিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফ্রন্টে এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে গণমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তাদের সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্দোলনকে বানচাল করে দেবেন এবং এইভাবে শাসকবর্গের শোষণসহ কৃষ্টির ধারা প্রবাহিত করবেন তাদের মধ্যে।[৪০৯]

শাসকদের এই রাজনৈতিক কৌশল, সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ধর্ম বা তার নাম ব্যবহার পুরো পাকিস্তান আমলে অব্যাহত থাকে। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তন ও রোমার হরফ ব্যবহারের প্রয়াস চালায়। পাকিস্তান জাতীয় শিক্ষা কমিশন পাকিস্তানি ভাষায় রোমান হরফ গ্রহণ করা সম্পর্কে মতামত যাচাইয়ের জন্যে ১৯৫৮ সালে এনামুল হক-এর কাছে প্রশ্নমালা প্রেরণ করে। এনামুল হক এর বিরোধিতা করে উত্তর দেন।[৪১০] তবে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর প্রকাশিত রিপোর্টও বাংলা লেখায় রোমান হরফ ব্যবহারের বিপক্ষে মত দেয়।[৪১১] শুধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নয়, এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশ তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী যতবেশি ষড়যন্ত্র করেছে, পূর্ব বাংলার মানুষ ততই আরও বেশি করে প্রতিরোধ করেছেন। ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার চেতনার পথ বেয়েই পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রাম পরবর্তীকালে জাতীয় স্বাধীনতা বা মুক্তির লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়।

পাকিস্তানি সরকার লেখকদের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে হরণ করেছিল। অনেক লেখককে কারাগারে পর্যন্ত পাঠানো হয়েছিল।[৪১২] লেখককের স্বাধীনতার জন্য বাঙালি লেখকবৃন্দ আন্দোলন সংগ্রাম করছিল। তেমনি একশ্রেণির লেখক ছিলেন যারা স্বাধীনতাকে একটা গণ্ডির মধ্যে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। শুধু তাই নয়, লেখার বিষয়বস্তুর হিসেবে এই শ্রেণির লেখক পাকিস্তানি আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে বেছে নেওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ পাকিস্তানিবাদী ভাবধারা রূপায়ণের জন্যে ইসলাম ধর্মকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুখ্য নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করে মুসলমানদের জীবন-ভিত্তিক, আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দবহুল বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা ও নতুন বাংলা ভাষা নির্মাণে সচেষ্ট হয়।[৪১৩] আবদুল হক মনে করেন, অনাবশ্যক আরবি-ফারসি শব্দের প্রতি মোহ অযৌক্তিক। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> পাকিস্তান কায়েম হওয়ার দরুণ অঢেল আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ আমদানীর যৌক্তিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই, কিন্তু আমি সাহিত্যিকদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যে- কোন ভাষার শব্দ এনে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করা এবং তার প্রকাশ ক্ষমতাকে প্রসারিত করার অধিকার তাঁদের আছে।... যে সব শব্দ অপরিহার্য নয় এবং আমরাও বুঝি না সে সব শব্দের বিশাল বোঝা যদি আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রতিবাদ না করে উপায় নেই,...।[৪১৪]

১৯৫৮ সালে 'সভ্যতার পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন,

> ...সাহিত্যিক-শিল্পীদের চিন্তা-ভাবনা-ধ্যান-ধারণাও আজ রাজনীতির প্রভাবমুক্ত নয়। আমরা কি লিখলে এবং কেমন করে লিখলে আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালক তথা রাজনীতিবিদদের সুবিধে হবে, অন্তত তাদের বিরাগ উৎপাদন করবে না, তা-ও আজ আমাদের সমস্যা।[৪১৫]

অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মধ্যে দিয়ে মননচর্চায় আসে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা। একজন সচেতন, স্বাধীনচেতা লেখককের পক্ষে এ পরিস্থিতিতে চুপ থাকা খুব কঠিন। তাই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে আবুল ফজল রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময় অভিমত প্রদান করেছেন।

লেখকের স্বাধীনতার প্রশ্নে গোলাম মোস্তফা বলেছেন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে পারে না। এ-প্রসঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের প্রতি' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৯৬০) লিখেছেন,

> অনেকে বলবেন : সাহিত্যে ও শিল্পে স্বাধীনতা চাই, নইলে নব সৃষ্টি সম্ভব নয়। একথা কিছুটা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। সম্পূর্ণ মুক্তির মধ্যে সৃষ্টি অসম্ভব। প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা বা গণ্ডী আছে। তার মধ্য থেকেই সে তার গুণাবলী প্রকাশ করে।... লেখকদেরও যদি সেইরূপ একটা বাউণ্ডারী লাইন থাকে, তাতে ক্ষতি কি? উচ্ছৃঙ্খলতার নাম স্বাধীনতা নয়।...[৪১৬]

তিনি বাংলা সাহিত্যের কল্যাণের জন্য স্বাতন্ত্র্য সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। পাকিস্তানি মাল-মশলা নিয়ে এমন সাহিত্য রচনার কথা তিনি বলেছেন, 'যা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে অনায়াসে পরিবেশন করা যাবে।'[৪১৭] তাঁর মতে সাহিত্যে এই স্বাতন্ত্র্যের দাবি বা আহ্বান সঙ্কীর্ণতা বা পশ্চাৎমুখিনতার পরিচায়ক নায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমরূপতা বা conformity-ও দাবিকে আবদুল হক অপরিণত সাহিত্যরুচিই লক্ষণ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষাগত অনগ্রসরতা সবসময় এর প্রধান কারণ নয়। এ-প্রসঙ্গে *ক্রান্তিকাল* গ্রন্থভুক্ত 'সাহিত্যিকের সমস্যা' (১৯৬২) তিনি বলেছেন, 'আমাদের সমাজ যদি উন্নত সাহিত্যের প্রত্যাশা করে তবে তার সাহিত্যরুচিকে আরও বিকশিত উন্নত হতে হবে, যাতে সমাজ নন-কনফরমিষ্ট সাহিত্যকে উদারতার সংগে সহ্য করতে ও বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে।'[৪১৮] পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন সমাজের সাহিত্যরুচি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে আবদুল হক লিখেছেন, 'এই সমাজ শিক্ষার দিক দিয়ে একাদশ থেকে পঞ্চদশ পর্যন্ত ইরানী সমাজ, বা সপ্তদশ শতাব্দের ইংরেজ সমাজ, বা ঊনবিংশ শতাব্দের হিন্দু সমাজের চাইতে অগ্রসর, কিন্তু এইসব সমাজের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানী সমাজের সাহিত্য-রুচি অনেক বেশী অবিকশিত।'[৪১৯] 'সাহিত্যিক মূল্যবোধ' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুল হক বলেছেন,

> কোনো দু'জন সৎ সাহিত্যিকই একভাবে অনুভব ও চিন্তা করেন না, এক রকম লিখতে চান না, এবং শক্তিমানেরা সর্বত্রই স্বতন্ত্র পথের পথিক।...কিন্তু এজন্যে যে স্বাধীন পরিবেশের প্রয়োজন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তানে তার অভাব হয়েছে। কি আদর্শের পথিক হতে হবে বা হবে না, কি রকম শব্দ ব্যবহার করতে হবে, অথবা করতে হবে না, তা অনেক সময়ে বলে দেওয়া হয়েছে কঠোর কণ্ঠে এবং নিরাপোষ ভঙ্গীতে।[৪২০]

তিনি আরও বলেছেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ রকম যে সমস্যাগুলো এসেছে তা ছিল মূলত রাজনৈতিক। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর শুরু করেছেন সাহিত্যিক সম্প্রদায়েরই একাংশ।

বহুবিবাহকে নিয়ন্ত্রিত এবং বিবাহ নিবন্ধীকরণের শর্ত-যুক্ত করে 'মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্স ১৯৬১' জারির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন,

> ইহা অত্যন্ত আশাপ্রদ যে, আমাদের সদাশয় জাতীয় সরকার এই নারী কল্যাণের প্রতি অবহিত হইয়াছেন। মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সে মুসলিম নারীকে অহেতুক তালাকরূপ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত এবং সতিনীরূপ ঘরের বাঘিনীর কবল হইতে রক্ষার জন্য বিধান করা হইয়াছে। যদি জমি-জমা কেনা বেচার জন্য দলিল ও রেজিষ্টারির প্রয়োজন হয়, তবে বিবাহের বেলা তাহার দোষ হইবে কেন? ইহাতে বিবাহ বিভ্রাট বন্ধ হইবে।[৪২১]

কিন্তু এই বিষয়টিকে সর্বস্তরের মানুষ ইতিবাচকভাবে নেননি। বিশেষ করে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও ধর্মী নেতারা এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তারা মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১-কে কুরআন পরিপন্থি বলে অবহিত করেন।[৪২২] কারণ এই আইনের ফলে তারা ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে আর ব্যবহার করতে পারবে না।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রধানত ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রগতিশীল লেখকগণ বরাবরই ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ভেদ টানার নীতি অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে মুখে আবুল ফজল কথা বলতে হয়।

আবুল ফজল 'ধর্ম' কথাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মানুষের প্রকৃত ধর্ম হলো মানুষ্যত্ব। আর তার ধর্মচর্চার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই মানুষ্যত্বের সাধনা। প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রচলিত ধর্ম যেখানে এই মনুষ্যত্ব-সাধনার বিপক্ষে দাঁড়ায় সেখানে তিনি বরং ধর্মকে বর্জন করে মানুষ্যত্বের পথ গ্রহণের পক্ষপাতী। এ-প্রসঙ্গে *সাহিত্য ও*

সংস্কৃতি সাধনা গ্রন্থেও 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'বৃক্ষের বৃক্ষত্ব কাকের কাকত্ব ব্যাঘ্রের ব্যাঘ্রত্ব তার ধর্ম, তেমনি ব্যাপক অর্থে মানুষের মানুষ্যত্বই তার ধর্ম।'[৪২৩] তিনি এ সম্পর্কে আরও বলেছেন, 'আজকের দিনে কোন সভ্যতাই ধর্ম-ভিত্তিক হবে না, হতে পারে না। দেশ তথা রাষ্ট্র-ভিত্তিকই হতে হবে।'[৪২৪]

রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বৈরাচারী ও নিবর্তনমূলক চরিত্রের কারণে রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির 'হিন্দুয়ানি' ঐতিহ্যের প্রতি পাকিস্তানি শাসক ও তাঁদের এতদঞ্চলীয় সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের বৈরী ও আক্রোশী মনোভাবের মোকাবেলায় সমন্বয়পন্থি বা উদারভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যাঘাত বা প্রতি-আক্রমণের পরিবর্তে প্রায়শ রক্ষণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করতে হয়।[৪২৫] অবশ্য রবীন্দ্রনাথসহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান ঐতিহ্যের প্রতি অঙ্গীকারের প্রশ্নে সমন্বয়পন্থি লেখকরা যে সকলেই সবসময় কৌশলী বা সম্পূর্ণ রক্ষণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করেছেন তা নয়। এ ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বা দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি সমালোচনাও তাঁদের কেউ কেউ[৪২৬] কখনো কখনো করেছেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং স্বাতন্ত্র্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের উদ্যোগে তথাকথিত পাকিস্তানি বা পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্যের জন্য নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের বিকল্প বা প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী 'সংস্কৃতি সংকট' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> ...এঁদের অর্থাৎ এই তমদ্দুনপন্থীদের ফতোয়ায় রবীন্দ্রনাথ বা মধুসূদনকে গ্রহণ করা মানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, ইসলামের বিদ্রোহী হওয়া ইত্যাদি। তাই তার পিছনে লাগাও গোয়েন্দা, লাগাও গুণ্ডা। কিন্তু এঁদের এই মিথ্যার বেসাতিও আজ অচল হয়ে পড়েছে। এঁদের ভ্রুকুটি ও আস্ফালনকে উপেক্ষা করে সমস্ত পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের কবি বলে গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণ রবীন্দ্র জন্মতিথিতে দিকে দিকে মহাসমারোহে কবির জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান এবং তাঁর প্রতি সকল পূর্ব পাকিস্তানীর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথও আমাদের কবি, নজরুলও আমাদের কবি, কিন্তু সে ঐ তমদ্দুনপন্থীদের ফতোয়ার জোরে নয়। আমাদের মাতৃভাষায় তাঁদের যে অসামান্য অবদান রয়েছে তার দৌলতে।[৪২৭]

রাজনৈতিক বিভাজনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েও, কিংবা তাকে যৌক্তিক বলে মনে করেও, বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক অবিভাজ্য গণ্য করে এবং রবীন্দ্রনাথের ওপর পশ্চিমবঙ্গবাসীর মতো পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরও সমান অধিকার বলে প্রবন্ধকার মনে করেন। ১৯৬১ সালের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কার্যক্রমসহ সকল গণতান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রামে অন্যান্যদের মতো আবুল ফজল পুরোধার ভূমিকা পালন করেন।

আবদুল হক ১৯৬৩ সালে *সমকাল*-এ 'বাঙালী মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি' প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের 'সত্তাহীনতা'র উল্লেখ করে লেখেন,

> ...বাঙালী মুসলমান আত্মপ্রতিষ্ঠ ছিল না, তার বাঙালীসত্তা লক্ষণীয় ছিল না। অতীতে ছিল না এবং এখনও খুব লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি।...এই অপ্রতিষ্ঠা, এই সত্তাহীনতা বাঙালী মুসলমানের গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়েছে, শুধু অতীতে নয়, এখনও হচ্ছে, এবং সাধারণভাবে স্বীকার করা না হলেও এর সঙ্গে তার অস্তিত্বেও প্রশ্নও জড়িয়ে আছে।
>
> বাঙালী মুসলিম-জীবনের এ সমস্যার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, বাঙালী মুসলমান তার দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে নিজেকে প্রবলভাবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে, অকুণ্ঠিতভাবে এবং সগৌরবে নিজেকে বাঙালী বলে ঘোষণা করেনি। ঘোষণা করার কথাও তাঁর মনে লক্ষণীয়ভাবে জাগেনি। আর এই কারণে বাঙালী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার ইতিহাস ব্যর্থতায় সমাকীর্ণ। এ ব্যর্থতা কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই।[৪২৮]

অর্থাৎ ষাটের দশকে এসেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাঙালির মুসলমানের আত্মপরিচয়ের যে সংকট তা পুরোপুরি কাটে নি। আবদুল হক এ সময় বাঙালি জাতির আত্মসমালোচনা করে জাতিকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন।

ইংরেজ আমল থেকে বাংলার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে বাঙালি ভাবার থেকেও বেশি হিন্দু বা মুসলমান বলে ভেবে এসেছেন। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের একটা

প্রচেষ্টা শুরু হয়। আত্মানুসন্ধানের সে-প্রক্রিয়ায়ই বাঙালির স্বাদেশিক চেতনার উন্মেষ এবং ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে তা সর্বক্ষেত্রে প্রবলভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। বিশেষ করে, শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ঘোষণা ও প্রচারের মাধ্যমে বাঙালির আত্মপরিচয় সংকট পুরোপুরি দূর হয়।

বাঙালিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্য। তবে ঐতিহ্যের নামে সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে থাকার বিরোধিতা করে আবুল ফজল *সমকালীন চিন্তা* (১৯৭০) গ্রন্থে। এমনকি ঐতিহ্য যেখানে অপরিসীম গৌরবের, সেখানেও তার অনুবর্তনে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে, ঐতিহ্যের কাছ থেকে প্রেরণ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার, নতুন নতুন গৌরব সৃষ্টির আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে 'মাতৃভাষার দাবী ও একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৬৩) প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল,

> যে জাতি ইতিহাসের অসংখ্য স্বর্ণ-স্বাক্ষর পড়েনি, একটি মাত্র স্মরণী তারিখের জাবর কেটেই যাদের বার্ষিক চক্রাবর্তন, সেজাতি অত্যন্ত হতভাগ্য, তারা ইতিহাসের করুণার পাত্র।...একুশে ফেব্রুয়ারী আজ আমাদের ঐতিহ্যে পরিণত। এ ঐতিহ্য থেকে আমরা প্রেরণা সংগ্রহ করবো, সঞ্চয় করবো শক্তি ও সাহস। কিন্তু আমাদের পদক্ষেপ হবে সামনের দিকে, দৃষ্টি থাকবে ভবিষ্যতের পানে এবং আমরা এগিয়ে যাবো মহত্তর ত্যাগের নবতর সংকল্প বুকে নিয়ে। এভাবে ইতিহাসের পাতায় সংযোজিত হবে আরও নতুনতর স্মরণীয় তারিখ...[৪২৯]

রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের বিসদৃশ ভৌগোলিক বাস্তবতা–দুই অংশের মধ্যে হাজার মাইলেরও বেশি ভূখণ্ডগত ব্যবধান এবং ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির পার্থক্য সম্পর্কে এদেশের প্রাবন্ধিকগণ সকলেই কমবেশি সচেতন ছিলেন। পাকিস্তানের বিশেষ ভৌগোলিক বাস্তবাতায় রাষ্ট্রের দুই অংশের জন্য আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অত্যাবশ্যকতার কথা বলতে গিয়ে আবুল ফজল ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের দিনগুলোর অভিজ্ঞতা স্মরণ করে দিয়েছেন।[৪৩০]

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৬ দফা দাবি উত্থাপন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার জনমাসনে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা প্রবল রূপ নিতে থাকে। এ-সময় থেকে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি বড়ো অংশ নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে দেখা যায়।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলোকে ব্যবহার করে বাঙালির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর এই সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বদরুদ্দীন উমর। তিনি সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬), সংস্কৃতির সংকট (১৯৬৭) ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৮) এই তিনটি গ্রন্থ লিখে শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনা সম্পর্কে বাংলার সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সক্ষম হন। ষাটের দশকে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লিখতে গিয়ে আইয়ুব-মোনায়েম সরকারের রোষানলে পড়ে বদরুদ্দীন উমর এতটুকু উপলব্ধি করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর পক্ষে বেশি দূর কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রী রক্তচক্ষু থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্যই তিনি শিক্ষকতা ছেড়েছিলেন।

পাকিস্তান আমলে বাঙালি পরিচয় সংকট এবং সেখান থেকে পাকিস্তানি মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে আত্মপরিচয়ের সংকটকে তীব্রতর করেছে। এ-প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর *সংস্কৃতির সংকট* (১৯৬৭) গ্রন্থে 'বাঙালী সংস্কৃতির সংকট' প্রবন্ধে বলেছেন,

> 'ইংরেজ বিদ্বেষের ফলে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে হয় বিরূপ মনোভাবাপন্ন। আবার হিন্দু বিদ্বেষের ফলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বাংলার সংস্কৃতি থেকেও নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য ও বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রায় অস্বীকার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা গঠন করতে উদ্যত হয় তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি।'[৪৩১]

বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনকে দেখেছেন পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানের 'স্বদেশে পরবাসী মানসিকতার পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ' হিসেবে, যদিও তাঁর মতে এই পরিবর্তনের সূচনা আসলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। এ সম্পর্কে তাঁর *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৮) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য,

> ... পূর্বে উর্দু না জানলে কোন মসলমানই সদ্বংশজাত বলে পরিচিত হতেন না। শুধু তাই নয়, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা এ কথা স্বীকার করলেও তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতো। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাঙালী মুসলমান 'মুসলমান বাঙালী'তে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো এবং সমস্ত সংস্কার বর্জন করে, উর্দুকে নিজের ভাষা হিসেবে বাতিল করে, বাংলাকে স্বীকার করলো মাতৃভাষা রূপে। এইভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের জীবনে সূত্রপাত হলো এক অভূতপূর্ব চেতনার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন সত্যিকার বিপ্লব ঘটে থাকে তাহলে এই হলো তার সঠিক পরিচয়।[৪৩২]

বদরুদ্দীন উমর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর হিসেবে ১৯৬৮ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন।[৪৩৩] বদরুদ্দীন উমর ও তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ সম্পর্কে শামসুর রাহমান বলেছেন,

> অন্ধকার, পশ্চাৎপদতা, হাতাশা যতই হামলা করুক, তবু আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে বদরুদ্দীন উমর রচিত 'সাম্প্রদায়িকতা', 'সংস্কৃতির সঙ্কট', সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়িকতা', 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি...ইত্যাদি।[৪৩৪]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকগোষ্ঠী অন্যান্য বিষয়ের মতো ভাষা ও সাহিত্যে ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। বাংলা ভাষায় হিন্দুয়ারিন প্রভাব চিহ্নিত করে যা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হতে পারে না। এর জন্য তারা বাংলা ভাষা বিশেষ করে তার বর্ণমালা ও বানানের সংস্কার, এমনকি আরবি বা রোমান হরফে বাংলার লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। শাসকগোষ্ঠীর অভিসন্ধির সঙ্গে লেখকদের অনেকের মতের মিল হওয়ায় তারা এ উদ্যোগের শামিল হন। দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার 'বিভক্তি'কেও স্বাভাবিক ও অনিবার্য বলে মনে করেছেন কবি গোলাম মোস্তফা। এ-সম্পর্কে তাঁর 'পাক বাংলার ভাষা' (১৯৫৮) প্রবন্ধে লিখেছেন, 'নিতান্ত দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান হাসিল হবার পরও আমরা কিন্তু সেই পণ্ডিতী বাংলাকেই আমাদের সাহিত্য ও ধ্যান-ধ্যারণার বাহন করেছি। ফলে পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে আমাদের অসংগতি দেখা দিয়েছে। এই বিড়ম্বনা থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে।'[৪৩৫] তিনি ইসলামী ভাষা তথা আরবি, ফারসি ও উর্দুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই মুক্তির কথা বলেছেন। অন্যদল লেখক ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে। বাংলা ভাষা সংস্কার নিয়ে প্রবন্ধকারগণের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক হয়।

দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি হওয়ার স্বার্থে পূর্ব বাংলার মানুষের 'বাঙালি'–এই স্বতন্ত্র ভাষিক পরিচয় কিংবা নিজস্ব জাতীয় সত্তাকে গৌণ করে তোলার দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা আবদুল হক তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে স্পষ্টভাবেই করেছেন। আর এক্ষেত্রে বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে পাকিস্তানি নাগরিক পরিচয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব তিনি দেখেননি। এ-প্রসঙ্গে 'ভাষা স্বদেশ সত্তা' প্রবন্ধে (১৯৬৭) ব্যক্ত মতামত এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য,

> ...আমার পক্ষে বোঝা কঠিন, কোনো ব্যক্তি বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পাঠান ইত্যাদি না হয়ে পাকিস্তানী হতে পারেন কি করে, কেননা বাস্তব সত্য এই যে, এইসব ভাষাগোষ্ঠীর সমবায়েই পাকিস্তান-রাষ্ট্র গঠিত। পাকিস্তানী বলেই তাদের এসব পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যায়নি; হবে অথবা হওয়া সম্ভব অথবা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলেও মনে হয় না।[৪৩৬]

আবুল হাশিম তাঁর 'বাঙলা সাহিত্য' (১৯৬৮) শিরোনামের একটি প্রবন্ধে ভাষা সংস্কারের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। প্রবন্ধটিতে আবুল হাশিম লেখেন,

> ক. অনেকে মনে করেন বিশেষ ভাষা বিশেষ আদর্শ ও সংস্কৃতির ভাষা, যথা আরবী ইসলামের ভাষা, এবং সংস্কৃত ও সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষা হিন্দু ভাষা। একথা সত্য নয়। অবিমিশ্র সংস্কৃত ভাষায় ইসলামের ভূয়সী প্রশংসা করা যায় এবং

আরবী ভাষায় ইসলামের নিন্দাও করা যায়। কোন একটি সমুন্নত ও সক্ষম ভাষার মাধ্যমে কোন একটি আদর্শ ও সংস্কৃতি করতে পারলে সেই আদর্শ ও সংস্কৃতি সমুজ্জ্বল হয়।

খ. বাঙলা ভাষায় যে সমস্ত বিদেশী শব্দ চালু আছে এবং বাংলা ভাষাভাষী মাত্রই যেগুলোর অর্থ বোঝেন সেগুলিকে বাংলা শব্দ বলে গ্রহণ করা কর্তব্য, সেগুলি মূলতঃ আরবী, সংস্কৃত অথবা ইংরেজী যাই হোক না কেন। এই নীতি যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে বাঙলা ভাষায় পরিভাষার কোন প্রয়োজন নাই। বাঙলা ভাষায় ফারসী ও উর্দু ছাড়া বই, কিতাব, কলম, দোয়াত, দোকান, শহীদ, জিহাদ, ছবি প্রভৃতির মত প্রায় দুই হাজার সাত শত আরবী শব্দ আছে এবং এগুলি বাঙালী জাতিধর্ম নির্বিশেষে বোঝেন ও ব্যবহার করেন। এইভাবে অফিস, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, চেয়ার, গ্লাস প্রভৃতি বহু ইংরেজী শব্দ বাঙালরি প্রতি ঘরে পরিচিত।

গ. চীনা প্রাচীর আজকের যুগে নিরর্থক এটা আজকের একটি শিশুও জানে। শিল্পের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কোনও একটি দেশের কোন একটা শিল্পকে বাহিরের প্রভাবমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তার চারি দিকে ভাবের চীনা প্রাচীর গড়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

ঘ. ... সাহিত্য ও শিল্প আদর্শ বা সংস্কৃতির বাহন মাত্র। বর্তমান গ্রীস তথা পশ্চিম ভূখণ্ড খৃস্টান জগত, কিন্তু সাহিত্যেও খাতিরে হোমার ও ভার্জিল খৃস্টান জগতে অতি সমাদৃত। আরব জগতে প্রাগ-ইসলামিক ইমরুল কায়েস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সাহিত্য সমভাবে সমাদৃত। ইংরেজ কবি মিলটন ছিলেন গোঁড়া খৃস্টান এবং গ্রীক দেব-দেবীর সাতে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর কাব্য 'প্যারাডাইস লষ্ট'-এ ঐ সমস্ত দেব- দেবীকে টেনে এনেছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মিলটন ঐ সমস্ত দেব- দেবীর পূজারী ছিলেন।...কাজী নজরুল ইসলাম অনেক শ্যামা-সংগীত রচনা করেছেন এবং তাঁর সাহিত্য পাকিস্তানে অতিশয় সমাদৃত। আমরা হোমার, ভার্জিল, মিলটন, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের সাহিত্যে প্রচুর সাহিত্যরস উপভোগ করি, কিন্তু ঐ সমস্ত সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার কারণে পৌত্তলিকতার ভক্ত হয়ে পড়ি না।

ঙ. বাঙলা সাহিত্যের মান নির্ধারণ করার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং এই সমস্যার সমাধান পল্টন ময়দানে অথবা ইহার অনুরূপ কোন সভা-সম্মেলনে হওয়া সম্ভব নয়। এ সমস্যার সমাধান করবেন কথাশিল্পের খ্যাতনামা শিল্পীরা। বাঙলা ভাষায় ভাষার নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা না করাই ভাল।[৪৩৭]

পাকিস্তানের মতো বহুভাষিক রাষ্ট্রে কোনো বিশেষ হরফ প্রবর্তনের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিল শাসকগোষ্ঠী। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হক বলেছিলেন, 'পাকিস্তানী ভাষাগুলির জন্যে রোমান হরফের প্রবর্তন ক'রে আমরা আমাদের হরফের তালিকায় আর একটি নতুন হরফ যোগ করবো মাত্র; তাতে জাতয়ি লাভ হবে না কিছুই।'[৪৩৮] ভাষার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সংস্কারের বিরোধী না হলেও, রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত হয়েছে *ভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত 'রোমান বনাম বাংলা হরফ' প্রবন্ধে। এ ব্যাপারে রোমান হরফের প্রবক্তাদের প্রতিটি 'যুক্তি'র চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তিনি অকাট্য তথ্য ও অব্যর্থ যুক্তির সাহায্যে তাকে নাকচ করে দিয়েছেন। সরকারি উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সেদিন পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে প্রতিবাদ হয়েছিল। আমাদের লেখক-বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই এর বিরুদ্ধে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।[৪৩৯]

আবদুল হক সাহিত্যিকের স্বাধীনতা বিষয়ে *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* (১৯৬৮) গ্রন্থের 'শিক্ষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> আমরা বলতে পারি সাহিত্য যেন কারো ধর্মভাবে আঘাত না হানে, যেন রাষ্ট্রবিরোধী না হয়, নৈতিকতা বিরোধী না হয়, এবং মানবতাবিরোধী আদর্শ প্রচার না করে, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো মতবাদই আমরা সাহিত্যিকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। ফরমায়েশ দিয়ে রেজিমেন্টেশন করে প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি সম্ভব নয়, বিপ্লবোত্তর রাশিয়া তার প্রমাণ।'[৪৪০]

আবদুল হক মনে করেন, প্রকৃত সাহিত্যিক বা সমালোচকরাই কেবল সাহিত্যের পথ-নির্দেশ বা সমালোচনার অধিকারী।[৪৪১]

আবদুল হক তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্তে' প্রবন্ধে (১৯৬৯) ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও তাকে দীর্ঘায়ত করা এবং বহিঃশক্তির আগ্রাসনকে সহায়তার ক্ষেত্রে অধীন দেশের একশ্রেণির মানুষের দাসসুলভ মনেবৃত্তির ভূমিকা উল্লেখ করে বলেছেন,

> সবদেশে সবকালেই তেমন ধরনের লোকের অস্তিত্ব থাকে। আর লেখকের মতে এই দাস-মনোভাবের মূলে কাজ করে এক ধরনের হীনম্মন্যতা এবং সেই সঙ্গে বৈদেশিক শক্তির আনুকূল্যে উপজাত ও বর্ধিত কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবোধ।[৪৪২]

ঔপনিবেশিক শক্তির তরফ থেকেও যে কবলিত দেশের জনগণের মধ্যে নিজের শক্তি ও যোগ্যতায় অনাস্থা ও শাসক জাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস জন্মাবার নিরন্তর চেষ্ট হয়ে সে-কথাও তিনি (আবদুল হক) উল্লেখ করেছেন। তারপরও লেখক মনে করেন, এতসব সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। বলেছেন, 'নানা কারণে' সময়টা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকূল এবং আধুনিক পৃথিবীতে সাম্রাজ্য ব্যাপারটির 'মধ্যযুগীয় দুর্গের মতো' পড়ো-পড়ো অবস্থা।[৪৪৩]

শুধু ভাষা ও সাহিত্যে নয়, পাকিস্তান আমলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকারে প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতি-সংকটের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ 'ধর্ম ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে লেখেন,

> ...সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করাতে গেলে আমাদের সামনে ধর্মীয় অনুসাশনের বাধা এসেছে–এটা না-জায়েজ, ওটা বেশরিয়তী ইত্যাদি। তাই আমাদের এখানে নাট-গান, ললিতকলা সুষ্ঠু ও বাধামুক্তভাবে বিকাশলাভ করতে পারেনি, তাই আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় পর্যন্ত আজও একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। অপরদিকে, আমাদের এখানে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন অংশ, আমন কি রবীন্দ্রসাহিত্যকে পর্যন্ত বর্জনের প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ–সে-সব নাকি অনৈসলামিক এই অজুহাতে।[৪৪৪]

লেখকের মতে সংস্কৃতি নিয়ে এই তর্ক-বির্তক, এসব হল 'একটা অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন চিন্তার ফল'।

শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থক লেখক গোষ্ঠী যে-সব অনুষ্ঠানকে ইসলামবিরোধী বলে প্রচার করতেন তার একটি হলো–পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ। মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৭০ সালে 'বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ' শিরোনামে প্রবন্ধে লেখেন, "উৎসবরূপে 'নববর্ষ' উদযাপনের রেওয়াজ বাঙালীর একার নয়। পৃথিবীতে সুসভ, অর্ধসভ্য অথবা অসভ্য এমন কোন জাত নেই, যাঁরা ঘটা করে 'নববর্ষ' পালন করেন না।"[৪৪৫] নববর্ষ উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো প্রায় ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বর্ষ-গণনারও আগে শুরু হয়েছে, ধর্ম এসেছে আরও পরে। সুতরাং নববর্ষ উৎসবের গায়ে যদি কোথাও ধর্মের রঙ লেগে থাকে তাবে তা লেগেছে পরে।

বাংলা নববর্ষ পালন সম্পর্কে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী 'আমাদের নববর্ষ উৎসব' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যময় জীবনধারা আছে। ইহাই তাহার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি লইয়া যদি সে বাঁচিতে না পারে তবে উহা সেই জাতির পক্ষে পরাধীনতা।...এক পক্ষ হইতে কথা উঠিবে বাঙলা বর্ষ হিন্দু সাল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বাঙলা সন হিজরী সনেরই রূপান্তর মাত্র।[৪৪৬]

আহমদ শরীফ কোনো সংস্কৃতিকে 'ইসলামি' বা অন্য কোনো ধর্মীয় নামে পরিচিত করার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন,

> নিতান্ত আদর্শানুগত্য কোন সংস্কৃতির জন্ম দিতে পাও না, এই জন্যেই সাধারণত আমরা ইসলামি সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি ও বুঝায় তাও আরব-ইরান-তুরানের দেশজ ও গোত্রজ সংস্কৃতির পাঁচমিশেলি রূপ মাত্র। তাই এর পরিচায়ক নাম হওয়া উচিত 'মুসলিম সংস্কৃতি' এবং যেহেতু এ সংস্কৃতির উদ্ভব মুসলিম মানসে এবং এর প্রতিফলন হয়েছে মুসলমানেরই আচরণে ও কর্মে, সেজন্যে রূপকল্পে ও ভাবরসে তা ইসলামি জীবনবোধের দ্বারা প্রভাবিত। তাই বলে একে ইসলামি বলার যৌক্তিকতা নেই।[৪৪৭]

গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য যেমন শক্তিশালী বিরোধী দল তেমনি স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্বকেও অপরিহার্য মনে করেছেন আবুল ফজল। আর আইয়ুব খানের আমলে বিদ্যমান পরিস্থিতি তাঁর মনে হয়েছে হতাশাজনক। বিরোধী মত প্রকাশের

দায়ে সংবাদপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ, সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকারি বিজ্ঞাপন বন্টন নীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা ইত্যাদি পদক্ষেপের উল্লেখ করে তাঁর *সমকালীন চিন্তা* (১৯৭০) গ্রন্থের 'রাষ্ট্র : সমাজ আর ছাত্র' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

> নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী আর স্বাধীন সংবাদপত্র ছাড়া সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা আজ প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সরকারী বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর না করে সংবাদপত্র শিল্পকে .. টিকে থাকা এক রকম অসম্ভব বল্লেই চলে। এখন বিজ্ঞাপন যেভাবে ও যে শর্তে বিতরিত হয় তাতে কোন স্বাধীন সংবাদপত্রের পক্ষেই অস্তিত্ব রাক্ষা করা সম্ভব নয় আদৌ।[৪৪৮]

পাকিস্তান আমলের আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়েও আবুল ফজল গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা ও মত প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে 'পাকিস্তানী জাতীয়তার ভিত্তি' প্রবন্ধে তাঁর স্পষ্ট অভিমত, 'পাকিস্তানের সমস্যা ধর্মের সমস্যা নয়–পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমতা বিধান ও নিশ্চয়তা সৃষ্টিই আমাদের একমাত্র সমস্যা।'[৪৪৯] তিনি আরও লিখেছেন,

> ধর্মের দিক দিয়ে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, যা কিছু বিরোধ রাজনীতি আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা নিয়েই।...এ দুই শক্তি এক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হলে আমাদের জাতীয়তার বুনিয়াদ কিছুতেই মজবুত ও দৃঢ়মূল হতে পারে না। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতা আর তার সুযোগ-সুবিধা দুই অঞ্চলে সমভাবে বন্টিত না হলে প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা অথবা বিচ্ছিন্নতা মনোভাবের আবসান কিছুতেই আশা করা যায় না। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বেও হাওয়াই বুলি উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তা টেকসই হতে পারে না কিছুতেই, কোথাও হয়ও নি।[৪৫০]

রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাস যেখানে, এবং দেশের রাজস্ব আয়েরও বৃহদংশর উৎস যে অঞ্চলটি, সেই পূর্ব বাংলার প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের উদাহরণ দিয়ে আবুল ফজল লিখেছেন,

> সরকারী অর্থেই কর্ণফুলি পেপার মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানকার দরিদ্র সাধারণ যে বাঁশ দশ-বারো টাকা শ'কিনতো মিল প্রতিষ্ঠার পর এখন তা কিনছে পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর টাকা দিয়ে। অনেকে ঘরের বেড়া আর চালের ছাউনি দিতে পারছে না এ কারণে। কলমের এক খোঁচায় 'শক্ত কেন্দ্র' মিলটা বেচে দিয়েছে এমন এক পুঁজিপাতির কাছে যার সঙ্গে এ অঞ্চলের রক্ত-মাংসের কোন সম্পর্কই নেই। ফলে, দুর্ভোগের শিকার হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণ; কিন্তু মুনাফার স্রোত বয়ে চলছে অন্য দিকে।[৪৫১]

ভাষা আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য 'একুশে ফেব্রুয়ারী ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৭০) প্রবন্ধে সরদার ফজলুল করিম উল্লেখ করেন,

> ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন কেবল মাত্র ভাষা রক্ষারই আন্দোলন ছিল না। ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ব-বাংলার জনতার, তার কৃষককুলের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চনার বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। আর এই ব্যাপকতার কারণেই সে আন্দোলনকে সেদিন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্তব্ধ করা যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি বছরের পর বছর তার নূতনতর উত্তরসুরীর আগমনকেও কেউ প্রতিরোধ করতে পারেনি।[৪৫২]

রোমান হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার মাধ্যমে পাকিস্তানের সংহতি জোরদার করার যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে মুহম্মদ আবদুল হাই 'শক্তিশালী পাকিস্তানি জাতি' গঠনের স্বার্থে দেশের উভয় অংশের মধ্যে 'আর্থিক ভারসাম্য' রক্ষার এবং চাকুরি ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশের মানুষকে সমান সুযোগ-সুবিধা দানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

আবুল ফজল পূর্ব বাংলার ব্যাপারে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা-বৈষম্যের তীব্র সমালোচনা করে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর *সমকালীন চিন্তা* (১৯৭০) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এসব প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসের স্বীকৃতির মধ্যেই যে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিহিত, মোটামুটি এ রকম মত ব্যক্ত হয়েছে।[৪৫৩]

১৯৭০ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় 'গোর্কি' কে নিয়ে প্রাবন্ধিক প্রবন্ধ লেখেন। *দৈনিক পাকিস্তান*-এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঘূর্ণিঝড় একটি নিবন্ধ লেখন। তার কিছু অংশ তুলে ধরছি,

> মহাপ্রলয়ংকার ঘূর্ণিঝড় ও ফলে ওঠা সমুদ্র তরঙ্গে প্রলয়-নাচন এ যে কত বড় ভয়াবহ ব্যাপার, দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তীর্ণ উপকূলভাগে এবার তার নিষ্করুণ স্বাক্ষর রখে গেছে। ইতিপূর্বে বহুবার পৃথিবীর বুকে মানুষের ব্যাপক মৃত্যুর স্বাক্ষরকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করতে আমরা দেখেছি। কিন্তু একই দিনে এত অত্যল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষে এমন আকস্মিক মৃত্যুর কাহিনী ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। হিরোশিমা-নাগাসাকির ব্যাপক মৃত্যুও এর কাছে ম্লান হয়ে গেছে।...
>
> ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস তার আকস্মিক থাবার আঘাতে লাখ লাখ আদম সন্তানের জীবনাবসান ঘটিয়ে চলে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে আরও লাখ লাখ জীবন্মৃত মানুষ।...রিলিফ কমিশনার স্বীকার না করলেও, ইতিমধ্যে যে তাদের গাফেলতির জন্য বেশ কিছুসংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে–একটু সহৃদয় চেষ্টা চালালেই তাদের বাঁচানো অসম্ভব ছিল না। এই 'মেন-মেড' মৃত্যুর দায়িত্ব তাঁরা এড়াবেন কী করে।[৪৫৪]

দৈনিক পাকিস্তান ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা। পরিস্থিতি এতই খারাপ ছিল যে তারাও বাধ্য হয়েছিল সরকারের সমালোচনা করতে।

আমাদের প্রবন্ধকারদের বেশিরভাগই সাধারণ মানুষের মুক্তি বা ভাগ্যোন্নয়নের প্রশ্নে তাদের নিজস্ব সংঘশক্তির চেয়ে বরং সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন অংশের সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ববোধের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও শহরের খেটে খাওয়া বস্তিবাসী মানুষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও তাদের নিয়তিনির্ভর জীবনযাত্রার উল্লেখ করে এঁদের কেউ কেউ এ-মর্মে মত ব্যক্ত করেন যে, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্তত নিজেদের চেষ্টায় শোষণ ও বঞ্চনার পাকচক্র থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়; সমাজের সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী এগিয়ে আসতে হবে। এ-সম্পর্কে 'কথাসাহিত্যের সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন,

> শহরগুলোর বস্তিবাসীরা অশিক্ষা-অজ্ঞতা-অক্ষমতার দরুণ জীবন-যুদ্ধে ঘায়েল হয়ে-হয়ে ক্রমে উচ্ছন্নে যাচ্ছে। খাওয়া-পরার সংগ্রাম আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠেছে।...এদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত কৃষিজীবী ও মজুর।...জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে যে-অনটন-সমস্যা এ যুগে দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের চাবিকাঠি এদের হাতে নেই। অদৃষ্টবাদের যাদুমন্ত্রের প্রভাবে এরা স্রষ্টা বা সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ করতেও ভুলে গেছে, দুঃখের দিনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও ভয় পায়–পাছে খোদা আরও রুষ্ট হন। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা এদের পক্ষ হয়ে ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে।[৪৫৫]

সাহিত্যে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের 'সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে'র মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতা সঞ্চারের ব্রত-সাধনায় আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি (আহমদ শরীফ) লেখকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।[৪৫৬] আহমদ শরীফ 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলেছেন, 'তাদের পুরোনার প্রতি যেমন মমতা ও শ্রদ্ধা থাকে, নতুনের প্রতি তেমনি থাকে ভীতি, বিরূপতা আর অবজ্ঞা।' তিনি আরও বলেছেন, 'অন্ধ সংস্কার-নির্ভর আবেগই তাদের একমাত্র অবলম্বন–যুক্তি-বুদ্ধি নয়।'[৪৫৭] অর্থাৎ সাধারণ মানুষ স্বভাবতই ঐতিহ্যপ্রিয়, প্রাচীনপন্থি ও রক্ষণশীল।

পরিশেষে বলা যায়, ষাটের দশকের আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণ সমান ছিল না। সমাজের বিভিন্ন অংশের আলাদা আলাদা শ্রেণিগত স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল। উঠতি ধনী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির আত্মবিকাশের স্বার্থে–'পশ্চিমা' শাসন ও 'বাইশ পরিবারে'র একচেটিয়া শোষণ থেকে মুক্তি; শিক্ষা, চাকুরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অসম প্রতিযোগিতার অবসানের আকাঙ্ক্ষা যেমন এর পেছনে কাজ করেছিল; তেমনি মুক্ত পরিবেশে প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চার স্বপ্নও এই শ্রেণির একটি অংশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তবে এরই পাশাপাশি সমাজের ব্যাপক সাধারণ মানুষের অন্যরকম একটি আকাঙ্ক্ষাও ছিল। তাহলো, শোষণ-বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত একটি ভবিষ্যতের। ১৯৭০-এর নির্বাচন-পূর্বকালে প্রচারিত আওয়ামীলীগের 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শিরোনামের পোস্টারের মাধ্যমে পাকিস্তানের উভয় অংশের বৈষম্যের পরিসংখ্যান জনমতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের প্রাবন্ধিকগণ রচনা করেছেন। বাঙালি জাতির মনন বা চিন্তাচর্চায়

প্রাবন্ধিকগণ তাদের লেখনি মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের লেখনি বাংলার সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছে এবং স্বাধীন দেশ গঠনের দিকে নিজেদেরকে অগ্রসর করে।

মূল্যায়ন

প্রশ্ন হলো ষাটের দশকে দেশের বেশিরভাগ মানুষই তো অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন না। তাহলে কীভাবে শুধু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও সাংস্কৃতিকগণের মমনচর্চার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হয়েছিল?

তৎকালীন সময়ে যে নাটকগুলো লিখিত হয়েছে সেগুলো গ্রাম-গঞ্জে-মহল্লায় একইসাথে মঞ্চস্থও হয়েছে। **১৯৭১** সালের ২৪ মার্চ মমতাজ উদ্‌দীনের নাটক *স্বাধীনতা সংগ্রাম* শেষ হওয়ার পর দর্শকরা সমবেতভাবে সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাসে বাধা দেওয়ার জন্য বন্দরে যায়। এই নাটক বাংলাদেশের লাখ লাখ স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী জনতাকে সেদিন সাহসী ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই বলা যায়, নাটক, উপন্যাস, গল্প ও কবিতা সবার পড়ার দরকার নেই। কারণ নাটক মঞ্চস্থ করায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলে তা বুঝতে পারে। সকলের অন্তরে নাড়া দেয়। একটা গল্প, কবিতা, উপন্যাস বা নাটক যখন লেখা হয়, তখন তা সবাই পড়ে না। পড়ে এক-দুইজন। কিন্তু এগুলোতে যে মূল বার্তা তা শিক্ষক, অধ্যাপক, শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মী বা সমাজের সচেতন অংশ ধারণ করেছেন এবং তাদের বক্তৃতা ও কথায় এগুলো প্রচার করেছেন। ফলে তা সহজেই দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমরা যদি *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সেই বিখ্যাত উক্তি 'চিনিল কেমনে' কথা উল্লেখ করি যা তৎকালীন সমাজের প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে ছিল। কিন্তু কতজন মানুষ তখন দৈনিক পত্রিকা পড়ত বা কয়জন পাঠক *ইত্তেফাকের ঐ* সংখ্যা পাঠ করেছিলেন। পাঠ করেছিলেন হয়তো কয়েকজন কিন্তু তা শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জে চায়ের আসরে, গল্পের আসরে, বিভিন্ন সেমিনার, জনসভায় বক্তৃতায় বলেছেন এবং মানুষের মুখে মুখে তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের মানসগঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

উপসংহার

রাজনীতি ও সাহিত্য সমাজেরই সৃষ্টি। সাহিত্য সমকালীন রাজনীতির সমান্তরালে সমাজ গঠন ও পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। এসবের একটি বড়ো অংশের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রাদর্শের পরিবর্তন সাধন। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিহাস তাই সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও সমাজের বিভিন্ন প্রবণতা তথা চিন্তাধারার বিবর্তনেরই ইতিহাস। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না এনে শুধু রাজনৈতিক ইতিহাসের দৃষ্টিতে কেবল ক্ষমতা দখল ও পরিবর্তন সংক্রান্ত বর্ণনা থেকে দেশের ভিতরকার অবস্থা উপলব্ধি করা যায় না। আর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কী বা কোনো কোনো ইস্যুকে মুখ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের দফা রূপে গ্রহণ করেছিলেন বা সমাজ কী চাচ্ছিলেন তা বোঝা যায় না। এ কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সংগতি রেখে সাহিত্যিক পটভূমিটি দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পূর্ব বাংলায় বাঙালিদের মধ্যে এই বোধ যখন জাগ্রত হলো যে, তারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষকদের স্থলে নতুন করে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের অধীনস্ত হয়ে পড়েছে–বস্তুতপক্ষে তখনই বাঙালির শোষণমুক্তির জাতীয় সংগ্রামের সূচনা হয় ভাষা প্রশ্নে। যুক্তিবাদী লেখকরা পরে পাকিস্তানি শাসকদের মোহজাল থেকে বাঙালিদের মুক্ত করার মানসে সমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা তথা বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটান।[৪৫৮] বাঙালি লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা যখনই উপলব্ধি করলেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোয় বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয় তখনই তা সাহিত্য শিল্পের মাধ্যমে জনগণকে বোঝাতে শুরু করেন। তৎকালীন শিল্পী-সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণ করলে এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনাবলির সংশ্লেষণ ঘটালে তা বুঝতে সহজ হয়।[৪৫৯] পাকিস্তানকালের বাংলা সাহিত্য তথা কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ও আলোচনা-সমালোচনার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করি, তাহলে দেখব–ঔপনিবেশিক, সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও খারাপ দিকগুলোকে তাতে অপূর্ব পদ্ধতিতে, শৈল্পিক বিন্যাসে উপস্থাপনপূর্বক পাঠক মনকে গঠন করে দেওয়া হয়েছিল যাতে স্বাধীনতার স্পৃহা স্ফুলিংগের ন্যায় জাগ্রত হয়।[৪৬০]

পাকিস্তান আমলে প্রথম পর্যায়ে কবি সাহিত্যিকেরা ইসলামি অনুপ্রেরণামূলক সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হন। কিন্তু ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হয়। অতঃপর বাংলা সাহিত্য এই সংগ্রামী বাঙালি ব্যক্তিত্বের প্রত্যাশা ও আবেগের ধারক হয়ে ওঠে।[৪৬১] এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন,

> ...কলিকাতায় বাসিয়া পূর্ব বাংলার লেখক-সাহিত্যিকদের কৃষ্টিক-সাহিত্যিক স্বকীয়তা-বোধ সম্বন্ধে আমি যে আশা ও ধারণা করিয়াছিলাম, ঢাকায় তার কিছুই দেখিলাম না। বরঞ্চ তার উল্টোটাই দেখিলাম। অবশ্য এর রাজনৈতিক কারণও ছিল। স্বয়ং কায়েদে আযম হইতে শুরু করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বাংলার বিরুদ্ধে ও উর্দুর পক্ষে যে অভিযান চালাইয়াছিলেন, পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতারা সে অভিযানে যেরূপ আত্মমর্যাদাবোধহীন অদূরদর্শী জি-হুযুর বৃত্তি চালাইয়া যাইতেছিলেন, তাতে পূর্ব বাংলার ইনটেলিজেনশিয়া ও ছাত্রসমাজ স্বভাবতই উর্দু ও পশ্চিমা নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।[৪৬২]

পাকিস্তানের প্রথম পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাঙালিত্বের পক্ষে ভূমিকা পালন না করলেও ভাষা আন্দোলনের পর তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর প্রথম মাইল ফলক হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের সংলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। এটি ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। সংকলনটিতে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নকশা ও ইতিহাসসহ ৬টি বিভাগে মোট ২২ জন লেখকের[৪৬৩] রচনা স্থান পায়।[৪৬৪] এই সংকলনটি বাঙালির জাতীয় সচেতনতার উদ্বোধনের প্রথম সাহিত্যিক দলিল। এই সংকলনটি প্রকাশের পর থেকে প্রতি বছর একুশ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে নানান সংকলন ও সাময়িকী।[৪৬৫] আমাদের সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে এসব সংকলন ও বিশেষ সংখ্যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে। একুশের পটভূমিতে যে অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনার জাগরণ ঘটেছিল তা আলোড়ন তুলেছিল নতুন প্রজন্মের লেখকদের সৃজনে ও মননে। একুশের চেতনা থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন শক্তিশালী ছোটোগল্পকার। এদের মধ্যে রয়েছেন–বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, মুর্তজা বশীর, আবদুল গাফফার চৌধুরী, জহির রায়হান, রাবেয়া খাতুন প্রমুখ।[৪৬৬] একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের বাকবদল ঘটে। রচিত হতে থাকে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক। গাজীউল হক-এর 'আমরা ভুলব না ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি।' একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে রচিত প্রথম গান। একুশে ফেব্রুয়ারি অসাধারণ সৃষ্টি আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পরি?' এ গান আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে উজ্জীবনী মন্ত্রের মতো প্রেরণাময়।[৪৬৭] এ পর্যায়ে ব্যাহত ১৯৫৮ সালে, সামরিক আইন জারির ফলে। সামরিক আইন ও আইয়ুব খানের শাসন উপেক্ষা করে সংঘটিত হয় ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত বাঙালির ব্যক্তিত্ব প্রতিবাদে প্রতিরোধে দুর্বার, মধ্যবিত্ত নেতৃত্বাধীন, গণতান্ত্রীভিলাষী। এ সময়ের বাংলা সাহিত্য এই সংগ্রামেরই প্রতিফলন। একথা সত্য যে, ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রশ্নে স্বাধিকারের আন্দোলন ও সংগ্রামেরপথ ধরেই অর্থনৈতিক মুক্তির, স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে বাঙালি এগিয়ে গেছে। তাই ভাষার হরফ-বদল, ভাষা-সংস্কার, রবীন্দ্র-বর্জন প্রভৃতি সকল সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিরোধী চক্রান্ত বাঙালি নির্ভুল ভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে।[৪৬৮]

ষাটের দশকের শেষদিকে অনেক কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন প্রত্যক্ষ ভূমিকায়। একটা অনিবার্য সম্মুখভূমি সম্পর্কে সচেতন মন ও মনন দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ অভিজ্ঞানে বিক্ষোভ ও সংগ্রামকে জেনেছিল রাজনৈতিক কর্মীদের কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে সূচিত হয় এক অন্তরঙ্গ যোগসূত্র। এ কারণেই একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল একটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডর ফলাফল হয়েই থাকে নি, তা রূপান্তরিত হয়েছে বাঙালির জাতীয়জীবন ও মানসপটভূমির সমগ্রতায়; পরিণত হয়েছে জাগৃতি, নির্মাণ এবং সৃজনকল্পনার রক্তিম ও সুদূরপ্রসারী সূচনাভূমিতে।[৪৬৯]

কবি-সাহিত্যিকরা জনগণের ভাষাকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া, আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য রচনা করে। আবার সাহিত্যও জনগণকে প্রভাবিত করে। প্রগ্রসর চিন্তার অধিকারি কবি-সাহিত্যিক সমাজের

কোনো অসংগতি দেখতে পেলে তা সাহিত্যের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরে। জনগণ সচেতন হয়ে ঐ অসংগতির বিপক্ষে রুখে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে পরিবর্তন ঘটে সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্র। ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যেও এই প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। কীভাবে বাঙালি জাতি ক্রমশ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয় তা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এ অধ্যায়ে তুলে আনা হয়েছে।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল একথা দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলা যায়। স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যখন বন্ধ থাকে তখনও সাহিত্যিকেরা রূপক আশ্রয়ে নিজেদের কথা বলতে পারে অনায়াসে। পাকিস্তানে যখন স্বাধীনভাবে মানুষ তাদের মনে কথা বলতে পারতেন না তখন সাহিত্যিকগণ তাদের লেখনীর মাধ্যমে জনগণে মনে কথা প্রকাশ করেছেন, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন শাসকদের প্রতিরোধ করতে এবং নিজেদেরকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিতে। সাহিত্যের চর্চার মাধ্যমে সাহিত্যিকগণ সমাজ পরিবর্তনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সমাজের মানুষের মানসগঠন করতে সহায়তা করে সমাজের প্রতি তাদের যে অঙ্গীকার তা পূরণ করেছে।

শুধু কেন্দ্র নয়, মননচর্চা ও মানসজগৎ পরিবর্তনে প্রান্তও একই সমান্তলে ভূমিকা পালন করে। রাজশাহী অঞ্চলে শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে আবদুল আজিজ বাচ্চু, মোস্তাফিজুর রহমান গামার উদ্যোগে লেখা হয়েছিল 'রক্তের রং লাল' নাটকটি। 'রক্তের রং লাল' নাটকের অন্যতম অভিনেতা ও আর্টস কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আবদুর রশিদ। তিনি সেই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'তখনও ২৫শে মার্চ আসে নাই। আমরা জানি না যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হবে কীনা? সেক্টর হবে কীনা? পাক বাহিনী কি করবে। কিছু আমরা তখনও জানি না। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যা হয়েছিল সমস্ত বিষয়গুলো ২৩শে মার্চে মঞ্চস্থ করা নাটকের মধ্যে নিয়ে এসেছিল।' তিনি আরও বলেছেনে, 'আমরা অবাক হয়েছিলাম যুদ্ধের পরে যখন নাটকটি বই আকারে ছাপা হয়। এই কথাগুলো ২৩শে মার্চ একজন শিল্পী বা লেখক কীভাবে অনুধাবন করতে পারল যে আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধে নামব পাকিস্তানি বাহিনী এখানে–নারীদের ব্যাপকহারে রেপ করবে, গণহত্যা করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলবে, লক্ষ লক্ষ বাড়ি-ঘর আগুনে পুড়ে দিবে, সম্পত্তি লুট করবে। কিংস্ব আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র করতে হবে।'

অর্থাৎ ৭১ সালে যা হয়েছে একজন শিল্পী তার অন্তর দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, সংবেদনশীল মন দিয়ে ২৩শে মার্চেই কিন্তু কল্পনা করতে পরেছিল। ঠিক অনুরূপ ৬০-এর দশকের শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজের সচেতন অংশও ঠিক অনুরূপভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল তারা একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজ পরিবর্তনের এই বিষয়গুলো শিল্পী-সাহিত্যিকগণ অগ্রিম অনুধাবন করতে পারে বলেই তারা সমাজে স্রষ্টা ও দ্রষ্টা।[৪৭০] অর্থাৎ খাটি শিল্পরা দেশের হৃদপিণ্ডের যে স্পন্দন তা অনুধাবন করে।

মননচর্চার কারণে ষাটের দশকে বাঙালি জাতির মানস জগতের একটি রাষ্ট্রের প্রতিমা তৈরি হয় যে আমরা এই রকম রাষ্ট্র চাই। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালিত্বের বা বাঙালির উপযোগী সেই রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ অঞ্চলের মানুষ নিজেদের বিকাশের জন্য এ রাষ্ট্র চাচ্ছিলেন যা তারা নিজেরাই পরিচালনা করবে। যে রাষ্ট্র বাঙালির আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশা পূরণ করবে। বাঙালির মনের মধ্যে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রের প্রতিমা শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাদের কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। এ সময় গড়ে ওঠা সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণিও এ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোতে তাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি সম্ভব নয়। মননচর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের মানস জগতে পরিবর্তন হয়েছে বা মানস জগত গঠন সম্পন্ন হয় বলেই ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন কিংবা মুক্তিযুদ্ধে জনতার এমন জাগরণ ও স্বতঃফূর্ত অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে। বাঙালির মনের মধ্যে রাষ্ট্র গড়ে তোলা যে কাঠামো ছিল তা ১৯৭১ সালের সফল মুক্তিযুদ্ধ শেষে '৭২-এর সংবিধানে বাস্তবরূপ পায়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকাভাষ্য

[১] রেনেসাঁ যেমন ইউরোপ তথা তাবৎ বিশ্বের মানবচৈতন্যে পরিবর্তন এনেছে, সাহিত্য ও শিল্পকে নবতর অভিধায় ব্যঞ্জিত করেছে; ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব যেমন সাহিত্য ও শিল্পে বৈপ্লবিক ধারা এনেছে, তেমনি বাঙালির অস্তিত্ব ঘোষণার অভিজ্ঞান, বাঙালির পরিচয় ঘোষণার উজ্জ্বল উৎস মহান একুশ। একুশের চেতনা বাংলা কবিতাকে বাস্তব জীবনমুখী, সংগ্রামমুখী ও মৃত্তিকাস্পর্শী করেছে।*১ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে বুরবো রাজাদের স্বৈরাচারী শাসনের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অসন্তোষ তৈরি হয় তাকে কাজে লাগিয়ে ফরাসি দার্শনিকগণ জনসাধারণের মনোজগতে পরিবর্তন বা বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভলতেয়ার, মন্টেস্কু, রুশো, দিদেরো প্রমুখ দার্শনিকগণ তাঁদের রচনার দ্বারা ফরাসি জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করে দেন। আহমদ রফিক বলেন, 'ফরাসি বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় রাশিয়ার প্রাবন্ধিক, লেখক ও সাহিত্যিকগণ রুশবিপ্লবের প্রাক্কালে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 'অক্টোবর বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে রচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, সাহিত্য ও কবিতাগুলো সে সময়ে সমাজের পচনশীল দিকগুলোর কথা তুলে ধরেছিল।'**২

*১সফিউদ্দিন আহমদ, *সাহিত্যের সেকাল ও একাল*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৭৫৯

**২ আহমদ রফিক, 'অক্টোবর বিপ্লবের সাহিত্যের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী', *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ৪ নভেম্বর ২০১৭

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৬

[৩] রতনতনু ঘোষ, 'চার দশকের ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র-নাটক উপন্যাস ও গানে মুক্তিযুদ্ধ', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা, প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, ঢাকা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭৭

[৪] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, বাংলাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৫-১৬

[৫] রতনতনু ঘোষ, 'চার দশকের ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র-নাটক উপন্যাস ও গানে মুক্তিযুদ্ধ', *প্রাগুক্ত*

[৬] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

[৮] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব', মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৯১

[৯] *ঐ*, পৃ. ১৯২

[১০] *ঐ*, পৃ. ১৯৬

[১১] স্বাধীন সুলতানদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য হয় সমৃদ্ধ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, 'রামায়ণ' অনবাদক কৃত্তিবাস, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচিয়তা মালাধর বসু, 'ইউসুফ জুলেখা' রচয়িতা শঅহ মুহম্মদ সগীর ও 'রসুল-বিজয়' রচয়িতা জয়নুদ্দীন–একালের শ্রেষ্ঠ কবি-ব্যক্তিত্ব। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তাঁর অসাধারণ পদাবলী রচনা করেছেন একালেই। এ ছাড়া এক বিরাট মঙ্গল-কাব্য সাহিত্যের সূচনা ঘটেছে একালে–কানাহরি দত্তের 'পদ্মপুরাণ', নারায়ণ দেবের 'পদ্মপুরাণ' বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসাবিজয়', বিজয়গুপ্তের, 'মনসামঙ্গল', ময়ূরভট্টের 'ধর্মমঙ্গল', মানিক রামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। রাজপৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও, আবহমান ব্রাহ্মণ্য সংস্কার- রৌরব-নরক-ভীতি-উপেক্ষ করে, কৃত্তিবাস [রাজা যদু বা জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দ) উৎসাহে] যে রামায়ণ অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন- এ তাঁর দুঃসাহিক ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। তেমনি হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ'র উৎসাহে মহাভারত অনুবাদ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী। এতদুভয়ই বাঙলায় সে বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডারের উৎসমুখ খুলে দিয়েছেন তা বলা বাহুল্য। স্মরণীয় যে, ইতিপূর্বে বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি ও ঐতিহ্য ছিল লোকসাহিত্য। রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদের ফলে এক বিরাট প্রাচ্য ক্লাসিক ঐতিহ্য বাঙলা সাহিত্যের সম্পদে ও ঐহিত্যে পরিণত হয়। তেমনি অন্যদিকে, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (মৃত্যু ১৪১০) আমলে রচিত শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জলিখা কাব্য বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য সূচনা করে।*

*ঐ, পৃ. ১৯৮-১৯৯

[১২] *ঐ*, পৃ. ১৯৯

[১৩] *ঐ*, পৃ. ২১১

[১৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৯৭

[১৫] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৬৫

[১৬] হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র* দ্বিতীয় খণ্ড, তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৯

[১৭] সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২০৩

[১৮] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯
[১৯] *ঐ*, পৃ. ১০১-১০২
[২০] সাক্ষাৎকার, আলী ইমাম (৬৯), সাহিত্যিক, স্থান : নিজ বাসভবন, ধানমণ্ডি, ঢাকা, ২৪ অক্টোবর ২০১৯
[২১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
[২২] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৬৯
[২৩] *ঐ*, পৃ. ৩৬৭
[২৪] সফিউদ্দিন আহমদ, *সাহিত্যের সেকাল ও একাল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫৯
[২৫] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[২৬] I am the defence early warning radar system
I see nothing but bombs
I am not interested in preventing Asia
from being Asia
And the government of Russia and Asia
will rise and fall but
Asia and Russia will not fall
The govenment of America also will fall
but how can America fall
I doubt it anyone will ever fall anymore
excet governments
fortunately all the governments will fall
the only ones which wont fall are the good ones
and the good ones don’t yer exist

But they have to begin existing
they exist in my poems
They exist in the death of Russian and
American governments
They exist in the death of Hart Crane
and Mayakovshy...* ১

*১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ‘বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব’, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

[২৭] *ঐ*, পৃ. ১৯২
[২৮] মজিদ মাহমুদ, ‘বাংলা কবিতায় সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ’, রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ : ২৬, সংখ্যা : ৬, রাজশাহী, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৩৬১-৩৬২
[২৯] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[৩০] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯
[৩১] *ঐ*, পৃ. ৩৬৯
[৩২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
[৩৩] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯
[৩৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
[৩৫] আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন ও নির্বাচিত ১০০ কবিতা*, শিকড়, ঢাকা, ২০১৫ পৃ. ৩৯
[৩৬] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭
[৩৭] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
[৩৮] আনিসুর রহমান (সম্পা.), *চর্যাপদ*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সংগ্রহ) ও অতীন্দ্র মজুমদার (অনু.), জ্ঞানের আলো, ঢাকা, পৃ. ৬৪
[৩৯] রওশন আরা, বাংলাদেশের কবিতায় স্বদেশচেতনার প্রকৃতি ও রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০১৩, পৃ. ১৪২
[৪০] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭
[৪১] *ঐ*, পৃ. ৩২৪
[৪২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[৪৩] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'কবিতা', আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৫৬৩-৫৬৪
[৪৪] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৬৫
[৪৫] 'বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন', *মাহে-নও*, বৈশাখ ১৩৫৬
[৪৬] 'আমি আর কবিতা লিখিনা', *মাসিক মোহাম্মদী*, অগ্রহায়ণ ১৯৫৭
[৪৭] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[৪৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *একুশে ফেব্রুয়ারী*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৯-৩০
[৪৯] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৯২
[৫০] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭১
[৫১] *ঐ*
[৫২] মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৫
[৫৩] সিকান্দার আবু জাফর, 'অনিবার্য', *বৈরী বৃষ্টিতে*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ১২
[৫৪] *ঐ*, পৃ. ১৩
[৫৫] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬
[৫৬] সিকান্দার আবু জাফর, 'ঘোড়সওয়ার', *বৈরী বৃষ্টিতে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
[৫৭] *ঐ*, পৃ. ১৪-১৫
[৫৮] *ঐ*, পৃ. ১৫
[৫৯] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'কবিতা', আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯২-৫৯৩
[৬০] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪
[৬১] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮
[৬২] সিকান্দার আবু জাফর, *বাংলা ছাড়ো*, মাটিগন্ধা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬২
[৬৩] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১
[৬৪] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
[৬৫] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১
[৬৬] *ঐ*, পৃ. ১৯২
[৬৭] *ঐ*, পৃ. ১৯২-১৯৩
[৬৮] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪
[৬৯] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫
[৭০] *ঐ*
[৭১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[৭২] হাসান হাফিজুর রহমান, *একুশে ফেব্রুয়ারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮
[৭৩] সিকান্দার আবু জাফর, 'স্বামীর লাশ প্রার্থী পলিন লুমুম্বাকে', *বৈরী বৃষ্টিতে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
[৭৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[৭৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
[৭৬] *ঐ*
[৭৭] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১২
[৭৮] মুনতাসীর মামুন, ১৮৮তম মাঘোৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ* গ্রন্থ আলোচনা-২০১৮, বাংলাদেশ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা, ২০ জানুয়ারি ২০১৮
[৭৯] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫
[৮০] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৫৭
[৮১] *দৈনিক আজাদ*, ১৬ অক্টোবর ১৯৬৪; রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৯২-৪৯৩
[৮২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
[৮৩] *ঐ*

[৮৪] হুমায়ুন আজাদ, *আমার নতুন জন্ম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৯১
[৮৫] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২
[৮৬] কবি সিকান্‌দার আবু জাফর-এর *কবিতা ১৩৭২* (১৯৬৮) কাব্য গ্রন্থটিতে তাঁর ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে লেখা কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে।
[৮৭] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪
[৮৮] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
[৮৯] 'সংগ্রাম চলবেই', *কবিতা ১৩৭২* (১৯৬৮ সালে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও মূলত ১৯৬৪ ও ৬৫ সালে লেখা কবিতাগুলো এতে স্থান পায়)*
*রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬২
[৯০] *ঐ*, পৃ. ৬২
[৯১] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. পাঁচ
[৯২] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪
[৯৩] সিকান্‌দার আবু জাফর, 'সংগ্রাম চলবেই', *কবিতা ১৩৭২*, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮, পৃ. ১৭
[৯৪] *ঐ*
[৯৫] *ঐ*
[৯৬] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. পঁচিশ
[৯৭] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮
[৯৮] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
[৯৯] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪
[১০০] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৬৪
[১০১] সিকান্‌দার আবু জাফর, 'কত ঈশ্বর', *কবিতা ১৩৭২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[১০২] *ঐ*
[১০৩] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৬
[১০৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
[১০৫] *ঐ*
[১০৬] *ঐ*, পৃ. ৬৮
[১০৭] মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা, *ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও বাংলাদেশের কবিতা* (১৯৬১-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ২৩৮-২৩৯
[১০৮] 'অনন্য স্বদেশ', *আর্ত শব্দাবলী* (১৯৬৮); রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮
[১০৯] 'বিপদে বিপন্ন নও', *অন্তিম শরের মতো* (১৯৬৮); রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮
[১১০] সিকান্‌দার আবু জাফর, 'যে কোন মূল্যে', *কবিতা ১৩৭২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
[১১১] সিকান্‌দার আবু জাফর, 'কত ঈশ্বর', *কবিতা ১৩৭২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[১১২] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭
[১১৩] *ঐ*, পৃ. ৩২৬
[১১৪] *ঐ*, পৃ. ৩২৭
[১১৫] 'নিদ্রিত মায়ের নাম', *কালের কলস* (১৯৬৮), *প্রাগুক্ত*
[১১৬] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
[১১৭] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২২৫
[১১৮] *প্রাগুক্ত*
[১১৯] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬
[১২০] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
[১২১] সিকান্‌দার আবু জাফর, 'আগরতলা ধর্ষিত বন্ধুকে', *বৃশ্চিক লগ্ন*, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭১, পৃ. ২৯
[১২২] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭
[১২৩] *ঐ*, পৃ. ২৮৬

[১২৪] সিকান্দার আবু জাফর, *বাংলা ছাড়ো*, মাটিগন্ধা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬০-৬১

[১২৫] সিকান্দার আবু জাফর, 'ইতিহাসের নীলাম', *বৃশ্চিক লগ্ন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

[১২৬] *ঐ*, পৃ. ৩১

[১২৭] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬

[১২৮] সিকান্দার আবু জাফর, 'ইতিহাসচারিণী বাঙলা', *বাংলা ছাড়ো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

[১২৯] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

[১৩০] *ঐ*, পৃ. ১৫২

[১৩১] সিকান্দার আবু জাফর, *বাংলা ছাড়ো*, 'কেঁদেই চলেছে', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০

[১৩২] সিকান্দার আবু জাফর, 'ইতিহাসচারিণী বাঙলা', *বাংলা ছাড়ো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

[১৩৩] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭

[১৩৪] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৮; সিকান্দার আবু জাফর, 'ইতিহাসচারিণী বাঙলা', *বাংলা ছাড়ো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

[১৩৫] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. পঁচিশ

[১৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৯

[১৩৭] মুজিবর রহমান (সংকলক ও সম্পাদক), *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার কথা*, রাঢ়বঙ্গ প্রকাশনী, রাজশাহী, ২০১৫, পৃ.১২৭-১২৮

[১৩৮] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮

[১৩৯] *ঐ*, পৃ. ৩০১

[১৪০] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২২২

[১৪১] *ঐ*, পৃ. ৩৩৭

[১৪২] গগন তানুর প্রকৃত নাম গোলাম কিবরিয়া।

[১৪৩] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩২

[১৪৪] *ঐ*

[১৪৫] *ঐ*, পৃ. ৩৩৩

[১৪৬] *ঐ*, পৃ. ৩২৮

[১৪৭] *ঐ*, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬

[১৪৮] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

[১৪৯] 'আসাদের শার্ট', *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০), *প্রাগুক্ত*; শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

[১৫০] *ঐ*, শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

[১৫১] মালেকা বেগম, *সুফিয়া কামাল*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৫০

[১৫২] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮

[১৫৩] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২-২৩৩

[১৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫

[১৫৫] *প্রাগুক্ত*

[১৫৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬

[১৫৭] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

[১৫৮] হুলিয়া, *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* (১৯৭০)

[১৫৯] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'গুণের আগুন, গুণের জল', *প্রথম আলো*, ১৯ জুন ২০১৫

[১৬০] *ঐ*

[১৬১] মুজিবর রহমান (সংকলক ও সম্পাদক), *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার কথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৮

[১৬২] সিকান্দার আবু জাফর, *বাংলা ছাড়ো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

সিকান্দার আব জাফরের 'বাংলা ছাড়ো' কাব্যের কবিতাগুলো রচনা শুরু হয় ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানের সময়। সর্বশেষ কবিতাটি রচিত হয়েছে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে।*২

*২ সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২

[১৬৩] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. পাঁচ

[১৬৪] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯
[১৬৫] সিকান্‌দার আবু জাফর, *বাংলা ছাড়ো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[১৬৬] *ঐ*
[১৬৭] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. আটাইশ
[১৬৮] *ঐ*, ভূমিকা, পৃ. ছয়
[১৬৯] সিকান্‌দার আবু জাফর, *বাংলা ছাড়ো*, 'তখন রাত্রিশেষ', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[১৭০] সিকান্‌দার আবু জাফর, 'আর কতকাল দেরী', *বৃশ্চিক লগ্ন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
[১৭১] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮
[১৭২] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, ১৯ জুন ২০১৫
[১৭৩] সাঈদ-উর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮
[১৭৪] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১-২
[১৭৫] সাবিরা মনির, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫
[১৭৬] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২-১৩
[১৭৭] রামেন্দু মজুমদার, 'নির্বাচিত থিয়েটার সম্পাদকীয় ১৮ (আগস্ট ১৯৯০)', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চারদশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৫৬
[১৭৮] সাবিরা মনির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
[১৭৯] হোসনে আরা জলী, *প্রাগুক্ত*
[১৮০] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৬৫
[১৮১] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১
[১৮২] সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৮
[১৮৩] সাবিরা মনির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
[১৮৪] *ঐ*, পৃ. ১৬-১৭
[১৮৫] *ঐ*, পৃ. ১৮
[১৮৬] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮
[১৮৭] আসকার ইবনে শাইখ, *বর্তমান নাট্যচর্চা*, *ঢাকা মহানগী নাট্যচর্চা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৮
[১৮৮] সাবিরা মনির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[১৮৯] সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০
[১৯০] সৈয়দা খালেদা জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭
[১৯১] *ঐ*, পৃ. ৩৭
[১৯২] *ঐ*, পৃ. ৩৭-৩৮
[১৯৩] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২১-২২
[১৯৪] *ঐ*, পৃ. ২২
[১৯৫] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, *প্রাগুক্ত*, ১৯৯৫, পৃ. ৭০
[১৯৬] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২
[১৯৭] সাবিরা মনির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০
[১৯৮] বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র গর্বিত নাট্যসৃষ্টি নুরুল মোমেনের (১৯০৬-১৯৯০) *নেমিসিস* নাটকটি ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ও মানবতার অবক্ষয় সম্পর্কিত এক শিল্পিত অভিজ্ঞান। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর নাট্যিকসচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এমন জোরালো ভাবে আর পরিলক্ষিত হয় নি। যদি এমন হতো (১৯৬০), শতকরা আশি (১৯৬৯), যেমন ইচ্ছে তেমন (১৯৭০) প্রভৃতি তাঁর উদ্দেশ্যমূলক ও হালকা মেজাজের নাটক।*১

*১. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১
[১৯৯] সাবিরা মনির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[২০০] সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮
[২০১] সাবিরা মনির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

[২০২] *ঐ*, পৃ. ২৩
[২০৩] সাবিরা মনির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[২০৪] সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৭২
[২০৫] *ঐ*
[২০৬] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২
[২০৭] আলাউদ্দিন আল আজাদ, *মরক্কোর জাদুকর*, চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, পৃ. ৭১
[২০৮] *ঐ*, পৃ. ৭২
[২০৯] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[২১০] ঈসমাইল মোহাম্মদ, 'নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর', *সমকাল*, সিকান্দার আবু জাফর স্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ৮৮
[২১১] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫
[২১২] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
[২১৩] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮
[২১৪] মাহবুবা সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫
[২১৫] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮
[২১৬] আতাউর রহমান, 'সাম্প্রতিক নাটকে প্রতিবাদী চেতনা', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৬
[২১৭] সৈয়দা খালেদা জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
[২১৮] মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২১৪
[২১৯] আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ*, অনন্যা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৫০২
[২২০] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬
[২২১] শাহমান মৈশান, 'সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ : ৫৩ সংখ্যা : ২, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১০৭-১০৮
[২২২] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[২২৩] *ঐ*
[২২৪] সৈয়দা খালেদা জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪
[২২৫] আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মুনীর চৌধুরীর নাটক (প্রবন্ধ), *বাংলাদেশের নাট্য চর্চার তিন দশক*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত ও সংকলন), ১৯৯৯, পৃ. ৫৬
[২২৬] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩
[২২৭] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭-৯৮
[২২৮] *ঐ*
[২২৯] *ঐ*
[২৩০] *ঐ*
[২৩১] শাহমান মৈশান, 'সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০
[২৩২] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
[২৩৩] শাহমান মৈশান, 'সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮-১১০
[২৩৪] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
[২৩৫] শাহমান মৈশান, 'সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০
[২৩৬] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫২
[২৩৭] সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫
[২৩৮] সৈয়দা খালেদা জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫
[২৩৯] *ঐ*, পৃ. ৬

[২৪০] ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীতে মুনীর চৌধুরির লেখা বিখ্যাত *কবর* (১৯৬৬) নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। অভিনয় করেছিলেন কারাবন্দিরা।* ১৯৫৪ সালে অল্পকালের জন্য যখন মুক্তি পান মুনীর চৌধুরী, তখন নাটিকাটিও জেলখানার বাইরে এলো। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় নাটকটি তখন ছাপা হয় নি।** কারাগারের বাইরে 'কবরে'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে–কার্জন হলে। সংস্কৃতি সংসদের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন বা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষ্যে ১৯৬৫ সালে।

* মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

** আনিসুজ্জামান, 'কবর', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫১

[২৪১] আনিসুজ্জামান, 'কবর', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

[২৪২] কবীর চৌধুরী, 'নাটক : প্রতিবাদ প্রতিরোধের', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[২৪৩] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[২৪৪] সৈয়দা খালেদা জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

[২৪৫] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[২৪৬] কবীর চৌধুরী, *থিয়েটার পত্রিকা*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৮৭

[২৪৭] সৈয়দা খালেদা জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

[২৪৮] রামেন্দু মজুমদার, "নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬৯-৭০

[২৪৯] *ঐ*, পৃ. ৬৯

[২৫০] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

[২৫১] *ঐ*

[২৫২] যতীন সরকার, 'শওকত ওসমান : ইতিহাসের দর্পণে সেকাল একাল ভাবীকাল দর্শন', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৪০

[২৫৩] রামেন্দু মজুমদার, "নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

[২৫৪] সনৎকুমার সাহা, 'সত্যসন্ধ শিল্পসাধনা : সাহিত্যে শওকত ওসমান', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

[২৫৫] রামেন্দু মজুমদার, "নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

[২৫৬] পণ্ডিতগণ অভিমত দেন, বোধ হয় পরিবেশ অনুযায়ী প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারেই পাঠ্যবই নির্বাচকমণ্ডলী কুপোকাত হয়েছিল।*

* সনৎকুমার সাহা, 'সত্যসন্ধ শিল্পসাধনা : সাহিত্যে শওকত ওসমান', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

[২৫৭] আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'মুনীর চৌধুরীর নাটক', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪৩

[২৫৮] *ঐ*

[২৫৯] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, 'বাংলাদেশের নাটকের বিষয় : রূপ ও রূপান্তর', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

[২৬০] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

[২৬১] আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'মুনীর চৌধুরীর নাটক', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[২৬২] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

[২৬৩] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

[২৬৪] *ঐ*
[২৬৫] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯
[২৬৬] *মাইলপোস্টের* রচনাকাল ১৯৬২-১৯৬৪।*

* শাহমান মৈশান, 'সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

[২৬৭] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬
[২৬৮] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫
[২৬৯] শাহমান মৈশান, 'সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩
[২৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪
[২৭১] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫
[২৭২] *ঐ*, পৃ. ১৩৫
[২৭৩] *ঐ*
[২৭৪] *ঐ*, পৃ. ১৩৪
[২৭৫] শিখা সরকার, 'বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ, রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ : ২৬, সংখ্যা : ৬, রাজশাহী, ২০১২, পৃ. ২১৭
[২৭৬] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬
[২৭৭] *ঐ*
[২৭৮] মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ, *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৯; শিখা সরকার, 'বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭
[২৭৯] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬
[২৮০] *ঐ*
[২৮১] *ঐ*, পৃ. ১৩৭
[২৮২] *ঐ*
[২৮৩] *ঐ*
[২৮৪] *ঐ*
[২৮৫] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩
[২৮৬] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
[২৮৭] *ঐ*, পৃ. ১৩৮
[২৮৮] *ঐ*
[২৮৯] *ঐ*
[২৯০] *ঐ*
[২৯১] *ঐ*
[২৯২] *ঐ*, পৃ. ১৩৯
[২৯৩] *ঐ*
[২৯৪] *ঐ*
[২৯৫] *ঐ*, পৃ. ১৩৪
[২৯৬] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৭
[২৯৭] সুধাময় দাস, *বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ*, মনন প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৭০-১৭১
[২৯৮] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯
[২৯৯] *ঐ*, পৃ. ১১৬
[৩০০] *ঐ*, পৃ. ৫৫-৫৬
[৩০১] *ঐ*, পৃ. ৯৮
[৩০২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮-১৬৯
[৩০৩] কুদরত-ই-হুদা, *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস আঙ্গিক বিচার*, আদর্শ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫১

[৩০৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

[৩০৫] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১

[৩০৬] মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মোজাম্মেল হক (১৯৬০-১৯৩৩), নজিবর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭৩), আকবর উদ্দিন (১৮৯৫-১৯৭৮), নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)।*

* মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-২

[৩০৭] *ঐ*, পৃ. ২-৩

[৩০৮] সুধাময় দাস, *বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

[৩০৯] শওকত ওসমানের জননী উপন্যাসের রচনা কাল ১৯৪৫-১৯৪৭ কলকাতায়। দেশবিভাগের ফলে কলকাতা থেকে তা প্রকাশিত হয়নি। পরে ১৯৬১ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। আমি এই উপন্যাসকে এখানে ব্যবহার করার কারণ হলো ঔপন্যাসিকের মনোজগতে যে পরিবর্তন হয়েছে তা দেখানো।

[৩১০] শওকত ওসমানের *জননী* উপন্যাসে বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ-উপন্যাসের ঘটনাংশ বিস্তৃত।*১ বাঙালি মুসলমানের আত্মসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানের ঐতিহ্যিক উৎসের ব্যবহার এবং বাস্তবতালালিত ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের অঙ্গীকার শওকত ওসমানের জীবনজিজ্ঞাসার স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে।*২ এ উপন্যাসে প্রথম বাঙালি মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলের সংস্কৃতি এবং বহির্বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। এর আগে রচিত অধিকাংশ উপন্যাসের উদ্দেশ ছিল মুসলিম পরিবার ও সমাজের মূল্যবোধের সংস্কার। সেসব উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিভাবক হয়ে কাজ করেছেন।*৩ মুসলিম পরিবারের দারিদ্র এবং সংগ্রামের আলেখ্য উপস্থাপিত হয়েছে এ উপন্যাসে।*৪ প্রতিকূল পরিবার ও সামাজিক পটভূমিতে দরিয়া বিবির অস্তিত্বসংগ্রামের নির্মম বাস্তবতা নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন ঔপন্যাসিক। মানবত্বের অন্তর্সত্যই এ-উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। এ-কারণেই জননী 'মানবতাবদী চেতনা প্রবাহের ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ'-এ পরিণত হয়েছে।*৫ শওকত ওসমানের 'বনী আদম' উপন্যাসে গ্রামত্যাগী ছিন্নমূল মানুষেল জীবন-সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে শহরের নিচুতলার বস্তিবাসী মানুষের শ্রমজীবনের বিভিন্ন দিক এবং জীবন ও জীবিকার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রামের নানাচিত্র রূপায়িত হয়েছে। কাহিনী শেষ হয়েছে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নায়কের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।*৬

*১. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

*২. *ঐ*, পৃ. ৩০

*৩. কুদরত-ই-হুদা, *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস আঙ্গিক বিচার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

*৪. *ঐ*, পৃ. ৬৭

*৫. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩১

*৬. শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩

[৩১১] এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আতহার আহমেদের *উন্মোচন* (১৯৬৫) ও *পিপাসা* (১৯৫৮), দিলারা হাশেমের *ঘর মন জানালা* (১৯৬৫), বাঙ্গাল আবু সাঈদের *ব্যতিক্রম* (১৯৬৫), আবু রুশদের *নোঙর* (১৯৬৭), আনিস সিদ্দিকীর *মন না মতি* (১৯৬৮), রাবেয়া খাতুনের *রাজাবাগ শালিমার বাগ* (১৯৬৯) ও আবদার রশীদের *লঘুমেঘ* (১৯৭০)।

[৩১২] শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

[৩১৩] bn.banglapedia.org/index.php?title=ওয়ালীউল্লাহ,_সৈয়দ

[৩১৪] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

[৩১৫] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬

[৩১৬] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

[৩১৭] *ঐ*

[৩১৮] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬

[৩১৯] সৈয়দ আকরাম হোসেন (সম্পা.), *চাঁদের অমাবস্যা*, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলী-১*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১১৩
[৩২০] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[৩২১] *ঐ*
[৩২২] https://shahedarefin.blogspot.in/2015/01/chander-amabossa.html?m=1
[৩২৩] *ঐ*
[৩২৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৮
[৩২৫] *ঐ*
[৩২৬] *ঐ*, পৃ. ১১৮
[৩২৭] *ঐ*, পৃ. ১২০
[৩২৮] *ঐ*, পৃ. ১২০-১২১
[৩২৯] আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পা.), *হাজার বছর ধরে*, *জহির রায়হান রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ১৯৮০, পৃ. ১১৩
[৩৩০] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯-১৭০
[৩৩১] *ঐ*, পৃ. ১৭০
[৩৩২] *ঐ*, পৃ. ১৭১
[৩৩৩] শহীদুল্লা কায়সার, *সংশপ্তক*, মুক্তধারা, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮২, পৃ. ১৬৩
[৩৩৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১
[৩৩৫] *ঐ*, পৃ. ১৭৫
[৩৩৬] *ঐ*, পৃ. ১৭৬
[৩৩৭] *ঐ*, পৃ. ১৭৭
[৩৩৮] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[৩৩৯] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[৩৪০] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[৩৪১] আবু রুশদ, *নোঙর*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, পরিবর্তিত সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ. ২৬৬
[৩৪২] যতীন সরকার, ‘শওকত ওসমান : ইতিহাসের দর্পণে সেকাল একাল ভাবীকাল দর্শন’, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[৩৪৩] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
[৩৪৪] যতীন সরকার, ‘শওকত ওসমান : ইতিহাসের দর্পণে সেকাল একাল ভাবীকাল দর্শন’, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[৩৪৫] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫
[৩৪৬] শওকত ওসমান, *সমাগম*, কথাকলি, ঢাকা, ১৩৭৪, পৃ. ১৪৫-১৫৬
[৩৪৭] সুধাময় দাস, *বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫
[৩৪৮] *ঐ*
[৩৪৯] *ঐ*, পৃ. ১৯৫-১৯৬
[৩৫০] *ঐ*, পৃ. ২২৩-২২৪
[৩৫১] *ঐ*, পৃ. ২২৫
[৩৫২] *ঐ*, পৃ. ২২৭-২২৮
[৩৫৩] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[৩৫৪] মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৭
[৩৫৫] হায়দার আকবর খান রনো, ‘প্রগতির পতাকাবাহী শওকত ওসমান’, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, , পৃ. ৬৬
[৩৫৬] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
[৩৫৭] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[৩৫৮] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
[৩৫৯] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

[৩৬০] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
[৩৬১] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[৩৬২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
[৩৬৩] শওকত ওসমান, *রাজা উপাখ্যান*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৭, পৃ. ১২৩
[৩৬৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪
[৩৬৫] সুধাময় দাস, *বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

রাবেয়া খাতুনের, *রাজারবাগ শালিমার বাগ* (১৯৬৯), আতহার আহমদের, *পিপাসা* (১৯৫৮), দিলআরা হাশেমের, *ঘরমনজানালা* (১৯৬৫), আনিস সিদ্দিকী, *মন না মতি* (১৯৬৮), আবদার রশিদের, *লঘুমেঘ* (১৯৭০) প্রভৃতি উপন্যাসে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন মিলবে।

পিপাসা'র নায়ককে একুশের স্মৃতিচারণ করতে দেখা যায় কিন্তু উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্ক মোটেই গভীর নয়। ফলে নায়কের ব্যক্তিজীবনের স্মরণীয় ঘটনার অতিরিক্ত এর কোন মূল্য নিরূপিত হয়নি।

ঘর মন জানালা'র শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের সংলাপ ও লম্পট আকতারের নেতৃত্বের অসারত্ব, শহীদ দিবস উদযাপনের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে লেখকের বক্র ইঙ্গিত পাঠক মনে প্রশ্নের উদ্রেক করে, প্রশ্ন আসে এই কারণে যে এর পূর্বাপর কোন ব্যাখ্যা লেখক দেননি।

মন না মতি'তে বাংলাভাষা প্রশ্নে তৎকালীন সরকার তথা মুসলিম লীগের মনোভাবের সঙ্গে ছাত্রদের মনোভাবের দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের উত্তমপুরুষ ছাত্রনেতা 'কায়েদে আযমে'র এই বক্তব্যের উল্লেখ করেও এই উক্তির দায়িত্ব থেকে 'কায়েদে আযম'কে অব্যাহতি দিয়ে বাকি মুসলিম লীগ নেতাদের ঘাড়ে এর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে।

লঘুমেঘে'র নায়কের মধ্যেও একুশের শহীদদের প্রতি আন্দোলনবিমুখ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাময়িক আবেগের অতিরিক্ত কোন পরিচয় ব্যক্ত হয়নি।

রাজাবাগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একুশের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে যে সমস্যাটি তা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর শাসকশ্রেণীর নেকনজরে থাকার অভিপ্রায় থেকে উদ্ভূত। এর সাথে প্রধান শিক্ষয়িত্রীয়র চাকুরির স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের প্রশ্নও জড়িত। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের চিত্রটি উল্লেখযোগ্য কিন্তু চিত্রটি যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি বিশ্লেষণের অভাবে খণ্ডিত।*১

*১ সুধাময় দাস, বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২

[৩৬৬] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭
[৩৬৭] *ঐ*, পৃ. ১০৭
[৩৬৮] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, কাশবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৫
[৩৬৯] *ঐ*, পৃ. ৫৬
[৩৭০] আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩২৫
[৩৭১] বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প', শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৪৮
[৩৭২] *ঐ*
[৩৭৩] আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'পঁচিশ বছরের ছোটগল্প : একটি আন্তর্জরিপ', আবদুল্লা আবু সায়ীদ (সম্পা.), *কণ্ঠস্বর*, ১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১৪-১৫
[৩৭৪] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯
[৩৭৫] *ঐ*, পৃ. ১০১
[৩৭৬] বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, 'মৌসুমী', *অবিচ্ছিন্ন*, ১৯৬০, পৃ. ১৩২; মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬৬-৬৭
[৩৭৭] মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬৬-৬৭
[৩৭৮] আবু জাফর শামসুদ্দীন, 'তাকাল', *আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প*, বর্ধিত ২য় সং, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৮
[৩৭৯] আবু ইসহাক, 'জোঁক', *মহাপতঙ্গ*, ১ম সং, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ৬৪
[৩৮০] আবু ইসহাক, 'প্রতিবিম্ব', *মহাপতঙ্গ*, ১ম সং, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ৯৪

[৩৮১] শওকত ওসমান, 'বর্ণামৃত', *প্রস্তর ফলক*, ১ম সং, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৬৬-৬৭

[৩৮২] আবুল ফজল, 'জয়', *আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠগল্প*, ১ম প্রকাশ, ১৩৭১, চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৪৮

[৩৮৩] আবুল ফজল, 'হাকিম', *আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠগল্প*, ১ম প্রকাশ, ১৩৭১, চট্টগ্রাম, পৃ. ১৬

[৩৮৪] আবু জাফর শামসুদ্দীন, 'একজোড়া প্যান্ট', *একজোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য গল্প*, ১৯৬৭, পৃ. ২৩; মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬৬

[৩৮৫] মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[৩৮৬] সৈয়দ শামসুল হক, 'ঘরে ফেরা', *আনন্দের মৃত্যু*, ১৯৬৭, পৃ. ২৪৮; মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[৩৮৭] শওকত ওসমান, *উভশৃঙ্গ*, 'নেমক হালাল' ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ১৭৭

[৩৮৮] শওকত ওসমান, *উভশৃঙ্গ*, 'রাতা' ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ১৩৩

[৩৮৯] খালেদা হানুম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১০৯

[৩৯০] আবুল মনসুর আহমদ, 'ইস্রাফিলের বেটা', *আবেহায়াত*, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১

[৩৯১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪২

[৩৯২] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৪৮

[৩৯৩] মুহম্মদ হায়দার, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ছোটগল্প*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫৬

[৩৯৪] বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯', *মুক্তিযুদ্ধ : নির্বাচিত গল্প*, হারুন হাবীব (সম্পা.), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৩

[৩৯৫] *প্রাগুক্ত*, ৪৫

[৩৯৬] হাসান হাফিজুর রহমান, *আরো দু'টি মৃত্যু*, লেখক সংঘ, ঢাকা, ১ম সং, ১৯৭০

[৩৯৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

[৩৯৮] *প্রাগুক্ত*

[৩৯৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

[৪০০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪-৫

[৪০১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১০

[৪০২] চৌধুরী শাহজাহান, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প॥ প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ ডিসেম্বর ২০১৮

[৪০৩] হেলেনা খান (১৯২৯-), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫-), আবুবকর সিদ্দিক (১৯৩৬-), মাহমুদুল হক (১৯৪০-), বুলবন ওসমান (১৯৪০-), বিপ্রদাশ বড়ুয়া (১৯৪২-), হাজেরা নজরুল (১৯৪২-), আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ (১৯৪৫), ফরিদা হোসেন (১৯৪৫-), কায়েস আহমেদ (১৯৪৮-১৯৯২), হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) প্রমুখ গল্পকারের আত্মপ্রকাশ মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালে হলেও মুক্তিযুদ্ধের পরেই তাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন।

[৪০৪] পাকিস্তানবাদী ধারার পক্ষে ছিলেন–মোহাম্মদ আকরম খান (১৮৬৮-১৯৬৮), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ (১৮৯৮-১৯৭৪), গোলাম মকসুদ হিলালী (১৯০০-১৯৬৪), সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০২-১৯৮১), আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪), হবীবুল্লাহ্ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬), নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (১৯০৬-১৯৮২), দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯), আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০), মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪), মীজানুর রহমান, এ এফ এম আবদুল জলীল (১৯১৬-১৯৭৮), অধ্যাপক আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯১), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-২০০১), শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০২), গোলাম সাকলায়েজন (জ. ১৯২৬), আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৭), কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭-২০০১), মুহম্মদ আবু তালিব (জ. ১৯২৮), হাসান জামান (১৯২৮-১৯৭৮), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ (জ. ১৯৩৬), শাহাবুদ্দীন আহমদ (জ. ১৯৩৬) প্রমুখ।*

*মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৩-৬৪

[৪০৫] বাঙালিত্বের ধারার পক্ষে ছিলেন–আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৮৫-১৯৬৯), কাজী মোতাহার হোসেন (১৯০৩-১৯৮৩), মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২), আবদুল কাদিও (১৯০৬-১৯৮৪), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৯), আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯১১-১৯৯৭), কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২), রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), অজিত কমার গুহ (১৯১৪-১৯৬১), আসহাবউদ্দীন আহমদ (১৯১৪-

১৯৯৪), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৮৫), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), সিরাজুদ্দীন হোসেন (১৯১৯-১৯৭১), আবদুল গনি হাজারী (১৯২১-১৯৭৬), আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২), এ. কে মাজমুল করিম (১৯২২-১৯৮২), কবির চৌধুরী (১৯২৩-২০১১), সালাহ্উদ্দী আহমদ (১৯২৪-২০১৪), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪), সন্তোষ গুপ্ত (১৯২৫-২০০৪), মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭-২০১৮), শহীদুল্লাহ্ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১), জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮-২০১৪), আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১), মযহারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৩) প্রমুখ।*১

*১ মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১-৭২

[৪০৬] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৯-২০

[৪০৭] আবদুল্লাহ আল-মুতী, *স্বাধীনতা শিক্ষা অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১২

[৪০৮] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.) *আবদুল গনি হাজারী রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৫৪

[৪০৯] *প্রাগুক্ত*

[৪১০] এনামুল হক ইংরেজিতে যে উত্তর দেন তার অনুবাদ ১৯৫৯ সালের *সমকাল* এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গুরুত্ব বিবেচনায় এখানে তা তুলে ধরা হলো–

প্রশ্ন ১৮৬। পাকিস্তানে রোমান হরফ গ্রহণ আপনি অনুমোদন করেন কি?

জবাব : না। ভাষাতাত্ত্বিক বিচাওে এ প্রস্তাব অযৌক্তিক এবং জাতি হিসেবে পাকিস্তানীদের জন্যে এ আত্মঘাতী। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমরা লাভবান হবো যৎসামান্য কিন্তু জাতির উন্নতির সহায়ক এমন অনেক কিছুই আমরা হারাবো। সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করছি :

(ক) পাকিস্তানের মত রাষ্ট্র যেখানে বহুসংখ্যক ধর্ম, ভাষা এবং হরফ বিদ্যমান তার জাতীয় ঐক্যের কথা চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তা অবাস্তব। বর্তমান পৃথিবীর বহুধর্মাবলম্বী এবং বহুভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলি আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সমন্বয়ে এক রাষ্ট্র বা এক জাতি গড়ে তোলা সম্ভব। পক্ষান্তরে একাধর্মাবলম্বী এবং একভাষাভাষী লোকেরাও পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিক।

(খ) কোন বিশেষ হরফ বহুভাষাভাষী কোন রাষ্ট্রের ভাষাগত ঐক্য আনতে পারে না। ভাষা না জানলে শুধু শুনে অথবা কোন বিশেষ হরফ প'ড়ে তা' কারো বোধগম্য হবে না। একই হরফে দু'টী বা তারও ভাষা লেখা হয়, তা' পড়তে পারলেও, ভাষাজ্ঞান না থাকলে কারও ভাষাগত বুৎপত্তি কিছুমাত্র বাড়বে না।...

(গ) ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে রোমান হরফ পাকিস্তানী ভাষাগুলির সমস্ত ধ্বনি উৎপাদ করতে পারে না। ...কাজেই পাকিস্তানী ভাষাগুলির জন্যে রোমান হরফের প্রবর্তন করে আমরা আমাদের হরফের তালিকায় আর একটি নতুন হরফ যোগ করব মাত্র; তাতে জাতীয় লাভ হবে না কিছুই।

(ঘ) পক্ষান্তরে রোমান হরফ গ্রহণ করলে পাকিস্তানী হরফে লেখা আমাদের যাবতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য ভবিষ্যৎকালের জন্যে একটি নিষিদ্ধ পুস্তকের মতই গণ হবে।...

(ঙ) মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি রোমান হরফ গ্রহণ না করলে, ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান তা করতে পারে না, করা উচিতও নয়। কারণ, তা'হলে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক মুহুর্তে ছিন্ন হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, আগামী বহু শতাব্দী পর্যন্ত আমরা তেমন ঝুঁকি নিতে পারি নে।

প্রশ্ন ১৮৭-ক। আপনি কি মনে করেন এই পন্থায় জনশিক্ষা ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে?

জবাব : না। যে দেশে প্রচলিত হরফেই তার সবগুলো ভাষা মিলিয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৫ জনের বেশী নয়, বুঝতে হবে গলদ সেখানে হরফে নয়, আসল গলদ শিক্ষা-পদ্ধতিতে।...

এছাড়া, পাকিস্তানী ভাষার ধ্বনি যথার্থভাবে প্রকাশ করতে গেলে রোমান হরফের যে নতুন চেহারা দাঁড়া করাতে হবে, তাতে পাকিস্তানী হরফের ধ্বনিতাত্ত্বিক জটিলতার সবকিছুই থাকবে। প্রত্যেকটি ধ্বনির যথার্থ্য বজায় রাখতে হ'লে পাকিস্তানী শব্দ অনুসারে রোমান হরফেও পড়া, লেখা এবং বানানের জটিলতার সককিছুই থেকে যাবে এবং ছাত্রদের তা পড়তে হবে এবং লিখতে হবে। কাজেই জনশিক্ষার জন্য প্রচলিত হরফে যে-সময় লাগে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না।

১৮৭- খ। আপনি কি মনে করেন, এই পন্থা স্কুলের ছাত্রদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা শিখবার ভার লাঘব করবে?

জবাব : ছাত্র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে কোন ভাষা শিখবে তার ওপরেই এ-প্রশ্নের জবাব নির্ভব করে। মাতৃভাষা ছাড়াও কোন ছাত্র যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে একটি পাকিস্তানী এবং একটি ইউরোপীয় ভাষা শিখতে চায় তা হলে তার হরফ শিখবার সময় হয়ত কিছুটা বাঁচবে। তা হলে তাকে ইউরোপীয় ভাষার অক্ষর বহু ক্ষেত্রেই নতুন করে শিখতে হবে।

যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা ইংরেজী এবং আরবী অথবা ফারসী হয় তা হলে পাকিস্তানী ভাষার ধ্বনি-ভিত্তিক পাকিস্তানী রোমান হরফ তার বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না। কারণ, আরবী এবং ফারসীর ক্ষেত্রে ছাত্রটিকে আরবী ও ফারসী হরফ আবার নতুন করে শিখতে হবে।

১৮৭-গ । আপনি কি মনে করেন, এই ব্যবস্থায় একটি জাতীয় ভাষা গড়ে উঠবে এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে?

জবাব : ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে এই ধারণা নিতান্ত ভিত্তিহীন।... কোন বিদেশী হরফকে যদি একটি ভাষার মৌলিক শব্দ উৎপাদনের উপযোগী করে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সে-হরফ উক্ত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক চরিত্র কিছুমাত্র বদলাতে পারে না। ...কাজেই বাংলা, উর্দু, পশতু, সিন্ধী, বেলুচ, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষার জন্যে হরফ গ্রহণ করলে তাতে পাকিস্তানের একটি জাতীয় ভাষা গড়ে উঠবে না। কাজেই কোন 'হরফ' জাতীয় ঐক্য বিধানের সহায়ক হবে না। জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার উপকরণ আমাদের অন্যত্র খুঁজতে হবে–'হরফে' তা পাওয়া যাবে না।

১৮৭-ঘ। এই ব্যবস্থা মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশের অধিকতর সহায়ক হবে কি?

জবাব : আমি মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ নয়। তবে আমার মনে হয়, মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশের সুবিধা-অসুবিধা মুদ্রাযন্ত্র এবং প্রকাশকদের ওপর নির্ভর করে। এখানে হরফের প্রশ্ন নিতান্ত গৌণ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা উন্নততর মুদ্রাযন্ত্র তৈরি করতে পারি। তাছাড়া বহু সংখ্যক লেখক এবং পাঠক গড়ে তুলতে পারলে, আমার মনে হয়, আমাদের হরফের যান্ত্রিক আকৃতি দ্রুত এবং ব্যাপক মুদ্রণেল পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।*

* রবিউল হোসেন, *সমকাল পত্রিকার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা*, ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৮৯-৯০

[৪১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

[৪১২] মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তানি সরকার কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন।

[৪১৩] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ পাবলিকেশনস লি:, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৮৫-১৮৬

[৪১৪] আবদুল হক, *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৪১

[৪১৫] মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫; আবুল ফজল, *সমাজ ও সংস্কৃতি সাধনা*, ঢাকা, ১৯৬১, পৃ. ২৬৩

[৪১৬] গোলাম মোস্তফা, *আমার চিন্তাধারা*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২৩৫

[৪১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

[৪১৮] আবদুল হক, *ক্রান্তিকাল*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ১৩৫-১৩৬

[৪১৯] *প্রাগুক্ত*

[৪২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮

[৪২১] মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০১

[৪২২] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৪৮

[৪২৩] মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২; আবুল ফজল, *সমাজ ও সংস্কৃতি সাধনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

[৪২৪] মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭; আবুল ফজল, *সমাজ ও সংস্কৃতি সাধনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫

[৪২৫] মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৯

[৪২৬] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল ও আবদুল হাইয়ের রচনায় আমরা সে পরিচয় পেয়েছি।*

*মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৫

[৪২৭] *প্রাগুক্ত*

[৪২৮] আবদুল হক, *বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৩, পৃ. ৩-৪

[৪২৯] মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২; আবুল ফজল, *সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫

[৪৩০] আবুল ফজল, *সমকালীন চিন্তা*, বিবিধ প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ১৯৭০, পৃ. ৩৩

[৪৩১] বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, মুক্তধারা, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১৮

[৪৩২] বদরুদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়ীকতা*, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ জুন ১৯৬০, পৃ. ১০

[৪৩৩] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৭৬

[৪৩৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৭

[৪৩৫] গোলাম মোস্তফা, *প্রবন্ধ-সংকলন*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২২৩

[৪৩৬] আবদুল হক, *সাহিত্য ও স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৪৯

[৪৩৭] আনিসুজ্জামান (সম্পা.) *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৫২০-৫২১

৪৩৮ মনসুর মুসা (সম্পা.) মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬০১

৪৩৯ মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৪-৫০৫

৪৪০ আবদুল হক, *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

৪৪১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

৪৪২ আবদুল হক, *সাহিত্য ও স্বাধীনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

৪৪৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

৪৪৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৮১

৪৪৫ মনসুর মুসা (সম্পা.), *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩৪

৪৪৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭০-৪৭১

৪৪৭ আহমদ শরীফ, *বিচিত্র চিন্তা*, চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১৮

৪৪৮ আবুল ফজল, *সমকালীন চিন্তা*, বিবিধ প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ১৯৭০, পৃ. ১৫৭-১৫৮

৪৪৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৪৫০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

৪৫১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

৪৫২ সরদার ফজলুল করিম, *নানা কথা*, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৫৮

৪৫৩ মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭২

৪৫৪ শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪

৪৫৫ আহমদ শরীফ, *বিচিত্র চিন্তা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৪৫৬ *প্রাগুক্ত*

৪৫৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬১

৪৫৮ ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

৪৫৯ *ঐ*

৪৬০ *ঐ*, পৃ. ১৬৫

৪৬১ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব', মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

৪৬২ আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩০৬

৪৬৩ কবি, গল্পকার, শিল্প, গীতিকার, ইতিহাসবিদ ও লেখকগণ হলেন–আলী আশরাফ, শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গণি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জামালুদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান, শওকত ওসমান, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম, আতোয়ার রহমান, মুর্তজা বশীর, সালেহ আহমদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, তোফাজ্জল হোসেন ও কবিরউদ্দিন আহমদ।*১

*১. মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

৪৬৪ *ঐ*, পৃ. ৮৯

৪৬৫ ১৯৯১-এর ডিসেম্বরে আমিরুল মোমেনীনের সম্পাদনায় যে একুশেল সংকলন গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ২২৮২টি সংকলনের উল্লেখ আছে। এর বাইরেও অনেক সংকলন থেকে থাকবে। এরপরেও প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর সংকলন।*১

*১. মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

৪৬৬ *ঐ*, পৃ. ১০১

৪৬৭ *ঐ*, পৃ. ৯১

৪৬৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব', মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

৪৬৯ রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

৪৭০ সাক্ষাৎকার, আবদুর রশিদ (৭০), রাজশাহী আর্টস কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : নিজ বাসভবন, তারিখ : ৬ জুলাই ২০১৯

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নির্মাণে শিল্পকলার ভূমিকা

পাকিস্তান শাসনামলে শিল্প-সাহিত্যচর্চায় মুসলমান সমাজে প্রথম পর্যায়ে বিরাজিত ছিল অশিক্ষাজনিত উদাসীনতা। উপরন্তু, সেসময় ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ, যাত্রা, গান এবং অভিনয়সহ সকল প্রগতিশীল শিল্পমাধ্যমকেই ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।[১] শুধু তাই নয় সামাজিকভাবেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ছিল। এ প্রসঙ্গে হাশেম খান বলেন,

> সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান হিসেবে ছবি আঁকা ইত্যাদি জায়েজ কিনা? এসব প্রশ্ন উঠেছিল। তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। পাকিস্তান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। ছবি আঁকা ভাস্কর্য তৈরি ইত্যাদি প্রায় নিষিদ্ধ–শিল্পীদের জন্য চাকুরী কোথায়? ছবি এঁকে জীবন ধারণ সম্ভব নয়।[২]

তাছাড়া বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিল্পকলাতে সামন্তবাদী ও ধর্মীয় জীবনভাবনা প্রাধান্য ছিল। এ সময় বাঙালিরা নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তার মাধ্যমে আত্মসঞ্জীবনীর চেষ্টা করে।[৩] এই ঐতিহ্যমুখিতার পেছনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণেই তখন এ অঞ্চলের মানুষ প্রথম তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের তুলনায় বাঙালিত্বের পরিচয়কে বড়ো হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল। জন সাধারণের মধ্যে জেগে ওঠা সেই নতুন চেতনা মানবতাবাদী, দেশপ্রেমিক ও সমাজ-সচেতন শিল্পীদের মধ্যেও সহজেই সঞ্চারিত হয়েছিল।[৪]

বাঙালিত্ব ও পাকিস্তানিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মূলত দার্শনিক। একদিকে সমান্তবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থ ও দর্শন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অন্যদিকে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে এই চাপিয়ে দেওয়া দর্শনের বিপরীতে নিজেদের অবস্থান জানান দেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সামন্তবাদী শক্তি পাকিস্তানি শাসকগণ সাম্প্রদাকিতা ব্যবহার করে বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে অন্যদিকে বাঙালি সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেরিয়ে এসে মানবতার পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। এই পারস্পরিক আদর্শের দ্বন্দ একসময় বাঙালির মধ্যে এই বোধ আসে স্বাধীন দেশ গঠন করা ছাড়া তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এই লড়াইয়ে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'শিল্পকলা শুধু শিল্পকলার জন্য এ ধরনের বিশ্বাস আমার নয়, আমি বিশ্বাস করি শিল্পকলা মানুষের কল্যাণের জন্য, জীবনকে সুষম ও সুন্দররূপে গড়ে তোলার জন্য।'[৫] অর্থাৎ শিল্পের যেসব শাখা আছে, সব শাখারই একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। শুধু সুন্দর শিল্প হলেই হবে না তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে হবে। বাংলাদেশে শিল্পকলার যে সব শাখা আছে তা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করেছে এবং মানুষের পক্ষে কাজ করেছে।

পাকিস্তান আমলের প্রতিকূল পরিবেশেও জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্মে তাই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।[৬] শিল্পীদের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ জেগেছিল স্বদেশের সমাজ-পরিবেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কিছু করার জন্য। শিল্পীগণ তাদের শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে সে দায়িত্ব পালন করেছিল। শিল্পের কোনো কোনো শাখা তাদের কর্মের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমিতে কাজ করে সেসম্পর্কে স্থপতি রবিউল হুসাইন সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

> বাংলাদেশের জন্মের প্রস্তুতিপর্বে মোটামুটি শিল্পের প্রায় সব শাখাতে স্থানিক প্রতিবেশ সচেতনতা ও সেইমতো নিজস্ব ধারা নির্মাণে সঠিক সক্ষমতা প্রদর্শিত হয়ে আসছিল বেশ সফলভাবে এবং তা দেশের সামগ্রিক রূপকাঠামোতে ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রতিভাসিত হচ্ছিল অবিসংবাদিতভাবে। .. এই সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার মানস দেশের স্বাধীনতাকে বহুলভাবে ত্বরান্বিত করেছে। কবিতা, সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত–এইসব শিল্পমাধ্যমের উন্নত চর্চা ও লালন-পালনের সর্বশেষ মাধ্যম ছিল চলচ্চিত্রের বিকাশ। এবং সবার শেষে এসবের ভেতর প্রায় সবার অজ্ঞাতসারে ও অলক্ষ্যে যে মাধ্যমটি সফল ও অনাড়ম্বরভাবে বিকাশ হয়ে আসছে, যা আধুনিক বিংশ শতাব্দীর একটি অন্যতম শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম বলে পরিগণিত তা হলো স্থাপত্যশিল্প।[৭]

সংগীত-শিল্প-সাহিত্য যদি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও উন্নতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে–সে সংস্কৃতি হয় সরকারমুখী। পাকিস্তান আমলে এ প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (B.N.R) কে সরকার কাজে লাগিয়ে শিল্পকলাকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। শিল্পীরা সরকারের এই প্রভাব কাটিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করে গণমুখী শিল্প সৃষ্টির চেষ্টা করে।

চিত্রকলা

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের চারুশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট, যার বর্তমান নাম চারুকলা ইনস্টিটিউট।[৮] এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার মধ্য দিয়ে আধুনিক চিত্রকলার যাত্রা শুরু হয়। সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানি রাষ্ট্রের ভাবাদর্শগত ভিত্তি এবং দর্শনটাই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাৎপদ এবং সকল রকম সুকুমার শিল্পের বিরোধী।[৯] ধর্মভিত্তিক একটি নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রক্ষণশীল সমাজে চারুকলা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাই রীতিমতো বিপ্লবাত্মক ঘটনা।[১০] প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সূচিত বাঙালি জাতিসত্তার পুনর্নির্মাণ এবং আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার অনুষঙ্গ হচ্ছে এ দেশে চারুকলা ও আধুনিক স্থাপত্য বিকাশের ইতিহাস। ওয়াহিদুল হক বলেন,

> আবেদীন, সফিউদ্দীন, আনোয়ারুল হক, খাজা শফিক, কামরুল হাসান আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা ও চিত্রশিল্পান্দোলন গড়ে একটানে একটা জেহাদি জোশের সঙ্কীর্ণ মানসিকতার সমাজকে ঘনিষ্ঠ স্বাদেশিকতা ও একযোগে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতায় তুলে আনলেন।[১১]

বাঙালিত্বের সাধনা যেমন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া, তেমনি জাতীয়তার সঙ্গে বিশ্বজনীনতার মিথস্ক্রিয়া সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের পূর্ব শর্ত। এছাড়া শুধু উপর্যুক্ত ব্যক্তিরাই নন, একাজে তাঁদের সহায়তা করেছিলেন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদা, আমলা সলিমুল্লাহ ফাহমী প্রমুখ উদারমনা মানুষ।[১২]

বাঙালি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা এবং ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির বন্ধন ছিন্ন করে গড়ে তুলেছে একটি নতুন অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক বাঙালি সংস্কৃতি। এ কারণে আমাদের শিল্প, সংস্কৃতি, গান, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, চারুকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য–সবকিছুর সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে সৃজনশীল দ্রোহ চেতনা, নব নির্মাণের আবেগ, রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ। বাঙালি নানা বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে নিজেদের শিল্প-সংস্কৃতির নিজস্ব ভুবন গড়ে তুলেছে।[১৩]

শিল্পী মাত্রই সংবেদনশীল। তাই সমাজের যা কিছু অমঙ্গল, যা কিছু অশুভ, যা কিছু অন্যায়–তার সবকিছু তাঁদের চেতনায় সুতীব্রভাবে প্রভাব ফেলে।[১৪] প্রতিকূল অবস্থা শিল্পী-চেতনায় সময়, সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা তৈরি করে। তৎকালীন ঢাকা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট-এর অগ্রগণ্য শিক্ষকদেরা স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে এক কাতারে আসেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুশাসনের মধ্যে অবস্থান করে যেহেতু স্বাধীন চিন্তার বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায় না, তাই চল্লিশের দশকের শেষের[১৫] গড়ে তোলা হয় 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ'।[১৬] ঢাকা আর্ট গ্রুপ নামে সংগঠনের মাধ্যমে এক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন ঢাকার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক তথা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের একটি দল। সরকারিভাবে চারুকলার শিক্ষা-কার্যক্রম ও বেসরকারিভাবে শিল্পগোষ্ঠী সংগঠন এ রকম যুগপৎ যাত্রার মধ্যদিয়ে বস্তুত চারুকলাচর্চা একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে অগ্রসর হতে থাকে।[১৭] জয়নুল আবেদিনের শিল্পদীক্ষা এবং ভাষা আন্দোলনের শিল্পিত হাতিয়ার হতে গিয়ে তাই পঞ্চাশ দশকের শুরুতে চিত্রশিল্প বাস্তববাদে অভিষিক্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক সংস্কার, রাষ্ট্রিক কালাকানুন এবং সর্বোপরি অসুস্থ রাজনীতির বিরুদ্ধে শিল্পীরা ব্যক্ত করেছেন অঙ্গীকারাবদ্ধ দ্রোহ।[১৮] যা বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে দেখিয়েছে আলো এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্বাধীনতা পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে।

চিত্র শিল্পীদের রূপান্তর

পঞ্চাশের দশকে আবির্ভূত শিল্পদের অধিকাংশই দেশজ শিল্পের ঐতিহ্যের দ্বারা তাৎকালনী সময়ে তেমন প্রভাবিত ছিলেন না।[১৯] তৎকালীন বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পী দেশীয় পদ্ধতিতে আঁকা বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যধারা অন্ধ অনুকরণ করতো। পাকিস্তানের প্রথম দিকে অনেক শিল্পীই মুসলিম ভাবধারায় চিত্রাঙ্গন করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য পাবার আশায় আবার কখন শাসকগোষ্ঠীর প্রলোভন ও চাপে শিল্পীগণ পাকিস্তানি এবং মুসলিম ভাবধারায় চিত্রাঙ্কন করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ, পৌরাণিক কাহিনি ও বাইবেলীয় কাহিনি নির্ভর ফরমায়েসি ছবি আঁকছিলেন।[২০] পঞ্চাশ দশকের শিল্পীরা ষাটের দশকে আরও বেশি প্রবলভাবে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।[২১]

পঞ্চাশের দশকে ভাষা আন্দোলন ও ৫৪-এর নির্বাচন জাতীয়জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছিল। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের সমসাময়িক কাজে তার প্রতিফলন দেখা গেছে। এ সময় তাঁরা জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলার প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশন করেন।[২২] জয়নুল আবেদিন পূর্ববাংলার লোকশিল্প ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক শিল্পের সমন্বয় করে একটি সিরিজ এঁকে। 'পাইন্যার মা', 'নব বধূ', 'পল্লীজননী', 'দুই রমণী', 'প্রসাধনরত নারী' ইত্যাদি রোম্যান্টিক মেজাজের কাজে লোকজ ও আধুনিক ধারার সমন্বিত আঙ্গিকের অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাংলার চিত্রকলার আধুনিকতার মূল শক্তি হবে লোকজ-ঐতিহ্য, এমন বিশ্বাস থেকেই জয়নুল এই সমন্বয়ী ধারাটির চর্চা শুরু করেছিলেন।[২৩] দেশাত্মবোধের প্রবল চেতনা, আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কারণে জয়নুল আবেদনিরের পক্ষে সমন্বয় ধারাটির চর্চা শুরু করা সম্ভব হয়েছে।

পরবর্তীকালে অনেক বিশিষ্ট শিল্পী আবার শিকরে ফিরে আসেন। দেশীয় পদ্ধতিতে আঁকা-আঁকি করেন। শিল্পী কামরুল হাসানও ইউরোপীয় ধাঁচের আঁকা-আঁকি করতেন। তিনি পাশ্চাত্যধারা ছেড়ে দেশীয় পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করেন দুই জনের প্রেরণায়। একজন হলেন–গুরুসদয় দত্ত ও অন্যজন মটরু নামে মুর্শিদাবাদের একজন পটুয়া। গুরুসদয় দত্ত কামরুল হাসান ও মটরুর আঁকা-আঁকি মধ্যে একটি তুলনা করেন। যেখান থেকে কামরুল হাসান যে শিক্ষা পান তা তাঁর কাজের ধরনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। গুরুসদয় দত্ত দুই জনের মধ্যে তুলনা করে বলেন,

> কোন শিক্ষার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, বাধাও নেই। শিক্ষার সুযোগ যেখানে আছে সেখানেই তোমাদের বিচরণ করতে হবে। তবে তুমি (কামরুল হাসান) যেটা আঁকছ সেটাতো ইউরোপিয়ান ধাঁচে। মটরু যেটা করছে সেটা একদম বাঙালি পদ্ধতিতে ছবি আঁকছে। এটি হচ্ছে তোমার নিজস্ব ধারা।[২৪]

এই বক্তব্যে কামরুল হাসানের মনোজগতে বিশেষ পরিবর্তন এনেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্যধারার অন্ধ অনুকরণে আপন সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষ সম্ভব নয়। বাংলার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য রয়েছে, শুধুমাত্র চর্চার অভাব। এর নিজস্ব চিত্রভাষা নির্মাণ করতে হলে এর লোক ঐতিহ্যের ক্ষয়িষ্ণু ধারাটিকে উজ্জীবিত করতে হবে।[২৫] ফলে প্রাতিষ্ঠানিক লব্ধজ্ঞানের সাথে ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। গুরুসদয় দত্ত ও মটরু কামরুল হাসানের মাঝে লোকশিল্পের যে বীজ বুনেছিলেন সেই বীজ থেকে পরবর্তীকালে বিশাল মহীরুহের সৃষ্টি হয়েছে।[২৬] ১৯৬০ সালে বিসিকে যোগদানের ফলে কামরুল হাসানের লোকশিল্প ও হস্তশিল্পের সাথে যোগাযোগ আরও নিবিড় হয়। তখন বাঁশ, বেত, শোলা, নকশীকাঁথা, পিতল-কাঁসার কাজের সাথে শখের হাঁড়ি, তেলের ভাঁড়, দইয়ের হাঁড়ি, কলসি, শিকা, জামদানি শাড়ির নক্শা ও ডিজাইন দেখে অভিভূত হন।[২৭] পরবর্তী সময়ে তিনি শিল্পীদেরকে এগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেন ও প্রেরণা যোগায়। উপর্যুক্ত শিল্পীদের বাইরেও অনেকে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করেন। বিজন চৌধুরী এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমিনুল ইসলামের কথা লিখেছে। তিনি লেখেছেন,

> ...আমিনুল যতই বিমূর্তধারায় ছবি আঁকুক না কেন, ওর চিন্তা- চেতনায় সবসময়ে বাঙালিয়ানার প্রবল প্রভাব ছিল। দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ওর মননে সবসময় বিরাজ করতে। গভীর অভিনিবেশে ওর ছবিগুলো দেখলে বাঙালি জীবনের দৈনন্দিনতা তথা বাঙালি পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রভাব অনুভব করা যায়। বলতে দ্বিধা নেই, এই ব্যাপারটর অনুপ্রেরণা আমি ওর কাছ থেকেই পেয়েছি। ওর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল উৎস ছিল স্বদেশের জীবন ও তার ভাবধারা। যতই বিদেশের

চিন্তাধারা ও অঙ্কনরীতির সঙ্গে ও পরিচিত হোক না কেন, যতই বিমূর্তধারায় ছবি আঁকুক না কেন, ওর শিকড় ছিল ওর সমসময়ের প্রিয় বিষয়। যশোলোভে, অর্থলোভে ওকখনো তাই শিকড়হীন হয়ে যায়নি।...[২৮]

শুধু আমিনুল ইসলাম নয়, জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান-এর পথ অনুসরণ করে অনেক শিল্পীই এই পথ অনুসরণ করেন। যা বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বাঙালিত্বের ভিতকে শক্ত করে।

চিত্রকলার জাতীয় ধারা বা মতবাদ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে সামাজিকভাবে এদেশের শিল্প মাধ্যম যে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে মাঝে মাঝে একটু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ রকম একটি পরিবর্তন হলো চারুকলায় ১৯৫৪ সাল থেকে মেয়েরা ভর্তি হয়। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের ভ্রূকুটি, সমালোচনা ইত্যাদি বাধা ডিঙিয়ে পাঁচজন[২৯] মেয়ে চারুকলায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে।[৩০] এরপর থেকে মেয়েদের চারুকলায় ভর্তি হওয়া অব্যাহত ছিল। ক্লাস রুমে প্রচলিতভাবে ছেলে মেয়ে ভিন্নভাবে বসার নিয়ম ছিল। ১৯৫৬ সালে যে তিনজন মেয়ে (আফরোজ মোস্তফা, এ্যাডলিন ডায়াস ও ইকবাল মান্দ বানু) ভর্তি হয়েছিলেন, তারা ছেলে সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এক সঙ্গে বসা শুরু করে। তাদেরকে এজন্য শাস্তি ভোগ করতে হলেও তা ছিল প্রচলিত রক্ষণশীল সমাজে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন।[৩১] কিন্তু এই পরিবর্তন টেকসই হয়ার পূর্বেই পাকিস্তানে জারি করা হয় সামারিক শাসন। ষাটের দশকের প্রায় পুরো সময়টা আইয়ুব খানের সামারিক শাসন এবং পরবর্তীকালে ইয়াহিয়া খানের দুঃশাসন ১৯৭১ পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। অর্থাৎ গোটা ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সামরিক শাসনের অধীনে। এছাড়া ১৯৫৬ সালে গৃহীত সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়েছিল।[৩২] স্বাধীনভাবে কাজ করার কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে ষাট দশকের শুরুতে আবার পাশ্চাত্যের শিল্প আবার প্রভাব বিস্তার করায় এদেশের শিল্প-আন্দোলনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে শুরু করে। ষাট দশক থেকে শিল্প-আন্দোলন আপাতভাবে গতিশীল ও প্রগতিশীল মনে হলেও বস্তুত এর গতি ছিল খুবই কম।[৩৩] এদেশের শিল্প-আন্দোলন সার্বিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ষাট দশকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ শিল্পীর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে জয়নুল আবেদিনের প্রভাব রয়েছে। তৎসত্ত্বেও তিনি বা তাঁর সমসাময়িক কামরুল হাসান বা সফিউদ্দিন আহমেদ কোনো জাতীয় ধারা বা মতবাদ ও আঙ্গিক প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম, ছাত্রগোষ্ঠী, জয়নুল-অনুরাগী হয়তো ছিলেন; কিন্তু জয়নুল-অনুগামী ছিলেন এমন কথা বলা যাবে না। শিক্ষকের ভূমিকায় তার প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও অগ্রবর্তী শিল্পী হিসেবে তিনি তাদের আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত হন নি।[৩৪] আবুল মনসুর জয়নুল আবেদিনের ছাত্রদের প্রসঙ্গে বলেন,

এই ছাত্ররাই যখন ইউরোপ ঘুরে এসে পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যে বিমূর্ত সরল রীতির চর্চা শুরু করলেন স্থান-কাল-পাত্রের কোনো প্রেক্ষিতকে প্রায় বিবেচনায় না এনে তখন জয়নুল বেদনার্তবোধ করলেন; কিন্তু ক্রমশ শক্তি সঞ্চারশীল নবীন শিল্পীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্থান গ্রহণ করতে চাইলেন না।

এ কথা সত্য যে, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতার জন্য শিল্পীদের মধ্যে মতভেদ ও মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম। শিল্পীদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে বিভিন্ন মতবাদ, ধারা ও আঙ্গিকের উদ্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু ধারা, মতবাদ ও আঙ্গিক যাই হোক না কেন মতানৈক্যের জন্য কোনোটা গুরুত্বহীন হয়ে যায় না বা কোনোটিকে অবমূল্যায়নও করা যায় না।

বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলন মনোনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, ষাট দশকের শুরু থেকে শিল্প-আন্দোলন দু'টি প্রধান প্রবাহে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সে দু'টি হচ্ছে–১. বাস্তববাদ ও ২. বিমূর্তবাদ।

ঐ দশকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এই দু'টি প্রধান মতবাদ পাশাপাশি সমান্তরালভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু অল্প সময়ের ম্যধ্যেই বিমূর্তবাদ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং এদেশের শিল্প-আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ছায়াছন্ন করে ফেলে। এর কারণ হলো, আমাদের দেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকরা মনে করেন যে, বিমূর্ত শিল্প মানেই সৃজনশীল ও প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড।[৩৫]

অবশ্য কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করেন, ইসলামি রাষ্ট্রতন্ত্র এবং সামরিক শাসনের কারণে এ দেশের শিল্পীরা ব্যাপকভাবে বিমূর্ত শিল্পের/নির্বস্তুক আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৩৬]

পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাঙালিসমাজের সাংস্কৃতিক ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব

মানবতাবোধ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সাম্য এই উপাদানগুলো নির্যাস হলো বাঙালিত্ব। এই উপাদানগুলোকে সমাজে বাস্তবায়ন করার উদ্দীপনা মুক্তিযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। সমাজের আত্মরক্ষা, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশোন্মুখ জাতি হিসেবে প্রকাশ প্রয়াসে শিল্পীরা অংশী হয়েছিলেন সেই সমাজের দায়িত্বশীল অংশ হিসেবে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ মুক্তির আশায় এবং শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, অত্যাচার থেকে নিজস্ব জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বাঙালি শিল্পীরা তাদের তুলি সঞ্চালিত করেছেন মানবতাবাদী চেতনার পথে।[৩৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, কিংবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতাবাদ এবং বাস্তবতাবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিরোধ এবং বৈপরীত্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ঐ দ্বন্দ্ব, বিরোধ এবং বৈপরীত্য আরেক তীব্রতা ও প্রখরতা লাভ করেছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র, পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতাদর্শ বনাব পূর্ব বাংলার সমাজ, পূর্ব বাংলার সমাজের সাংস্কৃতিক মতাদর্শকে কেন্দ্র করে। যেক্ষেত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতাদর্শ স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল, সেক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সমাজ এবং সমাজ গঠনের সাংস্কৃতিক মতাদর্শ তখনও ঘনীভূত এবং সচেতনায়নের মাত্রা অর্জন করেনি।[৩৮]

পাকিস্তানি রাষ্ট্রের মতাদর্শ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রথম থেকে একই ছিল। তবে **১৯৫৩** সালের সে মতাদর্শ আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। ঐ বছরের আগস্ট মাসে সেগুনবাগিচার স্কুলে প্রদর্শনীতে কিছু কিছু চিত্র সমালোচক যারা পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করে এসেছিল আশ্চার্য রকমের নতুন নতুন ধারা-উপধারা নিয়ে শিল্প বিচার করে। একদিকে তাঁরা আন্তর্জাতিক শিল্পরীতির অতি আধুনিক তত্ত্বের প্রতি গুরুত্ব দেন। আবার সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ সরবরাহ করা হতে লাগল পাকিস্তানি ও মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করার জন্য। এ সময় বিচারকগণ বাংলাদেশের শিল্পীদের ছবির মধ্যে 'পাকিস্তানি ধুয়ো চালু হয়েছে, না হিন্দুয়ানার ছাপ আছে'–এই অতি হীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ তথ্য অনুসন্ধানে তৎপর হয়। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ তারা আপত্তি জানান। সে সব শব্দের মধ্যে হিন্দুয়ানার ছাপ আছে সেগুলো পরিবর্তন করার জন্য উৎসাহিত করেন। যেমন : 'আলপনাকে' আলপনা বলা চলবে না, বলতে হবে 'হাসিয়া'।[৩৯] এসব সমালোচক এমনই উদ্ভট সব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। এ দেশের সংস্কৃতিকে ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ করার যে অপচেষ্টা চলছিল, এসব সমালোচক এ থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা নেননি।[৪০] এ দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীত-বিরোধীদের ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার সম্পর্কে এখানকার সাংস্কৃতিক মহল সাবিকভাবে জানে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা এসব প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু শিল্পীদের শিল্পকলায় ইসলামি বা মুসলমান ভাবধারা প্রচলন করার জন্যও একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী সচেষ্ট হয়েছিলেন। এমনকি তাঁরা শিল্পকলায় হিন্দু সংস্কৃতির উপস্থিতির সমালোচনা করতেন এবং বাঙালি চেতনাকে গলা টিপে হত্যা করতে উন্মুখ ছিলেন। রবীন্দ্রবিরোধীদের জনসাধারণের সামনে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি শিল্প-সংস্কৃতিবিরোধীদের সেভাবে চিহ্নিত করা যায় নি।[৪১] শিল্প-সংস্কৃতিবিরোধীদের প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন এক ঝাঁক তরুণ শিল্পী।[৪২]

পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে শিল্পীদের প্রতিরোধ

পাকিস্তানি শাসকশক্তির বিরুদ্ধে **১৯৪৮** থেকেই দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হয়েছিল তার প্রতিটি ধাপেই শিল্পীরা সক্রিয়ভাবে এইসব রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। শুধু রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা নয়, নিজেদের শিল্পকর্মের মাধ্যমেও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। পাকিস্তান আমলের প্রথম পর্বে চিত্রশিল্পের বিষয় বা বক্তব্য ছিল প্রধানত, অরাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ।[৪৩] পরবর্তীকালে বাংলার লোক ঐতিহ্য, দুর্যোগ, প্রতিরোধ ইত্যাদি শিল্পীরা তাদের কর্মের মধ্যে নিয়ে আসেন। ফলে চিত্রকলায় যে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন আসে তা বাঙালিত্বের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণের ও বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এতে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একটি বিষয় তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙালির জাতিসত্তার প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে তার লোকজ জীবনধারা মধ্যে। সুতরাং বাঙালিকে আত্মপরিচয় যদি খুঁজে পেতে হয়, তাহলে লোকশিল্পকলার মধ্য দিয়েই তার অনুসন্ধান করতে হবে। জয়নুল আবেদিন তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধে আমাদের মূল লড়াইয়ের রসদ নিহিত আছে লোকজ জীবনধারায়। সেখান থেকেই তিনি চিত্রকরদের শক্তি আহরণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশভাগের আগে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা অঙ্কনের উজ্জ্বল উত্তরাধিকারকে বহন করে তিনি এদেশের চিত্রকলার আন্দোলনে নতুন রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সেদিন একঝাঁক শিল্পী বেরিয়ে এসেছিলেন।[৪৪]

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঢাকার শিল্পশিক্ষালয়ের ছাত্রদলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পক্ষে জনতার কাতারে এসে দাঁড়ানো কোনোভাবে সম্ভব ছিল না; কিন্তু সর্বাংশে ছাত্রদের সম্পৃক্তি ও সক্রিয়তা থেকে বোঝা যায় শিক্ষকদের সমর্থন কোন দিকে রয়েছে।[৪৫] ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ এ একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারিত ছিল। চারুশিল্পকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকা আর্ট গ্রুপের এটি দ্বিতীয় প্রদর্শনী ছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের স্ত্রী লেডি নূন-এর উদ্বোধন করার কথা ছিল।[৪৬] কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনের ছাত্রমিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের নিহত হওয়ার ঘটনার কারণে তা স্থগিত করা হয়।[৪৭] ছাত্র ও শিক্ষকরা সেদিন প্রদর্শনী বন্ধ করে ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।[৪৮] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবল প্রভাব থাকলেও বছর না ঘুরতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিকল্প পথ ধরতে উদ্যোগী হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তাদের মাতৃভাষা বাংলার ন্যায্য মর্যাদার দাবিই এক্ষেত্রে মূল প্রেরণা ও শক্তি হিসেবে কাজ করে। উদারপন্থি রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষকরাই এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে। এই আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের নেতৃস্থানীয় এক অংশ।[৪৯] ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিয়ে সৈয়দ জাহাঙ্গীর বলেন,

> পরের বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে একটা বড় মিছিল বের করা হয়। এর আগের রাতে সারারাত ধরে অনেকে মিলে আমরা পোস্টার, ব্যানার লিখি। সকালে ওই ব্যানার-পোস্টার নিয়ে আমরা মিছিলে অংশগ্রহণ করি। বড় ব্যানারটিতে আঁকা ছিল এক ব্যক্তি একজন ছাত্রের লাশ দুহাতে তুলে নিয়ে মিছিলের অগ্রভাগে এগিয়ে যাচ্ছেন। সম্ভাবত বিজন চৌধুরীর আঁকা ছিল ওই ব্যানারটি।[৫০]

১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র তরুণ শিল্পী আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, ইমদাদ হোসেন, কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীরের তুলির বলিষ্ঠ রেখায় আঁকা পোস্টার শিক্ষাঙ্গনে, রাস্তায়, গলিতে সেঁটে দেয়ে এবং এগুলো ভাষা আন্দোলনকে করেছেন আরও বেগবান। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই স্লোগানে ভরে গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দেয়াল, এমনকি গাছের কাণ্ডগুলোও। মুর্তজা বশীর একুশের রাতেই একুশের গুলিবর্ষণ ও নিহতদের নিয়ে এঁকে দিলেন কয়েকটি স্কেচ।[৫১] তাঁর রেখাগুলোও ছিল বলিষ্ঠ এবং ভাষা আন্দোলনে তা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকী স্মরণে রেখে হাসান হাফিজুর রহমান ও মোহাম্মদ সুলতানের যৌথ উদ্যোগে যে সঙ্কলন প্রকাশের প্রয়াস নেওয়া হয় সেখানে নবীন শিল্পশিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। সংকলনের জন্য লিলোকাট ও ড্রইং করেছিলেন মুর্তজা বশীর ও বিজন চৌধুরী। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশের সংকলন* থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের অলংকরণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে চিত্র শিল্পীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। একুশের প্রথম সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারি* প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন আমিনুল ইসলাম।[৫২] একই সংকলনে

'একুশে ফেব্রুয়ারি' নামে একটি লেখা ছিল মুর্তজা বশীরের।[৫৩] আর সদরঘাট থেকে যে মিছিল বের হয়েছিল তাতে আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা যোগ দিয়েছিলেন চিত্রিত ফেস্টুন নিয়ে এবং মিছিলের পুরোভাগে রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীরের সঙ্গে ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী।[৫৪]

ভাষা আন্দোলনের পর পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চের অতিদ্রুত দৃশ্যবদল ঘটে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অগ্রণী রাজনৈতিক দল ইসলামী ভাবধারার মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ও গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা লাভ ও হারানো, মার্শাল ল ও সামরিক শাসনের প্রতিষ্ঠা, সবই এক দশকের মধ্যেই সংঘটিত হয়। এই পটভূমিতেই বাংলাদেশের চিত্রকলা আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে। স্বভাবতই চিত্রকলার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্মাণে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে।[৫৫]

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মাহফিলের উদ্যোগে ১৯৫৮ সালের ২-৪ মে চট্টগ্রামের জে এম সেন হলে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনের 'পাক-বাংলার চিত্রশিল্প' শিরোনামের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জয়নুল আবেদিন 'আমাদের চিত্রকলা' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজস্ব মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'অনুকরণের চাপরাশ এঁটে সর্বত্র আপন দৈন্যকে জাহির করে বেড়াচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'বিদেশের ভালো জিনিস থেকে শিক্ষা নিতে হবে বৈকি। কিন্তু তার জন্য প্রথমে নিজেদেরই ভালো করে জানা দরকার।'[৫৬]

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৮ সাল থেকেই যেটা আরম্ভ হয়েছিল তা হলো খেতাব ও পদক বিতরণ। সমাজকর্মী, লেখক, শিল্পী-সাহিত্যিক প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই উপহার বিতরণ সীমাবদ্ধ ছিল।[৫৭] বহুসংখ্যক লেখক ও শিল্পী শাসকগোষ্ঠীর প্রলোভনে পা দিয়েছিল।[৫৮] এ ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে পাকিস্তানি শাসকদের বাঙালিদের প্রতি যে গোপন অভিসন্ধি ছিল, তা পরবর্তীকালে ব্যর্থ হয়।[৫৯] কারণ বুদ্ধিজীবীদের সুবিধা দিলে যে সবক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যেত তা নয়। তারা নিজেদের মতো করে কাজ করে গেছেন।

জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও অন্যান্য শিল্পীর কর্মে পাকিস্তানের সমসাময়িক[৬০] আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং জীবনে যে কোনো প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে। এ সময়ের কাজগুলোর মধ্যে *সংগ্রাম*, *বিদ্রোহ*, *প্রত্যাবর্তন*, *ঝড়*, *জমিতে মই দেওয়া* প্রভৃতি। জয়নুল আবেদিনের এই কাজগুলোর মূলভাব হলো–বাঁচার জন্য সংগ্রাম এবং যে কোনো প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

সংগ্রাম (১৯৫৯)

সংগ্রাম[৬১] ছবিটি জয়নুল আবেদিন ১৯৫৯ সালে আঁকেন। এর ঠিক আগের বছর আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করেন। তখন স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ ছিল না। তাই শিল্পী রূপক ও বিমূর্ত চিত্রের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের চিত্র তুলে ধরেন। এই ছবির মধ্যে কাঠের গুঁড়ি বোঝাই একটা গরুর গাড়ি থলথলে এঁটেল কাদায় আটকে গেছে। বদল দু'টি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গাড়িটা টানছে এবং গাড়ির চালকও সমস্ত শক্তি দিয়ে গাড়ির চাকা সজোরে ধাক্কা মারছে। উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় গাড়িটাকে কাদা থেকে উঠাতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। কিন্তু চাকা এতটুকুও নড়ছে না।[৬২] চালকের এই সংগ্রাম একক কোনো ব্যক্তির সংগ্রাম হিসেবে নয়, এটি বাঙালি জাতির সংগ্রাম। নব্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানি রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অর্থাৎ বাঙালিরা অমানবিক পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাদের ভাগ্য ফিরছিল না। বাঙালির পরিশ্রম বিফলে যায়, কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির পরিশ্রমের ফল ভোগ করছিল। এই চিত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষণের একটি ছবি ফুঠে ওঠে। তবে শিল্পী হতাশ হন নি। তিনি বলদ দু'টির বিপরীতে পীত বর্ণের কিছুটা উন্মুক্ত পশ্চাদ্‌ভূমি যা একটা আশার আলো দেখায়। আর কিছুক্ষণ চেষ্টা অব্যাহত রাখলে গাড়িটা কাদা থেকে উঠে আসবে এবং গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবে।[৬৩] পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে যে শোষণ শাসকগোষ্ঠী শুরু করেছিল সেখান থেকে কোনো আশা দেখা যাচ্ছিল না বাঙালির মুক্তির। কিন্তু ৫২ ভাষা আন্দোলন বাঙালির মধ্যে আশার সঞ্চার করে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার আদায় করা যায়। এই চিত্রটাই যেন

শিল্পী *সংগ্রাম* ছবিটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সমস্ত প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা উত্তীর্ণ হওয়া জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে সর্বক্ষেত্রে উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রগতিশীল সংস্কৃতির ইঙ্গিত দেয় যা সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে।

প্রত্যাবর্তন

প্রত্যাবর্তন[৬৪] শিল্পকর্মটির মাধ্যমে ঐ সময়ের পাকিস্তানের পরিস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালিরা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু নতুন দেশেও তাদের ভাগ্য ফিরে না। পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত হতে থাকে। পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্তি হয়ে বাঙালি তার নতুন আশ্রয় খোঁজে আছে। সেই বিষয়টি শিল্পী জয়নুল আবেদিন *প্রত্যাবর্তন* চিত্রে তুলে ধরেন। *প্রত্যাবর্তনে* একপাল গরু ভীত সংকিত হয়ে নিজ গৃহ বা কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। নববর্ষের শুরুতে কালবৈশাখী ঝড় উঠেছে। বড়ো বড়ো ফোটায় শিলাবৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। অল্প সময়ের ভিতর মুষলধারে বৃষ্টি নামবে। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক ও মেঘের গুড় গুড় শব্দে গরুগুলো দারুণ ভয় পেয়ে দিশাহারা হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছে। নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি করে ছুটছে। নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে, ভয়ে গোঙাচ্ছে।[৬৫] নববর্ষের শুরুতে কালবৈশাখী ঝড় হলো পাকিস্তানি রাষ্ট্রের শুরুতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালির ওপর শোষণের শুরু। বাঙালি সেই শোষণ থেকে মুক্তির জন্য শুরু থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে থাকে।

ঝড়

ঝড়[৬৬] জয়নুল আবেদিনের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। এজন পথচারী একাকী কালবৈশাখীর প্রবল ঝড় ও শিল্প বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে অতিসন্তর্পণে প্রতিকূল অবস্থার বিপরীত দিকে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাপটা যেন তাকে পেছন দিকে উল্টে ফেলতে চায়। সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাতাসের ঝাপটা সামলে নিচ্ছে, ছাতাটা সামনের দিকে কাঁত করে ধরে নিজেকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছে। বাতাসে গায়ের জামা পত পত শব্দে পেছন দিকে উড়ছে।

পশ্চাদ্‌ভূমিতে গাছের দোলায়িত পল্লব ও প্রবলভাবে আন্দোলিত নারকেল গাছের পাতা থেকে ঝড়ের তীব্রতা ও গতি সহজে অনুভব করা যায়। পথচারীর ওপর তীব্র আলো থেকে বিদ্যুতের চমক অনুভূত হয় এবং বজ্রপাতের বিকট শব্দ ভীতি সঞ্চার করে। নরমূর্তির ওপর উজ্জ্বল আলোকপাতের ফলে চারদিকের অন্ধকার প্রকৃতি আরও অন্ধকার মনে হয়।

পঞ্চাশের দশকে সমসাময়িক সময়ের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শিল্পী একাকী অগ্রনায়ক হিসেবে ব্যক্তিগত জীবন এবং শিল্প-আন্দোলনকে যেভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঝড় তারই প্রতীকী প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে, এই ছবির ভিতর দিয়ে তিনি সব মানুষের সাহসিকতা ও সতর্কতার সাথে যে কোনো প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে এবং প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আপন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগন।[৬৭]

গুণটানা

ষাটের দশকের প্রথমার্ধে আঁকা *গুণটানা* জয়নুল আবেদিনের অন্যতম কর্ম। পাঁচজন লোক প্রবল স্রোতের উজানে বৃহদাকার একটি বোঝাই বজরা গুণ টেনে চলেছে। চৈত্রের দারুণ খরায় ঝলসানে রোদের মধ্যে ক্ষুৎপিপাসায় লোকগুলো ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। গ্রীষ্মের রোদে তাদের ঘর্মাক্ত দেহ চিকচিক করছে। তবু তারা মরিয়া হয়ে গুণ টেনে চলেছে যতক্ষণ পর্যন্ত গন্তব্যে না পৌঁছায়।

এই ছবির মধ্যে একদিকে ব্যক্তিগত এবং অন্যদিকে জাতীয়জীবনের মহান কিছু অর্জন ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচেষ্টা ও বাঁচার জন্য কঠোর সংগ্রাম এবং অপরদিকে জাতীয় স্বার্থে ঐক্য ও পারস্পারিক

সহযোগিতার বাণী প্রকাশ পেয়েছে। একইভাবে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেণি যে কঠোর কায়িক পরিশ্রম করে এবং সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে তা প্রতিফলিত হয়েছে।[৬৮]

জয়নুল আবেদিনের বেশিরভাগ ছবিই প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম ও জীবনের প্রাত্যহিকতাকে উপজীব্য করে আঁকা রোমান্টিক আবহের। গুনটানা, সংগ্রাম, মই দেওয়া এইরকমের কিছু ছবি। যেখানে দেখা যায় এইসব প্রান্তিক মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার তাগিদ আছে, পরিশ্রম করার মানসিকতা আছে এবং করছেও। কিন্তু হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও নিজেদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না তারা। কারণ সেই শোষণ। জমিদার প্রথা গেছে, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ কাঠামো ভেঙে গেছে। তাতে কিছুই হয় নি। বরং সবকিছু আগের মতোই আছে। শুধু চেহারা বদলে শোষণ চলছে। শুধু শোষক পাল্টেছে, ধারা বদলেছে। কৃষক ধান-পাট উৎপাদন করছে কিন্তু ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। ক্ষোভে কেউ কেউ উৎপাদিত পাট হাট-বাজারে দাঁড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। গণতান্ত্রিক সমাজে কৃষকের সমস্যা নিয়ে কেউ ভাবে নি। যেখানে সরকার সবচেয়ে বড়ো শোষক। তাদের শোষণের শিকার গুনটানা মাঝি, কাদায় দেবে যাওয়া গাড়ির চাকা ঠেলা গাড়োয়ান, জমিতে মই দেওয়া কৃষক। এরা সংগঠিত নয়, তবু এদের মাঝে প্রতিবাদী শক্তি আছে। এরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তহীন সংগ্রামের প্রতীক।[৬৯] বাংলার শিল্পীরা এভাবে জানগণকে জাগিয়েছে, তাদের অবস্থান বুঝিয়েছি অঙ্কনের মাধ্যমে। সমাজে যখন কোনো কথা বলা যাচ্ছিল না তা শিল্পীরা বিমূর্ত ছবি অঙ্কন করে জনগণের কাছে প্রতিবাদের বাণী পৌঁছে দিয়েছে। এভাবে বাঙালির দেশের মুক্তির সংগ্রামের প্রত্যেকটি পর্যায়ে শিল্পীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছে।

ডেড লিজার্ড (১৯৬১)

১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমিতে 'সমকালনীন চিত্রকলা' শীর্ষক এক প্রদর্শনীতে মুর্তজা বশীর 'ডেড লিজার্ড' নামে একটি ছবি ছিল। শিল্পী মুর্তজা বশীর ছবি সম্পর্কে বলেন, 'সেই মৃত টিকটিকিটা হচ্ছে এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজে মানুষের প্রতীক, আমরা যেখানে জীবন্মৃত।...চলছি, নড়ছি, তবু আমাদের মধ্যে প্রাণ নেই।'[৭০]

এই ছবির মাধ্যমে তিনি পরাধীনতার কথা বোঝাতে চেয়েছেন। বাঙালিরা পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। কিন্তু সেই দেশে তারা স্বাধীন নয়। প্রথম থেকেই শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে বিভিন্নভাবে শোষণ করে আসছিল, বিশেষ করে সাংস্কৃতিকভাবে। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও বাঙালি নিজের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করার পর সেই অধিকারটুকুও হরণ করা হয়।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার ডিজাইন সেন্টার

১৯৬০ সালের ১৬ মার্চ শিল্পী কামরুল হাসান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার ডিজাইন সেন্টারে চিফ ডিজাইনার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর থেকে লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির বিকাশের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। কারণ শিল্পী কামরুল হাসান লোকশিল্প ও হস্তশিল্পের জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয় এবং বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৭১] যেখানে এ অঞ্চলের শিল্পীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পাশ্চাত্য শিল্পরীতি, সেখান থেকে কামরুল হাসান তাদের দেশীয় ঐতিহ্যর প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। আবদুল হাফিজের ভাষায় :

> পুতুল তৈরি, ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পের ডিজাইন, মাটির তৈরি সব রকমের শিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ, শোলার কাজ, নকশী পিঠে ও পিতল-কাঁসার কাজ এবং বাংলাদেশের দেউল-মন্দিরের কারুকাজ প্রভৃতি দেখে তিনি বিসিকের ডিজাইন সেন্টারকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে লোকশিল্পের ডিজাইন তাঁর নিজস্ব চিত্রকর্মে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।[৭২]

কামরুল হাসান ডিজাইন সেন্টারের দায়িত্ব লাভ করে লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির বিকাশে আত্মনিয়োগ করেন। কাইয়ুম চৌধুরীর ভাষায়,

> ডিজাইন সেন্টারে চাকরিতে বহাল থাকাকালীন কামরুল ভাই এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকশিল্পের সঙ্গে তাঁর একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং লোকশিল্পীদেরও সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন।

বহুস্থানে সরকারিভাবে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও তিনি বিলুপ্তপ্রায় লোকশিল্পের বিলুপ্তিরোধে আর্থিক সহায়তা দান করেছেন।[৭৩]

বাংলাদেশের চিত্রকলা আন্দোলনে এই ডিজাইন সেন্টারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কামরুল হাসান নিজেই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশে চারু ও কারুকলার ক্ষেত্রে অবদানের কথা বিচার করলে কলাভবনের পরেই ডিজাইন সেন্টারের অবস্থান।'[৭৪]

যদিও ডিজাইন সেন্টার কেবল কারুশিল্পের প্রসারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শিল্পী কামরুল হাসান নিজ উদ্যোগে এর বাইরে গিয়ে যে কাজগুলো করেন–পাটের তৈরি প্রচুর ছিকা সংগ্রহ এবং বিদেশে রপ্তানি, ছিকার ডিজাইন থেকে পাট দিয়ে তৈরি মহিলাদের ব্যাগ। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রস্তুত বাংলার নিজস্ব আঙ্গিকের পণ্য শুধু দেশে না বিদেশেও পরিচিত করান যা এই অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে।[৭৫] এইসব ছিকা ও ব্যাগ তৈরির সাথে জড়িত ছিল গ্রাম বাংলার মহিলারা। পাট পণ্য রপ্তানি করে পাকিস্তান যে প্রচুর বৈদিশক মুদ্রা অর্জন করে এবং তা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করছে তা গ্রাম বাংলা সাধারণ মানুষকে সহজেই বোঝানো সম্ভব হয়েছিল কারণ তারা তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছিল না। ফলে শাসকগোষ্ঠীর শোষণ সহজেই সাধারণ মানুষের চোখে ধারা পরে কারণ তারা সরাসরি কাজের সাথে যুক্ত ছিল।

বাংলার গ্রামাঞ্চলের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং বংশ পরম্পরায় কুটির ও কারুশিল্প কর্মে নিয়োজিত শিল্পীদের উৎপাদিত হস্ত ও কারুশিল্প পণ্যের বিকাশ সাধন, এই শিল্পের ঐতিহ্য এবং এর মাধ্যমে বিহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে তুলে ধরার স্বপ্নকে ধারণ করেই মূলত কামরুল হাসান নকশা কেন্দ্রকে সেইভাবে গড়ে তোলেন।[৭৬]

সৈয়দ আজিজুল হক শিল্পী কামরুল হাসান সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বলেন,

> কামরুল হাসানের জীবনবোধ গঠনে বাঙালি জাতীয়তাবাদে আস্থা, সুগভীর দেশপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবলভাবে সক্রিয় থেকেছে। বাঙালি সংস্কৃতি ও দেশি ঐতিহ্যের প্রতিও তাঁর মনে ছিল এক প্রকার বিশুদ্ধ অনুরাগ। এই দেশ, দেশের মানুষ, অতীত ঐতিহ্য, এখানকার প্রকৃতি, মানুষের আবেগানুভূতি, তাদের সৃষ্টিশীলতা প্রভৃতি তাঁকে মুগ্ধ করেছে এবং তাঁর চিত্রভাষা বা চিত্রের আঙ্গিক নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ... লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতি কিংবা হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের বিকাশে তাঁর প্রাণবন্ত প্রয়াসের মূলে সক্রিয় তাঁর সুগভীর স্বাজাত্যচেতনা। ...বাঙালিত্বের সাধনাই হয়ে উঠেছিল তাঁর আমৃত্যু জীবনসাধনার অংশ। সামরিক স্বৈরতন্ত্র, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা ও ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি কামনা করতেন এমন এক সমাজ বা রাষ্ট্রের–যা হবে সকল প্রকার বৈষম্যমুক্ত, শোষণ ও বঞ্চনাহীন, আধুনিক চিন্তাচেতনার ধারক।[৭৭]

এত কিছু সত্ত্বেও ১৯৬৫ সালে কামরুল হাসান প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (তমঘা-ই-পাকিস্তান) লাভ করেন। পুরস্কারের মূল্যমান ছিল দশ হাজার রুপি। সমালোচকদের মতে কামরুল হাসানের 'প্রার্থনা' রেখাচিত্রটিকে বিবেচনায় নিয়ে তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। যদিও কামরুল হাসান আইয়ুবের সামরিক শাসনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তবু তিনি এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যন করেন নি। এই পুরস্কার প্রাপ্তিকে তিনি বিজয় হিসেবে নিয়েছিলেন। তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁকে যে পুরস্কার দেওয়া হলো–সেটা তাঁকে কেনার জন্য, তা তিনি মনে করতেন না। বরং তাঁকে বাদ দেওয়া যে কোনোভাবে সম্ভব হয় নি, পুরস্কার প্রদানের ঘটনাটিকে তিনি সেভাবেই মূল্যায়ন করেছেন।

বিক্ষুব্ধ মাছ (১৯৬৪)

১৯৬৪ সালে এচিং-অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে সফিউদ্দীন আহমেদ অঙ্কন করেন দুটি চিত্র–'নীল জল' ও 'বিক্ষুব্ধ মাছ'। এসব চিত্রের পটভূমি ১৯৫৪-৫৫-র বন্যা।[৭৮] মাছের জালে আবদ্ধ রূপটি এখানে স্পষ্ট করে তোলা হয়। শিল্পীর এর মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন বাঙালি পাকিস্তানি শোষকদের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আছে।

সৈয়দ আজিজুল হক 'বিক্ষুব্ধ মাছ' সম্পর্কে বলেন,

‘বিক্ষুব্ধ মাছ’ শীর্ষক চিত্রটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জালে আবদ্ধ মাছটির চোখে যে বিক্ষোভের আগুন তা তৎকালীন পাকিস্তানি সেনাশাসকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শৃঙ্খলিত মানুষের অন্তঃক্ষোভেরই প্রতীকী প্রকাশ। স্মরণীয় যে, মাছ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং জাতীয় জীবনের মর্মবেদনাকে রূপকায়িত করার জন্য মাছের এই ব্যবহার চিত্রটিকে অন্যভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।[৭৯]

এই ভূখণ্ডের মানুষ মাছে ভাতে বাঙালি বলে পরিচিত। অর্থাৎ মাছ বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিল্পী মাছের জীবনের সাথে বাঙালির জীবনের তুলনা করেছেন। এবং তিনি এর মাধ্যমে বাঙালিকে মাছ এবং জাল ফেলা মাঝিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করেন। এতে বাঙালিরা সহজেই বুঝতে পারেন তাদেরকে কীভাবে শাসকগোষ্ঠী শোষণ করে যাচ্ছে। এই শোষণ থেকে দ্রুত মুক্তির জন্য বাঙালি তাড়না অনুভব করে।

প্রার্থনা (১৯৬৫)

কামরুল হাসান *প্রার্থনা*[৮০] শীর্ষক রেখাচিত্রটি তাঁর শিল্পী জীবনের ব্যতিক্রমী কাজ। এ রেখাচিত্রে একজন মুসলমান জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে নামাজের মধ্য দিয়ে সে পরম শক্তিশালী ও করুণাময় আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করছে। সে তার অতীতের কৃত পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সে জীবনের আত্মতৃপ্তি ও প্রশান্তি ফিরে পেতে চায়।[৮১] যার মধ্যে ইসলামী আদর্শ ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। এই রেখাচিত্র শাসকগোষ্ঠীর বিচারক ও বিশ্লেষক তাঁকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেন। কারণ এই কাজটি ছাড়া আর কোনো কাজের মধ্যে ইসলামী আদর্শ বা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায় না। বরং তিনি বাংলার ঐতিহ্য ও বাঙালিত্ব নিয়েই জীবনের বেশিরভাগ সময় কাজ করেছেন এবং অন্যান্য শিল্পীদের তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বিদ্রোহী (১৯৬৬)

বিদ্রোহী ছবিটি জয়নুল আবেদিন **১৯৬৬** সালে অংকন করেন।[৮২] *বিদ্রোহী* চিত্রে একটি ষাঁড় দড়ি দিয়ে খোঁটায় বাঁধা রয়েছে। কিন্তু সে এই শৃঙ্খলিত অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সে এমনিভাবে সারা জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে চায় না, পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ি ছিড়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে।[৮৩] ষাঁড়টির মধ্যে একটি অদুর্দমনীয় শক্তি, তেজস্বিতা ও অন্তর্নিহিত সঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।[৮৪] আবুল মুনসর *বিদ্রোহী* ও অন্যান্য[৮৫] কয়েটি চিত্র সম্পর্কে বলেছেন,

> ..এগুলো দর্শকের চিত্তে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে সমর্থ। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এগুলোর উপাদান উঠে এসেছে একেবারে স্থানীয় জীবনের নির্যাস থেকে এবং তাঁর দ্রুতগামী বলিষ্ঠ রেখায় মানুষের এক অজেয় সংগ্রামী সত্তা বিম্বিত হয়েছে বলে।[৮৬]

কালি-কলম দ্বারা তিনি আরও একটি রেখা চিত্র আঁকেন যেখানে ষাঁড় দড়ি ছিড়ে পালাবার চেষ্টা করছে এবং অন্যটি উদাসীন নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন এই শৃঙ্খল জীবন মেনে নিয়ে অবস্থার সাথে মানিয়ে নিয়েছে। যার মধ্য দিয়ে গরিব পরাধীন সমাজের মনস্তাত্ত্বিক ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।[৮৭]

এই ছবির ভিতর যে শুধু তৎকালীন বাংলাদেশের সমকালীন অবস্থার প্রতীকী একাশ পেয়েছে তা নয়, বস্তুত তিনি শৃঙ্খলিত সমগ্র মানবজাতির মুক্তি কামনা করেছেন। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর জয়নুল আবেদিন ও তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

> জয়নুল আবেদিন লোকজ ফর্ম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই ফর্ম গ্রামীণ অভ্যাসজাত নয়, এই ফর্ম দেখে বাঙালি ঐতিহ্যের বোধ মনে তৈরি হয়, কিন্তু সে ঐতিহ্যের মধ্যে বর্তমানের কৃষক জীবনের দুই ঔপনিবেশিক যন্ত্রণা তিনি প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর ফর্ম দেখে মাথা ঠাণ্ডা এবং চোখ শান্ত রাখা যায় না, দর্শক অজান্তেই ফর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশের সমালোচনামনস্ক চেতনা তৈরি করে, প্রতিবেশের মধ্যে যুক্ত হয়ে পড়ে। আবেদিনের চৈত্রের দগ্ধদুপুরে খুঁটাবন্দি ষাঁড় ছবিটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দিগন্তের মধ্যে সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করে ষাঁড়টা খুঁটা উপড়ে ফেলবেই, পলকের

মধ্যে, কেউ ঠেকাতে পারবে না, কেউ কখনো ঠেকাতে পারে না। এভাবেই ষাঁড়টি কৃষক জীবন থেকে উত্থিত হয়ে ঔপনিবেশিক মুহূর্তের একটি প্রতীকে পরিণত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক মুহূর্তটি অতিক্রম করে চিরন্তনতার মর্যাদা পেয়ে যায়।[৮৮]

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত মানবসমাজের মুক্তি কামনা করেছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতীকী ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে আখ্যায়িত করলে হয়তো ভুল হবে না।[৮৯]

ছয়দফা ও শিল্পী সমাজ

ষাটের দশকের মধ্যভাগে দেশে যখন পাকিস্তানি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছাত্রজনতার সংগ্রাম চলছে সেসময় শিল্পীসমাজ এবং প্রগতিশীল ছাত্র ও সংস্কৃতিকর্মীরা এক সাথে কাজ করে। ১৯৬৬ সালে তদানীন্তত পূর্বপাকিস্তান জুড়ে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালির জাতিসত্তা তখন ধীরেধীরে বিকশিত হচ্ছে। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান একক স্থান অধিকার করে নিচ্ছে। ৬ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে আন্দোলনকে সুসংগঠিত রূপ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের প্রচার বিভাগের নূরুল ইসলাম শিল্পী হাশেম খানকে ছয়দফার ঘোষণাপত্রের একটি নকশা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।[৯০] শিল্পী হাশেম খান এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করে বলেন,

> ১৯৬৬ সালের এক সন্ধ্যায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি (নূরুল ইসলাম) আমার ঠিকানায়–২৫ গোপীবাগ ৩য় গলির বাড়িতে। বললেন, আওয়ামী লীগের ৬ দফার লোগো, পতাকা, প্রচার পুস্তিকা, প্রচ্ছদ ও পোস্টার ইত্যাদি করতে হবে। মুজিব ভাইয়ের সাথে আলোচনা করে এসেছি আপনাকেই সব করতে হবে।[৯১]

হাশেম খান ছয়রঙের সমন্বয়ে ছয়দফার একটি ডিজাইন তৈরি করে দেন। হাশেম খান নূরুল ইসলামকে বলেন, ছয় দফার আরও একটি মর্মার্থ আছে। আমাদের দেশে ঋতুর সংখ্যা ছয়। ঋতুগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ছয়দফাও ঠিক তেমনি করেই বাঙালির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রতীক হিসেবে গৃহীত হবে। ঘোষণাপত্রের নকশটি বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি ডিজাইনটি দেখে খুশি হলেন। নূরুল ইসলাম ছয়দফার বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ঐসময় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধু বললেন, ছয়দফা ঘোষণার জন্য যে মঞ্চ তৈরি করা হবে, ঘোষণাপত্রের ডিজাইন অনুসারে সেই মঞ্চের ডিজাইন তৈরি করতে হবে।[৯২] হাশেম খান মঞ্চ তৈরির দায়িত্ব পান। তিনি বীরেন সোম, আবুল বারক্ আলভী ও মঞ্জুরুল হাই এই তিনজনের সহায়তায় মঞ্চ বানানোর কাজটি সম্পন্ন করেন।[৯৩] ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে পূর্বপাকিস্তানের জনগণের বাঁচার দাবি হিসেবে ৬ দফা কর্মসূচিকে ব্যাখ্যা করেন।

দেয়াল (১৯৬৬)

মুর্তজা বশীরের অংকন তাঁর সমাজচেতনা ও উদ্দীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তিনি অসংখ্য সিরিজ ছবি আঁকেন। তার মধ্য *দেয়াল* সিরিজ অন্যতম। মুর্তজা বশীর *দেয়াল* সিরিজটি শুরু করার কারণ সম্পর্কে বলেন,

> ১৯৬৬ সালের শুরুতে আমিনুল ইসলাম, তার কিছু পরে মোহাম্মদ কিবরিয়া বিমূর্ত রীতির চিত্র রচনা করছে। আমি তখনো ফিগারেটিভ কাজ করি। সমাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা ছিল। নিজের মানসিক তৃপ্তির জন্য ছবি আঁকায় বিশ্বাস করতাম না। একদিকে সমাজের প্রতি আমার অঙ্গীকার, অন্যদিকে বিমূর্ত ছবি না আঁকার কারণে বন্ধুদের কাছে অনাধুনিক গণ্য হচ্ছি কিনা, সেই হীনম্মন্যতায় আমার মধ্যে একধরনের টানাপড়েন চলছিল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলের কারণে দেশে তখন দমবদ্ধ অবস্থা। আর্থসামাজিক কারণে সমাজে সবার মধ্যে দ্বন্দ্বের অদৃশ্য দেয়াল গড়ে উঠেছে।[৯৪]

শিল্পী অনেক দিন সময় নিয়ে ও বিভিন্ন জায়গায় বসে এই সিরিজটি আঁকেন। প্যারিসে থাকার সময়ে ১৪টি ছবি, ১৯৬৬ সালে ঢাকায় 'দেয়াল' সিরিজের ২৪টি, সারগোদায় পরবর্তী বছরে ৩১টি, '৬৯-এর শেষে করাচিতে সিরিজের ২৩টি ছবি। মোট ৯২টি ছবি আছে 'দেয়াল' সিরিজের'।'[৯৫] তাঁর দেয়াল সিরিজের মধ্যে ছিল–জেলখানার দেয়াল, দেয়ালে দাগ দেওয়া, পাশে পেরেক ঠুকানো। তাঁর *দেয়াল* সিরিজটিকে প্রতিটা শিল্পানুরাগী ও সমালোচকেরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল। তার

কারণ এই সিরিজে বক্তব্য ছিল এবং ছিল অঙ্গীকার। যা শিল্প ও বক্তাকে একই মোহনায় নিয়ে এসেছিল। আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনামলে সমাজে আর্থসামাজিক কারণে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র-কন্যার মধ্যে এক অদৃশ্য দেয়াল তুলে দিয়েছিল। যাকে তিনি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিল।[৯৬] মুর্তজা বশীর *দেয়াল* সম্পর্কে বলেন,

> এই দেয়াল সিরিজের ভেতর দিয়ে আমি তুলে ধরতে চেয়েছিলাম এই সমাজ ব্যবস্থার ফলে আমরা একটি অদৃশ্য প্রাচীরের ভেতর বন্দি। তাতে কেউ কারো সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে পারছে না। না বুঝতে পারছে পিতা তার পুত্রকে, স্ত্রী তার স্বামীকে এবং বন্ধু তার বন্ধুকে। কোথায় জানি একট অদৃশ্য দেয়াল রয়েছে। আমার মনে হয়েছিল যে, আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষ ক্রমেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে অসুস্থ পিতাকে মনে হয় গলগ্রহ, বেকার ভাইকে মনে হয় অপদার্থ, অবিবাহিত বোনকে মনে হয় বোঝা। এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে সবকিছুর।[৯৭]

ন্যুড ড্রইং

বাঙালি মনোভাবে ও সংস্কৃতিতে শরীর, প্রেম, যৌন, যৌনতা, উন্মত্তা এবং অসুস্থতা অপরাধবোধের সঙ্গে যুক্ত।[৯৮] পাকিস্তানের মতো ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে এ ধরনের ছবি আঁকার জন্য প্রচণ্ড সাহসের প্রয়োজন হয়। যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না, সেই দেশে ন্যূড জাতীয় ছবি আঁকা মানে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ করা। এবং শিল্পীগণ এতে সফল হয়েছেন। আমিনুল ইসলাম মধ্য ষাটে মানব-মানবীর 'ন্যূড' ড্রইং করেছেন কালি-কলমে।[৯৯] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর শিল্পী আমিনুল ইসলাম সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> আমিনুল ইউরোপ থেকে সাইকিকভাবে শূন্য হয়ে এবং অতিমাত্রায় যুক্তিবাদী হয়ে ফিরে এসে নিজের দেশের ঔপনিবেশিক অবস্থান, ধর্মজ মতাদর্শের চাপ, সমাজ ও রাজনীতির নানা ভণ্ডামির সম্মুখীন হন। তার মানসক্ষেত্রে সংঘাত তৈরি হয় এবং বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় তিনি ধাক্কা খেয়ে সচেতন হন এবং আবিষ্কার করেন তার নিজের দেশের ধর্মবহির্ভূত ও ধর্মবিচ্যুত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক।[১০০]

ফলে শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয় ধর্মের বেড়াজাল এড়িয়ে দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে থেকে একই ধরনের আঁকা কাজ করা। তবু যে বাধা আসে নি তা নয়। কিন্তু সহসের সাথে তিনি তা মোকাবেলা করে গেছেন।

১৯৬৬-৬৮ সালের দিকে কামরুল হাসান আধা-বিমূর্ত এবং স্টাইলাইজড নারী-অবয়ব এঁকেছেন প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রেই নারীচরিত্র স্বল্পবসনা বা একেবারেই আদুল গা ও আকর্ষণী স্তনাধিকারী। তাঁর তেলরঙ্গে 'স্নান' শীর্ষক ছবিটি ১৯৬৬ সালের, এতে দিঘিতে স্নানরতা অর্ধ-অনাবৃতা নারী চিত্র খুবই উদার সংস্কৃতির আবহের পরিচায়ক।[১০১] কামরুল হাসানের কাজের প্রবল শারীরিকতা এবং যৌনতা এবং শরীরী বিষয়ের উপস্থাপনা তৎকালীন সমাজে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছে। তিনি একান্ত ভাবনার বিষয়, গোপন বিষয়, নিষিদ্ধ বিষয় চোখে তুলেছেন, ফলে ভাবনার একান্ততা, গোপনতা, নিষিদ্ধতা খান খান হয়ে গেছে।[১০২]

বাংলাভাষা ও চিত্রশিল্পী

ভাষাকেন্দ্রিক আগ্রাসন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকে শুরু করে। শিল্পীদের সাথে প্রথম থেকেই ভাষার প্রশ্নে সরকারের একটি বিরোধ ছিল। ডিজাইন সেন্টারের দায়িত্বে থাকাকালে অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তা হয়েও শিল্পী কামরুল হাসান নীতির প্রশ্নে বা প্রাদেশিক স্বার্থের প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন। বিশেষভাবে বাংলা ভাষার প্রশ্নে তিনি কখনও আপন করেন নি। অফিসের ফাইল ইংরেজিতে লেখার নিয়ম ছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> তাঁতী, কামার, কুমার, মালাকার, এদের সমস্যা সমাধানই যদি ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের প্রধান দায়িত্ব হয় তাহলে বলব যে এ ধরনের সংস্থার অন্তত আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনা যদি বাংলায় হতো তাহলে আমরা আজকের তুলনায় বহুগণ বেশি কাজ করতে পারতাম তথা দরিদ্র গ্রাম্য শিল্পপতিদের সমস্যার সমাধান করতে পারতাম। বাংলা বাংলা বলে আমরা চীৎকার করলেও আজও আমরা আমাদের লক্ষ লক্ষ তাঁতী কামার কুমোরদের বাংলা ভাষায় তাদের সমস্যা পেশ করবার ভরসা দিতে পারি নাই। তারা নিজেদের তাগিদে কিছু কিছু দরখাস্ত বা আবেদনপত্র বাংলায় লিখে আনলেও তার ওপর যখন

> অফিস কর্তৃপক্ষ ইংরেজিতে অভিমত লিখে তার হাতে ফেরত দেয় তখন তা তার সপক্ষের হলেও সে কিছুই বুঝতে পারে না ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।[১০৩]

বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্ব নিয়ে তিনি প্রশাসনের সঙ্গে লড়াই করেছেন। কাজের মধ্য দিয়েও তিনি বাঙালিত্বে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথম বাংলায় অভ্যন্তরীণ নোট দাখিল করা শুরু করেন। তিনি যুক্তি হিসেবে বলেছেন–'রাষ্ট্রভাষা যেহেতু বাংলা সেহেতু বাংলায় লিখতে অপরাধ কোথায়?' ১৯৬৯ সাল থেকে শিল্পী সব নথিতে বাংলাই সই করতেন।[১০৪]

সরকার যে এটা খুব ভালোভাবে নিয়েছিল তা নয়। আইয়ুব খানের শাসনামলে ইপসিকের চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলির অভিযোগের ভিত্তিতে শিল্পী কামরুল হাসানের বিরুদ্ধে সামরিক আইনের অধীনে তদন্ত পরিচালিত হয়।[১০৫] কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি। ৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা কেমন হবে তা নিয়ে কামরুল হাসান নিজে পরিকল্পনা করেন। একুশের অনুষ্ঠানটি যাতে সুন্দরভাবে পালিত হয় সেইভাবেই তিনি সবকিছুর আয়োজন করেন। ৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি বাংলা একাডেমির বটবৃক্ষে অক্ষরবৃক্ষের প্রথম উদ্বোধন করেন।[১০৬] এই বর্ণতরু বা অক্ষরবৃক্ষ সকলকে মাতিয়ে তুলেছিল। গণঅভ্যুত্থানে সরাসরি অংশ নিয়ে কামরুল হাসান ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি সরকারি চাকরি করেন।[১০৭]

ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, '১৯৬৯ সালে 'অক্ষরবৃক্ষ' বাংলার পট বা নববর্ষ উৎসবকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে তাঁর অবদান অনেক।'[১০৮] অর্থাৎ শিল্পীদের এই উদ্যোগ ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ ও নির্দেশ করে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীও অক্ষরবৃক্ষ নিয়ে বলেছেন, 'আন্দোলনের পরবর্তী ধাপে কামরুল হাসান তৈরি করেছেন প্রতীক হিসেবে অক্ষরবৃক্ষ। সমগ্র বাংলাদেশে এই অক্ষরবৃক্ষকে রোপণ করতে হবে যাতে একদিন এই বৃক্ষ মহীরুহে পরিণত হয়। ... বাংলা হরফ দিয়ে শাড়ীর নকশা উনসত্তরে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি।'[১০৯]

নবান্ন (১৯৬৯)

১৯৬৫ সালের পর থেকে রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আঞ্চলিকতাবাদ ও সাংস্কৃতিক চেতনা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন।[১১০] ১৯৬৯ সালে 'নবান্ন' প্রদর্শনীর জন্য বিশেষভাবে আঁকা ৬৫ ফুট দীর্ঘ এই স্ক্রল চিত্র নিয়ে নেতৃত্ব দিন জয়নুল আবেদনি। স্ক্রলের কাগজের প্রস্থ ছিল ৪ ফুট। এই চিত্রমালা তিনি তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস।[১১১] আবুল মুনসুর এ প্রসঙ্গে বলেনছে, 'এবারও তিনি সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য এড়িয়ে বাঙালিজীবনের এক আদ্যোপান্ত চিত্র তুলে ধরলেন জড়ানো পটের রীতিতে। বাঙালির কান্না-হাসি সংগ্রামের সেই চলমান ছবির মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর আত্ম-অনুসন্ধানে নির্যাস।'[১১২] গোটা বিষয়টিই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সামগ্রিকতা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছিল। এবং যা আমাদের শক্তিমত্তা ও প্রাক্-স্বাধীনতা পূর্বে চূড়ান্ত পর্যায়ের আত্মোপলব্ধির নামান্তর। শিল্পী সমাজের পক্ষ থেকে হলেও বৃহত্তর অর্থেই তা ছিল সামগ্রিকভাবে বাঙালির প্রতিনিধিত্বমূলক এক প্রতীকী বিস্ফোরণ।[১১৩] 'সোনার বাংলা'-র সুখ ও শান্তির দিনের চিত্র দিয়ে শুরু, তারপর ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত বাংলার ক্রম-নিঃস্বতার পরিণতি।[১১৪] এরপর তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে শোষণ গাঁয়ের স্বচ্ছল মানুষকে চরম দারিদ্র্যাবস্থা, দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেয় এবং তাদেরকে গ্রামত্যাগী করে শহরমুখী করেছে।[১১৫] উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় জয়নুল নবান্নের ছবি এঁকেছেন এর মাধ্যমে তিনি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন যার শুরু হয়েছিল ১৯৫৮-এর সামরিক শাসনের মাধ্যমে।[১১৬] বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির দাবিই ছিল এ গণআন্দোলনের মূল কথা। তখন এদেশের শিল্পীরাও জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন এবং ১৯৭০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আর্ট কলেজে *নবান্ন* শীর্ষক এক বিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।[১১৭] এই উপলক্ষ্যে তিনি অতি দীর্ঘায়তনের একটি ছবি আঁকেন। আবুল মনসুর বলেছেন :

> এ সময় উনসত্তরের গণজাগরণ বাঙালির সত্তায় প্রবলতম জাগরণের অভিঘাত হানলো। জয়নুলের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হলো ৬৫ ফুট দীর্ঘ 'নবান্ন' চিত্রে। বাঙালি জীবনের এক আদ্যোপান্ত চিত্র তুলে ধরলেন শিল্প জড়ানো পটের ঐতিহ্য। বাঙালির কান্না, হাসি, সংগ্রামের সেই চলমান ছবির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠলো তার আত্মঅনুসন্ধানের নির্যাস।[১১৮]

নবান্ন প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে জয়নুল আবেদিন বিলুপ্ত কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য উৎসব এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি চেতনা ও মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার ও পুনঃজাগরণের চেষ্টা করেন। সব বাঙালি শিল্পী বিরোধ ভুলে এই প্রদর্শনীকে সফল করার জন্য অংশগ্রহণ করেন।[১১৯] এ উপলক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশের জীবন শিরোনামে জলরং এবং কালি-কলম মাধ্যমে ৬৫ ফুট দীর্ঘ নবান্নের ছবি আঁকেন, যার মধ্যে কৃষিভিত্তিক সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে–

১. ধান কাটার পরে কৃষকের বিশ্রাম করছে
২. ধানের আঁটি মাথায় নিয়ে খামারে যাচ্ছে
৩. কৃষকের খামার
৪. খামারে ধান মাড়াই
৫. ঢেঁকিতে ধান ভানা
৬. ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো।

শীতের প্রারম্ভ অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকদের বাড়ি নতুন ধানে ভরে ওঠে। বাড়িতে বাড়িতে হাসির ফোয়ারা ঝরে, আনন্দের ঢেউ ওঠে। গ্রামের পর গ্রাম আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

তাঁর নবান্নভিত্তিক বাংলাদেশের জীবন শিরোনামের ছবিটির মধ্যে একদিকে যেমন এদেশের কৃষক সমাজের বিভিন্ন দিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ফুটে উঠেছে, অপরদিকে তেমনি তাদের বিশ্বাস, আশা ও আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই ছবির একেবারে বামদিকে একটি নিঃস্ব বাস্তুহারা কৃষক পরিবারের গন্তব্যহীন অনিশ্চিতের দিকে যাত্রা করার দৃশ্য অবতারণার ভিতর দিয়ে করুণ সুর বেজে উঠেছে।[১২০] এই বিয়োগান্তক নাটক অবতারণার জন্য সমস্ত হাসি-আনন্দ এক মুহূর্তে থেমে গেছে। এখানে আশাবাদ ও নৈরাশ্যবাদেও ভিতর দারুণ সংঘাত দেখতে পাই যার মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্য প্রাধান্য পেয়েছে। এই ছবিটির মধ্যে আশাবাদ প্রতিফলিত হয়েছে।[১২১]

এই নিঃস্ব সর্বহারা পরিবারের সাথে একটা কুকুরের অবতারণা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুকুরটি এই কৃষক গৃহে জন্মগ্রহণ করে লালিত-পালিত হয়ে বড়ো হয়েছে। অভাব-অনটনের মধ্যেও কৃষক পরিবার তাকে যখন পেরেছে এক মুঠো খাবার দিয়েছে। তাই আজ এই চরম দুর্দিনেও সে তার প্রভুকে ত্যাগ করতে পারেনি। সেও প্রভুর সাথে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে।[১২২] বাঙালি নিজেদের ব্রিটিশ শাসন শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নতুন দেশ একটি ঔপনিবেশিক শোষণ প্রক্রিয়া চালু করে। ফলে বাঙালিদের পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি আর আস্থা রাখা সম্ভব হয়নি। এই শিল্পের মাধ্যমে শিল্প বোঝাতে চেয়েছেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নিজেদের ভালো থাকার বাঙালির চেষ্টার অন্ত ছিল না কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তা হতে দেয়নি তাই বাধ্য হয়ে তাদেরকে মুক্তির পথ বেছে নিতে হয়েছে।

জয়নুল আবেদিন ‘নবান্ন’ দীর্ঘচিত্রের শেষ অংশে অনেকটা জায়গা জুড়ে দর্শর্কদের নিজের নাম সই করার জায়গা রাখেন যাতে তিনি যা বলতে চাচ্ছেন চিত্রের মাধ্যমে তারা সাথে জনগণ মানসিকভাবে সম্পৃক্ত হয়। এভাবে অসংখ্য মানুষকে শিল্পকলার সাথে সম্পৃক্ত করছেন যাদের মধ্যে দেশি-বিদেশি নামিদামি মানুষের সাথে অসংখ্য সাধারণ মানুষ ছিলেন।[১২৩] জয়নুল আবেদিন ছিলেন মুক্তিকামী মানুষ। স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করেন তাঁদের সবার সাথেই একাত্মতা জানাতে তিনি উৎসাহী ছিলেন।

মনপুরা (১৯৭০)

১৯৭০ সালে তুফান ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী দক্ষিণাঞ্চলে বিরাট এলাকা বিধ্বস্ত হয়। তিন লক্ষাধিক অধিবাসী ও সহস্রাধিক গবাদিপশু প্রাণ হারায়। এই ঘটনা চিত্রশিল্পীদের মনে রেখা পাত করে। জয়নুল আবেদিনসহ অন্যান্য শিল্পীগণ শুধু চিত্রাংকন করে ক্ষান্ত হননি তাঁরা ত্রাণ বন্টন করার জন্যে দুর্যোগ কবলিত এলাকায় যান। ত্রাণ কাজ করতে গিয়ে ধ্বংসাবশেষ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে যা পরবর্তীকালে তাঁর শিল্প কর্মের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই বেদনাদায়ক স্মৃতি

তিনি ৩০ ফুট দীর্ঘ ক্যানভাসের ওপর চিত্রায়িত করেন।[১২৪] ৭০-এর জলোচ্ছ্বাসের পর পাকস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দুর্গত বাঙালিদের প্রতি যে অবহেলা তা জয়নুলের চিত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

শত সহস্রাধিক লাশ একত্রে জড়ো হয়ে আছে। ক্যানভাসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুধু শবদেহ, শবদেহ আর শবদেহ। ধ্বংসাবশেষ স্তূপ হয়ে আছে। কিন্তু একেবারে ক্যানভাসের শেষ প্রান্তে একজন সুস্থ সবলদেহী লোক চুপ করে বসে আছে। তার সমস্ত আত্মীয়স্বজন, ঘর-সংসার মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেবল সেই রক্ষা পেয়েছে।[১২৫] এই ব্যক্তিকে বাঙালির সম্ভাব্য পুনরুত্থানের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে।[১২৬] এই সবলদেহী লোককে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেনি সরকার। তাদের নিজেদের ভাগ্য পুনর্গঠনের জন্য নিজেদেরই সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। জনগনের এই দুঃখ-দুর্দশা ফুটে ওঠে জয়নুলের *মনপুরা* চিত্রের মাধ্যমে। আবুল মনসুর লিখেছেন :

> সত্তরে ভয়াবহ ঘূর্ণিবার্তা তাকে আলোড়িত করেছে প্রবলভাবে... অঙ্কিত হলো ৩০ ফুট দীর্ঘ *মনপুরা* চিত্র। এখানে আবার দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্রমালার স্মৃতি যেন জাগরিত হলো। প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্বিত অবস্থানেই যেন জয়নুল সবচেয়ে ক্ষুরধার হয়ে ওঠেন। মনপুরা চিত্রে শেষবার ঝলসে উঠলেন মন্বন্তরের জয়নুল।[১২৭]

দুর্যোগের ফলে বাংলার মানুষ ছিল বিপর্যস্থ। শাসকগোষ্ঠী জনগণের দুর্দশা লঘবের দিকে কোনো দৃষ্টি দেনি। জয়নুলের মনপুরা চিত্রের মধ্যমে এই দুর্দশা বাংলার জনগণের সামনে একটি স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। বাঙালিকে কখনই ভুলতে দেয়নি ৭০-এর জলোচ্ছ্বাসের সময় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের সাথে কী আচরণ করেছিল।

চিত্রশিল্পীদের সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যক্রম

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রধান ভয় ছিল বাঙালিকে নিয়ে। তারা কখনও হিন্দু সংস্কৃতির নামে কখনওবা সমন্বয়ের নামে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। সাধারণ জনতাকে সাথে নিয়ে শিল্পী সমাজ এইসব আগ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাঙালির সংস্কৃতির পক্ষে।

বাংলা নববর্ষ পালনের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিয়ত বাধা দিয়েছে। এটাকে চিহ্নিত করেছে বিজাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে। শিল্পীগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং গড়ে তোলে প্রতিরোধ। ঢাকা শহরে বৈশাখী মেলা আয়োজনেরও অন্যতম উদ্যোক্ত ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কারুশিল্পীরা তাদের সৃষ্টির সম্ভার নিয়ে রাজধানী ঢাকায় পয়লা বৈশাখে মিলিত হন। নাগরিক জীবনে এ মেলার আকর্ষণ অবর্ণনীয়। বাঙালিত্বের চেতনা প্রসারের লক্ষেই কামরুল হাসান ঢাকায় বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন।[১২৮] একইসাথে শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক বিমূর্ত প্রতিবাদ হলো এই বৈশাখী মেলা। বাঙালিরা এই মেলাগুলোতে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। তাদের সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা জানানোর উপলক্ষ খুঁজে পায়।

শিল্পীদের কাজের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল সেখানেই তাঁরা তাঁদের শিল্প কর্মের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এমনটি একধরনের প্রতিবাদ শিল্পীরা পত্রিকায় কার্টুন এঁকে করেছেন। অর্থাৎ পত্রিকায় কার্টুন এঁকে শিল্পীরা শাসকগোষ্ঠী চরিত্র ফুটে তুলতে সহযোগিতা করতো। এ প্রসঙ্গে রফিকুন নবী বলেন,

> .. *ফোরাম* পত্রিকাটি ছিল ইংরেজি।... রেহমান সোবহান সাহেবেদের কথা ফেলতে না পেরে আমাকে তাঁদের পত্রিকাটিতে যুক্ত করেছিলেন। পত্রিকাটিতে পাকিস্তানের রাজনীতির খুঁটিনাটি নিয়ে সমালোচনাধর্মী লেখালেখিই ছিল প্রধান। আমিও তাতে কার্টুন এঁকে মজাই পেতাম।[১২৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও রচনাকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সংহতির জন্য হুমকি মনে করতো। তারা মনে করতে ভাষার এই সেতুবন্ধনের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে মানসিক সান্নিধ্য বৃদ্ধি পেলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য তা বিপদের কারণ। এইসব ভাবনা থেকে **১৯৬৭** সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী এক বিবৃতি দিয়ে বেতার ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার হ্রাস করার নিদের্শ দেয়। বাঙালি এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করে। এর প্রতিবাদে জয়নুল আবেদিনসহ **১৯** জন চিত্রশিল্পী প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেয়।[১৩০] এর অল্পকাল পরে আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি এঁকে দেন।[১৩১]

আটষট্টি-উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বাঙালি সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটে। সমাজের অগ্রসর ও সংবেদনশীল অংশ হিসেবে আর্ট কলেজের ছাত্ররা ও শিল্পীসমাজ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আটষট্টির ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা (আমিনুল ইসলাম, রশিদ চৌধুরী, ইমদাদ হোসেন, কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর) রাজপথসহ বিভিন্ন স্থানে আলপনা আঁকার রীতি প্রবর্তন করে। শহিদ মিনার থেকে আজিমপুর গোরস্তান পর্যন্ত পুরো রাস্তায় বাঙালি সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ অঙ্কিত আলপনা বাঙালির চেতনায় ভিন্ন একটি মাত্রা যুক্ত করে দিয়েছিল। শিল্পীদের একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক দল তদানীন্তন ডাকসু নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনী ও আলপনা আঁকার কাজ সংঘঠিত করেছিল।[১৩২]

উনসত্তরের ২১শে ফেব্রুয়ারি চিত্রশিল্পীরা শুধু আলপনা অঙ্কনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তাঁরা চিত্রকলাকে সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে এসেছিলেন। সেবারই প্রথম শহিদ মিনার চত্বরে বিশাল আকারের ক্যানভাসে ছবি এঁকে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দশ-বার ফুট আকারের ক্যানভাস জুড়ে ছিল সাধারণ মানুষের বঞ্চনার চিত্র-স্বৈরাচারী শাসকের নিপীড়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের কথা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা, অসাম্প্রদায়িক বোধ ও মানবিক অধিকারের কথা। ছবি এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, রশিদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, মুস্তাফা মনোয়ার, হাশেম খান, রফিকুন নবী এবং আরও অনেকে।[১৩৩]

ষাটের দশকের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত শিল্পীরা তাঁদের নানা চিত্রকর্মের প্রতিবাদের শক্তি এবং জাগরণের প্রেরণা সঞ্চারিত করে দেন। শহিদ মিনারে এই চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে আমাদের শিল্পীরা জনসাধারণের কাছে পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শিল্পীরা বিভিন্ন বার্তা বহনকারী ব্যানারের প্রদর্শনী করে এসেছেন। ১৯৬৮ সালে বার্তা বহনকারী ব্যানারের সিরিজ এবং ১৯৬৯ সালের শহিদ মিনারে স্বরবর্ণের ব্যানার প্রদর্শনীর মাধ্যমে আন্দোলনে নবতর শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। এভাবে পুরো ষাটের দশক জুড়েই বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক বিরাট বাঁক নিয়েছিল। শিল্পী কামরুল হাসান বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ-এর ব্যানারে উনসত্তর সালে বাংলা একাডেমিতে বক্তব্য প্রদান করেন। এই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমির বটমূলে তিনি অক্ষরবৃক্ষের প্রথম উদ্বোধন করেন।[১৩৪] উনসত্তরে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক বিরাট বাঁক নিয়েছিল। এ বছর ২১শে ফেব্রুয়ারির স্লোগান ছিল –'আম পলাশ ফোটার দিন'। অর্ঘ্য হিসেবে শহিদ মিনারে শুধু ফুলের বলয় দেওয়ার বদলে 'অ' 'আ' অক্ষরের ফুলেল বলয় এবং আন্দোলনের বার্তা বহনকালী স্বরবর্ণের ব্যানার শহিদ মিনারে টাঙানো হয়। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল আর্ট কলেজের ছাত্র সংসদ এবং প্রদর্শনীর স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিলেন মুস্তাফা মনোয়ার, শাহাদাত চৌধুরী ও রফিকুন নবী।[১৩৫]

৬৯-এর গণ আন্দোলনের এক ধরনের ফলশ্রুতি জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে আয়োজিত 'নবান্ন' চিত্র প্রদর্শনী ও 'সোনার বাংলা শ্মাশান কেন' স্লোগানের সমধর্মী সাহসী শিল্পকর্ম ৬৪ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল চিত্র।[১৩৬] বস্তুত ষাটের দশকের শেষভাগে ঢাকা আর্ট কলেজের হোস্টেল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। চিত্রশিল্পীরা হোস্টেলে রাত জেগে হাজার হাজার পোস্টার, কার্টুন, ব্যানার অঙ্কনের কাজ করেন। দেশব্যাপী উত্তাল আন্দালন তখন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। স্বাধীনতা–এই চারটি অক্ষরের প্লাকার্ড নিয়ে আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ মিছিল বের করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীর উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ওপর রচিত ছড়ার বই 'উনসত্তরের ছড়া' প্রকাশ করে। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন–নিতুন কুণ্ডু ও বিনোদ মণ্ডল। কার্টুন এঁকেছিলেন–রফিকুন নবী। সম্পাদনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন–শাহাদাত চৌধুরী ও রফিকুন নবী। সহযোগিতায় ছিলেন–মঞ্জুরুল হাই, আবুল বারক্ আলভী, শিলাব্রত চৌধুরী, বীরেন সোম ও মোহাম্মদ আকতার ।

১১ দফা আন্দোলনের সঙ্গে আর্ট কলেজের ছাত্ররা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। আন্দোলনের জন্য আর্ট কলেজের ছাত্ররা পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন তৈরি করতো। প্রতিদিন কমপক্ষে এক রিম কগজে পোস্টর লেখা হতো। অর্থ সর্বনিম্ন পাঁচশ পোস্টার।[১৩৭]

১৯৭০ সালে জয়নুল আবেদিন শুধু যে ৩০ ফুট দীর্ঘ *মনপুরা* স্ক্রলটিই এঁকেছেন তা নয়, পাশাপাশি এ বিষয়ে অনেকগুলো মাঝারি আয়তনের ছবিও এঁকেছিলেন যার একটিতে মওলানা ভাসানীর প্রতিকৃতি এঁকেছেন দুর্যোগাক্রান্ত মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে।[১৩৮]

কিন্তু, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলের নেতারা অনেকেই একচেটিয়াভাবে যেখানে-সেখানে শিল্পী-সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীদের একতরফাভাবে পাকিস্তানিদের তাঁবেদার এবং 'মেরুদণ্ডহীন সমাজ' বলে আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠিত হতেন না। পাকিস্তানিদের কাছে বাংলাদেশ বিক্রি করে দেওয়ার পেছনে শিল্পীরাই একমাত্র গোষ্ঠী, এ কথা বলে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।[১৩৯] কামরুল হাসান রাজনীতিবিদদের একচেটিয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, ১৯৭১-এর মার্চ মাসের চরমতম অবস্থায় শিল্পীগোষ্ঠী এক প্রহরও নষ্ট করেননি। একইসাথে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে শিল্পীদের ভূমিকা তুলে ধরে বলেন,

> স্বাধীনতাযুদ্ধকালে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' নামে ইয়াহিয়া খানের যে দানবীয় প্রতিকৃতিটি পোস্টার আকারে প্রচারিত হয়েছিল, তা আমার নিজের হাতে আঁকা। শুধু মুজিবনগরে বসেই আমি ইয়াহিয়া খানকে দানবের মূর্তিতে আঁকিনি, আমি ১৯৬৯ সাল থেকেই গোপনে ঢাকায় বসেই ওই প্রতিকৃতি আঁতে থাকি। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ শহীদ মিনারে কমপক্ষে ১০টি ওই প্রতিকৃতির পোস্টার আঁকা হয়েছিল। সেই পোস্টারে লেখা ছিল, 'এই জানোয়ারটা আবার আক্রমণ করতে পারে'।[১৪০]

শিল্পীদের কাছে চিত্রাঙ্কন শুধু শিল্পচর্চা ছিল না, বরং তাঁরা তাঁদের কাজকে দেশমুক্তির ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জয়নুল আবেদিন চিত্রকলার আন্দোলন আর জাতিসত্তার আন্দোলনকে একই সূত্রে গেঁথে ছিয়েছিলেন। তারই চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে চারুশিল্পী সংসদ আয়োজিত 'স্বা ধী ন তা'–এই চারটি অক্ষরকে বুকে নিয়ে শিল্পীদের মিছিলের মধ্যে। 'স্বাধীনতা' শব্দটির চারটি অক্ষর সেদিন কী অসাধারণ উজ্জ্বলতায় বাংলাদেশের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলেছিল। ঢাকার রাজপথে সেদিন চার অক্ষরের এই প্রদর্শনী এক যুগান্তকারী ঘোষণা এসে হাজির করেছিল। এই মিছিলের ধারণা দিয়েছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। শুধু তাই নয়, সেই মিছিলে নেতৃত্বদানের অসমসাহসী দায়িত্বও পালন করেছিলেন তিনি।[১৪১]

শিল্পীরা সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না হয়েও বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত মওলানা ভাসানীর জনসভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার পক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন জয়নুল আবেদিন।

সেই কারণেই হয়তো আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালে নিরীহ বাঙালিদের ওপর স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকের লেলিয়ে দেওয়া হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার প্রতিবাদে এবং বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে পাকিস্তান সরকারপ্রদত্ত সম্মানজনক উপাধি জয়নুল 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' জয়নুল আবেদিন প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র বা ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর মনপুরা দ্বীপে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় অবলম্বনে চিত্রিত 'মনপুরা-৭০' বিবেকবান মানুষকে নাড়া দেয়।[১৪২] দুর্যোগকে কেন্দ্র করেই একই আঙ্গিকে জয়নুল এঁকেছিলেন দুঃস্থ মানবতার ত্রাণকর্তা হিসেবে বিপ্লবী জননেতা মওলানা ভাসানীর ছবি। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলায় কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সরাসরি উপস্থাপনা জয়নুলের হাতেই প্রথম।[১৪৩] জয়নুল পাকিস্তান আমলে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ ছবি এঁকেছেন।[১৪৪] ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের পর কামরুল হাসান ইয়াহিয়া খানের দশটি কার্টুন আঁকেন। শহিদ মিনারের দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই পোস্টার যেখানে হিংস্র দানবাকৃতির ইয়াহিয়া খান শোভা পাচ্ছিল।[১৪৫] ইতিহাস সাক্ষী, মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের রক্তপায় ও হিংস্র মুখমণ্ডল সংবলিত পোস্টার 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' চিত্রণ করে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের আন্দোলনে উজ্জীবিত করেছিলেন আবু শরাফ মোহাম্মদ কামরুল হাসান।[১৪৬] মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কামরুল হাসান মুজবনগর সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর্ট ও ডিজাইন বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি আঁকেন ইয়াহিয়া খানের দানব মূর্তি। দাঁত বের করে হিংস্র বাঘের মতো

সেই লাল দুই কষ বেয়ে নেমে আসছে। মানুষ মুখো শিকার ধরার পর যেমন করে থাকে ঠিক সে রকম। ছবির নিচে তিনি লিখলেন : এই জানোয়ারটাকে হত্যা করুন। সেই পোস্টার হাজার হাজার কপি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মুক্তাঞ্চলে, যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা রয়েছেন। বাংলাদেশের ভিতরেও সেই পোস্টা নিয়ে গেলেন মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধের সময় আর কোনো ছবি মুক্তিযোদ্ধাদের মতে এত উৎসাহ, জেদ, জিঘাংসা সৃষ্টি করেনি। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের আইকনিক ছবি।[১৪৭]

পোস্টার-চিত্র

ভাষা আন্দোলনের কাল থেকে পোস্টার-চিত্রে যে সফলতা এসেছে, এর পেছনে যে বস্তুটি কাজ করেছে, তা বাংলার তরুণ শিল্পীদের সংগ্রামী চেতনা।[১৪৮] এ দেশে পোস্টার বা প্রাচীরচিত্রের মূল উৎসের সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার সাত কোটি মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। এই শিল্পের অভিযাত্রাকে কোনো বাধা রুদ্ধ করতে পারে নি। বরং যত বাধা এসেছে, শিল্পীদের অনুশীলন ততই প্রখর হয়ে উঠেছে।[১৪৯]

১৯৫২ সালের শেষার্ধে কুমিল্লায় যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়েছিল, তাতে শিল্প প্রদর্শনী একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কেবল প্রদর্শনীতে ছবি দিয়েই শিল্পীরা তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেননি। বরং দলবদ্ধভাবে সম্মেলনকে সার্থক করে তোলার সবরকম প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তখনকার সরকার এসবকে পাকিস্তানবিরোধী কার্যকলাপ হিসেবেই গণ্য করতো।[১৫০]

১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষ্যে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দানের ভিত্তিতে শিল্পীরা যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে হাজার হাজার দেয়ালচিত্র, ব্যানার ও ছবি এঁকেছিল, তা নির্বাচনের ফলাফলে কীপ্রভাব ফেলেছিল তা সকলের জানা। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা সুযোগ পেলেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের সরাসরি 'মেরুদণ্ডহীন' গোষ্ঠী বলে গালাগাল দিতেও দ্বিধা করেন না। তাঁরা চান তাঁদের মতামত যা-ই হোক, শিল্পী-সাহিত্যিকেরা তাঁদের দলীয় কর্মীর মতোই অন্ধভাবে সমর্থন জুগিয়ে যাবে। বাংলাদেশের শিল্পীদের এ বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাধারা অবশ্যই আছে এবং সরাসরি দেশে ও দেশের সাধারণ মানুষের জীবনধারার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত। তাই মানবতাবিরোধী যেকোনো কাজের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে তার প্রতিক্রিয়া হতে দেখা গেছে। পাকিস্তানি চক্রের বিরুদ্ধে তাই বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক ছাড়া সবাই আপন আপন বিবেক-বিবেচনা ও মানবতাবোধের তাড়নায়ই তুলির ললিত রেখা বন্ধ রেখে সংগ্রামী বলিষ্ঠ রেখাকেই হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। শিল্পীরা এসব করেছেন সবরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁরা প্রমাণ রেখেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, প্রতিরোধে একাত্মতা, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই এর প্রমাণ মেলে।[১৫১]

শিল্পী হাশেম খান ষাটের দশকে পোস্টার-ফেস্টুন, প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন,

> আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের ফরমায়েশ অনুযায়ী নূরুল ইসলামসহ, তাঁর সঙ্গে মিলে মিশে সেই ষাটের দশকে কত পোস্টার-ফেস্টুন যে এঁকেছি, ছবি এঁকেছি, প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ এঁকেছি আর তার হিসাব মেলানো কঠিন কাজ।[১৫২]

রফিকুন নবী পাকিস্তানি শাসনের সময়ের কার্টুন-পোস্টার করা নিয়ে স্মৃতিচারণ করে বলেন,

> ২৫ মার্চের আগে পর্যন্ত সেই যে আইয়ুব খানদের নিয়ে কার্টুন-পোস্টার করা তা খুবই গোপনীয় ছিল বলে ক্লাসে বাইরের বন্ধুদের কাছেও তা বলাবলি হতো না। না আমি, না হাসান, কেউই এটা প্রকাশ করিনি। এই কাজ নিয়মিতই চলছিল। তবে একসময় বাড়িতে দরজা কপাট লাগিয়ে গভীর রাতে সেসময় করতাম। হাসান আর নুরুর রহমান সেসব নিতে যেত। একসময় এই আঁকা ভালো লাগার পর্যায়েই পৌঁছে গেল। বিপদের ভয় সত্ত্বেও উদ্দীপনায় পেয়ে বসেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সেগুলো দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা হতো দেখে ভালো লাগত। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত রিস্কি এই কাজ করত বিপদ-আপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে। বিস্মিত হতাম তাদের সাহস দেখে, ভাবতাম এই তরুণেরা যদি এমনটা পারে, তবে আমাদের আঁকায় ভয় কী।

এই যে রাজনীতি নিয়ে ভাবনা, নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে সোচ্চার আন্দোলন, মিটিং-মিছিল, এভাবে শিল্পীদের ভূমিকার অংশগ্রহণের কথা ইতিমধ্যে জানা হয়েছে। আর্ট কলেজে আমাদের অগ্রজ গোপেশ মালাকারের কমিউনিস্ট হিসেবে জেল খাটার কথা শুনেছি। রাজশাহীর খাপরা ওয়ার্ডে পুলিশি হামলার সময় তিনি অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে বেঁচে যাওয়াদের একজন ছিলেন তাও জেনেছি ততদিনে। মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, ইমদাদ হোসেন, বিজন চৌধুরী প্রমুখ শিল্পী, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, গাফ্ফার চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। এসব কথা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম যে শুধু রাজনীতিবিদ নয়, দেশাত্মবোধের ব্যাপারে যে-কোনো কর্মকাণ্ডে শিল্পীদের যুক্ততা থাকে। থাকতেই হয়। আমি পোস্টার-ব্যানার আঁকতে গিয়ে গর্বভরে ভাবতাম, 'যা করছি, ভাল করছি। তা যতই রিস্কি হোক না কেন।'[১৫৩]

জাতীয়জীবনের চরম পর্যায়ে শিল্পের চেয়ে মিছিল, স্লোগান এবং পোস্টারের মূল্য কোনো অংশে কম ছিল না। শিল্পীদের আশাবাদ এবং সংগ্রামী মনোবল আমাদের সচেতন শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নিঃসন্দেহে।[১৫৪]

অসহযোগ আন্দোলনে শিল্পীদের ভূমিকা

শিল্পীদের কাজগুলো সহজ ছিল না। শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত তাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত শহীদুল্লাহ্ কায়সারের *সংশপ্তক* উপন্যাসের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী। কিন্তু প্রচ্ছদের শিল্পীর নামের জায়গায় লেখা হলো অনামী। পাকিস্তানের সেই পরিস্থিতিতে দেবদাস চক্রবর্তীর নাম ছাপতে ইতস্তত করেছিলেন প্রকাশক। কারণ পাকিস্তান সরকার সবসময় এদেশের সব সংগ্রাম, আন্দোলনের ঘটনাকে ভারত ও হিন্দুদের কাজ বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। এখানে শাসকগোষ্ঠীর সম্প্রদায়িক আচরণ আবারও স্পষ্ট হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা সবধরণে কাজে শাসকগোষ্ঠী ভারতের সংশ্লিষ্টা খুঁজে পেত। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবে তারা ভারত ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে। ৫২-র ভাষা আন্দোলোনক তখনকার *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় ভারত ও হিন্দুদের কাজ বলে অভিহিত করেছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালেও এই কারণে এ রকম অনেক ঘটনা ঘটেছিল।[১৫৫]

শিল্পী জয়নুল আবেদিন বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। শহিদ মিনারের সামনে প্রদর্শনের জন্য তিনি ব্যানার এঁকেছেন, ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর জন্য প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন, লিখেছেনও এগুলোতে, আর মিছিলেও তিনি অংশ নিয়েছেন। এমনকি তিনি মওলানা ভাসানীর সাথে ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় ভাষণও দিয়েছেন।[১৫৬] অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে চারু ও কারু শিল্পীরাও পিছিয়ে ছিলেন না।

৫ মার্চ, ১৯৭১ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংগীত, নাটক, চারুকলা শিল্পীদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৬ মার্চ ঢাকার শিল্পীসমাজ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ' নামে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে।[১৫৭] ইতিপূর্বে ৫ মার্চ থেকে বেতারের শিল্পীরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে কর্মবিরতি করছিলেন। ৬ মার্চ ৩৩ জন চলচ্চিত্র শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক ও কুশলী অসহযোগ আন্দোলনে শরিক হয়ে ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন।[১৫৮] রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সাবেক মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ ৬ মার্চ এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, অসহযোগ আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে সকল পূর্ব পাকিস্তানি সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তির প্রতি খেতাব ও তমঘা বর্জনের আহ্বান জানানোর জন্য। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় শেখ মুজিব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বাদ দিয়েছেন, তা হচ্ছে খেতাব ও তমঘা বর্জনের প্রশ্ন।'[১৫৯] ৯ মার্চ বিক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ বেতার ও টেলিভিশনে মুক্তিসংগ্রামের চেতনাকে সদা জাগ্রত রাখার তাগিদে গণমুখী সংগীত, নাটক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে শর্তাধীন কাজে যোগ দেয়।

শিল্পী মুর্তজা বশীর বলেন,

বাংলার মাটিতে গণহত্যার প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকারের তথ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে যোগদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং আমন্ত্রিত শিল্পীদের প্রতি অংশগ্রহণে বিরত থাকার জন্য আমার এক আবেদন সংবাদ সংস্থা এনা

পরিবেশিত খবর ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই বিবৃতিতে আমি শিল্পী ও লেখকদের প্রতি অনুরোধ জানাই পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত তমঘা ও খেতাব বর্জনের।[১৬০]

১০ মার্চ স্বাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে বিশিষ্ঠ চিত্র শিল্পী মুর্তজা বশীর তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তুরস্ক, ইরাক ও পাকিস্তান–তিন দেশের ১০ জন করে শিল্পীর প্রদর্শনী হওয়ার কথা ছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাঁচজন–জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, মুর্তজা বশীর ও আরও দুইজনের অংশগ্রহণের কথা ছিল।[১৬১] ১০ মার্চ মুর্তজা বশীর পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেন,

মুক্তি ও স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার নিরস্ত্র জনগণ যখন অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছেন, ঠিক সে সময় আমি সচেতন শিল্পী হিসাবে ইসলামাবাদ সরকার কর্তৃক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পারি না।[১৬২]

তিনি দেশের সকল চিত্রকরদের উক্ত প্রদর্শনী বর্জনের আহ্বান জানান।[১৬৩]

১২ মার্চ ঢাকায় আর্ট কাউন্সিলে বিকেল ৪টায় চারু ও কারুশিল্পদের একসভায় কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীরকে আহ্বায়ক করে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ চারু ও কারু কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেন।[১৬৪] সভায় যে কর্মসূচিগুলো নেওয়া হয় তা হলো–১. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ‘প্রতীক’কে সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সংগ্রামী মনকে প্রেরণা দেওয়া এবং উদ্বুদ্ধ করা। ২. সভা-মিছিলের সাইক্লোস্টাইল করে অথবা ছাপিয়ে দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী স্কেচ বিতরণ করা। ৩. আন্দোলনমুখী পোস্টার ও ফেস্টুন প্রচার। ৪. পোস্টার ও ফেস্টুনসহ মিছিলের আয়োজন। ৫. এই পরিষদের ইউনিটগুলোর বিশেষ জরুরি অবস্থায় অন্যান্য সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণ।[১৬৫] এখানে উল্লেখ্য, ‘প্রতীক’ অর্থ ‘শাপলা’ ফুলকে বোঝানো হয়েছে।

১২ মার্চ কামরুল হাসানের আহ্বানে ‘বাংলার পটুয়া সমাজ’ নামে একসভা ধানমণ্ডির ২ নম্বর সড়কে অবস্থিত ‘আর্টস এনসেম্বল’ গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় কর্মপন্থা হিসেবে নেওয়া হয় : ১. কার্টুন, পোস্টার, লিফলেট প্রভৃতি সর্বত্র সঠিকভাবে বিলি-বিতরণের জন্য স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ২. প্রদেশের সব পটুয়া (চিত্রশিল্পী) ‘আর্টস এনসেম্বল’, ধানমণ্ডি ২ নম্বর সড়কে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়। ৩. বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু ডিগ্রিধারী শিল্পী ছাড়াও সাধারণ সাইনবোর্ড পেইন্টার ও অন্যান্য সাধারণ শিল্পীকে সংগ্রামে শামিল করে সব ধরনের কাজে সাহায্য নিতে হবে। ৪. অবিলম্বে প্রদেশের সব পটুয়াকে কার্টুন, ফেস্টুন, লিফলেট ইত্যাদির জন্য ‘ লে-আউট’ আর্টস এনসেম্বলে জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়। ৫. সংগ্রাম উচ্চ পর্যায়ে গেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আর পটু হস্তে কার্টুন, ফেস্টুন ও পোস্টার করে সংগ্রামী বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পটুয়া সমাজ দৃঢ়সংকল্প। ৬. পূর্ব বাংলার পল্লী জনগণের হাটের, মাঠের ও ঘাটের অতি আদরের ফুল ‘লাল শাপলা’কে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পটুয়া সমাজ সিদ্ধান্ত নেয়। যা বাংলার চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদের সভায়ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

১২ মার্চ কবি-সাহিত্যিকরা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ‘লেখক সংগ্রাম শিবির’ নামে একটি কমিটি গঠন করে এবং স্বৈরাচারী-ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতার মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন।[১৬৬]

১৩ মার্চ বাংলার চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা স্টেডিয়ামের বাইরে একটি কার্টুন চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। *দৈনিক পাকিস্তানের* শেষ পাতায় রফিকুল হাসানের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ব্যঙ্গচিত্রগুলো শত্রুকে চিনিয়ে দিয়েছে।’[১৬৭]

১৫ মার্চ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত করার প্রতিবাদে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর ‘হিলাল-ই- ইমতিয়াজ’ উপাধি ত্যাগ করেন।[১৬৮] জয়নুল আবেদিন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৫ মার্চ হিলাল-ই-ইমতিয়াজ বর্জন করে বলেন, ‘জনগণকে যেভাবে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে আমি হেলাল-ই-ইমতিয়াজ বর্জন

করছি।’ ১৬ মার্চ আবুল কালাম শামসুদ্দিন ‘সিতারা-ই-ইমতিয়াজ’ এবং আহসান হাবীব ১৭ মার্চ ‘সিতারা-ই-খিদমত’ বর্জন করেন।[১৬৯] এদের আগেই মুনীর চৌধুরী তাঁর খেতাব বর্জন করেন।[১৭০]

১৬ মার্চ বিকাল ৪টায় চারুকারু শিল্পীরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে।[১৭১] বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদের শহিদ মিনারের সভায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বক্তৃতায় বলেন,

> আমার সবুজ দেশ আজ লাল রঙের দেশ। অনেক রংই আমরা ছবিতে ব্যবহার করেছি। কিন্তু সবুজের দেশে এই লাল রঙের তুলনা নেই। বুকের রক্তের লাল রং যাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের প্রাণের বাণীকে, তাঁদের সংগ্রামকে আমরা মুক্ত করব। শিল্পীর তুলি অত্যাচারীর বন্দুকের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।[১৭২]

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্পীদের যে ভূমিকা রয়েছে সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জয়নুল আবেদিন বলেন,

> চিত্রকলার মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সুন্দরভাবে হতে পারে। স্বাধিকার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে শিল্পীদের প্রস্তুত থাকতে হবে।... জনগণের মুক্তিসংগ্রামের সময় কেউ ঘরে সবে থাকতে পারেন না। বাংলাদেশের স্বাধিকার সংগ্রামে দেশের বীর জনতা বুকের রক্ত দিয়ে মুক্তির বীজ বপন করেছেন, এই অবস্থায় শিল্পীরা কেবল ঘরে বসে ছবি আঁকলে চলবে না। দেশের এই মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে শিল্পীদের একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলি, শিল্পীরা জনগণেরই লোক।[১৭৩]

১৬ মার্চ সভার পর জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে একটি মিছিলের সামনে চারজন ছাত্রী বুকে বহন করেন বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা ‘স্ব-ধী-ন-তা’। মিছিলে প্রায় ৩৫টি কার্টুন, সেস্টুন ও পোস্টার ছিল। কয়েকটি কার্টুন ও ফেস্টুনে লেখা ছিল–‘হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্র’ ‘শোষণমুক্ত বাংলাদেশ কায়েম করো’, ‘আমার দেশের ফসল নিয়েছ তুমি, আমাকে দিয়েছ সমূহ সর্বনাশ, তোমার ওখানে মরুতে ফসল এল, শুধু অনাহারে কেটেছে আমার দিন’, ‘ডন কুইটজস্ট পগারপর, বিদ্রোহ চারিদিকে বিপ্লব আজ’, ‘একচেটিয়া পুঁজিবাদ খতম’ প্রভৃতি। তবে ব্যঙ্গাত্মক একটি কার্টুন উল্লেখযোগ্য–খালি গায়ে বন্দুক হাতে এক পায়ে জুতো পরে পলায়নপর এক সৈনিক। তার দিকে বুট ছুড়ে মারা। লেখা ছিল, ‘তোর জুতোটাও নিয়ে যা।’[১৭৪]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে প্রতিদিনই কোন না কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে, সভা হয়েছে, মিছিল হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই রাজনীতি সচেতন সংস্কৃতি কর্মী ও শিল্পীরা অংশ নিয়েছে। তখন সবার মনে একটিই স্বপ্ন স্বাধীকার। মাতৃভূমিকে শোষণ বর্জন স্বৈরাচারী সরকারের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে বাংলার সর্বস্তরের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামকে বেগবান করতে রাজপথে নেমে আসেন। অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত শিল্পীদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিত। আর্ট কলেজের হোস্টেলের পাশেই ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর সদর দপ্তর। সেখান থেকে গোয়েন্দারা কলেজের হোস্টেলে আসা যাওয়া করতেন। তারা কলেজের পিয়নদের কাছে জানতে চাইতেন, পোস্টারগুলো কে বা কারা আঁকে।[১৭৫]

২৬ মার্চ ভোরে পিলখানা থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানি সেনারা আর্ট কলেজের হোস্টেলে আক্রমণ চালায়। শিল্পীদের প্রতি ক্ষোভ থেকে শাসকগোষ্ঠী তাদের ওপর আক্রমণ করে।

২৫ মার্চ শিল্পীদের প্রতিরোধ

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ৪১ নয়াপল্টনে *সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস* পত্রিকার অফিসে বসে কাজ করছিল শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। পত্রিকার সম্পাদের তাঁকে বাসায় ফিরে যাওয়া জন্য বলেন। তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে হেঁটে এগোতে লাগলেন। রাস্তাঘাটে স্বল্প আলো। শান্তিনগর মোড়ে গলির ধারে এসে আবছ আলো-আঁধারিতে দেখলেন ছেলেরা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করছে। হঠাৎ কাইয়ুম চৌধুরীকে লক্ষ করে একজন বলে উঠলেন, ‘তুমি এখানে কী করছ? এই মুহূর্তে বাসায় চলে যাও। শহরের অবস্থা খারাপ।’ কাইয়ুম চৌধুরী বিস্মিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, আর কেউ নন, উচ্চকণ্ঠে কথা বলছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের আশংকার মুখে তিনি ছেলেদের সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় ব্যারিকেড

তৈরি করছিলেন। শিল্পী কামরুল হাসানও সেই রাতে হাতিরপুল এলাকায় স্থানীয় তরুণদের সঙ্গে মিলে হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত করার কাজে নেমে পড়েছিলেন।[১৭৬]

চিত্রশিল্প নিয়ে কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের একটি কথা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন–'ছবিতে রূপ ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর তুলি আসল কাজ নয়, সার্থক কাজও নয়। আসল কাজ হলো, রূপের আবেগ ফুটিয়ে তোলা।'[১৭৭] আর সেই আবেগই হয়তো আবহমানকাল ধরে ফুটিয়ে তুলেছেন কিংবা তুলছেন স্বার্থক শিল্পীরা। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পীসমাজ শুধু চিত্র অঙ্কনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি, বহু দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে একাত্তরের লড়াইয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন। বস্তুত, চিত্রকলার ব্যাপারটাই ছিল পাকিস্তানি মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি সদাজাগ্রত চেতনা। সেজন্যই পাকিস্তানি চিন্তাধারার ধারকবাহকেরা সর্বদাই এর বিরোধিতা করেছে। এদেশে চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তারা নানাভাবে বাধা দিয়েছে। কিন্তু শেষাবধি তারা জয়ী হতে পারেনি। নানা বাধা বিপত্তিকে এড়িয়ে অবশেষে চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাঙালির জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা ও আত্মপরিচয় লাভের সংগ্রামে প্রতিষ্ঠানটি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।[১৭৮]

শিল্পীদের আন্দোলনে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন–ইমদাদ হোসেন, হাশেম খান, গোলাম সারোয়ার, আনোয়ার হোসেন, হাসান আহমেদ, প্রফুল্ল রায়, নাসির বিশ্বাস, শাহাদাত চৌধুরী, মঞ্জুরুল হাই, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, আবুল বারক্‌ আলভী, বিজয় সেন, রেজাউল করিম, এসএম খালেদ, মাহতাব, মতলূব আলী, লুৎফুল হক এবং আরও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। শাহাদাত চৌধুরী আন্দোলনের পরিকল্পনা ও পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৭৯]

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে এদেশের শিল্পীসমাজ গভীর অঙ্গীকার ও ঐকান্তিক দেশপ্রেমে নিজেদেরকে যুক্ত করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর এই রাষ্ট্রের গণবিরোধী প্রতারক চরিত্র এদেশবাসীর কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিতর্কিত বক্তব্য খুব সহজেই পাকিস্তানি ভাবাদর্শের প্রকৃত স্বরূপটিকে চিনিয়ে দেয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার স্পর্ধিত ও স্বৈরাচারী ঘোষণা একটি সত্যকে উন্মোচিত করে, আর তা হলো, পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য আসেনি। পাকিস্তানি রাষ্ট্রশক্তি যে বাঙালি জাতিসত্তার শত্রুপক্ষ, সেই সত্যটি সমাজের অন্যান্য অংশের মতো শিল্পীসমাজও গভীরভাবে উপলব্ধি করে। ধীরে ধীরে সমাজের সর্বস্তরে এই উপলব্ধি গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ে।[১৮০]

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং শিল্পী কামরুল হাসান শুধু তাদের শিল্পকর্মের মধ্যে বাংলা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এনেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁরা রাস্তায় নেমে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করছেন–এই দৃশ্য দুটি আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অনন্য চিত্রপট হয়ে চির জাগরুক থাকবে। পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শহিদ হন আর্ট কলেজের ছাত্র–শাহনেওয়াজ। শিল্পী কামরুল হাসান মুক্তিযুদ্ধে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সজ্জা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। শস্য-শ্যামল বাংলাদেশে উদীয়মান সূর্যকে তিনি কেবলমাত্র লাল ও সবুজ এই দু'টি রঙের মধ্যে দিয়ে সুন্দর প্রতীকী উপস্থাপন করেন।[১৮১] স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শিরোনামে যে সাড়া জাগানো পোস্টার প্রকাশিত হয়েছিল তার রূপকার ছিলেন নূরুল ইসলাম।[১৮২]

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার অঙ্গীকার এভাবেই শিল্পীকে সক্রিয় করে তোলে মহত্তর জাতীয় সংগ্রামে, অনাগত সম্ভাবনার রক্তাক্ত পথযাত্রায়।

পাকিস্তানের আধা-উপনিবেশবাদী শাসক-শোষকশক্তির কাছে জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের অবস্থান অবশ্য দুর্বল ছিল না। পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান শিল্পী হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অধিপতিদের কাছে বিশেষভাবে আদৃত ছিলেন। তাদের বার বার কাছে টেনেছে। তারা সেসব আহ্বানে সাড়াও দিয়েছেন। কিন্তু কখনও কেন্দ্রের মানসিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। কেন্দ্রে অবস্থান করে কখনও স্বস্তিও পাননি।

জয়নুল আবেদিনের মনোযোগ ও দৃষ্টি সবসময়ই কেন্দ্রীভূত ছিল পূর্ববাংলার প্রতি। বাঙালির শিল্পশিক্ষার পথ প্রশস্ত করার জন্যে তিনি ঢাকায় চারুকলা শিক্ষালয় গড়ে তোলেন। সারা পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে উন্নীত করার জন্যে তিনি নিরলসভাবে চেষ্টা করে গেছেন। কেন্দ্রের দ্বারা নানাভাবে অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিল পূর্ববাংলা। তাই পূর্ববাংলাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁর সচেতন প্রয়াস ছিল।[১৮৩] কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রান্তীয় মানুষের প্রতিবাদ ও সংগ্রামের একটি প্রতীকী-চেতনাও এসব চিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।[১৮৪] মুক্তিযুদ্ধের সময় ভয়ংকর চেহারার ইয়াহিয়ার আরও ভয়ালদর্শী রূপ এঁকে কামরুল হাসান মানুষের মনে তার প্রতি ঘৃণা আরও উস্কে দিয়েছিলেন।[১৮৫] ভাষার ওপর আঘাতে মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালির ওপর আগ্রাসন শুরু হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালির প্রতিরোধ করে। এই প্রতিরোধে শিল্পীগণও যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়া তাঁরা করে দুইভাবে। এক. তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে এবং দুই. সরাসরি রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক কার্যক্রমে শিল্পীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। নববর্ষ তথা পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওইদিন সকালে চারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে যে-বর্ণময় শোভাযাত্রা বের হয় তাতে শিল্পীদের ভূমিকাই থাকত প্রধান। শুধু শোভাযাত্রা নয়, একুশে ফেব্রুয়ারির দেয়াল-লিখন থেকে শহিদ মিনার চত্বর আলপনায় ভরিয়ে তোলার উদ্যোগেও শিল্পীগণের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।[১৮৬] প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্ত চক্ষু। এর মাধ্যমে তার সরাসরি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত রাখতে সক্ষম হন।

স্থাপত্য, দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্য

শিল্প-সংগীত, সাহিত্য, চারু ও কারুশিল্প, নৃত্য বা লৌকিক আচারের মতো স্থাপত্যশিল্পও সংস্কৃতির বাহক। তাইতো পাহাড়পুর দেখে সেই আমলের মানুষের চিন্তা ও স্বপ্নের পরিধিকে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ ঘটে, সেই সঙ্গে তখনকার সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ও অন্যান্য শিল্পকর্ম সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা জন্মায়।[১৮৭] বাংলার আবহাওয়া ও উপকরণ সমস্ত স্থাপত্যশিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ঝড়-বৃষ্টি, রৌদ্র, ছয়ঋতুর বিচিত্র ভঙ্গিমা স্থাপত্যশিল্পের স্থায়িত্বকেও কতকটা বিপদে ফেলেছে। বিস্তৃত একালা জুড়ে পানি আর পলি পরা মাটি। পলিমাটি দ্বারা ইট তৈরি করে পোড়ানো হতো।[১৮৮] স্থাপত্যের চিন্তা-চেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে এই পাললিক দেশের স্থাপত্য-উপকরণের উজ্জ্বল নিদর্শন হচ্ছে ইট।[১৮৯] মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুরের স্থাপত্যকীর্তিই আমাদের স্থাপত্যশিল্পের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য বা ধারাই আমাদের বিভিন্ন সময় এবং কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ক্রম পরিবর্তিত ও পরিশীলিত হয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম উত্তরণের ভিতর দিয়ে বর্তমানের রূপ নিয়েছে।[১৯০]

শিল্পে সমকালীনতাই আধুনিকতা। এদেশের প্রায় সব শিল্পমাধ্যমেই এই সমকালীনতা বা আধুনিকতার একটা পরস্পর ধারাবাহিকতা মোটামুটি রক্ষিত হয়ে আসছে। কিন্তু স্থাপত্যশিল্পে এই ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত। কারণ, স্থাপত্যশিল্প খুব বেশি রাজনীতি ও অর্থনীতিনির্ভর এবং শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছে-মর্জি বহুলাংশে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্পের একটি বড়ো চাহিদা ও দাবি হচ্ছে এর স্বাধীনতা। সাধারণত দেশে স্বাধীনতা না থাকলে শিল্পের স্বাধীনতা থাকে না।[১৯১]

পরাধীনতার কারণে নিজস্ব দৈশিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ উপনিবেশকরা সুপরিকল্পিতভাবে বন্ধ করে তাদের নিজস্ব ও অপরিবেশগত স্থাপত্যকলা এদেশের মাটিতে চাপিয়ে গেছে।[১৯২] প্রাচীন পালবংশের রাজাদের তৈরি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ময়নামতির বৌদ্ধ বিহার, সেনবংশের রাজাদের তৈরি হিন্দু মন্দির, পরবর্তীকালে সুলতানি আমলের নৃপতিদের মসজিদ, মোগল আমলের সম্রাটদের দুর্গ, প্রাসাদ, স্মৃতিশালা, মসজিদ, তারপরে ইংরেজদের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন সরকারি আবাস, অফিস-আদালত, রেলস্টেশন ইত্যাদি এ রকম অনেক দালান-কোঠা একেক সময়ে এদেশে গড়ে উঠেছে।[১৯৩] এসব স্থাপত্যে কেউ কেউ আমাদের দেশের প্রধান স্থাপত্য-ঐতিহ্য মেনে নিয়ে তাদের স্থাপত্যকর্ম সৃষ্টি করেছেন, আবার কেউ কেউ জোর করে তাদের নিজেদের স্থাপত্যধারা এদেশে আরোপিত করেছেন তাদের শাসন ক্ষমতার গর্বে ও শক্তিতে।[১৯৪]

পাকিস্তান আমলেও সেই কর্মটি অব্যাহত থাকে। এদেশের স্থাপত্যচর্চায় ইসলামিক স্থাপত্যের পুনরাবির্ভাব ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। এ প্রসঙ্গে স্থপতি রবিউল হুসাইন বলেন,

> স্থাপত্যকলা এককালে ধর্মের প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ ছায়াতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে; কিন্তু তদ্রূপ অবস্থা এইকালেও যে যথাযথ হবে এমন কোন সূত্র নেই। তাই হীনম্মন্যতাপ্রসূত এখনকার এই ইসলামিক স্থাপত্যের পুনরাবির্ভাবের চিন্তা ও প্রয়াস। এককালে মুসলমানরা এদেশে শাসনকর্ম পরিচালনা করেছিল, তাদের থেকে ইংরেজরা শাসনভার নিয়েছিল, এতদিন পর এতো কষ্ট করে আমরা বাঙালি মুসলমানরা সব ধর্মাবলম্বী মিলেমিশে এদেশের স্বাধীনতা (পাকিস্তান) নিয়ে এসেছি। অতএব সেই আমলের সেকেন্দ্রা, তাজমহল অথবা কর্ডোভার বা ইরান-ইরাকের স্থাপত্যকর্ম আমরা পুনঃস্থাপন করবো–এই বোধ অবচেতনভাবে সবার ভেতর কাজ করে চলছে।[১৯৫]

তিনি আরও বলেন,

> প্রতিটি দেশ তার উপনিবেশগত শিকল ছিঁড়ে নিজস্ব স্বাধীনতা পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যার ভার, কর্মতৎপরতা, কর্মসংকুলান, গৃহায়ণ, কর্মস্থল ইত্যাদির প্রচণ্ড চাপে আশু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে উন্নত স্থাপত্যশৈলী ...। যুগধর্মের এহেন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বসবাস করে কেউ যদি ইসলামী স্থাপত্যের পুনরুত্থানের সুপারিশ করে তার বাস্তবায়নে তৎপর হয়, তবে সেই দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল শিকড়ে তার চিহ্ন থেকে যাবে এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবেই।[১৯৬]

এ রকম সময়ে এদেশের প্রধান আধুনিক স্থপতি মাজহারুল ইসলাম বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রীতিতে স্থাপত্যচর্চা শুরু করেন। সেই সময় একচেটিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় বড়ো বড়ো স্থাপত্যকাজ করতেন পশ্চিম পাকিস্তানি স্থাপত্য সংস্থা এবং কিছু বিদেশি স্থপতি উপদেশক।[১৯৭] যেহেতু সে-সময় দেশে কোনো উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত স্থপতি ছিলেন না, সেহেতু সরকার বিদেশি স্থপতিদের নিযুক্ত করেছিল বিভিন্ন সরকারি ভবনের নকশা করার জন্য।[১৯৮] পশ্চিম পাকিস্তানি স্থপতিদের করা মতিঝিলের প্রায় সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বহুতল বিশিষ্ট অফিস ভবন, আণবিক শক্তিকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ছাত্রাবাসসমূহ এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রায় বড়ো বড়ো কারখানাসমূহ। এইসব ভবনের ধারা-সংযোজনের নামে স্থাপত্য ও কার্যকারণহীন পরস্পরবিরোধী স্থাপত্য-উপাদান ব্যবহার ও অতিরিক্ত করার মানসিকতা বিশেষভাবে লক্ষগোচর হয়, যা স্থাপত্যশিল্পবিচারে কখনো উন্নতমানের নয়।[১৯৯] এইসবের ভিতরে এদেশে মাজহারুল ইসলাম অত্যন্ত সফলভাবে আধুনিক স্থাপত্যের মূল সূর অনুযায়ী আন্তর্জাতিকমানের স্থাপত্যচর্চা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, চারুকলা অনুষদ এই দুটি আধুনিক ভবনের স্থপতি হলেন–মাজহারুল ইসলাম।[২০০] চারুকলা অনুষদ বা আর্ট কলেজের ভবন সৃষ্টির পেছনে তাঁর চিন্তা সম্পর্কে বলেন,

> ...ভবনটির জন্য ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। দোতলার বেশি উঁচু হবে না। সামনে রেসকোর্সের ফাঁকা মাঠ, চারদিকে গাছপালার পরিবেশ। ভবনটি ব্যবহৃত হবে চারুকলার মতো একটি নান্দনিক বিষয়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিসর্গ ও পরিবেশই মুখ্য। তাই স্বভাবত ভবন সৃষ্টির পেছনে মূল চিন্তা সেই পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে এমন একটি অবস্থার বিকাশ ঘটানো, যাতে নিসর্গ ও ভবন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিরাজ করে। সেজন্য চারদিকের নিসর্গকে ভবনের মধ্য দিয়ে অবাধে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিসর্গকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু ভবনটিকে আলাদা অস্তিত্বে স্থাপন করা হয়নি। ভবনটিও যাতে পরিবেশ ও নিসর্গের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দাঁড়ায় সেদিকে জোর দেওয়া হয়েছে।[২০১]

স্থপতি মাজহারুল ইসলাম পরিবেশের সাথে সমন্বয় করে স্থাপনা গড়ে তোলেন। এ প্রসঙ্গে হাশেম খান বলেন,

> চারুকলা ইনস্টিটিউটের ভবনটি নির্মাণের সময় স্থপতি মাযহারুল ইসলামসহ প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিক্ষক কামরুল হাসান, শফিউদ্দিন আহমদ, আনোয়ারুল হক প্রমুখ অত্যন্ত সাবধানতা ও সচেতনতার সঙ্গে গাছপালাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছিলেন। পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে চারুকলা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই কিছু পাঠ গ্রহণ করতে হয়।[২০২]

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি স্থপতিদের দ্বারা নির্মিত মতিঝিলসহ দেশের প্রায় সব কয়টি স্থাপনার ক্ষেত্রে সেই রীতিগুলো লক্ষ্য করা যায় না। বৈরী পরিবেশে স্থপতি মাজহারুল ইসলামকে একা সংগ্রাম করতে করতে এগোতে হয়েছে এবং এই দুটি ভবন, যেখানে সেই সময়ের বিদেশি স্থাপত্যের প্রভাব পড়া খুব স্বাভাবিক; কিন্তু পরবর্তীকালে অচিরেই তিনি এই প্রভাব

কাটিয়ে নিজস্ব স্থাপত্যধারা অর্থাৎ এদেশের কৃষ্টি, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রয়োগ করে। তিনি এদেশে ঐতিহ্যবাদী লাল পোড়া ইটকে লাইনবন্দি, সরাসরি উন্মুক্ত পলেস্তারাহীন টালি বা টাইলে মতো করে পুরোনো রীতিটি নবতররূপে উপস্থাপন করেন।[২০৩] এছাড়া স্থাপত্যে শিল্পকর্ম যেমন, বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারের দেয়ালে দেয়ালচিত্র সংযোজন করার প্রস্তাব এদেশে তিনিই প্রথম বাস্তবায়ন করতে পরামর্শ দেন, যার ফলে নভেরা আহমেদ এবং হামিদুর রহমানের দুটি কাজ সেখানে হয়।[২০৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নিপা ভবন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত অনুষদ ভবন, গুরুগৃহ ও ছাত্রবাসসমূহ এদেশের জল, মাটি, বায়ু ও আবহাওয়া অনুযায়ী স্থাপত্য-কর্মপ্রয়াস।[২০৫]

উপর্যুক্ত দুটি প্রকল্প ছাড়া স্থপতি মাজহারুল ইসলামের অন্যান্য স্থাপত্যকর্মগুলো সরকারি লাল ফিতার কারণে বাস্তবায়ন হয়নি। এ নিয়ে সকারের সাথে মনোমালিন্যের জন্য ১৯৫৭ সালে চাকরি থেকে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সে-পত্র তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান প্রত্যাখান করেন। ১৯৬২ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদার সহযোগিতায় সায়েন্স ল্যাবরেটরি (বিসিএসআইআর) প্রকল্প প্রণয়ন করেন। শাসকগোষ্ঠীর একতরফা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের কারণে এদেশে তখন তেমন উল্লেখযোগ্য নিমার্ণকার্য চলছিল না। এ অবস্থায় স্থপতি মাজহারুল ইসলাম প্রায় এককভাবে সরকারি স্থাপত্য-নির্দেশনামা প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু সরকারিভাবে তা অনুমোদিত হয়নি। এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে আবার বিরোধ বাধে এবং ১৯৬৭ সালে তিনি সরকারি স্থপতির পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে পদত্যাগ করেন।[২০৬] এরপর প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও প্রকৌশলী আজিমুদ্দিন সাথে তিনি 'বাস্তুকলাবিদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম দেন–কবি সিকান্দার আবু জাফর। কিছু দিনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র পাকিস্তানে উন্নত স্থাপত্য চর্চার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[২০৭]

তৃতীয় বিশ্বের স্থপতিরা ইউরোপীয় স্থাপত্যের আন্তর্জাতিক রীতিতে শিক্ষিত হয়েও নিজেদের দেশে দৈশিক উপকরণ ও উপাদান এবং লোকজ লোকপ্রিয় নীতি-রীতিতে স্থাপত্যচর্চায় প্রচণ্ডভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন।[২০৮] এক্ষেত্রে বাংলাদেশে স্থপতি মাজহারুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কাজের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে স্থাপত্যের মধ্যে দৈশিক উপকরণ ও লোকজ উপাদানগুলো প্রয়োগ করতে হয়। তিনি এই রীতির প্রয়োগে করে শাসকদের চাওয়ার বিপরীতে গিয়ে, যেখন শাসকদের চাওয়া ছিল ধর্মের উপকরণগুলোর প্রয়োগ করতে।[২০৯]

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে শিল্পী হামিদুর রহমানের পরিকল্পনায় 'শহীদ মিনার নির্মাণ' করা হয়।[২১০] শহিদ মিনারের মূল নকশা সজ্জা-পরিকল্পনা এবং নির্মাণ কাজে শিল্পী হামিদুর রহমানের সাথে নভেরা আহমেদ যৌথভাবে সম্পন্ন করেন।[২১১] ভাষা আন্দোলনের শহিদ মিনার স্তম্ভ হিসেবে গগনচুম্বি নয়, কাঠামো হিসেবে বিশাল নয়, স্থাপত্যের দিক থেকে ব্যয়বহুল নয়–অতি সাধারণ সরল সহজ একটা কাঠামো। কিন্তু একটা জাতির চিরপ্রত্যয়, চির-অহঙ্কার ও চির-বিজয়ের গৌরব হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যার ভিতর দিয়ে একটা জাতির বিশ্বাস ও আশা প্রতিফলিত হয়েছে। যা ভবিষৎ বংশধরদের আপন সংস্কৃতি চেতনা ও স্বদেশপ্রেমের উৎস ও অনুপ্রেরণা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, পরবর্তী দশকে বিশেষ করে তরুণ শিল্পীদের শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছে।

শহিদ মিনারের পরিকল্পনা শিল্পীর জন্য শুধু একটি স্মৃতিস্তম্ভ ছিল না। এই স্মৃতিস্তম্ভের ভিতর দিয়ে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অপরদিকে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আশাবাদ প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পী হামিদুর রহমানের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভিতর অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও আশাবাদ উচ্চারিত হয়েছে। শহিদ মিনারের মূল নকশাটি এরূপ পরিকল্পনা করা হয় :

১. প্রশস্ত চত্বরের চারদিক থেকে শ্বেত পাথরের রেখা মূল কাঠামোর নিচে এক বিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। শ্বেত পাথরের মধ্যে খোদাই করা লাল পদচিহ্ন। অর্থাৎ জীবনের বা একটা জাতির মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে ধীর পদক্ষেপে ক্রমশ গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে হয়। জাতীয় জীবনে বৃহৎ কিছু অর্জন করতে হলে অনেক কিছু বিসর্জন, অনেক আত্মহুতি দিতে হয়।

২. মূল পাঁচটা স্তম্ভ রঙিন কাচ দ্বারা এমনভাবে শোভাপ্রদকরণ, যেন সূর্যরশ্মি কাচ ভেদ করে সম্মুখের চত্বরে এসে পড়ে, যা স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিজয়ের প্রতীকী প্রকাশ। অর্থাৎ স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর কঠিন ব্যূহভেদ করে গণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান।
৩. মূল বৃহৎ কাঠামোর পেছনে টকটকে লাল বৃত্ত উদীয়মান সূর্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, যার মধ্যে একটা জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সম্ভাপনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।[২১২]

শিল্পী শহিদ মিনারের পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত, সমাজ ও দেশের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। শিল্পী সমকালীন সময়ের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের দিকে লক্ষ্য রেখে শহিদ মিনারে কোনো মনুষ্য প্রতিমূর্তি ব্যবহার না করে কেবল কনক্রিটের কাঠামো নির্মাণ করেন। প্রশস্ত চত্বরের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে বৃহৎ মূল কাঠামোকে শহিদ ছাত্রদের মা এবং মূল কাঠামোর উভয়পাশের দু'টি করে ছোটো কাঠামোগুলোকে ছাত্রদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যা তার আপন ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার মানসিক ভারসাম্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।[২১৩]

দেয়ালচিত্র

বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীয় শহিদ মিনারের ঠিক নিচে একটি দেয়ালে শিল্পী হামিদার রহমান চিত্র অঙ্কনের সম্মান লাভ করেন। এই দেয়াল চিত্রের মধ্যে তিনি বিমূর্ত মনুষ্য প্রতিমূর্তি আঁকার সুযোগ পান। এই চিত্রে তিনি ভাষা আন্দোলনের নিহত ছাত্রদের আঙ্গিকে জ্যামিতিক আকারে কেবল কয়েকটা হাত-পা নিহত ছাত্র তথা শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[২১৪] এই দেয়াল চিত্রের সাদা, কালো ও ধূসর রঙের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের বিভীষিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাটির ওপর পড়ে থাকা একটা অর্ধ-পরিচিত আকৃতি শহিদ ছাত্রদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। অপরদিকে একটা কালো হাতের থাবা সর্বগ্রাসী স্বৈরাচারী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে। এখানে-ওখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়ানো কতকগুলো মানুষের হাত ও পায়ের মধ্য দিয়ে নিষ্পেষিত, জর্জরিত জনগণের মুক্তি পথের সন্ধানের আকুলতা ধ্বনিত হয়েছে।[২১৫] বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, আকার, আকৃতি ও রঙের ব্যবহার প্রভৃতি সবকিছু মিলিতভাবে স্বৈরাচারী শাসকের শোষণ ও নিষ্পেষণের প্রচণ্ডতা দারুণভাবে উচ্চারিত হয়েছে যা ভীতি সঞ্চার করে।[২১৬] শিল্পী হামিদুর রহমান **১৯৫৬** সালে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক এই দেয়ালচিত্রটি আঁকেন। তাঁর এই দেয়ালচিত্রটির এদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই দেয়ালচিত্রটি বাঙালির মধ্যে একটি জাগরণে সৃষ্টি করেছিল।[২১৭] শাসকগোষ্ঠীর উদ্বেগ হিসেবে কাজ করেছিল এই দেয়ালচিত্রটি। তাই শাসকগোষ্ঠী সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে দেয়ালচিত্রটি ধ্বংস করে দেয়।[২১৮]

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এবং ষাটের দশকের শুরুতে ঢাকায় বেশ কিছু নতুন নতুন ভবন নির্মাণ হচ্ছিল। এসব ভবনে দেয়ালচিত্র আঁকার মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার একটা তাগেদা অনুভব করলেন শিল্পী হামিদুর রহমান। কিন্তু তিনি প্রথমেই সরকারের পক্ষ থেকে তেমন সাড়া পান নি। কারণ সে সময় দেয়ালচিত্রকে প্রতিমা পূজা বা পৌত্তলিকতা সমান মনে করা হতো।[২১৯] কিন্তু শিল্পী সহজে হাল ছাড়েন নি। তিনি মোগল, তুর্কি, মিশরীয় ও পারস্য প্রভৃতি চিত্রকলার দৃষ্টান্ত দিয়ে তার স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেন। ফলে তিনি বেশকিছু দেয়ালচিত্র করার সুযোগ পান। তার মধ্যে করাচিতে অবস্থিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ঢাকার তৎকালীন সাধারণ পাঠাগার ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠাগারের দেয়ালচিত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালচিত্রে তিনি এদেশের কৃষিভিত্তিক জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের উপস্থাপনা করেন। জেলেদের জীবনভিত্তিক বিষয়বস্তুর অবতারণার মধ্য দিয়ে এদেশের কৃষিজীবী গ্রাম্য মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের ওপর আলোকপাত করেন। এই দেয়ালচিত্রটা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত–এক অংশে দু'জন জেলেনী ঝুড়ি ভর্তি মাছ মাথায় নিয়ে যাচ্ছে ফেরি করতে। একজন জেলে মাছ বিক্রি করছে। সে একটা মাছ হাতে তুলে নিয়ে ক্রেতাকে টাটকা মাছ দেখিয়ে দর কষাকষি করছে। অন্যদৃশ্যে, একজন জেলেনী বাড়িতে মাটির ঘরের বারান্দায় বসে সস্নেহে একটা ছাগলের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে

শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করছে। আরেকটি ভিন্ন দৃশ্যে, একজন অল্প বয়সী জেলে এক ঝুড়ি মাছ নিয়ে বসে আছে। তার এক কাঁধের ওপর একটা গামছা রাখা আছে। তাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে–যদি মাছ বিক্রি না হয় তাহলে মাছগুলো পঁচে যাবে। পরিবারের সকলকে অনাহারে থাকতে হবে।[২২০]

শিল্পী হামিদুর রহমান এদেশের সাধারণ মানুষ, তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও বাঁচার জন্য যে সংগ্রাম তার প্রতীক হিসেবে মাছের উপস্থাপনা করেছেন। বাঙালির সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি তাঁর চিত্রের মধ্য দিয়ে ওঠে এসেছে। ফলে তিনি সাধারণ দর্শকের কাছে সহজেই পৌঁছতে সক্ষম হন।

১৯৬৪ সালে শিল্পী হামিদুর রহমানের করাচিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে আঁকা দেয়ালচিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি একটা ধনী পরিবারের উপস্থাপন করেছেন। যার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ দেশের ইঙ্গিত দেন। কিন্তু একইসাথে তিনি এতে বাংলার সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘাটায়। দামি ও ব্যয়বহুল আসবাবপত্রের সাথে গ্রাম বাংলার লুঙ্গি পরিহিত দেখে মনে হয় বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবার। শয়নকক্ষের সার্বিক পরিবেশে তাদের কিছুটা বেমানান লাগে। কারণ শয়ন কক্ষের সার্বিক পরিবেশ দেখে মনে হয় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধশালী পরিবারের শয়ন কক্ষ।[২২১] শাসকগোষ্ঠী সর্বক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলে আসছিল। শিল্পী হামিদুর রহমানকেও সেরকমই করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিল্পী তা করেন খুব কৌশলে। তিনি তাঁর চিত্রের মধ্য দিয়ে দুই পাকিস্তানের মধ্যে যে ভিন্নতা এবং পূর্ব পাকিস্তান যে বঞ্চিত হচ্ছে ও সমান উন্নয়ন যে দুই অংশে হচ্ছে না তা তুলে ধারার চেষ্টা করে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ বা সামঞ্জস্য সৃষ্টির মাধ্যমে।

পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পার্থক্য ও বৈষম্য বিদ্যমান ছিল ষাট দশকের শুরুতেই তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[২২২] শিল্পী তাঁর শিল্প কর্মের মাধ্যমে ঐ বৈষম্য ফুটে তোলার চেষ্টা করেন। শিল্পীগণ এই বৈষম্য কথা শুধু পূর্ব পাকিস্তানে তুলে ধরেছেন এমন নয়, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও তা তুলে ধরেছেন।

ভাস্কর্য

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলাদেশের চারুশিল্পের মাধ্যম-বৈশিষ্ট্যে দেখা গেছে চিত্রকলা বা পেইন্টিং ও ছাপাইচিত্রের পাশাপাশি ভাস্কার্যের চর্চা শুরু হতে। পঞ্চাশের দশকে অবশ্য ভাস্কর্যচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এক্ষেত্রে প্রতিভাবান শিল্পী নভেরা আহমেদ এককভাবে ভাস্কর্য চর্চা করেছেন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে চারুকলা ইনস্টিটিউটে আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে ভাস্কর্যচর্চা শুরু হয়।[২২৩] আবদুর রাজ্জাক পেইন্টিংয়ের পাশাপাশি ভাস্কার্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ষাটের দশকের ভাস্কর্য প্রায় সবই মানব-অবয়ব, বিশেষত মুখ বা উর্ধ্বাঙ্গনির্ভর।[২২৪] ১৯৫৮ সালে স্থপতি হামিদুর রহমান ও নভেরা আহমেদের শিল্পকর্মের যৌথ একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।[২২৫] নভেরা আহমেদ তাঁর একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী করেন ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে।[২২৬] যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানে হামিদুর রহমান ও নভেরা যৌথ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। ১৯৫৭ সালে দুই শিল্পী শহিদ মিনারের কাজ করেন। কিন্তু সরকারি খাতায় নভেরা আহমেদের নাম না থাকায় শহিদ মিনারের নকশা পরিকল্পনায় তাঁর অবদানের প্রসঙ্গটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়।[২২৭] হামিদুর রহমানের সঙ্গে নভেরা আহমেদ যৌথভাবে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থাপত্য নকশা ও শৈল্পিক অঙ্গসজ্জার পরিকল্পনায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।[২২৮] শহিদ মিনারের নকশায় ৬টি ভাস্কর্যও ছিল। নভেরা আহমেদের ভাস্কর্যগুলো মধ্য দিয়ে বিমূর্ত অভিব্যক্তি ফুটে তোলার চেষ্টা করতেন। তাঁর ভাস্কর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : 'চাইল্ড ফিলোসফার', 'মা ও শিশু, 'এক্সটার্মিনেটিং অ্যাঞ্জেল', 'পরিবার', (১৯৫৮), 'জেব্রা ক্রসিং' (১৯৬৮), 'যুগল' (১৯৬৯) ও 'ইকারুস' (১৯৬৯) ইত্যাদি।[২২৯]

নভেরা আহমেদ পূর্ব পাকিস্তানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রথম আধুনিক ভাস্কর। তিনি পঞ্চাশ-ষাটের দশকে রক্ষণশীল সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন বেশবশনে ও ভাস্কর্য নির্মাণে মাধ্যমে। যেখানে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভাস্কর্যকে মূর্তি,

প্রতিমা পূজা বা পৌত্তলিকতা হিসেবে বিবেচিত করতো। ভাস্কর্যগুলো এই ভাবনার বিরুদ্ধে একটি বিজয়। রক্ষণশীল সমাজে থেকে প্রগতির পথে যাত্রা হিসেবে ধরতে হবে। এই প্রগতির যাত্রা শুরু হয় নভেরা আহমেদ ভাস্কর্যের মাধ্যমে।

বাংলা চলচ্চিত্র

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় জাতি প্রতিষ্ঠায় ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা কাজ করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চিন্তাধারার সাথে বাঙালিদের ভিন্নতা ও বৈপরিত্য দেখা দিলে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতি হিসেবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়। জাতি হিসেবে বাঙালির চূড়ান্ত উত্থান এবং তাদের আবাস হিসেবে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয়ের সার্বিক প্রস্তুতি মূলত শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে, যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ষাটের দশকের দুর্বার গণআন্দোলনে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হলো ঔপনিবেশিক ও ধর্মভিত্তিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সংমিশ্রণ, সহজভাবে যে ধারাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে চিহ্নিত করা হয়।[২৩০] এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব জাকির হোসেন রাজু বলেন, 'পাকিস্তান জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬০-এর দশকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ তাকে স্থানচ্যুত করেছে এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করেছে।'[২৩১]

চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনা

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন সংগঠন এবং মুদ্রণ-গণমাধ্যমের জাগরণসূচক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় যা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে চলচ্চিত্র মাধ্যমটির বিকাশের পথ সুগম ও সহজ করে তুলেছিল। চলচ্চিত্র বিষয়ক এসব প্রয়াস এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য–'ন্যাশনাল স্টুডিও এন্ড সিনে ল্যাবরোটরি' (১৯৫১), 'হনিউড' (১৯৫৩), 'কোবাদ এন্ড কোম্পানী' (১৯৫৩), 'আর হেলাল স্টুডিও' (চট্টগ্রাম-১৯৫৪) প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণের গৌরব অর্জন না করলেও এসব উদ্যোগ তৎকালে মুদ্রণ মাধ্যমসমূহে প্রচারিত হওয়ায় চলচ্চিত্র সম্পর্কিত দেশবাসীর মনে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল।[২৩২] ১৯৫৩ সালে 'ইকবাল ফিল্মস লিমিটেড ও ১৯৫৪ সালে 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকারস লিমিটেড' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এই প্রতিষ্ঠান দুটি অনেকগুলো চলচ্চিত্র নির্মাণ করে।[২৩৩]

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় তা পরবর্তী সময়ে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ লাভ করে। এ সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বেশ সক্রিয় ছিল। কঠোর সামরিক শাসনের কারণে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ছিল ঝুঁকিপূর্ণ এবং সে কারণে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক ভাবের যোগাযোগ হতো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। যে কারণে ষাটের দশকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেয়ে সাংস্কৃতিক কর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকারদের প্রভাব জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২৩৪]

বাঙালি ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক জাতিসত্তা এবং আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের যে অভিযান শুরু হয়েছিল তার যাত্রাপথেই বিকশিত হয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র চরিত্রগতভাবেই এমন এক শিল্প যা বিকাশের জন্য চাই রাষ্ট্রীয় কিংবা অপর কোনো বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।[২৩৫] প্রাথমিকভাবে তা হয়েছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফরের ওপর ভিত্তি করে নাজির আহমদ তৈরি করে *ইন আওয়ার মিডস্ট*। এই তথ্যচিত্রটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র।[২৩৬] একুশে এই ভূখণ্ডের সংস্কৃতিক বিকাশের যে আকুতি সৃষ্টি করেছিল, চলচ্চিত্রে তার বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল ঐ-জাতীয় উদ্যোগের এবং এজন্য আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। এক হচ্ছে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জায়মান আদর্শের বাহক যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ এবং যুক্তিসংগতভাবেই দ্বিতীয় পর্বটি হচ্ছে ক্ষমতা পরিচালনার স্বল্পকালের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন স্থাপনের নকশা প্রণয়ন।

উল্লেখ্য শেখ মুজিবুর রহমানে ছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রী এবং এফডিসি গড়ে-ওঠার পেছনে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।[২৩৭]

চলচ্চিত্র নির্মাণে মানসিক দ্বন্দ্ব

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহ মালিক পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চয়ে যায়। বাংলাদেশের মুসলমানদের নিকট চলচ্চিত্র ব্যবসা ইসলাম অননুমোদিত বলে বিবেচিত হওয়ায় সমকালে তারা এ মাধ্যমে আগ্রহ প্রকাশ করেনি।[২৩৮] যারা চলচ্চিত্র নিমার্ণে সাথে যুক্ত ছিলেন তারা তাই প্রাথমিকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রগতিতে খুব বেশি অবদান রাখতে পারে নি। পাকিস্তানের শুরু দিকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক জীবনের যে উত্থান-পতন ঘটে তার কোনো স্বাক্ষর তখনকার চলচ্চিত্রে নেই। এর অর্থ হলো সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ দেশের মানুষকে আলোড়িত করলেও তাতে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চেতনা জাগ্রত হয় নি।[২৩৯] শুধু তাই নয়, এই সময় বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকাও সন্তোষজন ছিল না। একদল সবসময় নিরপেক্ষ আবরণে নিজেদের নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট থাকেন। এদের কেউ কেউ সরকারের কাছে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রশাসনযন্ত্রের পক্ষে আন্দোলনের বিরোধিতা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। অন্য অংশ সরকারি কার্যক্রমের বিরোধিতা করেন, ফলে তাদের সরকারের পক্ষ থেকে নির্যাতনের ভোগ করতে হয়।[২৪০]

দ্বিতীয় দশকে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ষাটের দশকে বেশকিছু চলচ্চিত্র মুক্তির সংগ্রামের ভিত্তিভূমি তৈরিতে ভূমিকা পালন করে।[২৪১] চলচ্চিত্র নির্মাতারা চূড়ান্তভাবে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে সজাগ হলেন। এই সময় গঠিত ‘বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজে’ তারাও যোগ দিলেন। নিজেদের কর্তব্যের কথা নিজেরাই স্বীকার করলেন। খান আতাউর রহমান এ বিষয়ে একটি ভাষণে বলেন,

> সমগ্র মানব জাতিকে সচেতন করে তুলতে হলে তাদের সামনে জীবনের ছবি তুলে ধরতে হবে। তাদের দুঃখী জীবনবর্জিত জীবনের সামনে আয়না ধরে দেখাতে হবে দেখ তুমি কী। জীবনের কাছ থেকে এই কি তোমার প্রাপ্য? জীবনের এই সত্যিকার ছবি তুলে ধরেই কাজ শেষ নয়, তাকে আশ্বাস দিতে হবে যে তারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এমনি অজস্র ছবি, অজস্র গান, অজস্র কবিতা আর শিল্পকর্মের মাধ্যমে তার নিপীড়িত মানব আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ভবিষ্যতের জন্য গণজাগরণের জন্য। এই হচ্ছে গণআন্দোলনে শিল্পীর দান।[২৪২]

শিল্পীদের এই চেতনাবোধের জাগরণের সময় সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে চিত্রনির্মাতারা এগিয়ে এলেন। এর মধ্যে জহির রায়হানের ‘জীবন থেকে নেয়া’ প্রথম উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র।

চলচ্চিত্রে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালিত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব

সংস্কৃতির একটি অন্যতম শাখা হচ্ছে চলচ্চিত্র। সংস্কৃতির এই শাখাও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালির একটি দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে ছিল। চলচ্চিত্র দর্শক, নির্মাতা ও নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাশা ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়নের জন্য একটি বিল উত্থাপিত হয়। তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ‘পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা’–শীর্ষক বিল উত্থাপন করেন এবং সামান্য সংশোধনী শেষে ঐ অধিবেশনেই তা বিনা বাধায় গৃহীত হয়। এই বিল পাশের মাধ্যমে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রচর্চার আইনগত স্থায়ী ভিত্তি রচিত হয়। এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্বপাকিস্তানের সংস্কৃতিকর্মীদের সংস্কৃতিচর্চার বৃহৎ এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়।[২৪৩] শিল্প মন্ত্রণায়লয়ের অধীন হলেও অপরাপর শিল্পক্ষেত্রে সরকারের যে সাহায্যসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, চলচ্চিত্র শিল্পে তা প্রত্যক্ষ করা যায় না।[২৪৪] ‘পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা’ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর থেকেই এদেশে চলচ্চিত্রশিল্পের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। এ ঘটনা ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ভিত রচনার জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। রাজনীতি এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন গুণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে ঢাকার চলচ্চিত্রেও তখন শুরু হয় আত্মপরিচয়ের স্বরূপ সন্ধান।[২৪৫]

১৯৬৩ সালের ৩ অক্টোবর 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ' নামের একটি মননশীল সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪৬] এই চলচ্চিত্র সংসদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল উন্নত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রুচিশীল দর্শক সৃষ্টি করা। রুচিশীল চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে বৃহত্তর দর্শকের চলচ্চিত্রোপলব্ধির মানসিকক্ষেত্র প্রসারিত করা। সর্বোপরি, দেশজ চলচ্চিত্রে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যাবলি রক্ষার প্রত্যয়ে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ এবং এই মাধ্যমে আবহমান বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ের স্বাক্ষর প্রতিষ্ঠা করা।[২৪৭] অর্থাৎ বাংলার যে সংস্কৃতি তার এবং বাঙালিত্বের জয়গান গাওয়াই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ওয়াহিদুল হক বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ গঠন সম্পর্কে বলেন,

> ...গান দিয়ে ছায়ানট যা করতে চেষ্টা করছে, সংসদ তাই করবে চলচ্চিত্রচর্চার মধ্যদিয়ে। কাজটি হল পাকিস্তানি অচলায়তনের পাঁচিলে ধস্ ধরানো, সুস্থতা-উদারতা, সংস্কৃতমনস্কতার পথ কাটা। গানের অবলম্বন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মানবতাবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদী পরম শিল্পপ্রতিভা। চলচ্চিত্র নিজেই সংজ্ঞাগতভাবে যেন মানবতাবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদী। দেশ-বিদেশের সার্থক মহৎ চলচ্চিত্রের প্রদর্শন, তার রস ও মর্মগ্রহণ, আমাদের মধ্যযুগীয় মফস্বলিপনার খুব দক্ষ উৎসাদন হবে–এই ছিল হিসাব। তাছাড়া শিল্প হিসেবে এর রসগ্রাহিতার চর্চা ও বিস্তারের ব্যাপারটি তো ছিলই। এইভাবে চর্চা যদি প্রসার লাভ করে তবে তা একদিন অবশ্যই এদেশের চলচ্চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলবে, এ আশা আমাদের ছিল।[২৪৮]

প্রথম যুগে কয়েকজন প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী সংস্কৃতিকর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে এসেছিলেন। যে-কারণে *আসিয়া*, *কখনো আসেনি*, *সূর্যস্নান*, *কাঁচের দেয়াল*, *নদী ও নারী*'র মতো সমাজসচেতন বক্তব্যধর্মী ছবি তৈরি হতে পেরেছিল। *আসিয়া*-য় সামন্তবাদী নিপীড়ন, *কখনো আসেনি*-তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের চিত্র, *সূর্যস্নান*-এ পুঁজির শোষণ ও দৌরাত্ম্য, *কাঁচের দেয়াল*-এ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ ও বিপর্যস্ত সামাজিক মূল্যবোধ এবং *নদী ও নারী*-তে আধাসামন্তবাদী সমাজের মোটামুটি বিশ্বস্ত চিত্রায়ন করা হয়েছিল।[২৪৯]

এফডিসি প্রতিষ্ঠার কালে উর্দু চলচ্চিত্রের সাথে বাংলা চলচ্চিত্রের সম্পর্ক ছিল বিদ্বেষপূর্ণ ও দ্বান্দ্বিক। সে প্রেক্ষাপটেই প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার খান নির্মাণ করেন ঢাকার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংস্কৃতির যাত্রা শুরুর সময়ে এ এক বৈপ্লবিক ঘটনা। পাকিস্তানি উর্দু চলচ্চিত্রের আগ্রাসন, চলচ্চিত্র নির্মাণে দেশিয় পুঁজির সংকট, প্রশাসনিক বৈরিতা, অপপ্রচার ও সার্বিকভাবে প্রতিকূল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি এ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন।[২৫০] এফ.ডি.সি প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালেই সামরিক শাসন জারির কারণে কেন্দ্র থেকে প্রতিশ্রুত অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ বিকাশ ঘটে নি। এ সময় নবগঠিত এফ.ডি.সি-র কোনো কোনো কর্মকর্তার চাকরিও চলে যায়। এ ধরনের আতঙ্কিত পরিবেশের মধ্যেও এফ.ডি.সি-র অধীনে *আসিয়া*, *আকাশ আর মাটি*, *মাটির পাহাড়*, *জাগো হুয়া সাভেরা* প্রভৃতি চলচ্চিত্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।[২৫১] *জাগো হুয়া সাভেরা*-বাদে অন্য তিনটির প্রতিটিই সামাজিক কাহিনিচিত্র বলে সুপরিচিত। কিন্তু এসব চলচ্চিত্রের কোনোটিতেই আবহমান বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ভাষা আন্দোলনোত্তর বাঙালি গণমানুষের স্বাজাত্যবোধ বা ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা বিকাশের প্রয়াস দেখা যায় না। এর কারণ হলো–সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে এফ.ডি.সি-র প্রতিষ্ঠা এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমটি সম্পূর্ণ সরকারের প্রত্যক্ষ নজরদারিতে পরিচালিত হওয়ায় সৃজনশীল শিল্পীর স্বাধীনতা সেখানে কোনোরূপ প্রাধান্য পায় নি।[২৫২] এফ.ডি.সি-র এরূপ সরকারসংলগ্ন ভূমিকার কারণে সরকারি মনোভাব বিরুদ্ধ কোনো চলচ্চিত্র তৎকালে নির্মিত হওয়া সম্ভব ছিল না। সেজন্যই তৎকালের বাংলাদেশে বিরাজিত আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক চেতনাসমৃদ্ধ কোনো চলচ্চিত্র নির্মিত হয় নি।[২৫৩]

চলচ্চিত্র শিল্পের শুরু থেকে বাংলা ছবির বড়ো দুর্দিন চলছিল। বিশেষ করে, পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দু ছবির দাপট আর কিছু কিছু ভারতীয় হিট ছবির আকর্ষণ। এমনকি, পূর্ব পাকিস্তানেরও কেউ কেউ (এহতেশাম, মুস্তাফিজ প্রমুখ) উর্দু ছবি নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন।[২৫৪] তাদের উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণের পেছনে অজুহাত ছিল বাণিজ্য। কিন্তু তা সম্পূর্ণ পূর্বপাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আন্দোলন, গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও জাতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিপন্থি।

জহির রায়হান একটি ঘোষণা দেন যেখানে উর্দু ছবি নির্মাণে কারণ ও তার আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন,

> এ বছরের মধ্যে নতুন ধরনের চলচ্চিত্র না করতে পারলে আপন বিবেকের কাছে প্রতারক সাব্যস্ত হবো। এক সময় আমার আর্থিক সঙ্কট ছিল বলে সৃজনশীল ছবির বদলে বাণিজ্যিক ছবির ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এখন সে সামর্থ্য এসেছে। তাই আমার স্বপ্ন-সাধ নিজে ছবি তুলবার সময় উপস্থিত।[২৫৫]

এতদ্‌সত্ত্বেও ষাটের দশকেই এদেশিয় চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতিসত্তার স্ফূরণ ঘটে। কোনো কোনো পরিচালক চলচ্চিত্র মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রকৃত সমাজ-সংস্কৃতি, জলবায়ু-আবহাওয়ার প্রকৃত চিত্ররূপ উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[২৫৬] ষাটের দশকের উর্দু ছবির দাপটের মধ্যে পরিচালক সালাহ্‌উদ্দিন তৈরি করেন লোকগাথাভিত্তিক ছবি *রূপবান*। এই ছবি সুপারহিট ব্যবসা করে। এই সিনেমাতে বাঙালি সংস্কৃতির অনেক কিছু উঠে আসে ফলে সাধারণে মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সিনেমা হলো মধ্যবিত্তের প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। *রূপবান*-এর সাফল্য অন্যান্য চিত্রনির্মাতাকে উর্দু ছবির বদলে লোকগাথা ভিত্তিক ছবি নির্মাণে প্রেরণা জোগায়।[২৫৭] এর অল্প কিছুকাল পরেই তখনকার চলচ্চিত্রকাররা নির্মাণ করেন *সুতরাং* (১৯৬৪), *রূপবান* (১৯৬৫), *বেহুলা* (১৯৬৬), *নবাব সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭), *সাতভাই চম্পা* (১৯৬৮), *শহীদ তিতুমীর* (১৯৬৮) প্রভৃতি ছবি।[২৫৮] তবে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে বাঙালির স্বাধীনতার অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শানিত করে তুলেছিল *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)। এসব ছবির মাধ্যমে নির্মাতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মানুষের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন।[২৫৯]

পাকিস্তান আমলে চলচ্চিত্রের হাল

১৯৫৬ সালে *মুখ ও মুখোশ* ছবি দিয়ে জীবনভিত্তিক কাহিনি নিয়ে পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্র শুরু হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসা সফল হয় নি। প্রথম চলচ্চিত্র শুরুর আনন্দ, ভাষাগত ভালোবাসা থাকলেও তা প্রথমেই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।[২৬০] হিন্দি ও উর্দু ছবির সাথে প্রতিযোগীতায় টিকতে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয় এজন্য বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ উর্দু ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পরে। ১৯৬২ সালে বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক এহতেশামের উর্দু ভাষায় নির্মিত 'চান্দা' ছবিটি সারা পাকিস্তানে সুপারহিট হয়। ঢাকায় উর্দু ভাষায় ছবি নির্মাণ চিত্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাণিজ্যিক সাফল্য বয়ে আনলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য এটি ছিল বিরোধী পদক্ষেপ।[২৬১] বাংলা ছবির প্রতি দর্শকের মনযোগ বিচ্যুত হতে থাকলো। লগ্নী করা অর্থ না উঠায় বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো।[২৬২] এর ফলে পরবর্তীকালে উর্দু ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন আবদুল জব্বার খান, জহির রায়হান, খান আতাউর রহমানের মতো সচেতনরাও।[২৬৩] ১৯৬৪ সালে ঢাকায় সর্বাধিক উর্দু ছবি নির্মিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। চিত্র নির্মাতাদের উর্দু প্রীতি সচেতন বাঙালিদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[২৬৪] ৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধের কারণে ভারতীয় ছবির আমদানি ও প্রদর্শনী দিষিদ্ধ হয়। ফলে ঢাকার ছবির বাজারে কিছুটা আশার সঞ্চার হলেও পুরো সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ।[২৬৫] ১৯৬৫ সালে উর্দু ছবির গতি রোধ করে দাঁড়ালো 'বাংলার রূপকথা কাহিনী' নির্ভর 'রূপবান' সিনেমাটি। রূপকথার কাহিনি আর লোকগীতি-গাঁথা বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রাণ ফিরে দিলো। একইসাথে ফোক-কাহিনি এবং পৌরানিক ঐতিহাসিক কাহিনির চলচ্চিত্রও তৈরি হতে থাকলো এবং দর্শক প্রিয়তা লাভ করলো।[২৬৬] ১৯৬৬-৬৭ সালের মুক্তি পেয়েছিল পরিচালক সফদর আলি ভূঁইয়ার 'রহিম বাদশাহ ও রূপবান', আলি মনসুরের 'মহুয়া', জহির রায়হানের 'বেহুলা', ইবনে মিজানের 'আবার বনবাসে রূপবান', খান আতাউর রহমান পরিচালিত 'রাজা সন্ন্যাসী'[২৬৭] আর ইতিহাসভিত্তিক চলচ্চিত্র 'নবাব সিরাজদ্দৌলা'।[২৬৮] এই ছবিগুলোর উর্দু ও হিন্দি ছবির সাথে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করেছে। কারণ ফোক-কাহিনি এবং পৌরানিক কাহিনি যা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ তা দর্শকরা গ্রহণ করে। পরিচালক ও দর্শকরা নিজের সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করছে যা বাঙালিত্বের জয়। অন্যদিকে 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' চলচ্চিত্রটি দেশের রাজনৈতিক জাগরণে বিশেষ করে বাঙালির আত্মজাগরণে অবদান রাখে।[২৬৯] বাঙালির নিজের অবস্থার প্রতি এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয় এবং জনগণ নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হন। বাংলা চলচ্চিত্র সাহিত্য ও লোককাহিনির মাধ্যমে বাঙালির আপন সত্তা জেগে ওঠার যে প্রয়াস তা সহযোগিতা করে। ষাটের

দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মাসুদ-উর-রহমান বলেন, 'ডুবু ডুবু হয়ে পথ চলতে থাকলেও বাংলা ছবির ধারা–সংস্কৃতির মান বজায় রেখে, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে থাকলো। আর উর্দু ছবির ধারা–নিবু নিবু হয়ে তলিয়ে যেতে থাকলো।'[২৭০]

এভাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলা সংস্কৃতির জয় হতে থাকে। বাঙালির আত্মজাগরণ হয় যার মাধ্যমে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র্য ও স্বাধীন দেশ গঠনের দিকে এগিয়ে যায়। যে ছবিগুলো তৎকালীন সমাজে জাগরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা পর্যালোচনা করা হলো :

মুখ ও মুখোশ

চলচ্চিত্রের ইতিহাস বিষয়ক লেখকরা 'মুখ ও মুখোশে'র সাথে ১৯৫০ ও ৬০ দশকে গড়ে-ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা এবং উপনিবেশবিরোধী মনোভাবের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা বলতে চয়েছেন জব্বার খানের এই চলচ্চিত্র নির্মাণের পেছনে কাজ করেছে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ। আমাদের চলচ্চিত্র ঐতিহাসিকদের মতে 'মুখ ও মুখোশ' ছিল পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে নির্যাতিত গোষ্ঠীর এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। সেজন্য তাঁরা সবাই ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত একটি সভাকে বারংবার তুলে ধরেছেন।[২৭১] বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার উদ্ভবে যে কথা বলা হয় তা ছবির বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নয়, বরং বলা হয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অসহযোগিতা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে এই কাজটি কোনো একজন বাঙালির দ্বারা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল বলেই। দ্বিতীয়ত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষার বাংলা প্রতি বাঙালির যে আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল সেই জন্যেই বাংলা ভাষা ছবি নির্মিত হওয়া জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ড. আব্দুস সাদেক স্থানীয় সংস্কৃতিসেবী, চলচ্চিত্র পরিবেশক ও প্রদর্শকদের এক সভা আহ্বান করেন। পূর্ববঙ্গকে স্বাবলম্বী করার জন্যই তিনি এদেশে চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে তোলার আহ্বান জানান এই বৈঠকে। তিনি দেশের ৯২টি সিনেমা হলে যাতে বিদেশি ছবির বদলে যাতে স্থানীয় ছবি প্রদর্শন করা হয় সেজন্য ছবি তৈরির কথা বলেন। আব্দুল জব্বার খান তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'তৎকালে পূর্বপাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণ করবার বিষয়ে ড. আব্দুস সাদেক আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ..চলচ্চিত্র নির্মাণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন।'[২৭২] যার ফলাফল হলো বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬)।[২৭৩]

সাংস্কৃতিক কর্মীদের এ সভায় লাহোরের চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব উর্দুভাষী খান বাহাদুর ফজল আহমেদ দোসানী বলেন, 'এখানকার আবহাওয়া খারাপ, আর্দ্রতা বেশি। কাজেই এখানে ছবি তৈরি করা সম্ভব নয়।' তাকে চ্যালেঞ্জ করে আব্দুল জব্বার খান বলেন, 'কলকাতায় যদি ছবি তৈরি হতে পারে তবে ঢাকায় হবে না কেন?'[২৭৪] দোসানী বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েই পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে তিনি 'মুখ ও মুখোশ' ছবিটি নির্মাণ করেন।[২৭৫] পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি দোসনীর অভিব্যক্তির একটা শক্ত জবাব দেওয়া সম্ভব হয়েছে বাঙালি নির্মাতা আবদুল জব্বার খানের 'মুখ ও মুখোশ' ছবির মাধ্যমে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট জাতীয়তাবোধের গভীর চেতনা তাঁকে এই চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহিত করেছিল।[২৭৬] নির্মাণ শেষ হওয়ার পরেও শাসকগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আবদুল জব্বার খান বহু বাধাবিপত্তি এড়িয়ে লাহোর থেকে ছবিটির সম্পাদনার কাজ শেষে প্রিন্ট নিয়ে যখন ঢাকায় ফিরেন তখন কাস্টম্স অফিসে বাধা দেওয়া হয়। সরকার কর্তৃক প্রিন্ট আটক করায় সাধারণ মানুষের মনে সেদিন নানা ধরনের প্রশ্ন ওঠেছিল। আব্দুল জব্বার খান এ ঘটনার প্রতিবাদে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে সেদিন বলেছিলেন, 'আমরা কি পাকিস্তানের নাগরিক? পূর্ব পাকিস্তান কি পাকিস্তানের শাসিত রাজ্য?'[২৭৭] এই প্রশ্ন শুধু আব্দুল জব্বার খানের নয়, এটি ছিল সারাদেশের মানুষের প্রশ্ন, বাঙালির প্রশ্ন। দর্শক ছবিটি দেখেছিল, ভারতীয় এবং উর্দু ছবির মেলোড্রামার মুন্সিয়ানায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার পরও

ভাষা আন্দোলনের চেতনায় পরিপুষ্ট দর্শকমানস দুর্বল কাহিনি এবং অপরিণত চিত্রগ্রহণে দুষ্ট প্রথম বাংলা ছবিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল ভাষার টানেই।[২৭৮] আব্দুল জব্বার খানের চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ের মন্তব্য করতে গিয়ে মফিদুল হক বলেন,

> ভারতীয়, মার্কিনি ও বিশেষভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি তথা লাহোরি চলচ্চিত্রের জমজমাট বাজারে সম্পূর্ণ বিরূপ পরিবেশে বাঙালি তরুণরা যেভাবে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের দুঃসাহসিক কিন্তু একরোখা কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন তার পশ্চাতে একটা সামাজিক তাগিদ ছিলো। আর এই তাগিদের পশ্চাতে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল ছিলো একুশ-উত্তর বাঙালি মুসলমানদের স্বীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।[২৭৯]

'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক সমালোচক এই ছবিটির মধ্যে একুশের চেতনার কথা বলেছেন কিন্তু কোথাও সরাসরি তা প্রতিফলিত হয় নি। মূলত ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাঙালির যে বাংলা ভাষার প্রতি টান সেখান থেকেই মূলত বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রয়াস বলে সমালোচকগণ এই ব্যাখ্যা করেছেন। উর্দু এবং হিন্দি ভাষার সাথে প্রতিযোগিতা করে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র বানানো হয়। যেখানে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবোধের কারণে তা চলচ্চিত্রকার ভাবেন নি।

জাগো হুয়া সাভেরা (১৯৫৯)

জাগো হুয়া সাভেরা চলচ্চিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৫৯ সালে নির্মিত। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাহিনিকার হিসেবে হিন্দুনাম ব্যবহারে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের কবি ফয়েজ আহমদের নাম ব্যবহৃত হয়েছিল।[২৮০] একটি দেশ কতটা সাম্প্রদায়িক হলে এটা করতে হয়, তা সহজেই অনুমেয়। পাকিস্তানে তখন রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল আইয়ুব খানের সামরিক আইনের কারণে। শুধু তাই নয়, সংখ্যালঘু ও বাঙালিদের অধিকার আরও বেশি খর্ব করা হয়েছিল। *জাগো হুয়া সাভেরা* ছবিটি তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি একজন হিন্দুর হওয়ায় স্বাধীন পাকিস্তানে সেই নামটি ব্যবহার করা যায় নি। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকের অধিকারের চিত্র। ফলে জনসাধারণ নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তারা অগ্রসর হতে থাকে। *জাগো হুয়া সাভেরা* নির্মাণশৈলীর কারণে ১৯৫৯ সালে মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে।[২৮১] কিন্তু বাঙালির কাছে *জাগো হুয়া সাভেরা*'র গুরুত্ব তার কাহিনি বা অভিনয় দক্ষতার জন্য নয়, বরং শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক আচরণের কারণে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এই চলচ্চিত্রটি বাঙালিকে বুঝিয়ে দেয় তারা কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ পাকিস্তান কী?

সূর্যস্নান (১৯৬২)

'সূর্যস্নান' হলো চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন পরিচালিত দ্বিতীয় ছবি। শ্রমিক-মালিক সংঘাত নিয়ে এফডিসি'র প্রথম দিককার ছবি 'সূর্যস্নান' বেশ কয়েকবার সেন্সর বোর্ডের আপত্তির সম্মুখীন হয়। বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬২ সালের ৫ জানুয়ারি। ছবিটি করাচির একটি হলে দেখানো হয়। এই ছবি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ফয়েজউল্লাহ দু'জন অবাঙালি দর্শকের মতামত তুলে ধরেন–একজন দর্শক বলছেন, 'ইয়ে ক্যায়া আজিব বাত হ্যায়। ফিল্ম কা হিরো এক গরীব আদমী হোতা হ্যায়।' লাহোরি ছবির নায়কেরা নবাব, জমিদার, কোটিপতি হয়ে থাকে। তারা বাস করে প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, এদিকে 'সূর্যস্নান'-এর হিরো হলো একজন গরিব শ্রমিক। প্রথম জনের মন্তব্য শুনে দ্বিতীয় জন বলেন, 'গরীব হ্যায়। লেকিন শরীফ হ্যায়।'[২৮২]

একসময় আমাদের নায়ক ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা, ইরান, তুরান-এর সমস্ত নায়করা। আমাদের এখানকার মাটির মানুষ যে নায়ক হতে পারেন সেটা কিন্তু আমরা কেউ চিন্তাও করি নি আর কল্পনাতেও ভাবতে পারি নি। ইব্রাহিম খাঁ থেকে শুরু করে যারা নাটক লেখেছে তাদের নাটকের মূল বিষয় ছিল শিরি ফরহাদ, ইউসুফ জুলেখা, বিষাদ সিন্ধু, সিরাজউদ্দৌলা। অধিকাংশ কাহিনি ইসলামী ঐতিহ্য বা ইরান তুরানের ঐতিহ্য থেকে নেওয়া। কিন্তু ৬০-এর দশকে আমাদের মনে প্রশ্ন

জাগে, আমার নিজের মাটির কথা না বলে কেন ইরান তুরানের দিকে তাকিয়ে থাকব। তাই এ সময় এসে আমাদের পরিচয় সংকট পুরোপুরি কেটে যায়। এই সময় বাঙালি উপলব্ধি করে এই ভূমিটা আমার। এই মাটির সঙ্গে জড়িত তিতুমীর, শরীতউল্লা। এরাই আমাদের নায়ক। আমাদের মুক্তির প্রশ্নে যারা কাজ করেছেন। সুতরাং আমরা তাদেরকেই অনুসরণ করতে পারি। যেহেতু জাতীয়তাবাদ জিনিসটা ভূমির সাথে জড়িত। জাতীয়তাবাদ কোনো বায়বীয় জিনিস নয়–ভূমি, ভাষা, সাংস্কৃতির সাথে সাহিত্যের সঙ্গে বিষয়গুলো সম্পৃক্ত। এ সময় বাঙালি বুঝতে পারল আসলে আমাদের মুক্তির জন্যতো শিরি ফরহাদরা কাজ করেননি, কাজ করেছেন এ ভূমির সন্তানরা। সুতরাং কেন তারা নায়ক হবেন না। এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে নাটক, চলচ্চিত্রে মধ্যে এসেছে। যার কারণে গরিব রহমানের পক্ষে বাংলা চলচ্চিত্রের নায়ক হওয়া সম্ভব হয়েছে।

রহমান একজন মিলের শ্রমিক। মিলের মালিক চৌধুরীর চোখ পড়ে রহমানের সুন্দরী স্ত্রী সুখির ওপর। চৌধুরীর নির্যাতনের সুখি মারা যায়।[২৮৩] প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রহমান তার মালিকের মেয়ে রীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে এক বনের ভিতর রাখেন। মেয়েটির সাথে কোনো প্রকার অশ্লীন আচরণ করে নি। এজন্যই অপর দর্শক বলেন, গরিব হলেও ভদ্রলোক।[২৮৪] রহমানকে ধরার জন্য চৌধুরী গুণ্ডা লাগায়। রহমান তাদের হাতে ধরা পড়ে এবং অত্যাচার করে তাকে হত্যা করা হয়। রক্তাক্ত মৃতদেহের ওপর বিচ্ছুরিত হয় উদীয়মান সূর্যের কিরণ।[২৮৫] মালিক শ্রমিকের যে দ্বন্দ্ব ছবিতে দেখানো হয়েছে তা মূলত শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্বই ছিল। এর মাধ্যমে পাকিস্তানের তৎকালীন অবস্থা ফুটে ওঠেছিল বলে অনেকে মনে করেন। বেশিভাগ শিল্পের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। তাদের দ্বারা বাঙালিরা শোষিত হচ্ছিল এই বার্তাটি সাধারণ মানুষকে মনে করে দেওয়া সম্ভব হয় এই ছবির মাধ্যমে। এর মধ্যে আরও দেখানো হয়েছে শোষিতদের কীরকম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। উদীয়মান সূর্যের কিরণের মধ্যে আশার কথা বোঝানো হয়েছে। শ্রমিকদের আশার বাণী দেওয়া হয়েছে। সুদিন আসবেই কিন্তু তার জন্য কাজ করে যেতে হবে। এই কাজ হলো আন্দোলন, সংগ্রাম ও প্রতিরোধ যা এনে দেবে চূড়ান্ত মুক্তি।

রূপবান (১৯৬৫)

ষাটের দশকের শুরুর দিকে বাংলা ছবির বড়ো দুর্দিন চলছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দু ছবির দাপট আর কিছু কিছু ভারতীয় হিট ছবির আকর্ষণ। এমনকি, এদেশেরও কেউ কেউ (এহতেশাম, মুস্তাফিজ প্রমুখ) উর্দু ছবি নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন।[২৮৬] শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সালাহ্উদ্দিন দমে থাকেন নি। সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ছবির জোয়ার চলছিল। বাংলাদেশে যে কয়জন নির্মাতা বাংলা ছবিকে আঁকড়ে থাকতে চাইছিলেন তাদের জন্য চলছিল ঘোর দুর্দিন। এই পরিস্থিতিতে বাংলা ছবির দর্শককে কীভাবে হলে ফিরিয়ে আনা যায় শুধু সেই চিন্তাই সালাহ্উদ্দিন-এর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

সাল্লাহ্উদ্দিন[২৮৭] ছিলেন আগাগোড়া একজন সাংস্কৃতিক সংগঠক। **১৯৫২** সালে কুমিল্লার সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা সংগঠক ছিলেন। তিনি চিন্তা করা শুরু করলেন আমাদের যে লোকসংস্কৃতি বা লোকজীবন আছে যা থেকে অনেক যাত্রা হতো সেগুলো ব্যবহার করে কীভাবে বাংলা চলচ্চিত্রের সুদিন ফিরে আনা যায়। এগুলোর মধ্যে রূপবান ছিল খুবই জনপ্রিয়। তিনি এটাকে সিনেমায় রূপ দেন। কিন্তু আর এই উদ্যোগে কারও কাছে তিনি আর্থিক সহায়তা পান নি। তাই তিনি নিজের সমস্ত জমিজমা বিক্রি করে সিনেমা বানালেন অনেকটা জুয়া খেলার মতো এবং সিনেমাটা প্রবলভাবে জনপ্রিয় হলো। লোকসংস্কৃতিকে ধারণ করে বাংলা সিনেমার যে বিকাশ হতে পারে তার প্রথম উদাহরণ *রূপবান*। আমাদের সংস্কৃতির যে সম্পদ আছে সেগুলোকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তবে আমাদের জাগরণ সম্ভব, *রূপবান* সিনেমা তা প্রমাণ করলো। একারণে বাংলা সিনেমায় ক্ষেত্রে *রূপবান* সিনেমাটা একটা অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ আমাদের লোকসংস্কৃতি বা সংস্কৃতি দিয়ে আমাদের সঞ্জীবনী চেষ্টা সফল হয়।

সেই সময় সমগ্র বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) 'রূপবান' নামে একটি যাত্রাপালা খুব সুনাম অর্জন করে। দেশের আনাচে-কানাচে এই যাত্রা মঞ্চস্থ হতে থাকে। তিনি মফঃস্বলের এক গ্রামে গিয়ে সারারাত জেগে যাত্রা দেখলেন। দেখে

উপলব্ধি করলেন, গল্পে ও নাটকীয়তায় মাটির গন্ধ আছে বলেই দর্শকের কাছে এর এতেঠ আকর্ষণ। তাছাড়া এতে আছে হৃদয়গ্রাহী লোক সংগীতের ব্যবহার। এই সমস্ত চিন্তাভাবনা করে এই জনপ্রিয় লোকগাথাটিকে সিনেমার পর্দায় আনার সিদ্ধান্ত নেন সালাহ্উদ্দিন।[২৮৮] ছবিতে যাতে লোকজ ঐতিহ্য ও উপাদানের গন্ধ থাকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখা হয়। ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে ছবিটি মুক্তি পায়।[২৮৯] ছবিটি মুক্তির পর তিনি রাতারাতি তারকাখ্যাতি পেয়ে যান। এটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু চলচ্চিত্রের একচেটিয়া বাজার থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের বাজারকে রক্ষা করেন নি, একইসঙ্গে চলচ্চিত্র দর্শকের সংখ্যা, সিনেমা হলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।[২৯০] রূপবান সিনেমা হওয়ার আগে আমাদের এখানে উর্দু সিনেমার প্রাধান্য ছিল। দেশজ সংস্কৃতি ও লোককাহিনি হওয়ায় বাঙালিরা তা সদরে গ্রহণ করেছিল। এর মাধ্যমে বাঙালি নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি যে ভালোবাসা তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্মিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ছিল ১৫৪টি। তন্মধ্যে বাংলা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ১০৪টি এবং উর্দু ভাষায় ৫০টি। এই পরিসংখ্যানটি সত্য হলেও ১৯৬৫ সালের পূর্ব চিত্রটা ছিল ভিন্ন। ওই সময় মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের পরিসংখ্যা একটি সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো [২৯১]:

সারণি

নির্মাণকাল	বাংলা	উর্দু
১৯৬০	২	০
১৯৬১	৪	০
১৯৬২	৪	১
১৯৬৩	২	৩
১৯৬৪	৭	৯
১৯৬৫	৫	৬
১৯৬৬	১৪	১১
১৯৬৭	১৬	৭
১৯৬৮	২৮	৬
১৯৬৯	২২	৭
মোট	১০৪	৫০

প্রথম দিকে যেখানে চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ বাণিজ্যের জন্য উর্দু ছবি নির্মাণে দিকে ঝুঁকে পরছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে *রূপবান* চলচ্চিত্রটি নির্মাণের পর সে প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ১৯৬৯ সালে একদশকের চলচ্চিত্রের হিসেবে দেখা যাচ্ছে উর্দু চলচ্চিত্র বাংলা চলচ্চিত্রের অর্ধেক নির্মিত হয়েছে। এটা সম্ভম হয়েছে বাংলা ভাষা ও বাংলার লোকসংস্কৃতি ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের কারণে। এর জন্য বিশ্লেষকরা কৃতিত্ব দেন সালাহ্উদ্দিন এবং তার নির্মিত *রূপবান* চলচ্চিত্রকে। এ প্রসঙ্গে চিন্ময় মুৎসুদ্দী বলেন, '...রূপবানের সাফল্যে ঢাকার ছবি থেকে প্রায় নির্বাসিত বাংলা ভাষা আবার ফিরে আসে। নির্মাতারা লোকছবির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ফিরে এলেন। বলা যায় ঢাকায় বাংলা ছবির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটে।'[২৯২]

কৃষক, শ্রমিক থেকে শুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে আলোড়িত করেছিল *রূপবান* সিনেমা। বাংলা একাডেমি প্রথম বারের মতো কোনো ছবি নিয়ে সেমিনার আয়োজন করে।[২৯৩] রূপবানের বাণিজ্যিক সাফল্য চিত্রনির্মাতাদেরকে বাংলাভাষায় আরও লোকগাথাভিত্তিক ছবি নির্মাণে উৎসাহিত করে।[২৯৪]

যারা *রূপবান* দেখেছেন তারা আমাদের সংস্কৃতির শক্তি সম্পর্কে অবিহিত হয়েছে এবং এটা প্রকারন্তে একটা বিনোদনের মাধ্যমে হলেও এই সংস্কৃতির শক্তিতে জাগরণ হয়ে যুব সমাজ এগিয়ে গেছে। ঐ যুব সমাজই মুক্তিযুদ্ধ করেছে, যুব সমাজই সাংস্কৃতিক আন্দোলন করেছে, ঐ যুব সমাজই রাজনীতি করেছে শিল্প সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে। এভাবে বিভিন্ন কবিতা, চলচ্চিত্র বিভিন্ন মাধ্যমে তারাই কিন্তু সারাদেশে জাগরণ তৈরি করে। ষাটের দশকে বাংলা চলচ্চিত্র দেখে জনতা যে হাততালি দিচ্ছেন; এই অনেকগুলো হাততালি, অনেকগুলো গানের সুর এগুলোর একটা ঐক্যতান হচ্ছে ৬০-এর দশকের বাঙালিত্ব। আর এই অনেকগুলো বিষয়ে এক হয়ে এ সময় নিজেদের বোধ চূড়ান্ত হয়েছে যে আমরা বাঙালি।

নবাব সিরাজদ্দৌলা (১৯৬৭)

খান আতাউর রহমান পরিচালিত চলচ্চিত্র 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' ১৯৬৭ সালের শুরুতে মুক্তি পায়। ষাটের দশকে একদিকে আইয়ুবীয় একনায়কত্ব আর অন্যদিকে মুক্তিচেতনায় তোলপাড় রাজনৈতিক পরিবেশ। পর্দায় তখন চলছে উর্দু আর রূপকথার দাপট। ঠিক এই সময় খান আতাউর রহমান বাঙালির স্বাধীন চেতনার প্রতীক ঐতিহাসিক চরিত্র 'সিরাজউদ্দৌলা' পর্দায় আনেন।[২৯৫] মুক্তি পাওয়ার পর ছবিটি দর্শকবরা লুফে নেয়। গণতন্ত্রহীন নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাঙালিরা ছবিটি দেখে সিরাজের অভিনয়, সংলাপ ও দেশপ্রেমের মধ্যে মুক্তির স্বাদ পায়।[২৯৬] ছবিটি যেমন দারুণভাবে ব্যবসায়িক সফল হয়, তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে অনেক ছবি নির্মাণ করেন।[২৯৭] ছবি মুক্তি পেলে বিপুল জনগোষ্ঠী এই ছবি দেখতে ভিড় করতে থাকে সিনেমা হলগুলোতে। খান আতাউর রহমানের *নবাব সিরাজদ্দৌলা* জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অন্যতম চলচ্চিত্র। দুই শ' বছরের ইংরেজ শাসনমলে ইংরেজ কর্তৃক প্রচারিত দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর নির্যাতনকারী নবাব সিরাজ রাতারাতি 'ট্র্যাজিক হিরো' হয়ে উঠলেন। তাকে তুলে ধারা হলো–দেশপ্রেমিক, জনদরদী এবং দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী প্রথম শহিদ রূপে। সাধারণ মানুষের কাছে সিরাজের 'নায়ক' হয়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী ভাবকে জোরদার করে তোলে, যা ষাটের অপরাপর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমান অথবা অধিকতর প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে।[২৯৮] এই চলচ্চিত্রটি দেশের রাজনৈতিক জাগরণে বিশেষ করে বাঙালির আত্মজাগরণে অবদান রাখে।[২৯৯] পরিচালক খান আতাউর রহমান এ ছবির পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ষাট দশকের জনপ্রিয় নেতা আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতীক হিসেবে সিরাজদ্দৌলাকে পর্দায় চিত্রায়ণ করেছিলেন।[৩০০]

শহীদ তিতুমীর

ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে আরও ১টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশে। এই চলচ্চিত্র হলো ইবনে মিজান পরিচালিত 'শহীদ তিতুমীর' (১৯৬৮)। এই চরিত্রটি ব্রিটিশ ও জমিদারদের বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।[৩০১] যা ষাটের দশকে জনগণকে আন্দোলন-সংগ্রামে সবসময় প্রেরণা জুগিয়েছে।

জীবন থেকে নেয়া (১৯৬৯)

'জীবন থেকে নেয়া' নির্মাণের কথা ঘোষণা করে জহির রায়হান ১৯৭০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রশ্ন তুলেছিলেন,

> আমাদের ছবিতে আজ অবধি রাজনৈতিক জীবন স্থান পায়নি। অথচ জনতার সঙ্গে এ জীবনের একটা গভীর যোগাযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে দেশের সবকিছু নির্ভরশীল। তাই এদেশের কথা বলতে গেলে রাজনৈতিক জীবন তথা গণআন্দোলনকে বাদ দিয়ে চলচ্চিত্র কি সম্পূর্ণ হতে পারে? আমি তাই গণআন্দোলনের পটভূমিতে ছবি করতে চাই। বাধা চলবে না। পত্রিকা জনতার সঙ্গে কথা বলে। চলচ্চিত্রও জনতার সঙ্গে কথা বলে। জনতার আন্দোলন, জনতার মিছিল, গুলির সামনে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, এদেশের জনতার ঢলে পড়ার ছবি আর খবর পত্রিকার পাতায় ছাপা হতে পারলে সেলুলয়েডে তা স্থান পাবে না কেন?[৩০২]

বাঙালি জাতীয়তাবাদী পরিচয়টি রাজনৈতিকভাবে উপস্থাপনের একটি সার্থক চলচ্চিত্র উদ্যোগ হলো–*জীবন থেকে নেয়া*। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে জাতিকে একত্রিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দিকে তাড়িত করে, সেসব ঘটনার সার্থক রূপায়ণ করেন জহির রায়হান এ চলচ্চিত্রে।[৩০৩] ১৯৬৮-৬৯ সালের গণআন্দোলন,

ছাত্র আন্দোলন, রাজনীতি, সরকারি নির্যাতন, একুশের বিভিন্ন কর্মসূচি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ ও ঘটনা–পারিবারিক কর্তৃত্বের মেয়েলী লড়াইয়ের রূপকের আড়ালে তুলে ধরা হয়েছে।[৩০৪] অর্থাৎ ১৯৬৯-এর যে গণঅভ্যুত্থানে দশ বছরের স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের পতন ঘটে, সে আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত হয় এই ছবি।[৩০৫] ১৯৭০ সালের ১০ এপ্রিল নির্ধারিত দিনে ছবিটি মুক্তি পায় নি ছাড়পত্রের অভাবে। এদিন ক্ষুব্ধ দর্শকরা ঢাকা, চট্টগ্রামে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল করে। অবশেষে ১১ এপ্রিল সরকার বাধ্য হয় 'জীবন থেকে নেয়া'র ছাড়পত্র দিতে।[৩০৬] এ ছবি নির্মাণকালে জহির রায়হান বলেন,

> একদিকে যখন সারাদেশে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত অপরদিকে তখন একগোছা চাবির প্রতি অধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে কয়েকজন মানুষ। ...আমার নতুন ছবিতে একদিকে রয়েছে সমকালীন জীবন জিজ্ঞাসা আর অন্যদিকে রয়েছে আদিম মানবিক প্রবৃত্তিগুলোর নর্তন-কুর্দন।[৩০৭]

তৎকালীন পাকিস্তানের (১৯৪৭-১৯৭০) চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'জীবন থেকে নেয়া'ই একমাত্র চলচ্চিত্র, যাতে সমকালীন গণআন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, রাজনীতি, পুলিশি নির্যাতন, একুশের বিভিন্ন কর্মসূচি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ ও ঘটনা, পারিবারিক কর্তৃত্বের মেয়েলী লড়াই রূপকের আড়ালে তুলে ধরা হয়েছিল।[৩০৮] তৎকালীন সামরিক শাসন কবলিত পাকিস্তানে এ ধরনের বক্তব্য সংবলিত চলচ্চিত্র নির্মাণ করা খুব একটা সহজ ছিল না। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করেই জহির রায়হান 'জীবন থেকে নেয়া' ছবি নির্মাণে নিয়েছিলেন কৌশল ও রূপকের আশ্রয়। একটি বাড়ির স্বৈরাচারী শাসিকার যাঁতাকলে পড়ে কয়েকটি মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং স্বৈরাচারের উৎখাত–ছবির মূল গল্প। একটি চাবির গোছাকে নিয়ে স্বৈরাচারী শাসিকার সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের গণ্ডগোল।[৩০৯] চাবির গোছা নিয়ে সাংসারিক গণ্ডগোল নতুন কিছু নয়।[৩১০] কিন্তু জহির রায়হানের কৃতিত্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে। চাবির গোছাকে তিনি শুধু সাংসারিক গণ্ডগোলের কারণ হিসেবে দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি–তিনি একে উপস্থাপিত করেছেন ক্ষমতাদণ্ডের প্রতীকরূপে। তাই চাবির গোছার হাত বদলের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় রাজনীতির একটি চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।[৩১১] সংসার এবং সংসারের অভিযোগে জর্জরিত গৃহিনী তার অতি সাধের চাবির গোছা যা ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়–এসবকে দিয়ে জহির রায়হান ষাটের দশকের সামরিক শাসককেই প্রতীক রূপ দিয়েছেন। পরিণতিতে ছবিতে দেখা গেল অনেক ঝড়-ঝাপটার পর সেই অত্যাচারী গৃহিনী আদালতের রায়ে কারারুদ্ধ হলেন।[৩১২]

'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রে সংসার একজনের (গৃহিণী) ডিকটেটর শাসকের বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচারের হাত থেকে বাড়ির সবাই মুক্তি চায়। এ যেন বাংলার জনগণের কথা। তারাও ডিকটেটরি শাসন থেকে মুক্তি চেয়েছিল, বিক্ষোভ করেছিল, জীবন দিয়েছিল। অবশেষে দেশে ডিকটেটরের পতন হয়েছে। সংসারের নানা ঘটনার পর গৃহিনীকে শেষ পর্যন্ত আদালতে যেতে হয়। আদালতে হত্যার অভিসন্ধিতে দোষী হয়ে তাকে অবশেষে চাবির গোছা ফেলে জেলে যেতে হয়। অসত্য ও অবিচারের পরাজয় হয়।[৩১৩]

ছবির কাহিনি বলতে ছোটো একটি সংসার। দুই ভাই, বোন ও তার বেকার স্বামী। যদিও স্বামী মোক্তার, বড়ো ভাই উকিল, আর ছোটো ভাই স্বাধীনচেতা কলেজছাত্র। বোনের স্বেচ্ছাচারিতায় দুই ভাই এমনকি তার নিজের স্বামীরও জীবন দুর্বিষহ। অথচ সবাই নিরুপায়। প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারো নেই। শেষে অতিষ্ঠ স্বামী নিজের স্ত্রীকে জব্দ করার জন্য আনোয়ারের দুই বোনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন দুই শ্যালকের। এরপরই নাটক এগিয়ে চললো দ্রুতগতিতে। নানারূপ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে ননদিনী দুই বৌয়ের মাঝখানে বিচ্ছেদ বাধায়। উদ্দেশ্য চাবির গোছা নিজের হাতে রাখা অর্থাৎ সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের দখলে নেওয়া। কিন্তু পাপ চিরদিন চাপা থাকে না। কুচক্রী ননদিনীরও সব ষড়যন্ত্র আদালতে ধরা পড়ে এবং শাস্তিও হয়। এই পারিবারিক কাহিনির পাশে আর একটি কাহিনি আছে, যা ছবির প্রধান উপজীব্য বলে মনে হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে যেখানে আদর্শবান যুবক আনোয়ার যার নেতা। প্রায়ই তাকে

জেলে যেতে হয়। নজরুল, রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে যে মিছিল করে সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন করতে চায়। স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ করে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আনোয়ারের সঙ্গী হয় দুই বোন, বীথি, সাথী আর রাজ্জাক। সারাদেশে সামরিক শাসন চলে, অত্যাচার বেড়ে চলে, কারফিউ জারি হয়। কিন্তু আন্দোলন স্তব্ধ হয় না। সংসারের শান্তির মতো দেশেও শান্তি ফিরে আসে। জনতার আন্দোলন সার্থক হয়। ছবির মধ্যে 'আমার সোনার বাংলা'সহ কয়েকটি গান পরিবেশন করা হয়। পূর্ব বাংলার পথ, ঘাট, নদী ও গ্রাম যেভাবে ছবিতে চিত্রায়িত হয়েছে তা অপূর্ব। মিছিলের কয়েকটি দৃশ্য আছে।[৩১৪] বাংলাদেশের প্রথম গণআন্দোলনভিত্তিক এই ছবিটিতে আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির মর্মস্পর্শী চিত্রায়ন হয়েছে। গান চলাকালীন সময়ে দেখানো হয়েছে '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদ বরকত ও সালাম-এর কবর, শহিদ মিনারের সামনের কালো পিচের রাস্তায় আঁকা আলপনা।[৩১৫]
প্রতীকের আবরণে পরিচালক অত্যন্ত সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন দেশের ক্ষমতাসীন 'একনায়ক'-এর দাপট, অত্যাচার, শক্তি এবং ক্ষমতার লড়াই।[৩১৬] এ ছবিতে একজন স্বৈরাচারী নারীর সঙ্গে অন্য সবার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বাতাবরণে সে সময়কার পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি তুলে ধরা হয়েছে।[৩১৭] স্বৈরাচারী নারী শুধু যে তাঁর স্বামী, ভাই, ভাইদের স্ত্রীদের দমন করে রাখেন, তা-ই নয়; সংসারের কর্তৃত্ব নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাঁদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেন, যেমন করে সব স্বৈরশাসক divide and rule নীতি জারি রেখে। সবশেষে, সবার মিলিত চেষ্টায় সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে পরিবারটি মুক্ত হয় এ স্বৈরচারী নারীর কবল থেকে।[৩১৮] বিভিন্ন রূপকের আড়ালে এই ছবিটি ছিল একটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র এবং এর মাধ্যমে পরিচালক স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগাম ইঙ্গিত দিয়েছিল।[৩১৯]
নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে জহির রায়হানের ছবি 'জীবন থেকে নেয়া'র শুটিং হয়। এই চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক ঘটনা ও বক্তব্য থাকার কারণে তৎকালীন পাকিস্তানের সরকার শুটিং পর্বেই এর নির্মাণ কাজ বন্ধের ষড়যন্ত্র।[৩২০] **১৯৭০** সালের **১** ফেব্রুয়ারি *দৈনিক সংবাদ*-এ জহির রায়হানের সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সামরিক সরকার শুটিং পর্বেই এ ছবির কাজ বন্ধ করার গোপন নির্দেশ প্রদান করে তথ্য মন্ত্রণালয় ও এফডিসি কর্তৃপক্ষকে।[৩২১] শুটিং চলা অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ জহির রায়হানকে ডেকে নিয়ে নানাভাবে হুমকিও দেয়। সেন্সর করার সময়ও ছাড়পত্র প্রদানে বিলম্ব করা হয়।[৩২২] বাংলাদেশের ইতিহাসে 'জীবন থেকে নেয়া'ই একমাত্র ছবি যা দেখার জন্য জনগণ বিক্ষোভ করেছিলেন। তারা স্লোগান দেয়, '*জীবন থেকে নেয়া* দেখতে চাই, দেখতে চাই।'[৩২৩] 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। এই ছবিতে একুশ ও গণআন্দোলনের চেতনা ও ঘটনাসমৃদ্ধ রবীন্দ্র-নজরুল-ইকবালের গান সংবলিত 'জীবন থেকে নেয়া' মুক্তিলাভ করে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছিল, উদ্দীপ্ত করেছিল লাখ লাখ দর্শককে।[৩২৪] এই ছবি সে সময় দেশের জনগোষ্ঠীর মুক্তিপাগল অথবা স্বাধীনতাকামী মানুষের মেজাজকে ধারণ করে সাধারণের চৈতন্যে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।[৩২৫]

মুক্তিযুদ্ধকালীন চলচ্চিত্র

জহির রায়হান **১৯৭১** সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নির্মাণ করেন বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *স্টপ জেনোসাইড*। পাকিস্তানি বাহিনির নৃশংস গণহত্যা ও শরণার্থীদের মৃত্যুর প্রতিরোধস্পৃহার ওপর ভিত্তি করে তিনি এ ছবিটি নির্মাণ করেন। যা বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়। প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে তাঁরই সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ সময় নির্মিত হয় আরও ৩টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র–*এ স্টেট ইজ বর্ণ*, *লিবারেশন ফাইটার্স* এবং *ইননোসেন্ট মিলিয়নস*। এসব ছবিতে পাকিস্তানি বাহিনির গণহত্যা, সাহসিকতাপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ, বিপ্লবী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের তৎপরতা এবং শরণার্থী নারী ও শিশুদের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরা হয়। এসব চলচ্চিত্রের অগ্নিমন্ত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে গড়ে ওঠে বিশ্ব-জনমত।[৩২৬]

চলচ্চিত্রকারদের কার্যক্রম ও শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-নির্যাতন

১৯৫২ সালে 'প্রগতি মজলিশ' কুমিল্লায় তিনদিনে সাংস্কৃতিক সম্মেলন করে সেখানে সালাহ্উদ্দিন অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সরকার রাজনীতির গন্ধ পায় এবং তাকে কারাবরণ করতে হয়।[৩২৭]

কাগমারী সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য ১৯৫৭ সালে জহির রায়হান গ্রেফতার হয়ে তিন মাস জেলে কাটানা।[৩২৮]

১৯৬১ সালের মে মাসে প্রবল বাধা-বিপত্তির মধ্যে সচেতন বাঙালিদের উদ্যোগে ঢাকায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। এই শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'ডাকসু'র অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অন্যান্যের সঙ্গে জহির রায়হানও গ্রেফতার হন।[৩২৯]

সংগীত শিল্পের বিকাশের জন্য চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন উদ্যোগের ১৯৬৮ সালে 'পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানী' স্থাপিত হয়। এই কোম্পানি থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি রেকর্ড বের করা হয়।[৩৩০]

অসহযোগ আন্দোলনে চলচ্চিত্র শিল্পী

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে।[৩৩১] চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরাও এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

৪ মার্চ চলচ্চিত্র শিল্পীরা জনতার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ২০ জন বিশিষ্ট বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীদের সাথে চলচ্চিত্র শিল্পীরা সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতি দিয়ে জনতার সাথে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ঘোষণা দেন।[৩৩২]

৫ মার্চ পূর্ব বাংলার ৩৩ জন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব তথা পরিচালক, প্রয়োজক, অভিনেতা অভিনেত্রী ও সংগীত পরিচালক এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে জানান যে, পূর্ব বাংলার নায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্র সমাজ জনতার সংগ্রামের সাথে থাকবে।[৩৩৩]

৬ মার্চ বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত অভিনেতা অভিনেত্রীরা সংগ্রামের সংলাপ উচ্চারণ করে গণহত্যার প্রতিবাদ এবং স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে।[৩৩৪]

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র বা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই সামরিক সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, তৎকালীন অভিনেতা আবুল খায়েরের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের চিত্র ধারণ করা হয়। তারাঁ সেই 'সবাকচিত্রটি' সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে বাঙালির চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম এক ঐতিহাসিক প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন।[৩৩৫] পুরো অসহযোগ আন্দোলনে এই চলচ্চিত্র মানুষকে দারুনভাবে জাতীয়তাবোধ ও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল যা ইতিপূর্বে এদেশে কোনো চলচ্চিত্র তা করতে পারেনি।

একসময় বাঙালি মুসলমানের মধ্যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তারা বাঙালি না মুসলমান? নাকি বাঙালি মুসলমান? ১৯ শতকের শেষ দিকে যখন হিন্দু পুনজাগরণবাদ আসা শুরু করলো। মারাঠারা শিবাজি উৎসব পালন শুরু করে। যখন প্রাচীন ভারতের একটি সম্প্রদায় নিজেদের ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে নাটক করে বা সেটাকে অবলম্বন করে আত্মসঞ্জিবনের চেষ্টা করছে। তখনও বাঙালি মুসলমানরা তার নিজেদের কথা বা নিজের ভূমির কথা বলতে পারে নাই, তখন মুসলমানরা ইরান তুরানে কাহিনি নির্ভর কার্যক্রম চালিয়ে যায়, শুধু তাই নয়, এই জিনিসটা বিশশতকে দেখা যায়। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত শিখা গোষ্ঠীর যে পত্রিকার প্রচ্ছদ সেখানেও দেখা যায়–একটা মসজিদ, খেজুর পাতা ও সেখানে একটা প্রদীপ জলছে। শেখ আব্দুর রহিম[৩৩৬] কেন হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জীবনী লেখলেন? উনি মুসলমান কিন্তু উনি উনার সময়ের কারও তো জীবনী লেখেন নি। ওই সময়ের প্রত্যেক লেখক (ব্যতিক্রম ছাড়া) ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখেছেন। লিখেছেন কারণ তার আত্মপরিচয়টা সে তখনও বুঝে উঠতে পারছে না, সে যে বাঙালি। এই সংকট নিয়েই বাঙালি মুসলমান কিন্তু ২০ শতকে প্রবেশ করে। এবং ৪৭ সালের দেশভাগের এটা কিন্তু একটা অন্যতম উপাদান। ১৯৪৮

সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলছেন, আমরা বাঙালি। কিন্তু এটা রাজনৈতিক ভাবে ১৯৫২ সালের বুঝতে পারলাম আমাদের ভূমিটা আমাদের। এ রকম একটি পরিপ্রেক্ষিতে তখন বাঙালি মুলসমানরা তাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐহিত্য থেকে সঞ্জীবনী নেওয়ার চেষ্টা করলো।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ষাটের দশকে বাংলার পরিচালক সালাহ্উদ্দিন নির্মাণ করেন *রূপবান*। ষাটের দশকজুড়ে ঢাকার চলচ্চিত্র পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দু এবং ভারতীয় হিন্দি সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকার লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছিল। *রূপবান* ছবিটি ঢাকার বাংলা চলচ্চিত্রকে নবজীবন দান করেছিল। যখনই উর্দু এবং হিন্দি সিনেমার থাবার মুখে বাংলা চলচ্চিত্র পড়েছে তখনই কোনো না কোনো লোককাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ছবি ঢাকার সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষের লোকজ জীবন থেকেই সে যুগে বাংলা সিনেমাকে তার বেঁচে থাকার প্রেরণা অনুসন্ধান করতে হয়েছে। যে কারণে জহির রায়হানের *বেহুলা*, ইবনে মিজানের *শহীদ তীতুমীর*, *সাত ভাই চম্পা* সহ অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, যার গল্প, ভাবপ্রবণতা এবং অন্যান্য উপাদান এসেছে বাংলার মানুষের শত শত বছরের জীবনচর্যার ভিতর থেকে। একদিকে ষাটের দশকজুড়ে যেমন লোককাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের হিড়িক পড়ে, একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংকট নির্ভর কাহিনিচিত্রের চিত্রায়নও হতে থাকে। ফলে ষাটের দশকের রাজনীতির উত্তপ্ত সময়ে অন্যান্য যেকোনো প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চেয়ে চলচ্চিত্রে সাধারণ মানুষের জীবন অনেক বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে, যা আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে বিস্তৃত করেছে। মানুষের মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে কার্যকর প্রভাব ফেলেছে।[৩৩৭] *জীবন থেকে নেয়া* ছবির 'আমার সোনার বাংলা' গানটি চিত্রায়ন দেখি। ফকরুল আলম নির্মিত *জয়বাংলা* (১৯৭০) ছবির একটি গান ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের রণাঙ্গনে শত্রুর বুকে কাঁপন-ধরানো স্লোগান 'জয়বাংলা'।[৩৩৮] সুতরাং এগুলো থেকেই বোঝা যায় মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে চলচ্চিত্রের কী ভূমিকা ছিল।

মঞ্চনাটক

বাঙালি সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান ধারা নাটক। শুরু থেকেই প্রগতিশীল বাঙালি মধ্যবিত্তরা সীমিতভাবে নাট্যচর্চায় যুক্ত হন। সমকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক সংগ্রামী প্রেরণা এবং পূর্ব বাংলার বঞ্চিত ছিন্নমূল মানুষের হতাশা, জীবনবোধ, ব্যথা ও সংগ্রাম নিয়ে ক্রমশ এদেশে জীবনমুখী ও প্রতিবাদি নাটক লেখা ও মঞ্চায়ন অব্যাহত থাকে।

পাকিস্তান আমলে সৌখিস নাট্যসংগঠন 'ড্রামাসার্কল' ব্যতীত নিয়মিত নাট্যচর্চার কোনো দলের অস্তিত্ব খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। প্রবল প্রতিকূল পরিবেশে ড্রামা সার্কলের পক্ষে নিয়মিত নাট্যচর্চা করা সম্ভব ছিল না। ফলে নাটকের নিয়মিত দর্শকও তৈরি হয় নি। যদিও পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেই সে আমলে প্রেক্ষাপটে কিছু নাটক লেখা হতো। তাও আবার প্রতীক কিংবা রূপকাশ্রয়ী। অধিকাংশ নাটকই রচিত হতো সময়ের উত্তাপ কিংবা আন্দোলন-সংগ্রাম বিবর্জিত মানব-মানবীর প্রেম, সাংসারিক, পরিবারিক কিংবা সামাজিক নানা জটিলতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাতকে কেন্দ্র করে। এসব নাটক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা ক্লাবে সৌখিন নাট্য গোষ্ঠীর আয়োজনে বছরের কোনো একটি সময়ে মঞ্চায়িত হতো।[৩৩৯]

সাহিত্য, কাব্য সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন ও নাটক–শিল্পকলার এতগুলো বিভাগ থেকে নাটকের ক্ষমতাই অধিক। কেননা, নাটক শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে তার বক্তব্য পৌঁছে দেয়।[৩৪০]

১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ধারাটি হলো: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা শহর ও শহরতলীকেন্দ্রিক নাট্যচর্চা। এই নাটকগুলোতে প্রগতিশীল জীবনচেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতির স্ফুরণ ঘটে। দ্বিতীয় ধারাটি হলো : ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা বা গ্রামাঞ্চলের মঞ্চস্থ করা নাটক। মফস্বলে মঞ্চস্থ করা নাটকগুলোর অধিকাংশই ছিল ঐতিহাসিক, যা সামন্ত যুগীয় মূল্যাবোধ ও রক্ষণশীল ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে।[৩৪১]

১৯৪৮ সালের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসজ জারি হওয়ার পর সারাদেশে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মতো নাট্য ক্ষেত্রেও একটা প্রভাব পরে। সর্বপ্রথম সংগঠিত ও কার্যকর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সূচনা ঘটে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সে আন্দোলনে নাট্যজগতে তেমন কোনো প্রত্যক্ষ বা বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল না। তবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নাটক রচনা ও চর্চা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সাল থেকে মঞ্চস্থ করা নাটকের একটা তালিকা তুলে ধরা হলো :[৩৪২]

ক্রম	আয়োজক	নাট্যকার/রচয়িতা	নাটক	সময়কাল
১	সংস্কৃতি সংসদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন	১৯৫৮
২	সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়ন	আসকার ইবনে শাইখ	শেষ অধ্যায়	১৯৫৮
৩	ইকবাল হল ছাত্র হল ইউনিয়ন	আসকার ইবনে শাইখ	অনুবর্তন	১৯৫৮
৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ইউনিয়ন	বিধায়ক ভট্টাচার্য	তাইতো	১৯৫৯
৫.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ	মুনীর চৌধুরী (অনূদিত)	রূপার কৌটা	১৯৫৯
৬	কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ	-	রূপান্তর	১৯৫৯
৭	ফজলুল হক হল ইউনিয়ন	-	সয়লাব	১৯৬০
৮	সলিমুল্লাহ হল ইউনিয়ন	-	কানাগলি	১৯৬২
৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	মুনীর চৌধুরী	দণ্ড ও দণ্ডধর	১৯৬৩
১০	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	-	মলুয়া	১৯৬৩
১১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ	আলা উদ্দিন আল আজাদ	মায়াবী প্রহর	১৯৬৩
১২	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ	আসকার ইবনে শাইখ	প্রচ্ছদ পট	১৯৬৪
১৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী	১৯৬৪
১৪	ফজলুল হক হল ইউনিয়ন	-	বিন্দু বিন্দু রং	১৯৬৫
১৫	ছাত্র শিল্পী সংসদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ব্লাক আউট	১৯৬৫
১৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল ইউনিয়ন	-	শোধবোধ (মূল : কর্ম্মফল)	১৯৬৫
১৬	ইকবাল হল ছাত্র সংসদ	-	কথা দাও	১৯৬৫
১৭	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ	কল্যাণ মিত্র	দায়ী কে	১৯৬৬
১৮	সংস্কৃতি সংসদ	কল্যাণ মিত্র	রাস্তার ছেলে	১৯৬৭
১৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিভাগ কর্মচারীবৃন্দ	-	এবাড়ী ওবাড়ী	১৯৬৭
২০	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রবৃন্দ (২য় ও ৩য় বর্ষ)	আসকার ইবনে শাইখ	প্রচ্ছদপট	১৯৬৭
২১	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ	প্রসাদ বিশ্বাস	অবিচার	১৯৬৮
২২	ইকবাল হল	কল্যাণ মিত্র	পাথরবাড়ী	১৯৬৯
২৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	আসকার ইবনে শাইখ	লালন ফকির	১৯৬৯
২৪	জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ	-	বিদ্রোহী পদ্মা	১৯৭০
২৫	সংস্কৃতি সংসদ	সমরেশ বসু	আবর্ত	১৯৭০
২৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	নীলিমা ইব্রাহীম	দুয়ে দুয়ে চার	১৯৭০
২৭	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী	মাহবুবুর রহমান	যে পথের শেষ নেই	১৯৭১

এই কালপর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠন, ছাত্র সংসদ ও বিভাগের আয়োজন যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ বা অভিনীত হয়েছে তাতে মূলত প্রগতিশীল জীবন চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতির স্ফুরণ ঘটেছিল যা বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল

মূল্যবোধ আশ্রয়স্থল। যখন রাজনৈতিকরা তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম করতে পারছিল না সামরিক শাসকদের দাপটের কারণে। তখন ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্য প্রয়াসে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি ক্রমশ ফুটে উঠেছিল। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় একটি স্বতন্ত্র অভিরুচি বা চেতনার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এই স্বতন্ত্র অভিরুচি বা চেতনাকে আমরা প্রাগ্রসর চেতনা বলে চিহ্নিত করতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নব্য মধ্যবিত্তের আন্তর্গরজে ও অভিরুচিতে মঞ্চস্থ হয়েছে সমাজ সংকটমূলক ও জীবন যন্ত্রণাস্পর্শী নাটক। এই ধারা বা চেতনা '৫২ র ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্যায়ে এ দেশের প্রাগ্রসর নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ অবদান রাখে।[৩৪৩] প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শমণ্ডিত প্রতিবাদী নাট্য চর্চার ধারা গড়ে ওঠে, তা সমগ্রদেশের নাট্যকার ও নাট্যকর্মীকে যথেষ্ট প্রণোদিত করে। ক্রমশ নাটক হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শক্তিশালী মাধ্যম।

১৯৫৮ সালের পর ঢাকা শহরে বেশ কিছু পেশাদার ও অপেশাদার নাট্য সংগঠন সৃজনশীল ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধ্যারণার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই রূপ কিছু নাট্য সংগঠনের প্রদর্শিত নাটকের পরিচয় তুলে ধার হলো :

সংগঠনের নাম	**নাট্যকার**	**উল্লেখযোগ্য নাটক**	**সময়কাল**
কৃষ্টি সংঘ	আলী মনসুর	বোবা মানুষ	১৯৫৮
নাসো থিয়েটার	শহিদুল আমিন	নাটক নয় সত্যি	১৯৫৮
নবনাট্য পরিষদ	গোলাম রসুল	প্রত্যাখ্যান	১৯৫৮
ড্রামা সার্কেল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রক্ত কবরী	১৯৫৮
রূপায়ন নাট্য সংঘ	জসিমউদ্দিন	আগামী দিন	১৯৫৮
বুলবুল ললিতকলা একাডেমি	জসিমউদ্দিন	নকসীকাঁথার মাঠ	১৯৫৯
মিনার্ভা থিয়েটার	আব্দুর রউফ	এই তো সমাজ	১৯৫৯
ড্রামা সার্কেল	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	বহি পীর	১৯৫৯
নবনাট্য পরিষদ	গোলাম রসুল	স্বপ্নভঙ্গ	১৯৫৯
রূপ ও নাট্য সংঘ		রূপান্তর	১৯৫৯
ঢাকা থিয়েটার		মায়ামৃগ	১৯৬০
প্রান্তিক নাট্য পরিষদ	কল্যাণ মিত্র	দায়ী কে	১৯৬০
মিনার্ভা থিয়েটার	আব্দুর রউফ	ভাওয়াল সন্যাসী	১৯৬০
নবনাট্য পরিষদ	বিধায়ক ভট্টাচার্য	বিশ বছর আগে	১৯৬০
অগ্রদূত নাট্যসংঘ	বিধায়ক ভট্টাচার্য	মাটির মানুষ	১৯৬০
ইস্টার্ন কালচারাল এসোসেয়েশন	আসকর ইবনে শাইখ	বিরোধ জাহাঙ্গীর	১৯৬০
ড্রামা সার্কেল	আর্থার মিলার (অনুবাদ বজলুল কমির)	সবাই আমার ছেলে	১৯৬১
ড্রামা সার্কেল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাজা রাণী	১৯৬১
ড্রামা সার্কেল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	তাসের দেশ	১৯৬১
ড্রামা সার্কেল	সেফোক্লিন (অনুবাদ : সৈয়দ আলী আহসান)	ইডিপাস	১৯৬২
ড্রামা সার্কেল	এস. কাইলাস (অনুবাদ : বজলুল করিম)	সপ্তসুরের বীথি আক্রমণ	১৯৬৩
বুলবুল ললিতকলা একাডেমি	জসিমউদ্দিন	মনোনীতা	১৯৬৩

সাত রং নাট্য সংস্থা	আসকার ইবনে শাইখ	প্রচ্ছদপট	১৯৬৩
সাত রং নাট্য সংস্থা	আসকার ইবনে শাইখ	অনেক তারার হাতছানি	১৯৬৪
সাত রং নাট্য সংস্থা	সাঈদ আহমদ	মাইল পোস্ট	১৯৬৫
প্রান্তিক নাট্য পরিষদ	কল্যাণ মিত্র	জীবন হতে বড়	১৯৬৫
মিনার্ভা থিয়েটার	আব্দুর রউফ	গায়ের বধূ	১৯৬৫
মিনার্ভা থিয়েটার	তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	কালিন্দী	১৯৬৫
কৃষ্টি সংঘ	আলী মনসুর	চক্রান্ত	১৯৬৬
আরামবাগ নাট্য সংসদ		সমাধির পরে	১৯৬৭
খেয়ালী চক্র	কল্যাণ মিত্র	চোরাগলি মন	১৯৬৭
সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী	ম্যাক্সিম গোর্কী	মা	১৯৬৮/১৯৭৯
সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী	ম্যাক্সিম গোর্কী	বিপ্লবের টুকরো ছবি	১৯৬৮
সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী	জন রিড	দুনিয়া কাঁপানো দশদিন	১৯৬৮
বুলবুল ললিতকলা একাডেমি	আনিস চৌধুরী	মানচিত্র	১৯৬৯
সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী	জন রিড	সংকেত	১৯৭০

ঢাকার বাইরের এলাকাগুলোতে রক্ষণশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী তখন অধিকতর শক্তিশালীভাবে অবস্থান করছিল। তবুও 'ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে সেসব অঞ্চলের নাটকগুলো পরিলক্ষিত ক্রমবর্ধমান সামাজিক সচেতনার মাঝে স্থান করে নেয়। এসব নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (নারায়ণগঞ্জ, ১৯৫৫), 'উল্কা' (দিনাজপুর ১৯৫৭, রংপুর এবং রাজশাহী ১৯৫৬), ' ছেঁড়াতার' (রাজশাহী ১৯৫৭) ইত্যাদি।[৩৪৪]
মুক্তিযুদ্ধে নাট্যকর্মীদের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। ষাটের দশকে অসংখ্য নাটক মঞ্চস্থ করা হয় যেগুলো মানুষের মনে জাগরনের সৃষ্টি করে, আন্দোলন-সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ রকম কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

কবর

কবর[৩৪৫] নাটকটি ১৯৬৬ সালে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে।[৩৪৬] [বি. দ্র. 'মননচর্চা ও মানসজগৎ' অধ্যায়ে নাটকটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।] একটি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র প্রতিরোধধর্মী জীবন দর্শনের গাঢ় অনুভূতিময় প্রকাশের কারণে নাটকটি সর্বজনীনতা অর্জন করেছে এবং সকল রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৃত্যুহীন প্রতিরোধের মহৎ প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে।[৩৪৭] একুশের অনির্বাণ চেতনা ও অপরিমেয় আত্মত্যাগের ঘটনা শৈল্পিক উৎকর্ষে প্রতিভাসিত হয়েছে কবর নাটকে। এই নাটকে উঠে এসেছে সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদ চরিত্র যাদের গুলি করে হত্যা করা যায়, কিন্তু তাঁরা তাঁদের সংকল্পে থাকেন অটুট।[৩৪৮] স্বৈরাচারী শাসকবর্গের নির্দেশে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের রাতের অন্ধকারে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করার জন্য নিয়ে আসা হয়।[৩৪৯] কিন্তু নিহত ছাত্র যখন কবরে যেতে অস্বীকার করে। নেতা–যিনি অল্পক্ষণ আগেই মদ্যপান করেছিলেন–তাকে এই ভাষায় অনুরোধ করেন :

> জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাও নি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের পেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মত ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে তুমি বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনো মরেনি- তাদের নামে মিনতি করছি তুমি যাও, যাও, যাও। [কবর ২সং, পৃ. ৭৭][৩৫০]

এই নাটক আমাদের নাট্যসাহিত্যের পাশাপাশি জনজীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। 'কবর' নাটকটি সম্পর্কে কবীর চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> একটা বিশেষ বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও গভীর অনুভূতিময় প্রকাশের জন্য বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় নিরীক্ষাধর্মী অভিব্যক্তিবাদী আঙ্গিকের গুণে, এবং আবেদনবিস্তারী, সংলাপের ঔজ্জ্বল্যে 'কবর' বিশেষকে অতিক্রম করে সর্বজনীনতা অর্জন করেছে, এবং আমাদের নাটকের ভুবনে একট পালাবদলকারী দৃষ্টি উন্মোচক ভূমিকা পালন করেছে।[৩৫১]

কবর নাটকটি পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনসাধারণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ চেতনা ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। বাঙালির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে।[৩৫২] একুশের চেতনা বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে বাঙালির জাতীয় চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। যে চেতনার ফলে পুরো পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি রুখে দাঁড়ায়।

ক্রীতদাসের হাসি

শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) উপন্যাস অবলম্বনে শওকত ওসমান ও রামেন্দু মজুমদার যৌথভাবে রচনা করেন নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি'। [বি.দ্র. 'মননচর্চা ও মানসজগৎ' অধ্যায়ের উপন্যাস অংশে নাটকটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।] নাটকটি পুথিঘর থেকে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়।[৩৫৩] ২ ও ৩ মে, ১৯৬৩ সালে নাটকটি কার্জন হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়।[৩৫৪] নাটকে প্রতীকাশ্রয়ে তৎকালীন পাকিস্তানিদের বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা হয়েছে। বাগদাদের বাদশা হারুন অর রশিদের শাসনামলে গোলাম বেচাকেনা হতো। বাদশার হুকুম ছাড়া গোলামদের কোনো কিছু করার স্বাধীনতা ছিল না, এমনকি প্রেম, ভালোবাসা বিয়ের অধিকার পর্যন্ত ছিল না। বাদশা হারুন অর রশিদ ক্রীতদাস তাতারি ও বাঁদি মেহেরজানের প্রণয়ে বাধা সৃষ্টি করে। একরাতে বাদশা তার কেনা গোলাম তাতারীর হাসিতে মুগ্ধ হন। বিত্ত বৈভব থাকা সত্ত্বেও বাদশা হাসতে পারেন না। অথচ নিঃস্ব রিক্ত তাতারি স্ত্রী মেহেরজানের সান্নিধ্যে প্রাণ খুলে হাসতে পারে দেখে বাদশা তাতারি ও মেহেরজানের বিয়ে অবৈধ বলে ফতোয়াজারি করেন। মেহেরজানকে তাতারির কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তাতারি আমৃত্যু বাদশা হারুনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়। এখানে তাতারি বাঙালি জনতার এবং বাদশা হারুন আইয়ুব খানের প্রতীক। তাতারির হাসি উপন্যাসে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ধনদৌলত, বিভিন্ন নারীর যৌবন ও রূপের জৌলুস কোনো কিছু দিয়েও বাদশা তাতারির মুখে হাসি ফোটাতে পারেন নি। ভালোবাসার মেহেরজানকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তাতারির সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের হাসিও হারিয়ে যায়। নানা ধরনের অত্যাচার, এমনকি মৃত্যু অনিবার্য বুঝতে পেরেও তাতারি হাসে না। বরং সে জানিয়ে দেয় মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের চিরন্তন সত্য কথা–

> : শোন হারুণর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বাঁদী কেনা সম্ভব। কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না।[৩৫৫]

তাতারির উচ্চারিত সংলাপই এই নাটকের মূল বিষয়। অর্থাৎ 'ক্রীতদাসের হাসি অবিক্রিত' এই নাটকের মূল জীবনদর্শন।[৩৫৬] এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রই প্রতীকধর্মী। বাদশা হারুণর রশীদ চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকারদ্বয় স্বৈরাচারী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকের অত্যাচার, নির্যাতন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন। রক্ষণশীল ইসলামি ধারার তোষামোদকারীদের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন আলেম আব্দুল কদ্দুসের চরিত্রে। বিবেকমান মানুষের প্রতীক যেমন কবি ইসহাস তেমনি শাশ্বত মানবতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাতারি ও মেহেরজানকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–

> এতে নির্যাতীত মানুষের তিক্ত প্রতিবাদের এক রূপক কাহিনির মাধ্যমে নাট্যকারদ্বয় এই মর্মবাণী উপস্থাপন করেন যে, ঐশ্বর্য দাস ক্রয় করতে পারে বলে, তবে তা কখনো ক্রীতদাসের হাসিটুকু কিনতে সক্ষম নয়।[৩৫৭]

ক্রীতদাসের হাসি নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে সমকালীন স্বৈরাচারী শাসকের শাসনামলে পূর্ববাংলার স্বাধীনতাহীন, শৃঙ্খলিত বাঙালির দুঃখ বেদনানে সঠিক শব্দ প্রয়োগে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে তুলে ধরে নাট্যকারদ্বয় সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

যতীন সরকার *ক্রীতদাসের হাসি* রচনার করার পটভূমি সম্পর্কে বলেন,

> বিগত (উনিশ) শতকের ষাটের দশকটিতে পাকিস্তানি ফৌজি শাসনের জাঁতাকলের পেষণে আমাদের দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। সেই দমবন্ধ করা পরিবেশেও দম ফেলার সুযোগ সন্ধান করেছিলেন শওকত ওসমান। সুষ্ঠু ইতিহাস চর্চার পথও যখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন ইতিহাসকে রূপকথার মোড়কে ঢেকে তিনি লিখেছিলেন 'ক্রীতদাসের হাসি'।[৩৫৮]

ক্রীতদাসের হাসি'র জন শওকত ওসমান আদমজী পুরস্কার পান। সাধারণত শাসকগোষ্ঠীর পক্ষের লেখক বা তাদের মনমত লেখা না হলে পুরস্কার দেওয়া হতো না। কিন্তু শওকত ওসমানকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে রামেন্দু মজুমদার ব্যাখ্যা করে বলেন,

> ..শওকত ওসমানের উপন্যাস *ক্রীতদাসের হাসির* মধ্যে আরব্য রজনীর কাহিনির আড়ালে যে তদানীন্তন পাকিস্তানের একনায়ক আইয়ুব খানকেই কল্পনা করা হয়েছে, তা পাকিস্তানি কতৃপক্ষ বুঝতে পারেননি। রূপক হিসেবে আরব্য রজনীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। সেটা আগে বুঝতে পারলে বইটিকে আদমজী পুরস্কার দেয়ার বদলে হয়তো নিষিদ্ধই ঘোষণা করা হতো। তবে প্রগতিশীল বাঙালি বিচারকরা বিষয়টি বুঝতে পেরেও তা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন।[৩৫৯]

অবশ্য সনৎকুমার সাহার ব্যাখ্য একটু অন্যরকম। তিনি বলেন,

> ... এমনও হতে পারে, সম্মাননা জানিয়ে কেউ কেউ তাঁকে দলে টানতে চেয়েছেন, অথবা, তাঁর মুখবন্ধ করতে চেয়েছেন। তেমন হলে দুটোই ব্যর্থ হয়েছে। লেখকের সততা তিনি আরো কাছে বন্ধক দেননি। এমনও অবশ্য হতে পারে, যাঁরা তাঁকে পুরস্কৃত করেন, তাঁরা সবাই তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত নন। নামের প্রতিষ্ঠাকেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩৬০]

১৯৬৯ সালে ঢাকা টেলিভিশনে নাটকটি অভিনীত হয়।[৩৬১] শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রাক-স্নাতক পর্যায়ে একে অবশ্যপাঠ্য করা হয়েছিল। বোধ হয় পরিবেশ অনুযায়ী প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারেই পাঠ্যবই নির্বাচকমণ্ডলী কুপোকাত হয়েছিল।[৩৬২] এই নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যখন মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা ছিল না, তখন প্রতীকাশ্রয়ে নাটকটি প্রচারিত হওয়া জনগণ সাহস পায় এবং প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে।

স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাসখানেক আগে অর্থাৎ ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে লেডি গ্রেগরির, *দি রাইজিং অব দি মুন* অবলম্বনে মমতাজ উদ্‌দীন রচনা করেন *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* নাটক। কিন্তু নাট্যকার নিজের স্বাধীনতার প্রয়োগ করেছেন ইচ্ছে মতো ফলে নাটকটিকে মনে হয় মৌলিক নাটকের মতো।[৩৬৩] [বি. দ্র. 'মননচর্চা ও মানসজগৎ' অধ্যায়ে নাটকটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।] ফেব্রুয়ারি মাসে রচিত এ নাটকে নাট্যকার পাকিস্তান সরকারের বেতনভুক্ত দারোগার মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের ভূমিকা কী ছিল তারই চিত্র তুলে ধরেছেন।[৩৬৪] সামান্য বেতনভুক্ত সরকারের দারোগা নূর মোহাম্মদ, তার দুই পুলিশ সহকর্মী খলিলূর রহমান, আব্দুল বারেক মণ্ডল এবং জনৈক লোক এই চারটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বের বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে নাটকটি কাহিনি। রাতারাতি প্রমোশন, দুই হাজার টাকা পুরস্কার এবং প্রাপ্ত পুরস্কারের টাকায় ঘটা করে মেয়ের বিয়ের দেওয়ার আশায় সরকারের নির্দেশে দারোগা নূর মোহাম্মদ এক দেশপ্রেমিক বিপ্লবী নেতাকে ধরার জন্যে রাতে ফেরিঘাটে দুই সহকর্মীসহ পাহারা দিচ্ছিল। দুই সহকর্মীকে তাদের দায়িত্ব পালনে পাঠিয়ে নূর মোহাম্মদ যখন এক ফেরিঘাটে টহল দিচ্ছিল তখন গরীবুল্লাহ নামক জনৈক লোকের সঙ্গে দেখা হয়। লোকটির সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হয় দারোগার। লোকটি দারোগাকে ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের কথা, দেশাত্মবোধক কবিতা, গান, গল্প শোনালে দারোগার মধ্যেও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। লোকটি দারোগার কাছে জানতে চায়–

> : আপনি তো ব্রিটিশ আমলে ছাত্র। দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনার মনটাতে হাহাকার করতো না।
>
> : করতো না কি গরীবুল্লাহ, ইংরেজকে তাড়াবার জন্য কত কী করতাম। লাঠি চালাতাম, রক্তের মধ্যে আগুন ধরে যায় এমন সব গান শিখতাম।[৩৬৫]

লোকটি আবারও তাকে জিগ্যেস করে যে–

: মালিক আপনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন দেশের জন্য আপনার মত কাঁদত?

: এখনো কাঁদে। যদ্দিন বাঁচব দেশের জন্য কাঁদব। দেশকে ভালবাসা তো পাপ নয়। যারা স্বাধীনতা, তোমার আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তাদেরকে আমি ভালবাসি গরীবুল্লাহ।[৩৬৬]

এভাবেই কথোপকথনের মাধ্যমে গরীবুল্লাহ দারোগার মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। যার ফলে দারোগা যখন জানতে পারে যে, এই গরীবুল্লাহই সেই বিপ্লবী মোয়াজ্জেম যাকে ধরার জন্যে সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে তখন দারোগ সহকর্মী দলিল বিপ্লবী মোয়াজ্জেমকে হত্যা করতে চাইলে দারোগা নূর মোহাম্মদ দলিলকে গুলি করে হত্যা করে এবং রক্ষা করে দেশপ্রেমিক বিপ্লবী মোয়াজ্জেমকে। শত দুঃখ-অভাব-অনটন থাকলেও দারোগা এদেশের সন্তান। নিজের পদোন্নতি, মেয়ের বিয়ের জন্যে সে দেশের সঙ্গে বেঈমানি করতে পারে না। জীবনের জন্যে, জীবিকার জন্যে পাকিস্তান সরকারের গোলামী করলেও নূর মোহাম্মদ বুঝতে পেরেছে সরকারের ষড়যন্ত্র। সরকার যে কৌশলে একজন বাঙালিকে আরেকজন বাঙালির শত্রুতে পরিণত করের চক্রান্তে লিপ্ত তা বুঝতে তার বাকি থাকে না। নাটকের শেষ সংলাপে নাট্যকার দারোগার মধ্যে যে বিবেকবোধ, দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন–

: আমি নিজেই বড় সাহেবের কাছে হাজির হব মিঞা। বড় সাহেবকে বলব, জ্বি-হ্যাঁ আমি নূর মোহাম্মদ ছোট দারোগা, বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ছেড়ে দিয়েছি আর আমার সিপাহী দলিলুর রহমানকে গুলি করেছি।[৩৬৭]

দেশিবিদেশি শব্দে হাস্যরসাত্মক সংলাপের মাধ্যমে রচিত *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত অন্যতম নাটক। এ নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মূলত পূর্ববাংলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্যে স্বৈরাচারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং নাট্যকারের স্বদেশপ্রীতিরও প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া সময় ও বিষয় বিবেচনা করে দেশাত্মবোধক গান সংযোজন নাটকটি যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা।[৩৬৮] মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিলগ্নে এদেশের জনগণের মনে পুঞ্জিভূত ক্রোধ, বিদ্রোহ ইত্যাদির পটভূমিতে মমতাজ উদ্‌দীন আহমদই প্রথম নাটক রচনা করেন।

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ নিজের রচিত নাটক সম্পর্কে বলেন,

> স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের হাতিয়ার ছিল নাটক। খোলা মঞ্চে স্বাধীনতার জন্যে নাটক। মঞ্চের তিন দেয়াল আলোর ঝকমকানি, অভিনয়ের সুধা তখন বাঞ্ছিত ছিল না, নাটককে সরাসরি মাঠে নামে হয়েছে ফাল্গুনের খোলা বাতাসের মতো; গ্রীষ্মের নিকটবর্তী সূর্যের মতো। ছলাকলা দিয়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এবং বৈশাখের খরতাপকে তো সম্মেহিত করা যায় না।[৩৬৯]

এদেশের জনগণকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে মমতাজ উদ্‌দীন রচনা করেন রূপকাশ্রয়ী দুটো নাটক *এবারের সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সংগ্রাম*।[৩৭০]

এবারের সংগ্রাম (১৯৭১)

মমতাজ উদ্‌দীন মুক্তিযুদ্ধের শুরুর কয়েকদিন পূর্বে রচনা করেন–*এবারের সংগ্রাম* নাটকটি। [বি. দ্র. 'মননচর্চা ও মানসজগৎ' অধ্যায়ে নাটকটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।] বাদশা, উজির, সিপাহি ইত্যাদি চরিত্রের রূপকের আড়ালে নাট্যকার তুলে ধরেছেন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকের অত্যাচারের কাহিনি।[৩৭১] দীর্ঘ তেইশ বছর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষকে শাসনের নামে শোষণ করেছে। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবহেলিত বাংলার মানুষের মনে পুঞ্জিভূত ক্ষোভের প্রকাশ বায়ন্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান।[৩৭২] **১৯৬৯** সালে ২৫ মার্চ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা পাওয়ার পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন নাট্যকার মমতাজ উদ্‌দীন *এবারের সংগ্রাম* নাটকের প্রথম দৃশ্যেই বাদশার সংলাপে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তা তুলে ধরেছেন এভাবে–

: আসসালামু আলায়কুম। প্রিয় দেশবাসী, ভাইয়ো আউর বাহিনো। আমি কে? আমি হলাম এই দেশের বাদশা। এই যে মস্তবড় দেশের লম্বা চওড়া দেখছ, আমি এর তামাম জানমালের মালিক। আমি কী করতে পারি? আমি সবকিছু করতে পারি। যদি বলি চুপ করে আমার হুকুমে বসে থাক, তোমরা বসে থাকবে, আর যদি বলি খাড়া হো যাও, তোমরা খাড়া হয়ে যাবে। যদি খাড়া না হও তাহলে? তাহলে আমার সিপাহসালারকে বলব ডাণ্ডা লাগাও। ব্যস্ ডাণ্ডা দিয়ে তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবে। তখন কী হবে? লহুর দরিয়া বহে যাবে। সেটা কি ভাল হবে? কভি নাহি।[৩৭৩]

বাদশার এই সংলাপের মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়া খানের অমানবিক স্বৈরাচারী শাসন জুলুমের চিত্র ফুটে উঠেছে। এরপর একে একে ইয়াহিয়া, ভুট্টোর ষড়যন্ত্র, ছয়দফা আন্দোলনের গণপরিষদের বৈঠক বাতিল এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক সৈনিক গভর্নর শপথ পড়াতে অস্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলোও নাট্যকার অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে এই নাটকে তুলে ধরেছেন।[৩৭৪] অধিকার সচেতন এই বাঙালিদের সম্পর্কে উজির বাদশাহকে সাবধান করছে :

: পূর্বেদেশের মানুষ ছয়টা মনতরের একটা মনতরও ছাড়বে না। সবকটা মন্তরে একটা একটা করে বুঝে নিলে ওদের দিলে শান্তি পয়দা হবে।[৩৭৫]

এই ছয়টা মন্তর যে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা দাবি তা বোঝার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ১২ নভেম্বর রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলে এক ভয়াবহ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত আনে। এ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগে ১০ লক্ষাধিক লোকের সলিল সমাধি হয় এবং বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতিসাধনসহ প্রায় ৩০ লক্ষ লোক ছিন্নমূল হয়ে পড়ে। এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগণিত মানুষেল মৃত্যুর জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা ছিল অনেকাংশে দায়ী। আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পৃথিবীল বিভিন্ন স্থান থেকে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে বহু মানব দরদি ছুটে আসেন।[৩৭৬] কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে স্বৈরশাসক যে তার জন্যে কোনোরকম সাহায্য সহযোগিতাই করেনি সেই বাস্তব বিষয়টিও নাট্যকার উজীরের সংলাপে তুলে ধরেছেন–

: পূর্বদেশে বড় তুফানে যখন দশ লাখ লোক সমুদ্দরের পানিতে মরে গেল, আমরা কেই দেখতে যাইনি, ওদের পেটে খাবার নাই, আমরা খেতে দেইনি, ওদের ছাত্রদের গুলি করে মেরেছি। ওদেশে কলকারখানা করি নি, বন্যাতে সয়লাব হয়ে গেল, আমরা এখানে শুকনাতে বসে ফিক ফিক করে হেসেছি হুজুরে হামরাহি।[৩৭৭]

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা যে সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময় থেকে একাত্তর পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সবক্ষেত্রেই পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে সেই বিষয়টিও সমকাল সচেতন নাট্যকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। দৃষ্টি এড়াইনি পূর্ববাংলার স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনকারী মানুষের ছয় দফা দাবির প্রসঙ্গটি। নির্মম, নিষ্ঠুর টিক্কা খানের হাতে ইয়াহিয়ার পূর্বপাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টিও উঠে এসেছে বাদশার সংলাপে–

: জিত রাহো দিল্লের সিপাহসালার। না, না। তুমি তো এখন শুধুমাত্র সিপাহসালার না। তুমি আমার কমবখত পূর্বরাজ্যের মালিক। হাঁ তোমাকে আমি সেই রাজ্যের নয়া মালিক বানিয়ে দিলাম।[৩৭৮]

এই টিক্কা খান যে কীভাবে তার বর্বরোচিত শক্তিকে পূর্ববাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রিমক মানুষের ওপর প্রয়োগ করেছে সিপাহসালারের সংলাপে তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে–

: আইন, আইন, আইন। কিসের আইন, কার আইন? এখানে কোন আইন নাই। আমি আইন, আমার শক্তি আইন, আমি তোমাদের মালিক।[৩৭৯]

নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক যাদের হাতে অস্ত্র ছিল না কিন্তু ছিল গভীর দেশপ্রেম, তারা বসে থাকে নি। আইয়ুব, ইয়াহিয়া, টিক্কা খানের বিরুদ্ধে তারা বরাবরই ছিল প্রতিবাদী। নাট্যকার এই নাটকে 'মানুষ' চরিত্রটিকে পূর্ববাংলার নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক জনতার আকাঙ্ক্ষার কথা–

: আমি মরব, আমার ভাই মরবে, বোন জীবন দিবে। আর আমাদের দামাল ছেলেরা লড়াই করবে। আমাদের এক এক ফোঁটা রক্তে একশোটা বিদ্রোহী ছেলে জন্ম নিবে ওরা লড়বে। আজীব লড়াই চলবে।[৩৮০]

এবং নাটকের একেবারে শেষে এই মানুষ চরিত্রটি যখন বলে–

: 'এবারের সংগ্রাম', তখন তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ জনতাও বলে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ : স্বাধীনতার সংগ্রাম।[৩৮১]

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক বিপ্লবী জনগণকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে এবারের সংগ্রাম যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তা অনস্বীকার্য। নাটকটি সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে–

> বিষয়টি এতো সমসাময়িক এবং নাট্যকার এতো চমৎকারভাবে সেটি উপস্থাপিত করেছিলেন যে, জনতা যেন প্রতিটি সংলাপের সঙ্গে যথার্থই একাত্ম হয়ে প্রতি মুহূর্তে সোচ্চার প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেছিলো।[৩৮২]

'এবারের সংগ্রাম' নাটকের শেষে 'মানুষ' চরিত্রের সংলাপের মধ্যে নাট্যকার বাঙালিদেও দৃঢ় মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

> মানুষ ॥ পালিয়ে যাবে কোথায়? এদেশের কোন ঘওে তার আশ্রয় জুটবেনা। মাইলকে মাইল মানুষের মিছিল নিয়ে এদেশের সবখানে ওর তল্লাশী চালাবে। খুঁজে বের করবই জুলুমবাজকে। আমার ছেলের রক্তের দাম আমি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেব। ভাইসব, সূর্যেও আগুনে শরীরকে তাতিয়ে নাও। এস, ঘর ছেড়ে বাইরে এস শ্যামল ঘাসের দেশে।
>
> ঐক্যবদ্ধকণ্ঠ ॥ এবারের সংগ্রাম
>
> স্বাধীনতার সংগ্রাম।[৩৮৩]

রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য (১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী'র পরিবেশিত গুরুত্বপূর্ণ নাটক 'রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য'। মার্চের অসহযোগ আন্দোলন পর্বে ২৩ মার্চ পল্টনে, কমলাপুর, সদরঘাট প্রভৃতি স্থানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পরিবেশিত হয়।[৩৮৪]

স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৭১)

১৯৭১ সালের ২১ মার্চ মমতাজ উদ্‌দীন মুক্তিযুদ্ধ সূচনার কয়েকদিন পূর্বে রচনা করেন নাটক *স্বাধীনতার সংগ্রাম*। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অনুরোধে এ নাটকটি রচিত হয়েছিল। ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম কলেজ মাঠে মঞ্চস্থ হয়েছিল নাটকটি।[৩৮৫] [বি.দ্র. 'মননচর্চা ও মানসজগৎ' অধ্যায়ে নাটকটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।] লাখ লাখ জনতার সামনে মঞ্চস্থ এই নাটক বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী জনতাকে সেদিন সাহসী ও অনুপ্রাণিত করেছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। দর্শকের সেদিন মনে হয়েছিল, জীবনে সংকটে, দুঃখে, চার দেওয়ালের ঘেরা ঘরের মঞ্চ নাটকে চেয়ে খোলা মাঠে অবারিত আকাশের নিচে অভিনয় সবুজ গাছের গালিচায় বসা দর্শকদের টানে অনেক বেশি। সেই দিন নাটকের শেষ হওয়ার আগে এক পর্যায়ে মঞ্চ থেকে ঘোষণা হলো, পাকিস্তানি সৈন্যরা বন্দরে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের চেষ্টা করছে, বাঙালিদের হত্যা করা জন্য। সেখানে বাঙালিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্যারেড ময়দানে সমবেত নাটকের ১০ হাজারেরও বেশি দর্শনাথি-জনতা প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে বন্দরের দিকে ছুটে যায় বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো।[৩৮৬] স্বদেশপ্রেমিক নাট্যকার মমতাজ উদ্‌দীন *এবারের সংগ্রাম* নাটকের মতো এ নাটকেও রূপকের মাধ্যমে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি নাট্যকার শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সপক্ষের বাঙালির প্রতিবাদ এবং রুখে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে অঙ্কন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক যে কী পরিমাণ নিষ্ঠুর, বর্বর ছিল, কী পরিমাণ অত্যাচার করেছিল নিরীহ পূর্ববাংলার জনগণের ওপর ১ম দৃশ্যেই নাট্যকার সন্ধ্যায় হঠাৎ করে সান্ধ্য আইন ঘোষণা করে বর্গী ও হুকমত এর সংলাপের মধ্য দিয়ে সেই চিত্র তুলে ধরেছেন–

> হুকমত : জাহাজে জাহাজে সিপাহী লিয়ে আসেন। এ মুল্লুকের ঘরে ঘরে দেশের দুশমন কা বাচ্ছা তড়পচ্ছে।
>
> বর্গী : আর কত দিন তড়পাবে! এসব ফুসরফাসুর আলাপ আলোচনার মধ্যে আমার বিশ্বাস নাই। ঘরে ঘরে ঢুকে পড়। টেনে আন, ন্যাংটা করে চাবুক চালাও, সব বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের পিয়ারা কায়েদে আজম স্যার, মিল্লাত সাহাব নাই। দেশটা মগের মুল্লুক হয়ে গেল নাকি![৩৮৭]

শুধু দেশের সম্পদ, দেশের জনগণের ওপরই নয়, সাতচল্লিশের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা যে এদেশের ভাষা সংস্কৃতির ওপরও একের পর এক আঘাত হেনেছিল সেই চিত্রও লক্ষ করা যায় বর্গীর সংলাপে–

> : ছিরে ফেলে পাপ ক্ষয় কর। লেখার নকশা দেখ? অ, আ, ক, খ। উর্দু জবান শেখর না। শিখ না। যখন দোজখের আগুনে জ্বলবে তখন বুঝবি কায়দে আজম সাহেবের ব্রেন কত ঝকমকে ছিল। দুখু মিঞা, বেকুবের মতোন দাঁড়িয়ে থেক না, পোস্টার ছিড়ে নিয়ে এস।[৩৮৮]

যত অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা করুক, যতই ভয়-ভীতি, অস্ত্র দেখাক এদেশের মানুষ যে জীবন দিয়েও দেশকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। মৃত্যুর সামনে দাড়িয়ে জহুরুলের দৃপ্ত কণ্ঠে সেই ধ্বনিই যেন উচ্চারিত হয়–

> : আমার আঙুলের মধ্যে চারটা করে মোটা মোটা সুঁই গলগল করে ভরে দিয়েছে। দশ হাজার পাওয়ার লাইটের নিচে চোখ খুলে তিন দিন তিন রাত বসেছিলাম দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছে। আমার বুকে আর পিঠে তোমার সিপাহীরা শঙ্খ মাছের চাবুক মেরেছে, তবু আমি বেঁচে আছি, আমি বেঁচে থাকব, বাংলার স্বাধীনতার জন্য বেঁচে থাকব।[৩৮৯]

জহুরুলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের সংলাপ–

> : আমি আবার বেঁচে উঠব। যতবার মারবে ততবার বাঁচব।[৩৯০]

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত মুনীর চৌধুরীর কবর নাটকে কবর থেকে উঠে আসা ছায়ামূর্তিরাও বলেছিল মাটির যত গভীরে তাদের পুঁতে রাখা হোক দেশকে শত্রুমুক্ত করতে প্রয়োজনে তারা কবর থেকে উঠে আসবে। একাত্তরে দেশকে পাকিস্তানি শত্রুদের কবর থেকে মুক্ত করার জন্যে কবর থেকে উঠে আসা একজন যেন জহুরুল। ঝকড়ু জীবনধারণের জন্যে পাকিস্তানি হানাদারদের কাজ করলেও এক সময় সেও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে দুখু মিঞা। ঝাকড়ু 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে অত্যাচারিত বর্গীকে ঝাঁপটে ধরে। লক্ষ টাকা দিয়েও হানাদার বাহিনী ঝকড়ুর দেশাত্মবোধকে কিনতে পারে না। ঝকড়ু স্পষ্ট জানিয়ে দেয়–

> : টাকা দিয়ে আমার ঈমান লিতে পারবি না বর্গী।[৩৯১]

দুখুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় স্বাধীনতাকামী লক্ষ বাঙালির অন্তরের কথা–

> : তেইশ বছর সহ্য করেছি, ভালবেসেছি, দয়া করেছি। কিন্তু তোমরা ভাল হবার নও। এখন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তোমাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেব। তোমাদের পালাবার পথ গুড়ো করে দেব আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষ। লজ্জায় অপমানে আর পরাজয়ের যন্ত্রণায় তোমাদের সৈন্যবাহিনী পাগল হয়ে যাবে। এবার যুদ্ধ।[৩৯২]

দুখুর কথা শেষ হতেই গ্রেনেড ও গুলির শব্দ শোনা যায়। এর মাঝেই দুখু দৃপ্তকণ্ঠে সমগ্র বাঙালিকে আহ্বান জানায় যুদ্ধের জন্যে। ঘোষণা করে সেই অবিস্মরনীয় বাণী, যে বাণী **১৯৭১** সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উচ্চারণ করেছিলেন–

> : এবারের সংগ্রাম; স্বাধীনতার সংগ্রাম।[৩৯৩]

এই সংলাপ উচ্চারিত হওয়ার পর সেদিন সত্যি সত্যি কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন যে, সেদিন এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম এই সংলাপটি উচ্চারিত হওয়ার পর–

> জনতা বিশাল ক্রোধে ও বিশাল উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। বাস্তবে ঠিক সেই মুহূর্তের খবর এলো, 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র আনার পথে প্রতিরোধ সরাবার জন্যে ক্যান্টনমেন্ট থেকে খান সেনারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।
>
> শোনা মাত্র হাজার হাজার মানুষ আশপাশ থেকে লাঠি সংগ্রহ করে ছুটলো নাসিরাবাদের দিকে। সেখানে গড়ে তুললো প্রতিরোধ। সৈন্যরা আসতে পারে নি।[৩৯৪]

নাট্যকার নিজে তাঁর এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন–

> 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' লিখেছি একাত্তরের একুশে মার্চ। চট্টগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে এ নাটকের রচনা। সেদিন ছিল ২৪ মার্চ, চট্টগ্রাম কলেজ মাঠে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। বন্দরে জ্বলছে আগুন, পথে পথে ব্যারিকেড। দশ সহস্র দর্শক এ নাটক দেখে ভীষণ রকম আলোড়িত হয়ে শত্রু চরিত্রগুলোকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছে। অভিনয়ের শেষে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে মিছিল করে দর্শক ছুটে গেছে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে।[৩৯৫]

এবারের সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সংগ্রাম নাটক দুটো সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য–

স্বাধীনতা আন্দোলনের অব্যাহতি আগে, যথাক্রমে ১৪ ও ২১ মার্চ ১৯৭১, মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ রচিত নাটক দুটির শিল্পমূল্য যাই হোন না কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাবাহী নাটকের পথিকৃৎ হিসেবে ঐতিহাসিক মূল্যের দাবি রাখে।[৩৯৬]

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই নাটক দুটি চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দান ও লালদীঘির ময়দানে লক্ষাধিক সমাবেশে অভিনীত হয়েছিল। নাটক যে গণ-আন্দোলনকে কীভাবে সরাসরি উদ্দীপ্ত করতে পারে তার উদাহরণ এ দুটি নাটক। নাটক দুটি একাত্তরে চট্টগ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছিল, এত ঘৃণা মানুষ কখনো দেখেনি, কখনো অনুভব করেনি। বাঙালি বুঝতে পেরেছিল তাঁরা বাঙালি, তাঁদের ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি একান্তভাবেই শুধু তাঁদেরই।

মমতাজ উদ্‌দীন তাঁর নাটক মঞ্চস্থ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন,

> 'এবারের সংগ্রাম' এবং 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' নাটক দুটি একাত্তরে চট্টগ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছিল, এত ঘৃণা মানুষ কখনো দেখেনি, অনুভব করেনি। বাঙালি বুঝতে পেরেছিল তাঁরা বাঙালি, তাঁদের ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি একান্তভাবেই শুধু তাঁদেরই।[৩৯৭]

নাট্যকর্মীর স্বাধিকার আন্দোলনের সময়ে নাটককে জনগণের কাছে নিয়ে যায়। চার দেয়ালে ঘেরা ঘরে সজ্জিত মঞ্চে অভিনীত হতো যে নাটক, সে নাটক নেমে এলো রাজপথে। অবরুদ্ধ বায়ু যেন মুক্ত হয়ে মুক্তির খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো জনতার মাঝখানে। এমনি কিছু পথ নাটকের রূপকার ছিলেন খ্যাতনামা নাট্যকার মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান ও মমতাজ উদ্‌দীন। খোলা মঞ্চে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছিল সেগুলো অধীর আগ্রহে দেখেছেন অসংখ্য মানুষ, শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও দ্রোহ বুকে নিয়ে নিষ্পলক নেত্রে খোলা মাঠে বসে তারা দেখেছেন নাটকের পাত্র-পাত্রীদের দীপ্ত অভিনয়, উচ্চারিত সংলাপের মধ্যে শুনেছেন জীবনের অভয়বাণী। মুক্ত আকাশের নিচে, ভেজা ঘাসের আসনে বসে দর্শক এসেছিলেন জীবনের সন্নিকটে, সত্যের কাছাকাছি। উপলব্ধি ও বোধ তাদের এসেছিল জাগরণের অভিলাষ।[৩৯৮] ষাটের দশকে এ রকম অসংখ্য নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

গণসংগীত

গণসংগীত জাতীয়তাবাদ, স্বদেশিকতা ও মানুষের মুক্তির চেতনা সমৃদ্ধ। ষাটের দশক এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের গণসংগীত চর্চার স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। পঞ্চাশের দশকে বেশিরভাগ সময়ই বিভিন্ন আসরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গান গাওয়া হতো। ষাটের দশকে এই অভাবটা বহুলাংশে পূরণ হয়েছে। ৫৮-র মার্শাল ল'র পর ৪-৫ বছর পর্যন্ত এদেশে গণসংগীত গাইবার মতো কোনো পরিবেশ ছিল না। এই সময়ে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানকে গাইতে দেখা যায় নি একমাত্র একুশের অনুষ্ঠান ছাড়া। ৬২-এর পর থেকে ৬৯, ৭০ ও ৭১ সালে মানুষ নতুন গানের প্রচণ্ড শব্দে জেগে উঠেছেন। এই দশকে বাংলাদেশের পারিপাশ্বিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল আন্দোলনমুখর; আর রাজনৈতিক আন্দোলনের তৎপরতা যখনই প্রচণ্ড হয়েছে তখনই গণসংগীত রচিত ও গাওয়া হয়েছে।[৩৯৯]

১৯৪৭ এ বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিল্পী ও লেখকদের বড়ো অংশ পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। ফলে পূর্ব বাংলায় সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় গণসংগীতে একটা বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতার পূরণে কতগুলো সংগঠন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এগুলো হলো–প্রগতিশীল ছাত্র ফেডারেশন, প্রগতি সাহিত্য ও শিল্পী সংঘ, চট্টগ্রামের ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ, মুকুল ফৌজ, সংস্কৃতি সংসদ প্রভৃতি। পূর্বে রচিত গণসংগীতগুলো এ সময় নতুনভাবে পরিবেশিত হয়। একইসাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ও মুকুন্দ দাসের গানও এ সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের গান সমসাময়িক আন্দোলনের প্রয়োজন পূরণে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৪০০] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন গণআন্দোলনে গণসংগীত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষভাবে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে, চুয়ান্নোর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গণসংগীত ছিল বাংলাদেশের মানুষের নিকট অধিকার আদায়ের এক অসাধারণ হাতিয়ার।[৪০১]

১৯৪৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে দেশে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির যাত্রা শুরুর পথেই সহায়ক শক্তি হিসেবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তার সূত্রপাত। ১৯৫০ সালে নিজামুল হক, মোমিনুল হক প্রমুখ নেতৃত্বে গঠিত হলো 'ধুমকেতু শিল্পীসংঘ'। এই প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ মানুষের জীবনের হাসি-কান্না, ব্যাথা-বেদনা এবং নব্য স্বৈরাচারের চরিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেয়।[৪০২] এরপর বাংলা গানের ইতিহাসে রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, নিবারণ পণ্ডিত, সিকান্দার আবু জাফর, শেখ লুতফর রহমান, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, গাজীউল হক, আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, সত্যেন সেন, আবুবকর সিদ্দিক, ফজলে লোহানী, কামাল লোহানী, শাহ আবদুল করিম, বিনয় রায়, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, সাধন সরকার, ফকির আলমগীর, হরলাল রায়, মিনা মিজান, কামরুদ্দি আফসার প্রমুখের রচিত ও পরিবেশিত গণসংগীত অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন।[৪০৩] ১৯৬৮ সালে সত্যেন সেন কর্তৃক উদীচী নামের একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে গণসংগীত চর্চার একটি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।[৪০৪]

সময় আবর্তনের গণসংগীত এক জায়গায় একই রূপে আর বসে থাকে নি। চাহিদা ও যুগের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে গণসংগীতেও এসেছে পরিবর্তন। এ অঞ্চলে মূলত শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের প্রয়োজনে ঋদ্ধ হয় গণসংগীত।[৪০৫] শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন গণসংগীত রচিত হতে থাকলো। ৬০-এর দশকে গণসংগীতে নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি দিলীপ সেনগুপ্তের নেতৃত্বে গাওয়া হলো–'আমরা এই দুনিয়ার/জীবনের গান শোনাই'। এই সময় শ্রমিকদের স্লোগানকে গানে পরিণত করা হলো–'হারাবার কিছু ভয় নেই/শুধু শৃংখল হবে হারা'।

১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে কটূক্তি করেন। ২৪ জন *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় নিম্নোক্ত বক্তব্য ছাপা হয়–'রাওয়াল পিন্ডি, ২৩ জুন (এপিপি) : কেন্দ্রীয় তথ্য বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিপন্থি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে।'[৪০৬]

রবীন্দ্রসংগীতের বিরুদ্ধে এই বিবৃতিতে বাঙালিরা ফুসে উঠলো। ১৯৬৬-৬৭ সালের দিকে সত্যেন সেনের লেখা ও শেখ লুৎফরের সুরে গানটি তৎকালীন ঘটনাকে সাধারণ জনগণের চেতনায় গেঁথে দিতে সক্ষম হয় ও সারাদেশে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে–

এ আগুন নিভাইবো কে রে
এ আগুন নেভে নেভে নেভে না
এ আগুন জ্বলে দ্বিগুণ জ্বলবে দ্বিগুণ
চাপা দিলেও নিভবে না।[৪০৭]

আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করার পর থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষের চাকুরি নেই, বাঙালির কোনো অধিকার নেই। দাবি পেশ করার মতো জায়গাও নেই। একসময় মানুষ রাস্তায় নেমে এলো এবং আইয়ুব অপশাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তানে শুরু হলো দুর্বার আন্দোলন। ১৯৬২ থেকে ৬৭ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সাথে বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো সমানভাবে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। এ সময়ে সারাদেশে আবারও জেগে ওঠে অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ সময়ে গণসংগীতের মাধ্যমে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন–আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুতফর রহমান, নিজামুল হক, সুখেন্দু চক্রবর্তী, সাধন সরকার, আবুবকর সিদ্দিক, কামাল লোহানী প্রমুখ।[৪০৮] কবি আবুবকর সিদ্দিক ১৯৬৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রচনা করেন–'ব্যারিকেট বেয়নেট বেড়াজাল, পাকে পাকে তড়পায় সমকাল॥'।[৪০৯]

১৯৬৬ সালে সিকান্দার আবু জাফরের লেখা ও লুতফর রহমানের সুর করা গান, 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।[৪১০] গানটি প্রথম পরিবেশন করা হয় ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে তৈরি উন্মুক্ত মঞ্চে সংস্কৃতি সংসদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে। শেখ লুতফর রহমানের দেওয়া এই সুর অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।[৪১১]

গাজী মাজহারুল আনোয়ারের 'রক্ত শুধু রক্ত' গানটি ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে লেখা। এই গানে গীতিকার ইতিহাস স্মরণ করে দিয়ে লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানান–

রক্ত শুধু রক্ত
রক্ত ছড়িয়ে আছে
রাজপথে ঘাটে আজি রে।

রক্ত জমাট সিক্ত পিছল
রাজপথ-ঘাট ভাইরে
মায়ের ভাষায় হানছে আঘাত
কেউ কি তোরা নাইরে ॥...

রিক্ত বুকের হাড় পাঁজরে
রাখবে এ ঝড় আড়াল করে
ডাক এল আজ, ওরে তোরা সাজ
সময় যে আর নাইরে..॥[৪১২]

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের আগে ও পরে কবি আবুবকর সিদ্দিক রচিত বেশ কিছু গান তৎকালীন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে উদ্দীপনা দান করে। ১৯৬৮ সালে তাঁর লেখা একটি গান হলো–'বিপ্লবের রক্তরাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে, সর্বহারা জনতার জিন্দাবাদ বাতাসে।'[৪১৩]

১৯৬৮ সালে শিল্পী আবদুল লতিফ বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস-ঐতিহ্য একটি গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

আইলো দেশে জঙ্গী শাসন আয়ূব শাহী রাজ,
তার বিরুদ্ধে প্রথম তুইলাছে আওয়াজ
ওরা মানলো না চুয়াল্লিশ ধারা,
কারফিউ এর কঠিন পাহারা,
শত-সঙ্গীন বুলেটে ওদের রুখতে পারে নাই॥[৪১৪]

আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর যখন কোনো রাজনৈতিক দল এবং দলের নেতার প্রতিবাদ করতে পাচ্ছিল না, তখন প্রথম ছাত্ররা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্রদের জীবন উৎসর্গ করার কথাও তিনি স্মরণ করে দেন। ছাত্রদেরকে অতীতে দাবিয়ে রাখা যায় নি। তাই শিল্পী গীতিকার আশা করেছেন ছাত্ররা আবার রুখে দাঁড়াবেন এবং নিজেদের অধিকার আদায় করবেন। তাঁর লেখা গানটি তৎকালীন বিভিন্ন আন্দোলনের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের আলোড়িত করে।

১৯৬৯ সালে সাধন ঘোষের কথা ও সুর করা গান বাংলার মানুষকে আলোড়িত করে।

..শান্তির নামে ধোকা বাজি আর
চলবেনা মাকিনী দালালী
পশ্চিমা পুঁজিবাদ হুশিয়ার
বাংলার কোটি প্রাণ,
জেগেছে, জেগেছে, জেগেছে
গণযুদ্ধের ডাক এসেছে।
....
বিপ্লবী জনতার এই শ্রোত
ভাসিয়ে নেবে যত জঞ্জাল[৪১৫]

৬৯-এর ২০ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান ঢাকা মেডিকেল কলেজের পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ১৮ ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। এই আন্দোলনে মুখে রচিত হয়, 'আসাদ জোহা শতশহীদের রক্ত নিশান দেখেছি/ তাইতো মোরা সবকিছু ভুলে এক মিছিলে মিলেছি'।[৪১৬] আসাদ জোহা

এবং জহিরুল বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী পথনির্দেশক হিসেবে বাঙালির চেতনাকে আরও বেশি উজ্জীবিত করে তোলে।

সমগ্র পাকিস্তানে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল মূলত আইয়ুবি অপশাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে রক্ষা করার আন্দোলন। কিন্তু পূর্ববাংলায় এই আন্দোলনের পেছনে শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল স্বায়ত্তশাসন লাভ। আইয়ুব খানের পতন পরে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বাঙালির সকল প্রত্যাশা ভঙ্গ হয়। গণসংগীতে ঝলসে উঠলো নতুন স্বপ্নের কথা, নতুন দেশের কথা। গানের কথায় সংযোজিত হতে থাকে যুদ্ধের উন্মাদনা। এ সময়ের একটি গান মুস্তাফিজুর রহমানের কথায় আজিজ বাচ্চুর সুরে–

জন পথ প্রান্তরে, সাগরের বন্দরে, শুনি হুংকার
চাই স্বাধিকার স্বাধিকার স্বাধিকার॥[৪১৭]

১৯৬৯ সালে সাধন ঘোষের কথা ও সুরে একটি গান ছাড়া যেন গণসংগীত আসর সম্পন্ন হতো না।[৪১৮] গানটি হলো–

বাংলার কমরেড বন্ধু
এইবার তুলে নাও হাতিয়ার
ভূমিহীন কৃষক আর মজদুর
গণযুদ্ধের ডাক এসেছে॥[৪১৯]

এই গানটি সেসময় জনগণকে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলেছিল।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় পূর্ববাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক অবস্থা সবদিক থেকে খারাপ ছিল। একদিকে বন্যা-জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় গ্রাসে দক্ষিণ বাংলা। অন্যদিকে, সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের কব্জা থেকে দেশকে উদ্ধার।

এই ঝঞ্ঝা মোরা রুখবো
এই বন্যা মোরা রুখবো
মায়েদের বোনেদের শিশুদের অশ্রু মুছবোই।[৪২০]

ঘূর্ণিঝড়ে বাংলার মানুষের করুণ অবস্থা ছিল। হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। খাদ্য ও ওষুধের অভাবে অনাহারে ও অসুখে হাজার হাজার মানুষ ছিল দিশাহারা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায় নি। এমনি সময় আলতাফ মাহমুদের সুরে–

কাঁদো বাংলার মানুষ আজিকে কাঁদো
কাঁদো ভাইবোন।[৪২১]

৭০-নির্বাচনের সময় গণসংগীত রচনা করে বাঙালি গীতিকারগণ। তাদের লেখা গান জনগণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যার প্রভাব আমরা সত্তরের নির্বাচনে দেখতে পাই। এমনি একটি গান লিখলেন আবদুল লতিফ। যে গানটি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে বাংলার পক্ষে, ছয়দফার পক্ষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করে। গানটি হলো,

ও রহিম ভাই, ও করিম ভাই ও যদু ভাই ও মধু ভাই
দুঃখের দইরা হইবা যদি পার,
দেখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর হাইল ধইরা রইছে নৌকার॥

এই গানের মধ্যে তিনি আবার শাসকগোষ্ঠীর শোষণের কথা তুলে ধরেছেন–

আমরা ক্ষেতে ফসল বুনি বুলবুলিতে খায়
কতকাল আর এই অবিচার কওতো সওয়া যায়?
আমরা থাকি উপবাসী, ওনারা খাইয়া খোদার খাসি,
আইছে সুযোগ ভুঁড়িওয়ালার ভুঁড়ি ফাসাইবার॥[৪২২]

গণসংগীতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর যে শোষণ তা তুলে ধরা হয়। বাংলার মানুষ দিনরাত পরিশ্রম করে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো ঈঙ্গিত নেই। বরং আরও বেশি দুর্দিনের মধ্যে তাদের পরতে হয়। এই পরিস্থিতি গণসংগীতের গীতিকারগণ জনগণকে ভুলতে দেয় নি। তাদের কী অবস্থায় রেখেছে শাসকগোষ্ঠী তা গণসংগীতের মাধ্যমে বার বার চেষ্টা করে।

শোষিত মানুষের মনে যে ক্ষোভ জমে তা একসময় ক্রোধে পরিণত হলো। আর সেই ক্রোধ একদিন বিস্ফোরণে পরিণত হলো। কবি সুকান্তের কথায় শেখ লুতফর রহমান সুর দিলেন–

হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে উঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে-

গণশিল্পী শেখ লুতফর রহমান আচানক যে ডাক দিলেন সত্যি সে ডাকে সারা বাংলার তরুণ তাজা প্রদীপ্ত প্রাণগুলো কেঁপে উঠলো প্রাণের বৈভবে। শত্রুনিধনের লড়াইয়ে প্রাণপাত করার অঙ্গীকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো।[৪২৩] ষাটের দশকের এই গণআন্দোলন ও তার আবহে সৃষ্ট গণসংগীতে সাড়া দিয়ে বাংলার লক্ষ সংগ্রামী জনতা দেশের চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে।

৭০ সালে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার সকল প্রস্তুতি শেষ করেছে। যে কোনো সময়েই শিকল ছেড়ার উন্মাদনায় তখন বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন মুখরিত, আলোড়িত ও অগ্নিগর্ভ। সে সময় 'শহীদ দিবসের' জন্যে লেখা কবি আবুবকর সিদ্দিকের একুশের গানেও ঝরে পড়েছে সেই মুক্তির কথা, অগ্নিমন্ত্রণায় বিদ্রোহের আবহ–

একুশের ভোরে জেগে
উঠে দেখি রক্ত
রক্তিম সূর্যের ফিন্‌কি॥

খুনরাঙা শহীদের
রাখীবাঁধা সূত্রে
এলো সেই পবিত্র দিন কি॥[৪২৪]

গণসংগীত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে। রাজনীতিবিদদের যখন সামরিক শাসনের যাতাকলে পিষ্ট। প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পাচ্ছে তখন মূলত সাংস্কৃতিক কর্মীগণ তাদের কার্যক্রমের দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও সরকারের তোপের মুখে পরে কিন্তু একুশের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কীভাবে আবার তা জনগণের কাছে ফিরে আসে সে সম্পর্কে কামাল লোহানী বলেন,

> দেশে সামরিক শাসন জারি হবার পর থেকে গণসঙ্গীতের চর্চা অনেকাংশে কমে যায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো যা কিছু করছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। তবে ৫৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিতে কার্জন হলে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় তাতে শেখ লুতফর রহমান, আব্দুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, ফাহমিদা খাতুন অংশগ্রহণ করেন। বদরুল হাসান ও আজমিরী বেগম ধারাভাষ্য পাঠ করেন। এরপর থেকে একুশের অনুষ্ঠান নিয়ে যাওয়া হয় শহীদ মিনার চত্বরে। ১৯৬৬ মাল পর্যন্ত একুশের অনুষ্ঠান শহীদ মিনারেই হলো কিন্তু ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল পল্টন ময়দানে এবং ৬৮ সালেও গণসঙ্গীত আসর পল্টনে হলেও ১৯৬৯ সালে আবার শহীদ মিনারে এসে পৌঁছোয় এবং এখনও সেখানেই চলছে।[৪২৫]

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নির্যাতিত, পরাধীন দেশের মানুষেদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিবাদী গান রচিত হতে থাকে। সেই গানগুলো শুধু নিজ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। ঐ সময়ে গানের দ্বারা পল রোবসন, ভিক্টর জারা, বের্টল্ড বেখ্‌ট, হ্যারি বেলাফন্টে, অস্কার হ্যামারস্টেইন, হ্যান্স আইসলার, উদি গাথ্রি, পীট সিগার, বব ডিলান সহ অন্যান্য শিল্পী বিশ্বব্যাপী মেহনতি মানুষদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।[৪২৬]

আফ্রিকার বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নেলসন ম্যান্ডেলার, ভিয়েতনামে মার্কিনীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, মার্টিন লুথার কিং-এর ওপর রচিত গান নবজোয়ারের সৃষ্টি করে।[৪২৭] পীট সিগার সম্পাদিত, 'We shall over come, some day/Oh Deep my heart, I do believe that, we shall overcome some-day.'[৪২৮] ১৯৬৫ সালে গানটি[৪২৯] বঙ্গানুবাদ করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। গানটির সৃষ্টি হয়েছে বর্ণ-বিদ্বেষনীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই গানটি সারাবিশ্বের সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

উর্পযুক্ত আলোচনা পর্যালোচনায় ষাটের দশকের বাংলার রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ও তার বিরুদ্ধে গণসংগীত কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। গণসংগীত বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীকার আন্দোলন ও মুক্তির সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নৃত্যকলা

নৃত্য শিল্প বাঙালির নান্দনিক সংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম উপাদান। নৃত্যের অনেকগুলো বৈচিত্র্যময় শাখার মধ্যে কেবল নৃত্যনাট্যর মাধ্যমেই প্রতিবাদ প্রকাশ করা যায়। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে নৃত্যশিল্পকে জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে শিল্পকলার এই ধারাটিকে উজ্জীবিত করেন শিল্পী বুলবুল চৌধুরী।[৪৩০] ১৯৪৮ সালে গওহর জামিল ‘শিল্পকলা ভবন’ নামে একটি নৃত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ সময় ‘শকুন্তলা’, ‘মেঘদূত’ ও ‘সোনার নূপুর’ নামে কয়েকটি নৃত্যনাট্যও মঞ্চস্থ হয়।[৪৩১] ১৯৫০ সালের দিকে নিজামুল হক-এর নেতৃত্বে ঢাকায় ‘শিল্পী সংসদ’ নামে একটি গণসংগীতের দল আত্মপ্রকাশ করে।[৪৩২] তিনি কিছুদিনের পর ধূমকেতু শিল্পীগোষ্ঠী, পাকিস্তান শিল্পী সংসদ এবং আরও পরে পিপিটি.এ (আই.পি.টি-এর অনুসরণে) গঠন করেন। আলতাফ মাহমুদ ও মোমিনুল হক গণসংগীত গাইতেন এবং নিজামুল হক গণসংগীতের পাশাপাশি ছায়ানৃত্য পরিবেশন করতেন।[৪৩৩] এসব নৃত্যনাট্যে মেয়েরাই ছেলেদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কারণ তখনকার রক্ষণশীল সমাজে ছেলে-মেয়েদের একমঞ্চে নৃত্যে অংশগ্রহণ করার মতো পরিবেশ ছিল না। মূলত এই রক্ষণশীলতার বিপক্ষে ছিল নৃত্য একটি বড়ো অস্ত্র যা সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করে। লায়লা হাসান এ সম্পর্কে লিখেছেন, ‘সময়ের বিবর্তনে মানসিকতা, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরাও নৃত্যের প্রতি উৎসাহিত হয়ে নৃত্যচর্চা আরম্ভ করে এবং রক্ষণশীলতার ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে দেশের নৃত্যশিল্পকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।’

প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্ব বাংলার নৃত্যগুলো ততটা জীবনঘনিষ্ঠ ছিল না। এতে সমাজজীবন ও মানব জীবনের প্রতিফলন তেমন ঘটতো না। ষাটের দশকের মধ্যভাগে এ অবস্থার পরিবর্তন আসে। এ সময় বাস্তবমুখী ও জীবনমুখী নৃত্যানুষ্ঠানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এগুলোর মধ্যে বুলবুল ললিতকলা একাডেমির ভারতীয় শিক্ষক অজিত সান্যাল পরিচালিত ‘শ্যামল মাটির ধরা তলে’ অন্যতম। এই নৃত্যনাট্যটি গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন নিয়ে রচিত। এছাড়া গওহর জামিলের রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে ‘সামান্য ক্ষতি’ ও লোককাহিনি ভিত্তিক ‘কাঞ্চন মালা’ নৃত্যনাট্য ছিল অন্যতম।

আবহমান বাংলার লোককাহিনি ও লোকগাথা নিয়ে ষাটের দশকে বহু নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে ‘মহুয়া’, ‘সোনাই মাধব’, ‘মলুয়া’, ‘নদের চাঁদ’, ‘চন্দ্রাবতী’ প্রভৃতি।[৪৩৪]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় নৃত্যশিল্পের চর্চা আরও বেগবান হয়। সে সময় আন্দোলনমুখী বিবিধ ধারার নৃত্যের সৃষ্টি হয়। যেমন : দেশাত্মবোধক নৃত্য, বিপ্লবাত্মক নৃত্য, ছায়া নৃত্যনাট্য ইত্যাদি। সে বছর প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের পটভূমিতে ‘যেন ভুলে না যাই’ নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করে পূর্ব বাংলার মানুষের মণ জয় করেন। সমকালীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা প্রেক্ষাপটে না হলেও স্বাভাবিক ধারায় নৃত্যচর্চার জন্য ছেলে-মেয়েদের একই মঞ্চে উপস্থাপন করাটাই ছিল বড়ো অবদান। এ সময় থেকে নৃত্যকলা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বুলবুল চৌধুরী। তিনি রক্ষণশীল মুসলিম সমাজকে নৃত্যশিল্পকে জীবনে প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় প্রতিবাদী শিল্প চর্চার অন্যান্য ধারার মতো নৃত্যচর্চাও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। সে সময় মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ও ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ঢাকায় বিভিন্ন জনসভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে পরিবেশিত হয় নৃত্যনাট্য। নির্বাচনি প্রচারণা পর্বে উল্লেখযোগ্য একটি নৃত্যানুষ্ঠান হয় আরমানিটোলার জনসভায়। এটি পাট চাষিদের ওপর সরকারি নিগ্রহ ও বঞ্চনার পটভূমিতে রচিত হয়েছিল। পূর্ব বাংলার প্রথম সারির প্রায় সব রাজনৈতিক নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে গাজীউল হক, নিজামুল হক, জাহানারা লাইজু প্রমুখ এতে অংশ নেন।[৪৩৫] ৫৪ সালে গণনাট্য সংঘ ‘এই আমার

দেশ' নামে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে।[৪৩৬] পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে চট্টগ্রামের নবনাট্য সংঘের শিল্পীরা 'শিল্পীর নবজন্ম' নামক একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন।

১৯৫৫ সালে ঢাকায় গড়ে ওঠে বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস। বুলবুল একাডেমির সবচেয়ে বড়ো অবদান সংস্কারমুক্ত সংস্কৃতিচর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। মুসলিম সমাজের সংস্কার ভেঙে নৃত্যকলাকে প্রতিষ্ঠা করায় এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।[৪৩৭]

১৯৫৭ সালের কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সে সময়ে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ম্যাডাম আজুরী করাচি থেকে অনুষ্ঠানে আসেন।[৪৩৮]

ষাটের দশকের শুরু থেকে গণমুখী ও রাজনৈতিক দর্শন সংবলিত নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হতে থাকে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এর সূচনা হয়।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকাসহ সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও সংগঠনগুলো সরকারি রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি পূর্ব বাংলার মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটে এই জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানগুলোতে। এ সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে নৃত্যশিল্পীরা নিয়মিত নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়।[৪৩৯] এটি বুলবুল একাডেমির শিল্পীরা পরিবেশন করেন। ভক্তিময় দাস গুপ্তের তত্ত্বাবধানে মন্দিরানন্দি নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন।[৪৪০] নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি ও ছায়ানটের অবদান সবথেকে বেশি। এ সম্পর্কে সন্‌জীদা খাতুন বলেছেন, '...সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে ছায়ানট ও বুলবুল ললিতকলা একাডেমি বাঙালিসমাজে নৃত্যকলাকে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করার পেছনে স্মরণীয় অবদান রেখেছে।'[৪৪১]

ছায়ানট গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্র-নজরুলের জন্মতিথি, বাংলা নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি পালন উপলক্ষ্যে ছায়ানট সংগীতের সাথে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে এসেছে শুরু থেকেই।[৪৪২]

১৯৬৩ সালে কাকরাইলে বারীন মজুমদারের উদ্যোগে সংগীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৪৩] এই প্রতিষ্ঠানটি সংগীতের সাথে সাথে নৃত্যকলা ও আন্দোলন-সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত জি এম মান্নানের 'কাশ্মির' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। ১৯৬৬ সাল থেকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হতে শুরু করলে সংস্কৃতিচর্চায় এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এ সময় সৃজনশীল নৃত্যশিল্পীরা বাস্তবধর্মী পরিবেশনার মাধ্যমে তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, যাতে বাংলার সমাজজীবনের প্রতিফলন ঘটেছিল।

১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী'ও নৃত্যনাট্যের নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আমানুল হকের রচনা ও পরিচালনায় নৃত্যনাট্য 'জ্বলছে আগুন ক্ষেত ও খামারে' এবং জ্ঞানেশ মুখার্জী রচিত নাটক 'আলোর পথযাত্রী' দেশব্যাপী আলোড়ন ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।[৪৪৪]

১৯৬৮ সালে 'ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী' আমানুল হক পরিচালতি নৃত্যনাট্য 'দিগন্তে লালা সূর্যোদয়' মঞ্চস্থ করে। একই সালে কলেজ অব মিউজিক-এর পক্ষ থেকে দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ 'সুর পেল সুরভী' নামে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। আমানুল হক নৃত্যনাট্যটি পরিচালিত করেন।[৪৪৫]

১৯৬৮ সালের দিকে এই মহাবিদ্যালয়ে ডিগ্রী ক্লাস চালু হয়। সংগীত বলতে গীত, বাদ ও নৃত্য–এই তিনের সমন্বয়কে বোঝায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার নৃত্য কলাকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে নি।[৪৪৬] পাকিস্তান ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধা এছেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সংগীত সংগঠকগণ ধৈর্য ধরে এই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।

১৯৬৮ সালে তৎকালীন ঢাকার জেলা প্রশাসকের আমন্ত্রণে বুলবুল একাডেমির পক্ষ থেকে 'সোনালী ফসল' নামে একটি নৃত্যনাট্য করা হয়। তার বিষয়বস্তু ছিল সেলো মেশিনের সাহায্যে সেচের মাধ্যমে ইরি চাষ, নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি ইত্যাদি। পরিশেষে বাংলার কৃষকের ঘরে নবান্নের উৎসব।[৪৪৭]

৬৯-এর গণ-আন্দোলনের জোয়ারে পল্টন ময়দান, রেসকোর্স মাঠ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর সবখানেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পূর্বে গণসংগীত ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করা হতো।

১৯৭০ সালে তৎকালীন ইকবাল হলে ছাত্রলীগের এক অনুষ্ঠানে আমানুল হকের রচনা ও পরিচালনায় পরিবেশিত হয় নৃত্যনাট্য 'আর দেব না রক্তে বোনা ধান'।[৪৪৮]

১৯৭১ সালে জানুয়ারি মাসে আলপনা মমতাজ 'কথাকলি' নামে একটি নৃত্যচর্চা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মার্চের অসহযোগ আন্দোল নৃত্যানুষ্ঠানগুলো পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বাধিকার আন্দোলন পর্বে প্রতিবাদী ও বক্তব্য প্রধান নৃত্যনাট্যগুলোর মধ্যে ড. মুহম্মদ এনামুল হক রচিত এবং রাহিজা খানম ঝুনু ও বাবুরাম সিং পরিচালিত 'রাজপথ জনপথ', 'উত্তরণের দেশে', হাবিবুল চৌধুরীর 'প্রতিরোধ বহ্নিমান' এবং আমানুল হকের রচনা ও পরিচালনায় 'জ্বলছে আগুন ক্ষেতে ও খামারে', 'হরতাল', 'ওরা কাজ করে' ও 'দিগন্তের নতুন সূর্য' প্রভৃতি অন্যতম।[৪৪৯]

যাত্রা

১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের সংস্কৃতিক অঙ্গনে অপ্রত্যাশিত শূনত্য দেখা দেয়। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সে সময়কার যাত্রা শিল্পীরা বেশিরভাগ দেশত্যাগ করেছেন। জনপ্রিয় যাত্রাদলগুলোও দেশ ছেড়ে গেছে। ফলে যাত্রা শিল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে একটা শূন্যতা দেখা ছিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে অপেশাদার যাত্রা সংগঠনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে যাত্রার ধারাটি তখন ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়।[৪৫০] ১৯৬৫ সালের পর তৎকালনীন পূর্ব পাকিস্তানে বেশ কিছু পেশাদার যাত্রা কোম্পানি গড়ে ওঠে। একক মালিকানাধীন যেমন এই শিল্প প্রসার লাভ করে, পাশাপাশি লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে যৌথ মালিকানায়ও এই শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে।[৪৫১] যাত্রা এই ভূখণ্ডের নিজস্ব শিল্পরীতি হলেও তা মুসলমাদের কাছে খুব বেশি গ্রাহ্য ছিল না। কারণ তা ছিল হিন্দুদের দেববন্ধনার অংশ হিসেবে মঞ্চস্থ হতো। কিন্তু শিল্পসংস্কৃতির এই শাখার জনগণের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম ছিল। শুধু তাই নয়, যাত্রা জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। পরবর্তীকালে মুসলমানরাও প্রভাবিত হয় এবং মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে যাত্রাপালা রচনা হতে থাকে। বিশেষ করে ষাটের দশকে শাসকগোষ্ঠীর প্রণোদনায় মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে যাত্রাপালা তৈরি হতে থাকে। [৪৫২]

সাতচল্লিশ-উত্তর পূর্ব বাংলায় যাত্রাদলের সংখ্যা ছিল বিশ থেকে পঁচিশটি, প্রত্যেক দলের ছয়-সাতটি করে পালা ছিল। শিল্পী বাছাই করা, তাদের প্রশিক্ষণ, দলগত আচারণ ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হতো। শিল্পী সম্মানীও দেওয়া হতো নিয়মিতভাবে। পালা নির্বাচনে ছিল বৈচিত্র্য। দলের পালার মধ্যে হতো দু'টো পৌরাণিক, একটি-দুটি হতো ভক্তিমূলক, বাদবাকি ঐতিহাসিক। সামাজিক পালা তখনও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না। সামাজিক পালা ব্যাপকভাবে অভিনীত হতে থাকে ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে।[৪৫৩] যাত্রা মৌসুম শুরু হতো সুনির্দিষ্টভাবে দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন, শেষ হতো ৩০ চৈত্র, বাসন্তী পূজায়। বছরের এই ছয় মাস বায়না অনুযায়ী ঘুরে ঘুরে যাত্রা পরিবেশন করতো দলগুলো। সেই সময় রমজান মাসেও যাত্রাপালা অভিনীত হয়েছে।[৪৫৪]

ষাটের দশক থেকে যাত্রায় মুসলিম শিল্পীর অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। বারিশালে গঠিত হয়েছিল মুসলিম যাত্রা পার্টি, পরে এই দলের নাম রাখা হয় বাবুল যাত্রা পার্টি। দলের অধিকর্তা ছিলেন মোজাহার আলী শিকদার। পালা লিখতেন তাঁর ছেলে সেকান্দার আলী কিসদার। মুসলিম ধর্মীয় ইতিহাসভিত্তিক পালার মধ্যে ছিল *বিষাদ সিন্ধু*, *এজিদ বধ*, *জয়নাব উদ্ধার* ইত্যাদি।[৪৫৫]

ষাটের দশকের শুরু থেকে যাত্রামঞ্চে ‘রূপবান’ পালাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু ‘রূপবান’ যাত্রা অভিনয়ের জন্যেই বেশকিছু যাত্রাদল গড়ে ওঠে। এই জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে ‘রূপবান’ যাত্রার গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয়। তার বিক্রির পরিমাণও ছিল অনেক বেশি। সরকার এই যাত্রায় ইসলাম-বিরোধী বক্তব্য আছে এই অভিযোগ উত্থাপন করে।[৪৫৬] ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন গভর্নর রূপবান যাত্রা মঞ্চায়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রূপবান যাত্রার সঙ্গে বাঙালি মানসের সংস্কৃতি ও এর শিল্পরূপ বিষয়ে সহজাত ও গভীর পর্যবেক্ষণ নিয়ে কবি জসিমউদ্‌দীন পত্রিকায় লিখিত একটি নিবন্ধে বলেছেন, ‘একদল মোল্লা-পন্থি সমালোচক নাকি বলিয়া থাকেন, এই নাটকে ইসলামের আদর্শ ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে। কোথায় হইয়াছে তাহা কেহ প্রকাশ করিয়া বলেন নাই।’[৪৫৭]

১৯৬২ সালে যাত্রা মঞ্চায়ন সরকারি এক বাধার সম্মুখীন হয়। তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান এক আদেশ জারি করেন যে, যাত্রাদলে নৃত্যশিল্পী অথবা অভিনেত্রী হিসেবে কোনো মেয়ে থাকতে পারবে না।[৪৫৮] যাত্রা মালিকরা মামলা করলে পরে এই আদেশ রদ করা হয়। মামলা পরিচালনা করেছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী এবং যাত্রাদলগুলোকে সার্বিক সহায়তা করেছিলেন পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন।[৪৫৯] মামলা-জয়ের পর ‘রূপবান’ তথা যাত্রাগানে জনপ্রিয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ যাত্রা অনুষ্ঠানের প্রতি সরকার সদয় ছিল না, এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়।

৬৯-এর গণ আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিতেই দানা বেঁধে ওঠে এবং বৃহত্তর জনগণের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়। এই প্রেক্ষাপটে যাত্রাপালা তথা এদেশের পেশাদার যাত্রাদল ও অপেশাদার সৌখিন যাত্রাদল সমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪৬০] ৬৯-এর গণ আন্দোলনে ‘একটি পয়সা’ যাত্রাপালা জন জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৪৬১]

যাত্রা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির পথে যখনই যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে তা অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যাত্রা শিল্প প্রাচীনকাল থেকে লোক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চলে আসছে। লোক শিক্ষা বলতে বৃহত্তর লোকজীবনের ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক চেতনাকে জাগ্রত করা।[৪৬২] পূর্ব পাকিস্তানেও বাঙালিদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে উপজীব্য করে যাত্রাপালা রচিত হতে হয়। যা বাঙালিদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ গড়ে তোলে।

বেতার

পাকিস্তানের তৎকালীন বেতারে বাঙালিদের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এ সময়ে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সাইফুল বারী[৪৬৩] লিখেছেন,

> রেডিও পাকিস্তানের ইতিহাসে এটাই প্রথম কারো সরাসরি বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান। এর আগে প্রমোশন পেয়ে সহকারী বার্তা সম্পাদক থেকে বার্তা সম্পাদক হত। রেডিও সেন্ট্রাল নিউজ অরগানাইজেশন অর্থাৎ সিএনওর চাকরিতে যোগ দিয়ে প্রথম দিনই ধাক্কা খেলাম।...একজন বাঙালিকে ‘বস’ হিসেবে সহ্য করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠছিল। প্রতিকূল পরিবেশে আমিও অনড়।[৪৬৪]

শুধু তাই নয়, সংবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাঙালিকে অবজ্ঞার সম্মুখীন হতে হতো। ’৬৫ সালের বন্যায় পূর্ব বাংলা বেশকিছু মানুষ মারা যায়। এই সংবাদ বার্তা সম্পাদক হেড সাইফুল বারী লাইন করতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মীদের অবজ্ঞার শিকার হতে হয়। তারা বলেন, ‘বন্যা আবার হেড লাইন হয় নাকি!’[৪৬৫] অথচ সেদিন বিভিন্ন বিদেশি সংবাদপত্র ও রেডিওগুলো সংবাদটিকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছে।[৪৬৬]

পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা বুলেটিন হতো। বাংলাতেও হতো। কিন্তু প্রধান সংবাদ বুলেটিন হতো ইংরেজিতে। বিভিন্ন ভাষায় সেগুলো প্রয়োজন মতো অনুবাদ করা হতো। ঢাকা থেকে যে সংবাদগুলো পাঠানো হতো তার বেশিরভাগ যেতো বাংলা সংবাদ বুলেটিনে। বাংলাদেশের সংবাদ ইংরেজি বুলেটিনে খুব বেশি যেত না।[৪৬৭]

১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলার ডিফেন্সে সাইডের বক্তব্য ঢাকায় রেডিও নিউজে খুব বেশি কাভারেজ হচ্ছিল না শাসকগোষ্ঠীর চাপের কারণে।

৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে ঢাকা বেতারের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। রেসকোর্স থেকে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সরাসরি প্রচার করতে না দেওয়ায় কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয় বেতার কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত পরদিন সকলে বেতারে প্রচারিত হয় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।[৪৬৮]

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৭১ সালের মার্চ মাস জুড়ে চলে অসহযোগ আন্দোলন। তখন বেতারের ঢাকা কেন্দ্র নিজস্ব সংবাদ বুলেটিন প্রচার শুরু করে। সকাল-বিকাল আন্দোলনের সংবাদ ও সংবাদ পর্যালোচনা প্রচার হতে থাকে ঢাকা কেন্দ্র থেকে। পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের কঠোর সমালোচনা, বঙ্গবন্ধুর সংবাদ ব্রিফিংয়ের খবর বাংলাদেশের মানুষকে দিতে শুরু করলো অদ্ভুত এক প্রেরণা। আন্দোলনের অংশ হিসেবে কাজ করতে থাকে ঢাকা বেতার। সংবাদের সাথে সাথে প্রচার হতে থাকে স্বাধীনতার গান, উদ্দীপনাময় কথিকা, অনুষ্ঠান। বেতার কর্মীরা প্রচুর ঝুঁকি নিয়ে সেই সব অগ্নিঝরা দিনে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করেছিল পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।[৪৬৯]

বেতার শিল্পীদের ভূমিকা

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে ঢাকার প্রগতিশীল কিছুসংখ্যক শিল্পী অভিনেতা সৈয়দ হাসান ইমামের নেতৃত্বে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।[৪৭০] বেতার ও টেলিভিশনের শিল্পীরাই মূলত এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন। এই সংগঠনটির ঐক্য ছিল দৃঢ়।

বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ বাঙালি বেতার কর্মীদের আহ্বান জানালেন তাঁদের গান, আবৃত্তি ও কণ্ঠস্বর প্রচার করতে হবে। ঢাকা বেতারের কর্মীরা দেশের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের অনুষ্ঠান প্রচার করে। 'রেডিও পাকিস্তান' ঢাকার পরিবর্তে 'ঢাকা বেতারে'র অনুষ্ঠান শুনছেন এই ঘোষণা প্রচারিত হতে থাকলো। তখনকার বাস্তবতায় এই সিদ্ধান্ত ছিল খুব কঠিন। কারণ বেতার ও তথ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রেডিও পাকিস্তানের সদর দপ্তর ছিল রাওয়ালপিন্ডিতে। সরাসরি নির্দেশ আসত রাওয়ালপিন্ডি থেকে।[৪৭১]

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল তাতে রাজপথ, বাংলা একাডেমি চত্বরে আয়োজিত দেশ প্রেমের গানে তা স্বাধীন বাংলা বেতারেও গীত হয়েছে।[৪৭২] বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের প্রথম পদক্ষেপ ২ মার্চ বঙ্গবন্ধু পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করেন রেডিও টেলিভিশন কর্তৃক যদি আন্দোলনের খবর প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে এসব ক্ষেত্রে চাকুরিরত বাঙালিরা কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ৪ মার্চ থেকে বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা নীরব থাকলেন না। তাঁরা জনতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বেতার টেলিভিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ২০ জন বিশিষ্ট বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিল্পী সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতিতে জানান যে:

> যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাঁরা বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, দেশের বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা একযোগে এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া বাংলাদেশের গনমানুষের দাবী আদায়ে সহযোগীতা করবেন। গত ২ মার্চ হইতে ঢাকার বেতার কেন্দ্র শিল্পীদের রেকর্ড করা অনুষ্ঠান প্রচার করিতেছেন, অথচ পূর্বে রেকর্ড করা অনুষ্ঠানগুলি রেকর্ড বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে না। এজন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। তারা দেশে শিল্পী সমাজকে সবরকম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাতে আহ্বান জানান।[৪৭৩]

তারা ৫ মার্চের একটি কর্মসূচিরও ঘোষণা দেন। তারা বলেন:[৪৭৪]

> বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংগীত, নাটক ও অন্যান্য সকল চারুকলা ও কারুকলা শিল্পীদের এবং সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের এক সভার আয়োজন করা হইয়াছে আগামীকাল বিকাল ৩ টায়। সভা বুলবুল একাডেমীর ধানমন্ডি শাখায় অনুষ্ঠিত হইবে (রোড নং ৭, বাড়ি নং ১৭/বি, ধানমন্ডি, ঢাকা- ২) বিবৃতিতে শিল্পীগণ স্বাক্ষর দান করেন।[৪৭৫]

৬ মার্চ বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত বেতার, টি.ভি; চলচ্চিত্র আর অংকন শিল্পীদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে গণহত্যার প্রতিবাদ এবং স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে শপথ নিয়ে বলেন:

মুক্তিকামী বাংলার মানুষের উপর নির্যাতন ও ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার শিল্পী সমাজ আজ বিক্ষুব্ধ, বিক্ষুব্ধ শিল্প সমাজ আজ শপথ লইয়াছে এখন হইতে শিল্পীরাও গণসঙ্গীত স্কোয়াড বাহির করিবে যন্ত্র শিল্পীরা তবলা ছাড়িয়া ধরিবে দামামা, অভিনেতা অভিনেত্রীরা সংগ্রামের সংলাপ উচ্চারণ করিবে আর পটুয়ারা (চিত্রশিল্পী) আঁকিবে সংগ্রামী ছবি।[৪৭৬]

৬ মার্চ বাংলা একাডেমিতে বিশিষ্ট কণ্ঠ শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের সমাবেশে বক্তৃতাকালে বিভিন্ন বক্তা জনতার বর্তমান আন্দোলনে গণমুখী সংগীত, নাটক, কথিকা ইত্যাদি প্রচারে বেতার, টিভি ও সরকারি কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা বলেন:

আজ জনতার কাতারে আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি। জনতার স্বাধিকার সংগ্রামকে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আমাদের শিল্পকে আমরা উৎসর্গ করিব এই অধিকার আদায়ের শপথ এখন হইতে আমাদের হইবে শিকল ভাঙ্গা আগুন জ্বালার।[৪৭৭]

সমাবেশে পাঠকদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বক্তারা বলেন যে, এখন হইতে বেতার, টিভিতে গণসংগ্রামে এই মুহূর্ত 'সেন্সর করা সংবাদ' পাঠকালে পাঠকগন কালো ব্যাজ ধারণ করিবে।[৪৭৮] সমাবেশ শেষে বিক্ষুব্ধ শিল্পীদের এক বিরাট মিছিল বাহির হয়। মিছিল বেতার টিভি কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়।

৮ মার্চ ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনের বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ মুক্তিসংগ্রামের চেতনাকে সদাজাগ্রত রাখার প্রয়াসে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তগুলো হলো: ১. বেতার ও টেলিভিশনের সকল অনুষ্ঠান বাংলার গণআন্দোলনের অনুকূল হবে এই শর্তে বাংলার বিক্ষুব্ধ শিল্পীগণ আগামী ১০ মার্চ থেকে বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২. যতদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকবে ততদিন বাংলার সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগীত বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়। তবে গণসংগীতের মহড়া দেওয়া যাবে। বাংলাদেশে পূণর্বার সর্বাত্মক হরতাল ঘোষিত হলে শিল্পীদের অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় শুরু হবে।[৪৭৯]

একই দিন শিল্পী সমাজের প্রতিনিধিগণ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি শেখ মুজিবকে জানানো হয়। এছাড়াও এদিন শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। সৈয়দ হাসান ইমামকে আহ্বায়ক ও বেতার ও টেলিভিশনের ৪৫ জন বিশিষ্ট শিল্পীকে সদস্য করে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[৪৮০]

১৫ মার্চ বেতার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ, টেলিভিশন কর্মী ও কলা কুশলীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একাত্বতা প্রকাশ করা হয়।[৪৮১]

১৬ মার্চ বেতার ও টেলিভিশনের বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুনরায় গণসংগীত, কবিতা পাঠ ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। গণআন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ *ভোরের স্বপ্ন* নাটকটি শহিদ মিনার ও বাহাদুর শাহ পার্কে সফলভাবে পরিবেশন করে এবং এই নাটকটি জনমনে ব্যাপক সাড়া জাগায়।[৪৮২]

ঢাকা বেতারের বিশিষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী জনাব আব্দুল লতিফ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে তার 'তমঘা-ই-খিদমদ' খেতাব বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।[৪৮৩]

উপসংহার

১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের পর বাংলাদেশের মানুষের আন্দোলনের বিষয় ছিল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি। এ প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সৈয়দ আলী আহসানের দেওয়া বক্তৃতা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

... পূর্ণ মানবিক অধিকার এবং সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে পাকিস্তানে আমরা বেঁচে থাকতে চেয়েছি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বারবার সে পথে প্রতিবন্ধকতা এসেছে। এই প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রমে আজ আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে। আমরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর বিশ্বাসী এবং সে মূল্যবোধের ভিত্তিতে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হোক এই আমরা চাই। ১৯৫২ সালে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল সে আন্দোলনকে উৎস করেই বর্তমান আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আন্দোলনকে যথার্থ রূপে ফলপ্রসূ করে তোলা।[৪৮৪]

আর এই আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সহায়তা করে শিল্পকলা (চিত্রকলা, স্থাপত্য, দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্য), বাংলা চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক, গণসংগীত, নৃত্যকলা, যাত্রা ও বেতার।

শিল্পকলা থেকে ধর্মীয় দিক থেকে অধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর সাথে যারা যুক্ত হতেন তাদেরকে সামজিকভাবে হেয় হতে হতো। সাংস্কৃতিক কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে শিল্পকলা শুধু সমাজে নিজের অবস্থানই করে নেয় নি, একইসাথে সমাজের অগ্রগতির জন্য ভূমিকা পালন করে এবং সমাজকে প্রস্তুত করে প্রগতিশীল যাত্রার পক্ষে।

পঞ্চাশের দশকে জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান লোকশিল্প উৎসারিত লোকজ আধুনিকতা আঙ্গিকের চিত্রভাষা নির্মাণ করেন।[৪৮৫] তাঁরা বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে চিত্রকর্মে প্রাধান্য দেন যা বাঙালিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো আরও পরিস্ফুটিত করে এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। স্বাধীনতাপূর্ব ষাটের দশকেই বিমূর্ত বা সম্পূর্ণ নির্বস্তুক আঙ্গিক এ দেশের চিত্রকলার একটি শক্তিশালী ধারা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।[৪৮৬] তৎকালীন সামরিক শাসনাধীন পাকিস্তানে বিমূর্ত চিত্রকলাচর্চা সম্ভবত বা রাজনৈতিকভাবে নিরাপদ ছিল।[৪৮৭]

পাকিস্তানপর্বে চিত্রশিল্পের বিষয় বা বক্তব্য ছিল প্রধানত অরাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু '৬৫ পরবর্তী শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা দাবি ও '৬৯-এর গণআন্দোলনের এক ধরনের ফলশ্রুতি জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে আয়োজিত 'নবান্ন' চিত্রপ্রদর্শনী ও 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' স্লোগানের সমধর্মী সাহসী শিল্পকর্ম ৬৪ ফুট দীর্ঘ স্ক্রলচিত্র। '৭০-এর উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস-প্রভাবিত ৩০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রলটিকেও রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়, মানবিক বক্তব্য তো অবশ্যই। দুর্যোগকে কেন্দ্র করেই একই আঙ্গিকে জয়নুল এঁকেছিলেন দুস্থ মানবতার ত্রাণকর্তা হিসেবে বিপ্লবী জননেতা মওলানা ভাসানীর ছবি। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলায় কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সরাসরি উপস্থাপন জয়নুলের হাতেই প্রথম।[৪৮৮]

বাংলা চলচ্চিত্র ও মঞ্চনাটক মানুষকে তাদের ঐতিহ্যের কাছে ফিরে নিয়ে যায়। এই দুটি মাধ্যম তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে তাদের অবস্থা কী তা চিত্রায়নের মাধ্যমে দেখায় যা তাদের উদ্বুদ্ধ করে নিজেদের অধিকার ফিরে পাবার জন্য।

গণসংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ করা হয় এবং জনগণকে জাগিয়ে তোলা ও উদ্বুদ্ধ করার কাজ করা হয়।

যাত্রা বাঙালির ঐতিহ্য। একইসাথে যাত্রাপালার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছা যায় সহজে। এই মাধ্যম জনগণকে তাদের অবরুদ্ধে অবস্থার কথা এবং তারা যে প্রতিনিয়ত শোষিত হচ্ছে সে ব্যাপারটা তুলে ধরে অভিনয়ের মাধ্যমে।

বেতারের বিশেষ ভূমিকা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। প্রতিটি বাঙালি ৭ই মার্চের ভাষণ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন। শাসকগোষ্ঠীর বাধার জন্য তা সরাসরি প্রচার করা সম্ভব না হলেও বেতারকর্মীদের প্রতিরোধের মুখে তা শেষ পর্যন্ত তা প্রচারে বাধ্য হয়।

এভাবে ষাটের দশকের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতি যখন ছিল অবরুদ্ধ, সেই সময় বিকল্প হিসেবে শিল্পকলা জনগণের কথা বলেছিল এবং জনগণকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। শিল্পকলার এই সক্রিয় অংশ গ্রহণের কারণে অন্তিমে রাজনীতিবিদদের পক্ষে বাংলাদেশ স্বাধীন করার কাজটি দ্রুত হয়েছে। কারণ শিল্পকলার এই মাধ্যমেগুলো জনগণের কাছে খুব সহজে পৌঁছায় এবং তাদের মানসজগৎ তৈরি করে। যার ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশ স্বাধীন করা কাজটি সম্ভব হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকাভাষ্য

[১] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৭; কাজী আনওয়ারুল হক, *তিন পতাকার তলে*, (অনুবাদ : নূরুল ইসলাম খান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২২৭

[২] হাশেম খান, *শিল্পীর স্কেচ খাতা*, 'মিসবাহউদ্দিন খান স্মারক বক্তৃতা- ১২', বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৪০-৪১

[৩] পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ শিল্পীর মধ্যে লৌকিক বা দেশজ উপাদান কমই দেখতে পাওয়া যায়।*

* আবুল মনসুর, *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯৭
[৪] সৈদয় আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, 'জয়নুল আবেদিন', নিসার আলী, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২০৮
[৫] 'জয়নুল আবেদিনের বাংলাদেশ-সাধনা', মতলুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪
[৬] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৬
[৭] রবিউল হুসাইন, *বাংলাদেশের স্থাপত্যসংস্কৃতি ও অন্যান্য রচনা*, জার্নিম্যান বুক্স, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২০
[৮] অঞ্জন আচার্য, 'বাংলার চিত্রকলার ক্রমবিকাশ', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, ঢাকা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩৬
[৯] নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য, *প্রাগুক্ত* (সম্পাদকের কথা)
[১০] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[১১] ওয়াহিদুল হক, 'পুরনো সেই দিনের কথা', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা*, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১১৯
[১২] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, ২০১৫, পৃ. ১৩
[১৩] নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য, *প্রাগুক্ত*, (সম্পাদকের কথা)
[১৪] অঞ্জন আচার্য, 'বাংলার চিত্রকলার ক্রমবিকাশ', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯
[১৫] এর শুরু ১৯৪৯ সালে চারুকলা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই আবার কামরুল হাসানের উদ্যোগে ও জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে সরকারি পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সমান্তরাল এক আন্দোলন শুরু হয় ঢাকা আর্ট গ্রুপ নামে সংগঠনের মাধ্যমে।*
* নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[১৬] অঞ্জন আচার্য, 'বাংলার চিত্রকলার ক্রমবিকাশ', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬
[১৭] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[১৮] অঞ্জন আচার্য, 'বাংলার চিত্রকলার ক্রমবিকাশ', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬
[১৯] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[২০] শরীফ আতিক-উজ-জামান, *শিল্প ও শিল্পী*, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৯
[২১] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[২২] *প্রাগুক্ত*
[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫
[২৪] শরীফ আতিক-উজ-জামান, *শিল্প ও শিল্প*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[২৫] *প্রাগুক্ত*
[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[২৮] আবুল হাসনাত (সম্পা.), *অনন্য আমিনুল ইসলাম*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫২-৫৩
[২৯] রওশন আর আমিন, তাহেরা বেগম, জোবেদা খানম, মঈনা ও মিনু (হাসিনা)।
[৩০] হাশেম খান, *শিল্পীর স্কেচ খাতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১
[৩২] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[৩৩] রফিক হোসেন, 'বাংলাদেশের শিল্প-আন্দোলনের যথার্থতা নির্ণয়', শওকত হোসেন (সম্পা.), *হালাখাতা*, *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৬
[৩৪] *প্রাগুক্ত*
[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
[৩৬] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[৩৭] বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, 'শিল্পী এস. এম. সুলতান : বাঙালিত্বের চেতনাধারী চিত্র লেখক', আইবিএস জার্নাল, অষ্টাদশ সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, মার্চ ২০১১, পৃ.১৪৬

[৩৮] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, জার্নিম্যান বুক্স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৬০
[৩৯] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৬-৩৭
[৪০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[৪১] *প্রাগুক্ত*
[৪২] *প্রাগুক্ত*
[৪৩] নজরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[৪৪] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৪-৪৫
[৪৫] কামরুন ঝূমুর, 'কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্প জীবন', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩
[৪৬] সৈয়দ জাহাঙ্গীর, *আত্মপ্রতিকৃতি স্মৃতির মানচিত্র*, বেঙ্গল পাবালিকেশন্‌স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৭
[৪৭] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[৪৮] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
[৪৯] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৩
[৫০] সৈয়দ জাহাঙ্গীর, *আত্মপ্রতিকৃতি স্মৃতির মানচিত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[৫১] গাজী তানজিয়া, 'চিত্রশিল্পে দ্রোহের কাল', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১-২১২
[৫২] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৮৬
[৫৩] *প্রাগুক্ত*
[৫৪] কামরুন ঝূমুর, 'কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্প জীবন', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩-২৬৪
[৫৫] আহম্মেদ শরীফ, *বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র*, অন্যন্যা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১; নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[৫৬] সৈয়দ আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১১০
[৫৭] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪২
[৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[৫৯] *প্রাগুক্ত*
[৬০] (১৯৫১-১৯৬১ সাল পর্যন্ত)
[৬১] ৮ ফুট বাই ২ ফুট আয়তনের শিল্পকর্ম।
[৬২] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন', ভূমিকা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৩
[৬৩] *প্রাগুক্ত*
[৬৪] প্রত্যাবর্তন শিল্পকর্মটি সম্ভাবত পাকিস্তানে রয়েছে। ১৯৬১ সালের আগে এই ছবিটি অংকন করেছেন।*
* রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৪
[৬৬] (ঝড় ১৯৫১-১৯৬১ সালের মধ্যে আঁকা ছবি)
[৬৭] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[৬৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
[৬৯] শরীফ আতিক-উজ-জামান, *শিল্প ও শিল্পী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[৭০] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬
[৭১] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৮৩
[৭২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩-৮৪
[৭৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪
[৭৪] *প্রাগুক্ত*
[৭৫] *প্রাগুক্ত*
[৭৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

[৭৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০
[৭৮] সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ*, বেঙ্গল পাবলিকেশন লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫৩
[৭৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪
[৮০] ১৯৬৫ সালে কামরুল হাসান *প্রার্থনা* শীর্ষক রেখাচিত্রটি অঙ্কন করেন।
[৮১] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[৮২] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[৮৩] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[৮৪] *প্রাগুক্ত*
[৮৫] *মই দেওয়া*, *বিদ্রোহী*, *গুনটানা*, *সাঁওতাল দম্পত্তি* প্রভৃতি।
[৮৬] আবুল মনসুর, *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৮
[৮৭] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[৮৮] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯
[৮৯] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[৯০] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
[৯১] হাশেম খান, 'ছয় দফা সংবিধান এবং একটি পোস্টার', লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.), *নেপথ্য কাহিনী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৮
[৯২] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
[৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[৯৪] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২
[৯৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২২
[৯৬] গাজী তানজিয়া, 'চিত্রশিল্পে দ্রোহের কাল', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২
[৯৭] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬-৪২৭
[৯৮] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *কামরুল হাসান*, জার্নিম্যান বুক্স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৭৬
[৯৯] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[১০০] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *নানা শিল্পীর নানা কাজ*, জার্নিম্যান বুক্স, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৬-২৭
[১০১] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪
[১০২] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *কামরুল হাসান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৭
[১০৩] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫
[১০৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫-৮৬
[১০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬
[১০৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[১০৭] আনিসুজ্জামান, 'জীবনবোধ ও শিল্পচেতনা', *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৫২
[১০৮] মুনতাসীর মামুন, 'কামরুল হাসানের স্মৃতি', *কামরুল হাসান*, সম্পাদনা : আবুল হাসনাত, থিয়েটার, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৮৫; সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[১০৯] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[১১০] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[১১১] নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ৫৮ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ॥ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ২০১৭, পৃ. ১৮
[১১২] আবুল মনসুর, *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৬
[১১৩] মতলুব আলী, 'জয়নুল আবেদিনের চিত্রশিল্পে দেশাত্মবোধ', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্তসংখ্যা ৬২-৬৩, ঢাকা, পৃ. ৩৪
[১১৪] নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
[১১৫] শরীফ আতিক-উজ-জামান, *শিল্প ও শিল্পী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

[116] নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
[117] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
[118] 'তার শিল্প ভুবন', *সংবাদ*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০
[119] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[120] *প্রাগুক্ত*
[121] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[122] *প্রাগুক্ত*
[123] নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, পৃ. ১৮
[124] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন', , পৃ. ৩৫
[125] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
[126] নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[127] 'তার শিল্প ভুবন', *সংবাদ*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০; রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
[128] সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[129] রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথরেখায়*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৯৬-৯৭
[130] সৈদয় আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, 'জয়নুল আবেদিনের স্মৃতি', আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
[131] *প্রাগুক্ত*
[132] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
[133] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[134] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭-৪৯
[135] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
[136] নজরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[137] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
[138] নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[139] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[140] *প্রাগুক্ত*
[141] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
[142] অঞ্জন আচার্য, 'বাংলার চিত্রকলার ক্রমবিকাশ', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮-২৩৯
[143] নজরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[144] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
[145] গাজী তানজিয়া, 'চিত্রশিল্পে দ্রোহের কাল', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২
[146] অঞ্জন আচার্য, 'বাংলার চিত্রকলার ক্রমবিকাশ', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯
[147] গাজী তানজিয়া, 'চিত্রশিল্পে দ্রোহের কাল', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২
[148] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[149] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[150] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[151] কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
[152] হাশেম খান, 'ছয় দফা সংবিধান এবং একটি পোস্টার', লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.), *নেপথ্য কাহিনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
[153] রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথরেখায়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭
[154] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৭১

[১৫৫] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[১৫৬] নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
[১৫৭] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬
[১৫৮] *প্রাগুক্ত*
[১৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[১৬০] *প্রাগুক্ত*
[১৬১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৪
[১৬২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ ১৯৭১
[১৬৩] *সংবাদ*, ১২ মার্চ ১৯৭১
[১৬৪] *আজাদ*, ১৩ মার্চ ১৯৭১; *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৩ মার্চ ১৯৭১
[১৬৫] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[১৬৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[১৬৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
[১৬৮] *সংবাদ*, ১৬ মার্চ ১৯৭১; *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ মার্চ ১৯৭১; *আজাদ*, ১৫ মার্চ ১৯৭১
[১৬৯] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[১৭০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ ১৯৭১
[১৭১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ মার্চ ১৯৭১
[১৭২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ মার্চ ১৯৭১; মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[১৭৩] মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯
[১৭৪] *প্রাগুক্ত*
[১৭৫] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[১৭৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
[১৭৭] অঞ্জন আচার্য, 'বাংলার চিত্রকলার ক্রমবিকাশ', নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা*, *প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯
[১৭৮] বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
[১৭৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯
[১৮০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[১৮১] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
[১৮২] হাশেম খান, 'ছয় দফা সংবিধান এবং একটি পোস্টার', লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.), *নেপথ্য কাহিনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[১৮৩] সৈদয় আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, 'জয়নুল : আধুনিক ও প্রান্ত-অনুরাগী', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২
[১৮৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩
[১৮৫] শরীফ আতিক-উজ-জামান, *শিল্প ও শিল্পী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[১৮৬] আবুল হাসনাত (সম্পা.), *অনন্য আমিনুল ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫
[১৮৭] রবিউল হুসাইন, বাংলাদেশের স্থাপত্যসংস্কৃতি ও অন্যান্য রচনা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[১৮৮] হালী মোস্তফা, *বাংলাদেশের স্থাপত্যজগৎ*, মামুন সিদ্দিকী (সং ও সম্পা.), সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৪-৩৫
[১৮৯] রবিউল হুসাইন, বাংলাদেশের স্থাপত্যসংস্কৃতি ও অন্যান্য রচনা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[১৯০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[১৯১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[১৯২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
[১৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯
[১৯৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০
[১৯৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
[১৯৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[১৯৭] *প্রাগুক্ত*

[১৯৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[১৯৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[২০০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[২০১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১
[২০২] হাশেম খান, *শিল্পীর স্কেচ খাতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১
[২০৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫
[২০৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
[২০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[২০৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
[২০৭] *প্রাগুক্ত*
[২০৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[২০৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[২১০] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী হামিদুর রহমান', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০
[২১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২
[২১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০-১৪১
[২১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১
[২১৪] *প্রাগুক্ত*
[২১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৪২
[২১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২
[২১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২
[২১৮] ৭১ সালে শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা দেয়ালচিত্রটি ধ্বংস করে দেয়।
[২১৯] রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী হামিদুর রহমান', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
[২২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪
[২২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫
[২২২] *প্রাগুক্ত*
[২২৩] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
[২২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
[২২৫] আবদুল্লাহ জাহিদ, 'কিংবদন্তি ভাস্কর নভেরা', *প্রথম আলো*, ৫ মে ২০১৮
[২২৬] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[২২৭] আবদুল্লাহ জাহিদ, 'কিংবদন্তি ভাস্কর নভেরা', *প্রাগুক্ত*
[২২৮] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[২২৯] সাখাওয়াত টিপু, *নভেরার রূপ*, আদর্শ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯
[২৩০] জাকির হোসেন রাজু, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : উৎসের সন্ধানে', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা*, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬
[২৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[২৩২] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৯
[২৩৩] *প্রাগুক্ত*
[২৩৪] বেলায়াত হোসেন মামুন, 'বিজয়ের চার দশকে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা*, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[২৩৫] মফিদুল হক, 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা*, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
[২৩৬] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
[২৩৭] মফিদুল হক, 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা*, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
[২৩৮] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[২৩৯] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০২
[২৪০] *প্রাগুক্ত*
[২৪১] মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধের আলোকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[২৪২] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-১০৩
[২৪৩] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
[২৪৪] *প্রাগুক্ত*
[২৪৫] মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধের আলোকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[২৪৬] মুহম্মদ খসরু, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৯১; আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[২৪৭] মুহম্মদ খসরু, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭; আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
[২৪৮] ওয়াহিদুল হক, 'পুরনো সেই দিনের কথা', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০
[২৪৯] শাহরিয়ার কবির, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : একটি পর্যালোচনা', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০
[২৫০] অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিতের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬-২৭৭
[২৫১] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[২৫২] *প্রাগুক্ত*
[২৫৩] *প্রাগুক্ত*
[২৫৪] হারুনর রশীদ, *চলচ্চিত্রকার সালাহ্‌উদ্দিন*, চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৮
[২৫৫] উল্লেখ্য ১৯৭০ সালে তিনি এই বক্তব্য দেন।*
*অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[২৫৬] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[২৫৭] আলম কোরায়শী, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[২৫৮] অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিতের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬-২৭৭
[২৫৯] মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধের আলোকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[২৬০] মাসুদ-উর-রহমান, *স্মৃতি ধন্য অন্তর*, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১০২
[২৬১] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[২৬২] মাসুদ-উর-রহমান, *স্মৃতি ধন্য অন্তর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[২৬৩] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[২৬৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[২৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[২৬৬] মাসুদ-উর-রহমান, *স্মৃতি ধন্য অন্তর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[২৬৭] *প্রাগুক্ত*
[২৬৮] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[২৬৯] *প্রাগুক্ত*
[২৭০] মাসুদ-উর-রহমান, *স্মৃতি ধন্য অন্তর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
[২৭১] জাকির হোসেন রাজু, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : উৎসের সন্ধানে', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬
[২৭২] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

[২৭৩] *প্রাগুক্ত*
[২৭৪] আলম কোরায়শী, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪
[২৭৫] জাকির হোসেন রাজু, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : উৎসের সন্ধানে', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[২৭৬] *প্রাগুক্ত*
[২৭৭] মিজানুর রহমান, 'ঢাকার চলচ্চিত্রের কথা', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[২৭৮] শেখ মাহমুদা সুলতানা, 'ঢাকার চলচ্চিত্র : রাজনৈতিক অর্থনীতি', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩
[২৭৯] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
[২৮০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১
[২৮১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১
[২৮২] হারুনর রশীদ, *চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬
[২৮৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০
[২৮৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭
[২৮৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০
[২৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[২৮৭] ভিক্টোরিয়া কলেজে বিজ্ঞানের ডেমোনেস্টেটর ছিলেন।
[২৮৮] হারুনর রশীদ, *চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[২৮৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[২৯০] *প্রাগুক্ত*, তত্ত্বধায়কের কথা
[২৯১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৪
[২৯২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[২৯৩] *প্রাগুক্ত*
[২৯৪] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[২৯৫] আলম কোরায়শী, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[২৯৬] অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*, চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৫
[২৯৭] আলম কোরায়শী, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[২৯৮] বেলায়াত হোসেন মামুন, 'বিজয়ের চার দশকে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[২৯৯] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[৩০০] খান আতাউর রহমান, 'নবাব সিরাজদ্দৌলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব; উদ্বৃত, মাহবুব আজাদ, *খান আতাউর রহমান* (জীবনী), ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৫৮-১৬৪; অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[৩০১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[৩০২] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩-১০৪
[৩০৩] কাবেরী গায়েন, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ*, বেঙ্গল পাবলিকশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৪
[৩০৪] অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[৩০৫] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[৩০৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮
[৩০৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[৩০৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

[৩০৯] *সাপ্তাহিক চিত্রালী*, ৮ মে ১৯৭০; অনুপম হায়াৎ (সং ও সম্পা.), *পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সমালোচনা (১৯৫৬-২০০৯)*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৮৭
[৩১০] 'শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'তে চাবির গোছাই সব গণ্ডগোলের মূলে ছিল–এমনকি এস. এম. ইউসুফের 'আশিয়ানা' ও মিতার 'ক খ গ ঘ ঙ' তেও ছিল চাবির গোছা।'*

*অনুপম হায়াৎ (সং ও সম্পা.), *পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সমালোচনা (১৯৫৬-২০০৯)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭
[৩১১] *সাপ্তাহিক চিত্রালী*, ৮ মে ১৯৭০; অনুপম হায়াৎ (সং ও সম্পা.), *পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সমালোচনা (১৯৫৬-২০০৯)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
[৩১২] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩
[৩১৩] *প্রাগুক্ত*
[৩১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭
[৩১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯
[৩১৬] *প্রাগুক্ত*
[৩১৭] কাবেরী গায়েন, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[৩১৮] *প্রাগুক্ত*
[৩১৯] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০
[৩২০] *প্রাগুক্ত*
[৩২১] *প্রাগুক্ত*
[৩২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮
[৩২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[৩২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০
[৩২৫] বেলায়াত হোসেন মামুন, 'বিজয়ের চার দশকে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
[৩২৬] মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, 'মুক্তিযুদ্ধের আলোকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮
[৩২৭] হারুনর রশীদ, *চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[৩২৮] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[৩২৯] মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৫২; অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[৩৩০] হারুনর রশীদ, *চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন*, *প্রাগুক্ত*, তত্ত্বধায়কের কথা
[৩৩১] শেখ লুৎফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮৫
[৩৩২] *ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৭১
[৩৩৩] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৭৯
[৩৩৪] *সংবাদ*, ৭ মার্চ ১৯৭১।
[৩৩৫] মানজারে হাসীন, 'বাংলাদেশের প্রামান্যচিত্রের চর্চা : ভারত ভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ', *ভোরের কাগজ*, ১১ নভেম্বর ২০০৫
[৩৩৬] আনিসুজ্জামানের দাদা
[৩৩৭] বেলায়াত হোসেন মামুন, 'বিজয়ের চার দশকে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১
[৩৩৮] বেলায়াত হোসেন মামুন, 'বিজয়ের চার দশকে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
[৩৩৯] মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫৫
[৩৪০] মাহবুব জামিল, 'আজকের প্রেক্ষাপট : আমাদের চলচ্চিত্র', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, ঢাকা, পৃ. ৫০
[৩৪১] সৈয়দ জামিল আহমেদ, 'নাটক ও নাট্যকলা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৪৭* (৩য় খণ্ড), বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫০২
[৩৪২] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫-২১৬

[৩৪৩] সুকুমার সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৭৭-৭৪
[৩৪৪] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১
[৩৪৫] ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীতে মুনীর চৌধুরীর লেখা বিখ্যাত *কবর* (১৯৬৬) নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। অভিনয় করেছিলেন কারাবন্দিরা।* ১৯৫৪ সালে অল্পকালের জন্য যখন মুক্তি পান মুনীর চৌধুরী, তখন নাটিকাটিও জেলখানার বাইরে এলো। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় নাটকটি তখন ছাপা হয় নি।** কারাগারের বাইরে 'কবরে'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে–কার্জন হলে। সংস্কৃতি সংসদের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন বা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষ্যে ১৯৬৫ সালে।
* মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, বাংলাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১০২
** আনিসুজ্জামান, 'কবর', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫১
[৩৪৬] আনিসুজ্জামান, 'কবর', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
[৩৪৭] কবীর চৌধুরী, 'নাটক : প্রতিবাদ প্রতিরোধের', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[৩৪৮] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
[৩৪৯] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩৮
[৩৫০] মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
[৩৫১] কবীর চৌধুরী, *থিয়েটার পত্রিকা*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৮৭
[৩৫২] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
[৩৫৩] রামেন্দু মজুমদার, "নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬৯-৭০
[৩৫৪] রামেন্দু মজুমদার, "নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯
[৩৫৫] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৩
[৩৫৬] আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ*, অনন্যা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৫৬০
[৩৫৭] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[৩৫৮] যতীন সরকার, 'শওকত ওসমান : ইতিহাসের দর্পণে সেকাল একাল ভাবীকাল দর্শন', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
[৩৫৯] রামেন্দু মজুমদার, "নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[৩৬০] সনৎকুমার সাহা, 'সত্যসন্ধ শিল্পসাধনা : সাহিত্যে শওকত ওসমান', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
[৩৬১] রামেন্দু মজুমদার, "নাটক 'ক্রীতদাসের হাসি' ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[৩৬২] সনৎকুমার সাহা, 'সত্যসন্ধ শিল্পসাধনা : সাহিত্যে শওকত ওসমান', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩
[৩৬৩] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪
[৩৬৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
[৩৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫
[৩৬৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫
[৩৬৭] *প্রাগুক্ত*
[৩৬৮] *প্রাগুক্ত*
[৩৬৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪
[৩৭০] *প্রাগুক্ত*

[৩৭১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬
[৩৭২] শিখা সরকার, 'বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ', *রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ : ২৬, সংখ্যা : ৬, রাজশাহী, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ২১৭
[৩৭৩] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬
[৩৭৪] *প্রাগুক্ত*
[৩৭৫] মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ, *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৯; শিখা সরকার, 'বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ', *রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ : ২৬, সংখ্যা : ৬, রাজশাহী, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ২১৭
[৩৭৬] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১-২১২
[৩৭৭] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬
[৩৭৮] *প্রাগুক্ত*
[৩৭৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
[৩৮০] *প্রাগুক্ত*
[৩৮১] *প্রাগুক্ত*
[৩৮২] *প্রাগুক্ত*
[৩৮৩] সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩
[৩৮৪] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, ২০১৩, পৃ. ২২২
[৩৮৫] এম সুলতান উল আলম, 'মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় দুটি মঞ্চ নাটক', *ইতিহাসের খসড়া*, বর্ষ-২, সংখ্যা-৪, মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা, ২০১৬, পৃ. ৭
[৩৮৬] *প্রাগুক্ত*
[৩৮৭] হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
[৩৮৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮
[৩৮৯] *প্রাগুক্ত*
[৩৯০] *প্রাগুক্ত*
[৩৯১] *প্রাগুক্ত*
[৩৯২] *প্রাগুক্ত*
[৩৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯
[৩৯৪] *প্রাগুক্ত*
[৩৯৫] *প্রাগুক্ত*
[৩৯৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪
[৩৯৭] এম সুলতান উল আলম, 'মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় দুটি মঞ্চ নাটক', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭
[৩৯৮] এম সুলতান উল আলম, "মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় দুটি মঞ্চ নাটক 'এবারের সংগ্রাম' ও 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'", *ইতিহাসের খসড়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬
[৩৯৯] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৫৭
[৪০০] স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৭২
[৪০১] সন্‌জীদা খাতুন, 'বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তি সংগ্রাম আর সংস্কৃতি সাধনা', *বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ২৪ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১১২; স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
[৪০২] কামাল লোহানী, 'গণসংগীত চর্চা ও আমাদের রাজনীতি', *আবহমান বাংলা*, আকাশ প্রদীপ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬৮
[৪০৩] স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
[৪০৪] সন্‌জীদা খাতুন, 'বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তি সংগ্রাম আর সংস্কৃতি সাধনা', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২; স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
[৪০৫] স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
[৪০৬] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ জুন ১৯৬৭; স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩-৮৪
[৪০৭] সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৪৮-১৪৯
[৪০৮] স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

[৪০৯] আবুবকর সিদ্দিক, *রুদ্রপদাবলী : গণমানুষের গান*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭৩; কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[৪১০] স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

[৪১১] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[৪১২] সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

[৪১৩] আবুবকর সিদ্দিক, *রুদ্রপদাবলী : গণমানুষের গান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১

[৪১৪] সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০

[৪১৫] ফকির আলমগীর, *গণসঙ্গীতের অতীত ও বর্তমান*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২০৪

[৪১৬] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *আবহমান বাংলা*, আকাশ প্রদীপ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৭৫

[৪১৭] সেলিম রেজা (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতি ও গান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৯১

[৪১৮] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[৪১৯] সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬

[৪২০] স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

[৪২১] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯

[৪২২] সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-৯৬

[৪২৩] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

[৪২৪] আবুবকর সিদ্দিক, *রুদ্রপদাবলী : গণমানুষের গান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

[৪২৫] সাক্ষাৎকার, কামাল লোহানী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মধুরিমা, বাড়ি নং ১১, রোড নং ১৩, ধানমণ্ডি, ঢাকা, ২৫ নভেম্বর ২০১৮; কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

[৪২৬] সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

[৪২৭] *প্রাগুক্ত*

[৪২৮] *প্রাগুক্ত*

[৪২৯] 'আমরা করবো জয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয়
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয়॥

আমাদের নেই ভয় (৩) আজ আর
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয়॥

আমরা নই একা (৩) আজ আর
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয়॥

সত্য যে সাথী (৩) মোদের
আছে মুক্তির পথ বক্ষপাতি
সত্য যে মোদের সাথী॥'*

*সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

[৪৩০] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২২৫

[৪৩১] *বাংলাপিডিয়া*

[৪৩২] নিজামুল হক ভাষা-সংগ্রামী গাজীউল হকের ছোটো ভাই। আলতাফ মাহমুদ ও মোমিনুল হক এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

[৪৩৩] মাহফুজুর রহমান, *পূর্ববাংলায় নৃত্যকলা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১০১

[৪৩৪] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮

[৪৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

[৪৩৬] মাহফুজুর রহমান, *পূর্ববাংলায় নৃত্যকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[৪৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
[৪৩৮] *প্রাগুক্ত*
[৪৩৯] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭
[৪৪০] মাহফুজুর রহমান, *পূর্ববাংলায় নৃত্যকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
[৪৪১] *প্রাগুক্ত*
[৪৪২] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭
[৪৪৩] মাহফুজুর রহমান, *পূর্ববাংলায় নৃত্যকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[৪৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[৪৪৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[৪৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[৪৪৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[৪৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[৪৪৯] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮
[৪৫০] সুশান্ত সরকার, 'যাত্রা শিল্পের সংকট সমস্যার ক্ষেত্র ও বিষয় নির্দেশ', সৈকত আসগর (সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রা শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৫১
[৪৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১
[৪৫২] তপন বাগচী, *বাংলাদেশেল যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭০
[৪৫৩] রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চারদশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৮৯
[৪৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০
[৪৫৫] মফিদুল হক, *বাংলাদেশের যাত্রাচর্চা : অতীত ও বর্তমান*, সৈকত আসগর (সম্পা.), বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রা শিল্প, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪
[৪৫৬] তপন বাগচী, *বাংলাদেশেল যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮
[৪৫৭] মফিদুল হক, *বাংলাদেশের যাত্রাচর্চা : অতীত ও বর্তমান*, সৈকত আসগর (সম্পা.), বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রা শিল্প, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬
[৪৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪
[৪৫৯] রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চারদশকের বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
[৪৬০] সুশান্ত সরকার, 'যাত্রা শিল্পের সংকট সমস্যার ক্ষেত্র ও বিষয় নির্দেশ', সৈকত আসগর (সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রা শিল্প*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২
[৪৬১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৬
[৪৬২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২
[৪৬৩] সাইফুল বারী ১৯৬৪ সালে সেন্ট্রাল সার্ভিসের পরীক্ষার মাধ্যমে ইনফরমেশন সার্ভিসে ১৯৬৪ সালে যোগ দান করেন। তার পোস্টিং হয় রেডিও পাকিস্তানের সংবাদ বিভাগের সরাসরি বার্তা সম্পাদক হিসেবে।
[৪৬৪] সাইফুল বারী, 'বেতারে সংগ্রামী দিনের স্মৃতি', কাজী মাহমুদুর রহমান (সম্পা.), *বেতার স্মৃতি*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৪২
[৪৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩
[৪৬৬] *প্রাগুক্ত*
[৪৬৭] *প্রাগুক্ত*
[৪৬৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩-২৪৪
[৪৬৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪
[৪৭০] শেখ লুৎফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮৫
[৪৭১] নূরন্নবী খান, 'অবরুদ্ধ ঢাকা বেতার', কাজী মাহমুদুর রহমান (সম্পা.), *বেতার স্মৃতি*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৬৫
[৪৭২] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪
[৪৭৩] *ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৭১
[৪৭৪] *ঐ*

[৪৭৫] বিবৃতিতে সাক্ষর দান করেন, লায়লা আরজুমান্দ বানু, আফসারী খানম, আতীকুল ইসলাম, ফেরদৌসী রহমান, মুস্তফা জামান আব্বাসী, গোলাম মোস্তফা, হাসান ইমাম, জাহেদুর রহিম, আলতাফ মাহমুদ, লায়লা হাসান, রাহিজা খানম, বিলকিস, নাসিরুদ্দিন, হামিদা আতিক, অজিদ রায়, বেদারুদ্দিন আহমেদ, ফজলুল হক, ওয়াহিদুল হক, সৈয়দ আহমেদ হোসেন, আবদুল বাতিন ও এম এ হানিফ।*১

*১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৭১

[৪৭৬] *সংবাদ*, ৭ মার্চ ১৯৭১

[৪৭৭] *ঐ*

[৪৭৮] *ঐ*

[৪৭৯] *ইত্তেফাক*, ৯ মার্চ; ১৯৭১; *সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৭১

[৪৮০] *ঐ*, ৯ মার্চ; ১৯৭১; *ঐ*, ১০ মার্চ ১৯৭১

[৪৮১] *ইত্তেফাক*, ১৬ মার্চ ১৯৭১

[৪৮২] *সংবাদ*, ১৭ মার্চ ১৯৭১; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪; সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত;* পৃ. ২২৪
এসময়কার শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন, জাহেদুর রহীম, আলতাফ মাহমুদ, অজিত রায় প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন আতাউর রহমান, আলী মনসুর, গোলাম মোস্তফা, ও আবদুল হামিদ এবং অভিনয়ে ছিলেন গোলাম মোস্তফা, রাজু আহমেদ ও আলতাফ হোসেন।

[৪৮৩] *ইত্তেফাক*, ১৮ মার্চ ১৯৭১

[৪৮৪] সৈয়দ আলী আহসান, *জীবনের শিলান্যাস*, বাড কম্প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭

[৪৮৫] নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

[৪৮৬] মোহাম্মদ কিবরিয়া এ ধারার প্রধান শিল্পী। অবশ্য পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আরও কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী–আমিনুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক, মুর্তজা বশীর, কাজী আবদুল বাসেত, আবু তাহের, মোহাম্মদ মোহসীন, মবিনুল আজিম প্রমুখ বিমূর্তধারার শিল্পী ছিলেন।*১

*১ নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

[৪৮৭] *প্রাগুক্ত*

[৪৮৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা

সংস্কৃতি হলো একটি জনগোষ্ঠীর যাপিতজীবনের সমষ্টি। মানুষের জীবনচর্যার মধ্য দিয়েই তার সাংস্কৃতিক প্রকাশ ঘটে। যেহেতু মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবকিছু অর্থনীতি ও রাজনীতির সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট, তাই সংস্কৃতি ও রাজনীতি পরস্পর পরিপূরক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সংগ্রামের সাফল্য ত্বরান্বিত করার জন্য সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রয়োজন সব থেকে বেশি। সংস্কৃতি সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য মানসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে শোষণ শুরু করে। ১৯৪৮-৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শুরু হয় তা ষাটের দশকে তা পূর্ণাঙ্গরূপ পায়। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্যকে স্বকীয় করে তোলে। সংস্কৃতি বাঙালির জাতিচেতনার সংহতিসাধন করে এবং সেই চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করে জাতির মুক্তিসংগ্রামে শক্তি জোগায়।[১]

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মনে করতো বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে সাধারণ সরল দেশবাসীর মনে নানা কূটচালের মাধ্যমে দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টি করাতে পারলেই তাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম হবে। এ কাজে তারা সব চাইতে বেশি ব্যবহার করে ধর্মকে, ধর্মীয় আবেগকে।[২] পাকিস্তান গঠিত হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর। মুসলমানরা যেহেতু এক জাতি, তাই তাদের ধর্ম এখানে মূল হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মকেই জাতীয়তা গঠনের একমাত্র উপাদান-রূপে তখন মুসলিম লীগ প্রচার করে।[৩] ভাষা আন্দোলনের ফলে জাতীয়জীবনে যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে, বাংলাদেশের সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। সামন্ত-আদর্শকেন্দ্রিকদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও জনজীবনে তার আবেদন ক্ষীণ হতে থাকে। এ বিষয়ে ওয়াহিদুল হকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> পঞ্চাশের দশকের পুরোটাই গিয়েছিল পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে 'বিশ্ব সাথে যোগ' আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠায়। এবং সে নির্মাণের পথ ছিল অবশ্যই অখণ্ড বাংলাসাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে।... বাহান্ন'য় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, চুয়ান্ন'য় যুক্তফ্রন্টের বিজয়, মুসলিম লীগের কবর রচনা, কেন্দ্রীয় শাসন পেরিয়ে ছাপান্নয় আওয়ামী লীগের সরকার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতিসহ পাকিস্তানের সংবিধান জারি। যে উঠতি বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত 'আল্লাহো আক্‌বার' বলে মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করল মাত্র কয় বছর আগে, সেই মধ্যবিত্তের গতিশীল অংশ 'বিশ্বমানব হবি যদি কায়মনে বাঙালি হ'-গুরুসদয় দত্তের সেই অমোঘ বাণীর নির্দেশেই যেন সাম্প্রদায়িকতার তামসিকতা পেরিয়ে বিশ্বসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে।[৪]

অর্থাৎ বিশ্বমানব হওয়ার স্লোগান দিয়ে বাঙালি সাংস্কৃতিকর্মীগণ পাকিস্তানের সামন্তবাদী শাসনের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর শত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রথম থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকাণ্ড বিকাশ লাভ করে। রক্ষণশীল সম্প্রদায় গোড়া থেকেই প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বন্দ্ব-জটিল চরিত্ররূপ গ্রহণ করলেও সাংস্কৃতিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের প্রগতিশীল শক্তি প্রথমবারের মতো সুসংগঠিতভাবে ১৯৫৪ সালের ২৩-২৭ এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে'র আয়োজন করে। 'সকল রকম বিকৃতি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরীভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে'র যথাযথ আসন নির্ধারণ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ববাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্য' প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।

পূর্ব পাকিস্তান দেশ বিভাগের সংকটে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে। পাকিস্তান একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসন রাষ্ট্রটির মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধিজীবীদের

একাংশ শাসকগোষ্ঠীর এ কাজে সাহায্য করতে থাকে। কিন্তু '৫২-র ভাষা আন্দোলন সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করলেও রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে শ্রেণিটিকে কখনোই সরানো যায় নি।[৫] ষাটের দশকের গোড়ার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী নয়া উপনিবেশগুলোতে রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন 'লেকরা'-র শত শত কর্মী নিহত হন কমিউনিস্টবিরোধী কার্যক্রমে। ১৯৬৪ সালে ব্রাজিলে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো চরমভাবে নিগৃহীত হয়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক সরকারই ঔপনিবেশিক সেন্সর প্রথা তুলে দেওয়ার বদলে তাকে আরও জোরদার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তির আন্দোলন নির্মমভাবে দমনের ফলে কালো সংস্কৃতিতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানেও এই দশকে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।[৬] মূলত, বাঙালিত্ব বিকাশ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কীভাবে হয় তা তুলে ধরা এই অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয়।

পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা

ইংরেজি Culture শব্দটা ল্যাটিন Cultura শব্দ থেকে আগত। এর মূল অর্থ কর্ষণ বা উৎকর্ষ বাচক। Culture-এর বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে একটা দেশ বা জাতির সমগ্র জীবন-পদ্ধতি, চিন্তাধারা ও মননশীলতার প্রকাশকেই বুঝবো। এ-প্রকাশের রূপান্তর ঘটে-বিভিন্ন রূপে এর বিকাশ ঘটে থাকে। তবে, সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য কল্যাণময়তার দিকে। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই যুগোপযোগী রূপান্তর ঘটে থাকে। অনেক সময় এক সংস্কৃতির সাথে আর এক সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত রূপও বিভিন্ন দেশে দেখা গিয়েছে। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষকে Cultured বা সংস্কৃতিবান বলা হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে Culture মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষসাধন করে। একথা যেমন ব্যক্তি জীবনে, তেমনি জাতীয়জীবনেও সত্য। অর্থাৎ মানুষের উৎকর্ষরুচির বহিঃপ্রকাশকে সংস্কৃতি বলে। একটা জাতির উৎকর্ষ সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে তার সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, ভাস্কর্য, নৃত্যের মাধ্যমে। এগুলো সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।[৭] কিন্তু এই বিষয়গুলোর সাথে সাথে–ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং উন্নত পর্যায়ের রীতিনীতি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।[৮] অর্থাৎ কোনো একটি জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, সামাজিক উৎসবাদি, সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের জীবনের হাজারো উপকরণ ও উপাচার, তাদের ভাষা সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা নৃত্য ইত্যাদি মিলে তার সংস্কৃতি নির্মিত হয়। এসব কিন্তু সর্বদা সমান গুরুত্বপূর্ণ কিংবা সমান প্রভাব বিস্তারী হয় না। কোনো কোনো সময়ে সংস্কৃতির উপর্যুক্ত উপাদানসমূহের মধ্যে একটি বা বিশেষ কয়েকটি উপাদান অন্যান্য উপাদানগুলোর চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সার্বিক সংস্কৃতি নির্মাণে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী হয়ে উঠতে পারে। এর পেছনে কাজ করে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে কালপ্রবাহের বিশেষ কোনো লগ্নে সংস্কৃতিই হয়ে ওঠে একটি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের ও বিকাশের মৌল স্তম্ভ।[৯] বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমির বশবর্তী হয়ে কোনো বিশেষ উপাদানকে মুখ্য বলে চিহ্নিত করলে, সর্বাবস্থায় সর্বকালের জন্য কোনো একটি মাত্র উপাদানকে নিরঙ্কুশ অগ্রাধিকার দিলে, বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং তার ফলে জন্ম লাভ করে নানা অশুভ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। পাকিস্তানি নয়া উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী সেই কাজই করলেন। তারা সেদিন বাঙালিদের সংস্কৃতির প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের ভাষা, ভৌগোলিক পরিবেশ, ইতিহাস, দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যলালিত আচার-আচরণ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে শুধু ধর্মকে অতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শুধু ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্রীয় স্তম্ভ করে তারা পাকিস্তানি সংস্কৃতি ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ফলে দৃষ্টিভঙ্গি ঘোলাটে হয়, বিভ্রান্তি প্রশ্রয় পায়, অন্ধ গোঁড়ামি প্রবল হয়ে ওঠে। পাকিস্তান আমলে উপনিবেশবাদী শোষণের স্বার্থে, ইসলামের প্রতি ভালোবাসার কারণে নয়, শাসকচক্র সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালি সংস্কৃতির স্বাভাবিক স্রোতোধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। তাদের এইসব কর্মকাণ্ড বাঙালিকে আরও প্রতিবাদী করে তোলে, তার সাংস্কৃতিক চেতনায় একটা নতুন সংগ্রামী দ্যোতনা যুক্ত করে, এবং জাতীয়তাবাদী বিকাশকে তরান্বিত করে।[১০]

প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির নিজস্বতা রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক বিচার-বিশ্লেষণে আমরা দুটো মৌলিক ব্যাপার বিশেষ করে লক্ষ করবো–১. এদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও ২. এ দেশের মানুষ।

১. ... ভৌগোলিক দিক থেকে এর ওপর রয়েছে বাংলার জলবায়ু এবং পরিবেশের প্রভাব। এ প্রভাবকে অস্বীকার করা দেশের মানুষের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। যুগ যুগ থেকে এদেশের মানুষের জীবন-পদ্ধতিতে, চিন্তাধারায় এবং মানসিকতায় প্রকৃতি যে ছাপ রেখে গেছে এবং যাচ্ছে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নিশ্চয়ই তার প্রমূর্ত রূপ এবং চিহ্ন আমরা লক্ষ্য করতে পারি অতীত যুগ থেকে আমাদের সাহিত্যে সৃষ্ট গীতিপ্রবণতা, সাহিত্য সৃষ্টিতে সঙ্গীতের প্রাধান্য (বহুলাংশে সঙ্গীতের আকর্ষণেই সাহিত্যের সৃষ্টি), লৌকিক সাহিত্য ও শিল্প, লোক-নৃত্য, আধ্যাত্মিকতা-প্রীতি গ্রহাভিমুখী মানসিকতা (যা সাহিত্যেও স্থানলাভ করেছে), কর্ম-প্রবণতা অপেক্ষা ভাব-প্রবণতার আধিক্য ইত্যাদি বহু জিনিস প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে–যার মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ সর্বাবেক্ষা সক্রিয়।

২. ... এদেশের অধিবাসী অনেকগুলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্তর পার হয়ে এসেছে। রক্তের দিক থেকে অনার্য, আর্য, মঙ্গোলীয়, সেমীয়, নিগ্রো প্রভৃতি নানা জাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে এদেশের অধিবাসী এক ‘শংকর জনসমষ্টিতে’ পরিণত হয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অনার্য, আর্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম সংস্কৃতির ধারা এদেশের মানুষের ওপর বর্তেছে। শব্দের দিক থেকে ভাষায়, আচার, রীতিনীতি ও জীবন পদ্ধতিতে; মননশীলতার বিকাশের দিক থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এ-সমস্ত সভ্যতার নিদর্শন সুপ্রচুর। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আগমনের পর মুসলিম সংস্কৃতি ধীরে ধীরে সবার ওপরে প্রাধান্য লাভ করেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের জনজীবনের এক বিরাট অংশ ... সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী এবং আত্মমগ্ন। অতীতের সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতি এদের ভিতর থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।[১১]

এদেশে যে সাংস্কৃতিক জীবন বহু যুগ ধরে গড়ে উঠেছিল। মুসলমানরা তাকে উৎখাত করেনি বরঞ্চ শ্রদ্ধার সাথে তাকেও বেড়ে উঠবার পথ করে দিয়েছে।[১২]

বাঙালির দেশজ, লোকজ ঐতিহ্য এবং পাকিস্তানি দর্শন

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে তার মাটি, পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব থেকে প্রাণরস আহরণ করে একান্তভাবে দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্যলালিত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একটা সম্পূর্ণ বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সম্প্রদায়ভেদে, শ্রেণিভেদে, ধর্মভেদে, পেশাভেদে কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও জীবনযাপন রীতির ক্ষেত্রে ওপরে বিভিন্নতা থাকলেও মৌলস্তরে নিবিড় ঐক্য ছিল। ব্যাপক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে তলের দিকে বিদ্যমান ঐ মৌলিক ঐক্যই তখন সমাজকে বেঁধে রেখেছিল, তার সুস্থতা সুনিশ্চিত করেছিল এবং নানা বিচিত্র ও আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সম্ভব করে তুলেছিল। বাঙালির লোকসংগীত, লোকগাথা, লোককাব্য, বাউল সাধনা ও গ্রামীণ মেলাসহ নানা লোকউৎসবের মধ্যে। ধর্মীয় উগ্রতা ও রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি-সৃষ্টি ভেদবুদ্ধি তখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি।[১৩]

বাংলাদেশে ইসলাম যে শুধু আরবীয়-পারস্য আদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা নয়, এদেশের সংস্কৃতির সাথেও হাত মিলিয়ে ছিল। ফলে সংস্কৃতিতে আসে এক অপূর্ব সমন্বয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলাম বিশ্বে যে দেশে গিয়েছে সেই দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে এবং তাকে নিজের করে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজকে সজীব করে তুলেছে। এই সমন্বয়ে পুরোভাগে ছিলেন মুসলিম সম্রাটগণ। গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের নাম এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। তিনি মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং দেশীয় আদর্শকেও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সুলতান সিকান্দার শাহের সময় রাজানুগ্রহ লাভ করেন চণ্ডিদাস।[১৪] চণ্ডিদাস লিখলেন, ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’ গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করে। মুসলমান সম্রাটগণই শুধু যে সাংস্কৃতিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলেছে তা নয়, মুসলিম জনসাধারণের মধ্য থেকেও শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে। একদিকে সম্রাটগণের প্রেরণায় সাহিত্য গড়ে উঠেছে–আর একদিকে মুসলিম কবিরা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। মুসলমান সম্রাটগণ, কবি এবং দরবেশগণ এ কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন

যে, 'কোন এক দেশে নতুন আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শুধু মত প্রচার বা সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত লোকসংখ্যা বাড়িয়ে তুললেই চলবে না, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতির মধ্য দিয়েই তাকে জনমনে উজ্জীবিত করে রাখতে হবে।'[১৫] সুলতানি আমলে শাসদকের শুভদৃষ্টি যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপায়ণের পশ্চাতে ছিল, এ সময়ের সৃষ্টি সাহিত্যে সুলতানদের সহয়তা তারই প্রমাণ বহন করে।[১৬] সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যযুগীয় কবি আবদুল হাকিম উদার মানবতাবাদী ধর্মীয় সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সকল ভাষার প্রতি, সকল জাতের প্রতি সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সৃষ্টিকর্তা সকলের ভাষা বুঝে। তাই ভাষার বৈষম্য নিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

যেই দেশ যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্যে বুঝে প্রভু আপ নিরঞ্জন॥
সর্ববাক্যে বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী।[১৭]

এয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী এই ছয় শতাব্দীব্যাপী এদেশে যে সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠেছিল, মুসলমানরা ছিল তার কর্ণধর–মুসলমান কবিরা ছিলেন তার প্রধান অংশীদার। এধারা অব্যাহত ছিল উনিশ শতকেও। বাউল কবির লালন শাহের লেখায় তা ফুটে ওঠে বার বার। তিনি লিখলেন :

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন ভাবে, জাতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারী লোকের কি হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতেয় প্রমাণ, বামনী চিনে কিসে রে।
কেউ মালা কেউ তসবী গলায়, তাইতে কে জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায় জেতের চিহ্ন রয় কারুরে।[১৮]

মানুষের পরিচয় শুধু মানুষ। কোনো ধর্মীয় আবরণ দিয়ে তাতে কোনো পার্থক্য করা যায় না। প্রাচীনকাল থেকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীতে এসে কাজী নজরুল ইসলামের লেখার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ঐ সমন্বিত ঐতিহ্যেরই একটি বিশেষ উদ্ভাসন।[১৯]

কিন্তু ইংরেজদের এই উপমহাদেশে প্রথমে বণিক বেশে আগমন, পরে রাজদণ্ড হাতে বাংলায় তাদের প্রভুত্ব বিস্তার, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, সীমিত নগরায়ণ, পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ প্রভৃতি তার সকল দোষগুণ নিয়ে বাঙালি বুর্জোয়ার উদ্ভবের সূচনা হলো। এর ফলে শিক্ষিত নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালির চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের পথ বেয়ে বাঙালি সংস্কৃতির একটা রূপান্তর ঘটলো।[২০] রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক কারণে গোটা উনিশ শতক জুড়ে, এমনকি বিশ শতকেরও কিছুটা পর্যন্ত, উপর্যুক্ত রূপান্তর বাঙালি মুসলমানের জীবনকে ইতিবাচকভাবে স্পর্শ করলো না। ফলে এ যাবৎ লোক-ঐতিহ্যভিত্তিক সমন্বিত বাঙালি সংস্কৃতির যে ধারা গড়ে উঠেছিল তার বিকাশের পথে বাধার প্রাচীর তৈরি শুরু করলো।[২১]

ইংরেজদের সেই ধারা অব্যাহত থাকে পাকিস্তানেও অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানি সরকারি নীতি কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের লক্ষণগুলো ক্রমেই তীব্রভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তার বিকাশের প্রথম যুগে মানুষ সূদূর অতীত থেকে প্রেরণা প্রয়াসী হয়ে ওঠে। বাংলার প্রকৃতি, ঐতিহ্য, লোকসংগীত, লোকগাথা, লোককাব্য, বাউল সাধনা ভিত্তি করে এ সময় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। শুধু সমাজের অগ্রসর শ্রেণি যে এই চেষ্টা করেছে তা নয়, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষজন। তারা অগ্রসর গোষ্ঠীর গৃহীত পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। তার প্রমাণ জহির রায়হান পরিচালিত 'বেহুলা' সিনেমাটি দেখ হলে সাধারণ মানুষের ঢল নামে। কারণ, চাঁদসদাগর-বেহুলা কাহিনি এই বাংলাদেশের নদীমাতৃক দেশের প্রতিচ্ছায় হয়ে ওঠে। তাই ভেলায় ভেসে চলে বেহুলা। বাঙালির মনের কাছে এর আবেদন সম্প্রদায়ের গণ্ডীভুক্ত নয়। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খৃস্টান সকলেই অতীতের এই কাহিনির মধ্যে নিজেদের স্বরূপ খুঁজে পায়। এক কথায় বাঙালির মনে নিজের স্বাজাত্যে ফুটতে লাগল। তাই পদ্মপুরাণের কাহিনি মুসলমান পরিচালক এবং দর্শকদের

ঐভাবে আকর্ষণ করে। পাকিস্তান সরকারের অবশ্য এসব জানার কথা নয়। বাঙালিরা এই ধারা পুরো পাকিস্তান আমলে অব্যাহত রাখে। বাঙালি বছরের প্রথম দিন পয়লা-বৈশাখের জাঁকজমক ঘটা করে উৎসবের আয়োজন করে এবং অজস্র দর্শক-সংখ্যার বৃদ্ধির মাধ্যমে তা নিজের করে নিল। মোনায়েম খানের কুখ্যাত শাসনও সেদিকে জোরজবরদস্তি খাটাতে সাহস পায় নি। বাঙালি সবকিছুতে তার ঐতিহ্য ও ভাষাকে ব্যবহার করা শুরু করে। এমনকি বাংলাদেশের গাড়ির নম্বর বাংলায় ব্যবহার শুরু হলো। স্বৈরতন্ত্র এখানেও চুপ রইল। কারণ, তাদের জানা ছিল, বাধা দিলে তা টিকবে না। নতুন পল্লীর নামকরণ একই খাতে বইতে লাগল। পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সরকার নিজস্ব ইমারৎ এবং পল্লীর নাম রাখা শুরু করলো আরবি ও ফার্সিতে। যথা–গুলফেশান, কাহ্‌কেশান ইত্যাদি। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের পর নাম বদলাতে লাগল। এবার সরকারি ইমারতের নাম হলো–সাগরিকা, অরুণিমা, নীহারিকা আর নতুন পল্লী একদম বাঙালি মনের প্রতিধ্বনি–বারিধারা, বনানী, উত্তরা ইত্যাদি। এইসব প্রবণতার দিকে বাঙালিদের ঠেলে দেওয়ার মূলে ছিল, সরকারি নীতি।[২২]

বাঙালি ক্রমশই স্বাজাত্যবোধের দিকে ঝুঁকতে থাকে। ঐক্যের প্রবণতা সাহিত্য ও সংগীতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তাই রবীন্দ্রসংগীতের প্রসার বা রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকে পড়া বিচিত্র নয়। শাসকশ্রেণি প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলো। সোজাসুজি রবীন্দ্রনাথকে নাকচ করা যায় না। সুতরাং ভারত-বিদ্বেষ তথা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্বেষের আড়ালে ঘোষণা করা হলো–পাকিস্তানি সাহিত্যের আলাদা স্বাতন্ত্র্য আছে। এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিই সত্যিকার সাহিত্যিকের জাতীয় কর্তব্য।[২৩]

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ খণ্ডিত হলো। বাংলাও দ্বিখণ্ডিত হয়, একইসাথে বাংলার রাষ্ট্রীয় ও নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাঙালি বিভক্ত হয়ে গেল, তবে সাংস্কৃতিক বিভাজন রাজনীতির সহজ সূত্র ধরে ঘটে না, তার একটা নিজস্ব যুক্তি থাকে। কিন্তু পাকিস্তানের নয়া উপনিবেশবাদী শাসককুল সে সত্য স্বীকার করেন নি।[২৪] পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকেও জারিগান, মুর্শিদি গানের সঙ্গে কৃষ্ণলীলা, রামযাত্রা, সীতার বনবাস এসব একসাথে চলতো। কিন্তু শাসকদের সাম্প্রদায়িক নীতি ও তার পক্ষে শক্ত অবস্থানের জন্য তা বাধা গ্রস্ত হয়।[২৫] শোষণের স্বার্থে তারা পশ্চিম বাংলার বাঙালি ও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য স্থায়ী পার্থক্য গড়ে তুলতে চান। সংস্কৃতির একমাত্র নিয়াময় শক্তি হিসেবে তারা তুলে ধরলেন ধর্মকে। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে নানাভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হলো। তারা বলতে চেষ্টা করলেন যে বাঙালি সভ্যতা বলে কিছু নেই, আছে হিন্দু সভ্যতা ও মুসলমানের সভ্যতা।[২৬] অর্থাৎ আমরা একথা বলতে পারি, বাঙালির সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইত্যাদির বিপরীতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে দাঁড় করায়। এই দুই আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্বে অন্তিমে বাঙালিত্বের জয় হয়।

রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল ধারার দ্বন্দ্ব

দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা থেকেই শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। প্রথমে ভাষাকেন্দ্রিক এবং পরে রাজনীতি নিয়ে।[২৭] ১৯৫২-এরপরও বাঙালির ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয়া উপনিবেশবাদী শাসক-শোসকদের চক্রান্ত থেমে যায় নি। শাসকগোষ্ঠী মেয়েদের কপালে টিপ পরা, উৎসব অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, পয়লা বৈশাখ, বর্ষবরণ, নবান্ন উৎসব প্রভৃতি পালন করা হিন্দুয়ানি বলে চিহ্নিত করে। এর মধ্যে যে হিন্দুত্ব বা মুসলমানিত্ব কিছু নেই, এগুলো যে নিতান্তই বাঙালিত্বে বহিঃপ্রকাশ, বাঙালি জীবনধারার সহজ অংশ, এ সত্যটি তারা সচেতনভাবে উপেক্ষা করে।[২৮] কিন্তু প্রগতিশীল বাঙালি সংস্কৃতিকর্মীরা প্রবলভাবে শাসকগোষ্ঠীর এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সঙ্গে সাধারণ জনতা সহযোগিতা করতে থাকে। মেয়েরা টিপ পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করেন। তৎকালীন সময়ে এ ঘটনা সামান্য মনে হলেও তা ছিল অসামান্য।[২৯]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারগুলো পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনার স্বরূপ বা সাংস্কৃতিক চেতনার প্রকৃতি কখনো বোঝার চেষ্টা করে নি। বরং বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চাকে বরাবরই রাজনৈতিকভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, আরোপ করা হয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা।[৩০] পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে অস্বীকার করে 'এক ধর্ম, এক রাষ্ট্র, এক

জাতি'-র যুক্তি দেখিয়ে পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষণ ও দমন করার এবং বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে মুছে দিয়ে পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতি প্রবর্তন করার চেষ্টা চালিয়ে ছিল।[৩১]

ফলে বাঙালিকে প্রতিরোধ করতে হয় এবং স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশের বা এ অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক নিজস্বতা ছিল। এই নিজস্বতায় যখন শাসকগোষ্ঠী আঘাত করলো, তখন প্রতিরোধ স্বভাবিকভাবেই এসেছে। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *যখন সময় এল* গ্রন্থের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> ...সংস্কৃতির বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য একটি জাতিকে নতুন নতুন চৈতন্যে উদ্বেল করে। পাকিস্তান আমলে সমগ্র পাকিস্তানে একটি সাংস্কৃতিক একতা নির্মাণের চেষ্টা হয়েছিল। আমি তার বিরুদ্ধে ছিলাম এবং আমরা বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখায় আমি সে কথা বলেছি। সকল শূন্যতার মধ্যে একটি ঐক্যবোধ আছে, কিন্তু সে ঐক্য আমি চাইনি। পৃথিবীর সকল মরুভূমি একই রকম, একই ধরনের তাপ, একই ধরনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর সকল মরুভূমি একই স্বভাবের বৃত্তে আবদ্ধ। কিন্তু যেখানেই সজীবতার প্রশ্ন আসে সেখানেই বৈচিত্র্য এবং পার্থক্যের চিহ্ন ধরা পড়ে। আমরা পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের মানুষকে এই বৈচিত্র্য মেনে নিতে বলেছিলাম। কিন্তু পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই বৈচিত্র্য মেনে নিতে সাহসী হয়নি। যার ফলে বাংলাদেশের মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন করতে হল।[৩২]

ইসরাইল খান এ প্রসঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনা করে বলেছেন, 'শাসক-জাতির একটি স্বভাব হচ্ছে তার অধীন জাতির আত্মচেতনার এবং সংস্কৃতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা এবং তাকে নিজস্ব সংস্কৃতির আজ্ঞাবহ দাস করার প্রয়াস পাওয়া।'[৩৩]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরস্পরবিরোধী ধারা তৈরি করেছিল। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও বাঙালির সাংস্কৃতিক শক্তির প্রয়োগ নিয়ে বলেন,

> সংস্কৃতির বিশেষ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য রূপান্তরমূলক শক্তি আছে এবং সাংস্কৃতিক ব্যবহারবিধি ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির ভূমিকা আছে সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। এই রূপান্তরণ শক্তিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র ইসলামি মতাদর্শের মধ্যস্থতায় ঔপনিবেশিকবাদে করেছিল পর্যবসিত, আবার একই রূপান্তরণ শক্তিকে বাঙালিসমাজ সেক্যুলার মতাদর্শের, মধ্যস্থতায় দিয়েছিল ঔপনিবেশিকবাদ বিরোধী ভূমিকা। সংস্কৃতির রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপ ঔপনিবেশিকবাদ শক্তিশালী করে তুলেছিল, অন্যপক্ষে ঐ সেন্সরশিপ বিরোধী ভূমিকা সাংস্কৃতিক এবং নান্দনিক ক্ষেত্র থেকে বিস্তৃত হয়েছিল সমগ্র সমাজে।[৩৪]

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারগুলো সংস্কৃতির শক্তিকে ব্যবহার করে পূর্ব বাংলা ও বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ঔপনিবেশিকবাদে পরিণত করেছিল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাঙালির সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ওপর রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে প্রতিনিয়ত। পাকিস্তান সরকারের এই কার্য ও বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী এসব অপতৎপরতাকে সফল করার জন্য সক্রিয় ছিলেন পাকিস্তানমনস্ক এ দেশীয় লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ও তাদের কতিপয় সংগঠন। এই সংগঠনগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় উদার ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ রোধ করা। অন্যদিকে সকল সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে প্রগতিশীল ও উদারমনস্ক বাঙালি লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীগণ এবং তাঁদের সংগঠনগুলো পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সর্বদা সক্রিয় হন। তাঁদের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনা ও কর্মতৎপরতায় গড়ে ওঠা বহুমাত্রিক আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রামে উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রবল ভূমিকা রেখেছে। অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রক্ষণশীল ধারা তাকে সর্মথন করে ও প্রগতিশীল ধারা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বস্তুত বিভিন্ন সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎপতার মাধ্যমে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল এই দুই ধারা পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তুলেছিল। এই অংশ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়েছে।

রক্ষণশীল ধারা

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও রক্ষণশীল বাঙালি রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী শুধু থেকেই তাদের আদর্শের দেশ গঠনের জন্য সচেষ্ট হন। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তারা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে তৎস্থলে উর্দু ভাষা, সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও পাকিস্তানি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান জন্য নানা পন্থা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্য বাস্তায়নের

জন্য রক্ষণশীল একদল কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী 'তমদ্দুন মসলিশ', 'রওনক সাহিত্য সংস্থা', 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রভৃতি সংগঠনের ব্যানারে একত্রিত হন। আবার অনেকে পাকিস্তান 'রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪০) ও 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৪২)-এর আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত এবং ধর্মকে যারা সংস্কৃতির মুখ্য নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[৩৫] পাকিস্তানবাদী এ ধারার লক্ষ্য ছিল 'সমগ্র পাকিস্তান' চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগে সহায়তা করা। ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী সরকারি-বেসরকারি বেশ কিছু পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা এ আদর্শে প্রচারণাও চালায়। পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য–দৈনিক *আজাদ*, সাপ্তাহিক *সৈনিক*, *মাহে নাও*, এবং মাসিক *মোহাম্মদী*, *নও বাহার*, *তহজিব*, *দ্যুতি* প্রভৃতি। এভাবে পাকিস্তানবাদী দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান রক্ষণশীল শক্তি পূর্ব বাংলায় এক ধর্মীয় সংস্কৃতিভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এ জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বেশ কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এজন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর প্রণোদনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল–বিএনআর, প্রেস ট্রাস্ট, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড (পূর্বাঞ্চল শাখা) ইত্যাদি সংস্থা। একইসাথে প্রবর্তন করা হলো–আদমজী, দাউদ ও অন্যান্য পুরস্কার এবং উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা। ফলে অনেকক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের শৃঙ্খলিত ও বেতনদাসে পরিণত করার প্রচেষ্টায় পাকিস্তানি সামরিক সরকার সাফল্য অর্জন করে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা-বিকাশের গতিতেও সরাসরি বাধা সৃষ্টি করে।

প্রগতিশীল ধারা

বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। বিশ্বশতকের গোড়ার দিক থেকে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সুস্পষ্ট গতি লাভ করে। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে সেই ধারার পাশাপাশি পূর্ব বাংলায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা শিখা গোষ্ঠীর 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' ও 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী' প্রভৃতির তৎপরতা এখানে প্রগতিশীল মানসগঠন ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। তার প্রভাব আমরা দেখতে পাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়। পূর্ব বাংলার মানুষের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ও মুক্তিসংগ্রামে অন্যতম হাতিয়ার ছিল সংস্কৃতিক আন্দোলন। বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে সাংস্কৃতিকর্মীরা কখনো বিচ্যুত হননি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন,

> ১৯৪৭-এরপর থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীরা একটি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তারা কখনও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। বিচ্যুত হয়েছেন রাজনৈতিক কর্মীরা। এ ভূখণ্ডে যত আন্দোলন তার শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মীদের দ্বারা। পরে রাজনৈতিক নেতারা তাতে যুক্ত হয়েছেন।[৩৬]

তবে পাকিস্তান আমলে বাঙালির সংস্কৃতির সংগ্রামের পথ মসৃণ ছিল না। প্রতিক্ষেত্রেই শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে প্রতিবন্ধকতা। বাংলার উদার ও অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে পাকিস্তানবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধ। পাকিস্তানবাদী চক্রের এই প্রচেষ্টাকে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিককর্মীরা বাংলাদেশের জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিহত করেছে।[৩৭]

ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পটভূমি

ষাটের দশকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগঠনের যে বিকাশ হয় তারা সূচনা হয় পঞ্চাশের দশকে। তাই ষাটের দশককের সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা বুঝতে হলে তাই পঞ্চাশের দশককে জানতে হবে। তাই পটভূমি হিসেবে সময়ক্রমানুয়ী পঞ্চাশের দশক সম্পর্কে আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো :

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে বা পরে এর নেতারা দেশটির ভষিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, অর্থনৈতিক-সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পথ ও পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারেন নি। বস্তুত তেমন কোনো পরিকল্পনা তাঁদের ছিলও না। পাকিস্তান আন্দোলন পর্বে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বাঙালি মুসলামান লেখকদের কেউ কেউ পাকিস্তান

দাবির সমর্থনে বই-প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখলেও, তাতে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার জবাবে দেশভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতার দিকটিকেই মূলত গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়। এসব অধিকাংশ রচনায়ই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপরেখা সম্পর্কে কোনো আলোচনা স্থান পায় নি। সাধারণভাবে শুধু বলা হয়, ইসলামের ন্যায় ও সাম্যের নীতির ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রের সমাজ-অর্থনীতি পরিচালিত হবে এবং হিন্দু প্রাধান্য থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে মুসলমানরা সেখানে স্বাধীন পরিবেশে 'নিজস্ব তাহজিব-তমদ্দুনে'র চর্চা করতে পারবে।[৩৮] ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে ধারনার অভাবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র পঁচিশদিন আগে (২০ জুলাই ১৯৪৭) দৈনিক *ইত্তেহাদ*-এ প্রকাশিত তাঁর রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব প্রবন্ধে মাহবুব জামাল জাহেদী বাংলাকে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক ভাষা করার দাবি জানিয়ে লেখেন:

> এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হইলে পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত এই রাষ্ট্রের যোগসূত্র কি প্রকারে স্থাপিত হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর প্রধানতঃ নির্ভর করে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর। কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকিবে সেই বিষয়টি পরিস্কার হইলেই এই প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। বর্তমান ব্যবস্থা মতে অর্থাৎ দেশরক্ষা, অর্থ বিভাগ এবং পররাষ্ট্র বিভাগের উপর যদি কেন্দ্রের কর্তৃত্ব থাকে, তবে অসুবিধা বিশেষ কিছু থাকিবে না।[৩৯]

রাষ্ট্রের কোন কোন্ বিষয়ে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব থাকবে, সে-প্রশ্নের মীমাংসা পাকিস্তানে শেষাবধি হয় নি।

পূর্বপাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার সময় দুইটি বিষয় মনে রাখতে হবে–এক. পূর্ব পাকিস্তান নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানি রাষ্ট্রের অংশ, দুই. এদেশের মানুষের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অতীত আছে।[৪০]

পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদিকে অস্বীকার করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য–প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। সরকারের প্রণোদনায় শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা পাকিস্তানি মতাদর্শ ও ইসলামি তমুদ্দুনের পক্ষে কাজ করে। সরকারি মতাদর্শের সমর্থনে এবং ইসলামি তমুদ্দুনের পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী সংস্কৃতিকর্মীদের বেশ কিছু সম্মেলনের আয়োজন করে। ১৯৪০ সালে কলকাতায় 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকাগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি', ১৯৪২-৪৩ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এবং ১৯৪৭ সালে 'তমদ্দুন মজলিশ' ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনগুলোর ধারার, মাত্রার পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বৈচিত্র্য বা বৈপরীত্য থাকলেও মোটামুটিভাবে প্রগতিশীলতা, বামপন্থি চিন্তাধারা এবং কমিউনিস্ট-প্রভাবিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করেছিল।[৪১]

শুধু তাই নয়, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাসকগোষ্ঠী প্রগতিশীল যে কোনো আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। প্রগতিশীল, বামপন্থি বা সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোকদের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই রুষ্ট হওয়ায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে প্রগতিশীল লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের কার্যক্রমে শূন্যতার সৃষ্টি হয়।[৪২] তাই পাকিস্তানে প্রথম যে রাজনৈতিক আন্দোলনের আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আগ্রসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এই প্রতিরোধ আন্দোলন বাংলাভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতির পক্ষে প্রথমে হয়েছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে। দেশভাগের পর কলকাতা থেকে আগত প্রগতিশীল সাহিত্যিক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীদের একটা বড়ো অংশ চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছিলেন। কারণ তখন কলকাতার সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ভালো। তাছাড়া তখন চট্টগ্রামে যেসব প্রাগ্রসর ভাবুক চিন্তক কর্মগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় তাদের অধিংকাংশই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য।[৪৩] চট্টগ্রাম রেলওয়ে বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন সক্রিয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবেও বন্দরনগরী চট্টগ্রাম ছিল উন্নত। এসব কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্য-শিল্পের প্রাগ্রসর ধারার চর্চা চট্টগ্রাম শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ক্রমে তা সারা পূর্ব বাংলায় ব্যাপ্তি লাভ করে।[৪৪] ১৯৪৭ সংলগ্ন সময়কালে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক উৎসাহী কর্মী আজিজ মিছির (সিরাজুল ইসলাম) লিখেছেন :

চট্টগ্রামের 'রেলওয়ে ইনস্টিটিউট বা ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা প্রাণকেন্দ্র ছিল। রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগে তখস কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং সমর্থক ছিল অনেকেই। ...প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বীজ এই ...ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করেই রোপিত হয়। ...একটা কথা আজ ভাবতে অবাক লাগে যে, যখন পূর্ব-পাকিস্তানের কোন জায়গায়–এমনকি ঢাকায়ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা ছিল না–সেই সময়ে চট্টগ্রামে প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়।[৪৫]

রাজধানী ঢাকায় আগত সংস্কৃতি-কর্মী ও লেখক-সাহিত্যিকরা ক্ষমতা দখল এবং দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থ-সংরক্ষণে তৎপর ছিলেন। প্রগতির সপক্ষের তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা শাসকদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতনের মুখে সুবিধা পারছিলেন না। তবু তাঁরা কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[৪৬] তারা কিছু প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীর সমর্থন পেয়ে শেষ পর্যন্ত এ ধারাকে সচল করতে সক্ষম হন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও প্রবীণ সংবাদিক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে সামনে রেখে তাঁরা ১৯৪৭-৪৮ এবং ৫২-৫৩ নাগাদ ঢাকায়ও একটি সুসংগঠিত সাংস্কৃকি কার্যক্রম চালু করেছিলেন, যা ১৯৫৩-৬৪ থেকে জোরদার হয়।[৪৭]

মাহবুবউল আলম চৌধুরী অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার নিরপেক্ষ বক্তব্য নিয়ে 'সীমান্ত' নামে কমিউনিস্টভাবাপন্ন একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশে প্রথমে উদ্যোগী হন ১৯৪৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর নভেম্বর মাসেই। এই পত্রিকাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী–'সাংস্কৃতিক বৈঠক'। মাহবুবউল আলম চৌধুরী লিখেছেন:

প্রগতিগোষ্ঠী ও সাহিত্য সংঘ যখন সরকারের হামলায় ভেঙ্গে গেল তখন সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকরা এই 'সাংস্কৃতিক বৈঠক'-এ এসে জমায়েত হলেন। তাঁরা গল্প কবিতা পাঠ করতেন। আহমদুল কবির, সানাইল হক, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শওকত ওসমান প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা এতে যোগ দিতেন।[৪৮]

তখন ইসলামের দোহাই দিয়ে দেশে প্রতিক্রিয়াশীলচক্র সমস্ত প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। একে প্রতিহত করতে হলে শুধু সাংস্কৃতিক সংঘ দিয়ে রোধ করা যায় না। একটা পূর্ণাঙ্গ সংগঠনের প্রয়োজন। কিন্তু তখন কোনো সংঘটিত পার্টি ছিল না। এরপর 'সীমান্তর' সাংস্কৃতিক বৈঠককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ'।[৪৯] এই সংগঠনটি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে জনমত গঠিত হয় এবং তা ছড়িয়ে পরে দেশব্যাপী। দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকায় একটি প্রগতিশীল সাহিত্যিক পরিবেশ সৃষ্টি হলেও পাকিস্তান-প্রাপ্তির পরে ইসলামি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সাম্রাজ্যবাদী নয়া উপনিবেশবাদীদের জোর-জুলুম-নির্যাতন নিপীড়নমূলক আগ্রাসনের ফলে প্রগতিশীল কমিউনিস্ট কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ প্রগতিশীল সংস্কৃতির ধারায় প্রতিনিয়ত আসে প্রতিবন্ধকতা। অনেকেই কারাগারে এবং ভারতে চলে যাবার ফলে প্রগতির ধারা সংগঠিত কার্যক্রমটি বিশৃংখল-ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেখানে বিভাগ পূর্ববর্তীকালে অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধিতাকারী নব্য-কৃত্রিম-পাকিস্তানি ইসলামপন্থি সংস্কৃতির ধারকদের কার্যক্রম জোরতালে চলছিল।[৫০] এরই মধ্যে ১৯৪৮ সালের ৩ ডিসেম্বর 'ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র কাউন্সিলে অজিত গুহকে সভাপতি এবং মুনীর চৌধুরীকে সম্পাদক নির্বাচন করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালে ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের এক বৈঠকে একমত প্রকাশ করা হয়, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রগতি সাহিত্য বিরোধী এবং প্রকৃত গণতন্ত্র ও গণসাহিত্যের পরিপন্থি। তাই লেখক সংঘের সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৫১]

মাহবুবউল আলম চৌধুরী প্রগতিশীলদের সংগঠিত করা প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন,

১৯৫০ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে দাঙ্গা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে দাঙ্গা-বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাবেশ করার জন্য চট্টগ্রামের মাদার বাড়ী ক্লাব, নন্দন কাননের শক্তি সংঘ, দেওয়ান বাজারের সংঘ প্রভৃতি ক্লাব সংগঠিত করে জেএস সেন হল প্রাঙ্গনে সমাবেশের আয়োজন করে মানুষকে সচেতন করে তোলা হয়।[৫২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক 'সংস্কৃতি সংসদ' ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী গণচেতনা' ও দেশাত্মবোধক নাটক-সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যতিক্রমী জীবনঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করলেও তা ছিল সীমিত।[৫৩] সংস্কৃতি সংসদ-এর তৎপরতা প্রথম দিকে সীমাবদ্ধ ছিল নাট্যাভিনয়ে[৫৪]। পরে এ সংগঠনের তৎপরতায় দেশাত্মবোধক ও গণসংগীতের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫৫] সংগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কে আনিসুজ্জামান বলেন, 'গোড়া থেকেই সংস্কৃতি সংসদ ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী অসাম্প্রাদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন।'[৫৬] 'একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনে' বাংলা ভাষা-ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করাতে, পরবর্তীকালে বাংলাভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে এদেশের মানুষ সচেতন হওয়ার ফলে ক্রমে তা পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দেলনের কেন্দ্র বিন্দু হওয়ায় সংস্কৃতি-সংসদের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল সারা প্রদেশে।[৫৭]

একইসাথে রক্ষণশীল ধারা কার্যক্রমও চলতে থাকে। নিখিল পাকিস্তান চিত্র প্রদর্শনী (ঢাকা) ও তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ১৭-২০ অক্টোবর-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল : 'ইসলাম রাষ্ট্রের স্বরূপ' অন্বেষণ এবং আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যাবলির তুলনায় ইসলাম যে শ্রেষ্ঠতম মানব কল্যাণ আদর্শ তা বুঝিয়ে দেওয়া।[৫৮]

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ

১৯৫২ সালের শেষের দিকে দিকে প্রগতিশীল লেখক ও সাহিত্যিকদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর আবির্ভাব হয়। এর সভাপতি ছিলেন ড. কাজী মোতহার হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহ্মদ।[৫৯] এই সংগঠনের নিয়মিত বৈঠক হতো *সওগাত* কার্যালয়ে, অন্যত্রও হতো। প্রবন্ধ, কবিতা গল্প ইত্যাদি পাঠ করতেন পূর্ব নির্ধারিত লেখক। সাহিত্য সংসদের এসব সভায় হাসান হাফিজুর রহমান, আতোয়ার রহমান, আনিসুজ্জামান, আবদুল্লাহ আল-মুতী, সরদার জয়েনউদ্দিন, খালেদ চৌধুরী, মুস্তাফা নূরুল ইসলাম ও আবু জাফর শামসুদ্দীনসহ প্রমুখ উপস্থিত থাকতেন।[৬০] পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতি নির্মাণের উদ্যোগ প্রতিহত করার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই একটি সংগঠনে একত্রিত হয়েছিলেন ঢাকার প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীরা।[৬১] এর পূর্বে সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল ধারার সংস্কৃতিসেবী ও চিন্তাবিদদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না।[৬২] সাহিত্য সংসদের সহযোগিতায় কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* (১৯৫৩) সংকলনগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সামাজিক-পরিবর্তনের আশায় কিছু সাহিত্য-পত্রিকা তখন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বৈরী-পরিবেশের কারণে তাও দু-চারটি সংখ্যা প্রকাশের পরপর বন্ধ হয়ে যায়।

'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর কোনো কোনো চিন্তক-সংগঠক কর্মকর্তার বিবেচনায় পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ত্রিশের দশকে 'সওগাত সাহিত্য মজলিশের' ধারাবাহিক উত্তরসূরি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও বটে।[৬৩] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন 'হাসানের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

> সে সময়ে এখানে (পূর্ব পাকিস্তান/ঢাকায়) কোনো সক্রিয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ছিলনা...এমন দুর্দিনে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে হাসান হাফিজুর রহমান কয়েকজন তরুণসহ...সওগাত কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে সওগাত সাহিত্য মজলিশের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ....সওগাত কার্যালয় সংলগ্ন (৬৬ লয়াল স্ট্রীট, ঢাকা) একটি প্রশস্ত ঘর ও সম্মুখে খোলা জায়গা ছিল। স্থির হলো ওখানেই...তাঁদের নব প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর কাজ আরম্ভ হবে। ...হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকার কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক দলে দলে এসে ভীড় জমালেন সওগাত কার্যালয় সংলগ্ন তাঁদের জন্য প্রদত্ত স্থানটিতে।[৬৪]

হাসান হাফিজুর রহমান নিজে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' সম্পর্কে বলেছেন :

> আমরা ধূমকেতুর মতো তেজে প্রখর, কিন্তু নিরাবলম্ব। ঠাঁই ছিল না, তাই আমরা সংগঠিতও ছিলাম না। অসংগঠিত আমরা প্রবল উত্তেজনায় অস্থির...কিন্তু সংহত নই বলে শক্তি ও তাৎপর্যকে অপরের অনুভবে তীব্র করে তুলতে পারছিলাম না। সেই

সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ভেঙ্গে গেছে। তরুণ সাহিত্যিকদের নতুন চেতনা নতুন বক্তব্যের সংগঠিত মাধ্যমের খোঁজে আমরা ছটফট করছি। সময়টা ১৯৫২ সাল, ভাষা আন্দোলনের তুমুল মুহূর্ত। সেই সময় আমি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) হঠাৎ সওগাত প্রকাশনালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি....(সওগাতকে কেন্দ্র করে) তরুণ সাহিত্য-কর্মীদের ভীড় জমতে লাগলো...নাসিরউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সওগাতের প্লাটফরমে একত্র হয়েছিলাম এটাই বড় কথা।[৬৫]

এই সংগঠনের সঙ্গে যে সকল ব্যক্তি ছিল তারা মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। তারা কেউ কেউ সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন; অনেকেই বুর্জোয়া উদারনীতিতে। নিয়মিত অধিবেশনের অতিরিক্ত বিশেষ সভাও তাঁদের হতো। ১৯৫২-৫৩ সালে ম্যাক্সিম গোর্কি, ১৯৫৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্রনাথের ওপর অনুষ্ঠানগুলো বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল। এই সংসদের প্রধান কর্ম ছিল ১৯৫৪-তে অনুষ্ঠিত ঢাকার সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন।[৬৬]

'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) সাহিত্য সংকলন প্রকাশের ঘটনা এ দেশের সাংস্কৃতিক জগতে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল।[৬৭] চাষের জমির বিক্রি করে সংকলনটি প্রকাশের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। প্রকাশের (মার্চ ১৯৫৩) অব্যবহিত পরেই এটি তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। পরে ১৯৫৬ সালের দিকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু আর্থিক ক্ষতি পোষায়নি।

১৯৫৫ সালে বাঙালির সংস্কৃতি-জগতে পর পর দুটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এক প্রবল জোয়ার সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। এর একটি, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী রশীদ আহমদ চৌধুরী ওরফে বুলবুল চৌধুরীর (১৯১৯-১৯৫৪) স্মৃতিতে বুলবুল ললিত কলা একাডেমির (বাফা) প্রতিষ্ঠা (১৯৫৫) এবং অন্যটি 'বাংলা একাডেমি'র (১৯৫৫) উদ্বোধন। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ১৯৪৮-৪৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন এর প্রথম অধিবেশনের মূল সভাপতির অভিভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের 'একুশ দফার' ষোড়শ দফায় বলা হয়েছিল:

বর্ধমান হাউসকে....বাঙলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার প্রেক্ষিতে ফ্রন্ট সরকার (পূর্ব বাঙলার) একাডেমী প্রতিষ্ঠার কাজ বাস্তবায়ন করলে বাঙলা ভাষার জয় যাত্রা আর এক ধাপ উত্তরণ ঘটে।[৬৮]

সরকার এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের কাজ করতে চেয়েছে এবং এর পরিচালকগণ পাকিস্তানবাদী দৃষ্টিভঙ্গির হওয়ায় তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন।[৬৯] বাংলা একাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার-এর বক্তৃতা থেকে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

আমি স্বীকার করি, যে-কোন ষ্ট্যান্ডার্ড-ভাষা উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া যায় না। ভাষা আপনা হইতেই উৎপত্তি লাভ করে, কিন্তু একেবারে আপনা আপনিই উৎপত্তি লাভ কর - তাহা আমি স্বীকার করি না; সবকিছুর মত ভাষার রূপ, রূপান্তর, গতিধারাও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। জনগণের প্রয়োজনের দিক হইতে আমাদের ভাষার একটা ষ্ট্যান্ডার্ড রূপ গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে বাঙ্‌লা-একাডেমী অনেক কিছু করতে পারে।[৭০]

১৯৫৭ সালে রক্ষণশীল সংগঠন ঢাকা আর্ট কাউন্সিল এর উদ্যোগে নিখিল পাকিস্তান সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্যও ছিল দুই পাকিস্তানের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। ১৯৫৯ সালের ১-৪ মে তে দ্বিতীয় সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যাপক শ্রোতা-দর্শক পাওয়া যায়। সাহিত্যিকদের সরকারি অপকৌশলের হাতিয়াররূপে ব্যবহারের লক্ষে আইয়ুব খান প্রতিক্রিয়াশীল বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিকদের দু'টি কার্যসূচি পূর্ব বাংলায় সাফল্য লাভ করেছিল। একটি ১৯৫৭-তে 'সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান' এবং অপরটি 'রওনক' সাহিত্য সংস্থা গঠন।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, পাক-বাংলা সাহিত্য মহফিল, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, এসলামী সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি তামদ্দুনিক গোষ্ঠী সিপাহি বিপ্লবের (১৮৫৭) শতবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত নেন। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক হাসান জামান। মূল সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম এবং উদ্বোধক ছিলেন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। অনুষ্ঠানের মূল সুর ছিল 'সাম্প্রদায়িক'।

'রওনক' সাহিত্য সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ভিত্তিতে তমদ্দুন গঠনে সহায়তা করার জন্য সর্বপ্রকার সাহিত্যিক ও তামদ্দুনিক প্রচেষ্টা চালানো। এই সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মতিনউদ্দীন আহমদ প্রমুখ।[৭১]

এভাবে বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে ও আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে সরকার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে কিন্তু তা প্রগতিশীলদের পাল্টা কার্যমক্রের ফলে সফল হয় নি।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন : ঢাকা (১৯৪৮)

পূর্ব বাংলায় প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সরকারি উদ্যোগে। সরকারি মতাদর্শের সমর্থনে এবং ইসলামি তমুদ্দুনের পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী সংস্কৃতিকর্মীদের বেশকিছু সম্মেলন পাকিস্তানি আমলে অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে নতুন সচেতনতা ও মতবিরোধী দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে পুরো পূর্ব বাংলা গর্জে ওঠে। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যই প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহারের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'।[৭২] এই সম্মেলনকে পূর্ব বাংলায় সর্বজনীন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেখানে এক আদর্শিক দ্বন্দ্বেরও সূচনা হয়। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, 'সম্মেলনটি সর্বোতভাবে সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত হওয়ায় স্বভাবতই তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রাধান্য ছিল অনস্বীকার্য।'[৭৩] সে কারণে সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালে আদর্শগত মতপার্থক্যের কথা উত্থাপন করে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৭৪] এই সম্মেলনের প্রস্তুতি ও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী এবং সম্পাদক মনোনীত হন অধ্যাপক অজিত গুহ ও সৈয়দ আলী আশরাফ।[৭৫] সৈয়দ আলী আহসান এবং আবু জাফর শামসুদ্দীন যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।[৭৬] এতে কবিতা, শিশুসাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, পুথিসাহিত্য ও লোকসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন মূল সভাপতি।

বিপুল জনসমাগমে সম্মেলন শুরু হয়। মাওলানা আবদুর রহিম কোরান তেলাওয়াত করেন, রেডিও পাকিস্তানের শিল্পীরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' গান পরিবেশন করেন ও কবি গোলাম মোস্তফা নবজাগ্রত রাষ্ট্রের চেতনা ও সাহিত্যিকদের নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন।[৭৭] কিন্তু উপস্থিত ছাত্রজনতা বক্তৃতার মাঝখানে করতালি দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে।[৭৮] তাঁর মতে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অভিজাত ও গণমানুষের সংঘাতের ইতিহাস এবং সে-সংগ্রামে সর্বদা গণমানুষের বিজয় ঘটেছে। মধ্যযুগে মুসলমান নরপতিগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের দুয়ারে। ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্য মধ্যবিত্তের অধিকারে চলে যায়; কিন্তু তিনি আশা করছেন, পাকিস্তানে সাহিত্য পুনর্বার গণমানুষের কাছাকাছি এসে যাবে।[৭৯]

'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' এর উদ্দেশ্য মোটামুটি, 'পাকিস্তানী সাহিত্যের পুনর্জাগরণ'-কিন্তু হবীবুল্লাহ বাহার এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯; মূল সভাপতি) বিবেকের তাড়নায় যে সত্য মন্তব্য উচ্চারণ করেন, তাতে সরকারি উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।[৮০]

হবীবুল্লাহ বাহার বাংলাভাষার সুখ্যাতি ও বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলোকে অতি চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করে বলেন,

> ... বঙ্গ সাহিত্য পুষ্টি লাভ করেছে স্থানীয় ও মুসলিম তাহজিব তমদ্দুনের সংঘাতের ফলে। এই সংঘাতের ফলে জন্ম হয়েছে শ্রীচৈতন্যের ও চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যের, যার প্রাণবাণী- 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।[৮১]

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তানে নতুন যুগের গণমুখী সাহিত্য চর্চার জন্য সমবেত লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে মানুষের জীবনের প্রতিফলন ঘটবে, যা শুধু শহুরে সাহিত্য হবে না। সেদিন তাঁর বক্তব্যে

সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তানবাদ প্রতিষ্ঠার সুর ছিল না। স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পূর্ব বাংলার মানুষকে তিনি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও জীবনমুখী নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দেন।

সভাশেষে বিশেষ অনুমতি নিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দফতরের সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী বক্তৃতা দিতে ওঠে মূল সভাপতির ভাষণের সমালোচনা করেন এবং অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এক পর্যায়ে মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য মিনিময় হয়। উত্তেজিত দর্শকের মনোভাব আঁচ করে তিনি সভা ত্যাগ করেন।[৮২]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ঐ সম্মেলনের বক্তব্য হলো :

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী, এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।[৮৩]

তিনি এই সম্মেলনে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যে পূর্ব বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করেন তা পূর্ব বাংলার জনমানসে এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।[৮৪]

উপর্যুক্ত উক্তি পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী মহলের প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়। *দৈনিক আজাদ* ও তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক সৈনিক' ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র বক্তব্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।[৮৫] ১ জানুয়ারি ১৯৪৯ তারিখের *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তাঁর বক্তব্যের সমালোচন করে বলা হয়, '...বিভক্ত ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পাকিস্তানি পরিবেশে এই শ্রেণির কথা শুনতে হইবে, এ কথা ভাবা একটু কঠিন ছিল বৈ কি। তা ছাড়া কোনো হিন্দু লেখক নয়, একেবারে স্বয়ং ডক্টর শহীদুল্লাহ্ 'মা প্রকৃতির' এমন স্তব গাহিবেন, এ-কথাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল!'[৮৬] উপর্যুক্ত সম্পাদকীয়তে আরও মন্তব্য করা হয়, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষণে ইসলামি ভাবধারা আমদানির প্রয়োজনবোধ করেন নি। বস্তুত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পূর্ব বাংলায় যে বাঙালিত্বের উৎকর্ষতা প্রত্যাশা করেন তা নবীন রাষ্ট্রে পাকিস্তানবাদীরা সুনজরে দেখেন নি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সেই ঐতিহাসিক উচ্চারণকে সমালোচনা করে তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র সাপ্তাহিক *সৈনিক* পত্রিকা ১৯৪৯ সালের ৯ জানুয়ারি লেখা হয়েছিল, 'পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরও মুসলমানের চেয়ে আমাদের বাঙালী পরিচয়টাই খাঁটি সত্য এর চেয়ে অভিনব কথা আর কি হতে পারে?'[৮৭]

সাহিত্য সম্মেলনে দ্বিতীয় দিন একটি 'কার্যকারী সংসদ' গঠনের উদ্যোগ নেন হাবিবুল্লাহ বাহার কিন্তু তা সফল হয়নি। তবে অধ্যাপক আবুল কাসেমের প্রস্তাবনায় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ভাষা করার যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনের শেষ দিন গৃহীত এক প্রস্তাবে কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে মোনাজাত করা হয় এই মর্মে যে, 'তাঁহার অমর আত্মা পাকিস্তানের সকল নাগরিককে শাশ্বত অনুপ্রেরণা দান করিবে'। দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তন করার জন্য ইতঃপূর্বে পাকিস্তানের আইন সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা এ পর্যন্ত কার্যকরী না হওয়ায় গভীর দুঃখ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয় এবং তা অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

তৃতীয়ত, মাদ্রাসা শিক্ষা অনুসন্ধান কমিটি, বয়স্কদের স্বাক্ষরতা নিবারণ কল্পে একটি পরামর্শ কমিটি ও নারী শিক্ষা পরামর্শ কমিটি গঠনের অনুরোধ করা হয়।

চতুর্থত, ঢাকায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন এবং আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগৃহীত পুথিগুলো উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

পঞ্চমত, বাংলা বানান সংস্কার, পরিভাষা সংকলন, বাংলা অভিধান রচনা এবং বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

ষষ্ঠত, আইএ এবং বিএ শ্রেণিতে বাংলা ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মেলনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সপ্তমত, আরবি, ফারসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষা থেকে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক দরকারি গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করার জন্য একটি অনুবাদ দপ্তর খোলার জন্য প্রাদেশিক সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। সর্বোপরি ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিষয়ক একটি একাডেমি স্থাপনের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।[৮৮]

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের' আয়োজন করা হয় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা প্রশমনের লক্ষ্যে। এ সম্মেলনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলায় 'পাকিস্তানী সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ' কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক অজিত গুহ, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশরাফ-এর মতো কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল ও উদারপন্থির প্রচেষ্টায় এই সম্মেলনে পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি চিন্তার প্রতিফলন ঘটে এবং বাঙালিত্বের আদর্শই জয়ী হয়। বাঙালিত্বের সাধনায় এরপর থেকে গতি আসতে শুরু করে।[৮৯]

পূর্ব বাংলাভাষা কমিটির সংস্কার উদ্যোগ

ভাষা-সংস্কার ষড়যন্ত্রের কথা

বাংলাভাষার হরফ পরিবর্তন (আরবি/রোমান প্রভৃতি), ভাষার মুসলমানি চেহারা গঠন (শব্দ পরিবর্তন-আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে) এবং রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হরণ (উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করে জাতীয়জীবন থেকে বাঙলা ও বাঙালির নষ্ট করে) করার ষড়যন্ত্র পাকিস্তানপূর্ব ও পরবর্তী কালে বিভিন্ন ভাবে চলে আসছিল। রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪০) মুসলমানি শব্দ অকাতরে বাংলাতে অনুপ্রবেশ ঘটাবার সুপারিশ করেছিল। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার আগেই বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব ছিল। পূর্ব বাংলা সরকার এই প্রস্তাব লুফে নিয়ে রেনেসাঁ-বাদীদের দ্বারা সরকারি পত্রপত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভঅবে ব্যবহার শুরু করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি শিক্ষমন্ত্রী ফজলুর রহমান 'পূর্ব পশ্চিমের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য সহজতর' করার যুক্তিতে বাংলা হরফ পরিবর্তন করে আরবিতে বাংলা শিক্ষাদানেরর ২০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে বিনামূল্যে আরবি হরফের বাংলা বই দেওয়া শুরু করে।

পাকিস্তান সরকারের এই সমস্ত উদ্দেশ্য হাসিলের একটি পন্থা ছিল মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর নেতৃত্বে (সেক্রেটারী ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা) গঠিত বাংলাভাষা সংস্কার কমিটি (১৯৪৯)। এই কমিটি বাংলাভাষা, এর ব্যাকরণ ও বর্ণমালার গুরুতর সংস্কারের সুপারিশপূর্বক সহজ বাংলার প্রস্তাব করেছিলেন।[৯০] তখন রোমান হরফে বাংলাভাষা লেখার জন্য বেশকিছু যুক্তি উত্থাপন করা হয়। সেগুলো হলো : '১. বাংলা হরফ আমাদের জাতীয় লিপি নয়। ২. বর্তমানে বাংলা হরফের অনেকগুলো দোষ-ক্রটি রয়েছে। যেমন, অতিরিক্ত অক্ষর সংখ্যা, দীর্ঘস্বর, তিনটি–'শ', দুইটি 'ব', দুইটি 'জ', দুইটি 'ন' এবং যুক্তাক্ষর ইত্যাদি। এই লিপি সমুদ্রের মধ্যে শিল্পের উৎসাহ তলিয়ে যায় বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। ৩. রোমান হরফে অক্ষর সংখ্যা কম থাকায় নতুন শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা আয়ত্ত ও চর্চা করা সহজ হবে। অতি অল্প সময়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হবে। উদ্যোক্তাদের ধারণা ছিল–রোমান হরফ গ্রহণের ফলেই তুরস্কে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। ৪. টাইপরাইটারে রোমান লিখতে সুবিধা হবে। ৫. বাংলার চেয়ে দ্রুত রোমান হরফে লিখা এবং পড়া সম্ভব হয়। ৬. আমাদের ইংরেজি লেখা সহজতর হবে। ৭. বিদেশীদের জন্য বাংলা পড়া ও লেখা সহজ হবে।'[৯১]

এই কমিটি পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের ৩০১ জন মানুষের কাছে ভাষা সংস্কারের ব্যাপারে সমীক্ষার অংশ হিসেবে প্রশ্নপত্র বিলি করেন। এতে ১৮৭ জন উত্তরদাতা বাংলা লিপি বজায় রাখার পক্ষে, ৯৬ জন উত্তর দাতা আরবি এবং ১৮ জন রোমান লিপিতে বাংলা লেখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৯২] ফলে জনগণের ব্যাপক বিরোধিতা,

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ-সংগ্রাম ও আন্দোলনের মুখে সমস্ত উদ্যোগ যদিও ব্যর্থ হয়েছিল, তবু এঁদের প্রয়াস থেমে ছিল না। নানাভাবে বাঙালিদের মনের ভাবনার, চিন্তার, আকাঙ্ক্ষার এবং শৃঙ্খলার পরিবর্তন ও বিকৃত-সাধনের উপায় অন্বেষণ করে। ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার ও তাঁর তাবেদার প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা বাঙালিপনা, বাঙালিত্ব ও বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের নানা উদ্যোগ একটার পর একটা গ্রহণ করা হতেই থাকে।[৯৩]

১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়েই প্রস্তাব করে বসলেন যে পাকিস্তানে সবকটি ভাষার জন্যে এক রোমান হরফ প্রবর্তন করতে হবে। প্রস্তাবের পক্ষে যুক্ত হিসেবে পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়া হলো। তিনি আরও বললেন, বাংলা ও উর্দুকে এক হরপে লিখতে পারলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের জন্য একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করার সম্ভব হবে। আইয়ুব খান এই প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাড়াটে বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবী আইয়ুব খানের এই প্রস্তাব সমর্থন করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করেন। ১৯৫৯ সালে বাংলাভাষা সংস্কারের নানা উদ্যোগও তখন গৃহীত হয়। কিন্তু প্রতিবাদের মুখে বলাবাহুল্য, সেসব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।[৯৪]

চট্টগ্রামের জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন (১৯৫১)

প্রান্তিক নব নাট্য সংঘ এবং সাংস্কৃতিক বৈঠকের সদস্যদের শক্তিকে সুসংহত করার লক্ষ্যে তাঁরা সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সালের ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ শে মার্চ, হরিখোলার (চট্টগ্রাম) মাঠে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।[৯৫] এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্ত ছিলেন মাইদুল হাসান, মাহবুব আলম চৌধুরী, শওকত ওসমান, আবুল ফজল, চৌধুরী হারুনুর রশিদ, টিপি বেগ প্রমুখ। এছাড়া বিশিষ্ট শিল্পী কলিম শরাফী ও অধ্যাপক মোতাহার হোসেন চৌধুরী এতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। নেপথ্যে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন–আহমেদুল কবির ও সানাউল হক।[৯৬] অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টি করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল।[৯৭]

এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক-জগতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রগতিশীলতার দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মহল–*দৈনিক আজাদ*, *মর্নিং নিউজ* প্রভৃতি পত্রিকা এবং মুসলিম লীগ সরকার সমর্থক অপরাপর প্রচার মাধ্যম এর বিরুদ্ধে আগেই কমিউনিস্টদের সম্মেলন বলে প্রচার শুরু করে। তাঁরা সম্মেলনের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ উত্থাপন করতে থাকেন যে সরকারি চাকুরে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সম্মেলনের অংশগ্রহণ করতে সাহসী পান নি। এ বি এম হাবীবুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী, অজিত গুহ প্রমুখ নিমন্ত্রিত অতিথি কেউ-ই গেলেন না।[৯৮]

ঢাকা থেকে সম্মেলনের অতিথি হিসেবে কবি বেগম সুফিয়া কামাল এবং কলকাতার 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার যোগদান করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অনেক শিল্পী সাহিত্যিক এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সুচিত্র মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেনা বর্মণ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থান থেকে যে সমস্ত লেখক শিল্পী সম্মেলনে যোগদান করেন–তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দীন আল আজাদ, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদক, নাওবেলাল), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সলিল চৌধুরী, রমেশ শীল-এর নাম উল্লেখযোগ্য।[৯৯]

সম্মেলন উদ্বোধন করেন বেগম সুফিয়া কামাল এবং সভাপতিত্ব করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।[১০০] ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও পশ্চিমবঙ্গের খ্যাত-অখ্যাত বহুলোকের সমাগমে সম্মেলনটি সার্থকতার পথ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়। কীর্তন, রবীন্দ্রসংগীত ও কবিগানের মাধ্যমে সমাবেশের বিপুল সংখ্যক শ্রোতা-দর্শক বাঙালি-সংস্কৃতির আস্বাদ লাভ করে। সমাবেশের মূল প্রস্তাব ছিল সমাজ পরিবর্তনের উপায় সম্পর্কে। নিজেদেরকে তাঁরা সবাই প্রাচীন ও আধুনিককালের অবিভাজ্য বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বলে দাবি করেন। এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে একজন সমালোচক সমকালীন একটি পত্রিকায় লিখেছিলেন :

> শিল্পী-সাহিত্যিকেরা জনতার বিবেকের প্রতিনিধি। মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা, অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে সমাজ জীবন বিপর্যস্ত। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা, যুদ্ধের বিভীষিকা জনজীবনে এনেছে অমঙ্গলের ঝড়। ভুখা জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যত সুস্থ সুন্দর জীবনের ছবি বুদ্ধুদের মত মিলিয়ে যাচ্ছে, অসীম শূন্যে। ইতিহাসের গতিকে স্তব্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে প্রতিনিয়ত। বৃহত্তর জনতার (যাঁরা সংস্কৃতির কর্ণধার) জীবনে শান্তি, অবসর, নিরাপত্তা নেই। ... দারিদ্র্য, মহামারী,

দাংগা, যুদ্ধের বিভীষিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে বাস করতে হচ্ছে জীবনের অধিকাংশ সময়। অথচ বৃহত্তর জনতাকে বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নতির কথা ভাবতে যাওয়া কাল্পনিক বিলাস মাত্র। বৃহত্তর জনতার জীবনে নিরাপত্তা, শান্তি, প্রাচুর্য্য চাই। শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতির ব্যাপক প্রবাহকে এগিয়ে নিতে শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবকেরা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সংস্কৃতিকে নিয়ে আজ ছিনিমিনি খেলা চলছে পুরো মাত্রায়। ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সংস্কৃতির নামে বিভ্রান্তিকর পথে বৃহত্তর জনতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অজ্ঞতার অন্ধকারে, মৃত্যুর অতল গহবরে। জনতার বিবেকের প্রতিনিধি বলেই শিল্পী সাহিত্যিকদের সংবেদনশীল মনে তুলেছে বিক্ষোভের তুফান। কালের যাত্রাধ্বনিকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে শিল্পী-সাহিত্যিকরা কোনদিনই পিছপা হননি। আজকের শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবীরাও এগিয়ে এসেছেন দৃঢ় পদক্ষেপে। তাই এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন।[১০১]

একই পত্রিকায় সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে লেখা হয় :

১. আমরা বিশ্বাস করি–সাহিত্য শুধু জীবনের নিছক প্রতিফলন নয়, সাহিত্য সমাজ উন্নয়নের শক্তিশালী অবলম্বন। ক্ষুধা, বেকারী এবং অশান্তি হাত থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করা-তার গতিশীলতাকে....এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র দায়িত্ব আজ শিল্পী, সাহিত্যিকদের। দুর্ভিক্ষে বাঙলাদেশের ৩৫ লক্ষ নরনরীর মৃত্যু, গত মহাযুদ্ধে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ভাঙন, যে ধ্বংস, আজকের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে অর্থনৈতিক সংকট-অভাব-অনটন, জীবনের এই বাস্তব সত্য-তাকে বাদ দিয়ে সমস্যাকে এড়িয়ে কোন সাহিত্যই মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারেনা।

   অতএব বিভিন্ন মতবাদের শিল্পী সাহিত্যিকের এ সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব করিছি-মানুষের কল্যাণের জন্য যে সাহিত্য, সমাজের গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সাহিত্য আমরা সে সাহিত্যের প্রতি আস্থাশীল। মানুষের ভাল করবার, মানুষের মঙ্গল করার সদিচ্ছাকে অঙ্গীভূত করে যে সাহিত্য, শোষণের বিরুদ্ধে এক দেশের উপরে অন্য দেশের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে এক দেশের উপরে অন্য দেশের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমরা মতবাদ নির্বিশেষে মানবতার নামে যে সাহিত্যের অনুসারী। আমরা বিশ্বাস করি আজ এ সাহিত্যই জনসাধারণের একমাত্র কাম্য।

২. নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ব্যতীত কোন দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব করছি-ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধকেই আমরা বরদাস্ত করব না। আক্রমণকারী যে হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আমরা মানবতাবিরোধী জঘন্য কাজ হিসাবে নিন্দা করবো।

৩. ... বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অক্ষর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলা ভাষার মূলে আঘাত করার যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মূলনীতি কমিটির প্রস্তাবে বাঙলা ভাষার দাবীকে কোন প্রকার প্রাধান্য দেওয়া হয়নি দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি। অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে যে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।

৪. খুনী বাঙলা-বাঙলাদেশের পরিচয় নয়। বিগত দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত কলুষিত হতে দেখে প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকই অত্যন্ত পীড়া অনুভব করেছেন।

৫. সংস্কৃতির মূল ভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছাড়া জাতীয় সংস্কৃতির মান উন্নয়ন অসম্ভব। ... অতএব এ সম্মেলন সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসার করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

৬. সংস্কৃতি বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে যে কোন জাতি ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়তে বাধ্য। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য ইত্যাদি সাংস্কৃতিক আবদারগুলো উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা সাধন না হলে জাতীয় জীবনে কোন প্রকার অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের সংস্কৃতি বিকাশের জন্য আজ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। এ না হলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ব্যহত হবে। কুসংস্কারের নাগপাশে আমরা চিরদিন জড়িত হবে থাকব। মানবতামুখ্য কোন নতুন চিন্তাধারাকে আমদের মহান জাতীয় ঐতিহ্যের বলে সঞ্জীবিত করে গ্রহণ করার মত মানসিক ঔদার্য আমরা হারিয়ে ফেলব। নতুনকে বর্জন করে পুরোতনের আবর্জনা রূপে আমরা নিমগ্ন হয়ে পড়ব তাই আজ গতিশীল জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন যাবতীয় সৃষ্টিশীল কল্যাণধর্মী শিল্প সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের, পুস্তক, পত্র, পত্রিকা প্রকাশের, সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের এবং সকল নতুন চিন্তাধারার ব্যাপক আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

৭. দেশের সমস্ত শিক্ষায়তগুলি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন রূপে কাজ করে। কিন্তু আমরা দেখেছি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্ররা স্বাধীনভাবে আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় অবাধ অংশগ্রহণ করার সুয়োগ থেকে বঞ্চিত। এতে জাতিকে হয়তো শিক্ষিত করে তোলা হয়। কিন্তু সভ্য করে গড়ে তোলা হয়না। তাই শিল্পী সাহিত্যিকের এ সম্মেলন প্রস্তাব করে–সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের এই অধিকার ও সুযোগ প্রদান করা হোক যেন তারা আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী সব প্রকার সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে বাধা প্রাপ্ত না হয়।

৮. আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধা কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর অবদানে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি নতুন প্রাণ-স্পন্দনের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এই শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আজ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে অচিকিৎসায় অনটনে কোনমতে বেঁচে রয়েছেন। অথচ আজ তাঁকে দিয়ে চলেছে নির্লজ্জ টানাটানি। তিনি নীরব বলে আজ তাঁর অবদানগুলোক চূড়ান্ত অপব্যাখ্যায়, সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হচ্ছে। এমন কি তাঁর নাম বিকৃত পর্যন্ত করবার চেষ্টা চলছে। রুগ্ন কবিকে চিকিৎসার জন্য আজো সুইজারল্যান্ডে প্রেরণের ব্যবস্থা করা গলে না। আমরা মনে করি উভয় বাঙলার সরকারদ্বয় ইচ্ছা করলে জনগণের প্রিয় কবি নজরুলের জন্য পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এন হাজির করতে পারেন। এমন কি নজরুলের চিকিৎসার জন্য যদি জনসাধারণের উপর করও বসানো হয় তাতেও কেই কোন আপত্তি বরবে না। এই সম্মেলন তাই আবেদন করে যে উভয় বাঙলা, সরকারদ্বয় চিকিৎসার জন্য নজরুলকে সুইজারল্যান্ডে প্রেরণ করে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন। জনরুলের সৃষ্টির যারা অপব্যাখ্যা করেছে এবং নজরুলকে নিয়ে যারা সুবিধা আদায়ের অপচেষ্টা করছে এ সম্মেলন তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছে।

৯. এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে এখানে বিভিন্ন জেলা থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সম্মেলনের কার্যকরী কমিটি আমাদের প্রথম প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রদেশব্যাপী একটি সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটি অবিলম্বে অন্যান্য জেলার সঙ্গে যোগযোগ করে প্রত্যেক জেলা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আহ্বায়ক কমিটিকে পরিবর্ধন করবেন ও আর একটি প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন আহ্বানের জন্য প্রস্তুতি চালাবেন।[১০২]

প্রস্তাবগুলো থেকে সম্মেলনের মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সম্মেলন বাংলাভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের রক্ষার জন্য সচেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যা বলেন, তা ছিল তখনকার সমাজের দিকদর্শনের মতো এবং সৎসাহসী সমাজসেবীর পবিত্র দায়িত্ববোধের স্মারক :

> ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি ধ্রুব নক্ষত্র বিশেষ। ঐতিহ্যের অনুসরণ ও সেই স্রোতধারাকে চির বহমান করিয়া তোলাই সংস্কৃতিসেবীর আসল কাজ। যাঁরা তা মানেন না, তাদের কাছে আমার সাধনার কোন মূল্য নেই। তাঁহাদের সহিত আমি তর্কে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু আপনাদের বলিতে চাই, ঐতিহ্যের পটভূমির সহিত যাহাদের যোগ নাই, তরুলতার ক্ষেত্রে যেমন পরভেজী শব্দ ব্যবহার করা হয়–এখানে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য তেমন বিশেষণই আরোপ করা চলে। সমাজ জীবনেও দেখিবেন ইহারা পরভোজী। মানবতার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। জনসাধারণের মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দিনাতিপাত করেন–এই জাতীয় ব্যক্তিদের উপদেশ কোনদিন গ্রহণ করিবেন না।
>
> ঐতিহ্যের প্রেম সাংস্কৃতিক সাধনার আসল সোপান। দেশের ইতিহাস এই জন্যই ভাল রূপে জানা দরকার। ...ভুলিয়া যাইবেন না, অতীত আমাদের পথ প্রদর্শন করে। সেই আলোকে আমাদের বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই জন্য ঐতিহ্যের কথা বারবার স্মরণ রাখা দরকার। ঐতিহ্যহীন কোন কিছু গড়িতে গেলে আপনারা ভুল করিবেন। সাধানা পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অথবা জাতীয় বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। ...ঐতিহ্য হইতে তাহারা দূরে সরিয়া যাইতে বলে। মনে রাখিবেন, ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ ...মৃত্যু। ঐতিহ্যের সহিত দেশের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, লৌকিক আচার, জলবায়ু, গাছ-পালা, এমনকি তরুলতা পর্যন্ত জড়িত। বুকে দেশ-প্রেম না থাকিলে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া মুশকিল।[১০৩]

তাঁর আলোচনায় একথা পরিষ্কার হয় যে অতীতের সব উজ্জ্বল উপাদানসমূহ সম্বল করে ভবিষতের পথ যাত্রা করতে হবে। অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের যোগসূত্র রচনা করে, বৃহত্তর সমাজের সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিকদের কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে গড়ে তুলতে হবে নয়া শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি কোনো নির্দিষ্ট সীমা রেখায় আবদ্ধ নয়। সারা দুনিয়ার সঙ্গে সে সংস্কৃতির নিবিড় আত্মীয়তা রয়েছে। কবি সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন : 'বিশ্বের সঙ্গে, সকল জাতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, ততই আমাদের মনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী দূর হবে। ফলে আমাদের সাহিত্য হবে সুদূরপ্রসারী ও বহুবিস্তৃত।'[১০৪]

সম্মেলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের তথা জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীকরণ করে অর্থনৈতিক সক্ষমতা সৃষ্টির পক্ষেও বক্তব্য উচ্চারিত হয়। 'সাংস্কৃতিক বৈঠকে'র মাত্রা বৃদ্ধি পায় প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ দ্বারা। সম্মেলনের সার্থকতার ফলে প্রান্তিকের গানের 'স্কোয়াড' গ্রামে গ্রামে গিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবন-ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করে তাঁরা সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রাখতে থাকেন। এই সম্মেলন পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে পথের সন্ধান দিয়েছিল। পরে যত সম্মেলন হয় তার মূল সুর ছিল এটাই। অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে এবং ক্রমে তা সারা পূর্ব বাংলায় ব্যাপ্তি লাভ করে।

পূর্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক সম্মেলন (১৯৫১)

১৯৫১ সালের ১৬ মার্চ কুমিল্লায় পূর্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টম মুহম্মদ শীহদুল্লাহ। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পরিবর্তে উর্দু প্রবর্তনের চেষ্টা পূর্ব বাংলার ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই প্রতিধ্বনি করে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ শিক্ষকদের এই সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন,

> শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পূর্ব বঙ্গের ছাত্রদের ওপর বাংলা ভাষা ব্যতীত যদি অন্য কোনো ভাষা আরোপ করা হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো আমাদের উচিত। এমনকি প্রয়োজন হইলে ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ করা উচিত। বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব। নতুন ভাষা আরোপ করা পূর্ববঙ্গে গণহত্যার শামিল হইবে।[১০৫]

স্কুল ও কলেজে শিক্ষার মাধ্যম যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজি হওয়ার ফলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে অসংগতি দেখা দেয় সে বিষয়ে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন,

> আমাদের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার পাঠ্য তালিকাও পরিবর্তিত হইবে। তবে আগামী ১০-২০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় ইংরেজি রাখিতে হইবে। শিক্ষার মাধ্যম ও অধ্যয়ন সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমাদের দেশে বর্তমান স্কুলসমূহে শিক্ষার মাধ্যম এবং উহা বেশ ভালভাবেই চলিতেছে। কিন্তু স্কুলের সঙ্গে কলেজের যে তফাৎ রহিয়াছে তাহা খুবই বেশি। ইহার ফলে অধিকাংশ ছেলের ভবিষ্যতই পঙ্গু হইয়া যায়। কারণ স্কুলে বহুদিন পর্যন্ত বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া করিয়া ছেলেগণ হঠাৎ যখন কলেজে আসিয়া ইংরেজি মাধ্যমের সম্মুখীন হয়, তখন অধিকাংশ ছেলের ভবিষ্যৎ পঙ্গু হইয়া যায়।

দুই শিক্ষা মাধ্যমের টানাপোড়েন পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক ছাত্রের অকৃতকার্যতা এবং বেকার সমস্যা এড়ানোর উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, যে সকল ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভে অনুপযুক্ত তাহাদিগকে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা উচিত। আর এতদুদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র অধিকসংখ্যক কারিগরী বা বৃত্তিমূলক স্কুল বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দিকে এখন সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আর দেশকে শিল্পায়িত করিয়া এই সকল কারিগরকে চাকরি প্রদানের ব্যবস্থা করা সরকারের উচিত। এই সম্পর্কে আর একটি প্রস্তাব করা যাইতে পারে যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করা যায়, তবেই এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত–এ কথা বলে তিনি প্রস্তাব করেন স্কুল-কলেজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠকে বাধ্যতামূলক করা উচিত। শিক্ষক ব্যতীত অন্য কাউকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে না দেওয়ার নীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের পরীক্ষা দেওয়ার

সমান অধিকার প্রদান করা দরকার। সাধারণ মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণে অভিযান পরিচালনার জন্য ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষণে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন।
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এই ভাষণ পূর্ব বাংলার সচেতন মহল যেমন, কুমিল্লার গণতান্ত্রিক মন্ত্রে উজ্জীবিত ছাত্র-জনতাকে বিপুলভঅবে প্রভাবিত করে। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, পূর্ব বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর দিকনির্দেশনা ছিল সময়ানুগ। কুমিল্লার আপামর জনগণকে এই ভাষণ নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছিল–যার প্রভাব পড়ে একুশের আন্দোলনে।

ভাষা আন্দোলন (১৯৫২)

বাহান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার জন্য আত্মাহুতি বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করে। বিশেষ করে, এর পটভূমিতে প্রবল হয়ে ওঠে সংস্কৃতির সংগ্রাম। পাকিস্তানি রাজনীতির আলোচনায় সাংস্কৃতিক ঘটনাবলি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পাকিস্তানবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাংলাভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতির পক্ষে জনমত গঠন করতে গিয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সকল দলমতের সংস্কৃতিকর্মীগণ প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের সময়ে পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির প্রতি পূর্ববাংলার শিক্ষিত জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব পরিপক্কতা লাভ করে এবং বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বেড়ে চলতে থাকে।[১০৬] এর ফলে রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্যনাট্য, মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের সাহিত্য, নববর্ষ ও ঋতু উৎসব উদ্‌যাপন ইত্যাদির প্রতি শিক্ষিত বাঙালির আকর্ষণ বাড়তে থাকে।[১০৭] একুশের ঘটনার পর সংস্কৃতিকর্মী মাহবুব আলম চৌধুরী 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কবিতাটি পরে মোমিনুল হকের সুরে গানেও পরিণত হয়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবন করতে–গাজীউল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আব্দুল লতিফ, লোকশিল্পী রমেশ শীল, শামসুদ্দীন আহম্মদের (বাগেরহাট), খুলনার প্রকৌশলী মোশাররফ উদ্দীন আহম্মদ প্রমুখ গান লিখে ও গেয়ে বাঙালিকে শক্তি যুগিয়েছিল।[১০৮] ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রভাবেও হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের সাগ্রহ দৃষ্টি পড়ে।[১০৯]

কুমিল্লা সাংস্কৃতিক সম্মেলন (১৯৫২)

১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে কুমিল্লার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা প্রগতি মজলিস নামে সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলে। বায়ান্নোর প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে যে বুনিয়াদ গড়ে ওঠে তাদের সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম ছিল প্রগতি মজলিস[১১০]। এদের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা-বির্তক-আবৃত্তি-সংগীত-চিত্রাঙ্কনের আয়োজন করতো। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা সভা ও রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী, বিভিন্ন ঋতু উৎসব, নববর্ষ ও অন্যান্য বিশেষ দিবস পালন করতো। প্রগতি মজলিস প্রথম থেকেই বাঙালির ভবিষ্যৎ কী হবে, ভাষা কী হবে, সংস্কৃতি কী হবে এবং অস্তিত্ব কীভাবে বজায় রাখা যাবে তা অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল।[১১১] মূলত চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসহাবউদ্দীন আহমদ, আবুল খায়ের আহমদ, সালাহউদ্দীন প্রমুখের উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ২২, ২৩ ও ২৪ আগস্ট কুমিল্লা শহরে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক অজিতনাথ নন্দী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আশুতোষ চক্রবর্তী ছিলেন।[১১২] সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের আহমদ পৃথক এক বিবৃতিতে, 'দেশের এক সাংস্কৃতিক দুর্ভিক্ষের দিনে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য সভার প্রতি আহ্বান জানান। এবং

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মূল বাণী হিসেবে নির্ধারণ করা হয় 'আমাদের সংস্কৃতিক-সঙ্কট কেটে যাচ্ছে'। এ সম্মেলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া সম্মেলনে উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তিনটি পুস্তিকা থেকে। একটি হলো : আহ্বান, অন্য দুইটি–মূল সভাপতি ও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির অভিভাষণ।

কুমিল্লার সাংস্কৃতিক সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার করার জন্য *আহ্বান* নামে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। *আহ্বান*-এ সম্মেলনের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয় :

> যাঁহারা এদেশের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদানে নিরত, যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ অন্তরে পোষণ করেন; সঙ্গীতে, চিত্রে যাঁহারা প্রাণের সন্ধান পান, দর্শন বিজ্ঞানের সাধনায় যাঁহাদের জীবন ব্যয়িত হয়, সেই সব শিক্ষাব্রতী সাহিত্যিক সাহিত্যানুরাগী শিল্পী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের ওপরই পড়িয়াছে জাতির মানস সংস্কৃতি উন্নয়নের মহৎ ভার। লক্ষ লক্ষ ম্লান মূঢ় অন্তর আজ তাঁহাদেরই মুখেল দিকে চাহিয়া আছে। তাঁহারাই যে জাতির প্রতিনিধি। তাহাদিগকেই যে আজ জাতির মূখ মুখে ভাষা দিতে হইবে, অন্তরে আশা ধ্বানিয় তুলিতে হইবে। বহির্জগতের সর্ববিধ উন্নতির মূলে রহিয়াছে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ। এই মানসিক উন্নতি বিধানের সাধনায় একটি দিনও সময় নষ্ট করিবার মত নাই। কিভাবে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায় তাহাই প্রশ্ন। চিন্তা-নায়ক, কবি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমবেত প্রচেষ্টাই এই কার্যকে দ্রুত সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে পারে। অবকাশ ও সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী ইহার জন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্মেলন প্রয়োজন। এই সমস্ত সম্মেলনে শিল্পী সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কেরা সমবেত হইয়া পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন এবং উহারই মাধ্যমে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন। এভাবে নিজ নিজ সৃষ্ট বিষয়ের গুণাগুণও বিচার করিবার সুযোগ পান। তাঁহাদের ভাব বিনিময়ের, মধ্য দিয়াই জাতির মানস সংস্কৃতির ধারা প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া নূতন নূতন খাতে প্রবাহিত হয় এবং বিরাট প্রসার লাভ করিয়া অপরিস্ফুট জনগণের অবজ্ঞাত সৃজনী ক্ষমতাকে উদ্বোধিত করিয়া ভাব ও কর্মের বিপুল শস্য সম্ভারে জাতীয় সমৃদ্ধি ঘোষণা করে।[১১৩]

সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল :

> আমাদের প্রস্তাবিত সম্মেলনের প্রধান বিশেষত্ব হইবে আত্মসমীক্ষা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, শিল্পে সঙ্গীতে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কি আমরা দিতে পারিয়াছি, কি পারি নাই তাহাই আমরা মোহমুক্তচিত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। এই আত্মসমালোচনার মধ্যে হইতেই আমাদের শিল্পী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান সাধকগণ নিজেদের বলাবল বুঝিতে পারিবেন আর তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হইতে থাকিবে ভবিষ্যৎ কর্মধারা।[১১৪]

অতএব প্রগিত মজলিসের আহ্বান :

> আসুন, জ্ঞান, বুদ্ধি, অর্থ, সামর্থ্য যাঁহার যাহা আছে তাহাই দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে মহৎরূপ দান করুন। আমাদের এই আহ্বান শুধু দেশেল কতিপয় শিক্ষিত ও বিত্তশালী ব্যক্তির প্রতিই সীমাবদ্ধ নহে পরন্তু যে বিশাল জনতা যুগ যুগ ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কৃষি-শিল্প, বাণিজ্য ও নানাবিধ শ্রমজনক কার্য্যের দ্বারা নীরবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ গঠন ও ধারণ করিয়া আসিতেছে তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়াও বটে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান অধিবাসী সমন্বিত সমগ্র পাকিস্তানি জাতির চিত্ত শতদল বিকশিত করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অবিচল নিষ্ঠা সহকারে আমরা কর্মের পথে অগ্রসর হইব। আমাদের সমবেত সাধনা ও তপস্যা সকল কলুষ কালিমা সকল মোহ, সকল ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া জাতিকে এক মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। আজ যাহা উজ্জ্বল কল্পনা মাত্র কাল তাহা গৌরব মণ্ডিত বর্তমানে রূপায়িত হইবেই।[১১৫]

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক অজিতনাথ নন্দী তাঁর ভাষণে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এর পুনর্বিন্যাস ও সমন্বিতকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইংরেজ রাজত্বের কালে অশিক্ষিত ও শিক্ষিতের ব্যবধানের ফলে যে 'ভদ্র' সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> আমাদের যে সংস্কৃতি পরাধীনতার আওতায় বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা পরাধীনতার অপরিহার্য বিকৃতি ও সঙ্কীর্ণতা বহন করিবেই। আত্ম-ভ্রষ্ট সমাজ-জীবন বিদেশী প্রভূ শক্তির দ্বারস্থ হইয়া আত্মাবমাননার চরমে গিয়াছিল। অনুকরণ ও অনুগ্রহ

লিপ্সাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দেশের গভীরে যে প্রাণ-স্রোত প্রবহমান তাহার বেগ ও প্রবাহ হইতে এই সঙ্কীর্ণ সংস্কৃতি নিজের কল্পিত শূচিতা বাঁচাইয়া নিজের দূর্ভাগ্যকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছিল।

তিনি বলেন, লোক সংস্কৃতিই মূলত দেশের প্রাণ। দেশের সমগ্র জনসমষ্টিকে এক সূত্রে বেঁধে সমাজ-গঠন করতে চাইলে সবাইকে লোক সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে :

> এই লোকসংস্কৃতি যাহা প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত, যাহা আড়ম্বরহীন জীবন যাত্রার সরল সুষমায় রমনীয়, সেই সংস্কৃতির মুমূর্ষ শক্তি ও সাধনাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই সংস্কৃতি সহজ জীবনের আত্মপ্রকাশ, ইহার উপকরণ ও প্রেরণা প্রতি দিবসের দুঃখে সুখে চঞ্চল, সরল জীবনযাত্রা। এই জীবন মেঠো সুরে, রাখালিয়া সঙ্গীতে বাণীময় হইয়াছে। এই জীবনেরই রসবোধের তৃপ্তি সাধন করিয়াছে পল্লী আসরের জারিগান ও কবিগান। নানা অনুষ্ঠান ও উৎসব এই জীবনের রসতৃষ্ণায় তৃপ্তি আনিয়া দিয়াছে।

পরিশেষে তিনি বলেন, 'মূল সত্য এই যে, সংস্কৃতির বিচিত্র সৃষ্টি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। এই সত্যকে পাথেয় গ্রহণ করিয়াই আমাদের কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে।'[১১৬]

এই সম্মেলনেররও মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। সভাপতির ভাষণে সাহিত্যবিশারদ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির তৎকালীন অবস্থা, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিতর্ক, সাহিত্যে বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন :

> আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে-বাঙলা আমাদের সংস্কৃতির ভাষা হইতে পারেনা। আমাদের ধর্ম, ঈমান এই ভাষায় অটুট থাকিতে পারে না। এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের কাছে লজ্জার ব্যাপার।...সংস্কৃতি ধ্বংসের অনেক পথ আছে। জনসাধারণ-বিরোধী ও সমাজ-বিরোধী গোঁয়ার-নীতি তার অন্যতম উপায় বটে। কিন্তু তার পরিণাম পারস্যে আরবদের ভাগ্যের মতোই হইতে বাধ্য।[১১৭]

তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে তিনি উক্ত ভাষণে বলেন :

> আমাদের সংস্কৃতি-ধ্বংসের যে হীন আয়োজন নেপথ্যে চলিতেছে, তাহা ব্যর্থ করিতে পারেন কেবল আপনারাই। কারণ, সংস্কৃতির নির্বাণোন্মুখ দীপশিখা আবার আপনারাই জ্বালাইতে পারেন। একটি কথা আপনারা প্রায় শুনিয়া থাকেন–'জীবন বোধ'। কিন্তু দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি সম্মুখে থাকিলেই শুধু জীবন বোধ জাগ্রত হইতে পারে। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে দেশের ও মানুষের ইতিহাস জানা দরকার। এক কথায় স্বদেশ-প্রেমের মালা গাঁথিয়া গলায় পরা আবশ্যক। জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেম ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আমার এই বিশ্বাস আছে যে, আমার দেশের মৃত্যু নাই, আমার দেশের আত্ম যে জনগণ, তারও মৃত্যু নাই, তেমনই অমর আমার এই বাঙলা ভাষা।[১১৮]

এ সম্মেলনে দেশের সংস্কৃতি তথা বাংলাভাষা-আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রের নিন্দা করা হয়। এদেশের মানুষ যে একটি আলাদা সংস্কৃতির ধারক তাদের যে নিজস্ব ভাষা ও বক্তব্য আছে, সংস্কৃতি আছে তা স্মরণ করে দেওয়ার জন্য সম্মেলনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মেলন থেকে যুদ্ধ বন্ধ রাখা এবং শান্তির অনুকূলে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেখানে ঘোষিত হয় যে, প্রগতি শান্তি ও জীবন সৃষ্টি করার জন্য সম্মেলন বদ্ধপরিকর।

ঢাকার ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন (১৯৫২)

১৯৫২ সালে ১৭-২০ অক্টোবর কার্জন হলে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে 'ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।[১১৯] এই সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক আব্দুল গফুর। বস্তুত পূর্ব বাংলা লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানবাদী ভাবধারায় নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।[১২০]

ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকায় (অক্টোবর, ১৯৫২) সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। সেখানে সম্মেলনের লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয় :

> আমরা যদি পাকিস্তানকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' হিসাবে গড়ে তুলতে চাই তবে প্রথমে, 'ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ' সম্বন্ধে আমরা পরিস্কার ধারণা করে নেবো। আমরা আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যাবলীর তুলনায় ইসলামকে যাচাই করে নিতে

চাই। ইসলাম যে শ্রেষ্ঠতম মানবকল্যাণকর আদর্শ তা আমরা কোনো গোঁজামিল না দিয়ে বুঝে নিতে এবং অন্যান্যদের বুঝিয়ে দিতে চাই।[১২১]

অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রের স্বরূপ পাকিস্তান রাষ্ট্রে ফুটিয়ে তোলা এবং যুগোপযুগী ধ্যানধারণার সাথে ইসলামের মানব কল্যাণের আদর্শকে প্রকাশ করা ছিল সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া ইসলামি দর্শন ও তার গতিশীলতা নিয়ে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয় সুধী সমাজের কাছে সে বিষয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরা ছিল ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।[১২২]

সম্মেলনকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়–ইসলামি আন্দোলন, সমাজবিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য-অধিবেশন ও বিচিত্রানুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে আক্ষেপ করে বলেন যে, 'মুসলিম সাহিত্যিকরা যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যের বাস্তববাদিতা এবং সোভিয়েট সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে আত্মবিস্মৃত হয়েছে।'[১২৩] আধুনিককালের সাহিত্যের উদ্দেশ্যেহীনতা, যথেচ্ছচারিতা ও সমাজের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাবও তাঁর ক্ষোভের কারণ ছিল। এ অবস্থা যথেষ্ট ক্ষতিকর মুসলিম সমাজের জন্য। তাই এই যথেচ্ছাচারিতা ও উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যচর্চার পথ পরিহার করে নিজেদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যনির্ভর মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান রাখেন। এ সম্মেলনের সাহিত্য শাখার উদ্বোধনী ভাষণে কবি শাহাদাৎ হোসেন বলেন :

> জাতি গঠনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা কতখানি সে কথা আপনরা সবাই ভাল করে জানেন। আজকার এই সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের সাহিত্য কোন দিকে চলবে বা চলা উচিৎ-তার রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হবে তার গতি কোন খাতে প্রবাহিত-প্রতিভা, দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতার সমন্বয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগণ ও ফলগত সাহিত্য জাতির অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ন করে, একথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করবেন না। সেই জন্য জাতীয় সাহিত্যকে ব্যক্তি ও দলের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তাকে অখন্ড জাতীয় সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। সমগ্র জাতির জ্ঞান, কৃষ্টি, ধ্যান-ধারণা সেই সাহিত্যের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হবে।[১২৪]

'ইসলামী তমদ্দুন' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন হাসান জামান। ইসলামের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংস্কৃতি পুনর্গঠনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। সে বেশিষ্ট্যগুলো হলো : ইসলামের মৌলিক ভাব ও নীতিবোধ মানবিক ও সর্বজনীন, এর সামাজিক ফল মঙ্গলজনক ... সুকুমার ও মানবিক প্রবৃত্তি বিকাশের অনুকূল।[১২৫]

সম্মেলনে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানানো হয়। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার দাবি জানানো হয় যার মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রতিটি জেলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। পাকিস্তানের সকল প্রকার দেশি-বিদেশি সমাজবিরোধী অশ্লীল পত্রিকাকে নিষিদ্ধকরণ এবং ইসলামের অপব্যবহার করে শাসনকার্য পরিচালনা না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[১২৬] তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র সাপ্তাহিক *সৈনিকে*র দৃষ্টিভঙ্গিতে ঢাকার ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন ছিল সফল। বাস্তবে এটি ছিল ভাষা আন্দোলন উত্তরকালে হতাশ হয়ে পড়া রক্ষণশীল লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের মনোবল দৃঢ় করার জন্য আয়োজিত সম্মেলন। এখানে প্রবন্ধকার ও আলোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পূর্ব বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে ইসলামি ভাবধারা তথা পাকিস্তানি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে। বস্তুত এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পড়ে নি বললেই চলে।

চট্টগ্রামের লোক সংস্কৃতি উৎসব (১৯৫৩)

চট্টগ্রামের প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ ও কবিয়াল সমিতির উদ্যোগে ১৯৫৩ সালের ১৭-১৮ এপ্রিল জেএমসেন হলে প্রথম লোকসংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সভাপতি ছিলেন কবিয়াল রমেশ শীল এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক মাহবুব আলম চৌধুরী। যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নূরুল ইসলাম ও কণ্ঠশিল্পী কলিম শরাফী। দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীরা একত্রিত হন এবং বহুমাত্রিক লোকজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারা

লোকসংস্কৃতির চর্চাকে উজ্জীবিত ও বেগবান করাই এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল।[১২৭] অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র সিংহ তথ্যমূলক ও তত্ত্বসংবলিত ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রান্তিক সম্পর্কে কথাশিল্পী মাহবুব উল আলমের পর্যবেক্ষণ, 'তাঁদের কাজ হলো গণচিত্তে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষের আগুন ধরিয়ে দেয়া। তাঁদের প্রধান টার্গেট হলো প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা।'[১২৮] অভ্যর্থনা কমিতির সভাপতির অভিভাষণে মাহবুব উল আলম বলেছিলেন,

> এই নূতন সংস্থা গড়ে উঠতে পারে এক মাত্র সমবায়কে ভিত্তি করে। এই জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি চরিত্রের উৎকর্ষের এবং সমাজ-বোধের। এই দিকে লোক-সংগীত কিছু কিছু কাজ শুরু করেছেন। তার মধ্যে বৃদ্ধ কবিয়াল রমেশ শীল সহজেই লক্ষ্য-যোগ্য। কিন্তু, এর সঙ্গে যোগ হওয়া চাই একটা সংগঠনী প্রতিভার। আপনাদের সাহচর্য্য তাঁহাদিগকে নূতন প্রেরণা যোগাবে-এটাই আমাদের আশা।[১২৯]

মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, 'তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোককবি এবং লোকশিল্পী এসেছিলেন সম্মেলনে যোগ দিতে। কুষ্টিয়া থেকে একটি বাউল সম্প্রদায় এসেছিলেন বাউল গান পরিবেশন করতে। সিলেট এবং ময়মনসিংহের দুইজন লোককবি খুব সুন্দর গান করেছিলেন। সিলেটের কবি, যার নাম মনে আসছে না। তার গানের একটি পদ আমার এখনো মনে আছে : 'কলে চিপ দিলে উইড়া চলে কোম্পানির জাহাজ।'[১৩০] লোকসংস্কৃতি সম্মেলনের মাধ্যমে গণসংস্কৃতিকে তুলে ধরাই ছিল প্রান্তিকের মূল লক্ষ্য।

সিলেটের সংস্কৃতি সম্মেলন (১৯৫৩)

সিলেটে সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। এই সম্মেলনে সাহিত্য বিভাগের সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলাভাষা ও পূর্ব বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা নিয়ে বিশ্লেষণ ধর্ম বক্তব্য দেন। তিনি বলেন :

> কোন জাতির উন্নতির মাপকাঠি তাদের ধনৈশ্বর্য্য কিংবা রণসম্ভার নহে। সাহিত্যই তাদের উন্নতির ও গৌরবের একমাত্র পরিচায়ক। কোথায় সে প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসুরীয়, খাল্‌দীয় জাতি? কোথায় বিশ্ববিজয়ী রোমক জাতি? কোথায় হানিবল ও তাঁহার কার্থেজিয়ান জাতি? কোথায় দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার এবং তাঁহার মাসিদনীয় জাতি? কোথায় আটিলা ও তাঁহার হুণ জাতি? একে একে সকলেই পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আছে গ্রীক জাতির গৌরব হোমার, হেসিওদ, ইউরিপাইদিস, এসখাইলুস, সোফোক্লিস, আনাক্রিওন, সাফফো, পিথাগোরাস, সোক্রেতিস, প্লেতোন, আরিস্ততলিস, হিরোদোতস, যিনোফোন, প্লুতার্খ, হিপ্পোক্রেতিস, গালেন, প্তোলেমিউস, ইউক্লিদ। আছে রোমের গৌরব ভার্জিল, হোরেস, প্লউতস, কিকিরো (Ciccro), সেনেকা, সাল্লুত, লুক্রেতিউস, কাতাল্লুম, লিবি, তাকিতুস (Tacitus), লুকান। শত আলেকজান্ডার বা শত সীযর গ্রীক বা রোমক জাতির যে গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেন না, সে গৌরব এই সমস্ত সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা তাঁহাদের জাতির জন্য অর্জন করিয়া গিয়াছেন। আরব জাতির রাজনৈতিক প্রচণ্ডমার্তণ্ড-প্রতাপ অস্তমিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অবদানের জন্য আজিও সভ্য জগৎ তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তণ করিতে বাদ্য হয়। ... আরব জাতীয় সাহিত্যিক অবদান প্রচুর এবং মহিমাময়। যদি গত বিশ্বসমরে আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ বা জার্মান জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, তবুও তাঁহাদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতি প্রতিভা তাঁহাদের গৌরবকে চিরদিন অক্ষুণ্ন রাখিত। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলিয়া আমরা পাকিস্তানকে গৌরবান্বিত করিতে পারিব না। পাকিস্তানকে যিন্দা রাখিতে হইবে, তাহার সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অবদান দ্বারা। এই জন্য পাকিস্তানের প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলি, যথা বাংলা, পাঞ্জাব, পুশতু, সিন্ধী ও বালোচী এবং পাকিস্তানের আগন্তুক ভাষা উর্দ্দু-ইহাদের সকলেরই সাহিত্যিক উন্নতির জন্য পাকিস্তান সরকারের এবং এই ভাষাভাষীদের ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োজন।[১৩১]

ঢাকার সাহিত্য সম্মেলন (১৯৫৪)

১৯৫৪ সালের ২৩, ২৪ ও ২৬ এপ্রিলে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন। এ সম্মেলনে শিল্পীদের সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগীত শ্রোতাদের মনে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।[১৩২] এ সাহিত্য

সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ আবদুর রহমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন ও আবদুল গণি হাজারী যুগ্ম সম্পাদক এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই প্রমুখ ১৮ জনকে সদস্য করে কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।[১৩৩]

সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খান তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন,

> আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির গত ছয় বৎসর আমাদের প্রতিটি মানুষের কেটেছে এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে...। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা, বাংলা যে আমাদের ভাষা, বাংলা যে আমাদের সাহিত্য, বাঙালির সংস্কৃতি যে আমার সংস্কৃতি এই ঘোষণাটি করতে আমরা ভয় পেতাম।[১৩৪]

কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রদেশের বিভিন্ন জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচশত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সভাপতিত্ব করেন আবদুল গফুর সিদ্দিকী। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে ড. সাঈদ-উর-রহমান লিখেছেন :

> ১৯৫৩ সনের শেষের দিকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে প্রদেশের সংস্কৃতিসেবীরাও ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য উদযোগী হন। কয়েকবার তারিখ পরিবর্তিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেটা অনুষ্ঠিত হয় ... ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ এর উদ্বোধন করেছিলেন।[১৩৫]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষণে মুসলিম লীগ সরকারের সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। এবং বলেন,

> ১৯৪৮ সনের পর বিষাক্ত আবহাওয়ায় এই পর্যন্ত কোন সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভব হয়নি। আজ জনপ্রিয় পূর্ব বাঙলার গভর্নমেন্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনর আয়োজন করেছি।[১৩৬]

তিনি আরও বলেন, 'পূর্ববঙ্গবাসীদের উদারতা যে তারা চার কোটি লোকের ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি না করে বরং উর্দুকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে মানতে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে কেউ কেউ এখনো হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে তারা পাকিস্তানের দুশমন।'[১৩৭]

সকল জেলা থেকে আগত প্রতিনিধির মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় উক্ত সম্মেলনে আলোচনা, সংগীত, প্রদর্শনী, আবৃত্তি, পাঠ ও মুশায়েরা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ১০৮ জন শিল্পী-সাহিত্যিকের এক যুক্ত আবেদনপত্রে সম্মেলনের মূলনীতি পরিস্ফুট হয়েয়ে বলে মনে করা সংগত। তাঁরা বলেন :

> সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ব বাঙলার শিল্পী সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্য তাঁদের মূল মন্ত্র। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের দায়িত্ব হলো জাতীয় প্রগতি, বিশ্ব শান্তি ও দেশ মানবের কল্যাণে সৃষ্টিক্ষমতাকে কাজে লাগানো, বাঙলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে প্রবহমান ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সকল রকম বিকৃতি, কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা এবং জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্পদায়গত সকল প্রকার বৈরীভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে সাহিত্যের উপজীব্য করা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায্য আসনের সাহিত্যিকদের অনৈক্য, ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা, অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি, পুস্তক প্রকাশের সমস্যা, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ইত্যাদি।[১৩৮]

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ আলোচনাক্রমে ভাষা ও সংস্কৃতি চেতনার ক্ষেত্রে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের ধারাকে প্রবহমান রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেখানে মননশীল বুদ্ধিজীবী আবুল ফজল উদাত্ত চিত্তে বলেন, 'ইতিহাসের চাকা কখনো পেছনে ঘোরে না। বরকত, সালামের রক্তে যে রাঙ্গা প্রভাতের সূচনা হয়েছে তারই আলোয় বাংলার মানুষ নিজেকে নতুন করে চিনতে শিখবে।'[১৩৯]

এ সম্মেলনের প্রথম দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁদের সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগীত শ্রোতাদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্ট করে।[১৪০]

মাহবুব আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় শতাধিক শিল্পী-সাহিত্যিকের একটি দল অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪-র ঢাকা সম্মেলনের চট্টগ্রামের প্রান্তিক নব নাট্য সংঘের সাফল্য তাঁদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারি কোপানলে পতিত হন তাঁরা। প্রান্তিকের সদস্যদের গোঁড়া কমিউনিস্ট বলে সরকার ধরে নিলেন। প্রান্তিকের সদস্যদের উপর নির্যাতন চলতে

থাকলো। কেউ কেউ কারাবন্দী হলেন। কেউবা 'আন্ডার গ্রাউন্ডে' গা ঢাকা দিলেন। কেউ চলে গেলেন ভারতে। এ পরিস্থিতিতে 'প্রান্তিক' এর জামাল খান রোডস্থ দড়মার বেড়ার দোচালা ঘর তালাবদ্ধ হয়ে যায়।

এরপর চট্টগ্রামের মাহবুব হাসান প্রমুখের 'ইস্ট এন্ড ক্লাব' গড়ে ওঠে। ৯২(ক) ধারা জারির পর 'প্রান্তিক'কে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেক সদস্য 'প্রান্তিক' এর ছত্রতলে জড় হতে ভয় পেলেন রাজরোষের কারণে। 'কৃষ্টি কেন্দ্র' (১৯৫৬) নামে প্রান্তিককে অতপর টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। এই কৃষ্টি কেন্দ্রের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে আবুল ফজল ও আবুল হাসনাত। রাজকাপুর লেনে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে, 'কৃষ্টি কেন্দ্রের' সাহিত্য সংগীত ও নাট্য বিভাগ চালু করা হয়। সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সুধাংশু ভট্টাচার্য। সাহিত্য আসরে নিয়মিত যোগ দিতেন শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আইনুন নাহার, নুরুন্নাহার, দীননাথ সেন, সুচরিত চৌধুরী, সুনীল চক্রবর্তী প্রমুখ।[১৪১]

বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (১৯৫৫)

মাহমুদ নূরুল হুদার এ প্রতিষ্ঠানটি গঠনের জন্য প্রস্তাব দেন। বুলবুল একাডেমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ ও প্রচারের কর্মসূচি চালিয়ে যেতে একটি বুলবুল স্মৃতি সম্মেলন করার লক্ষ্যে মাহমুদ নূরুল হুদাকে আহ্বায়ক করে ১০০ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।[১৪২] ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ থেকে ৫ দিন ব্যাপী এ সম্মেলন হয়।[১৪৩] বুলবুল স্মৃতি সম্মেলন হওয়ার পরে ২৫ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীমের বাসভবনে তাঁরই সভাপতিত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়। ঐ দিন বেগম আফরোজা বুলবুলকে পরিকল্পিত এ একাডেমির প্রিন্সিপাল করা হবে। ১৯৫৫ সালের ১৭ মে বুলবুল ললিতকলা একাডেমির উদ্বোধন করা হয়।[১৪৪] ৭নং ওয়াইজঘাটে জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে গড়ে ওঠে বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস। এই একাডেমির সবচেয়ে বড়ো অবদান সংস্কারমুক্ত সংস্কৃতিচর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাধা ও মুসলিম সমাজের সংস্কার ভেঙে নৃত্যকলাকে প্রতিষ্ঠা করায় এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।[১৪৫] মূলত রক্ষণশীলতার বিপক্ষে নৃত্য ছিল একটি বড়ো অস্ত্র যা সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি প্রথম মঞ্চস্থ করে বুলবুল একাডেমির শিল্পীরা। ভক্তিময় দাস গুপ্তের তত্ত্বাবধানে মন্দিরানন্দি নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন।[১৪৬] বুলবুল ললিতকলা একাডেমি ১৯৬৩ সালে জসিমউদ্দিন *মনোনীতা* এবং ১৯৬৯ সালে আনিস চৌধুরী *মানচিত্র* নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করে। এছাড়া ১৯৬৮ সালে ঢাকার জেলা প্রশাসকের আমন্ত্রণে বুলবুল একাডেমির পক্ষ থেকে *সোনালী ফসল* নামে একটি নৃত্যনাট্য করা হয়। তার বিষয়বস্তু ছিল সেলো মেশিনের সাহায্যে সেচের মাধ্যমে ইরি চাষ, নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি ইত্যাদি। পরিশেষে বাংলার কৃষকের ঘরে নবান্নের উৎসব।[১৪৭]

শুধু নৃত্যচর্চা বুলবুল একাডেমি সীমাবদ্ধ থাকে নি। অসযোগ আন্দোলনের সময় সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রমেও অংশ নেয়। তারা ৫ মার্চ বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংগীত, নাটক ও অন্যান্য সকল চারুকলা ও কারুকলা শিল্পীদের এবং সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের এক সভা বুলবুল একাডেমির ধানমন্ডি শাখায় অনুষ্ঠিত হয় এবং বিবৃতিতে শিল্পীগণ স্বাক্ষর দান করেন।[১৪৮]

পূর্ব পাকিস্তান আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক সম্মেলন (১৯৫৫)

১৯৫৫ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তানি আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক সম্মেলন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে ছাত্র সংসদ এ সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীজোৎস্নাময় বসুকে সভাপতি ও অধ্যাপক আলি নওয়াজকে সম্পাদক করে

অভ্যর্থনা পরিষদ গঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন কলেজ এতে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খান, উদ্বোধন করেন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।[১৪৯]

সম্মেলনে প্রথম দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সম্মেলনে আগত অতিথিদের ভাষণ, চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা, গণসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, লোকগীতি ও আধুনিক গানের আসর। গণসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত পরিবশেন করেন সুখেন্দু চক্রবর্তী ও পরিমল দত্ত। ঈশ্বর পাঠশালায় ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন অধ্যাপক বদরুল হাসান। কমরুল হাসান প্রদর্শনীর প্রশংসা করেন। সাহিত্য অধিবেশনে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুচরিত চৌধুরী রচিত ও পরিচালিত 'পার্কের কোণে' নাটক মঞ্চস্থ হয়। মুনীর চৌধুরী অভিনীত 'অরুণোদয়ের পথে' নাটকটি প্রশংসিত হয়। সম্মেলনে আরও ছিল ফুটবল প্রতিযোগিতা, শিক্ষা অধিবেশন, মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা। সম্মেলনে বই, সূচিশিল্প ও ডাক টিকিট প্রদর্শনী ও আমানুল হকের আলোকচিত্র প্রদর্শনী 'আমার দেশ' অন্তর্ভুক্ত ছিল। গীতিনাট্যে প্রথম হয়েছিল সুখেন্দু চক্রবর্তীর দল।

মূল সভাপতির ভাষণে আবদুর রহমান খান বলেন, 'আমি এই সম্মেলনকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি কেননা জাতি বিশেষে উন্নতির মান তার সংস্কৃতি। জাতির উন্নতির সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপকরণ তার সাহিত্য। আমাদের দেশে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে বিজ্ঞান ধর্মবিরোধী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের কোন বিরোধ নেই।' 'সাহিত্যে কবিতায়, সংগীতে নৃত্যে দেশব্যাপী এই সম্মেলনের স্বর্ণফসল নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।'

সম্মেলনে চট্টগ্রামের শতাধিক শিল্পী-সাহিত্যিক নিয়ে মাহবুব উল আলম চৌধুরী যোগদান করেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক সম্মেলনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[১৫০]

ড্রামা সার্কেল (১৯৫৬)

সংস্কৃতি সংসদ থেকে পঞ্চাশের দশকেই 'ডাকসু নাট্য দল' এবং 'ড্রামা সার্কেল' গঠিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ 'ডাকসু'র তৎকালীন প্রমোদ সম্পাদক মীর মকসুদুস সালেহীনের উদ্যোগে ১৯৫৬ সালের ৬ অক্টোবর নাটককে জীবনমুখী করে তোলার প্রয়াস নিয়ে গঠিত হয় ড্রামা সার্কেল। এই গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য ছিল পেশাদার মঞ্চরীতির বাইরে নতুন ধারার নাটক মঞ্চায়ন করা। এজন্য গোষ্ঠীর কর্মীরা নাটকের দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও অভিনয়ে নতুনত্ব আনয়ন করেন। ড্রামা সার্কেলের প্রথম সভাপতি ছিলেন আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ খান, পরে হাসান হাফিজুর রহমান ও মুনীর চৌধুরী। পরবর্তীতে সভাপতির পদটি উঠে গেলে একজন পরিচালকের অধীনে সংগঠনটি চলতে থাকে। এর প্রথম পরিচালক ছিলেন মকসুদুস সালেহীন তিনি বিদেশে চলে গেলে পরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন বজলুল করিম। ড্রামা সার্কেলের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা ছিলেন মাসুদ আলী খান, আবদুল্লাহ আর মামুন, দীন মুহাম্মদ খান, ফকরুজ্জামান চৌধুরী, জিয়া হায়দার, তওফিক আজিজ খান সৈয়দ রওশন, ফজলুল করিম, মনতাসিন বিল্লাহ, আফজাল করিম, মাসিহুল করিম, মোহাম্মদ হোসেন খান, আতাউর রহমান, সৈয়দ আহসান আলী প্রমুখ।[১৫১]

পাকিস্তানি শাসনামলে পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম মাধ্যম ছিল নাটক। যে মাধ্যমের দ্বারা রূপকভাবে শোষণ-বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বতঃফূর্ত প্রতিবাদ জানানো হয়। সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ সংগঠনের ভূমিকা পালন করে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী' মঞ্চায়নের মাধ্যমে সংস্কৃতি সংসদ প্রথম নাটক মঞ্চায়ন শুরু করে। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন সে সময়ের ঢাকার আধুনিক নাট্য পরিচালক হাবিবুল হক, সহ-পরিচালক মেডিকেল কলেজের ছাত্র শরফুল আলম। 'জবানবন্দী' নাটকে পুরুষ চরিত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কামাল আহমেদ, কাজী আব্দুল মুকিত, আজিজুল জলিল, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আর মেয়েদের চরিত্রে লায়লা সামাদ, রোকেয়া কবীর এবং নূরুন্নাহার অভিনয় করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের ঐ নাটকেই প্রথমবারের মতো নারী চরিত্রে ছাত্রদের বদলে ছাত্রীরা অভিনয় করে। এই সম্পর্কে ওবায়দুল হক সরকার লিখেছেন,

বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাট্যানুষ্ঠান এদেশের নাট্য ধারায় বিপ্লবের সূচনা করে। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রথম মঞ্চে একত্রে অভিনয়ের দুঃসাহস প্রদর্শন করেন। দুঃসাহস এ কারণে যে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে মুসলমান ছেলেদের পক্ষেই নাটক করা সহজসাধ্য ছিল না। মেয়েদের ত কথাই নেই... ১৯৪৭-এ দেশে স্বাধীন হলো কিন্তু দেশের মেয়েরা স্বাধীনতা পেলো না, তাছাড়া তাদের ঘরে বন্দী করে রাখা হতো। তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতো না। রেডিওতে মুসলমান মহিলা শিল্পী গান গাইতে সাহস পেতো না। প্রযোজক ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে মহিলা শিল্পীর বাড়ীতে ধরনা দিতেন। 'আমার চাকরি বাঁচান, প্রোগ্রামটা করে দিন' বলে কোন মতো শিল্পীকে নিয়ে আসতেন। পর্দা ঘেরা ঘোড়ার গাড়ী রেডিও স্টেশনের (নাজিমউদ্দিন রোড) ভিতরে এসে থামতো। বড় পর্দা পুষিদার মধ্যেও শিল্পীকে কথা শুনতে হত। সেই পর্দা ভেদ করে প্রকাশ্যে মঞ্চে পর-পুরুষের সাথে অভিনয়–এ যে কত বড় বিপ্লব আজ তা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। আজ নাটক নন্দিত, তখন নাটক ছিল নিন্দিত, আজ নাটক করলে সম্মান ও সম্মানী লাভ হয়, তখন জুটতো সম্মার্জনী।[১৫২]

ড্রামা সার্কেল প্রযোজিত প্রথম নাটক 'কবয়' (পয়েন্টারস অব ইসফাহান এর বনফুলকৃত অনুবাদ) গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা দিবসেই ঢাকার কার্জন হলে মঞ্চস্থ হয়। এতে অভিনয় করেন মাহমুদ হাসান, তওফিক আজিজ খান, জহরত আরা, আবিদ হোসেন, মোরশেদ চৌধুরী প্রমুখ। এ বছরই গোষ্ঠীটি কলকাতায় আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র* মঞ্চস্থ করে; পরে এটি পাকিস্তানেও অভিনীত হয়। ড্রামা সার্কেল মৌলিক নাটকের পাশাপাশি গ্রিক ও ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ ও রূপান্তর, ধ্রুপদী কাব্য নাটক, নৃত্য ও সংগীত সমৃদ্ধ নাটক, রূপকধর্মী নাটকও প্রদর্শন করে। তবে এই সংগঠনের কার্যক্রম খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬৪ সালে বজলুল করিম যুক্তরাজ্যে চলে গেলে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ইতঃমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যার ফলে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠে আর এই সত্তার প্রতিফলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

উপর্যুক্ত পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্মেলনগুলো পঞ্চাশের দশকে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনগুলো প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় পক্ষের দ্বারাই আয়োজন করা হয়। সম্মেলনগুলোতে যে আলোচনা-পর্যালোচনাগুলো হয় তা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মননচর্চার খোরাক যোগায় এবং মানসগঠনের সহযোগিতা করে। পঞ্চাশের এই ধারাবাহিকতা ষাটেও অব্যাহত ছিল। আমরা ষাটের দশকের আলোচনার সূচনা করবো ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত কাগমারী সম্মেলন থেকে।

কাগমারী সাংস্কৃতি সম্মেলন (১৯৫৭)

১৯৫৬ সালের শেষের দিকে ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন করার প্রস্তাব দেন। উপস্থিত সবাই তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন।[১৫৩] সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জনমত গঠনের জন্য নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলের জন্যই এ সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।[১৫৪] এজন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠত করা হয়। এ কমিটির আহ্বায়ক ছিল–মওলানা ভাসানী। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন–কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, খায়রুল কবীর, ফকীর শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান এবং সদরি ইস্পাহানি।[১৫৫] ১৯৫৭ সালের ৮-১০ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষ্যে অন্যতম একটি পর্ব হিসেবে এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কাগমারীতে আয়োজিত আন্তর্জাতিকমানের সাংস্কৃতিক সম্মেলন সমগ্র পাকিস্তানে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির এই যোগসূত্র নির্মাণ ছিল খুবই তাৎপর্যবহ। বস্তুত, এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'রাজনৈতিক সংকট নিরসনের প্রচেষ্টা, জনগণের ও জাতির স্বার্থের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির মধ্যেকার বিভাজনরেখা স্পষ্ট করা এবং গণতন্ত্রের পতাকাবাহী ধূর্ত ও কপটদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা'।[১৫৬]

এই সম্মেলনের তারিখ ঘোষণার পর 'পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবী/পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী' জানিয়ে ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৭ মওলানা ভাসানী একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। প্রচার পত্রটি তুলে ধরা হলো[১৫৭] :

পূর্ব বাংলার গরীব চাষী, মজুর, ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণের প্রতি আমার আবেদন

ভাইসব,

এ দেশ শুধু মন্ত্রী, মেম্বার, সরকারী কর্মচারীদের নহে-এ দেশ অগণিত জনগণের দেশ। যাহারা এ দেশ পরিচালিত করেন, তাহারা শতকরা ৯৫ জন গরীব চাষী, মজুর, কামার-কুমার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জনসাধারণের টাকা দিয়া চলেন। এ দেশের সরকার জনগণের সরকার। তাই জনগণের স্বার্থ রক্ষাকল্পে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি চোরাকারবারী প্রভৃতি সকল রকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ভয়ভীতি ত্যাগ করিয়া ঐক্যবদ্ধ হউন। পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী এবং মহান ২১ দফার বাকি ১৪ দফা দাবী পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমি আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে সপ্তাহব্যাপী সন্তোষ কাগমারীতে এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করিয়াছি। দল, মত, জাতিধর্ম নির্বিশেষে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিয়া জনগণের দাবী আদায়ের আন্দোলন জোরদার করুন।

কর্মসূচী

৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী- পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা।

৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে–কৃষি, শিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। প্রদর্শনীর জন্য শ্রেষ্ঠ দ্রব্যসম্ভার আনয়নের এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য শিল্পীগণকে অনুরোধ জানান যাইতেছে। থাকার ব্যবস্থা করা হইবে, বিছানা সঙ্গে আনিবেন।

জনগণের নগণ্য খাদেম

মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৩ জানুয়ারী ১৯৫৭

মওলানা ভাসানী মনে করতেন, 'দেশকে বাঁচাতে হলে কৃষি শিল্পের মতো সুকুমার শিল্পেরও উন্নতি প্রয়োজন। তাই তিনি সবসময় মানুষের নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশের দিকে নজর দিতেন খুব বেশি এবং রাজনীতিকে সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কখনও ভাবতেন না'।[১৫৮] বস্তুত মওলানা ভাসানীই ছিলেন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি সংস্কৃতির সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিপূরক হিসেবে দেখেছেন চিরকাল। এই নীতি ও আদর্শেরই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল কাগমারীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের যুগল আয়োজন।

কাগমারী সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে সমগ্র পাকিস্তানের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণসহ কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ও মিসর থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। পাকিস্তান থেকে প্রায় শতাধিক শিল্পী-সাহিত্যিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সর্বসাধারণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সম্মেলনে সহস্রাধিক লোকের সমাগম ঘটে। রাজনৈতিক সম্মেলন শেষে ৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৭) বিকেল থেকে সাংস্কৃতিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। এটি উদ্বোধন করেন পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, 'দেশের রাজনৈতিক দুর্যোগের দিনে তিনি (মওলানা ভাসানী) আমাদের গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। আজ তিনিই আবার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবজীবন দান করতে এগিয়ে এসেছেন।'[১৫৯]

সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মূল সভার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া দেশের গৌরবময় সংস্কৃতিতে রেনেসাঁ সম্ভব হবে না'। এ ছাড়া তিনি ঐক্যের ভিত্তিতে সর্বজনীন সংস্কৃতি বিনির্মাণের জন্য সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।[১৬০]

সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মওলানা ভাসানী তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, 'সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সৌহার্দ্য গড়ে তোলা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা'।[১৬১]

তিনি দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাজমান অবক্ষয়ের কারণসমূহ খুঁজে বের করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৬২] এই ভাষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, তিনি এতে পূর্ব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের উপনিবেশবাদী মানসিকতার সমালোচনা করেন এবং তাঁদের সতর্ক করে দেন। ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়ে মওলানা ভাসানী সেদিন বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ যদি বন্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে, যখন পূর্ব পাকিস্তান হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানকে জানাইবে 'আসসালামু আলায়কুম'।[১৬৩]

নাট্য বিভাগের তৎপর ছিলেন কাজী আলী ইমাম, মাহবুব হাসান, দীননাথ সেন, সি এম রোজারিও, আমিনুল ইসলাম, মনি ইমাম, মীরা সেন প্রমুখ। সংগীত বিভাগের নেতৃত্বে ছিলেন কলিম শরাফী। 'কৃষ্টি কেন্দ্র' মাহবুবউল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিকের দল নিয়ে যোগদান করেন।[১৬৪]

কাগমারী সম্মেলন উপলক্ষ্যে ৫১টি তোরণ নির্মাণ করা হয় এবং অসংখ্য ব্যানার ফেস্টুনের ভরা ছিল আয়োজনের চারদিকে। কবি মাহবুব সাদিক একটি ব্যানারের কথা তুলে ধরে :

> যে ডালে তুমি বইসা আছো
> সে ডাল তুমি কাইটো না
> জনতার কথা ভুইলো না।[১৬৫]

এই স্লোগানের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে জনতার শক্তি ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কাগমারী সম্মেলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের একটি ছিল সাংস্কৃতিক সম্মেলন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রূপ দেওয়ার জন্য দূতাবাস এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ও মিশর থেকে প্রতিনিধি আসেন। তৎকালে কাগমারী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল সারা পাকিস্তানে। সত্যিকার বললে পাক-ভারত উপ-মহাদেশে। কারণও ছিল অনেক। এই সম্মেলনের পরে আওয়ামী লীগ ভেঙে 'ন্যাপ' গঠিত হয় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে। সেজন্য রাজনৈতিক ইতিহাসেও এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। সম্মেলনের নানা বক্তব্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করে।[১৬৬] মুসলীম লীগ সরকার, তার সমর্থক গোষ্ঠী তথা পাকিস্তানবাদী বাঙালিরা এই সম্মেলনকে দেখেছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও ইসলামবিরোধী তৎপরতা হিসেবে। এই সময়কার *মাসিক মোহাম্মদী* ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা আর *দৈনিক আজাদ* ও প্রচলিত সংবাদপত্রে এ বিষয়ে নানান খবর, মতামত ও বিতর্ক লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।[১৬৭]

আজাদ পত্রিকায় ১৩, ১৪, ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৭) তারিখে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় 'কাগমারী সম্মেলন' শিরোনামে। এগুলোতে লেখা হয় :

> ...কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশ হইয়া গেল। তার সাথে একটি তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক' সম্মেলনের অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তথাকথিত বলিয়া অভিহিত করিলাম এই জন্য যে, পাক বাঙলার সাহিত্য তমদ্দুন লইয়া যাঁরা চর্চা করিয়া থাকেন তাঁদের অধিকাংশকে এই সম্মেলনে যোগদান করতে আবেদন জানানো হয়নি। যে কিছু সংখক সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী এ সম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁদের আবার বেশির ভাগই ছিলেন এক বিশেষ দল বা মতের ধারক ও বাহক। তাই এই সাংস্কৃতিক সম্মেলন কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব মূলক বলা চলে না ...।[১৬৮]
>
> সম্মেলনের অনুষ্ঠান উদ্যোক্তারা পাক বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে মোটেই মাথা ঘামাতে চান নাই। চাহিয়াছেন পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী একটা বিজাতীয় ভাবধারা সাহিত্য সংস্কৃতির নামে চালু করিতে...।[১৬৯]
>
> এই সম্মেলন ও তার সকল সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে যা স্পষ্ট হইয়া ওঠে, তা হইল একটি দলের কুচক্রী হস্তের খেলা। ...তাদের মতলব ছিল ঘরে ও বাহিরে পাকিস্তানী স্বার্থের উপর আঘাত।[১৭০]

আজাদের এই মনোভাব ও বক্তব্যই ছিল সম্মেলন সম্পর্কে সকল পাকিস্তানবাদীর বক্তব্য। তাঁরা নিন্দা, বিদ্রুপ ও সমালোচনা করলেও, কিন্তু পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট মোকাবেলার কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধানের কথা কোথাও বলেননি। বস্তুত তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ও সাংস্কৃতিক উত্তরণ দেখে ভীত হয়ে পড়েন।

প্রবোধকুমার সম্মেলনে ভাষণে বলেন :

> এখানকার সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি প্রাণের অভিব্যক্তি দেখেছি। সম্মেলনের আশপাশে যে কর্মকাণ্ড দেখেছি, তা অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। এই সার্থকতার ব্যাকুলতা, স্নেহ ও বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও সাম্যের প্রতি অনুরাগের বাঙালি-প্রাণের এত বড় আয়োজন আর কোথাও দেখিনি। পূর্ব বাংলা আজ এক আদর্শ মিলন-মোহনায় পরিণত হয়েছে। এখানে এসে এই মিলন- মোহনায় অবগাহন করলাম।[১৭১]

তারাশঙ্কর বলেছিলেন :

> মাতৃভাষা ও সাহিত্যের জন্য রক্ষদানের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। পূর্ব বাংলার মানুষ এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, আমরা পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অহিংসা ও সততার বাণী বুকে নিয়ে সংস্কৃতির মুক্তিতীর্থে আমাদের দীর্ঘ যাত্রাপথ। সেই স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছাতে পারলেই আমাদের সংস্কৃতি-সাধনায় সার্থকতা।[১৭২]

কাজী আবদুল ওদুদ সম্মেলন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় বলেন :

> কাগমারীতে মওলানা ভাসানীকে একটু নিরিবিলিতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম–তিনি কি করতে চাচ্ছেন। তার উত্তরে যা তিনি বলেছিলেন তার একটি অংশ এই : 'আমাকে অনেকে কমিউনিস্ট বলে। কিন্তু আমি কমিউনিস্ট নই। ইসলামে মানুষের কর্তব্যকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখা হয়েছে–আল্লাহর প্রতি কর্তব্য আর মানুষের প্রতি কর্তব্য। মানুষের প্রতি কর্তব্য পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে, নিদারুণভাবে অবহেলিত হচ্ছে; সেই কথাই আমি দেশের সবাইকে বলছি।' ধর্মবর্ণনির্বিশেষে দেশের সবার প্রতি মওলানা সাহেবে কি গভীর দরদ, তাও প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল কাগমারীতে।[১৭৩]

কাগমারী সম্মেলনের ভিতর দিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে এবং সাম্প্রদায়িক মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা দুর্বল ও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১৭৪] শুধু তাই নয় এ সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং তার ফল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি ও দার্শনিক ভিতভূমি নির্মাণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অন্যতম। বাঙালি জাতি একটি সুপ্রাচীন যৌথ সংস্কৃতির অধিকারী। এ সংস্কৃতিতে আদিবাসী, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় ও বর্ণের বিশিষ্ট অবদান আছে। বাঙালি জাতির যৌথ উদ্যমে ও আয়োজনে শত শত বৎসরব্যাপী গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সৃজিত বাঙালির আলাদা জাতি সত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন :

> কাগমারী সম্মেলনকে শুধু একটি সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক সম্মেলন হিসেবে দেখলে তার যথার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আড়ালে থেকে যাবে। স্বশাসিত পূর্ব বাংলা কীভাবে সাংস্কৃতিকভাবে স্বতন্ত্র ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে, সে ব্যাপারে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অভিমত জনগণকে অবগত করানোও মওলানার উদ্দেশ্যে ছিল।[১৭৫]

আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর *আত্মস্মৃতি*তে বলেন, 'বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সকল কবি সাহিত্যিক শিল্পী লোকশিল্পী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আমরা নিমন্ত্রণ করেছিলাম। এ ব্যাপারে কোনোরূপ রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ছিল না।'[১৭৬]

সিপাহি বিপ্লবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান (১৯৫৭)

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে ঢাকার কার্জন হলে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ২৯ থেকে ৩১ মার্চ তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান।[১৭৭] অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক হাসান জামান, মূল অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান

খান। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষদিনে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করতে গিয়ে অধ্যাপক মাহফুজুল হক বলেন, 'যে-সমস্ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে সিপাহী বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে সবের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসই ছিল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য'।[১৭৮]

অনুষ্ঠানটি ছিল পূর্ব বাংলার তৎকালীন রক্ষণশীল ও পাকিস্তানবাদী মানসের প্রতিফলন। অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ লেখক বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদী আদর্শে রচিত প্রবন্ধগুলো[১৭৯] তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাঙালি সংস্কৃতির চেতনার বহিঃপ্রকাশ এখানে ছিল না বললেই চলে। এখানে প্রগতিপন্থি ও পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার কোনো প্রতিফলন ছিল না। বস্তুত কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রভাব ঠেকাতেই উদ্যোক্তরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।[১৮০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সাহিত্য সেমিনার অনুষ্ঠিত (১৯৫৮)

কাগমারী সম্মেলনের পর পূর্ব বাংলায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিল্প-সাহিত্য চর্চার আগ্রহ বাড়তে থাকে। ফজলুল হক হল মিলনায়তনে **১৯৫৮** সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রথম সেমিনার আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ আয়োজনে বেশকিছু বিদেশি সংস্থার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।[১৮১] **১৯৫৮** সালের প্রথম দিকে রকফেলার ফাউন্ডেশন পূর্ব বাংলার সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক আলোচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩৭০০ ডলার অনুদান দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের তত্ত্বাবধানে বিশালাকার আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রতিনিধিত্বশীল সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচকদেরকে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের পয়সা খাওয়ানো এবং পূর্ব বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'প্রভাব' বিস্তার।[১৮২] প্রতি মাসে একটি করে আড়ম্বরপূর্ণ ৮টি সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সেমিনারে এক বা একাধিক প্রবন্ধ পাঠ ও তার ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রথম সেমিনারের উদ্বোধন করতে এসে উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম[১৮৩] উল্লেখ করেন, 'আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন করা, বিদেশে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ঘটানো এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন সেমিনার অনুষ্ঠানের মূল প্রেরণা।' সেমিনারে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। এখানে পঠিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–'পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের বর্তমান নাম', পূর্ব পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সমসাময়িক রহস্য উপন্যাস', 'ইংল্যান্ড ও পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িক লেখনীতে বিচ্যুতি', 'বাংলা সাহিত্যে ভাবালুতা', 'সমকালীন কথাসাহিত্যে ও বাংলা নাটকে ভাবালুতা', 'বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজ চেতনা' ও বিমূর্ত চিন্তার বাহন হিসেবে বাংলা গদ্য'। প্রবন্ধকারদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন–জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, নূরুল মোমেন, আবুল হোসেন, খান সারওয়ার মুরশিদ, হাসান জামান, মুনীর চৌধুরী, আসকর ইবনে শাইখ, কবির চৌধুরী ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন।[১৮৪]

সমকালীন কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রবন্ধকার জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী পূর্ববাংলার কবিতার ঐতিহ্য নিয়ে বিতর্কের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে, 'ইসলামপন্থী ধারা ও আবহমান বাংলা ঐতিহ্যের ধারার সার্থক সমন্বয়ের মধ্যে এদেশের সাহিত্যের মুক্তি নিহিত।'[১৮৫]

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, চট্টগ্রাম ১৯৫৮

১৯৫৮ সালের ২-৪ মে মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'।[১৮৬] সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মওলভী আবদুর রহমান ও মওলভী নূরুল ইসলাম চৌধুরী। চট্টগ্রামের 'বিখ্যাত দেশকর্মী, বিরাট ব্যবসায়ী রফিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, তাঁর পুত্র সাইফুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী ও 'বিজনেস ম্যাগনেট' এ কে খান (১৯০৫-৯১) অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।[১৮৭] অনুষ্ঠানের মূল তাৎপর্য ছিল প্রগতিশীল আন্দোলনের আদি কেন্দ্র চাঁটগায়ে 'পাকিস্তানি আদর্শ' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।[১৮৮] অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নূরুল ইসলাম চৌধুরী সম্মেলনের

কার্যবিবরণী পেশের সময় বলেন, 'দেশে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য গড়ে না-ওঠায় ও বিদেশী ইমেজের অনুপ্রবেশে দুঃখ ও শঙ্ক প্রকাশ করেন।' সাহিত্য-সম্মেলনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দিকে দিকে অপরিণামদর্শী ও জাতীয় বিরোধী তথাকথিত যুবক, তরুণ সম্মেলনের' অশুভ-প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।[১৮৯] সম্মেলনের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুর রহমান লিখেছেন–

> যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শিল্প ও সঙ্গীত, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে ইতিপূর্বে যে ইসলামিক আদর্শ রূপায়ণের প্রস্তুতি চলছিল তা বাধাগ্রস্ত হল। তথাকথিত স্বাধীন চিন্তানায়কদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার ছদ্ম আবরণে বৃহত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক একীকরণের অভিশপ্ত প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে ক্রমশ পাকিস্তানী আদর্শকে ম্লান ও দূর্বল করতে লাগল। ঢাকা, কুমিল্লা ও কাগমারীতে পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে চিন্তা ও কর্মের সমুদয় ক্ষেত্রে কবরস্থ করার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে আনা হয়েছিল। এর প্রতিবাদে আমরা জনকয়েক মিলে স্থানীয় কর্মীদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের জন্মভূমি ইসলামাবাদে বা চাটগাঁয়ে পাকিস্তানী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত দেশহিতৈষীদের কি করা কর্তব্য, যা সম্বন্ধে উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিন দিনব্যাপী এক সাহিত্য মাহফিলের আয়োজন করি।....পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় পাকিস্তানী আদর্শের বিশ্বাসী লেখক- লেখিকা, কলা-শিল্পী ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এতে যোগদান করেন।[১৯০]

'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মহফিলে'র উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কয়েকজন বুর্জোয়া শিল্পপতি। মূল সভাপতি ছিলেন মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থি নেতা মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।[১৯১]

চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন (জেএমসেন) হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বড়ো রাস্তার ওপরই তৈরি করা হয়েছিল আলাওল গেট। তারপর নজরুল-ইকবাল গেট। ডায়াসের পেছনে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিরাট ম্যাপ। পূর্ব পাকিস্তানের পরিবেশ অঙ্কিত তরুণ শিল্পীর আঁকা কতকগুলো চিত্র। মাঝে মাঝে নজরুল, ইকবাল আর হাদীস ও কুরআনের বাণী। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উপায়ে সমগ্র হলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যা পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব।[১৯২]

অভ্যর্থনা সমিতিরি সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, 'ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের জন্যই পাকিস্তান হাসেল করা হয়েছিল কিন্তু পাকিস্তান-সৃষ্টির পর সে-আদর্শ সবাই ভুলে গেল এবং ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থ করা দিকে মনোযোগ দিলো। সাহিত্যিকরাও পথভ্রষ্ট হয়ে সাম্যবাদী দলে ভিড়ে গেলেন।'[১৯৩]

পাকিস্তানের রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের ভাষা আন্দোলন ও যক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাফল্য এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও বামপন্থি প্রগতিবাদী চিন্তাধারার প্রসার, বিস্তার-এ আতঙ্কিত বুর্জোয়া, পুঁজিপতি, সাম্প্রদায়িক, নয়া-উপনিবেশবাদী 'পাকিস্তানপন্থি'রা ইসলামি সংস্কৃতির ধ্বজ্জা সম্মুখে নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই আয়োজনের ব্যাপকতা ও জাঁকজমক কম ছিল না। কারণ, ব্যক্তিগত ও দলীয় নগদ-স্বার্থ সংরক্ষণ তাঁদের কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণ হিসেবে কাজ করেছিল।[১৯৪]

রফিকউল্লাহ খান পূর্ব পাকিস্তানের ৫০-এর দশকের সাংস্কৃতিক অবস্থার বর্ণনা করে বলেন,

> এক দশকেরও অধিককালব্যাপী যে-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আন্দোলন, রক্তপাত ও বিক্ষোভ জাতীয় জীবনে নানামুখী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার ইতিবাচক প্রতিফলন হয়ে পড়েছিলো অনেকটা মন্থর। লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখায় আশ্রয় গ্রহণকারী শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল দ্বিধান্বিত, বলা যায় সত্যান্ধ।[১৯৫]

দিনাজপুরে নওরোজ সাহিত্য সম্মেলন

১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর দিনাজপুরে নওরোজ সাহিত্য-মুসলিসের উদ্যোগে আয়োজিত হয় নওরোজ সাহিত্য সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ দেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক। সম্মেলনের অভিভাষণে ভাষা সংস্কারের প্রশ্নে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাঙলার ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট, সামগ্রিক রূপটি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আপনিই মূর্ত হয়ে উঠবে–কোনোরকম ফরমায়েশ বা জোরজবরদস্তির সাহায্যে তা হবে না, কিংবা একছাঁচে তাকে ঢালাই করাও যাবে না।'[১৯৬] এ-উপলক্ষ্যে পঠিত প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'জাতি হিসাবে আমাদের বয়স মাত্র এগার বছর। জাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তনে দশ-এগার বছর কিছুই নয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে যাঁরা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট সামগ্রিক রূপ দেখতে

চান, তাঁরা নিশ্চয়ই অত্যুৎসাহী; আর এ-জাতীয় অত্যুৎসাহের পরিণাম হতাশা ও নৈরাশ্য। আমাদের বিবেচনায় এমন হতাশা লোকের কথায় কান দেওয়াই ভাল।'[১৯৭] এবং 'ভাষা ও সাহিত্যকে যাঁরা এক ছাঁচে ঢেলে বৈচিত্র্যহীন করতে চান, হয় তাঁরা জীবনের আহ্বান শুনতে অভ্যস্ত নন, নয় তাঁরা মরণের অপেক্ষায় দিন গুনছেন। আমরা তাঁদের কথা না ভাবলেও পারি।'[১৯৮] একই রকম মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁদের সম্পর্কেও যাঁরা 'পাকিস্তানি-বাংলার গায়ে কুর্তি-কোর্তা পরিয়ে রাতারাতি পাকিস্তানি-বাংলাকে ভারতীয়-বাংলা থেকে পৃথক করে দেবার ইচ্ছা পোষণ করেন।'[১৯৯] কিন্তু তিনি এও বলেন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার সাহিত্যের পার্থক্যটা মৌলিক ও স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে 'পূর্ব-পাকিস্তানী' বাংলা সাহিত্যের বিকাশমান ধারার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে এ-প্রবন্ধে মুহম্মদ এনামুল হক দেখা যায় ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ওপরই মূল বা প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> আমরা রাষ্ট্রগতভাবে যেমন আদর্শ-ভিত্তিক, জাতিগতভাবেও তেমন আদর্শবাদী। এই আদর্শই আমাদেরকে মত ও পথের সন্ধান দিয়েছে।... যেহেতু, ভারতে মৌলিক আদর্শ ধর্মসম্পৃক্ত ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং তার বিঘোণিত আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবাদ, সেহেতু ভারতীয় মানসে একটা আদর্শ-সংঘাত, একটা নৈতিক দ্বন্দ্ব অন্তসঃসলিলা ফল্গুর মতো চিরবিরাজমান। সেখানকার সাহিত্যের পক্ষে এই আদর্শ-সংঘাত উপেক্ষা করা সহজ নয়। পশ্চিমবঙ্গেও বাংলা সাহিত্যও তা পারেনি। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানের মৌলিক ও বিঘোষিত আদর্শ এক হওয়ায়, অর্থাৎ একমাত্র ইসলামই পাকিস্তানের আদর্শ বলে স্বীকৃত হওয়ায়, এখানে কোন আদর্শের সংঘাত নেই। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা-সাহিত্যে তাই ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্য এত সুস্পষ্ট; আর পশ্চিম-বঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও হিন্দু ঐতিহ্যের পাশে উৎকট পাশ্চাত্য অনুকরণও স্থান পাচ্ছে।[২০০]

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন

পাকিস্তান সরকার শুরু থেকে বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত এবং তাদের সহযোগী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে চেষ্টা করে। পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই তাঁর তাবেদার প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা বাঙালিপনা, বাঙালিত্ব ও বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের নানা উদ্যোগ একটার পর একটা গ্রহণ করা হতেই থাকে।[২০১] পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সর্বপাকিস্তানি সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের সহযোগী রক্ষণশীল রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সহায়তায় অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা বাঙালির হাজার বছরের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিবেচনা না নিয়ে বরং তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে। আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রগতিশীল সংগঠনগুলো ক্রমে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিকেরা আপোষকামিতার পথে অগ্রসর হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করতে সচেত হন।[২০২] এর মধ্যেও কোনো কোনো প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই প্রক্রিয়ার রুখে দাঁড়ায়। ফলে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার লড়াইও একইসাথে শুরু হয়। বাঙালি প্রগতিশীল ও উদারমনস্ক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীগণ এবং তাদের সংগঠনগুলো পূর্ব বাংলায় সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সফলতা লাভ করে। কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে প্রগতিশীল গোষ্ঠী বাঙালিপনা, বাঙালিত্ব ও বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হলো । এই পরস্পরবিরোধী মনোভাব একটা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের শুরু করে। যার প্রতিফলন আমরা পাকিস্তানের রাজনীতিতে লক্ষ করি।

পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে বেশকয়েকটি 'সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন'। বিশেষ করে ৫০-এর দশকের এইসব সম্মেলন পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্ব বাংলায় প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সরকারি উদ্যোগ। পরবর্তীকালে আরও চারটি সম্মেলন হয় বেসরকারি পর্যায়ে। সেগুলোতে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা মতাদর্শের ভিত্তিতে মিলিত হয়ে সাহিত্যের সমস্যাকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় সেগুলোর ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর সাথে যুক্ত ছিল শাসকগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের আন্দোলন। এইসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাঙালির

মানসজগৎ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা প্রতিফলন আমরা পবরর্তীকালের ৬০-এর দশকে দেখতে পাই। কীভাবে ৫০-এর দশকের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলো একটি জাতিকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সংস্কৃতি সংসদের ভূমিকা (১৯৫১)

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের ৩৮নং কক্ষে সংস্কৃতি সংসদের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে সংস্কৃতি সংসদের নাম হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ। এ সংসদ প্রতিষ্ঠার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন–আনওয়ারুল আজিম চৌধুরী, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ খান ও ওবায়দুল হক সরকার। সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের চারজন প্রগতিশীল শিক্ষক অমিয় চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, খান সারওয়ার মুরশিদ এবং মুনীর চৌধুরী ছিলেন প্রেরণদাতা।[২০৩] বামপন্থি মনোভাবাপন্ন ছাত্র আজিজুল জলিল, হাফিজুর রহমান চৌধুরী, কামাল আহমেদ,কাজী আব্দুল মুকিত, প্রমুখ সংস্কৃতি সংসদের প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন। ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ড. খান সরওয়ার মুরশিদকে সভাপতি, আজিজুল জলিলকে আহ্বায়ক ও হাফিজুর রহমান চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে সংস্কৃতি সংসদের প্রথম কমিটি গঠিত হয়েছিল।[২০৪] ১৯৫১-৬৬ সাল পর্যন্ত সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরিচয় পাওয়া যায়।[২০৫]

তাদের কার্যবলিতে প্রতিফলিত হয়েছে–'সামন্তবাদের সমাপ্তি এবং ধনতন্ত্রবাদের পত্তন আর সাম্প্রতিক সমাজতন্ত্রের অপ্রতিরোধ্য হাওয়া।' রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিব্যবস্থা বিবর্তিত হয়েছে অনেকান্ত সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপান্তর।[২০৬] এ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতা, স্বচ্ছলতা এবং অপ্রাদেশিকতার জন্য পূর্ব বাংলার তরুণ বুদ্ধিবাদী, কবি যশপ্রার্থী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি সেবী, যশস্বী সাংবাদিক ও গবেষকদের প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[২০৭]

'সংস্কৃতি সংসদ' মূলত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু করে যা ছিল সামাজিক গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি চর্চার। এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্ত বুদ্ধির চর্চা ও সংস্কৃতির বিকাশ। 'সংস্কৃতি সংসদ' সর্ম্পকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের একটা বড় ক্ষেত্র ছিল সংস্কৃতি সংসদ। সকল ছাত্রের সংগঠন হলেও সংস্কৃতি সংসদে প্রাধান্য ছিল বামপন্থি ছাত্রদের, কাজ-কর্মেও তা প্রকাশ পেত।[২০৮] তিনি আরও বলেন, 'গোড়া থেকেই সংস্কৃতি সংসদ ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন।'[২০৯]

'সংস্কৃতি সংসদের আহ্বান' নামে এক পাতার একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। এই প্রচারপত্রটি ছিল সুস্থ সংস্কৃতির প্রতীক।[২১০] প্রকৃতপক্ষে গোড়া থেকেই সংস্কৃতি সংসদ ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি সংসদের তৎপরতা ছিল বাহুমাত্রিক। প্রতিষ্ঠার পর থেকে তারা ঢাকায় বৃহত্তর জনমানুষের জন্য উন্নত মানের নাটক, গণসংগীত ও দেশাত্মবোধক সংঙ্গীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেছে। এ ছাড়া 'মননশীল ও বৈদগ্ধে লালিত' ভাষা আন্দোলনের পুস্তিকা প্রকাশ করে এই সংগঠন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংস্কৃতি চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক সংস্কৃতির কলুষতা থেকে মুক্তি অর্জন এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য এর নিরলস সংগ্রাম ছিল অপ্রতিরোধ্য।[২১১]

প্রথম দিকে নাটক মঞ্চায়নের মধ্যে এর তৎপরতা সীমিত ছিল। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' (১৯৫১), তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' (১৯৫৩) ও বনফুলের 'কবয়' (১৯৫৪), ১৯৫৬ সালে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', ১৯৫৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন, ১৯৭০ সালে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ইত্যাদি। এগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনা; ক্রমশ দেশাত্মবোধক গান ও গণসংগীতের অনুষ্ঠান করার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়।[২১২]

সংস্কৃতি সংসদের সাফল্য দেশব্যাপী এমন সাড়া জাগালো যে, ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে নাটক প্রদর্শনের জন্য একমাত্র এই সংস্কৃতি সংসদকেই নির্বাচিত করা হয়। কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সংস্কৃতি সংসদ এই নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ করে প্রশংসিত হয়।

১৯৫৫ সালে বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠান ছাড়াও রবীন্দ্র, নজরুল এবং সুকান্ত স্মৃতি তর্পণ করা হয়। ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল একুশের পটভূমিকায় রচিত 'কবর' নাটকের অভিনয়, বাংলাভাষার আলোচনা এবং স্বদেশী সংগীতের আসর। ১৯৫৭ সালে ঢাকা হল মিলনায়তনে 'সংস্কৃতি সংসদ' উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান করে। নিয়মিত সাহিত্য সভা, আলোচনা অনুষ্ঠান ছাড়াও রবীন্দ্র, নজরুল এবং সুকান্ত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৫৮ সালে সংস্কৃতি সংসদ ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে দশদিনব্যাপী নাটক, কাব্যনাটক, সংগীত, সাহিত্যালোচনা, এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ১৯৫৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান হয়। পরের বছর সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতি সংসদের বসন্ত উৎসবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬১ সালে ঢাকা কলেজের মিলনায়তনে সংস্কৃতি সংসদ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে যা বছরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বলে অভিহিত হয়।

১৯৬২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জীবনে যে তীব্র আলোড়নকারী সাড়া পড়ে সংস্কৃতি সংসদ তাকে সুসংহত রূপায়ণ দান করে। সামরিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণমনে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, সংস্কৃতি সংসদ তার নেতৃত্বে অগ্রবর্তী হয়। সে বছর দুইদিনব্যাপী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত ৩ অগ্রহায়ণের দেশাত্মবোধক সংগীতের আসর ও ৪ অগ্রহায়ণের প্রেমের গানের আসর ও শ্যামা নৃত্যনাট্য সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়। ১৯৬৩ সালে সংস্কৃতি সংসদ বাংলা একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দেশাত্মবোধক সংগীতের আয়োজন করে। পরের বছর বাংলা একাডেমির বটতলায় গণসংগীতের আসর হয়। ১৯৬৫ সনে সর্বপ্রথম সংস্কৃতি সংসদ রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। ১৯৬৬ সালে সংস্কৃতি সংসদ 'জ্বলছে আগুন ক্ষেত খামারে' শীর্ষক একটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে। ১৯৭০ সালে 'সংস্কৃতি সংসদ' পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দ্বাদশ কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে মহসীন হলের খেলার মাঠে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দু'পর্বে বিভক্ত এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল গণসংগীতের আসর এবং দ্বিতীয় পর্বে ছিল সমরেশ বসু রচিত 'আবর্ত' নাটকের মঞ্চায়ন। গণসংগীতের আসরে অংশগ্রহণ করেন শেখ লুতফর রহমান, মোস্তফা জামান আব্বাসী, অজিত রায়, মাহমুদুন্নবী, মালেকা আজিম খান, ইকবাল আহমেদ, মিলিয়া গণি, রমানাথ, আলোক মোহাইমেন, সফিক, মঞ্জুর মোরশেদ, হাসান মনসুর বাচ্চু, মুজাহিদ, মল্লিক, দুলু, ফিরোজ, বুলু, রাজিয়া, তাজিম সুলতানা, ইরফাত লতা, শ্রাবণী, নার্গিস সুলতানা প্রমুখ।

বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে যে কোনো ধরনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে রুখে দাড়িয়েছে সংস্কৃতি সংসদ। বাংলাভাষা ও লিপি সংস্কারের মাধ্যমে সুদীর্ঘকালের বাঙালি ও বাংলাভাষা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে পাকিস্তানি আদর্শায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে, সংস্কৃতি সংসদ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৬৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেল চারটায় সংস্কৃতি সংসদ সাধারণ ছাত্রসভার আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে ২ সেপ্টেম্বর সংস্কৃতি সংসদ একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে। প্রচারপত্রে বলা হয়[২১৩],

বাংলা ভাষার বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র জমায়েত

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলে সম্প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের ধুয়া তুলে মূলতঃ বহুল ব্যবহৃত ঙ,ণ,ঞ,ঈ,উ,ঐ,ঔ,ষ,ৎ প্রভৃতি হরফ বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার প্রচলিত যুক্তাক্ষর যথা ঙ্ক,ক্ত এবং সমুদয় ফলা যথা দ্ম,য্য, স্ম, প্রভৃতি বর্জন, 'ৈ' ও 'ী' কার বর্জন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত উক্ত কাউন্সিলে গৃহীত হয়।
>
> এই বর্ণমালা বর্জনের দ্বারা ভাষা সহজ হবে এবং তা শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হবে, এই যুক্তি দেখিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল বর্ণ বর্জনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মূলতঃ তা বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করবে।

বর্ণমালা বর্জন বা বানান পরিবর্তনের ফলে শব্দ তার মূলগত অর্থ এবং ব্যবহারগত অনুসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হবে। ভাষার যে সচল প্রবাহ রয়েছে এই সংস্কার দ্বারা তা ব্যাহত হবে। আমরা জানি সরকার শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির ধারক। সেক্ষেত্রে এই বর্ণমালা-সংস্কারের দ্বারা ভবিষ্যতে শিক্ষা বিস্তারের ধুয়া তুলে মূলতঃ জনগণের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যুৎপত্তিকেও নাকচ করতে চাইছে, এটা উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলতঃ বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবোধ তথা বাঙালী সংস্কৃতির যে জাগরণ আজ সর্বত্র দেখা দিয়েছে সেই জাগরণকে স্তিমিত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই 'পাকিস্তানী তমদ্দুন' এই দোহাই দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানি সংস্কৃতির ওপর আঘাত এসেছে। আজকের এই হীন প্রচেষ্টা এ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। আরও লক্ষ্য করার বিষয় বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার যে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা সরকারের আর নেই। আজ তাই পরোক্ষে বাংলা বর্ণমালা বর্জন করে নতুন 'লেখ্যরীতির' সূচনা দ্বারা এই প্রচেষ্টার মূলে আঘাত হানা হচ্ছে। নতুন লেখ্যরীতিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা আরও পশ্চাৎপদী হবে।

এ সকল বিষয় বিশ্লেষণ করেই দেখা যাবে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকরী। বাংলা ভাষার ওপর এই আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের আজ প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

সংস্কৃতি সংসদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এর বাইরে পোষ্টার কিংবা দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতি সংসদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের একটা বড়ো ক্ষেত্র ছিল সংস্কৃতি সংসদ। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সংস্কৃতি সংসদ সর্ম্পকে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্র–ছাত্রী হিসাবে পড়তে এলে সংস্কৃতি সংসদের নাম না জেনে উপায় ছিল না। সংস্কৃতি সংসদের আভিজাত্য ছিল অসাধারণ আর রূপ ছিল আকর্ষণীয় মুখের মত। এর যেকোনে আলোচনা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকতে হত না, তারা নিজেরাই ভিড় করতেন। ক্লাসকক্ষ দর্শকে ভরে যেত। আর বার্ষিক অনুষ্ঠানের সময় জায়গা পাওয়া যেত না অনুষ্ঠান দেখার। সে জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হত বাংলা একাডেমির খোলা মাঠে আর টিএসটির বড়ো লনে।'[২১৪] প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী সংগ্রামে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অবদান একক গৌরবে মন্ডিত। সংস্কৃতি সংসদ এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাহমুদ হাসান লিখেছেন, 'সংস্কৃতি সংসদ একটি ঐতিহ্য একটি আন্দোলন। সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে একটি দুর্জয়, বলিষ্ঠ, একক সংগঠন।... এ প্রতিষ্ঠানটি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হলেও এর কর্ম-প্রয়াস ব্যাপক ও বৃহত্তর পরিমণ্ডলের মধ্যে চিহ্নিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনার মান উন্নয়ন, সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক সংস্কৃতির কলুষতা থেকে মুক্তি অর্জন এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য এর প্রয়াস নিরলস-সংগ্রাম নিরবিচ্ছিন্ন। গতি অপ্রতিরোধ্য। সংস্কৃতি সংসদের প্রথম পদক্ষেপ থেকে অদ্যকার কর্মপ্রয়াসের সময় পরিধি এক ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাস। এর মূল সুর হলো প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মানবিক সংস্কৃতির উদার ঘোষণা। বিগত দশ বছরের স্বৈরাচারী একনায়কত্ব কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের সুপরিকল্পিত হামলা, প্রচারণা, সাম্প্রদায়িক জিগির ও সর্বোপরি সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আধিপত্য দেশের সংস্কৃতিতে এনেছে ভয়াবহ দুর্যোগ। ছাত্র সমাজের চেতনার মান লুণ্ঠিত হয়েছে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলতার পঙ্কিল আবর্তে, সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব এবং নিষ্ক্রিয়তার পথে। এই বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলাই সংস্কৃতি সংসদের উদ্দেশ্য।[২১৫]

প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উদার ও মননশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সংস্কৃতি সংসদ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছিল যার প্রভাব সমগ্র পূর্ব বাংলায় পড়েছিল। সংস্কৃতি সংসদের প্রাক্তন সভাপতি জহির রায়হান লিখেছেন, 'সকালে, দুপুরে, বিকালে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সাহিত্য সভা, আলোচনা সভা, বিচিত্রানুষ্ঠান, কবি সম্মেলন, বসন্ত উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে এই বিদ্যামন্দিরে এক নতুন সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিল এই সংসদ।'[২১৬]

তবে 'সংস্কৃতি সংসদের' ভূমিকা ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকের দিকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে তা স্তিমিত হয়ে যায়। মূলত 'সংস্কৃতি সংসদ' কমিউনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সংগঠন ছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতির বিভেদের প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৬৫ সালে বিভক্ত হয়ে গেলে সংস্কৃতি সংসদও তখন বিভক্ত হয়ে যায়। তবুও একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন, বাংলা ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রাদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করতে পরবর্তীকালে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে এ দেশের একাংশ মানুষ সচকিত হয়ে উঠলে সংস্কৃতি সংসদ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়।[২১৭] অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করতে সংস্কৃতি সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সংস্কৃতি সংসদের এই সংগ্রাম শুধু সাংস্কৃতিক সংগ্রামই ছিল না, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিল। সংস্কৃতি সংসদের সাথে জড়িত ব্যক্তিরাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে।

রওনক সাহিত্য সংস্থার কর্মতৎপরতা (১৯৫৮)

রওনক সাহিত্য সংস্থা ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপাহি বিপ্লবের শতবার্ষিকী যে উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপন করা হয়েছিল সেই ধারার আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রক্ষণশীল সাহিত্যসেবীরা 'রওনক সাহিত্য গোষ্ঠী' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের উদ্যোক্ত ছিলেন–আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ও মতিনউদ্দীন প্রমুখ।[২১৮] প্রথম কর্মপরিষদে ছিলেন–মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (সভাপতি), ইবরাহিম খাঁ ও গোলাম মোস্তফা (সহসভাপতি) এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সম্পাদক)।[২১৯] আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বাসায় একুশজন সমমনা লেখক-সাহিত্যিকের এক বৈঠকে রওনক সাহিত্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় প্রতি মাসে এক একজন সদস্যের বাড়িতে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় একজন প্রবন্ধ পাঠ করবেন এবং অন্যরা তার ওপর আলোচনা করবেন। এরপর প্রতি মাসে সদস্যদের বাড়িতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে চললো। প্রতি বৈঠকেই মূল্যবান প্রবন্ধাদি পঠিত হতো এবং তা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা হতো। এ বৈঠকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিভিন্ন দৈনিক বিশেষ করে *আজাদে* প্রকাশিত হতো। প্রায় আড়াই বছর ধরে এভাবে বৈঠক চলে।[২২০] এই সাহিত্য সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ভিত্তিতে তমদ্দুন গঠনে সহায়তা করার জন্য সর্বপ্রকার সাহিত্যিক ও তামদ্দুনিক প্রচেষ্টা চালানো।[২২১]

রওনক সাহিত্য সংস্থার প্রথম সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ নূর আলী। এ সভায় গোলাম মোস্তফা 'পাক-বাংলা ভাষা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে তিনি 'পাক-বাংলা ভাষায় অধিকতর আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ গ্রহণের ওপর বিশেষ জোর দেন'। *আজাদ* পত্রিকায় এই সভা সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়–

> বাংলা ভাষা হইতে হিন্দু ভাবধারার বাহক সংস্কৃতি শব্দগুলো বর্জন করিয়া আমাদের রাষ্ট্রগত আদর্শের ভিত্তিতে ইহার সংস্কার সাধন সময়-সাপেক্ষ হইলেও পাক-বাংলা ভাষার রূপান্তর অবধারিত এবং ভাষার রূপান্তর স্বাভাবিকভাবে আসিলেও আমাদের লেখক সমাজের এ বিষয়ে সচেতন দৃষ্টির এবং জাতীয় সাহিত্যকে বেগময়ী ও সমৃদ্ধ করিতে আমাদের মুখের ভাষাকেই অবলম্বন করা উচিত।[২২২]

২০ জুলাই ১৯৫৮ দ্বিতীয় সাহিত্য সভায় আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী 'পাক-বাংলা ভাষার অভিধান' শীর্ষক উপস্থাপিত প্রবন্ধের আলোকে সভায় সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অবিলম্বে পাক-বাংলা ভাষার অভিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন হলে প্রচলিত সংস্কৃতি শব্দ বাদ দিয়ে পুথি সাহিত্য ও আঞ্চলিক লোক-সাহিত্য থেকে শব্দ চয়নের ওপর গুরুত্ব বেশি দেওয়ার জন্য আলোচকরা সুপারিশ করেন। এই সভায় আলোচকবৃন্দের অপর একটি সুপারিশ ছিল এই যে, 'পাক-বাংলা ভাষার অভিধান পাক-বাংলা সাহিত্যের অনুসারী হবে এবং তজ্জন্য বাংলা ভাষারও সংস্কার আবশ্যক'।[২২৩] এরপর খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন 'পাক-বাংলা সাহিত্যের উপমা' শিরোনামের উপস্থাপিত প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল 'পাক বাংলা' সাহিত্যের উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারাতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। কারণ প্রচলিত উপমার রীতি মূলত সংস্কৃতি সাহিত্য থেকে এসেছে, যা পাকিস্তানি সংস্কৃতির পরিপন্থি।[২২৪]

১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে 'বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন' শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এতে 'পাকিস্তানের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও তামদ্দুনিক বুনিয়াদের' আলোকে এবং দেশের জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে বাংলা পরিভাষা তৈরি করতে হবে বলে সভায় উপস্থিত সভ্যরা মত প্রকাশ করেন।[২২৫] সেই সভায় উপস্থিত সংস্থার সদস্যরা সাহিত্যের বিদেশি বই বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের (বাংলা সাহিত্য) বই আমদানির করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তাদের মতে, 'পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী ভাবধারার এই ধরনের বই দেশের সরলমতি ছাত্র সমাজকে বিপথগামী করছে এবং পাকিস্তানের লেখক সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতকেও করে তুলছে অনিশ্চিত ও বিপদজনক'।[২২৬]

এছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয়ের ওপর রওনক সংস্থার প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, কবি মঈদুদ্দীনের 'আমাদের সাহিত্যের রূপ ও আঙ্গিক' আব্দুল মান্নানের 'সঙ্গীতে মুসলমানদের অবদান', কবি আজিজুর রহমানের 'গীতিকবিতা, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর 'সমালোচনা প্রসঙ্গে', 'আমাদের সংস্কৃতি' ও 'আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম অবদান'। রওনক সংস্থার কোনো মুখপত্র ছিল না, তবে ১৯৫৯ সালের শেষ দিক থেকে এর একটি প্রকাশনা দপ্তর খোলা হয়। 'রওনক পাবলিকেশন্স' নামে এখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের প্রকাশনা করা হয়। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো–মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত 'নজরুল সাহিত্য' (১৯৬০), যাতে ২৩ জন লেখকের রচনা সংকলিত হয়।[২২৭]

এভাবে প্রতি মাসে পাকিস্তানি আদর্শের ভাবধারা ও তামদ্দুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত রাখে রওনক সাহিত্য সংস্থা। অর্থের অভাবে খুব বেশিদিন এই প্রকাশনার কাজ চালানো সম্ভব হয়নি। ১৯৬১ সালের দিকে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে মূলত রওনক সাহিত্য সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর স্মৃতি কথায় আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগ নিয়ে গবেষণাপূর্ণ ও মূল্যবান প্রবন্ধ প্রায় প্রতি মাসে পঠিত হয়েছে এবং তা নিয়ে উন্নতমানের আলোচনাও হয়েছে। কাজেই এমন সাহিত্য সংস্থার অকাল বিলুপ্তি পাক-বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর হয়েছিল।'[২২৮] সাঈদ-উর রহমান এই সংগঠনের প্রভাব নিয়ে বলেন, 'সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর প্রভাব তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। গভীর আলোচনার দিক থেকে আপংক্তেয় না-হলেও আলোচনা নিজেদের মধ্যে সীমিত থাকায় বিস্তৃত পরিবেশে এর প্রভাব পড়েনি।'[২২৯]

রওনক সাহিত্য সংস্থা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাতে সচেতনভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তানবাদীর আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করে। একইসাথে এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব বাংলার তৎকালীন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতি রোধ করতে তৎপর ছিল। অর্থের অভাব ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে মূলত রওনক সাহিত্য সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ কথা বলা হলেও মূলত ষাটের দশকে প্রথম দিকে প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চার প্রবল স্রোতে এই সংগঠনটি আর টিকে থাকতে পারে নি।

জাতীয় ভাষা প্রণয়ন ও বাংলাভাষা সংস্কারের প্রচেষ্টা

বাংলাভাষার প্রতি আইয়ুব খানের মনোভঙ্গি তার পূর্বসূরিদের থেকে ভিন্ন ছিল না। সুতরাং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও এর পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হন। কিন্তু জনমতের কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য শুধুমাত্র বাংলাভাষার সংশোধন, পরিবর্তন সম্ভব নয় বিধায় এর সঙ্গে উর্দুকেও সংযুক্ত করা হয় এবং বলা হয় বাংলা ও উর্দুর সমন্বয়ে রোমান হরফে একটি জাতীয় ভাষা প্রবর্তন করা হবে। যুক্তি হিসেবে যদিও উল্লেখ করা হয় উভয় অংশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, সংহতি রক্ষার কথা। কিন্তু উদ্দেশ্য বাঙালির স্বজাত্যবোধ খর্ব করে তাদের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ কায়েমের লক্ষে অধস্তন হিসেবে গড়ে তোলা। বাংলা একাডেমি ও শিক্ষা কমিশন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তৎপর হয। এ লক্ষে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে গঠিত হয় 'ভাষা সংস্কার কমিটি'। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এসব ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টাকে সংস্কৃতিকর্মী, সংস্কৃতিসেবীরা প্রত্যাখান করে। বিশেষত ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এবং ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল সবসময়ের মতো এবারও একুশে ফেব্রুয়ারি প্রেরণার ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫৯ সালে একুশে

ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে ছাত্র সংগঠনসমূহ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষা সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[২৩০] এই প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল পরবর্তী বছরগুলোর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত এক সভায় রোমান হরফ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষা ও ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিরুদ্ধাচারণ করেন।[২৩১] এমনকি ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আবেদন ছিল ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম স্লোগান। এভাবে সামরিক শাসনামলে সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে সংস্কৃতিকর্মী, সংস্কৃতিসেবীরা প্রতিবাদের মাধ্যমে আইয়ুব খানে কূটকৌশল নস্যাৎ করে দেন।

প্রাদেশিক লেখক সংঘের কর্মতৎপরতা (১৯৫৯)

পাকিস্তান সরকার সূক্ষ্ম চালের মাধ্যমে সংস্কৃতির ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে।[২৩২] পাকিস্তানি প্রশাসন সাংবাদিকদেরকেও নানা প্রলোভনে বিভ্রান্ত করতে উদ্যোগী হয়। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ১৯৫৯ সালের ৩১ জানুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত লেখক সাহিত্যিকদের সম্মেলনে অনুষ্ঠানিকভাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ' (Pakistan Writer's Guild)। 'লেখক সঙ্ঘ' গঠন উপলক্ষ্যে ১৯৫৯ সালের ২৯-৩১ জানুয়ারি করাচিতে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের ২১২ জন লেখকের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বপাকিস্তান থেকে ৪৭ জন লেখক-শিল্পী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। লেখক সংঘের ১২ সদস্য বিশিষ্ট পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৫৯ সালেই গঠন করা হয়।[২৩৩] সংঘের শপথপত্রে বলা হয় 'মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, মর্যাদা-বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানবজাতির বিকাশের স্বার্থে' পাকিস্তানি লেখকদের আত্মোৎসর্গের কথা। 'ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থে' 'একটি সুখী ও সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব' ও তাঁরা গ্রহণ করেন।[২৩৪] আইয়ুব খান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক অবক্ষয়-সাধনের ব্যবস্থা করেছিলেন 'পাকিস্তান লেখক সংঘের' প্রতিষ্ঠা করে।–সামরিক আইন জারির তিন মাসের মধ্যে (১৯৫৯ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারী) শিক্ষা-সচিব কুদরতুল্লাহ শাহাব (জ. ১৯১৭) এবং কতিপয় উর্দু ভাষার লেখকের উদ্যোগে করাচির গোয়ানিজ হলে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের এক মহসমাবেশ ঘটানের হয়।[২৩৫] আবু জাফর শামসুদ্দীন এই সম্মেলন সম্পর্কে বলেন, 'বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করার কৌশল হিসেবে...করাচিতে উভয় অঞ্চলের লেখক সাহিত্যিকদের নিয়ে এক আজিমুসশান সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করা হয়।'[২৩৬] তিনি এই সম্মেলন সম্পর্কে লিখেছেন,

> সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়েও দলাদলি হচ্ছে। মনে হয় সাহিত্যবিচারের কর্তা পাঠক নয়, সাহিত্যিক বা সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিগণ নিজেরাই। আশ্চার্য নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ইকবাল–সাহিত্যিক বা সাহিত্য-রসিকদের বিচারে বড় নন, বড় পাঠক সমাজের বিচারেই। আর সাহিত্যিকদের বিভিন্নমুখী মননশক্তিকে পাহাড়ি নদীর স্রোতের মতো একমুখী করে সংগঠন করার মতো দুরূহ কাজে যদি কেউ হাত দেয়ার দুঃসাহস করেন তবে তার সে প্রচেষ্টাকে দলীয় মনোভাবের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে অন্তত আমি মনে করি। এমনিতেই এরূপ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সাহিত্যিকের মনকে যদিও দেশের রাজনৈতিক জীবন আলপিনের খোঁচার মতো মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়, তবু সাহিত্যিক সক্রিয় রাজনীতিতে সর্বদাই অপটু। সাহিত্যিকের সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতার পক্ষে সক্রিয় রাজনীতি ক্ষতিকরও বটে।
>
> ঠিক তেমনি সাহিত্যিক কোনো বিশেষ সময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকারীর সকল কাজের সমর্থক হতে পারেন না–বস্তুত সমর্থন-অসমর্থনের প্রশ্নই তাঁর কাছে অবান্তর। সাহিত্যিকের কাছে রাজনীতি তখনই জীবন-মরণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, যখন কোনো বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশের, দশের এবং তাঁর নিজেরও চিন্তার স্বাধীনতার ওপর আঘাত হানে বা হানতে উদ্যত হয়। অথবা এমন ক্রিয়াকর্মে মত্ত হয় যা দেশের ও দশের সর্বনাশ সাধন করতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের প্রতিবাদ কতকটা কাগজেকলমে থাকতে বাধ্য। কেননা সাহিত্যিকের কাজই হলো কাগজকলম নিয়ে, প্রত্যক্ষভাবে মাঠে নেমে ভোট কুড়ানো নয়, বা দেশ শাসনের দণ্ড নিজ হাতে নেয়াও নয়। যদি কোনো শাসনব্যবস্থা জনহিতকর হয়, তবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে, সাহিত্যিক তার প্রশংসাও করতে পারেন; কিন্তু সেও কাগজেকলমে।
>
> আমরা গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি, Regimentation of ideas অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ও মননশীলতাকে এক ছাঁচে ঢালার প্রচেষ্টা তার মধ্যে খাপ খায় না। সাহিত্যিকদের এক জায়গায় ডেকে সেরূপ প্রচেষ্টা–তা যতো কৌশলে এবং সাবধানতার সঙ্গেই

করা হোস না কেন–ভালো নয়, এতে দেশের ক্ষতি ছাড়া ভালো নেই। হ্যাঁ, তবে সরকারি খরচায় যদি সাহিত্যিকদের একত্র হওয়ার সুযোগ মাঝে মধ্যে দেয়া হয়, তবে গরিব দেশের সাহিত্যিক পরস্পর মেলামেশার সুযোগ পায়, জিনিস খুব দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠেন না।

করাচি...সাহিত্যিক সমাবেশ হচেছ–উদ্যোক্তারা যদিও বেসরকারি ব্যক্তি, কিন্তু আয়োজনের ব্যাপকতা ও খরচের বাহুল্য দেখে মনে হয়, অদৃশ্য সরকারি হস্ত এর পশ্চাতে রয়েছে।....[২৩৭]

পূর্ব পাকিস্তানের পঞ্চাশ ব্যক্তি আমন্ত্রিত হন। তাঁদের আসা-যাওয়ার বিমান ভাড়া এবং হোটেল ব্যয় প্রভৃতি ব্যবস্থা উদ্যোক্তারাই করেন।[২৩৮] পূর্ব বাংলার বহু কবি-সাহিত্যিক করাচি লেখক সম্মেলনে যোগদানের অছিলায় জীবনের সর্ব প্রথম উড়োজাহাজে চড়তে, আর দামী হোটেলে থাকতে- খেতে পেরেছিলেন। এতে উচ্ছ্বাস-আনন্দ ও গর্ব ছিল অনেকেরই এই জন্যে যে, সরকার তাঁদেরকে 'সাহিত্যিক' বিবেচনায় এমন অপূর্ব সুযোগ দিয়েছেন। পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলতে এঁদের আগেই কোনো দ্বিধা ছিল না।[২৩৯] উদ্যোক্তাদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে লোক বাছাইয়ের কাজ করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগের অফিসার জয়নুল আবেদীন, কবি জসীমউদ্‌দীন এবং খায়রুল কবীর।[২৪০]

সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে যে 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা হয় তার সেক্রেটারী জেনারেল শিক্ষ সচিব কুদরতুল্লাহ শাহাব দীর্ঘদিন ধরে, একটানা এ দুই পদে বহাল ছিলেন।[২৪১] লেখক সংঘের ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে ১১ জন পূর্ব বাংলার লেখক এবং অন্যান্যরা পশ্চিম পাকিস্তানি (১১ জন উর্দু এবং সিন্ধি ও পাঞ্জাবি লেখক ১ জন করে)। এই সংঘের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত পূর্ব বাংলার সদস্যরা ছিলেন–অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসিমউদ্দীন, আব্দুল কাদির, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, আবুল হোসেন, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আসকর ইবনে শাইখ ও মুহম্মদ আবদুল হাই। উল্লেখ্য যে করাচি সম্মেলনে পূর্ব বাংলার উদারপন্থি ও প্রগতিপন্থি বেশ কয়েকজন লেখক যোগদান করেছিলেন তাঁরা হলেন–কাজী মোতাহার হোসেন, মাহবুব-উল আলম, আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল, নূরুল মোমেন, আব্দুল হাই, শওকত ওসমান, আবদুল্লাহ্‌ আল্‌-মুতী শরফুদ্দিন প্রমুখ। পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সম্মেলনের প্রস্তুতির সমন্বয়কারী হিসেবে ড. মুহম্মদ এনামুল হক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের কেউ কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পাননি। তবে পরবর্তীকালে এই সংঘের কর্মতৎপরতার সাথে তাঁরা যুক্ত ছিলেন।[২৪২] এ প্রসঙ্গে গবেষক ইসরাইল খান বলেন,

পূর্ব বাঙলার শাখা লেখক সংঘের সক্রিয় উৎসাহী সদস্য ছিলেন না, তৎকালে এমন প্রতাপশালী, মেধাবী, লেখক সাহিত্যিকদের খুঁজে পাওয়া ভার ছিল। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসীম উদ্‌দীন, কবি আবদুল কাদির, কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লহ, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, কবি আবুল হোসেন, ড. সৈয়দ সাজজাদ হোসায়েন, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, নাট্যকার আসকার উবনে শাইখ, অধ্যক্ষ মুহাম্‌দ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কবি সাংবাদিক আবদুল গণি হাজারী, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি ছড়াকার ফয়েজ আহমদ, ড. বোরহানউদ্দন খান জাহাঙ্গীর, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. আনিসুজ্জামন প্রমুখ সকল বাঙালি প্রতিভাবান লেখক সংঘের ছত্রছায়ায় একত্র হতে পেরেছিলেন এবং বই-পুস্তক-পত্রিকা-সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে পাকিস্তান আমলে বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতি খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[২৪৩]

'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা হলে এর মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী কবি, সাহিত্যিকেরা সংঘের ছত্রতলে আইয়ুবের উদ্দেশ্য অভিপ্রায়কে সফল-সার্থক করে তুলেছিলেন। তখন সরকারি সাহায্য ছাড়া সাহিত্য ও শিল্প-সংগঠন করার তেজ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পুরোপুরি না হলেও মোটামুটিভাবে বিপ্লবী-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র উঠে যায়। এক দশক ধরে আইয়ুব যে স্বৈর-শাসন চালাতে পেরেছিলেন এবং পূর্ব বাংলার ওপর যে অর্থনৈতিক শোষণ চলে, দেশের ৬৫% ভাগ কৃষক ভূমিহীনে পরিণত হয়, আর তার বিপরীতে কতিপয় ভূঁইফোঁড় ব্যক্তি ফুলে ফেঁপে বড়লোক হওয়ার সুয়োগ পান–তার নেপথ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই সুযোগ সন্ধানী বুদ্ধিজীবীরা সহযোগিতা না করলে বাংলাদেশ অনেক আগেই স্বাধীনতার পথে পা বাড়াতে পারত।[২৪৪] ড. আনিসুজ্জামান 'লেখক সংঘ'-এর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, '...এই উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। কেউ মনে করেছিলেন, এটা হলো সরকারের ছত্রছায়ায় সাহিত্যিকদের সমবেত করার

চেষ্টা; কেউ মনে করেছিলেন, এই সুযোগে দেশের লেখকদের জন্য কিছু সুবিধে আদায় করে নেওয়া যাবে এবং দেশের প্রকাশনা ও মুদ্রণ শিল্পের উন্নয়ন ঘটবে'।[২৪৫]

'পাকিস্তান লেখক সংঘ' মূলত গড়ে উঠেছিল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দর্শনের প্রতিফলন হিসেবে। করাচির লেখক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য লেখকদের উদ্যম ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দেখে প্রশংসা করেন। সেখানে তিনি 'লেখকদেরকে জনগণের কাছে পাকিস্তানের আদর্শ ও আধুনিক ভাবধারায় ইসলামের আদর্শ প্রচারে আরও যত্নবান হতে দিকনির্দেশনা দেন। সম্মেলনে 'পাকিস্তান ভাবাদর্শের প্রতি লেখককূলের আনুগত্যের আবশ্যকতার ওপর' বেশ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর বক্তৃতায় বেশ উৎসাহব্যঞ্জক বাক্যে 'ভলতেয়ারকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, যেকোনো লেখকের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে তিনি এসে দাঁড়াবেন'।[২৪৬]

কিন্তু অনুষ্ঠানে পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব কুদরতুল্লাহ শাহাব লেখকদের দায়িত্ব নির্দেশ করে এভাবে : লেখক কোনোক্রমেই আইনের উর্ধ্বে নন; একদেশে বাস করে অন্যদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারেন না, এবং তিনি একরূপ আদর্শ প্রচার করে ভিন্নরূপ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপনের সাহিত্যিক সম্পদ গ্রহণ করতে পারেন না।

> আমাদেরকে নিয়ে এক বিদেশীয় দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের চিন্তাধারার উৎসকে মস্কো, ওয়াশিংটন ও কলকাতামুখী করার চেষ্টা চলছে। এদের মতলব পৃথক। মস্কো ও কলকাতা চায় আমাদের বিপথগামী করতে, ওয়াশিংটন চায় অন্য পথে নিতে। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের চিন্তাধারার ভিত্তিভূমি পাকিস্তান, অন্য কোথাও নয়। পাকিস্তানী লেখকরা বিশ্বরাজনীতির পরীক্ষাগারে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহৃত হতে চায় না। আমরা দরিদ্র ও সংগ্রামী কিন্তু আমাদের নিজস্ব মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিগন্ত রয়েছে।[২৪৭]

ড. জাবিদ ইকবালও লেখকদের শ্রেণিচেতনা, প্রাদেশিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী আদর্শ আবলম্বন করতে ও ইসলামি আদর্শের রূপায়ণ করতে আহ্বান জানান।[২৪৮]

এভাবে লেখক সংঘের জন্য যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা বাস্তবায়নের জন্য জন্মলগ্নেই সরকারি অর্থ বরাদ্দ হয়। প্রথম বছর সরকার সংঘকে বিবিধ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এক লক্ষ টাকা সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে। এই অর্থে লেখক সংঘ করাচি, লাহোর ও ঢাকায় নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন, ষাট বছরের কম বয়স্ক সদস্যদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা জীবন বীমার ব্যবস্থা, এই সংঘের সদস্যদের অর্ধেক ভাড়ায় রেল ও স্টিমারে যাতায়াতের সুবিধা দান, প্রতি বছর বিদেশে তামদ্দুনিক মিশন প্রেরণ, সদস্যদের রচনা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশনা, লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ পুস্তক ছাপানো এবং মুখপত্র হিসেবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহ করা হয়। লেখক সংঘ প্রথমে 'পূরবী' নামে একটি মুখপত্র বা পত্রিকা প্রকাশ করে। এর সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোস্তফা ও সহসম্পাদক ছিলেন আব্দুল হাই। এক বছর পরে এটি 'লেখক সংঘ পত্রিকা' নাম লাভ করে।

ষাটের দশকে প্রথম দিক থেকে পাকিস্তান লেখক সংঘের কর্মতৎপরতা পূর্ব বাংলায় ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৬০ সালে প্রাদেশিক লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হয় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইস্টিটিউটে। এতে 'সাহিত্যে মীর মোশারফ হোসেনের অবদান' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন সৈয়দ মুর্তজা আলী, মুনীর চৌধুরী, আনিসুজ্জামান প্রমুখ। এই সংঘের দ্বিতীয় সভা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালের ৭ এপ্রিল। এতে পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্যের সমস্যা বিষয়ক আলোচনায় প্রধান বক্তা ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। তিনি 'জাতীয় ভাবধারা নিয়ে সাহিত্যকে নবরূপে রূপায়ণ' করার জন্য বিশেষ জোর দেন এবং বলেন, 'জাতি হিসেবে সাহিত্যকে যদি আলাদা করে চেনা না যায় তবে সেই সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না'। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন–মুনীর চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, আশরাফ সিদ্দিকী, আবুল কাশেম প্রমুখ। সে বছর 'সামাজিক কুসংস্কার ও তার প্রতিকার' বিষয়ে সংঘের পরবর্তী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে লেখকদের মুক্তমনা হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে সামাজিক কুসংস্কার কিভাবে কাজ করে সে ব্যাপারে বিশেষ আলোকপাত করে বক্তৃতা

দেন আবুল হাসনাত। এ বিষয়ে আরও আলোচনায় অংশ নেন আশরাফ সিদ্দিকী, নাজমুল করিম, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, জোবেদা খানম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ।[২৪৯]

ক্রমে লেখক সংঘের কর্মতৎপরতা বিস্তৃতি লাভ করে। এই সংগঠন জাতিসংঘের সুদৃষ্টি লাভ করে এবং ১৯৬১ সালের ২১ জুন এটি নিয়মিতভাবে জাতিসংঘের বেসরকারি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ বছর কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সেমিনারে লেখক সংঘের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সংঘের পক্ষ থেকে দুস্থ লেখকদের সাহায্য প্রদান করা হয়। লেখক সংঘের চেষ্টায় বিভিন্ন পুঁজিপতি, আমলা-মুৎসুদ্দি-সামন্তরা অর্থ-সাহায্য দিয়ে নানা প্রকার সাহিত্য পুরস্কারে ব্যবস্থা করেন। পাকিস্তানি ধ্যান-ধারণার পরিপোষক হলেই পুরস্কার পাওয়া যেত। লেখকদের চিন্তা-চেতনায় ও রচনাবলিতে বাঙালি-সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকলে আদমজী পুরস্কার (১৯৬০) দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩) ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার (১৯৬৪) এবং আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত সাহিত্য-শিল্পের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড ফর প্রাই এন্ড পারফরমেন্সেস' পাওয়া যেতোনা।[২৫০] অথচ প্রধান বাঙালি লেখক-সাহিত্যিক-গবেষক-অধ্যাপক প্রায় সকলেই আইয়ুবী শাসনামলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত 'সাহিত্য-পুরুস্কার' সমূহ অর্জন করেছেন।[২৫১] বস্তুত লেখক সংঘের কর্মতৎপরতা এবং এর সাথে পূর্ব বাংলার প্রগতিপন্থি লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়াকে বেশ বিস্ময়কর। তবে এই সংগঠনের ভেতরে রক্ষণশীল লেখক সম্প্রদায়ের সাথে প্রগতিপন্থি লেখকদের একটি নিরব দ্বন্দ্ব ছিল। লেখক সংঘের কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে একপর্যায়ে প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য চিন্তা বিকশিত হয়।

১৯৬২ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার প্রায় সকল সদস্য পদে প্রগতিশীল লেখকরা নির্বাচিত হন। আর এ সময় থেকে পূর্ববর্তী কমিটির প্রভাবশালী রক্ষণশীল ও অতি পাকিস্তানবাদী লেখকরা নিষ্ক্রিয় ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমশ বিকশিত হতে থাকলে প্রগতিশীল ও উদারপন্থি লেখকরা 'লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা' নামে স্বতন্ত্র ধারায় শিল্পী-সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[২৫২]

মূলত সরকারের উদ্দেশ্যপূরণ করা জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান কাজ করে তার মধ্যে একটি রাইটার্স গিল্ড। সরকার বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয় মারফৎ সাহিত্যের বিকাশের নানা দিক প্রশস্ত করলো। আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হয়। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য, সব বিকাশের ধারা সরকারি কুক্ষিগত রাখা। অথবা যদি কোনো বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়, সরকার যেন আগেই তার খবর পায় এবং সেই মত বিনষ্টে নীতি প্রয়োগ করতে পারে। সরকার এ ক্ষেত্রে কিছুটা সফলতাও লাভ করে।[২৫৩] 'লেখক সংঘ' প্রদত্ত নানামুখী সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অর্থনৈতিক দিকটি ছিল উল্লেখযোগ্য–যার আকর্ষণে অনেক প্রগতিশীল লেখকও জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে আপসকামী হয়ে ওঠেন। সামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তাধন্য হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী সময়প্রবাহে 'লেখক সংঘ' বাংলাদেশের উদার মানবতাবাদী প্রগতিশীল ও মার্কসীয় চেতনাসমৃদ্ধ লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।[২৫৪] কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ধোপে টেকেনি। কারণ, অধিকাংশ সময়ে দেখা গেছে, একটু প্রগতিমনা পরিচালক যখন কর্ণধার, বহু লেখা সরকার-বিরোধী, যথারীতি প্রচারিত হয়েছে। অথচ সরকার কিছু উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায়নি, পাছে রাইটার্স গিল্ড ভেঙে যায় এবং সরকারি দূরভিসন্ধি প্রকাশ পায়। অনেক সরকারবিরোধী বই পর্যন্ত পুরস্কৃত হয়ে যাওয়ার পর টনক নড়েছে।

এই ক্ষেত্রেও কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমের ফারাকের জের স্পষ্ট ছিল। সরকার গড়ে রাইটার্স গিল্ডের পেছনে বাৎসরিক তিল লক্ষ টাকা খরচ করতো। পূর্ব পকিস্তানে হিস্যায় কখনও চল্লিশ হাজারও আসত না। তাছাড়া হেড অফিস করাচিতে অবস্থিত। ফলে আনুষঙ্গিক ব্যয়ের সুযোগ পশ্চিমেই। পূর্ববঙ্গ স্বভাবতই বঞ্চিত হত।[২৫৫]

এই সংগঠনের মুখপত্র ছিল 'পরিক্রমা'। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর এই সংঘের কার্যক্রম বেশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। ৬ দফা আন্দোলন (১৯৬৬) জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সময় লেখক সংঘের তৎপতরা প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয় এবং এর সক্রিয়তা হ্রাস পায়। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রবিতর্কের ফলে এই সংঘের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে এর কার্যক্রম আরও স্থবির হয়ে পড়ে। তারপরেও এই সংঘ ১৯৬৮ সালে 'মহাকবি স্মরণোৎসব' ও 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনুষ্ঠান' এই দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৬৯ সাল থেকে পূর্ব বাংলার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনও প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হলে লেখক সংঘের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে।

সৃজনী লেখক ও শিল্পগোষ্ঠী (১৯৬০)

লেখক ও শিল্পীদের গোষ্ঠী 'সৃজনী' ১৯৬০ সালে সংগঠিত হয় 'সৃজনী সাহিত্যিক গোষ্ঠী' নামে। ১৯৬৩ সালে নাম বদলে হয় 'সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী'।[২৫৬] 'সৃজনী' প্রতিষ্ঠায় ছিলেন–অজয় গুপ্ত, ইমরুল চৌধুরী, নিয়ামত হোসেন, আবু নাহিদ, মাসুদ আহমেদ, কবি ইউসুফ পাশা, হেদায়েত হোসেইন মোর্শেদ প্রমুখ। পরে আরও যুক্ত হয় শুভ রহমান, মাহবুব তালুকদার, জিয়া আনসারী, ওয়াজেদ মাহমুদ, সোলায়মান, মোজাম্মেল হোসেন মন্টু প্রমুখ।[২৫৭]

'সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী'র ঘোষণায় বলা হয়েছিল :

> সৃজনীর লেখক ও শিল্পীরা সবসময় মনে রাখে যে তাদের
> প্রত্যেকের যেমন স্বতন্ত্র ও চিহ্নিত ব্যক্তি সত্তা বা ভূমিকা ও প্রতিভা
> রয়েছে, তেমনি তারা প্রত্যেকেই সর্বসাধারণের অবিভাজ্য অংশ।
>
> সৃজনী...জীবনের জয়গান করে। অপরাজেয় আশাবাদী...
> ধ্বংস ও মৃত্যুর কুৎসিৎ ভ্রূকুটী তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না।
>
> ...অতি জাতীয়তাবাদ কিংবা তথাকথিত বিশ্বপ্রেমিকতাকে
> সে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। প্রতিক্রিয়ার সাথে সংঘাতকে অবশ্য
> এড়িয়ে চলবে না সৃজনী।
> ... প্রতিভার ছলে কখনও আত্মপ্রবঞ্চনা করবে না... সে
> জানে...বিকৃতিতে ঘটবে তার বিচ্যুতি।[২৫৮]

'সৃজনী' একুশে ফেব্রুয়ারি ও মে দিবস উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশ করে। ১৯৬৭ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি স্মরণে প্রকাশিত 'জয়ধ্বনি' সংকলন সংগঠনের 'লেখকদের ইতিহাসচর্চা ও সমাজবিকাশের গতিধারা সম্পর্কে গভীর অনুশীলনের ফসল' হিসেবে বিবেচিত।[২৫৯]

মার্কসবাদী লেখক-সাহিত্যিকদের সংগঠন হলেও এটি মূলত প্রতিবাদী নাটক চর্চার ক্ষেত্রেই বেশি আগ্রহী ছিল। প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে এই সংগঠনটি পাঁচটি নাটক উপস্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১৯৬৬ সালে প্রথম পথনাটক উপস্থাপনার কৃতিত্বের দাবিদার সৃজনী। এটি ছিল শহিদ মিনারে অভিনীত প্রথম নাটক। এরপর তাদের সফল প্রযোজনা ছিল ১৯৬৮ সালে সৈয়দ হাসান ইমামের পরিচালনায় ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা'। কিন্তু মে দিবসের অনুষ্ঠানে পল্টন ময়দানে নাটকটি পরিবেশনার ঘোষণা হলেও সংকীর্ণমনা কিছু রাজনৈতিক নেতার বিরোধিতায় তা সম্ভব হয় নি। কারণ সৃজনী ততদিনে সরকারবিরোধী একটি সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক গোয়েন্দা সংস্থা 'বিএনআর' আর গোয়েন্দা পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি ছিল সৃজনীর কর্মকাণ্ডের প্রতি। তবু ঢাকায় সৃজনীর সাহসী নাট্য আয়োজন ছিল 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন', গোর্কির 'বিপ্লবের টুকরো ছবি', 'সংকেত' (১৯৭০) ইত্যাদি।[২৬০]

'সৃজনী'র সকল কার্যক্রম ঢাকা শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। সে গণ্ডি ভাঙার অঙ্গীকার থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি রাজনৈতিক বিভক্তির জন্য।[২৬১] এতকিছুর পরেও মুক্তিযুদ্ধের অসহযোগ আন্দোলন পর্বে সৃজনী সংস্কৃতিকর্মীরা নাটক ও গণসংগীত নিয়ে আমজনতার সাথে রাজপথে নেমে আসে। সে সময় তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশনা ছিল 'রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য' এবং 'একটি পোস্টার'। বস্তুত এ সব বাস্তবধর্মী নাটকটি অভিনীত হয়েছে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে। বাঙালি জাতীয়তাবোধে ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শই ছিল সৃজনী গোষ্ঠীর পরিচালিকা শক্তি। 'সব রকম

সীমাবদ্ধতা নিয়েও পথনাটক ও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের পথিকৃতের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে সৃজনী'। সৃষ্টিশীল গণমুখী নাট্যচর্চার ধারা গড়ে তুলতে সৃজনীর ছিল এক অগ্রণী ভূমিকা।[২৬২]

রীবন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন (১৯৬১)

রাজনীতিবিদদের কারাগারে ঢুকিয়ে, রাজনীতি-চর্চা নিষিদ্ধ করে সামরিক আইনের কঠোর প্রয়োগ ঘটিয়েছিলন আইয়ুব খান। সেই সাথে ছিল সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ এবং প্রকাশ্য স্থানে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা। এমনি পটভূমিকায় **১৯৬১** সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। শতবর্ষ অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীরা এগুতে লাগলেন। এই কমিটি কীভাবে হলো সে সম্পর্কে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন,

> সময়টা তখন **১৯৬০** সালের শেষের দিক। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী হবে একষট্টির মে মাসে। এটা সেই সময় যখন সমস্ত দেশ আইয়ুব খানের কঠোর সামরিক শাসনের কবলে নির্মমভাবে শৃংখলিত।...সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সভা সমিতির চত্বরগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর শীতল নীরব স্থবিরতা।...
>
> এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর উদ্যোগ নিতে যাওয়া যে কতখানি ঝুঁকির ব্যাপর তা আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম। বাঙালি সংস্কৃতির যে অবদমন তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন যে সেই প্রচেষ্টার প্রতি একটা সরাসরি প্রত্যাঘাত তা তারা ভালোভাবেই জানেন।[২৬৩]

মুনতাসীর মামুন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সম্পর্কে বলেন, 'রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নিপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ।'[২৬৪] **১৯৬১** সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিক উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে বাঙালি আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানের প্রশ্নে দ্বিধামুক্ত হওয়ার অবকাশ পেলো বহুলাংশে। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠী, রবীন্দ্র-অধ্যয়নে অক্ষম বাঙালি শিক্ষিত আমলাশ্রেণি ও ধর্মান্ধ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে জটিল সংকট সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে ওঠে।[২৬৫] শুধু তাই নয় শাসক ও তাদের সমর্থকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরোধিতা করে যায়। মওলানা আকরম খাঁর *আজাদ* পত্রিকা সাফ জানানো হচ্ছে–

> পাকিস্তান এছলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট কর্মসূচী লইয়া দুনিয়ার বুকে জন্মলাভ করিয়াছে। আমরা পাকিস্তানিরা তাই স্বকীয় তাহজীব তমদ্দুনের পরিপন্থী কোনো প্রচেষ্টাই বরদাশ্‌ত করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞ প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাইয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল।[২৬৬]

মফিদুল হক এ প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত মতামতের বিরোধিতা করে বলেন,

> **১৯৬১** সালে চির নতুনের ডাক নিয়ে হাজির হলো পঁচিশে বৈশাখ, বিশ্বকবির জন্মশতবর্ষ পালনের তাগিদ সৃষ্টি করে। এই তাগিদ বাঙালি চিত্তে সঞ্চার করেছিল ভিন্নতর অনুরণন, সবকিছু হারিয়ে বাঙালি বুঝি বাঁচবার অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চাইলো তাঁর সংস্কৃতি। আপতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নির্দোষ এক আয়োজন, কিন্তু এর রাজনৈতিক মাত্র বুঝতে শাসকগোষ্ঠীরও ভুল হয়নি। সরকারের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করলেন যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কবি, তাঁর সাথে মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তানের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং 'হিন্দু' কবির জন্মশতবর্ষ পালন হবে পাকিস্তানের ঈমান ও আকিদার বিরোধী।[২৬৭]

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎসব শুরু হয়। পূর্ববাংলায় তখন ছিল ভিন্ন পরিস্থিতি। এ ব্যাপারে সামরিক সরকারের কোনো প্রকাশ্য বিরোধিতা না-থাকলেও কিছুসময় পূর্বে নানা অজুহাতে আলাউদ্দিন আল আজাদ, কে জি মোস্তফা ও আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ সংস্কৃতিসেবীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। ফলে বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন সন্ত্রস্ত।[২৬৮]

বুদ্ধিজীবীদের নানাভাবে সাবধান করে দেওয়া হয় যাতে তারা সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে না যান। এক্ষেত্রে সন্‌জীদা খাতুন সরকার কর্তৃক সৃষ্টি করা প্রতিবন্ধকতার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন :

বিলকিস নাসিরুদ্দীন 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্রে গান গাইবেন, কথা ছিল। তিতি কি কারণে যেন গাইতে পারছেন না। উপায়ান্তর না দেখে ভক্তিময় দাশগুপ্ত স্বরলিপিতে 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্রের নির্বাচিত গানগুলো দাগিয়ে দিলেন। আড়াল থেকে গান গেয়ে দেবার দায় বর্তালো আমার উপর,...

ড্রামা সার্ক্‌ল-এর 'তাসের দেশ' নাটকের গান নিয়েও সমস্য হলে, আমাকে উপস্থিত মতো গান গাইতে হয়েছিল। সরকারের অসন্তোষের ভয়ে মুখের ভিতরে রুমাল পুরে নিয়ে গেয়েছিলাম যাতে আমার কণ্ঠ চেনা না যায়। অনুষ্ঠান শেষে আব্দুল আহাদ জিগ্যেস্ করলেন ভালোই তো গাইল, কে বলো তো? অর্থাৎ সত্যি সত্যিই গলা চেনা যায়নি।[২৬৯]

এই রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন করতে হয়।

পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীরা এসব উদ্যোগ যুক্তবঙ্গীয় প্রবণতার নিশানা এবং পাকিস্তানি আদর্শ ও ইসলামী ঐতিহ্যবিরোধী শক্তির সমাবেশ দেখতে পেলেন এবং প্রাণপনে বিরোধিতা শুরু করলেন। *দৈনিক আজাদ* এদের মুখপত্র পরিণত হয়। ১লা বৈশাখ, এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আজাদ সবাইকে সাবধান করে দেয়।

> সোজা কথায়, রবীন্দ্রনাথের দোহাই তুলিয়া অখন্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক জীবনের বিপদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ অনুসারী ও ভক্ত। তাদের রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করে নাই, তারা এই সুযোগে তামদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে।[২৭০]

১২ বৈশাখের 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে 'কোহেনেদার' ডাকের সমান। এবং 'এ ডাকে সাড়া দিলে তার নিশ্চিত মৃত্যু'। দুদিন পরে আরও একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিলেন বিরূপ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণু। এগুলো ছাড়াও বৈশাখ মাসের মধ্যে আরও তেইশটি প্রবন্ধ ও অনেক চিঠি আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রতিটিতে নানাভাবে ও নানা যুক্তিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের সীমাবদ্ধতা, মুসলমানদের নিকট এর অগ্রহণযোগ্যতা এবং শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্‌যোক্তাদের পাকিস্তানবিরোধী মানসিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা হয়।

পাকিস্তানি দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসাহিত্যকে মূল্যায়নের জন্য এদের উদ্যোগ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে কয়েকটি আলোচনার ব্যবস্থা হয়। চব্বিশে বৈশাখ ঢাকা জেলা কাউন্সিল হলে আয়োজিত সভায় বক্তারা রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরোধী, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসাধক ও প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের অনুসারী বলে অভিহিত করেন। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নেওয়া হয় :

> এক. পাকিস্তানের ইসলাম ভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে খন্ডিত করার উদ্দেশ্যে অখন্ড ভারতীয় রামরাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসাবে চালু করার জন্য এক শ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী প্রদেশব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, এই সভা তাহাদের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিতেছে।
>
> দুই. পাকিস্তানের বদৌলতে অকল্পিত সুখসম্পদের অধিকারী হইয়াও যাহারা বিদেশী বিজাতীয় কৃষ্টি ও মতবাদের তল্পী বাহিয়া বেড়াইতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট বিকাইয়া দেওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছে তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য এই সভা প্রত্যেক দেশাত্মবোধ সম্পন্ন পাকিস্তানী ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।
>
> তিন. পূর্ব পাকিস্তানের বেতারকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন একাডেমীকে বিজাতীয় সঙ্গীত সাহিত্যের অভিশাপমুক্ত করিয়া জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের অনুসারী করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিশু ও কিশোর মনকে জাতীয় কৃষ্টির অনুবর্তী করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে যাবতীয় গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এই সভা পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শে বিশ্বাসী সরকার, সুধীসমাজ ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।[২৭১]

কিন্তু সরকারের ভ্রুকুটি বা গোষ্ঠী বিশেষের প্রচারণা ফলপ্রদ হয়নি। ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা প্রদেশে সেমিনার, সাহিত্য-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি-সংগীতানুষ্ঠান, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য-নাটক মঞ্চায়ন চলতে থাকে এবং বহুদিনের জড়তা ও নিস্তব্ধতা কেটে গিয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রবল প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি হয়। ঢাকা শহরে উদ্যোগ নিয়েছিল তিনটি কমিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের উদ্‌যোগে এগারো বৈশাখ কার্জন হলে প্রধান অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব

করেন বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সকল রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে অবস্থিত মহান কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। গীতিনক্সা, আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে সভা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের আলোচনা-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বজনীনতা, মুসলামনদের সমস্যা পর্যালোচনায় তাঁর সহানুভূতি এবং তাঁর সাহিত্যে পূর্ববাংলার জনজীবন ও প্রকৃতির অবদান উল্লেখ করেন।[২৭২]

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস, এম, মুর্শেদের সভাপতিত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির অনুষ্ঠান হয়েছিল চারদিনের। কবির রচনা থেকে পাঠ, নাটক মঞ্চায়ন, সংগীতানুষ্ঠান ও আলোচনা ছিল অনুষ্ঠানের অংশ। আলোচকরা রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিশ্বমানবের বিশেষ সম্পদ বলে বর্ণনা করেন এবং মতবাদ-আকীর্ণ আধুনিক বিশ্বে কবির চিন্তাধারা উপকারে আসতে পারে বলে মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন চসার, শেক্সপীয়র, বালজাক, ভলতেয়ারের মতো রবীন্দ্রনাথকে 'সমগ্র পৃথিবীরই বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধার পাত্র' বলে মত প্রকাশ করেন।

ঢাকার প্রেসক্লাবে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিক্ষার্থীদের সমবায়ে 'রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি' গঠিত হয়েছিল। সিম্পোজিয়াম, নাটক-মঞ্চায়ন, চিত্র-পুস্তক প্রদর্শনী, শিশুদের অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে কমিটি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।[২৭৩]

রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা-নাটক-গীতিনাট্য মিলিয়ে তিন দিনের সংস্কৃতি উৎসব মাতিয়ে তুলেছিল ঢাকাবাসীকে, সরকারি বাধার মুখে রাজনীতি রুদ্ধ হলেও সংস্কৃতি প্রকাশ করেছিল প্রত্যয়দীপ্ত সাংস্কৃতিক বার্তা, দ্বিজাতিতত্ত্বের ঘেরাটোপে যে সাম্প্রদায়িক অগণতান্ত্রিক শোষণ-পীড়নমূলক রাষ্ট্র কায়েমের চেষ্টা চলছে প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সংস্কৃতির বিশেষ ভূমিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সবার আগে সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল জাতীয় মুক্তির আকুতি, মিলছিল অগ্রগতির পথরেখা।[২৭৪]

রবীন্দ্রচর্চা সম্পর্কে আতিউর রহমান বলেন,

> ১৯৬০-এর দশক রবীন্দ্রচর্চার মধ্যে দিয়েই ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন জোরদার হয়। তখনকার পাকিস্তান সরকারের প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করেই সেকাজ চলতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্রচর্চাকে কেন্দ্র করে যে-প্রবল উৎসাহ লক্ষ করা যায়, তা প্রতিবাদী মনোভাবের। পাকিস্তানি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করার মনোভাবের। এ-সময় যে-হাজার হাজার লোক ছায়ানটের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে যেতেন, তাঁরা বেশিরভাগই রবীন্দ্রসংগীতের সমঝদার ছিলেন না। যে-শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা তাঁদের বসার ঘরে লং প্লে রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত বাজাতেন, তাঁরা অনেকেই রবীন্দ্রসংগীত অতটা ভালোবাসতেন না অথবা বুঝতেন না। কিন্তু এটা ছিল বাঙালিয়ানার আন্দোলনে শরিক হওয়ার প্রতীক। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতীক। যাঁরা বাঙালিত্বে বিশ্বাসী তাঁরা এ-সময় রাবীন্দ্রিক হয়ে ওঠেন, যাঁরা রাবীন্দ্রিক তাঁরা উদার মানবিকতার আদর্শ এবং বৈদগ্ধ্যে দীক্ষিত হয়ে ওঠেন।[২৭৫]

ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা (১৯৬২)

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হলে কোনো কোনো কর্মী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার জন্য স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।[২৭৬] এ উদ্দেশে ঢাকা ও জয়দেবপুরে দুটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। এ প্রসঙ্গে সন্‌জীদা খাতুন লিখেছেন,

> অনুষ্ঠান শেষ (রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী) হয়ে গেলে আমাদের ভাবনা হল-এখানেই কি শেষ? এই যে সাহস করে জন্ম-শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে এতগুলো মানুষ একত্র হয়েছি, আমাদের কি আর কিছু করণীয় নেই? ভাবনার দায় নিয়েছিলেন সিধু ভাই (মোখলেসুর রহমান), আহমেদুর রহমান('মিঠেকড়া' কলাম লেখক 'ভীমরুল'), ওয়াহিদুল হক, সাঈদুল হাসান প্রমুখ অনেকে। অল্পবয়সীদের মধ্যে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাইফুদ্দীন আহমেদ (মানিক), তার বন্ধু ছানা (মীজানুর রহমান)। সিধু ভাই আর তাঁর অক্লান্তকর্মী স্ত্রী আমাদের রোজবু (শামসুন নাহার)-র ব্যবস্থাপনায়

জয়দেবপুর গিয়ে চড়ুইভাতির আয়োজন হল। বিকেল বেলা সেখানে সভা বসল একটি সংগঠনে সকলে মিলিত হবার কথাবার্তা বলতে। সেইদিন জন্ম হলো 'ছায়ানট' সংগঠনের।[২৭৭]

সাঈদুল হাসানের প্রস্তাবক্রমে 'ছায়ানট' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে।[২৭৮] সুফিয়া কামাল সভাপতি, সহসভাপতি মোখলেসুর রহমান সিধু আর মিসেস্ সায়েরা মহীউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক ফরিদা হাসান। সদস্যরা হলেন–আহমেদুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সাঈদুল হাসান, শামসুন নাহার, সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিক, মীজানুর রহমান, নূরুল ইসলাম, দেবদাস চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকে। সরকারি চাকুরে হওয়া সন্‌জীদা খাতুন সক্রিয় কর্মী হলেও তাকে কমিটিতে যুক্ত করা যায় নি।[২৭৯]

সুফিয়া কামাল ছায়াটন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

> এই সময়েই (রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের সময়) আমরা অনুভব করি কণ্ঠশিল্পীর। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, বিশেষত বাংলাদেশের আসল যে সংগীতের ধারা পল্লিগীতি, তা বেতারে বা নানা অনুষ্ঠানে গাওয়ার জন্য আমাদের ভালো কণ্ঠের শিল্পী নেই। সেই লক্ষ্য থেকেই সংগীত বিদ্যায়তন 'ছায়ানট'-এর প্রতিষ্ঠা হলো।[২৮০]

ঐতিহ্য সংলগ্ন-হওয়া, বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণের প্রয়াস নিয়ে ছায়ানটের যাত্রা শুরু। সন্‌জীদা খাতুন ছায়ানটের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, 'ছায়ানটের মূল সাধনা হলো বাঙালি হবার এবং চর্তুদিকে আমাদের যারা রয়েছেন, আমাদের সমাজের, আমাদের দেশের সবাইকে খাঁটি বাঙালি করে তোলা'।[২৮১]

ছায়ানট সম্পর্কে ওয়াহিদুল হক বলেন,

> পঞ্চাশের দশক জুড়ে আমরা যেমন নিজেদেরকে বাঙালি হিসেবে, মানুষ হিসেবে মেলতে আরম্ভ করলাম, পাকিস্তানও তেমনি তার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অচলায়তনী পেষণপীড়ন কঠিন করতে আরম্ভ করল। আটান্ন'র আইয়ুব খানের সামরিক অভ্যুত্থান চণ্ডনীতি নিয়ে চড়াও হল বাঙালি জাতিচেতনা ও সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, বিরোধী উদারতার উপর। ফল হল উল্টো। একষট্টিতে রবীন্দ্রশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হল যেন দেশজোড়া মহোৎসবের মতো। যে-জিনিস ছিল চাপা, খুলে গেল তা সহস্রমুখে। পঞ্চাশের দশকে যা ছিল সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি, ষাটের দশকে ঘটল তার রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। শতবার্ষিকীর সুফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 'ছায়ানট' আরম্ভ করল তার বিখ্যাত ঋতু-উৎসবগুলো। বিদেশি উপনিবেশিক শক্তির সামরিক একনায়কত্বের কঠিন নিগড়াবদ্ধ দিনেই আরম্ভ করল এক নিতান্তই বেহিসেবি সাংস্কৃতিক খোলা বাতাস।[২৮২]

সন্‌জীদা খাতুন বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ছায়ানট সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

> ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুরু হয়েছিল। দেশীয় সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেবার একটা নিরন্তর চেষ্টা ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর। তাই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত ছায়ানটের উদ্দেশ্য ছিল তা ফিরিয়ে আনার। আরও উদ্দেশ্য ছিল মনে করানো আমরা বাঙালি। এছাড়া সঙ্গীতের আলোতে আলোকিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ছায়ানট। কারণ সঙ্গীত মানুষের চিত্তকে আলোকিত করে। তাই শিল্পী তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলা শুরু করে ছায়ানট।[২৮৩]

সন্‌জীদা খাতুন আরও বলেন,

> এসময় (পাকিস্তানি আমলে) শিল্পীদের রেজিমেন্টকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য ডাকা হয়। কিন্তু তাদের বাগ (নিয়ন্ত্রণ) মানানো সম্ভব নয় মনে করে আর কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়নি।[২৮৪]

তবে প্রতিবন্ধকতা যে আসেনি তা নয়। ১৯৬৩ সালে যখন ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা হয় তখন ভাবা হয়েছিল এই বিদ্যায়তন থেকে প্রগতিশীল সংস্কৃতির কর্মী বেরয়ি আসবে। কিন্তু আইয়ুবী মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনের পর ছায়ানট থেকে যখন আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের বিরুদ্ধে পল্টন ময়দানে একটি সাংস্কৃতিক সমাবেশ করে গণসংগীত অনুষ্ঠান করতে চাইলে চূড়ান্ত আঘাত আসল। ছাত্রছাত্রীরা জানায় তাদের বাবা-মা পল্টন ময়দানে গান গাইতে দিতে চায়।[২৮৫] অর্থাৎ সরকার বিভিন্ন ভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদেরকে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখে।

ছায়াটন মূলত একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান। এটা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতি ও সংগীত-চর্চায় এদেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতি-মুখী হওয়া। ঢাকার কারিগরী মিলনায়তনে 'হাজার বছরের গানের আসর' ছিল প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান। এর অন্যান্য নিয়মিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল রবীন্দ্র-নজরুল জন্মতিথি, নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব ও বসন্তোৎসব-পালন। নববর্ষ ও শারদোৎসবের অনুষ্ঠান হত যথাক্রমে রমনার বটমূলে ও বলদা গার্ডেনে। অনুষ্ঠানে নানাভাবে দেশজ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত গানের মধ্যে 'আবার তোরা মানুষ হ অনুকরণ খোলস ভেদি কায়মনে বাঙালী হ'–গানটি বিশেষ স্থান দখল করেছিল।[২৮৬] এইসব অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাঙালিত্বের প্রসার ঘটায় পূর্ব বাংলায়। ছায়ানট বুঝতে পেরেছিল, ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে প্রতিহত করতে হলে ঐতিহ্য স্মরণের আয়োজন করা জরুরি। সে জন্যই জন্মলগ্ন থেকে পুরোনো গানের আসর, রাগসংগীত, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত গানের নানামাত্রিক চর্চার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে দেশীয় ঐতিহ্যে সচেতন করা হয়।[২৮৭]

মফিদুল হক ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

> সঙ্গীতকে অবলম্বন করে সাংস্কৃতিক বোধের উদ্বোধনের জন্য ছায়ানটের প্রয়াসে ছিল সম্প্রসারণশীল তাৎপর্য। ছায়ানটে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল-গীতি, লোকগান ও ধ্রুপদী বাদনের শিক্ষণ ও চর্চা হয়ে উঠেছিল বাঙালি সত্তা ফিরে পাওয়া ও তার প্রতিষ্ঠা ঘটাবার অবলম্বন, ফলে গান আর নিছক গান থাকে নি, উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকা না নিয়েও তা হয়ে উঠছিল নিঃশঙ্ক প্রতিবাদী।...সঙ্গীত অবলম্বন করে জাতীয় মুক্তির এমন সাধনা আর খুব বেশি দেশে খুব বেশি কালে ঘটেনি।[২৮৮]

ছায়ানটের কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৬২ সালের প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা। ছায়ানটের নেতৃস্থানীয়রা ১৯৬৩ সালে সুস্থ চলচ্চিত্র শিল্প গড়ার লক্ষ্যে 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ' গঠন করেন। এ ছাড়া ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনের জন্য জনমত সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক আবহে শান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়ে ছায়ানটের শিল্পীরা কুষ্টিয়ার শিলাইদহে অনুষ্ঠান করে। এছাড়া ১৯৬৭ সালে সরকারিভাবে রবীন্দ্র সংগীতের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয় ছায়ানট। এ সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন প্রমুখ শিল্পীদের সহায়তায় ১৯৭১ সালের মার্চে গঠিত হয় 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংস্থা'। তারা ১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন পর্বের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।[২৮৯] পূর্ব বাংলার বাঙালিত্বের সাধনায় তথা সংস্কৃতির সংগ্রামে ছায়ানট মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর। বলতে গেলে ছায়ানটের একক প্রচেষ্টায় 'পহেলা বৈশাখ' (বর্ষবরণ) সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে এখানে এক সর্বজনীন উৎসবের মর্যাদা লাভ করেছে। ওয়াহিদুল হক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'কাজ একটাই-এ দেশীয় বাঙালিদের সাংস্কৃতিক শূন্যতা পূরণ করা। সংস্কৃতির অভিমুখে বাংলাভাষী সকল মানুষকে ধাওয়ানো। বারো মাসে তের নয় ষোলটি পর্যন্ত অনুষ্ঠান করেছে ছায়ানট। গানে গানে ভাসিয়ে দিয়েছে দেশকে'।[২৯০]

মাহমুদ আল জামান বলেন,

> ষাটের দশকে গড়ে ওঠা স্বরূপ চেতনা এবং স্বাধিকার বোধের গভীরতা বাঙালি নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গী হয়ে ছায়ানট এই সময়য়ে নব-উপলব্ধিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই, ছায়ানটের এই কর্মপ্রয়াস স্বাধীনতার যাত্রাপথকে সুগম করেছে।[২৯১]

করতোয়া শিল্পী গোষ্ঠী, বগুড়া (১৯৬২)

ষাটের দশকের সামরিক আইনে সারা দেশের মতো বগুড়ার সংগীত চর্চাও শৃঙ্খলিত ছিল। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে বগুড়ার শিল্পী মহল প্রণোদিত হয়। এই প্রণোদনা থেকেই ১৯৬২ সালে বগুড়ায় গঠিত হয় 'করতোয়া সাংস্কৃতিক সংসদ'। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন লুৎফর রহমান সরকার। করতোয়া গোষ্ঠীর সংগীত দলে ছিলেন–মৃণাল কান্তি সাহা, মোস্তফা নুরুল মোহাসিন (ছোটি), খাজা গোলাম মঈন উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, অনিল বিশ্বাস, আবদুল কাদের, খন্দকার এমদাদুল হক, চায়না মুখার্জী, বকুল, জলি, রঞ্জনা, হোসনে আরা ও অনুপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

গণসংগীত ও দেশগান চর্চায় এ সংগঠনটি বিশেষ অবদান ছিল। সমকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করার লক্ষ্যে করতোয়ার শিল্পীরা একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন।[২৯২]

ঐকতান (১৯৬৩)

১৯৬০-এর দশকের প্রথমদিকে বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশের মানসে সংস্কৃতিসেবীদের যে বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ঐকতান'। ১৯৬৩ সালে সংস্কৃতিসেবী নাসির উদ্দিন, শহীদ উদ-দাহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. রফিকুল ইসলাম, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী আতিকুল ইসলাম, ফারুকুর ইসলাম প্রমুখের উদ্যোগে মুখ্য ভূমিকা ছিল ঐকতান সৃষ্টির পেছনে। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনা করা। তেমন কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। তবু পূর্ব বাংলা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাদের যথেষ্ট অবাদন ছিল। ঐকতান মূলত সংগীতনির্ভর ও অনুষ্ঠানভিত্তিক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। দেশগান ও বিষয়ভিত্তিক ঋতুসংগীত চর্চায় এ সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[২৯৩] ওয়াহিদুল হকের মতে, 'এই দলের সম্মেলক গানের একটি সুন্দর মান ছিল। তেমনি ছিল এদের মঞ্চে আবির্ভব ও উপস্থিতির ব্যাপরটা–সাদা শাড়ীতে-জামাতে-পাজামা-পাঞ্জাবীতে ও চুলে জড়ানো সাদা ফুলের মালাতে মিশে এক শুভ্রশচি গম্ভীর প্রাণভরানো পরিবেশ সৃষ্টি হত। হাতে হাতে বিলি হত অত্যন্ত রুচিমান অনুষ্ঠানপত্র। ছায়ানটের বন্ধ্যা থাকবার কালে ও অনিশ্চিত প্রথম পদক্ষেপের সময় রবীন্দ্রসংগীত প্রচার-প্রসারে সবচাইতে অগ্রসর ও উল্লেখযোগ্য–বলতে গেছে একমাত্র কাজই করেছে ঐকতান। পূর্ব বাংলায় সংস্কৃতি ও সংগীত চর্চায় ঐতিহ্য ও প্রকৃতিমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে এ সংগঠনের ভূমিকা স্বল্পকালীন হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২৯৪]

সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, খুলনা (১৯৬৩)

১৯৬৩ সালের ২০ সেপ্টেম্ব খুলনার শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক সবাই মিলে 'সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়' প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯৫] সন্দীপনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন–আব্দুল হাকিম।[২৯৬] প্রতিষ্ঠাকালে এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন প্রখ্যাত গল্পকার হাসান আজিজুল হক, অধ্যাপক নাজিম মাহমুদ, অধ্যাপক খালেদ রশীদ, কবি আবুবকর সিদ্দিক, অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, অসিত রায় চৌধুরী, জাহানারা বেগম, নাজিম সেলিম বুলবুল, গৌরী শংকর ঘোষ এবং সুরকার সাধন সরকার।[২৯৭] সন্দীপনের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের পঞ্চবর্ষ উৎসব স্মারকপত্রে বলা হয়,

> ..অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবার আকুল আগ্রহে গুটি-কয়েক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন একটি সুস্থ ও জীবন ভিত্তিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলবার কাজে। এই প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি হিসেবে উনিশশো তেষট্টির বিশে সেপ্টেম্বর জন্ম নিল এ প্রতিষ্ঠান।[২৯৮]

পঞ্চদশ আসরে সন্দীপনের ভিত্তিকে মজবুত এবং স্থায়ী রাখবার জন্যে পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস নিয়ে এ গঠনতন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন–নামিজ মাহমুদ। তিনি সপ্তদশ আসরে রচনা করেন–সম্প্রদায় সংগীত।

> সম্প্রদায় সংগীত
> সন্দীপন সন্দীপন সন্দীপন
> সংস্কৃতি সভ্যতার সঞ্জীবন
> সন্দীপন সন্দীপন সন্দীপন
> সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্মিলন
>
> সূর্যমুখী সূর্যলোকের সুর যে চায়
> আকাশ ডাকে বলকা সুদূর যে যায়
> নির্মুক্ত পবিত্র মাটি বন্দীময়
> সুন্দরের বন্দনায় সন্দীপন
>
> বুদ্ধি হৃদয় বৃত্তির উৎকর্ষ চাই

মানবতা ও জ্ঞানের আলোর স্পর্শ চাই

একটি মুগ্ধ স্বপ্ন উজল দৃষ্টি চাই
মুক্ত উদার জীবনবোধের সৃষ্টি চাই
উত্তরণ ও যুগ হুজুগের সন্ধিক্ষন
দীপ্ত মনের মূর্ত প্রকাশ সন্দীপন।[২৯৯]

সুর দেন সংগীতজ্ঞ সাধন সরকার। সন্দীপনের প্রতীক সূর্যমুখী তৈরি করেন–মুস্তাফিজুর রহমান।[৩০০]
আঞ্চলিক সংগঠন হলেও সমাকালীন প্রেক্ষাপটে 'সন্দীপন' অনেক উঁচু মানের শিল্প-সাহিত্যচর্চা করতো। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সাংস্কৃতিক আসরের ব্যবস্থা করতো তারা। সেখানে গল্প পাঠ, কবিতা পাঠ, গান রচনা সুরারোপ ও পরিবেশনা করা হতো।[৩০১] পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক (১৯৬৭ জুন পর্যন্ত সন্দীপনের সদস্য) এলেন। নিয়ে এলেন সাহিত্যিকদের মেলায় এক জাগরণ। সাড়া পড়ে গেল তাদের মাঝে।[৩০২] প্রতিষ্ঠানটি যাতে টিকে থাকে সেজন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে পঞ্চবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকপত্রে বলা হয়,

> বিভিন্ন মহল থেকে সর্বস্তরের ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ জানান হবে এবঙ নিজেরা ও অতিথিরা সবাই মিলে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ করবার সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন করবে যাতে করে এ প্রতিষ্ঠান সকলের প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিঁকে থাকতে পারে। কোঠা বাড়ীর চারদেওয়ালের মধ্যে বছরে দু একটা জয়ন্তী উৎসব করে সংস্কৃতি চর্চার ছলনাকে .. সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এঁরা বিশ্বাস করেছেন যে পৃথিবীতে যাকে টিঁকোতে হবে তাকে সাধারণের জন্যেই তৈরি করতে হবে। যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ সেখানে সংস্কৃতি ব্যক্তি সংস্কৃতি বা শ্রেণীর গোঁড়া সংস্কৃতি। সেখানে কখনই সুস্থ সংস্কৃতির স্থান নেই। তাই এই প্রতিষ্ঠানকে সাধারণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলবার প্রেরণা উদ্যোক্তাদের প্রথম থেকেই উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৩০৩]

আমন্ত্রিত শ্রোতারা সেই আসর উপভোগ করতেন।[৩০৪] সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই সংগঠনটি নানামুখী সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিজেদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে গণমানুষকে সচেতন করে তুলতে সচেষ্ট ছিল।[৩০৫] সন্দীপন ১৯৬৮ সালে ১৪টি গণসংগীতের একটি অনুষ্ঠান 'অপরাজেয় ভিয়েৎনাম' নিয়ে ঢাকা আসে। আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের উদ্যোগে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে চমৎকার গীতিনক্সাটি পরিবেশন করে শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে।[৩০৬] নাজিম মাহমুদের লেখা এবং সাধন সরকারের যে গানগুলো জনপ্রিয়তা আর্জন করেছিল তার মধ্যে–'দেয়ালে দেয়ালে লটকে দাও একটি নাম/মুক্তি পাগল রক্তস্নাত ভিয়েৎনাম', 'কমরেড এই রাত আঁধিয়ার', 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল চৌকিদার', 'আকাশের সে কপোত/আর ডানা পত পত করে না', 'ধ্বংসের পরোয়ানা শোনকি/সায়গন হাইফং আকাশে', ও 'শান্তি না সংগ্রাম সংগ্রাম' উল্লেখযোগ্য।[৩০৭] নবুলবুল ললিতকলা একাডেমির সম্পাদক সৈয়দ আহমদ হোসেন সন্দীপন গোষ্ঠী সম্পর্কে বলেন, 'সন্দীপন গোষ্ঠী আমাদের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নাম। সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁদের সাধনা নিরলস। সংস্কার মুক্ত দৃষ্টি তাঁদের বৈশিষ্ট্য। মানবতার আদর্শে তাঁরা উদ্বুদ্ধ।'[৩০৮] খুলনার সংস্কৃতিসেবীদের প্রচেষ্টায় 'সন্দীপন' একটি গণমানুষের হিতকামী সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে। পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই সংগঠনটি গভীরভাবে প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়। সন্দীপনের অনুষ্ঠানগুলো সুরাকার সাধন সরকারের সংগীত পরিচালনায় নাজিম মাহমুদ ও কবি আবু বকর সিদ্দিকের লেখা গণসংগীতের মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৩০৯] পঞ্চবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সন্দীপনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,

> আমাদের দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যাঁরা মানবতা ও বিশ্ব জনীনতার আদর্শকে ধ্রুব করে দেশীয় ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে সন্দীপন গোষ্ঠীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঁচ বছরের একাগ্র সাধনা ও একনিষ্ঠ তৎপরতার ফফে সন্দীপন আজ আর শুধু খুলনার প্রতিষ্ঠান বলে পরিগণিত নন, পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট সংগঠন হিসাবে পরিচিত।... দেশের আশা আর বেদনার বানী তাঁদের সাধনায় এমনি করেই শিল্পরূপ লাভ করুক।[৩১০]

সন্দীপন বিভিন্ন সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান উপহার দিতেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–বর্ষপূর্তি উৎসব, নববর্ষ (বাংলা) উৎসব, সংগীতভবন প্রতিষ্ঠার দিবস উপলক্ষ্যে ধ্রুপদ সংগীতের দুদিনব্যাপী উৎসব। ভাষা দিবস, মে দিবস, রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম জয়ন্তী, বর্ষামঙ্গল, স্বাধীনতা দিবস। সন্দীপন এ রকম প্রায় আড়াইশোটি সাপ্তাহিক চক্রের আয়োজন করেছিল।[৩১১]

এছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে রাজশাহী সংস্কৃতি সংসদ (১৯৬৫)[৩১২], রংপুরের শিখা সংসদ (১৯৬৬)[৩১৩], বরিশালের খেয়ালী থিয়েটার (১৯৬৯)[৩১৪] ইত্যাদি অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল।

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ (১৯৬৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্‌যোগে ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়নবোর্ডে ও পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে ১৯৬৩ সালের ২২-২৮ সেপ্টেম্বর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়।[৩১৫] উপাচার্য ড. মুহম্মদ গণি এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।[৩১৬] উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর ভাষণে বলেন,

> এককালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেশকালের সমস্যা-নিরপেক্ষ জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করা হতো। একালে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। তাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে নিছক জ্ঞানসাধনার গজদন্ত মিনার হিসেবে গণ্য করা হয় না। জ্ঞান-সাধনা এখন দেশকাল নিরপেক্ষ নয়, অর্জিত জ্ঞান যাতে দেশের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হয়, একালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেভাবে চিন্তা করছে।
>
> এদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বিভাগের মতো শিক্ষাদান এ বিভাগের প্রধান কর্তব্য হলেও দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, আত্মিক বিশ্বাস এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ষণাবেক্ষণ, তার বিকাশ ও রূপায়ণে সহায়তা করাও বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকক্ষে দেশের ছেলেমেয়েরা যেভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে, তার সঙ্গে আমাদের দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে পরিচিত করে তোলার জন্য এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে বর্তমান ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩১৭]

অনুষ্ঠানের মূল প্রেরণা ছিল বাংলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে 'চার দেয়ালের পরিধি, পুথির পরিবেষ্টন ও গবেষণার অনুবীক্ষণ থেকে বিস্তৃত করে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে 'ভাষা ও সাহিত্য' সম্পর্কে দেশবাসীর কৌতূহল, শ্রদ্ধা আর চেতনা বৃদ্ধি করা।[৩১৮]

পুরো আয়োজনটিকে আলোচনা, কবিতা-গদ্য-নাটক থেকে পাঠ, সংগীতানুষ্ঠান ও প্রদর্শনী এই কয়ভাগে বিন্যাস করা হয়। প্রদর্শনীর শাখা ছিল চারটি ঃ ভাষার বিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, লিপির পরিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাস। চার্ট, রেখাচিত্র, স্থিরচিত্র, হস্তলিখিত পুথি, প্রথম যুগের মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতির সাহায্যে প্রদর্শনীকে কৌতুহলোদ্দীপক ও সর্বসাধারণের সহজবোধ্য করে তোলা হয়। চিত্রগুলোর মধ্যে ছিল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের বাংলা সাহিত্যচর্চা, মুসলমানদের বাংলাদেশে আগমন, রেসাঙ্গ রাজদরবার, ইংরেজদের বাংলাদেশ-বিজয় প্রভৃতি। এ-ছাড়া ছিল মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, কায়কোবাদ ও লালন শাহ প্রমুখের ছবি। আলাওলের পদ্মাবতী কাহিনির একটি চিত্ররূপও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৩১৯]

প্রদর্শনীর প্রবেশপথে পোস্টারে শোভা পাচ্ছিল সতের শতকের কবি আবদুল হাকিমের বিখ্যাত চরণ কয়টি:

> যেসব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবানী
> সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
> দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়
> নিজদেশত্যাগী কেন বিদেশ ন জায়।।
> মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
> দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি।[৩২০]

বাইশে সেপ্টেম্বর সকল নটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিভাগীয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে পূর্ববাংলার অবদান উল্লেখ করেন বিশেষভাবে–

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল পূর্ববাংলায়, উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র বাংলা বিভাগ চালু হয়, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে এদেশেই এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে এখানেই। এর একটা অদৃশ্য ইঙ্গিত হচ্ছে যে, 'বাংলা ভাষার যাবতীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানের ভার বিধাতা এদেশের মানুষের হাতেই তুলে দিয়েছেন।' শিক্ষাদানের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন, 'দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, আত্মিক বিশ্বাস ও আশা-আকাংক্ষার রক্ষণাবেক্ষণ, তার বিকাশ ও রূপায়ণে' সহায়তা করা।[৩২১]

'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি সাড়া-জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক অকৃত্রিম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছে, আলোচনা শুনেছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে। এই আগ্রহের কারণ মূলত অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ ও অভিনবত্বের জন্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও স্মর্তব্য যে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে-অস্ফূট বিকাশ শুরু হয়েছিল সে-কারে, তাই টেনে নিয়ে গেছে সবাইকে অনুষ্ঠানের দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকালে যে-ছাত্র আন্দোলন চলছিল, তার অন্যতম প্রেরণা ছিল নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ, তা-পূর্বেই বলা হয়েছে।[৩২২]

পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান

বাংলা নববর্ষের দিন বাঙালিদের কাছে অত্যন্ত অর্থবহ দিন। নানা অনুষ্ঠান-উৎসবের মাধ্যমে দিনটি পালন করা বাঙালি সংস্কৃতির অতি প্রাচীন রীতি। ব্যবসায়ীরা এদিনে হালখাতা খুলে ও গ্রামে-গঞ্জে মেলা বসে। পাকিস্তান-আমলের প্রথম দিকে উৎসবটি ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল এবং নববর্ষ পালনের খবরও ধীরে ধীরে কমে আসছিল।[৩২৩] কিন্তু **১৯৬১**-র পরবর্তী বছরগুলোতে আবার বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং **১৯৬৪** সালে তথা **১৩৭১** সালে পহেলা বৈশাখ প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। প্রাদেশিক সরকার দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে এবং সেদিন ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব জনসমাগম দেখা যায়। সে বছর বাংলা একাডেমি, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ছায়ানট, তমদ্দুন মজলিশ, নিক্বন ললিতকলা কেন্দ্র, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রসংসদ, গীতিকলা সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ঐকতান গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে এত দর্শক-শ্রোতা ছিল যে, ভীড়ের চাপে কয়েকজন আহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাঙ্গামা উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দর্শকসংখ্যা দেখে কোনো কোনো পত্রিকায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।[৩২৪]

আবদুস সবুর খান (সরকারি দলের নেতা) বলেন, 'ইদানিং পূর্ব বাঙলায় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের এক অশুভ তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপনের নামে বিদেশী সংস্কৃতি এদেশে অনুপ্রবেশ করে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের মূলে আঘাত হানছে।'[৩২৫]

উল্লেখ্য যে **১৯৬১** সালের রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের সময় আইয়ুব সরকার বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে যাতে পূর্ব বাঙলায় তা পালিত না হয়। পাকিস্তানবাদীদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে বহু আক্রমণাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারের এই নীতির প্রতিক্রিয়ায় প্রায় একটা গণ-আন্দোলনের উত্তেজনা নিয়ে পূর্ব বাঙলার জনগণ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করে।

এই বার্ষিকী উদযাপনের সাফল্যে ঢাকায় রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে **১৯৬২** সালে 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রাপ্তির পরে পহেলা বৈশাখের উৎসব হারিয়ে যেতে বসেছিল। কিন্তু **১৯৬১** পরবর্তী বছরগুলোতে আবার বাঙলা নববর্ষ পালনের আয়োজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমেই উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। প্রাদেশিক সরকার পহেলা বৈশাখ সরকারি ছুটি দিন (১৯৬৪ থেকে) ঘোষণা করে বাঙালি-সংস্কৃতির স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

নববর্ষ উদ্‌যাপন সংসদ (১৯৬৬)

খান শামসুর রহমানকে সভাপতি এবং মাহবুব উল আলমকে সম্পাদক করে ব্যাপক ভিত্তিতে নববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে গঠিত হয় নববর্ষ উদ্‌যাপন সংসদ। সংসদের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন হয় ১৯৬৭ সালে। উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ. আর. মল্লিক। এতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও অতুল প্রসাদের গান এবং গণসংগীতসহ মোট ত্রিশটি গান পরিবেশিত হয়। ননী দত্ত, হরি প্রসন্ন পাল, প্রণোদিত বড়ুয়া, চমন আফরোজ, শেফালী ঘোষ, শিখারাণী দাশ, সাফিনা মাহবুব মুন্নি গেয়েছিলেন। এরপর শুরু হয চিরঞ্জীব দাশ শর্মার পরিচালনায় 'এসো হে বৈশাখ' গীতিনকশা। কৃষকদের ফসল তোলার আনন্দের ওপর ভিত্তি করে রচিত নৃত্যনাট্য ' সোনালি ফসল' মঞ্চস্থ হয়। এই সংসদের উদ্যোগে প্রতিবছর পয়লা বৈশাখ উদযাপিত হয়। শেষবারের মতো ১৯৭০ সালে নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়।[৩২৬]

ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী (১৯৬৭)

১৯৬৭ সালে ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃতিসেবী কামাল লোহানীর উদ্যোগে। 'ক্রান্তি ছিল পুরোপরি মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী সংগঠন। এর সাথে সাথে জড়িত সকলেই রাজনীতিতে সরাসরি এবং সক্রিয় ছিলেন। গণমুখী সংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলে সামরিক শাসন, সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ক্রান্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। বস্তুত ক্রান্তির লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ভূমিকা জাগিয়ে তোলা। তাই এই সংগঠনটি গণনাট্য সংঘের পুরোনো গণসংগীতগুলোকে নতুন করে সংগ্রহ করে ও চালু করেছিল। এ ছাড়া তারা পূর্ব বাংলায় লিখিত গণসংগীতকে ব্যাপকভাবে গণজাগরণে কাজে লাগিয়েছেন। পল্টন ময়দানে এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানটি ছিল জমকালো এবং তিনদিনব্যাপী (২১, ২২, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭)।[৩২৭] এ অনুষ্ঠানে তোফাজ্জল হোসেন, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আববুকর সিদ্দিক, সলিল চৌধুরী প্রমুখের গান পরিবেশিত হয়।[৩২৮] এ সম্পর্কে কামাল লোহানী লিখেছেন,

> পল্টন ময়দানে তাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তোফাজ্জল হোসেন, আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, আবু বকর সিদ্দিক ও সলিল চৌধুরীর গণসঙ্গীত নিয়ে পরিবশন করে 'ধানের গুচ্ছ রক্ত জমেছে', নাটক 'আলোর পথযাত্রী' ও নৃত্যানুষ্ঠান 'জ্বলছে আগুন ক্ষেত-খামারে'। তিনটি অনুষ্ঠানেরই সঙ্গীত পরিচালনা করেন সঙ্গীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদ এবং নৃত্যপরিচালক ছিলেন শিল্পী আমানুল হক।[৩২৯]

ক্রান্তি গান, নাটক, নৃত্যনাট্য রচনা ও পরিবেশন করেছে। এই সকল গান, নাচ ও নাটকের মধ্যে ছিল শ্রেণিসংগ্রাম ও বিপ্লবী চেতনা। কৃষক আন্দোলননের উপর ভিত্তি করে রচিত একটি নৃত্যনাট্যেও নাম ছিল 'জ্বলছে আগুন ক্ষেত খামারে'।[৩৩০] ১৯৬৭ সারে সরকারিভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে এবং বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত সম্প্রচার বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রবীন্দ্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সে সময় সবচেয়ে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে ক্রান্তি। ঢাকার বাইরে ক্রান্তির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল–কুলাউড়া কৃষক সম্মেলনে, নওগাঁও ঈদগাহ মাঠের জনসভায়, টাঙ্গাইলে ন্যাপ কাউন্সিলে এবং চট্টগ্রাম জাম্বুরি মাঠে গণসংগীত অনুষ্ঠান।[৩৩১] সর্বোপরি ১৯৬৮-৬৯ সালে গণআন্দোলনের দিনগুলোতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্রান্তি ছিল অন্যতম।

ক্রান্তির জন্য গান রচনা করতেন কয়েকজন তরুন কবি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম দু'জন হলেন–বুলবুল খান মাহবুব ও ফারুক আলমগীর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গাত্মক গান রচনা করেছিলেন বুলবুল খান মাহবুব–'ডলার এল দেশে'। সুর দিয়েছিলেন শেখ লুতফর রহমান। ফারুক আলমগীরের গান, 'ওরে আয় যে বেলা যায়রে/মুক্তির মিছিলে এই সবে আয় রে'। গানটিতে সুর ও কণ্ঠ দিয়েছিলেন মাহমুদুন্নবী।

ক্রান্তির গানের আসরে বিপ্লবী গান গাওয়া হতো–

> বাংলার কমরেড বন্ধু
> এইবার তুলে নাও হাতিয়ার
> ভূমিহীন কৃষক আর মজদুর

গণযুদ্ধের ডাক এসেছে।...[৩৩২]

গানটি রচনা ও সুর দিয়েছিলেন সাধন ঘোষ। গাইতেন মনিরুল আলম মনু। 'বিপ্লবের রক্তে রাঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে' গানটি লিখেছিলেন কবি আবু বকর সিদ্দিক। শেখ লুতফর রহমান এই গানটি গাইতেন। আরেকটি গান 'বাংলা এবার স্বাধীন হবে, চেয়ে দেখ পুব আকাশ'। এই গানে সরাসরি স্বাধীনতার কথা ছিল।[৩৩৩] এইসব গানের মাধ্যমে ক্রান্তি বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করতে ভূমিকা পালন করেছিল।

নজরুল একাডেমি (১৯৬৮)

পাকিস্তানি সংস্কৃতির রূপায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের ২৪ মে ঢাকায় উদ্বোধন করা হয় নজরুল একাডেমি। একাডেমির প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদের ছিলেন–সভাপতি : বিচারপতি আবদুল মওদুদ, সহসভাপতি (অন্যতম) : আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক : তালিম হোসেন।[৩৩৪] উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রদূত হিসেবে কবি নজরুলের-ভূমিকাকে চির জাগরুক রাখা, পাকিস্তানি জীবনাদর্শের সঙ্গে সংগতি রেখে আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারার সকল উপাদানকে আত্মস্থ করা এবং মুসলিম ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানি সংস্কৃতির সংহতি ও বিকাশ সাধন করা প্রভৃতি।[৩৩৫] এর কর্মসূচির মধ্যে ছিল কবির সাহিত্য ও সংগীত প্রচার করা, বাঙালি মুসলামনদের নবজাগরণেল অগ্রপথিক হিসেবে তাঁর অবদান পর্যালোচনা করা, পাকিস্তানি ও ইসলামি সংস্কৃতি বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কিন্ডার গার্টেন স্কুল স্থাপন করা।[৩৩৬]

৬৮ সালের ১ জুলাই একাডেমির উদ্যোগে ঢাকার কারিগরি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'হামদ-নাত জলসা'। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান রাষ্ট্রের নবীন নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান ইসলামী আদর্শকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরার জন্য।[৩৩৭]

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পূজার জন্য হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮) ছাড়াও ঐ একাডেমি বছর খানেক যাবৎ আনন্দের সঙ্গে নজরুলের জন্মবার্ষিকী ইত্যাদি কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিন।[৩৩৮] অনুষ্ঠানে নৃত্যের মাধ্যমে দেখানো হয় : 'উদভ্রান্ত মুসলামানকে নজরুল ইসলাম যে আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন, তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে প্রাত্যহিক জীবনের অন্ধকার, নৈরাজ্য ও কাপুরুষতা লোপ পেয়ে এক বীর্যবান জাতি গড়ে উঠবে।'[৩৩৯] অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানে এক জাতি, এক সংস্কৃতি ও এক ভাষা গড়ে তোলার জন্য।[৩৪০] ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় একাডেমির তৎপরতা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রসংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধে আন্দোলন (১৯৬৭)

পাক-ভারত যুদ্ধের (১৯৬৫) সময় থেকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ নির্দেশ পরবর্তীকালেও বহাল ছিল। এর মধ্যে ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও এতে রবীন্দ্রনাথের অবদান বিষয়ে বিতর্ক উত্তপ্ত রূপ ধারণ করে। তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে জানান জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত আর প্রচার করা হবে না।[৩৪১]

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী এক বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, বেতার ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের সম্প্রচার হ্রাস করার নির্দের্শ দেওয়া হয়েছে, কেননা তা পাকিস্তানের ভাবাদর্শের সঙ্গে সংগতিহীন।[৩৪২]

তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে জানান জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত আর প্রচার করা হবে না।

১৯৬৭ সালের ২৪ জুন *দৈনিক পাকিস্তানের* তৃতীয় পৃষ্ঠায় 'রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করা হবে না' এই শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। খবরে বলা হয়েছিল :

> কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদের বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে। রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরীর এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে খাজা শাহাবুদ্দীন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।[৩৪৩]

এর পরদিনই ২৫ জুন ১৯৬৭, *দৈনিক পাকিস্তানে*র প্রথম পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত - ১৮ জন[৩৪৪] বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি' এই শিরোনামে নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় :

> স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩ শে জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি।
>
> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে; তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্নতা দান করেছে; তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।
>
> সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।[৩৪৫]

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই এই বিবৃতির রচয়িতা অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। বিবৃতিটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই খাজা শাহাবুদ্দিনের ঘোষণা ও সরকারি নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা হতে থাকে। গণমিছিলও বের হয় ঢাকা শহরে। কিন্তু সংবাদপত্রে এইসব খবর তেমন প্রকাশিত হয়নি। তবে সরকারি নীতির সমর্থনে এর পরপরই আরও দুটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ২৯ জুনে। ঐ দিনে দৈনিক পাকিস্তানের প্রথম পৃষ্ঠায় দুটি বিবৃতিই পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল। একটি বিবৃতির শিরোনাম ছিল '১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি-বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬ জন[৩৪৬] শিক্ষক কর্তৃক মতানৈক্য প্রকাশ'; এই বিবৃতিতে বলা হয় :

> সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে পতিপয় ব্যক্তির বিবৃতিতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং এই বিবৃতি পাকিস্তান বিরোধী প্রচারে ব্যবহৃত হতে পারে। বিবৃতির ভাষার এই ধারণা জন্মে যে, স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানি ও বাংলাভাষী ভারতীয়দের সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোন পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধারণার সাথে আমরা একমত নই বলে এই বিবৃতি দিচ্ছি।[৩৪৭]

এই বিবৃতিটির পাশেই যে বিবৃতিটি ছাপা হয় তার শিরোনাম ছিল "৪০ জন[৩৪৮] বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি-রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি মারাত্মক।" বিবৃতিতে বলা হয় :

> পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে ঘোষিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে : 'রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।' এই উক্তির প্রতিবাদ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে, এই উক্তি স্বীকার করে নিলে পাকিস্তানি ও ভারতীয় সংস্কৃতি যে এক এবং অবিচ্ছেদ্য, এ কথাই মেনে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি- যে সংস্কৃতির মূল কথা হল : 'শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।' এবং যে-সংস্কৃতি এই উপমহাদেশের মুসলমানদের অভিহিত করে 'হিন্দু-মুসলমান' বলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁর এক প্রবন্ধে এই উপমহাদেশের মুসলমানদের 'হিন্দু-মুসলমান' বলে অভিহিত করেন।
>
> সংস্কৃতি সম্পকে এই যে ধারণা, এর সাথে পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক ধারণার আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে এবং বরা যেতে পারে, একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। এই কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতির বিরোধী বলেও মনে করি।[৩৪৯]

রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের ঐ অধিবেশনে এ-বিষযে মূল বক্তা ছিলেন পরিষদে সরকারি দলের নেতা আবদুস সবুর খান। সবুরের বক্তৃতায় শুধু রবীন্দ্র প্রসঙ্গই আলোচিত হয়নি, নজরুল-ইকবালকে কি দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আদর্শ কি, সে বিষয়েও বক্তব্য ছিল। সংবাদপত্রে সবুর খানের বক্তৃতা যতদূর পাওয়া যায় তা

থেকে বোঝা যায় বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা ও মূর্খতা কত বিরাট ছিল। অথচ এই সবুর খানই তাঁর বক্তৃতায় বলেন :

> এ-কথা বলা হচ্ছে যে, ড. রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন এবং তাঁর কাব্য-বিহনে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা এতিম হয়ে পড়েছেন। এই শ্রেণীর মূর্খদের গলাবাজির প্রতি আমার কোনো সহানভূতি নেই।[৩৫০]

জাতীয় পরিষদে এই সময়ে বিরোধী দলের নেতা ছিলেন নূরুল আমিন। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলের তখন কোনো শক্তি ছিল না, ভূমিকাও ছিল না। তবে দেশের অভ্যন্তরে সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, সরকার বক্তব্য পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিল। সংবাদপত্রে দেখা যায়, ৪ জুলই তারিখে খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে বলেন, সংবাদপত্রে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের ভুল বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। পরিষদে তিনি বলেন, আসলে বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞার কথা তিনি বলেননি। তিনি বলেন যে, জনৈক ভারতীয় উর্দু কবি সম্পর্কে এক অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের আদর্শ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-বিরোধী কোনো কিছু বেতারে অনুমোদন করা হবে না। তখন একজন সদস্য তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'একথা কি রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?' তিনি বলেন, উক্ত অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'হাঁ, যদি তাঁর কোনো গান পাকিস্তানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-বিরোধী হয় তা হলে তা বাজানো হবে না।'

গণআন্দোলনের মধ্যে এই রকম বক্তব্য দিয়ে সেদিন সরকারকে বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। ..এর জন্য তখন জাতীয় পরিষদের প্রোসিডিং পর্যন্ত বদলাতে হয়েছিল।

ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এতে যোগ দিয়েছিল ছায়ানট ও অন্যান্য সংগঠন। গড়ে উঠেছিল 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ'-চারদিন প্রতিবাদ অনুষ্ঠান হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে।[৩৫১]

আইন মারফৎ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বই, রেকর্ড (বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ) বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন ইংল্যান্ড, আমেরিকা ঘুরে বই বা রেকর্ড আসতে থাকে। এবার আইন মোক্ষমঃ যে-কোনো দেশ থেকেই হোক ভারতীয় বই ও রেকর্ড আমদানি নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক আইন-অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে এক ডজন রেকর্ড সঙ্গে আনা যেত। পাকিস্তান সরকার তা-ও ভঙ্গ করে। পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে ছাপা বইয়ের পূনর্মূদ্রণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা প্রয়োজ্য নয়। সেদিকে ব্যবসা অব্যাহত রইল। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গেই লিখিত। পাঠ্য বই ছাড়া ছাত্রদের কীভাবে চলবে, পাকিস্তান সরকার এতটুকু ভেবে দেখেনি। ফরে এর বিরুদ্ধে জাতীয়ভাবে বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। শামসুর রাহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আল মাহামুদ, হাসান হাফিজর রহমান এবং শহীদ কাদ্‌রীর উনিশ শ' পয়ষট্টি-উত্তর কবিতা পড়লে তার প্রভাব দেখা যায়।[৩৫২]

পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর সরকার ভারত থেকে পুস্তক আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয়। মোনেম সরকার এক অর্ডিন্যাসের দ্বারা পূর্ব বঙ্গে ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ করেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের সঙ্গে পূর্ব বাঙলার জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যাহত হয়। সরকারি এই রীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা এবং শিক্ষিত সমাজ অনেক আন্দোলন করেন। কিন্তু সরকার তা গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু এ সময় ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক-সাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগর মধুসূদন দীনবন্ধু বঙ্কিম রবন্দ্রিনাথের রচনাবলি পূর্ব বাঙলায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তাছাড়া আরও পশ্চিমবঙ্গীয় অত্যাধুনিক লেখকদের রচনারও বহু ফুটপাথ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ নিয়ে অনেক বিতর্ক সভা- সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং দোষ-গুণ সুফল-কুফল বিষয়ে মতামত ব্যক্ত হতে থাকে।[৩৫৩]

হঠাৎ রবীন্দ্রসংগীত রেডিও পাকিস্তান থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করে। তার প্রতিবাদে তুমুল ঝড় উঠে। শাসকগোষ্ঠী শেষে পিছু হটতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্র-বিরোধিতায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন হেয় হয় যে, পাকিস্তানি দূতাবাসগুলো পর্যন্ত সরকারকে অমন কাজ থেকে নিরস্ত হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানায়।[৩৫৪]

শামসুর রাহমান রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন,

রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জগত থেকে নির্বাসিত করার সাম্প্রদায়িক, কূপমণ্ডুক চেতনা-তাড়িত ব্যক্তিদেও অপচেষ্টা আখেরে বিফল হয়েছে। তাদের এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী এ দেশের সুস্থ, শুভবাদী, প্রগতিশীল, সংগ্রামী কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ। এই চেতনাই আমাদের স্বাধীনতার সূর্যোদয় দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে।...আমাদেও জাতীয় সঙ্গীতই হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথেরই একটি অনিন্দ্য সুন্দও গান–'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'[৩৫৫]

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গভর্নর মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক বাদ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হিন্দু দেবদেবীদের কথা বলা হয়েছে, হিন্দু সমাজের চিত্র পরিবেশিত হয়েছে, এই জাতীয় হাস্যকর কুযুক্তির অবতারণা করে তারা বহু শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্যকর্মের অবমূল্যায়নে ব্রতী হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি পাঠক্রমে গ্রিক দেবদেবীদের নানা কিচ্ছাকাহিনি ও পৌত্তলিক পরিবেশের বহু গল্প-নাটক-ইতিহাসের মধ্যে কিন্তু তারা আপত্তির কিছু দেখলেন না। অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপত্তি তোলা হলো। বলা হলো, রবীন্দ্রনাথকে খুব বড়ো করে দেখা ঠিক হবে না। বস্তুতপক্ষে তিনি আমাদের কবি নন। প্রয়োজনবোধে তাঁকে বর্জন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হলো নজরুলকে, যে নজরুলকে বাঙালি মুসলমানদের একটা ধর্মান্ধ অংশ একদা কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিল। মানবতাবাদী, চিরবিদ্রোহী, জাত-অসাম্প্রদায়িক, সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বাঙালির সুস্থ জীবনবাদী সমন্বিত সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক নজরুলকে তুলে ধরা হলো অবিশ্বাস্য খণ্ডিতরূপে, শুধু মুসলমানের কবি বলে। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু বাঙালি সংস্কৃতিসেবীও সেদিন হয় ভ্রান্তি, অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, কিংবা নেহাতই সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থবুদ্ধির কারণে উক্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। সেদিন সাংস্কৃতিক সামপ্রদায়িকতার বিষাক্ত হাওয়ায় সম্বিত হারিয়ে তারা নজরুলের কবিতা ও গানের সর্বজন পরিচিত পঙ্‌ক্তিমালা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে এগিয়ে আসেন। এইসব ঘৃণ্য উদ্যোগের ফলে কবির বিখ্যাত গান 'চল চল চল'-এর 'নর জীবনের গাহিয়া গান/সজীব করিব মহাশ্মশান' হলো 'নব জীবনের গাহিয়া গান/সজীব করিব গোরস্থান।' তাঁর অনবদ্য শিশুতোষ কবিতা 'প্রভাতী'র 'জয়গানে ভগবানে তুষি বর মাগো রে' হলো 'জয়গানে রহমানে তুষি বর মাগো রে।' সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার মোহে অন্ধ হয়ে কিছু কিছু বাঙালি মুসলমান এই পথেই তাঁদের একটা স্বতন্ত্র জাতীয়তা আবিষ্কারের চেষ্টা করলেন। এ সব প্রয়াস ছিল নির্বোধ, যুক্তিহীন ও হঠকারী।[৩৫৬]

প্রগতিশীল বাঙালি সংস্কৃতিকর্মীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এরই ফলে বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে আরবি বা রোমান হরফ চালু হয় নি, বাতিল হওয়ার পরিবর্তে স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসনামলেই সারা বাংলাদেশে পরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পায়, এবং সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, জীবনধর্মী, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লাভ করে।[৩৫৭]

সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

রোমান হরফ প্রবর্তন ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ

একটি জনগোষ্ঠীর একেবারেই অপরিবর্তনীয় ও অহস্তান্তরযোগ্য যে স্বাতন্ত্র্য সেটি তার মাতৃভাষা।[৩৫৮] একটি মাত্র ভাষা সৃষ্টি করে দেশের সংহতি মজবুত করার জন্য সামরিক সরকার প্রথম থেকে চেষ্টা চালায়।[৩৫৯] পাকিস্তানি শাসনের এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খুবই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। বাংলা ও উর্দুর মিশ্রণে তিনি একটা নতুন পাকিস্তানি ভাষা উদ্ভব করার চেষ্টার কথা বলেছিলেন।[৩৬০] পরিকল্পনা ছিল বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে একটি ভাষা তৈরি করা ও সংশোধিত রোমান হরফে লেখা। একটি মাত্র ভাষা সৃষ্টি করে দেশের সংহতি মজবুত করার জন্য সামরিক সরকার প্রথম থেকে চেষ্টা চালায়।[৩৬১] এটি একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত। রবার্ট ফ্রস্ট কবিতা অনুবাদ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেন যা এ প্রসঙ্গে তুলনা যোগ্য। তিনি বলেন, 'অনুবাদে যা হারিয়ে যা তা অন্য কিছু নয়, কবিতা নিজেই'।[৩৬২] এ উপলব্ধি অত্যন্ত যথার্থ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেখানে অনুবাদ করলে একটি কবিতার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব নয়, সেখানে ভাষার উপর নিয়ন্ত্রণ

কোনো ভাবেই ভাষার স্বাভাবিকতা বজায় থাকে না।[৩৬৩] ১৯৬৮ সালের আগস্টে ৪১ জন সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সাংবাদিক বিবৃতির মাধ্যমে সরকার ও দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা এটি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'বাংলা হরফের রদবদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করবে।'[৩৬৪] পাকিস্তানি শাসনামলে সময় সুস্পষ্ট অসাধু উদ্দেশ্য থেকে বাংলা বর্ণমালা, বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতি উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে ও সেই সূত্রে সাহিত্যকে দুর্বল ও বিকৃত করে, বাঙালি সংস্কৃতিকে পঙ্গু ও খণ্ডিত করে, এবং ঐ পথ ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সমূলে উৎপাটিত করার একটা সার্বিক অপপ্রয়াস চালানো হয়। মন্ত্রীসভার বৈঠকে, সাংবাদিক সম্মেলনে, সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনায় আইয়ুব খান সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেন।[৩৬৫] সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়েছিল যে, দেশবাসীর পারস্পারিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমগ্র দেশের লোক বুঝতে পারে সে-ধরনের একটি ভাষার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিকাশসাধনই সরকারের লক্ষ্য।[৩৬৬] আইয়ুব খান তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন :

> এটা আমার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার যে দুটি জাতীয় ভাষা নিয়ে আমরা এক-জাতি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব না; আমরা বহু-জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে থেকে যাব। আমি এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিচ্ছিনান, আমি একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরছি যা স্বীকার করতেই হবে। ... এটাও সমানভাবে সত্য যে যদি জনগণ-তা পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই থাকুক না কেন-নিজেদের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে চায় তবে তাদের অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়যোগ্য একটি মাধ্যম থাকতে হবে। এ ধরনের মাধ্যম উদ্ভব করতে হলে আমাদিগকে বাংলা ও উর্দুর সাধারণ উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলিকে একটি সাধারণ লিপির মাধ্যমে বিকশিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।[৩৬৭]

প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য 'শিক্ষা কমিশন' ও বাংলা একাডেমি চেষ্টা চালায়। কমিশনের প্রস্তাব ছিল দুটি–প্রথমত, যে-সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নশ্‌ক বা রোমান হরফের উদ্ভাবন ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের আর্থিক আনুকূল্য করা; দ্বিতীয়ত, মুদ্রণযোগ্য আদর্শ উর্দু বর্ণমালা নির্ণয় করা, বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করা এবং বাংলা ও উর্দুর উপযোগী রোমান হরফের উদ্ভাবনের জন্য ভাষাবিদদের পরামর্শ দেওয়া। কমিশন বলে যে, এই সমস্ত প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে 'সিদ্ধান্ত' নেওয়ার সময় আসবে।[৩৬৮]

অপরদিকে বাংলা একাডেমির প্রস্তাব ছিল পূর্ববাংলার স্কুলে উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুলে বাংলা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং উর্দু ও বাংলার সাধারণ শব্দগুলো খুঁজে বের করে জনপ্রিয় করা।[৩৬৯] তৃতীয় সূত্রটির ব্যাখ্যা তৎকালীন পরিচলক সৈদয় আলী আহসান এভাবে করেছেন যে, বাংলা ভাষার আরবী, ফারসী, উর্দু ও তুর্কী শব্দের একটি অভিধান ও উর্দুভাষার সংস্কৃত, পালি ও বাংলা শব্দের একটি অভিধান তৈরি করলে দুই রাষ্ট্রভাষার ব্যবধান ক্রমশ হ্রাস পাবে।[৩৭০] পাঠ্য পুস্তকে প্রচুর আরবী-ফার্সী ঢোকাতে রাষ্ট্রযন্ত্র শিক্ষাবিভাগের কর্তাদের হুকুম দেয়। শিক্ষাবিভাগের কর্তারা তাদের হুকুম পালনে তৎপর হয়। এমনকি বানান পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হয়। নামাজ বর্গীয়-জ না অন্তস্থ-য হবে তা একদম বিধিবদ্ধ। পরীক্ষার্থীরা নিরুপায় হয়ে পরীক্ষা পাশের জন্য মুখস্ত করতে বাধ্য হয়। কাজী নজরুলের নাম পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকে অন্তস্থ-য দিয়ে লেখা হতে লাগল। কারণ, বাংলাকে যতদূর সম্ভব আরবী-ফার্সী উচ্চারণেল কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে।[৩৭১]

বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য বাংলা একাডেমি একটি কমিটি স্থাপন করে। সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন কমিটির সভাপতি। কমিটি বর্ণমালা থেকে ঙ, ণ, ঋ, ঌ, ৎ, ঞ, ঃ, ষ, ঈ, ী, ঊ, ৄ, বর্জন করা সহ অনেক সুদূরপ্রসারী সুপারিশ করে।[৩৭২]

এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ উত্থিত হয়। শিক্ষা কমিশনকে রোমান হরফ সম্পর্কে মতামত দেওয়ার নির্দেশের প্রেক্ষাপটে *দৈনিক ইত্তেফাক* ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ সালে 'হরফ পরিবর্তন প্রসঙ্গে' শীর্ষক পর-পর দুদিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রতিবাদ করে। মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায়ও প্রতিবাদ জানায়।[৩৭৩]

১৯৫৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংসদের সম্মিলিত উদ্‌যোগে আয়োজিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রোমান হরফের প্রস্তাবটি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল বাংলা বিভাগে আয়োজিত আরও একটি সভায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও অধ্যাপক আবদুল হাই ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিরোধিতা করেন। ৬০ সালের শহিদ দিবসে ও

১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের অন্যতম বক্তব্য ছিল রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে।[৩৭৪] অর্থাৎ যে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সক্রিয় ছিল তারা প্রথম থেকেই এসব উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেছে।[৩৭৫]
বাংলা সাধারণ মানুষের ভাষা। এ অঞ্চলের অভিজাতরা সংস্কৃত, ফার্সি, ইংরেজি, উর্দু ব্যবহার করেছে, জনগণ ব্যবহার করেছে বাংলা। বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। কিন্তু সংস্কৃত পন্ডিতরা বলেছেন, 'বাংলা হচ্ছে সংস্কৃতের কথ্য রূপ মাত্র।'। কিন্তু দেশপ্রেমিক বাঙালি লেখকেরা কিন্তু তা মানেন নি। তাঁরা বাংলা ভাষাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবেই দেখেছেন।[৩৭৬] বাংলা ভাষা সম্পর্কে ১৯০১ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'বাঙ্গলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, ইহা যে পালি, মাগধী, অর্ধ মাগধী, সংস্কৃত, পার্সি, ইংরেজি প্রভৃতি নানান ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে গ্রন্থকারগণ সেকথা একবারও ভাবেন না।'[৩৭৭] তিনি আরও বলেন, 'বাংলা জনপদে নেমে গেছে, তা এখন জনগণের ভাষা...'।[৩৭৮] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বাঙ্গলা ভাষা' প্রবন্ধে বাংলাকে সংস্কৃত করে তোলার পাশাপাশি আরেক ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রাষ্ট্র ও বাংলাভাষা' প্রবন্ধে বলেন, 'বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব তাহাই বাঙ্গালা–এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরেজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয় দিলে, তাহাকেও কি বাঙলা বলিব? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙ্গলা।'[৩৭৯] ১৯৭৪-এর পরে স্বাধীন পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ বাংলা ভাষাকে একটি চরমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। প্রচুর পরিমাণ আরবি-ফার্সি শব্দ মিশিয়েছেন তাঁরা। এর কারণ একাধিক হতে পারে। এক, সংস্কৃতকরণের প্রতিশোধ গ্রহণ। পণ্ডিতেরা আরবি-ফার্সি শব্দ উৎখাত করেছেন, আমরা সে-সব শব্দ বহুগুণে পূনঃস্থাপিত করে প্রতিশোধ নেবো-এই মনোভাব ছিল হয়তো। পাকিস্তানি শাসকদের অনুগ্রহভাবন হবার আশা থাকাও অসম্ভব বলি না।'[৩৮০] রাজনীতিবিদ আতউর রহমান খান তাঁর 'স্বৈরাচারের দশ বছর' বইতে পরিহাস করে স্মরণ করেছেন সাতচল্লিশের পরে রেডিও পাকিস্তান থেকে কি ধরনের বাংলা সংবাদ প্রচার করা হতো। যেমন, 'পিছলে এতোয়ার খান গাফফার খাঁর লেড়কা গ্রেফতার হয়েছেন। হুকুমতে হায়দারাবাদ হুকমতে হিন্দুস্থানের জং ও জেহাদের ইরাদা জাহির করেছেন।' সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রাষ্ট্র ও বাংলাভাষা'[৩৮১] অনেকেটা সেই পুথির ভাষা বটে। এটা এক ধরনের মিশেলের সংস্কৃতি।
ভাষা আন্দোলন অনেক কিছু সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি একটি চেতনার–সেটি হচ্ছে স্বাধীনতার চেতনা। আন্দোলনের অন্তরে রয়েছে আবেগ, যে আবেগ দেশপ্রেমের। আবেগ ছাড়া বড়ো সৃষ্টি নেই, ভাষার জন্য উদ্দীপ্ত আবেগ তাই আমাদের বড়ো ভরসা।[৩৮২]

উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ (১৯৬৮)

কবি ইন্দু সাহা ও কথাসাহিত্যকার জহিরুল ইসলাম অসন্তুষ্ট হয়ে 'ক্রান্তি' ত্যাগ করেন। এছাড়াও আরও কিছু সক্রিয় কর্মী উপদলী ক্রোদলে 'ক্রান্তি' ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ অবস্থায় কেবল কবি, লেকখ ও কর্মীদের নিয়ে আবদুস সামাদ খান মুকুল, জহিরুল ইসলাম ও আরও কয়েকজন মিলে আলাদা একটি সংগঠন করার চিন্তা করেন। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কবি ইন্দু সাহার বাসায় ২৮-৩০ জনের এক কর্মীয় সভায় গঠিত হয় 'উন্মেষ সাহিত্য সংসদ।[৩৮৩] সভাপতি করা হয় জহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কবি ইন্দু সাহা ও প্রচার সম্পাদক মহসিন শস্ত্রপাণিকে। নির্বাহী কমিটিতে আরও ছিলেন–আবদুস সামাদ খান মুকুল, আজিজ মেহের টিঙ্কু, কবি গগন তানু, জানে আলম প্রমুখ।[৩৮৪] প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর সংগঠনের নামের সাথে 'সংস্কৃতি' শব্দটি যোগ করে নাম করা হয় উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ।
এ সংগঠনের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য সভা করা। প্রতি শনিবার ও পরে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নিয়মিত সাহিত্য সভা হতো। এ সভা ছিল প্রকৃতপক্ষে সদস্যদের অনুশীলন সভা। পঠিত রচনা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা থেকে কবি ও লেখকরা নিজেরা শিখতেন ও অন্যকে শিখতে সাহায্য করতে। এভাবে নিজেদের সৃষ্টিশীলতা মতাদর্শের আলোয় উদ্ভাসিত করার চেষ্টা চালাতো সংগঠন।[৩৮৫]

প্রতিষ্ঠা বর্ষেই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে 'ক্রান্তি', 'আলোর পথযাত্রী' নাটকসহ অংশগ্রহণ করে। নাটকে কামাল লোহানী, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, রেখা আহম্মেদ ও অন্যরা অভিনয় করেছিলেন।

২৪ এপ্রিল ১৯৬৮ 'উন্মেষ' রাজশাহী কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ড স্মরণে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ ফটক থেকে সদরঘাট মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। চলার পথে দশ পয়সা মূল্যের চার পৃষ্ঠার একটা প্রচারপত্র বিক্রি করে উৎসুক পথচারীদের মাঝে এবং রথখোলার মোড়ে পথসভায় সম্পাদক ইন্দু সাহা বক্তৃতা করেন। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনকালে এই বিক্ষোভ মিছিলটি ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সংগঠিত হওয়ার সময় থেকেই 'উন্মেষ' তরুণ কবি- লেখকদের অনুশীলনের কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। তবে আন্দোলনমুখিতা ছিল এই সংগঠনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। সমমনা বা কাছাকাছি চিন্তার সংগঠন বা গোষ্ঠীর সাথে মিলিতভাবে আন্দোলনে বেশি জোর দিয়ে এসেছে সবসময়। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' ও 'মে দিবস' উপলক্ষ করে অনেকগুলো সংকল প্রকাশ করে 'উন্মেষ'। শুধু তাই নয়, ১৯৭০-৭১ এই দু-বছর কয়েকটি নাটক-নাটিকা তারা মঞ্চায়ন করেছে। আটষট্টি-উনসত্তরের গণআন্দোলনের একদিনের হরতালের ঘটনা নিয়ে ১৯৭০ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রথম নাটিকা–'মহাবিপ্লবের পদধ্বনি' মঞ্চায়ন করা হয় পল্টন ময়দানের খোলা মঞ্চে। নাটকটির রচিয়তা ছিলেন–মহসিন শস্ত্রপাণি এবং নির্দেশনা দেন–আমির খসরু।

একই বছর বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাহাদুর শাহ পার্কে শহিদ বেদীতে দিতীয় নাটক ' ভোরের অভিযাত্রীরা চলছে' মঞ্চস্ত করে। এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপক নাটকটি রচনা ও নির্দেশনা দেন যোসেফ শতাব্দী।

১৯৭০ সালের নভেম্বরে উপকূলে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝর ও জলোচ্ছ্বাস 'গোর্কী'র ধ্বংসযজ্ঞের পটভূমিতে রচিত তৃতীয় নাটকা–'শবের মিছিলে জীবনের জয়গান' মঞ্চায়ন করা হয়। নাটকটির রচিয়তা ছিলেন–মহসিন শস্ত্রপাণি এবং নির্দেশনা দেন–আমির খসরু। এবং ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পল্টন ময়দানে সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে জহিরুল ইসলামের একটি পোস্টার প্রদর্শিত হয়। পোস্টারে লেখা ছিল 'টিক্কা খানকে ব্যাঙ চ্যাপ্টা করা হবে'। এছাড়া দুটি নাটিকা ও একটি নাটক পরপর মঞ্চায়ন করা হয়।[৩৮৬] এছাড়া ঢাকা শহরের আরও কয়েকটি স্থানে এবং ঢাকার বাইরে বিক্রমপুরের এক গ্রামে, মানিকগঞ্জ শহরে, ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ ময়দানে, সন্তোষে ও অন্যান্য স্থানে নাটক মঞ্চায়ন করেছে 'উন্মেষ'। এসব নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে প্রতিবারই থাকতো আলোচনা, কবিতা ও ছড়া পাঠ এবং শিল্পী সায়েদুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিবেশিত হতো গণসংগীত।

আটষট্টি-উনসত্তরের গণআন্দোলনে সংগঠনের কর্মীরা সবসময় সংগ্রামী জনগণের মধ্যেই ছিল। সংগঠনের প্রথম সভাপতি জহিরুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী হামলা চালালে চুনকুটিয়া গ্রাম থেকে নিখোঁজ হন।

উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী (১৯৬৮)

১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর 'উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সত্যেন সেন-এর অভিযাত্রা–সাংস্কৃতিক সংগ্রামের বৃহত্তম বিশ্ববোধ তৈরি করেছে। তিনি এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য মেহনতী মানুষকে গানের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা।[৩৮৭] এবং সংস্কৃতিকে মানুষের মুক্তিসংগ্রামের ধারার সাথে যুক্ত করা। সারা বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে চলা সংগ্রামের যে ইতিহাস; সে ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী।[৩৮৮] সত্যেন সেন ১৯৫৬ সালে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত 'কৃষক সম্মেলন' একটি সাহিত্য-শিল্পের গণসংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং সে বছরই 'সৃজনী সাহিত্য-শিল্প সংস্থা' গঠন করেন। সংগঠনটি গান ও নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি বদলের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।[৩৮৯] এই সংস্থাটি স্ব-নামে বেশিদিন টিকতে না পারলেও এর গণসংগীত কর্মসূচি যথাযথই চলতে থাকে। সত্যেন সেন জেলে গেলেও সংগঠনটির গণসংগীত চর্চা ও অন্যান্য তৎপরতা চালিয়ে যান–গোলাম মোহাম্মদ ইদু এবং সাইদুর রহমান প্রমুখ। তাঁরা এক দশককালব্যাপী মুক্তির গান এবং

আবৃত্তির অনুষ্ঠান নিয়ে রাজনৈতিক সভা এবং কৃষক-শ্রমিক সমাবেশের উদ্বোধনী পর্বে অংশ নিয়েছে। যখন পাকিস্তানি শাসন শোষণের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছিল বাংলার আপামর জনসাধারণ। একটি কালজয়ী গণঅভ্যুত্থানের আভাস দেখা যাচ্ছে। তখনই বঙ্গদেশের গণসংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ সত্যেন সেনের নেতৃত্বে সৃজনী সংগীত দলটিকে ১৯৬৮ সালে 'উদীচী' নামে নতুনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩৯০] উদীচীর প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন কামরুল আহসান খান এবং পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হলে সত্যেন সেন সভাপতি, গোলাম মোহাম্মদ ইদু সহ-সভাপতি, মোস্তফা ওয়াহিদ খান সাধারণ সম্পাদক ও ইকরাম আহমেদ সহ-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠাকালে উদীচীর সাথে যুক্ত ছিলেন–আবুল ফজল, রণেশ দাশগুপ্ত, বেগম সুফিয়া কামাল, শহীদুল্লাহ কায়সার, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, সন্‌জীদা খাতুন, আনিসুজ্জামান, শেখ লুতফর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, জাহেদুর রহিম, অজিদ রায়, জিতেন ঘোষ, অীনমা সিংহ, আব্দুল লতিফ, জ্ঞান চক্রবর্তী, পান্না কায়সার, হাসান ইমাম, সুখেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পীরা। এসব শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা অভিন্ন হৃদয় হয়ে এগিয়ে আসেন উদীচীর মাধ্যমে এক গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে। 'কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সংগঠনের সদস্যরা গণসংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে স্বগৌরবে এগিয়ে চলেন'। নবসংস্কৃতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এসব তরুণ দেশব্যাপী গণসংগীত ছড়িয়ে দেয়। কৃষকদের সচেতন ও সংগঠিত করতে এ দলের কার্যকর ভূমিকা ছিল। শুধু খালি গলায় গান গেয়ে এই সংগীত দলের যাত্রা শুরু।[৩৯১] প্রথম মহড়ায় সত্যেন সেনের লেখা গণসংগীতের অনুশীলন হয়। গানটি ছিল এ রকম–

> ওরে ও বঞ্চিত সর্বহারা দল
> শোষণের দিন হয়ে এল ক্ষীণ
> নবযুগ আসে চঞ্চল।
> খেটে খেটে মরলি খালি
> অভাবেই দিন কাটালি
> দিনে দিন সব খোয়াইলি
> এমনি কপাল পোড়া
> এবং
> চাষি দে তোর লাল সেলাম
> তোর লাল নিশানারে।[৩৯২]

উদীচী শুরু থেকে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অর্জন করতে চেয়েছে। আসলে 'উদীচী' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে সংগঠনটির গভীর কর্মতৎপরতার দিকনির্দেশনা। শব্দটির অর্থ 'উত্তর দিক'। আকাশের উত্তর দিকে ধ্রুবতারার অবস্থান। পথ হারা নাবিক ধ্রুবতারা দেশে তার গন্তব্য ঠিক করে। শুরু থেকে উদীচী ধ্রুবতারার মতো মুক্তিকামী বাঙালির গণতান্ত্রিক দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে।[৩৯৩] সত্যেন সেন ছিলেন আপাদমস্তক মার্কসবাদী। তিনি বলেন, 'সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষের অগ্রগমনের জন্য যা প্রয়োজন আমার সাধ্যমতো তা আমি করার চেষ্টা করব।'[৩৯৪] সরদার ফজলুল করিম সত্যেন সেনের সাংস্কৃতিক দর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে,

> সত্যেন সেন তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে জীবনকে তথা তার সংগ্রামী মানুষকে জানতে চেষ্টা করেছেন।..'জীবনে জীবন যোগ করা' এমন মূর্ত প্রকাশ আমাদের দেশ ও সাহিত্যের ইতিহাসে একেবারেই বিরল।...সত্যেন সেন বাংলাদেশের গোর্কী। মানুষ জীবনের একজন মহৎ কর্মীও এবং শিল্পী।[৩৯৫]

পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক কর্মদের ওপর জেল ও জুলুম নেমে আসে। সত্যেন সেন পাকিস্তান আমলে বার বার গ্রেফতার হন।[৩৯৬] শুরু থেকেই উদীচীর কর্মতৎপরতা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তখন পাকিস্তানি শোষণ-শাসন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।[৩৯৭] পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শোষণ শাসন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংস্কৃতির শক্তি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন উদীচীর সংস্কৃতিকর্মীরা। গণ-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ধারায় একত্রীভূত হয়ে উদীচী গাইতে শুরু করে সংগ্রামের গান। উদীচী জন্মলগ্ন থেকেই মঞ্চনাটক করে আসে। ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজ মঞ্চে 'আলো আসছে'

নাটক মঞ্চায়ন করে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে উদীচীর সংস্কৃতিকর্মীরা চলমান সাংস্কৃতিক সংগ্রামে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন গণসংগীত ও পথনাটক নিয়ে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে উদীচী ঢাকা নগর ও শ্রমিক অঞ্চলে 'শপথ নিলাম' নামে পথনাটক পরিবেশন করে। নাটক শেষে উপস্থিত জনতা মুহুর্মুহু করতালির পাশাপাশি 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকে নায়কের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে। পথনাটকটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৩৯৮] এ সময় উদীচী রাজপথে সংগীতে সংগীতে উজ্জীবিত করেছে জনতাকে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় উদীচী রাজপথে মিছিল, লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস, বুলেট-বেয়নেট উপেক্ষা করে নিজেদের সংগ্রাম চালিয়ে যায়।[৩৯৯] ৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে উদীচী আখতার হুসেন রচিত ও নির্দেশনায় 'সামনে লড়াই' নামে নাটক পরিবেশন করে। নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।[৪০০] আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি দূর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে উদীচী। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ওঠানো অর্থ নিয়ে উদীচী ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের প্রবল ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাগুলোর লক্ষ লক্ষ সহায় সম্বলহীন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় উদীচী।[৪০১] ১৯৭১ সালে বাঙালির সার্বিক মুক্তির চেতনাকে ধারণ করে উদীচী গড়ে তোলে এক সাংস্কৃতিক সংগ্রাম।[৪০২] ৭১-এর জানুয়ারি মাসে উদীচীর পূর্ব নির্ধারিত জাতীয় সম্মেলনে অন্যান্য সম্মেলনে অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করার পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম নিয়ে নাটক 'জীবনতরঙ্গ' পরিবেশন করে।[৪০৩] যা মানুষকে স্মরণ করে দেয় পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের সময় জনগণের পাশে দাঁড়ায় নি।

৭১-এর ২১ ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে উদীচীর ট্রাকস্কোয়াড বের হয়। যার ব্যাকগ্রাউণ্ডে আঁকা থাকে সূর্যের মাঝখানে শৃঙ্খলিত হাত। সূর্যটি যেন কাঁটা তারের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসছে। পাশে শহিদ মিনার। স্লোগান লেখা–'একুশের শোককে শক্তিতে পরিণত করুন'। এ সময় 'একুশের গান' নামে উদীচী একটি গানের সংকলন বের করে। এর মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলমুক্তির লড়াইয়ে উদীচী তার উপস্থিতি একে একে জানান দিতে থাকে।[৪০৪] ক্রমান্বয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ঘনীভূত হতে থাকে।

১১ মার্চ ১৯৭১ দৈনিক সংবাদে বলা হয় 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'উদীচী' বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সহিত আগাইয়া যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। উদীচীর সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয় সৈনিকসুলভ দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা লইয়া বাংলার এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আমরা শরিক থাকিব।' [৪০৫]

এভাবে গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নাটকের মাধ্যমে, গণসংগীতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রেরণা বা প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছে, সাহস যুগিয়েছে উদীচী।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য সম্মেলন

বাংলা একাডেমি উন্নয়ন দশক পালন ও 'আমাদের সাহিত্য'

১৯৬৫ সালে ৬ সেপ্টেম্বর আইয়ুব খান ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা করলে শিল্পী সাহিত্যিকেরা দেশাত্মবোধক সাহিত্য-সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করলে পাকিস্তানের সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৪০৬] ইসরাইল খানের মতে, 'পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ বিরোধী স্বায়ত্তশাসনের রাজনৈতিক আন্দোলনে সমকালে পাক-ভারত যুদ্ধ ভারতবিরোধী জেহাদী মনোভাব জাগ্রত করিয়ে বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে বিপরীত ফল ফলাতে সক্ষম হয়েছিল।'[৪০৭]

এই সময় পাকিস্তান লেখক সংঘ বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের জন্য (১৯৬৭ সালে) ৬ সেপ্টেম্বর পুরস্কার প্রবর্তন করলে পুরস্কার প্রাপ্তির লক্ষ্যে লেখকরা পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষায় সহায়তাকারী গ্রন্থ প্রণয়নের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এই পুরস্কার প্রথম লাভ করেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান[৪০৮], তাঁর 'সীমান্ত শিবির' কাব্যগ্রন্থের জন্য। এরপর অনেকেই পুরস্কৃত হন যাঁরা এখন প্রগতিশীল বৃদ্ধিজীবী বলে খ্যাতিমান হয়েছেন।

বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে 'উন্নয়ন দশক' (১৯৬৮) পালনের সময়ে অনেক সেমিনার আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন আইয়ুব খান করেছিলেন। এসব সেমিনার আলোচনা অনুষ্ঠানে তখন সরকারি টাকার ছড়াছড়ি হয়। ঢাকার বাংলা একাডেমি ১৯৬৮ সালের অক্টোবর (১৮-২৪) মাসে 'আমাদের সাহিত্য' পর্যায়ে একটি ব্যাপক সেমিনারের আয়োজন করে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য এবং সাময়িকপত্র এই সাতটি বিষয়ের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[৪০৯] বাংলা একাডেমির সাহিত্য সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণ দেন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠার এর সভাপতি ছিলেন বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ। 'পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি সৈয়দ আলী আহসান। আলোচনা করেন ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও ড. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। সেদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন ডক্টর মযহারুল ইসলাম।[৪১০]

'বিশ বছরের বাঙলা নাটক' পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন ওবায়েদ উল হক। আলোচনায় অংশ নেন : আসকার ইবনে শাইখ, আনিস চৌধুরী, সাবেরা মুস্তাফা এবং জিয়া হায়দার, সভাপতি মুনীর চৌধুরী। 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; আলোচক : ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম; সভাপতি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। 'পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আতোয়ার রহমান। আলোচক : সৈয়দ শাহাদাৎ হোসেন, সরদার জয়েনউদ্দীন ও শামসুল হক; সভাপতি : আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ছোটোপল্প বিভাগে 'আমাদের গল্প সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। আলোচনায় অংশ নেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শহীদ আখন্দ, হাসনাত আবদুল হাই এবং সভাপতি : শাহেদ আলী।[৪১১]

'পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। আলোচনা করেন ড. রফিকুল ইসলাম ও কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ; সভাপতি : মুজীবুর রহমান খাঁ। 'শিশু সাহিত্য' বিভাগে 'আমাদের শিশু সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই); আলোচক : মোহাম্মদ নাসির আলী, ডক্টর আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন; হাবিবুর রহমান, এম এ আজম, হোসনে আরা কামাল এবং সভাপতি মোহাম্মদ মোদাব্বের।[৪১২]

'উন্নয়নের দশক' পালনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটো : বিরামহীন বর্ণাঢ্য প্রচারণার দ্বারা আইয়ুব খানের এক মহিমাময় ব্যক্তিত্ব দেশবাসীর সামনে গড়ে তোলা এবং এর দ্বারা ১৯৬৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন ও ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে প্রভাবিত করা। প্রচারণা চলে নানাভাবে–সরকারি কাগজপত্র, লেফাফা, স্ট্যাম্প, টেলিগ্রাম, মানি অর্ডার ফরম ইত্যাদির উপর উন্নয়ন দশকের ছাপ দেওয়া হয়। রেডিও টেলিভিশন থেকে কথিকা প্রচার করা হয়। সরকারিভাবে লক্ষ লক্ষ প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এর মূল বক্তব্য ছিল : '১৯৫৮-৬৮ মধ্যবর্তী সময়ে (পাকিস্তানের) ...অর্থনীতিতে বিরাট উন্নতি হয়েছে, পররাষ্ট্র নীতিতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য, দেশের পশ্চাৎপদ সমাজ কাঠামো পড়েছে ভেঙে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের ইজ্জত বেড়েছে বহুগুণ এবং এর সবই সম্ভব হয়েছে সৈনিক রাজনীতিবিদ আইউব খানের গতিশীল নেতৃত্বে ও মহিমাময় ব্যক্তিত্বে-ফলকথা ইকবাল যার স্বপ্ন দেখেছিলেন, জিন্নাহ যার ভিত গেঁথেছিলেন, পাকিস্তানের সার্থক স্থপতি হলেন ফিল্ড মার্শল মোহাম্মদ আইউব খান।'[৪১৩]

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় (১৯৬৮)

১৯৬৮ সালে ঢাকায় 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' প্রতিষ্ঠিত হয়। নাটক মঞ্চায়নের পূর্বে এই সংগঠনটি বেতার ও টেলিভিশনে নাটক প্রযোজনা করতো। নিয়মিত নাট্যচর্চা ও নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নাটকের মান উন্নয়ন করা ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৬৯ সালের রাজনীতির উত্তাল দিনে সংগঠনটি ছিল যথেষ্ট সক্রিয়। লক্ষ ছিল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের এক চরম পর্বে ঢাকার সৌখিন নাট্যচর্চাকে প্রতিশ্রুতিশীল নাট্য আন্দোলনে রূপায়িত করা। অর্থাৎ নাট্যচর্চাকেকে নিছক সখের বিষয় বা বিনোদনের বিষয় থেকে বাহির করে মননশীল ও সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যেও দায়বদ্ধতার জায়গায় দাঁড় করাবার চেষ্টা করে এ সংগঠনটি। 'দল হিসেবে নাগরিক মনে করে যে, একটি ভালো নাটক দেশ-কালের সীমারেখার উর্ধ্বে এবং তার উত্তরাধিকার বিশ্বমানব হিসেবে সকলেই দাবি করতে পারে। নাগরিকের এরূপ

বৈশ্বিক ভাবনা তাদের নাট্য প্রযোজনায় প্রভাব ফেলেছে'।[৪১৪] এ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন জিয়া হায়দার, আতাউর রহমান, আলী যাকের, আবুল হায়াত, সারা যাকের (আমিন), আসাদুজ্জামান নূর, খালেদ খান প্রমুখ। এর নাট্য পরিবেশনার মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা, সুষ্ঠু শিল্পবোধ ও নান্দনিকতা ছিল লক্ষ্যণীয়। মুক্তিযুদ্ধের পর্বের এই সংগঠনের নাট্যকর্মীরা নানাভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন।[৪১৫]

মহাকবি স্মরণ উৎসব (১৯৬৮)

১৯৬৮ সালে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল লেখক সম্প্রদায় সরকার নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ধারায় 'পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা' নামে নতুন উদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম প্রথমদিকে খুব বেশি ছিল না। *পরিক্রম* নামে একটি মাসিক মুখপত্র প্রকাশের মধ্যে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। এই সংগঠনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল কাজ হলো পাঁচদিনব্যাপী মহকবি স্মরণ উৎসব আয়োজন। ১৯৬৮ সালের ৫-৯ জুলাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মির্জা গালিব, আল্লামা ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের সামগ্রিক পরিকল্পনাটি ছিল লেখক সংঘের তৎকালীন সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমানের। অনুষ্ঠানটি এত প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয় যে, ইস্টিটিউট হল শ্রোতার ভিড়ে উপচে পড়ে।[৪১৬]

৫ জুলাই (১৯৬৮) প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আবুল হাশিম (তৎকালীন ইসলামিক একাডেমির পরিচালক)। এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। তিনি তাঁর লেখায় সুদীর্ঘ সাহিত্য চর্চায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বৈচিত্র্য আলোচনা করে তাঁকে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নির্মতা' রূপে আখ্যায়িত করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি আবুল হাশিম তাঁর বক্তব্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যবান আলোকপাত করেন।[৪১৭]

সর্বোপরি তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ মত ও পথের উর্ধ্বে'। পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সারা জীবন তিনি 'কন্সিস্ট্যান্ট' ছিলেন। তা হলো স্বাধীন চিন্তা।[৪১৮] পূর্ব বাংলায় বিগত সময়ে যাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেন তাঁদের স্বরূপ উন্মোচন করে আবুল হাশিম স্পষ্টভাবে আরও বলেন,

> যাহারা ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন, তাহারা শুধুই মূর্খ নহেন, দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিতও। তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ, না বোঝেন ইসলাম। তাঁহারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া রবীন্দ্র-বিরোধিতায় মাতিয় উঠিয়াছেন।[৪১৯]

৬ জুলাই ১৯৬৮, দ্বিতীয়দিন ছিল কবি ইকবালের স্মরণে অনুষ্ঠান। এতে সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন যথাক্রমে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও মনিরুদ্দীন ইউসুফ। সভাপতি ড. এনামুল হক তাঁর ভাষণে বলেন, '...জাতিকে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ দেওয়া ও চলার পাথেয় হওয়ার মতো কবি খুব বিরল। আল্লামা ইকবাল ছিলেন এমন এক বিরল কবি। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা আমাদের মধ্যে এমন এক কবি পেয়েছি'।[৪২০] প্রবন্ধকার ও আলোচকবৃন্দ ইকবালের দর্শন, অবস্থান, কাব্য-সাহিত্যের শিল্পরূপ বিশ্লেষণ করেন।

৭ জুলাই ১৯৬৮, তৃতীয় দিনে আয়োজন ছিল কবি মির্জা গালিবকে নিয়ে। এদিন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদ এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন আব্দুল ওহাব ও আহসান আহমেদ আশক। সভাপতির ভাষণে বিচারপতি মুর্শেদ বলেন, 'তিনি অমরদের মধ্যে অমর এবং মহৎদের মধ্যে মহৎ। গালিব এক যুগসন্ধিক্ষণের কবি'। প্রবন্ধকার আবদুল ওহাব কবি গালিবকে একজন মহান পথপ্রদর্শক বলে আখ্যায়িত করেন। গালিবের কাব্যদর্শন সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করে আহসান আহমদ আশক বলেন, 'তাঁর (গালিবের) কাব্যের মূল উপজীব্য ছিল মানুষ। এই বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তিনি মূলতঃ মানবতাবাদী। তাঁর কাব্যে প্রদিকিম্বিত হয়েছে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণা'।[৪২১]

৮ জুলাই ১৯৬৮, চতুর্থ দিনে ছিল মাইকেল মধুসূদন দিবস। এদিন মুনীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন শওকত ওসমান এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিল প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার আব্দুল হামিদ চৌধুরী। আলোচকরা মধুসূদনকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্যোক্তা ও মহৎ কবি হিসেবে মূল্যায়ন করেন।

উৎসবের শেষদিন ৯ জুলাই ১৯৬৮-তে কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণে অনুষ্ঠান হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি আব্দুল কাদির এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। প্রবন্ধকার রফিকুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মহত্ত সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে অখণ্ডিতভাবে নজরুলকে গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণে আব্দুল কাদির কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা' বলে মূল্যায়ন করেন।[৪২২]

মহাকবি স্মরণ উৎসবের ব্যাপক সাফল্য পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল লেখক-শিল্পীদের মনোগ্রাহী হয়নি। অনুষ্ঠান আয়োজনের ধ্যান-ধারণা ও আলোচকদের বক্তব্যে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ইকবাল ও গালিব স্মরণে অনুষ্ঠান করেও উদ্যোক্তারা রেহাই পাননি। এই মহলটি রবীন্দ্রনাথকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া এবং নজরুলকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণের দাবিকে সমর্থন করতে পারেনি। *দৈনিক পয়গামে* সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খুব তীব্র ভাষায় মহাকবি স্মরণ উৎসবের সমালোচনা করা হয়।[৪২৩] তবে মহাকবি স্মরণ উৎসবের মধ্য দিয়ে লেখক সংঘ পূর্বপ্রঞ্চলীয় শাখার সাথে সংশ্লিষ্টরা নিজেদের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করতে সক্ষম হন। আইয়ুব খানের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের মধ্যে থেকেই তাঁরা সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বাঙালির সংস্কৃতি চর্চার প্রগতিশীল ধারাকে বেগবান করেন। এই উৎসবের সাফল্য লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সদস্যদের আরও বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে দেয়।

আফ্রো-এশীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (১৯৬৮)

মহাকবি স্মরণ উৎসব সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হবার পর লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল–আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান'। ১৯৬৮ সালের ২০ ও ২১ অক্টোবর মাসে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় এই অনুষ্ঠান।[৪২৪] সন্‌জীদা খাতুনের মতে, 'লেখক সংঘ যে বছরেই 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান'-এর পরিকল্পনা করে। তাদের সমাবেশের প্রধান বিষয় ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির গণমুখিতা সম্পাদন'।[৪২৫] দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথমদিন ছিল প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি। ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিক সফদার মীর। তাঁদের প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল যথাক্রমে 'আফ্রিকা এশিয়ার গণমুখী সাহিত্যের ভূমিকা' ও আফ্রো-এশীয় সাহিত্য আন্দোলন'। হাসান আজিজুল হক তাঁর প্রবন্ধে এশিয়া ও আফ্রিক মহাদেশের সাহিত্য একই ধারা কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে তাই তুলে ধরেন। তাঁর মতে, আফ্রিকা ও এশিয়ার নতুন সাহিত্যের অন্যতম উপাদান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বিরোধী চেতনা। সভাপতি আহমদ শরীফ তাঁর ভাষণে 'সমদর্শিতা ও সহঅবস্থানের ভিত্তিতে নির্যাতনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মানুষের একতাবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই সার্বিক কল্যাণ নিহিত' আছে বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, 'মানুষকে শুভবুদ্ধি দান করার দায়িত্ব লেখকদের, কেননা শিল্পী কোনকালেই শুধু নন্দনতাত্ত্বিক ছিল না'।

প্রবন্ধ পাঠের পর অনুষ্ঠানে এশিয়া-আফ্রিকার বিপ্লবী কবিদের বিশেষ করে হো-চি-মিন, মাও-সেতুং, নাজিম হিকমতের কবিতা অনুবাদ করা হয়। সবশেষে ছিল খুলনার 'সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়' পরিবেশিত 'অপরাজেয় ভিয়েতনাম' শীর্ষক গণসংগীতে অনুষ্ঠান। এতে সাধন সরকারের পরিচালনায় ১৪টি গণসংগীত পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানের অধিকাংশ গানের রচয়িতা ছিলেন–নাজিম মাহমুদ। কামাল লোহানীর মতে, 'কেবল মাত্র ভিয়েতনামের ওপর এতগুলো গান নিয়ে একটি নকশা (গীতিনকশা) রচনা এই প্রথম। এতে পরিবেশনার অভিনবত্ব ছিল'। দ্বিতীয়দিন ২১ অক্টোবর ১৯৬৮-তে সিকান্‌দার আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্যের ধারা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ

উপস্থাপন করেন সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ূন। এতে তিনি মন্তব্য করেন 'আফ্রিকা ও এশিয়ার সাহিত্য স্বাধীনতা আন্দোলন ও মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গভীরতর সার্থকতা লাভ করেছে।'[৪২৬] সভাপতি তাঁর ভাষণে আফ্রো-এশীয় নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সাথে পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণের কাছে শোষকদের তৈরি দেওয়াল ভেঙে ফেলার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর মতে, লেখকরাই জনগণকে আন্দোলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহস যোগাতে পারেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে 'চীনা আপেরা'র নাটক 'The White Haired Girl'-এর বাংলা রূপান্তর ' শ্বেতাকেশিনী' মঞ্চস্থ হয়। এর মূল বক্তব্য ছিল 'সামন্ত-সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে ভূত বানায় এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থা ভূতকে মানুষে পরিণত করে'।

আফ্রো-এশীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি মূলত মার্কসীয় তথা সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাপ্রসূত ছিল। আয়োজক লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সাথে সংশ্লিষ্টরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের অতীতের অপবাদ ও গ্লানি মোচন করে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক তাঁদেরকে এক গৌরবজনক স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল।

জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার তৎপরতা, (বিএনআর)

বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের কার্যক্রম নজরদারি করতে এবং তাদেরকে পাকিস্তানমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য **১৯৫৯** সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (বিএনআর) (BNR) (Bureau of National Reconstraction)।[৪২৭] এই সংগঠন মারফৎ সরকার বুদ্ধিজীবীদের মানসিক প্রবণতার উপর লক্ষ্য রাখতো।[৪২৮] ড. হাসান জামানকে **১৯৬৯** সালের সামরিক শাসনামলে সার্বক্ষণিক পরিচালক নিযুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে সক্রিয় করা হয়।[৪২৯] তিনি সামরিক সরকার কর্তৃক গঠন করা শিক্ষা-কমিশনেরও সদস্য সচিব ছিলেন। তিনি এক কথায় আইয়ুব খানের আমলে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[৪৩০] সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত বাজেট দিয়ে সংস্থাটিকে অপসংস্কৃতি প্রচারের এবং বুদ্ধিজীবী-লেখকদের দিয়ে বই লেখানোর মাধ্যমে টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পে বই লেখেন নি এমন সক্ষম লেখকেরও খুব কমই ছিল।[৪৩১] সাঈদ-উর রহমান এই প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করেন এভাবে–

> অল্পশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবিরোধী ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করে সেগুলো হাজার হাজার কপি দূর-দূরান্তের গ্রামে অর্ধশিক্ষিত জনগণের মধ্যে বিতরণ করা; মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দ্বারা উচ্চমূল্যে পুস্তক রচনা করে তাঁদের নিরপেক্ষ করে তোলা। ....পূর্ব বাংলার প্রতিষ্ঠিত লেখকদের এক বিরাট অংশকে সংস্থাটির গণবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে নীরব রাখতে সমর্থ হলেন।[৪৩২]

বিএনআর-এর কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে সরকারের 'সাংস্কৃতিক গোয়েন্দা বিভাগ' বলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি লেখকদের উৎকোচের ব্যবস্থা রেখেছিল।[৪৩৩] দুঃস্থ লেখকদের পাণ্ডুলিপি বাজার দরের চেয়ে চড়া মূল্যে কিনে নেয়। ফলে লেখকদের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা পায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি।[৪৩৪] আবার প্রতিষ্ঠিত লেখক মাথা চাড়া না মারে, তারও ব্যবস্থা ছিল। সংবাদপত্র-সেবীদের মুখবন্ধ করে রাখার বন্দোবস্ত ছিল এই প্রতিষ্ঠান মারফৎ। বহু চরিত্রহীন ব্যক্তি এইভাবে গোপনে বিয়েনারের সমর্থক হয়ে পড়ত অথবা তার সমাজ-বিরোধী কাজের ক্ষেত্রে চুপচাপ থাকত। বহু অনভিজ্ঞ তরুণ পরিচালকের স্রেফ খেয়ালখুশীর উপর লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে পড়েছে। সাধারণ সরকারি অডিট ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর প্রযোজ্য নয়। এখন ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার।[৪৩৫] সরকারি অর্থব্যয়ে বাংলাদেশি সংস্কৃতি-নাশকতায় যে কতো ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু বিয়েনারের বাজেট বছরে তেত্রিশ লক্ষ টাকা। দরিদ্র দেশে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় সম্ভ হত, কারণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। স্বৈরতন্ত্রেই এ জাতীয় ব্যাপর ঘটে। কিন্তু এত নাগপাশও বাঙালি জাতীয়তাবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারেনি। কারণ পরিবেশগত দুর্দশার প্রতিকার-আসল জায়গা থেকে, সরকার সবসময় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাই লাখ লাখ টাকা শ্রাদ্ধ কিছু সাময়িক বিভ্রান্তি হয়তো সৃষ্টি করেছে, কিন্তু আসল লক্ষ্য থেকে বাঙালিদের দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি। সরকারি নীতি পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের লক্ষণগুলো ক্রমেই তীব্রভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।[৪৩৬] শুধু বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেই নয়, তরুণদের হাত করার জন্য সামরিক শাসন জারি হওয়ার পরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্যে প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তিত হয়। এ অ্যাওয়ার্ডর অর্থমূল্যর

বেশ ভালো ছিল।[৪৩৭]-আইয়ুব খানের আমলে বিএনআর-এর উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। কারণ প্রকৃত দেশপ্রেমী বা বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ লেখকরা এক প্রত্যাখ্যান করেন। নিচের উদ্ধৃতি থেকে সংস্থাটির কার্যকলাপের একটি চিত্র পাওয়া যাবে–

> জানা যায়, ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর (আসলে মে) মাস থেকে ডঃ হাসান জামান কর্তৃক ডিরেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রায় পনেরশো বিভিন্ন ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা, কাব্য, নাটক, প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ছশো প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী আদর্শের নীতির দিক অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আধ্যাত্মিক প্রভৃতিসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজিতে ছোট-বড় পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে এবং এগুলো প্রদেশের দূর-দূরান্তের জনসাধারণের মধ্যে বিপুলভাবে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া আরও জানা যায়, সংস্থার সাম্প্রতিক আকর্ষণীয় প্রকাশনা হিসাবে কতিপয় শিল্প-সাহিত্য এ প্রতিষ্ঠান বের করেছে। প্রকাশ, উপরোল্লেখিত পনেরশো পুস্তকের মধ্যে আটশো খানা গণসাহিত্যমূলক, চারশো গবেষণামূলক ও তিনশো নাটক। পক্ষান্তরে ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন আইউব সরকারের আমলে এই সংস্থা থেকে নাকি মাত্র ত্রিশটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এ সাহিত্যসৃষ্টি মারফত জনসাধারণের মধ্যে যেমনি একটি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি এদেশের অবহেলিত লাঞ্ছিত লেখক সমাজও অনেকাংশে উপকৃত হলেন। এদেশের লেখকসমাজ, প্রবীণ কি নবীন, সাহিত্যসৃষ্টি করে এখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। ফলে, যেমন প্রবীণ লেখক হতাশ হয়ে লেখনী চর্চা পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা আবার লেখনী ধরেছেন এবং বিকাশোন্মুখ তরুণ লেখকগোষ্ঠী নিজেদের প্রতিভা বিকাশের একটি যথোপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পেয়েছেন। আনন্দের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্ররা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যমের সহিত লেখনী চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন।[৪৩৮]

পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চেয়ে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব আরও জটিল।[৪৩৯]হিন্দু নেতৃত্বস্থানীয়রা এ প্রসঙ্গে প্রায়ই বলেন, 'দুম্ মে থোড়া কসর রহ্ গয়া' অর্থাৎ লেজের দিকে কিছু খুৎ রয়ে গেছে বা কিছুট খাটো।[৪৪০]

১৯৭০ সালের প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপের বিরোধিতা শুরু হয়। বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ এর তৎপরতায় সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও প্রকাশে জনসভায় এর কার্যকলাপের নিন্দা করেন।[৪৪১] সংস্থার কাজকর্ম তবু অব্যাহত থাকে কিন্তু ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার এর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।[৪৪২]

সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রগতিপন্থিদের গ্রন্থ বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন (১৯৬৯)

১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' জারির পর বিভিন্ন গ্রন্থের ওপর সরকারে নজরদারী চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। এ সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দীন তার স্মৃতিচারণ করে লিখেন,

> তখন লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের বড় সমস্যা দেখা দেয় তাঁদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি নয়ে। মার্কস বা মার্কসিজমের বই পেলে রক্ষা নেই। আমার কিছু বই অন্যত্র সরিয়ে ছিলাম। সৈয়দ নুরুদ্দিন আগমসী লেনে থাকতেন। তিনি তাঁর কিছু বই বাড়ির ভেতর কুয়োতে নিক্ষেপ করেন। আমার ট্রটস্কির হিস্টরি অব রাশিয়ান রিভল্যুশন বইটি তিনি পড়তে নিয়েছিলেন, সেটিও সলিল সমাধি লাভ করে।[৪৪৩]

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বিরোধ চরমে পৌঁছে ১৯৬৮ সালের দিকে। ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার আগে পর্যন্ত স্বৈরাচারী আইয়ুব খান পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অবদমন অব্যাহত রাখেন। বাংলা ভাষাকে বিকৃত করে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির শেষ উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর সুক্ষ্ম পন্থায় স্বাধীন মত প্রকাশের ওপর হস্তক্ষেপ করে। জরুরি অবস্থার সুযোগে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ লেখকদের গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করার নীতি গ্রহণ করে সরকার। এই লক্ষে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান সরকার কুখ্যাত 'প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অডিন্যান্স' জারি করে। মৌলিক অধিকার তথা স্বাধীন চিন্তা ও বাঙালি সাংস্কৃতিবিরোধী এই আদেশ জারি হলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ সময় লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীরা প্রবল প্রতিবাদে সোচ্চার হন।[৪৪৪]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার আদেশ জারির প্রতিবাদে ১ ডিসেম্বর ঢাকায় সাংবাদিক ও সংবাদসেবীদের এক প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন–*ইত্তেফাক* সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক

মিয়া), আলী আশরাফ, এ বি এম মুসা (প্রেসক্লাবের সভাপতি), শহীদুল্লাহ কায়সার (সহ-সভাপতি) এবং আতাউস সামাদ (সম্পাদক)। সমাবেশ থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পূর্ণ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, দেশরক্ষা বিধি, প্রেস অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন বাতিলসহ সব ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ প্রত্যাহার করার দাবি করা হয়। মিছিলকারীরা *ইত্তেফাকের* ছাপাখানা বাজেয়াপ্তি ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে গভর্নর হাউসের সামনে বিক্ষোভও প্রদর্শন করে।[৪৪৫]

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে পর-পর কয়েকটি বইয়ের প্রকাশকের ওপর 'কেন বইগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে না' তার কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। বইগুলো ছিল কামরুদ্দিন আহমদের, The Social History of East Pakistan; বদরুদ্দিন উমরের, 'সংস্কৃতির সংকট'(১৯৬৭) ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা'; ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে ত্রিশ বছর (১৯৬৮); সত্যেন সেনের 'আল বেরুনী' (১৯৬৯) ও আবদুল মান্নান সৈয়দের 'সত্যের মত বদমাস' (১৩৭৫)। মওলানা ভাসানীর একটি রাজনৈতিক পুস্তিকা 'ভোটের আগে ভাত চাই'র ওপরও অনুরূপ নির্দেশ আসে।[৪৪৬] ঘটনাপ্রবাহ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্‌বিগ্ন করে। তিরিশজন বুদ্ধিজীবী পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে সরকারের কাজকে আশংকাজনক ও মারত্মক বলে অভিহিত করে বইগুলোকে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে মত প্রকাশ করেন। কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক নেতা ও সাংবাদিক আরও একটি বিবৃতিতে মওলানা ভানাসীর পুস্তিকাটির ওপর কারণ-দর্শানোর নোটিশকে রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থি কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। 'সাম্প্রতিক' গোষ্ঠীর লেখকরাও প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেয়।[৪৪৭]

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভা হয় বেগম সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে। সভায় আবুল হাসিম মত প্রকাশ করেন যে, আমরা এই সঙ্গে বাঙালী, মুসলমান ও পাকিস্তানি এবং আমাদের বাঙালীত্ব স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। তিনি আরও বলেন, মুক্ত চিন্তাকে উৎসাহিত করার মধ্যেই সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব নিহিত আছে ঃ লেখকদের বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে তা বিপন্ন হতে পারে।[৪৪৮]

বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং শিল্পী ও লেখকগণ 'প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' বাতিলের দাবি জানায়।[৪৪৯]

এ সময় তেরোজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক আরও একটি বিবৃতিতে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস রচিত 'ভাসানী যখন ইউরোপে' (১৯৫৭) গ্রন্থটির ওপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানান।[৪৫০] বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোও প্রতিবাদমুখর হয় এবং বাঙালী সংস্কৃতি, বাঙালী জাতি ও স্বাধীন চিন্তার ওপর হামলা না-করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।[৪৫১]

লেখক স্বাধীকার সংরক্ষণ কমিটির উদ্‌যোগে ১৯৭০ সালের ১৫ই জানুয়ারী বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সভা বসে। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সে-সভায় বক্তৃতা ও গৃহীত প্রস্তাবে 'প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' বাতিল করার, সকল পুস্তকের ওপর থেকে বাযেয়াপ্তির আদেশ প্রত্যাহার করার, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার, রেডিও টেলিভিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার, সংবাদপত্রের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করার, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার মাধ্যমে সংস্কৃতিক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি বন্ধ করার এবং লেখক সংঘ, পাকিস্তান কাউন্সিল ও পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের মাধ্যমে সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না-করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৪৫২] এই প্রতিবাদ সভা ও মিছিল উপলক্ষ্যে কমিটি একটি প্রচার পত্র প্রকাশ করে ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৯। এই প্রচার পত্রে বলা হয়–

> ...এই প্রদেশে সরকার যে একে একে এত বই বাজেয়াপ্ত করেছেন তার হিসেবে নেই। বিশেষ করে সম্প্রতি সেই কুখ্যাত প্রেস ও পাবলিকেশনস্-এর কালাকানুনের সাহায্যে গ্রন্থ বিশেষের ওপর বিধি নিষেধাজ্ঞা জারী করে। কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী এবং কোনো বই আটক ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে সরকার নতুনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের কণ্ঠরোধে তৎপর হয়ে উঠেছেন।...এ অবস্থার ফলে কেবল যে লেখকদের স্বাধীনভাবে লেখার উৎসাহ দমিত হচ্ছে তাই নয়,

প্রকাশকরাও বই প্রকাশে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন এবং ফলে সংস্কৃতির জগতে নেমে আসছে চরম বন্ধ্যাত্ব। বস্তুতঃ স্বৈরাচারী শাসকবর্গের নিকটও একটি জাতিকে অবদমিত রাখার জন্য এটাই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা। যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তেই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই পরিকল্পিত হামলার ব্যাখ্যা কি? এই অসঙ্গতির মূল কোথা?

তাই এ মুহূর্তে লেখকদের স্বাধিকার সংরক্ষণ এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের ওপর যে কোনো প্রকারের হামলার প্রতিরোধে প্রতিটি নাগরিককে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।...আমাদের চিন্তা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ আমরা যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করব এবং এই অনাচার আমরা কিছুতেই কায়েম হতে দেব না।[৪৫৩]

পূর্ব বাংলার লেখক বুদ্ধিজীবীদের গ্রন্থ বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র সংগঠন, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মীরা একাত্মতা প্রকাশ করেন।[৪৫৪] এই পরিস্থিতিতে সরকার চতুর নীতি গ্রহণ করে। বাংলা একাডেমির পরিচালক কবীর চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে আরও ছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার প্রধান ড. হাসান জামান ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ড. আশরাফ সিদ্দিকী। সরকারের চাল সফল হয়। আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।[৪৫৫]

সংগীত সম্মেলন ১৯৭০

১৯৬৩ সালে কাকরাইলে বারীন মজুমদারের উদ্যোগে সংগীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেনে তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষা ও তথ্যমন্ত্রী এ.টি.এম মোস্তফা। এই কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৫ জন শিক্ষক ও ১১ জন ছাত্র নিয়ে। ১৯৬৮ সালের দিকে এই মহাবিদ্যালয়ে ডিগ্রী ক্লাস চালু হয়। সংগীত বলতে গীত, বাদ ও নৃত্য–এই তিনের সমন্বয়কে বোঝায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার নৃত্য কলাকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে নি।[৪৫৬] পাকিস্তান ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধা এছেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সংগীত সংগঠকগণ ধৈর্য ধরে এই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। সংগীত মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সংগীত সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সংগীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বারীন মজুমদার পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে সমস্ত বড়ো বড়ো শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে আসেন।[৪৫৭] পরবর্তী সময়ে কামাল লোহানী শিল্পীদের পশ্চিম পাকিস্তানে আনতে গিয়েছিলেন। বারীন মজুমদার চেয়েছিলেন উপমহাদের বড়ো বড়ো শিল্পদের নিয়ে এ সম্মেলন করতে। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।[৪৫৮] ঢাকার পর খুলনাতে দুইদিন এবং চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউশনে দুই দিনের সম্মেলন হয়েছিল।[৪৫৯] উল্লেখ ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে নিখিল পাকিস্তান সংগীত সম্মেলনের আযোজন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা আয়োজনের ব্যর্থ হয়েছিল।[৪৬০]

'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' বিরোধী আন্দোলন

উনসত্তরের অভ্যুত্থানের পর থেকে বাঙালি তরুণ মানসে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রচার ও প্রসারের নতুনভাবে চেষ্টা শুরু হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে পাকিস্তানিবোধের ভিত পাকা করার জন্য পাঠক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আজিজুর রহমান মল্লিককে সভাপতি করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় এবং পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' নামক দুখণ্ডের একটি পুস্তক রচনা করেন। এটা ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে পূর্ববাংলার মাধ্যমিক স্কুলসমূহে নবম ও দশম শ্রেণিতে পাঠ্য করা হয়।[৪৬১] পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষে কখন থেকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎস খোঁজা উচিত ও পাকিস্তানের মাধ্যমে কিভাবে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটলো এই হলো ঐ বইয়ের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। পাকিস্তানের অখন্ড মুসলমানি জাতীয়তাবাদী

চেতনা জাগ্রত করার এই অপচেষ্টা পাকিস্তানি শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করবে-তার মাত্র একবছর পূর্বে, বাঙালি লেখক-গবেষক-অধ্যাপকদের দ্বারাই প্রণীত হয়েছিল।[৪৬২] গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন :

> পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, পাকিস্তানী কৃষ্টির কতকগুলি দিক যেমন : ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ, স্থাপত্য ও ললিতকলা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বইটিতে। ....পৃথিবীর যে কোনও উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতির শিল্প-কলা-কৃষ্টিগত বুনিয়াদ সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষার্থীকে অবহিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিন্তু ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। তাই প্রদেশের শিক্ষাবোর্ডগুলি এবং সে-সঙ্গে টেক্সট বুক বোর্ড তাঁহাদের এই নীতি ও পদক্ষেপের জন্য অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য।[৪৬৩]

দ্বিতীয় খণ্ডে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ এবং ভাষা-সাহিত্য-স্থাপত্য-চিত্র প্রভৃতির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত 'অখণ্ড জাতীয়তাবাদী চেতনা' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পর্কে বলা হয় :

> কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আপতঃ এত অমিল সত্ত্বেও টেকনাফ থেকে তুরখান পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের প্রায় সকল অধিবাসীই এক ধর্মবিশ্বাসের সূত্রে আবদ্ধ। একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হিসাবে পাকিস্তানীরা একটি সুসংহত জাতি গড়িয়া তুলিয়অছে। আর সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের নিজস্ব একটি কৃষ্টিগত বুনিয়াদ।... পাকিস্তানের নিজস্ব কৃষ্টিগত বুনিয়াদকে আমরা পাকিস্তানী কৃষ্টি আখ্যায়িত করিতে পারি। এই পাকিস্তানী কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রচ্ছদপটই দেশের জনগণের মধ্যে সংহতির একটি শক্তিশালী যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।[৪৬৪]

পুস্তকটি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করায় ছাত্র-ছাত্রীরা এটি প্রত্যাহারের জন্য সংগঠিতভাবে আন্দোলনে নামে। দুটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়–একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের, অপরটি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) তত্ত্বাবধানে। দুই পরিষদ ১৯৭০ সালের আগস্ট- সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলে-স্কুলে ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে আন্দোলনে যোগ দেয় অন্যান্য ছাত্র সংগঠন; ষোল জন বুদ্ধিজীবীও বইটি প্রত্যাহারের জন্য বিবৃতি দেন।[৪৬৫]

চাপের মুখে সরকার আপোষমূলক বক্তব্য প্রচার করে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করলেও এই বই আর ছাত্রদের ছুঁয়ে দেখার প্রয়োজন পড়েনি।

পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকগণ বারে বারে গণ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। ক্ষমতার সঙ্গে আপোষ করে জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।[৪৬৬]

বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ (১৯৭১)

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের পর্বে ঢাকার প্রগতিশীল কিছুসংখ্যক শিল্পী অভিনেতা সৈয়দ হাসান ইমাম-এর নেতৃত্বে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ প্রসঙ্গে ওয়াহিদুল হক লিখেছে,

> মার্চ মাসের পহেলা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সভা বাতিল হলে গেলে বিক্ষোভ আরম্ভ হলো দেশ-জোড়া। চলচ্চিত্র শিল্পীদের থেকে সৈয়দ হাসান ইমাম, বুলবুল একাডেমির আতিক ও ছায়ানটের আমি গড়ে তুলি 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'। গণহত্যার রাত পর্যন্ত চলে এই সমাজের বিক্ষোভের গান রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে।[৪৬৭]

বিক্ষুব্ধশিল্পী সমাজের গণসংগীত দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন–অজিত রায়, আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুতফর রহমান, অখেন্দু চক্রবর্তী, আপেল মাহমুদ, ফাহমিদা খাতুন, জাহেদুর রহিম প্রমুখ। তাঁরা দল বেঁধে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন, ঢাকার শহিদ মিনার, প্রেসক্লাব, রাস্তায়, কখনো বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালরে ছাত্র সংসদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে। বস্তুত সে সময় সর্বত্রই রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে গড়ে উঠেছে সংস্কৃতির সংগ্রাম।[৪৬৮]

মূলত সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্মেলনগুলো পঞ্চাশের দশকে আয়োজিত হয় এবং তা বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলে। যার ভিত্তিতে বাঙালি নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করে। একাজে কেন্দ্রের ভূমিকাকে প্রভাবিত করে প্রান্তের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও সংগঠনসমূহ। এই সম্মেলন ও সংগঠনসমূহ সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তোলে বা সচেতন করে তোলে। যা অন্তিমে তা বাঙালিকে একটি

স্বাধীন দেশ গঠনের জন্য প্রেরণা দেয়। এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রান্ত ও কেন্দ্র যেমন একে অপরকে প্রভাবিত করে। তেমনি রাজনীতিকেও এইসব সম্মেলন সমানভাবে প্রভাবিত করে। গ্রামীণ বৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা এই দেশের সন্তান তাদের দেশের রাজনীতির মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার অদম্য স্পৃহাই ভাসানীকে উজ্জীবিত করেছিল পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন আয়োজনে। মওলানা ভাসানী দেশজ সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে জাতিগত ও শ্রেণি নিপীড়নকে উৎখাত করতে সংস্কৃতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন। যা বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণের ও সাংস্কৃতিক ভিত ভূমি। এই সম্মেলনগুলো আমাদের মানসগঠনে ভূমিকা পালন করে।

অসহযোগ আন্দোলন পর্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলন

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকেই পূর্ব বাংরার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরও গতিশীল হয়। গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসক বদল হলেও স্বৈরাচারী শাসনের প্রকৃতি ছিল একই। পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার চেষ্টায় নতুনভাবে ইসলামি ভাবধারার সংস্কৃতি পূর্ব বাংলায় আরোপ করার চেষ্ট অব্যাহত ছিল। পূর্ব বাংলার মানুষের জাতীয়তাবাদী জাগরণ ঠেকাতে সামরিক স্বৈরাচার ও তার সমর্থকগোষ্ঠী তখন যত তৎপর হয়, তার চেয়ে অনেক গুণে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে সংস্কৃতির সংগ্রাম। পূর্ব বাংলার অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে বিকশিত করতে সজাগ-সচেতন সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশ প্রবলভঅবে আন্দোলিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবে গণ-অভ্যুত্থানের সময় মানুষের ভেতরে যেমন প্রেরণা সৃষ্টি করেন, তেমনই ১৯৭০ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিকে বিজয়ীর আসনে বসাতে, সর্বোপরি একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। বস্তুত উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকেই প্রতিবাদী চেতনার কবিতা, গণসংগীত, পথ-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙালিকে মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দালনে বাংলাদেশের দেশপ্রেমী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সে সময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে অসাধ্যকে সাধন করে। 'বাঙালি অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করতে পেরেছিলেন প্রবল প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কারণেই। সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সে সময় তারা হাতে নিয়েছিলেন নানা কর্মসূচি'।[৪৬৯] ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ২ মার্চ সকালে ঢাকার সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট' শহিদ মিনারের পাদদেশে 'স্বদেশ পর্যায়ের গাণের' এক অনুষ্ঠান করে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেদিন পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছিল।[৪৭০] '৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শোষক শ্রেণি ও কায়েমীস্বার্থবাদী মহল দায়ী।'[৪৭১] এরপর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। সংস্কৃতিকর্মীরাও এ সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে শরিক হন। ৪ মার্চ ১৯৭১ তারিখে ২৪ জন প্রখ্যাত শিল্পী এক যৌথ বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন যে, পূর্ব বাংলায় যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণের স্বাধিকারের দাবি আদায়ের সংগ্রাম চলবে, ততোদিন পর্যন্ত তাঁরা বেতার ও টেলিভিশনের কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না।[৪৭২] এদিন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নও এক সভার মাধ্যমে দেশের চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানান। তাঁরা স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার না পেলে বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না বলে মত প্রকাশ করেন। ৫ মার্চ ঢাকা থেকে 'সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি' এক বিবৃতিতে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। সেদিন পূর্ব বাংলার ৩৩ জন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব তথা পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সংগীত পরিচালক এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে জানান

যে, পূর্ব বাংলার ন্যায্যা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্র সমাজ জনতার সংগ্রামের সাথে থাকবে'।[৪৭৩] এদিন বাংলা জনগণেল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সমর্থনে উদীচী এক মিছিল বের করে। মিছিলটি নগরের বিভন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং গুলিস্তান, নয়াপল্টন, জিন্না এভিনিউ ও সেগুনবাগিচা এলাকায় পথসভা করে। উদীচীর সভাপতি সত্যেন সেন সভাসমূহে বক্তৃতাকারে দেশের বর্তমান দুর্যোগ মুহূর্তে সকল প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের গণআন্দোলনে শরিক হওয়ার আহ্বান জানান।[৪৭৪] ৬ মার্চ বাংলা একাডেমি চত্বরে লায়লা আরজুমন্দ বানুর সভাপতিত্বে বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে চলমান 'স্বাধীকার আন্দোলনের মূল কথাকে গানের সুরে জনতার মুখে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।' এই সভায় ২৫ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনের আগে পূর্ব বাংলায় নির্বিচারে গণহত্যার বিচার অনুষ্ঠানের দাবি করা হয়।[৪৭৫] ৬ মার্চ উদীচীর শিল্পীকর্মীরা আবার গণমিছিল করে। গণহত্যার প্রতিবাদে এবং গণআন্দোলনের সমর্থনে সকাল ১০টায় বায়তুল মোকাররম থেকে গণমিছিল গুলিস্তান, টিকাটুলি প্রভৃতি স্থানে পথসভা করে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শেষ করে।[৪৭৬]

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠলে সংস্কৃতিকর্মীরা জনতার সাথে রাজপথে আন্দোলনে শরিক হন। এ সময় ছায়ানট, বুলবুল একাডেমি ও চলচ্চিত্র শিল্পী সংসদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'। এই সংগঠনের ব্যানারে শিল্পী সমাজ অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে উদ্দীপনার গান গেয়ে বেড়ান। তখন দেশপ্রেমী কবিদের কলমও যেন আগ্নেয়াস্ত্রে পরিণত হয়। সে সময় লেখা সিকান্দার আবু জাফরের সাড়া জাগানো কবিতা 'বাংলা ছাড়ো' ৭ মার্চ (১৯৭১) তারিখে *দৈনিক পাকিস্তানে* প্রকাশিত হয়।[৪৭৭] এভাবে একাত্ম হয়ে পূর্ব বাংলার সমগ্র শিল্পীসমাজ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গণ-আন্দোলনের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন এবং তখন পর্যন্ত সরকারি সব প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান বর্জন অব্যাহত রাখেন। কিন্তু যেহেতু গণ-আন্দোলন তথা মুক্তিসংগ্রামের চেতনাকে সদাজাগ্রত রাখার জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে উদ্দীপনাময় ও গণমুখী সংগীত, নাটক ইত্যাদি প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে। তাই সংঘবদ্ধ শিল্পীরা এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন,

ক. ১০ মার্চ (১৯৭১) থেকে তারা রেডিও, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন এই শর্তে যে, যাবতীয় অনুষ্ঠান অবশ্যই আন্দোলনের অনুকূলে হবে। কোনো অবস্থাতেই আন্দোলনের পরিপন্থি অথবা দেশের সামগ্রীক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসঙ্গতিপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার করা যাবে না;

খ. যতোদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকবে ততোদিন প্রদেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগীত একাডেমিগুলো বন্ধ থাকবে।

গ. যদি আবার সামগ্রিক হরতাল ঘোষিত হয়, তাহলে শিল্পীদের অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় চলতে থাকবে।[৪৭৮]

১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচিতে ৩৫টি নির্দেশ ঘোষণা করলে আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ১৫ মার্চ টেলিভিশন নাট্যশিল্পীরা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন।[৪৭৯] ২২ মার্চ ড. আহমদ শরীফ-এর সভাপতিত্বে 'লেখক সংগ্রাম শিবির' বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'অসহযোগ আন্দোলনের বজ্রশপথ' শীর্ষক এক কবিতা পাঠের আসরের আয়োজন করে। এই আসরে–আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আলাউদ্দীন আল্ আজাদ, হুমায়ন কবির, শাহনূর খান, দাউদ হায়দার, মেহেরুন্নেসা প্রমুখ কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতা পাঠের আসরের পর 'উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী'র পরিবেশনায় একটি নাটিকা মঞ্চস্থ হয়।[৪৮০] ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' বাহাদুর শাহ পার্কে তাদের পঞ্চম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ' ঐ দিন বিকেলে পল্টন ময়দানে ছড়া পাঠের আসর, গণসংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'বিমুর্ত সঙ্গীত একাডেমি' সকালে শহিদ মিনারে শপথ এবং বিকেলে 'বিমুর্তের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে' গণসংগীতের আয়োজন করে। 'সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী' মালিবাগ চৌরাস্তায়, রেল স্টেশনের সামনে, বিকেলে মতিঝিলে, সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এবং রাত ৮টায় সদরঘাট টার্মিনালে 'একটি পোস্টার'

নাটক ও গণসংগীতের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। 'বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন'ও প্রতিরোধ দিবসের ডাকে মিছিল, সভা, গণসংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ দিন 'ছায়ানটে'র অনুষ্ঠান হয় শহিদ মিনারে।[৪৮১]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই রাজনীতি সচেতন সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন। তখন সবার মনে একটিই স্বপ্ন 'স্বাধীকার'। তাই অসহযোগ আন্দোলন পর্বে দেখা যায় বাংলাদেশের সর্বস্তরের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামকে বেগবান করতে রাজপথে নেমে আসেন।

আঞ্চলিক পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

আঞ্চলিক গান, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতনা করে তোলা হয়েছে। তাদের মনের মধ্যে সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং তারা রাজনীতির মূলস্রোতের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করে এবং জাতীয় রাজনীতিতে অবদান রাখে।

যশোর

ষাটের দশকে যশোরে অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলো স্থানীয় জনগণকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন করার পাশাপাশি অনেক সময় কেন্দ্রকেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এ রকম কিছু সংগঠন হলো : যশোর কলেজ সাহিত্য মজলিস (১৯৬০), যশোর এম এম কলেজ ইংলিশ এ্যাসোসিয়েশন (১৯৬০), পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতি, যশোর শাখা (১৯৬০), সবুজ সংঘ, যশোর (১৯৬০), যশোর কালেক্টরে ক্লাব, জে সি সি (১৯৬০), ঝিকরগাছা নাট্য সংস্থা (১৯৬০), যশোর শিল্পকলা একাডেমি (১৯৬০), ডায়মণ্ড ক্লাব (১৯৬২), অভয়নগর তরুণ পাঠাগার (১৯৬২), নবারুণ সংঘ (১৯৬৪), প্রগতি ক্লাব (১৯৬৪), নবারুণ সংসদ (১৯৬৪-১৯৭৫), সুহৃদ সন্ধানী ক্লাব (১৯৬৪-১৯৭২), যশোর নিউ থিয়েটার্স (১৯৬৫), গোল্ডেন ক্লাব (১৯৬৫-১৯৭১), প্রকাশ নাট্য গোষ্ঠী (১৯৬৫), গ্রীণ ক্লাব (১৯৬৭), চলিশিয়া যুব সংঘ (১৯৬৮), যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট (১৯৬৮), মশিয়াহাটী সাংস্কৃতিক পরিষদ (১৯৬৮), শিল্পী মন ক্লাব (১৯৬৮), তরুণ সংঘ (১৯৬৮) ও প্রগতি সংঘ (১৯৭০),[৪৮২] ঝিনাইদহ শিল্পকলা একাডেমি (১৯৬০), ঝিনাইদহ ইত্যাদি।[৪৮৩]

বগুড়া

বগুড়ার সাংস্কৃতিক কর্মীরা সাম্প্রদায়িক ও অপসংস্কৃতির অবসান ঘটাতে কেন্দ্রের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে গেছে। সাংস্কৃতিক কর্মী তৌফিকুল আলম টিপু বলেন, 'ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, উদীচী সাংস্কৃতিক সংঘ, কৃষক সম্মেলন, শ্রমিক সম্মেলনের নিয়মিত মিটিং বগুড়ায় হতো।'[৪৮৪] এইসব সংগঠন সমন্বয় করে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতো। আঞ্চলিক ভাষা স্থানীয় পর্যায়ে গান পরিবেশন করা হতো প্রত্যেকটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের পূর্বে। এ প্রসঙ্গে তৌফিকুল আলম টিপু বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য গণসঙ্গীত অগ্রসর চিন্তা ভাবনার মানুষের জন্য। মানুষকে জাগানোর জন্য বা জাগরণের জন্য আঞ্চলিক ভাষার গান খুব ফলপ্রসূ হতো।'[৪৮৫]

১৯৬৮ সালে ছাত্র ইউনিয়ন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে এক সভায় আঞ্চলিক ভাষার গান পরিবেশিত হয় যা জনগণকে জাগিয়ে তোলে। গানটি সুরকার, গীতিকার ও গায়ক ছিলেন তৌফিকুল আলম টিপু। গানটি হলো :

> গবরা খায়া যা শেরপুরের দই
> পাঁচ সিকে আছল এখন পাঁচ ট্যকা (টাকা) হলো
> পাঁচ ট্যকা পালে হামি চাউল কিননু হিনি
> ছোলপোলের কাপর চোপোর সেটাও কিননু হিনি।[৪৮৬]

বরিশাল

ষাটের দশকে বরিশালে অনেকগুলো সাংস্কৃতিক ও নাট্য সংগঠন গড়ে ওঠেছিল।

বরিশাল যুব সংঘ (১৯৬৫)

'বরিশাল যুব সংঘ' ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যুব সংঘের স্থায়ী কার্যালয় বরিশাল সদর রোডে। এই প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসে প্রতিবছর ভ্রাম্যমান 'ট্রাক ড্রামা' করত। এই ড্রামাগুলো তাদের নিজস্ব রচিনা ছিল। নাট্যকারগণ হলেন–অধ্যাপক সাধন ঘোষ, আবু আল সাঈদ (নান্টু), অধ্যাপক রবীন সমদ্দার ও মিন্টু বসু প্রমুখ।[৪৮৭] যুব সংঘ নাটকের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তুলতে অবদান রাখে।

প্রান্তিক (১৯৬৭)

১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর 'প্রান্তিক'-এর জন্ম। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আবদুল কাউয়ুম এবং জসিম বিশ্বাস। এছাড়া মোশারফ হোসেন নান্নু, খান সাইফুর রহমান, এনায়েত পীর খান, মুজিবর রহমান তালুকদার, ছেরনিয়াবাত, মীর মুজতবা আলী, আবদুল হক, সেলিম আহমেদ এবং রাণী ভট্টাচার্য এ সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। প্রান্তিক তিনটি বিভাগের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভাগ তিনটি হচ্ছে ক. সংগীত, খ. আবৃত্তি ও নাট্য এবং গ. চারুকারু।[৪৮৮]

তানসেন সংগীত বিদ্যালয় (১৯৬৯)

১৯৬৯ সালে আবদুর রহমান বিশ্বাস তানসেন সংগীত বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে অ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খান এবং আক্কাস হোসেন। এছাড়াও মহেন্দ্র নাথ দাস, বিনয় কৃষ্ণ দাস, নিকুঞ্জ বিহারী দাস, অ্যাডভোকেট আবদুল লতিফ এবং ডা: শান্তি রঞ্জন দাস এ সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৪৮৯]

খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার (১৯৬৯)

'খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার'ও বাঙালির মুক্তির আন্দোলনে জনগণকে সচেতন করে তোলে। 'খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার' ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হলেন : আবদুল খালেক[৪৯০] এবং অভিনেতা ও নির্দেশক আকবর হোসেন।[৪৯১] এছাড়াও আবদুস সাত্তার, এস.এম. আলম, মীর মোশারফ হোসেন, মোস্তফা কামাল এবং ইউসুফ আবদুল্লাহ এ প্রতিষ্ঠান গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৪৯২]

এসব সংগঠন ছাড়াও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বরিশালে মুক্তির সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি। সেগুলোর কিছু অংশ তুলে ধরা হলো : আইয়ুব খান-এর মার্শাল ল-এর পর ২১ শে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ, ২৫ শে বৈশাখ ও ২২ শে শ্রাবণ ইত্যাদি দিনগুলো পালন করা বরিশালে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬০ সালে হরেন্দ্র কুমার নাগের মেয়ে অনিতা নাগ, মোঃ আক্কাস হোসেন ও অন্যান্যরা ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালন করেন। ১৯৬২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করায় মোঃ আক্কাস হোসেনকে রাষ্ট্রদোহী মামলায় গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৫ সালের ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনে বি. ডি হাবিবুল্লাহ্ এর লেখা গানে সুর দেন মোঃ আক্কাস হোসেন। গানটির কলি ছিল,

> জাগোরে জাগোরে আজি জাগো দেশের মানুষ,
> গণতন্ত্রের কবর দিয়ে আইয়ুব গড়ল জালেম রাজ আসন।[৪৯৩]

১৯৬৮-৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হওয়ার পর তাঁকে মুক্ত করার জন্য বিদেশি আইনজীবী আনার জন্য মোঃ আক্কাস হোসেনের নেতৃত্বে বরিশালে গান গেয়ে ভিক্ষা হতো।[৪৯৪] মোঃ আক্কাস হোসেনের লেখা ও সুর করা গানটি হলো :

> ভিক্ষা দাওগো নগর বাসী, ভিক্ষা মোদের দে

আগরতল ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হইয়াছে ॥
এই মামলায় প্রধান আসামী শেখ মুজিবর রহমান
তাঁরও সাথে আছে অনেক বীর বাঙ্গালী সন্তান
এবার বাঙ্গালীদের নীধন যজ্ঞ শুরু ইয়াছে ॥[৪৯৫]

বরিশালের মহল্লায় মহল্লায়, রাস্তায় রাস্তায় যেখানে গিয়ে এই গানের দল অগনিত মানুষ মন দিয়ে গান শুনেছে এবং সবাই তাদের সমর্থ অনুযায়ী অর্থে দান করেছেন। এই গান গাওয়ার অপরাধে মোঃ আব্বাস হোসেন রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে গ্রেফতার হন।

টাঙ্গাইল

আঞ্চলিক পর্যায়ে লোক-সংস্কৃতিতে জাতীয় রাজনীতির প্রভাব পরত। যে লোকগান মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং রাজনৈতিক সচেতন করে তোলে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল হয়। তাই এদেশের নেতা-কর্মীরা আইয়ুব খানের নিন্দায় মুখরিত হয়ে উঠে। আইয়ুব খান এদেশের নেতা-কর্মীদের শায়েস্তা করার জন্য সামরিক আইন জারি করে। এর ফলে দেশের অবস্থা কেমন হয় এবং জনসাধারণের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় টাঙ্গাইলের দুইটি লোকজ গানে। যেমন-

(১)

শোন শোন বয়াতীগণ আমার একটি নিবেদন/ দ্যাশের শনে তাল মিলাও এখন ॥/ ওরে নতুন যুগের আমল হইল/পুরান গান সব খ্যান্ত কর/নিত্য নুতন বল না এখন।/ওরে দ্যাশের যত ভদ্রলোকে /টেডি পোশাক পরছে সবে/পকেট রাখে শার্টের কানি।/জোড় আসনে বসতে গেলে বিপদে পরি ॥/আর ভাই রে নতুন মানুষ নয়ারি কারবার/সকল কিছুর হাল ফ্যাশান/সত্য যুগের নাই কোন কারবার।/ওরে টেডি কুলি মুজুর যত/ভদ্রলোক দখল করল/আর বা কত দেখাব বাহার।/ওরে সবেই বলে গরীব লোকে চুরি করে পেটের দায়ে/মিথ্যা কেনে দোষ তারে/শুট কোট চশমাদারী চোরেরই সর্দার ॥/হায় ঢাকার ইনভার্সিটির ছাত্র বন্ধুগণ/এবার তারা হয় চেতন/চোরের দলকে করতে চায় দমন।/তাই দেইখা মোনায়েম খানের/শিশু-সাবক ফেলিয়া থুইয়া/রাজ্য ছাইড়া যায় পালাইয়া।/মুরগী ছাড়া বাচ্চা যেমন/সব চোরেরা করছে তেমন/দ্যাশের মাথায় দিয়াবারি/সকল টাকা কইরা চুরি/সেই কারণে কতক চোরে ছাড়ল ঘরবাড়ি ॥/হায় ছাত্র কত লোকের বাড়ি দেয় পুইড়ে/কারো মারে পাড়ায়ে/কতক চোরের কান ধইরা টানে।/তখন চতুর চোর ছিল যারা/এসডিওর আশ্রয় নিল তারা/স্ত্রী পুত্রর মায়া ত্যাগ কইরে।/কত চোরে প্রাণের ভয়ে ছাত্রের দলে মিশে যাইয়্যে/তারা গোপন কথা দেয় বলিয়্যে/তাই ছাত্র যাইয়া কত অফিস দিল পুইড়ে ॥/আর ভাই রে পুলিশ লোকে গুলি দেয় ছাইড়ে/তাতে কত ছাত্র যায় মইরে/তারা শহীদ হইল দ্যাশের কারণে।/ওরে তবু তারা ভয় না করে/রাইফেলের ভয়ও কিছুই না করে/বেইমানের দল দ্যাশে রাখব না।/ওরে তারাই হরতা তারাই করতা/রাজ সরকারের ধার ধারে না/করে আইয়ুবের নিন্দা চর্চা/সেই কারণে মারশাললো আইন করিলেন জারি ॥/আর ভাই রে আমির সরকার সেই কথা বলে/তোমরা নিজেই কেন বিচার নিলে/মিশলে না ক্যানে সরকারের শনে।/ইবার করায় কান্তি হিসাব কইরে/আইন মত দণ্ড ধইরে/লাভে মূলে লও বাহির কইরে।/চোরের দালান কোঠা যত আছে/সব বেচিয়ে দিতে হবে/থাকবো না ভাই ঘড়ি হাতে/যেমন কামলা ছিলা পূর্বে সে রকমই হবে ॥[৪৯৬]

(২)

আর ভাই রে আল্লাহ বল দিন বইয়া যায়/নিরাকারে পরওয়ার জাহের বাতেন লাগছে সোমাচার/ওরে আঠারো হাজার আলেম পয়দা/করছে আল্লাহ আপে খোদা/জাতের বিচার করছে চমেৎকার।/ওরে সারা বিশ্বের রাজা হয়ে কোরআনের আইন দিয়ে/হক বিচার কইরা চল বলছে পরওয়ার ॥/আর ভাই রে মারশাললো আইন করছে জারি/কেউ কইরো বেঈমানি/ধার ধাইরও না উকিল মুক্তারের।/তিন তারিখে মামলা শেষ ভাই/জেল খাটায় দিন চারি/জমিরানা আর বেতের বাড়ি।/খাটপোনা ভাই ধনি মানি টাকার করবা বাহাদুরি/আইন কইল মেলেটারির/হালাল রুজি কইরা খাইও দেল কইরা খাঁটি ॥/আর ভাই রে হালাল রুজি কতই শিখাইছি/পরের মাথায় দিয়া বাড়ি/নিজের কার্য সাধন করি।/ওরে যখন পাইলাম পাকিস্তান/সাত কোটি টাকা আয় ছিল তফিল।/সাত কোটি টাকা আয় থুইয়া/জিন্নাহ সাহেব গেলেন চইলা/চোরের দল সুযোগ পাইয়্যে/নিজের তফিল পুরা করে/দ্যাশের মাথায় পরে বাড়ি ॥/আর ভাই রে ফিরোজ খান নুন ছিল/গরমেনের খোঁজ রাখিল/তাহার ঘরে চুরি

গেছে চল্লিশ হাজার মণ গম।/ওরে ইসকান্দার মির্জা ছিল/দিশা পাইয়া পালাইয়া গেল/আবু মোনছের বড় মারছেন ছিল/সোয়া লাখ টাকা ব্যাটা চুরি করিয়া /হাজতে আছে বসিয়া।/সব মন্ত্রী একই দশা/ঘুষের কথা মুখে আনলে কাটব তার মাথা ॥/আর ভাই রে আইয়ুব খান আর কাইয়ুম খান/পশ্চিমবঙ্গের বসত স্থান /ধন্য মাতার গর্ভে দুই সন্তান।/ওরে ভাগ্য গুণে আইয়ুব খান/পাইল সামরিক শাসনের ভার/ সারা বিশ্ব হইয়া কম্পমান।/সকল চোরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া /নিজ হস্তে নেয় শাসনের ভার/সত্য যুগ আইল ইবার/কত লোক হাজতে যায় হিসাবের বেলায় ॥/আর ভাই রে আইয়ুব খানের নাম শাসন শুইনে/ঘুমে থোনে চুইমকা ওঠে/ক্যাম্পাসের দল কোথায় লুকাইছে।/অধম আমির সরকার ভাইবা বলে/এতোকাল কোথায় ছিলে/সোনার তরি ডুবলো সাগরে।/ওরে ডুবাতরীর মাঝি হইয়া/সাগর দিয়া যাইও বাইয়া/দ্যাশের লোক দেখুক চাইয়া/আইয়ুব খানের ডুবাতরী লাগাও কিনারে ॥[৪৯৭]

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজম উদ্দিন। তিনি মানুষের সমর্থনকে দেশের প্রধান মন্ত্রী হয়ে দূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। জনগণকে রীতিমত শোষণ করে, টাকা উপার্জন করে, নিজের জন্য বাড়ি গাড়ি তৈরি করেছিলেন। তার কাছে মানুষ শোষিত হয়ে মানুষ তার প্রতি ক্ষেপে গিয়ে প্রতিবাদ করেছিল। তার মন্ত্রীত্ব পদটি বাদ দেওয়ার জন্য জনগণ বলেছিলেন। তাও পাই টাঙ্গাইলের লোকগীতিতে। যেমন–

আর ভাই রে আমির আলী আইলো সভাতে/আমি বলি দশের হুজুরে/মিটিংয়েতে যাই প্রকাশ কইরে/আমির আলী মুর্খ্যমতি বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই ধরে ॥/আরেক ব্যাটা আইলো নাজিম উদ্দিন/ব্যাটা লেকছার দেয় গলি গলি/তোমা গরে নেব কোলে তুলি।/সব পাবলিকে যুক্তি কইরা//ব্যাটারে বানাইলো দ্যাশের প্রধান মন্ত্রী/ওরে সিংহাসনের বসলো যাইয়া দেখ সে যাইয়া করাচী ॥/আর ভাই রে ট্যাকার ভান্ডার পড়লো যাইয়া তার হাতে/একটা বিল্ডিং সাজায় ঢাকাতে/আমেরিকার কামিলকর আইনে/তিন তালা এক বিল্ডিং দেয় ভাই/এমুন একটা সিঁড়ি রাখছে তার মোইদ্দে/টেকসি মোটর লইয়া ব্যাটায় চইলা যায় উপর তালাতে ॥/আর ভাই রে সেই কারণে ব্যাটার তফিল পড়লো ঘাটতি/টাকার উপায় করে কি টাস্কো বসায় উপরে চাষীর ছাগল-ভেড়া, গরু-বাছুর নাইলা ক্ষেতের/তামাকের দেও টাস্কোডি/ও হায় সুপারি গাছের দিবেন টাস্কো/তা না হলে নাই ছাড়াছাড়ি ॥/আর ভাই রে সেই খবরটি শুনলো সি.আই.ডি./অমনি চইলা গেল করাচী মিটিংগেতে যাই প্রকাশ কইরে/ ও হায় দশ লাখ টাকা দিবেন মোরে/কাশ্মিরটা দিব ছাড়িয়ে ॥/আর বেটা চইলা গেল হিন্দুস্তানেতে/আমি বলি দশের হুজুরে/মিটিংগেতে যাই প্রকাশ কইরে।/দিল্লি থনে টেলিগ্রাফ কইরে/আনলো রে ভাই নাজিম উদ্দিনের রে করাচী/জাফর উল্যা সরকার উইঠা বলে/মন্ত্রী তুমি যাও রিজাইন দিয়ে ॥[৪৯৮]

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাক ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে ‘শিয়ালকোট’ নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলিষ্ট নেতৃত্ব দান করেন। কিন্তু শিয়ালকোটে সে সময় আধুনিক অস্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। তবু আইয়ুব খান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এই যুদ্ধের ধাক্কা এসে টাঙ্গাইলে লাগে। তখন টাঙ্গাইলের চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ যুদ্ধের নাম করে সাধারণ লোকদের নিকট থেকে টাকা পয়সা নিয়ে নিজেরাই আত্মসাৎ করে। এই ঘটনায় টাঙ্গাইলের লোক কবিরাও বসে থাকে নি। তারা ধুয়া গান রচনা করে বিষয়টি সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার করে। এমন একটি ধুয়া গান নিম্নরূপ-

আমি বইসা নদীর কূলে/চিন্তা করি রাত্রি দিনে/অজগবী এক তুফান ওঠে দরিয়ার উপরে/দেশটি টলমল করে/ওরে কত নৌকা ভাইসা বেড়ায় দরিয়ার উপরে/তারা ডাকছে আল্লাহ বলে/যে নায়ের মাঝি ভালা গো/সে কইল যায় কিনারে ॥/ভাই রে ইণ্ডিয়ার শয়তানে একটা সুযোগ নিল করে/গোপনেতে তৈয়ার হইল যুদ্ধের কারণে/উঠল সারা পাকিস্তানে/এমন কোন শক্তি নাই রে দাঁড়ায় তার সামনে/অস্ত্র নাই রে পাকিস্তানে/জঙ্গি বিমান টেংনরী গো সাজায় শতে শতে ॥/ছয়শ টেং চলে মাটিতে /কত কামান ফিট করিয়া/উপর দিয়া জঙ্গি বিমান/এটম বোম লইয়া চলে বিষম বিক্রমে।/ওরে এমন কোন শক্তি নাই রে দাঁড়ায় তার সামনে/অস্ত্র নাই রে শিয়ালকোটে/আমার রাষ্ট্র নেতা আইয়ুব সরকার গো/দাঁড়ায় বুক ফুলাইয়ে ॥/আরো কত মায়ের পুত/দেখ পাষাণ তাদের বুক/পিষ্ঠ পরে বোমা লইয়া পরিল মাটিতে/ধ্বংস করিব তাহারে/হাসতে হাসতে জীবন দিল রাষ্ট্রের কারণে।/চিন্তা ছিল না তার মনে/নিজের জীবন দান করিয়া গো স্বাধীন রক্ষা করে ॥/তারা নিজের জীবন দিয়ে দ্যাশের স্বাধীনতা রক্ষা করে/কত চেয়ারম্যান আর মেম্বারগণে সুযোগ নিল করে/মোদের মাথায় বাড়ি দিয়ে/ওরে যুদ্ধের খরচ দিব

বোলে চান্দা আদায় করে/খাইল তারা নিজেরাই মজা মাইরে/ও যার বউয়ে খাইছে বাসন ডইলা গো/সে কইল ঘড়ি বান্দে ॥/ও তাই আমির সরকার বলে যত বাবু ভাই সকলে/লায়লাহা কলেমা সদায় পড় দমে দমে/বালা থাকবো তোর ঘাড়ে
ওরে এক নিরিকে হাইল ধর ভাই পানির দিকে চাইয়ে/মওলা যদি দয়া করে/শত তুফান পাড়ি দিয়া গো নৌকা যায় কিনারে॥[৪৯৯]

ষাটের দশক ছিল এক উত্তাল দশক। গণআন্দোলন ও রাজনৈতিক তোলপাড়ের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনেও নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে প্রথম থেকেই বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আক্রমণ এসেছিল। পঞ্চাশের দশকেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। ষাটের দশকে তা আরও তীব্র হয় এবং দেশকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়।[৫০০]

উপসংহার

পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থায় প্রথম থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মদের ওপর জেল ও জুলুম নেমে আসে। পাকিস্তানপন্থিরা বাঙালিদের সামন্তযুগীয় গতানুগতিক ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কার ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাগুলোর পরিবর্তন চাচ্ছিলেন না।[৫০১] তারা শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বরং চেয়েছিলেন পুরোনো ধারার সংস্কৃতি তথা চিন্তাধারার প্রবহমানতা।

সংগীত-নৃত্য-অভিনয়-অঙ্কনের বিভিন্ন ধারা গতিশীল সংস্কৃতি চর্চার অফুরন্ত অবকাশ দরকার হলেও সরকারের নিষেধাজ্ঞা ও সাবধানতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, বাঙালি সংস্কৃতি ও গণ-সংস্কৃতির চর্চা গণ্য হত রীতিমতো 'কমিউনিস্ট কার্যাবলী' হিসেবে। আর 'ভারতীয় দালাল' এবং 'পাকিস্তানের শত্রু', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ছাড়া বাংলা সংস্কৃতির চর্চা যে কেউ করতে পারেন, তা ছিল তখন সরকারি বিবেচনায় অসম্ভব ও অভাবনীয়। সরকার-সমর্থক, সাম্প্রদায়িক, উগ্র পাকিস্তানবাদী কবি-সাহিত্যিকেরাও জাতীয় স্বার্থের প্রতিপক্ষে হিসেবে দাঁড়ায়।[৫০২]

বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। বাঙালি মুসলমান ধর্মীয় নৈতিকভাবে উদার। মস্‌জিদের পাশে দেবমন্দিরের ঘন্টাও বাজিত, মহরম, ঈদ, শবেবরাত প্রভৃতির পাশে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলতো।[৫০৩] সে যেমন নামাজ পড়ে আবার ১লা বৈশাখ পালন করে। যখন দেখা গেল যে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত আসে। তখন বাঙালি আবার রুখে দাঁড়ালো। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আমরা সংস্কৃতিই বলব। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালির আত্মত্যাগ করার পরেও শাসকগোষ্ঠী ২১ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনভাবে পালন করতে পারেনি। বাঙালি তাদের নিজস্ব আত্মত্যাগের মহিমাকেও উদ্‌যাপন করতে পারে না। এরপর শাসকগোষ্ঠী এখানে নববর্ষকে উদ্‌যাপন করতে বাধা দিলো। রবীন্দ্রনাথ হলো বাঙালি সংস্কৃতির গর্ব। সেই রবীন্দ্রনাথের গান ও শতবর্ষ উদ্‌যাপন করতে দেওয়া হচ্ছিল না। এটা বাঙালির মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এখানে একটা তাবেদার শ্রেণি তৈরি পাকিস্তানবাদী সাহিত্যসৃষ্টির জন্য উঠে পরে লাগলেন।

সংস্কৃতির একটা নিজস্বে শক্তি আছে। এখানকার সংস্কৃতির সেই শক্তি ছিল। কিন্ত আমরা বাঙালিরা সে সম্পর্কে পূর্বে অবগত ছিলামনা। রূপবান সিনেমার মধ্যদিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পালাম আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি লোককাহিনির একটি বিরাট শক্তি আছে। অথচ আমরা বুঝতেই পারি নাই যে লোককাহিনি আমাদের কত বড়ো শক্তি। রূপবান কাহিনি নিয়ে যখন সিনেমা করা হলো, তখন তার শক্তি বোঝা গেল। মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর আগে জহির রায়হানের মতো যারা পরিচালকরাও উর্দুতে সিনেমা তৈরি করতো। আমরা যখন বুঝতে পারলাম এখানে উপাদানের অভাব নাই। অর্থাৎ আমার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আমার নিজের শক্তি এই যে আস্তে আস্তে বোধের উদ্ভব ঘটল। অর্থাৎ বাঙালি নিজের সংস্কৃতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল এবং তার ঐতিহ্য রক্ষার জন্য লড়াই শুরু করে।

পূর্ব বাংলার মানুষের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশসহ প্রায় দুই যুগব্যাপী মুক্তিসংগ্রামে সংস্কৃতির হাতিয়ার হাতে প্রবল সোচ্চার ছিলেন বাঙালি সংস্কৃতিকর্মী, সাহিত্যসেবী ও বুদ্ধিজীবীরা। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি সূত্রে গাঁথা। কখনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকর্মীরা বিচ্যুত হয়নি বরং মুক্তিসংগ্রামকে গতিশীল করেছেন। তাই, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল ধারায় কখনো পাকিস্তানবাদ বা রক্ষণশীল ধারা স্থায়ীভাবে দাঁড়াতে পারেনি। আমাদের দেশের রাজনীতি সবসময় সাংস্কৃতিক

আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন পথ প্রদর্শন করেছে কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। এ প্রসঙ্গে কামাল লোহানী ৬২-এর আন্দোলনের উদাহরণ দিয়ে বলেন, '৬২ এর আন্দোলনে ৯ নেতা বিবৃতি দিলে তাদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তখনও সাংস্কৃতিক কর্মীরা রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যায়। সাংস্কৃতিক কর্মীদের ত্যাগ এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়।'[৫০৪]

১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে। আর এই তেইশ বছর ধরেই চলেছে একই বিতর্ক হয়েছে কিন্তু এ থেকে উত্তরণ ঘটেনি মূলত সততা ও আন্তরিকতার অভাবে। যুদ্ধের মধ্যদিয়ে পরাজিত না-হওয়া পর্যন্ত যুক্তির পরাজয় কেউ মানতে চাননি।[৫০৫] পাকিস্তানি শাসনামালে লেখকগোষ্ঠী দুই দলে বিভক্ত ছিলেন–'সাম্প্রদায়িক' ও 'অসাম্প্রদায়িক'।[৫০৬]

রক্ষণশীল ধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল বাঙালি সংস্কৃতির বিপরীতে পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির স্ফুরণ ঘটানো এবং সেই চেতনার আলোকে সাহিত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তোলা। তাই সে আদর্শ হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার বাঙালি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরশাসকরা সুপরিকল্পিতভাবে একের পর এক বাঙালি জাতিসত্তা, বাঙালি সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলচর্চার ওপর আঘাত হানতে থাকে। আর একদল পাকিস্তানমনস্ক বুদ্ধিজীবী ও রক্ষণশীল সংস্কৃতিসেবী আগাগোড়া পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রয়াসকে সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা জানিয়েছেন। বস্তুত বাঙালিকে তার উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার জায়গা থেকে 'একান্ত মুসলমান আর পাকিস্তানি করবার' জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ছিল বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেওয়ার এবং এক ধর্মের দোহাই দিয়ে তথাকথিত পাকিস্তানি তমদ্দুন সৃষ্টির। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংগ্রাম ছিল এদের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধেই।[৫০৭]

পাকিস্তানের তরুণদের মনে ইসলামী আদর্শ ও সাম্যবাদী আদর্শের যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরাজ করছে সে বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে আহমদ শরীফ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে 'তন্ত্রসঙ্কট' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন এর যথাযোগ্য সমাধানের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

> আজ পাকিস্তানের মনীষীদের সম্মুখে এই যে আদর্শ সংঘাত এই যে তন্ত্রসঙ্কট দেখা দিয়েছে, এর সুষ্ঠু সমাধানের ওপরই ব্যক্তির সমাজের জাতির এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। শিল্পে সাহিত্যে সমাজে রাষ্ট্রে এই আদর্শ সঙ্কট মারাত্মকরূপে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যার সমাধান ব্যতীত সমাজ-মাসনের বিশৃঙ্খল দূর হইবে না। আমাদের দিশা দেবার দায়িত্ব আমাদের চিন্তানায়কদের। সুতরা তাদের নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে না। আলোর মশাল তুলে ধরতে হবে।[৫০৮]

শেষ পর্যন্ত তাঁরা পথ নির্দেশ করতে সংক্ষম হয়েছিল বলেই আজ আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। অর্থাৎ ষাটের দশকে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ হয় তার ভিত হলো পঞ্চাশের দশকের সাহিত্যে ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মেলনসমূহ। ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা অসংখ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সম্মেলন। এই সংগঠন ও সম্মেলন বাঙালির মানস গড়ে তোলে এবং তারা যে স্বতন্ত্র্য একটি জাতি ও তাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে তা মনে করে দেয়। এই সংগঠন ও সম্মেলন একটি পাটাতন গড়ে তোলে যার ওপর ভিত্তি করে বাঙালি অগ্রসর হয় নিজেদের মুক্তির জন্য। ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সাড়াদেশে জনগণকে জাগিয়ে তোলা হয়। কেন্দ্র যেমন প্রান্তকে প্রভাবিত করে, তেমনি প্রান্তও কেন্দ্রকে প্রভাবিত করে করে। এভাবে মিলিতভাবে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে যা দেশকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকাভাষ্য

[১] মফিদুল হক, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং শিল্পী-সংস্কৃতিসমাজের ভূমিকা', অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (প্রথম পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৫০

[২] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বর্ষে বিজয় দিবস উদযাপন কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ৩৩-৩৪

[৩] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, নবজীবন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৯৮

[৪] ওয়াহিদুল হক, 'পুরনো সেই দিনের কথা', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা*, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

[৫] মামুনুর রশীদ, 'মুক্তনাটক : জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা', রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৩২

[৬] *প্রাগুক্ত*

[৭] মযহারুল ইসলাম, *সাহিত্য পথে*, গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬০, পৃ. ১৪৪-১৪৫

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

[৯] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

[১১] মযহারুল ইসলাম, *সাহিত্য পথে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬-১৪৭

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭

[১৩] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮

[১৪] মযহারুল ইসলাম, *সাহিত্য পথে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮-১৫৯

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬-১৫৭

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১

[১৭] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালায় কেউ তসবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারে
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামনী চিনি কিসে রে।
জগৎ বেড়ে জেতের কথঅ,
লোকে গৌরব করে যথা তথা
লালর সে জেতের ফাতা ঘুচিয়াছে সাধ বাজারে।

[১৯] *প্রাগুক্ত*

[২০] *প্রাগুক্ত*

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[২২] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১

[২৪] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

[২৫] শামসুজ্জামান খান, 'বাংলার জাগরণে লোকায়ত দর্শন ও লোকজ সংস্কৃতির ভূমিকা', *জাগারণ ও অভ্যুদয়*, স্বরোচিত সরকার (সম্পা.), আইবিএস সেমিনার ভলিউম ১১, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২১৭
[২৬] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[২৭] আহম্মেদ শরীফ, *বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৭-৪৮
[২৮] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
[২৯] মুনতাসীর মামুন, *রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আমাদের হলেন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৯
[৩০] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩২২
[৩১] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৭৩
[৩২] সৈয়দ আলী আহসান, *যখন সময় এল*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ভূমিকা
[৩৩] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১২
[৩৪] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, ঢাকা, প্রথম জার্নিম্যান বুক্স সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ৬৮
[৩৫] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (১৯৪০-১৯৮২), অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬
[৩৬] মুনতাসীর মামুন (বক্তৃতা), 'শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকবক্তৃতা', ডাব্লিউভিএ, ২৬ জুন ২০১৫
[৩৭] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩
[৩৮] মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলার চিন্তাচর্চা : ১৯৪৭-১৯৭১ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৭
[৩৯] *প্রাগুক্ত*
[৪০] মযহারুল ইসলাম, *সাহিত্য পথে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১
[৪১] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
[৪২] আবদুল গণি হাজারী, 'সাহিত্যে বিপন্নবাদ', *মাসিক সওগাত*, অগ্রাহয়ণ, ১৩৫৯
[৪৩] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[৪৪] *প্রাগুক্ত*
[৪৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
[৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫
[৪৭] *প্রাগুক্ত*
[৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬
[৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭
[৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
[৫১] আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ. ৩০০-৩০২
[৫২] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬
[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
[৫৪] যেসব নাটক এ সংগঠন মঞ্চায়ন করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য–*জবানবন্দী* (বিজন ভট্টাচার্য), *পথিক* (তুলসী লাহিড়ী), এবং *কবয়* (বনফুল)। এসব নাটক ছিল অসাম্প্রদায়িকতা, মানবতা ও গণ-চেতনার পক্ষে। সংগঠনের সদস্যরা নিজেরা কোনো নাটক রচনার উদ্যোগ নেননি।*১
*১ মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৫৮
[৫৫] *প্রাগুক্ত*
[৫৬] আনিসুজ্জামান, 'সংস্কৃতি সংসদের কথা', হামিদ কায়সার অপু (সম্পা.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন '৮৯ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা, ঢাকা, ১৯৮৯
[৫৭] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
[৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
[৫৯] সভাপতি : ড. কাজী মোতার হোসেন; সহ-সভাপতি : বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক খান সরওয়ার মুর্শেদ, আবদুল গণি হাজারী, মুস্তাফা নূরুউল ইসলাম; সাধারণ সম্পাদক : ফয়েজ আহমদ; সহ-সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর; বিভাগীয় সম্পাদক : আলাউদ্দীন আল আজাদ; ফজলে লোহানী (সাহিত্য); আবদুল্লাহ আল মুহীত (বিজ্ঞান); আমিনুল

ইসলাম (চিত্রকলা); এম আর আখতার (প্রচার); সদস্য : শামসুর রাহমান, আনিস চৌধুরী, দৌলতন নেসা খাতুন, লায়লা সামাদ, সরদার জয়েনউদ্দীন, আতাউর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, শেখ লুৎফর রহমান।*১

*১ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[৬০] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি* অখণ্ড সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২১৩

[৬১] মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[৬২] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

[৬৩] *প্রাগুক্ত*

[৬৪] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, 'হাসানের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়', হাসান হাফিজুর রহমান (স্মারক গ্রন্থ), খালেদ খালেদুর রহমান (সম্পা.) জুন ১৯৮৩, পৃ. ১৮-১৯; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮

[৬৫] নাসিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমাদের এই যোগাযোগ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের এক স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিলো। আমরা 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গড়ে তুললাম সেই ১৯৫২ সনেই। প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রথম সংগঠন নাসিরউদ্দীন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হলো। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব (১৮৯৭-১৯৮১, প্রথমাবধি) সভাপতি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, বেগম সুফয়া কামাল, অজিত কুমার গুহ, কামরুল হাসান, মুনীর চৌধুরী, আবদুল গণি হাজারী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফয়েজ আহমদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আতোয়ার রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, খালেদ চৌধুরী, লায়লা সামাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লআহ প্রমুখ এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে সক্রিয় হলে উঠলেন।... সেই সময়ে সাহিত্য সভায় প্রতিটিতেই প্রায় দুশো আড়াইশো লোক জমায়েত হতেন।...নাসিরউদ্দীন সাহেবের কাছে এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস অশেষ ঋণী। *

* মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, 'হাসানের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়', হাসান হাফিজুর রহমান (স্মারক গ্রন্থ), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

[৬৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

[৬৭] এর প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতান 'পুঁথিপত্র প্রকাশনী'র সৃষ্টি করে প্রগতিশীল পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের যে সুযোগ ঘটান, তাতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মুখপত্রের প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল।*

*মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[৬৮] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[৬৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

[৭০] আনিসুজ্জামান, *বাংলা একাডেমি ও আমাদের সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা ৩রা ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ৪

[৭১] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[৭২] ৫ ডিসেম্বর, রবিবার, অভ্যর্থনা সমিতির একটি সভায় সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা এবং শাখা সভাপতি সম্পর্কে বৈঠকটিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

অভ্যর্থনা- হাবিবুল্লাহ বাহার
মূল-ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ
কাব্য-জসিমুদ্দীন
শিশু সাহিত্য- বেগম শামসুন্নাহার
ভাষা বিজ্ঞান- আবুল হাসনাৎ
ইতিহাস- অধ্যক্ষ শরফুদ্দীন
পুথি সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি- ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী
বিজ্ঞান- ডক্টর এস. আর. খাস্তগীর
চিকিৎসাবিজ্ঞান- ডক্টর আবদুল ওয়াহেদ
শিক্ষা- অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ।

বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ১, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৭১

[৭৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

[৭৪] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭
[৭৫] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০
[৭৬] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড সংস্করণ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২
[৭৭] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২
[৭৮] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড সংস্করণ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২
[৭৯] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২
[৮০] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
[৮১] *আজাদ*, ১ জানুয়ারি ১৯৪৯; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭-২৮৮
[৮২] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬
[৮৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫
[৮৪] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮-২৮৯
[৮৫] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, পৃ. ৭১
[৮৬] *আজাদ*, ১ জানুয়ারি ১৯৪৯; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮
[৮৭] রফিকুল ইসলাম, 'সাংস্কৃতিক মুক্তিযুদ্ধ', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ মার্চ ১৯৯৭ (স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা); বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯
[৮৮] আজাদ, ৩ জানুয়ারি ১৯৪৯; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯
[৮৯] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯-২৯০
[৯০] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[৯১] মুনীর চৌধুরী, *বাংলা গদ্যরীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৬০; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, ২৯০-২৯১
[৯২] বশীর আল্‌হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭৪০
[৯৩] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[৯৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
[৯৫] মাহবুবউল আল চৌধুরী, *সাংস্কৃতিক আন্দোলন চট্টগ্রাম; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দেলন : প্রগতিশীল ধারা*, মাহবুব হাসান (সম্পা.), চট্টগ্রাম, ১৯৯১, পৃ. ৮; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[৯৬] মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম : রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৪০২, পৃ. ২৫
[৯৭] মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম : রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
[৯৮] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[৯৯] *প্রাগুক্ত*
[১০০] মাহবুব আলম চৌধুরী, *সংস্কৃতি : জাতীয় মুখশ্রী*, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ১৯
[১০১] ইসরাইল খান, 'সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাহিত্য-সম্মেলন', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *সুন্দরম*, শীত সংখ্যা, ১৪০২, পৃ. ৭৬; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, ৫৮
[১০২] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৬০
[১০৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬১
[১০৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
[১০৫] মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৮-৩৯
[১০৬] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তির সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৩
[১০৭] *প্রাগুক্ত*
[১০৮] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৮৭-১৯১
[১০৯] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তির সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
[১১০] প্রগতি মজলিসের সভাপতি ছিলেন–অজিতনাথ নন্দী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমদ ও আসহাবউদ্দীন আহমদ, সম্পাদক নূরুন্নবী। প্রধান সংগঠক জালাল উদ্দিন সানু।*
* মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮

[111] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[112] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
[113] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১-১২২
[114] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২
[115] *প্রাগুক্ত*
[116] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫
[117] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[118] *প্রাগুক্ত*
[119] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৭
[120] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪
[121] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[122] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪-২৯৫
[123] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[124] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২০২-২০৩
[125] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[126] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫
[127] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৪
[128] মামুন সিদ্দিকী, *ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৮
[129] *প্রাগুক্ত*
[130] *প্রাগুক্ত*
[131] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'সিলহেটে সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫৩, সাহিত্য বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ', *বাংলার সাহিত্য সম্মেলন*, খান মাহবুব, একাত্তর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৯১-৯২
[132] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[133] মামুন সিদ্দিকী, *ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯
[134] রফিকুল ইসলাম, 'সাংস্কৃতিক মুক্তিযুদ্ধ', দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মার্চ ১৯৯৭
[135] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[136] *প্রাগুক্ত*
[137] মামুন সিদ্দিকী, *ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯
[138] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[139] মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৪০২, পৃ. ২৭
[140] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৭
[141] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[142] মাহমুদ নূরুল হুদা, *আমার জীবনস্মৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৯
[143] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪
[144] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১
[145] মাহফুজুর রহমান, *পূর্ববাংলায় নৃত্যকলা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১০২
[146] মাহফুজুর রহমান, *পূর্ববাংলায় নৃত্যকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
[147] মাহফুজুর রহমান, *পূর্ববাংলায় নৃত্যকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
[148] বিবৃতিতে সাক্ষর দান করেন, লায়লা আরজুমান্দ বানু, আফসারী খানম, আতীকুল ইসলাম, ফেরদৌসী রহমান, মুস্তফা জামান আব্বাসী, গোলাম মোস্তফা, হাসান ইমাম, জাহেদুর রহিম, আলতাফ মাহমুদ, লায়লা হাসান, রাহিজা খানম, বিলকিস, নাসিরুদ্দিন, হামিদা আতিক, অজিদ রায়, বেদারুদ্দিন আহমেদ, ফজলুল হক, ওয়াহিদুল হক, সৈয়দ আহমেদ হোসেন, আবদুল বাতিন ও এম এ হানিফ।*১

*১*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৭১

[149] মামুন সিদ্দিকী, *ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

[১৫০] *প্রাগুক্ত*
[১৫১] রহমান চৌধুরী, 'বাংলাদেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের নাট্য চর্চা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রত্রিকা*, ডিসেম্বর, ২০০২, বিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা পৃ. ২৯
[১৫২] ওবায়দুল হক সরকার, 'নাট্য আন্দোলনের স্মরণীয় দিন', *দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯২
[১৫৩] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫
[১৫৪] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৫
[১৫৫] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫
[১৫৬] মহসিন শস্ত্রপাণি, 'কাগমারী সম্মেলন : পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্য', মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.) *কাগমারী সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ*, কাগামারী সম্মেলনের ৫০ বর্ষ পূর্তি কমিটি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৫; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০
[১৫৭] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২
[১৫৮] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০
[১৫৯] *সংবাদ*, ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১
[১৬০] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১
[১৬১] *প্রাগুক্ত*
[১৬২] *প্রাগুক্ত*
[১৬৩] দলিলপত্র : প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬০১; আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭
[১৬৪] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[১৬৫] খান মাহবুব, *বাংলার সাহিত্য সম্মেলন*, একাত্তর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৫১
[১৬৬] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[১৬৭] *প্রাগুক্ত*
[১৬৮] *আজাদ*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ (সম্পাদকীয়); বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩
[১৬৯] *আজাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ (সম্পাদকীয়); বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*
[১৭০] *আজাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ (সম্পাদকীয়); বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*
[১৭১] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩
[১৭২] *প্রাগুক্ত*
[১৭৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬
[১৭৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২
[১৭৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭
[১৭৬] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭
[১৭৭] উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠনগুলো হলো–তমদ্দুন মজলিশ, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, পাক-বাংলা সাহিত্য মহফিল, শিল্প-সংস্কৃতি পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চলীয় কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস সমিতি, বিক্রমপুর সাংস্কৃতিক পরিষদ, গেণ্ডারিয়া কালচারাল ক্লাব, পাকিস্তান ছাত্রশক্তি, ছাত্রী পরিষদ, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রভৃতি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠন।
বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬
[১৭৮] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫
[১৭৯] ২৯ মার্চ তারিখের আলোচনা অনুষ্ঠানে ঢাকার খ্যাত ও অখ্যাত বেশ কয়েকজন লেখক-বুদ্ধিজীবী অংশ নেন। তাঁরা হলেন–আব্দুল মওদুদ, মোস্তাফিজু রহমান, অধ্যাপক আসকার ইবনে শাইখ, ড. মুহম্মদ ইসহাক, ড. মফিজুল্লাহ কবির, অধ্যাপক তোফাজ্জুল হোসেন, আলীম আল্ রাজী, আবদুল হক, মওলানা মহিউদ্দিন খান প্রমুখ। এদিন সভাপতির ভাষণে মোহাম্মদ ইব্রাহীম বলেন, 'যে আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসমূহের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশত বীর মুজাহিদগণ অকাতরে রক্তদান করেছেন তারা প্রতি আজো যদি আমরা উদাসীন থাকি তবে আমাদের নবলব্ধ রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। প্রথম দিনের সাহিত্য সভা পর্বে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এগুলো হলো–আবদুল মওদুদের 'সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা', মওলানা মোস্তাফিজুর রহমানের 'মুজাহিদীন', অধ্যাপক আসকার ইবনে শাইখ-এর 'শহীদ তিতুমির', অধ্যাপক আবু তালিবের 'আযাদী আন্দোলনে বাঙালী মুসলমান', অধ্যাপক আকবর উদ্দীনের 'আযাদী সংগ্রাম', ড. মফিজুল্লাহ কবির-এর 'আঠারো'শ সাতান্ন আন্দোলনের অগ্রণীদল', অধ্যাপক খন্দকার তোফাজ্জল হোসেনের 'সিপাহী বিপ্লবের অর্থনৈতিক পটভূমি', আবদুল হকের, 'আযাদী সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা'।*১

*১রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮-২৪১

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের (৩০ মার্চ, '৫৭) সাহিত্য অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ। এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন ড. হাসান জামান, ড. আহমদ হাসান দানী, ড. আবুল হাসান, আবুল হাশিম, ড. গোলাম আহম্মদ চৌধুরী, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সিরাজুল হক প্রমুখ। তাঁদের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলো হলো–ড. হাসান জামানের 'সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিকা', বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের 'আযাদী সংগ্রামে নারী', ড. আব্দুল আজিজের 'মুসলিম রেনেসাঁয় সৈয়দ আহম্মদের অবদান', ড. কাজী দীন মুহম্মদ-এর 'বাংলা সাহিত্যে জাতীয় জাতীয় চেতনা', এ কে এম আমিনুল ইসলামের 'শতাব্দী পরিক্রমা', অধাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুররি 'উনিশ শ থেকে ছত্রিশ' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কবি-সম্মেলন এবং সিপাহি বিপ্লব ও শহীদদের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর। এই পর্বে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বেগম সুফিয়া কামাল, বেনজির আহমদ, আহসান হাবীব, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল হাই মাশরেকী, আজিজুর রহমান, জাগানারা আরজু, মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ প্রমুখ।

তৃতীয় ও শেষ দিনের (৩১ মার্চ, '৫৭) সাহিত্য অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলো ছিল–অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফের 'পাক-ভারতে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন', কবি আব্দুল কাদিরের 'আযাদী সংগ্রাম : ১৮৫৭', আবদুল গফুরের 'পাকিস্তান আন্দোলন', আজিজুর রহমানের 'বিপ্লবী আন্দোলনে দক্ষিণ বঙ্গের অবদান' ইত্যাদি।*২

*২বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬-২৯৭

[১৮০] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫

[১৮১] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪

[১৮২] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

[১৮৩] রফিকুল ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৭

[১৮৪] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪

[১৮৫] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[১৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

[১৮৭] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৯

[১৮৮] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

[১৮৯] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

[১৯০] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯; সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

[১৯১] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

[১৯২] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

[১৯৩] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

[১৯৪] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

[১৯৫] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১০১

[১৯৬] মনসুর মুসা (সম্পা.), *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১০৩

[১৯৭] *প্রাগুক্ত*

[১৯৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

[১৯৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

[২০০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

[২০১] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

[২০২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬

[২০৩] রফিকুল ইসলাম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা, ঐতিহ্য, ২০০৪, পৃ. ৪৮

[২০৪] 'সংস্কৃতি সংসদ এর সাথে আরও যারা জড়িত ছিলেন তারা হলেন–গিয়াসউদ্দীন আহমদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, মুজিবুর রহমান খান, রফিকুল ইসলাম, সানজীদা খাতুন, মোহাম্মাদ মনিরুজ্জামান, মমতাজউদ্দীন আহমদ, মকসুদউস সালেহীন, বজলুল করিম, শহীদ খান, জিয়া হায়দার, জহিরুল হক, আবদুল্লাহ আল মামুন, রামেন্দু মজুমদার, ফারুক আলমগীর, রশীদ হায়দার, আসাদ চৌধুরী, মুসা আহমদ, আতাউর রহমান, ফরিদা বারী মালিক, কামরুন্নাহার লাইলী, জহরত আরা খানম, ফাহমিদা খাতুন, মালেকা বেগম, ফেরদৌসী মজুমদার, সুলতানা রেবু প্রমুখ।'

আনিসুজ্জামান, *সংস্কৃতি সংসদের কথা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন' ৮৯ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা,সম্পাদক, হামিদ কায়সার অপু).

[২০৫] ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত খান সারওয়ার মুরশিদ (সভাপতি), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৫২-৫৩ পর্যন্ত মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সভাপতি), আলাউদ্দীন আল আজাদ (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৫৩-৫৪ পর্যন্ত আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (সভাপতি), রফিকুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত হাসান হাফিজুর রহমান (সভাপতি), আবদুস সাত্তার (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত সাখাওয়াত হোসেন (সভাপতি), জহির রায়হান (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত মোমিনুল হক (সভাপতি), খন্দকার আসাদুজ্জামান (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৫৭-৫৮ পর্যন্ত এনাম আহমদ চৌধুরী (সভাপতি), এনায়েতউল্লাহ খান (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৫৮-৫৯ পর্যন্ত জহির রায়হান (সভাপতি), মোহাম্মদ হোসেন (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত এনামুল হক (সভাপতি), কাজী জাফর আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৬২-৬৩ পর্যন্ত রফিকুল হক (সভাপতি), সাইফউদ্দীন আহমদ মানিক (সাধারণ সম্পাদক); ১৯৬৫-৬৬ পর্যন্ত আখলাকুর রহমান (সভাপতি), মুহম্মদ মুহাদ্দিস (সাধারণ সম্পাদক)।*

* রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন : ১৯৪৭-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

[২০৬] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১

[২০৭] ফারুক আলমগীর, *সংস্কৃতি সংসদ* (হেমন্ত, ১৩৭২), পৃ. ৬-৭

[২০৮] আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২২৯

[২০৯] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন : ১৯৪৭-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

[২১০] রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯-৫০

[২১১] মাহমুদ হাসান, 'সংস্কৃতি সংসদ: একটি ঐতিহ্য একটি আন্দোলন', *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর, ১৯৭০

[২১২] ফারুক আলমগীর, *সংস্কৃতি সংসদ* (হেমন্ত, ১৩৭২), পৃ. ৬-৭

[২১৩] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ৩৭২

[২১৪] আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'স্মৃতিময় সেই দিনগুলি', (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন' ৮৯,স্মরণিকা)

[২১৫] মাহমুদ হাসান, প্রাগুক্ত

[২১৬] ফারুক আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

[২১৭] ইসরাইল খান, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

[২১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[২১৯] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[২২০] আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীতে দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৯৩; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮

[২২১] *দৈনিক আজাদ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৫৮; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[২২২] *ঐ*, ১৩ মে ১৯৫৮; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮

[২২৩] *ঐ*, ২০ জুলাই ১৯৫৮; *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮-২৯৯

[২২৪] *ঐ*, ১৯ আগস্ট ১৯৫৮; *প্রাগুক্ত*

[২২৫] *ঐ*, ১১ আগস্ট ১৯৫৯; *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯

[২২৬] *ঐ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৯; *প্রাগুক্ত*

[২২৭] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯

[২২৮] আবুল কালাম শামসুদ্দীনহ, *অতীত দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৯৩

[২২৯] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

[২৩০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯

[২৩১] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

[২৩২] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

[২৩৩] আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭-৩২৮; রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯

[২৩৪] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[২৩৫] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
[২৩৬] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮৭
[২৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮
[২৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮৭, ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
[২৩৯] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
[২৪০] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮৭
[২৪১] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[২৪২] আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০০
[২৪৩] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[২৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
[২৪৫] আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮
[২৪৬] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০০-৩০১
[২৪৭] সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[২৪৮] *প্রাগুক্ত*
[২৪৯] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১
[২৫০] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[২৫১] *প্রাগুক্ত*
[২৫২] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২
[২৫৩] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭
[২৫৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯
[২৫৫] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৮
[২৫৬] মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[২৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৬৪
[২৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[২৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[২৬০] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৭৩
[২৬১] মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[২৬২] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০
[২৬৩] মুনতাসীর মামুন, *রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আমাদের হলেন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২০
[২৬৪] *প্রাগুক্ত*
[২৬৫] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
[২৬৬] মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *নিবেদন ইতি*, *উত্তর খণ্ড*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১২
[২৬৭] মফিদুল হক, 'ষাটের দশকের সমাজ ও সঙ্গীত', *ওয়াহিদুল হক স্মারণিক মিলনোৎসব ২০১০*, কণ্ঠশীলন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৬
[২৬৮] সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯
[২৬৯] সন্জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১২৫-১২৬
[২৭০] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯
[২৭১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০
[২৭২] আজাদ, ২৯ মার্চ ১৯৬১; সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
[২৭৩] *ঐ*, ২৯ মার্চ ১৯৬১; সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, ২০০১, পৃ. ৮১
[২৭৪] মফিদুল হক, 'ষাটের দশকের সমাজ ও সঙ্গীত', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭
[২৭৫] আতিউর রহমান, *রবীন্দ্রসাধক ওয়াহিদুল হক*, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫২
[২৭৬] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

[২৭৭] সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭
[২৭৮] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭
[২৭৯] সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭
[২৮০] মালেকা বেগম, *সুফিয়া কামাল*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৪৬
[২৮১] সন্‌জীদা খাতুন (বক্তৃতা), 'শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকবক্তৃতা', ডাব্লিউভিএ, ২৬ জুন ২০১৫; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭
[২৮২] ওয়াহিদুল হক, 'পুরনো সেই দিনের কথা', শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা*, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১২০
[২৮৩] সন্‌জীদা খাতুন (বক্তৃতা), 'শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকবক্তৃতা', ডাব্লিউভিএ, ২৬ জুন ২০১৫
[২৮৪] *প্রাগুক্ত*
[২৮৫] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
[২৮৬] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
[২৮৭] সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫
[২৮৮] মফিদুল হক, 'ষাটের দশকের সমাজ ও সঙ্গীত', *ওয়াহিদুল হক স্মারণিক মিললোৎসব ২০১০*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[২৮৯] ওয়াহিদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশে গবেষণা ইন্সটিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃ. ২৯; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮
[২৯০] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮
[২৯১] আতিউর রহমান, *রবীন্দ্রসাধক ওয়াহিদুল হক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২; মাহমুদ আল জামান, জগতের আনন্দযজ্ঞে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩
[২৯২] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭
[২৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮
[২৯৪] রোজিনা কাদের, *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৭৮; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯
[২৯৫] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬
[২৯৬] পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্মারকপত্র, সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, খুলনা, ২০-২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
[২৯৭] সাক্ষাৎকার, মনোয়ার আলী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, খুলনা, ১ অক্টোবর ২০১৬; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬
[২৯৮] 'আমাদের কথা', পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্মারকপত্র, সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, খুলনা, ২০-২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
[২৯৯] *প্রাগুক্ত*
[৩০০] *প্রাগুক্ত*
[৩০১] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬
[৩০২] 'আমাদের কথা', পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্মারকপত্র, *প্রাগুক্ত*
[৩০৩] *প্রাগুক্ত*
[৩০৪] *প্রাগুক্ত*
[৩০৫] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭
[৩০৬] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬
[৩০৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭
[৩০৮] পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্মারকপত্র, *প্রাগুক্ত*
[৩০৯] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭
[৩১০] আনিসুজ্জামান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮; পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্মারকপত্র, *প্রাগুক্ত*
[৩১১] 'আমাদের কথা', পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্মারকপত্র, *প্রাগুক্ত*
[৩১২] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭
[৩১৩] *প্রাগুক্ত*
[৩১৪] *প্রাগুক্ত*
[৩১৫] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

[৩১৬] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৩
[৩১৭] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের ইতিহাস*, বিজয় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৬
[৩১৮] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
[৩১৯] *প্রাগুক্ত*
[৩২০] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩
[৩২১] মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.), *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১০৭০, পৃ. ২০
[৩২২] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩
[৩২৩] *প্রাগুক্ত*
[৩২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪
[৩২৫] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
[৩২৬] মামুন সিদ্দিকী, *ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২
[৩২৭] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১
[৩২৮] স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৮৭
[৩২৯] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১
[৩৩০] হায়দার আকবর খান রনো, *উত্তাল ষাটের দশক*, পুথিনিলয়, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫৬
[৩৩১] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১
[৩৩২] হায়দার আকবর খান রনো, *উত্তাল ষাটের দশক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
[৩৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮
[৩৩৪] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩
[৩৩৫] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
[৩৩৬] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩
[৩৩৭] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ জুলাই ১৯৬৮
[৩৩৮] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
[৩৩৯] সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[৩৪০] *প্রাগুক্ত*
[৩৪১] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
[৩৪২] সৈদয় আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, 'জয়নুল আবেদিনের স্মৃতি', আনিসুজ্জামান, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৬৭
[৩৪৩] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তির সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[৩৪৪] বিবৃতিটির সঙ্গে এই বিবৃতির স্বাক্ষরকারী হিসেবে পত্রিকায় যাঁদের নাম ছাপা হয়েছিল তাঁরা হলেন–ড. মুহম্মদ কুদরত-ই- খোদা, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন, এ এ বারি, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. খান সরওয়ার মুরশিদ, সিকান্‌দার আবু জাফর, মোফাজ্জাল হায়দার চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, ড. আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত এই বিবৃতিতে উক্ত নামগুলোর সঙ্গে শহীদুল্লাহ কায়সারের নাম যুক্ত হয়েছিল। (আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তির সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫)
[৩৪৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[৩৪৬] বিবৃতিটির সঙ্গে এই বিবৃতির স্বাক্ষরকারী হিসেবে যাঁদের নাম ছাপা হয় তাঁরা হলেন–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টির ডীন এম শাহাবুদ্দন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার মোহাম্মদ মোহর আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বিভাগের রীড়ার এ. এফ. এ মুমিন।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তির সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
[৩৪৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

[৩৪৮] বিবৃতিটির সঙ্গে এই বিবৃতির স্বাক্ষরকারী হিসেবে যাঁদের নাম ছাপা হয় তাঁরা হলেন–মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দী, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, বিচরপতি আবদুল মওদুদ, মুজীবর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, ড. হাসান জামান, ড. গোলাম সাকলায়েন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, কবি বেনজির আহমদ, কবি মঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, আ কা মু আদমউদ্দীন, কবি তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ ন ম বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহ্‌পুজউল্লাহ, সানাউল্লাহ নুরী, কবি আবদুস সাত্তার, কাজী আবুল কাসেম (শিল্পী), মুফখখারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গনি, মফিজউদ্দিন আহমদ, আনিসুল হক, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ কে এম নুরুল ইসলাম, কবি জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, বেগম মাফরুহা চৌধুরী, আবদুল ওয়াদুদ ও আখতার-উল-আলম। (আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তির সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬)

[৩৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

[৩৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[৩৫১] কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[৩৫২] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

[৩৫৩] ইসরাইল খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

[৩৫৪] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

[৩৫৫] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২২১-২২২

[৩৫৬] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[৩৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

[৩৫৮] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রাষ্ট্র ও বাংলাভাষা', সুব্রত বড়ুয়া, ফরহাদ খান (সম্পা.), *অমর একুশে বক্তৃতা ১৯৮৫-৯৪*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৮

[৩৫৯] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[৩৬০] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[৩৬১] সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[৩৬২] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রাষ্ট্র ও বাংলাভাষা', সুব্রত বড়ুয়া, ফরহাদ খান (সম্পা.), *অমর একুশে বক্তৃতা ১৯৮৫-৯৪*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

[৩৬৩] *প্রাগুক্ত*

[৩৬৪] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

[৩৬৫] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[৩৬৬] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[৩৬৭] *প্রাগুক্ত*

[৩৬৮] *প্রাগুক্ত*

[৩৬৯] *প্রাগুক্ত*

[৩৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

[৩৭১] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

[৩৭২] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

[৩৭৩] *প্রাগুক্ত*

[৩৭৪] *প্রাগুক্ত*

[৩৭৫] কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[৩৭৬] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রাষ্ট্র ও বাংলাভাষা', সুব্রত বড়ুয়া, ফরহাদ খান (সম্পা.), অমর একুশে বক্তৃতা ১৯৮৫-৯৪, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

[৩৭৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[৩৭৮] *প্রাগুক্ত*

[৩৭৯] *প্রাগুক্ত*

[৩৮০] *প্রাগুক্ত*

[৩৮১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
[৩৮২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
[৩৮৩] মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮
[৩৮৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮
[৩৮৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[৩৮৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯
[৩৮৭] শেখ মেহেদী হাসান, 'শিল্পী ও বিপ্লবী সত্যেন সেন', *ইতিহাসের খসড়া*, বর্ষ-২, সংখ্যা-৪, মার্চ-এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৪
[৩৮৮] *প্রাগুক্ত*
[৩৮৯] কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.) *উদীচী : বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার*, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৮
[৩৯০] *প্রাগুক্ত*
[৩৯১] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১-২৭২
[৩৯২] শেখ মেহেদী হাসান, 'শিল্পী ও বিপ্লবী সত্যেন সেন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪, ৫
[৩৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
[৩৯৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[৩৯৫] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২
[৩৯৬] শেখ মেহেদী হাসান, 'শিল্পী ও বিপ্লবী সত্যেন সেন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
[৩৯৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
[৩৯৮] কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.) *উদীচী : বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[৩৯৯] শেখ মেহেদী হাসান, 'শিল্পী ও বিপ্লবী সত্যেন সেন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
[৪০০] কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.) *উদীচী : বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[৪০১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[৪০২] শেখ মেহেদী হাসান, 'শিল্পী ও বিপ্লবী সত্যেন সেন', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
[৪০৩] কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.), *উদীচী : বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[৪০৪] *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১; কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.), *উদীচী : বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০
[৪০৫] *দৈনিক সংবাদ*, ১১ মার্চ ১৯৭১
[৪০৬] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[৪০৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৭৫
[৪০৮] উল্লেখ্য কবি হাসান হাফিজুর রহমান 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের সম্পাদক ছিলেন।
[৪০৯] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫
[৪১০] *প্রাগুক্ত*
[৪১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬
[৪১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
[৪১৩] *প্রাগুক্ত*
[৪১৪] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩
[৪১৫] *প্রাগুক্ত*
[৪১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২
[৪১৭] *প্রাগুক্ত*
[৪১৮] *প্রাগুক্ত*
[৪১৯] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১
[৪২০] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩
[৪২১] *প্রাগুক্ত*
[৪২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪
[৪২৩] *প্রাগুক্ত*

[৪২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫
[৪২৫] সন্‌জীদা খাতুন, 'বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তিসংগ্রাম আর সংস্কৃতিসাধনা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১০৮
[৪২৬] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫
[৪২৭] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
[৪২৮] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
[৪২৯] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[৪৩০] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
[৪৩১] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[৪৩২] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬
[৪৩৩] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
[৪৩৪] *প্রাগুক্ত*
[৪৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
[৪৩৬] *প্রাগুক্ত*
[৪৩৭] শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩২৩
[৪৩৮] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬
'নবপর্যায়ে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা জনগণের অভিমত, ১৯৭০; এই শিরোনামে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়।'
[৪৩৯] শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
[৪৪০] *প্রাগুক্ত*
[৪৪১] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭
'নবপর্যায়ে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা জনগণের অভিমত, ১৯৭০; এই শিরোনামে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়।'
[৪৪২] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭
[৪৪৩] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি অখণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮০
[৪৪৪] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬
[৪৪৫] *প্রাগুক্ত*
[৪৪৬] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪
[৪৪৭] *প্রাগুক্ত*
[৪৪৮] *প্রাগুক্ত*
[৪৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪-১২৫
[৪৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫
[৪৫১] *প্রাগুক্ত*
[৪৫২] *প্রাগুক্ত*
[৪৫৩] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭
[৪৫৪] *প্রাগুক্ত*
[৪৫৫] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫
[৪৫৬] মাহফুজুর রহমান, *পূর্ববাংলায় নৃত্যকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[৪৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
[৪৫৮] *প্রাগুক্ত*
[৪৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
[৪৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
[৪৬১] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭
[৪৬২] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[৪৬৩] *প্রাগুক্ত*

[৪৬৪] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

[৪৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১২৮

[৪৬৬] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

[৪৬৭] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩-২৭৪

[৪৬৮] র, পৃ. ২৭৪

[৪৬৯] আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৩

[৪৭০] ওয়াহিদুল হক, 'কলম ছেগে গানে', মহিউদ্দিন আহম্মেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর : মুক্তিযুদ্ধ স্মারক গ্রন্থ*, সিডিএল, ঢাকা ২০০৬, পৃ. ৩৮১

[৪৭১] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৮

[৪৭২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯

[৪৭৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৯

[৪৭৪] *দৈনিক সংবাদ*, ৬ মার্চ ১৯৭১

[৪৭৫] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৯

[৪৭৬] কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.), *উদীচী : বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

[৪৭৭] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২২; সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২

[৪৭৮] আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

[৪৭৯] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮০

[৪৮০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮১

[৪৮১] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭২-৭৭৩; বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮০-৩৮১

[৪৮২] এ জামান, *সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে যশোরের স্পর্শ*, প্রকাশক : এ বি এম আশরাফউজ্জামান, যশোর, ২০০৪, পৃ. ৭৯৫-৮১৫

[৪৮৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯৮

[৪৮৪] তৌফিকুল আলম টিপু, পিতা : আকবর হোসেন আকন্দ, জলেশ্বরীতলা, কালিমন্দির, বগুড়া সদর, বগুড়া, নিজ : বাসভবন, ১১ জুন ২০১৮

[৪৮৫] *প্রাগুক্ত*

[৪৮৬] *প্রাগুক্ত*

[৪৮৭] নিখিল সেন, 'নাট্য-আন্দোলনে বরিশাল', মিন্টু বসু (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর*, বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ, বরিশাল, ১৯৯৬, পৃ. ১৮

[৪৮৮] নজরুল ইসলাম চুন্নু, 'সমন্বয় পরিষদের সদস্য সংগঠন', মিন্টু বসু (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, *মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর*, পৃ. ৭৯

[৪৮৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

[৪৯০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

[৪৯১] নিখিল সেন, 'নাট্য-আন্দোলনে বরিশাল', মিন্টু বসু (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

[৪৯২] নজরুল ইসলাম চুন্নু, 'সমন্বয় পরিষদের সদস্য সংগঠন', মিন্টু বসু (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

[৪৯৩] মোঃ আক্কাস হোসেন, 'গণসংগীতে বরিশাল', মিন্টু বসু (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[৪৯৪] সাক্ষাৎকার, সৈয়দ দুলাল, সাংস্কৃতিক কর্মী, বরিশাল, ৫ অক্টোবর ২০১৮

[৪৯৫] মোঃ আক্কাস হোসেন, 'গণসংগীতে বরিশাল', মিন্টু বসু (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[৪৯৬] সাক্ষাৎকার, মো. মমরেজ আলী বয়াতী (৬৭), পিতা : মোহাম্মদ আলী শেখ, পেশা : গায়ক, গ্রাম : আগতেরিল্যা, ডাকঘর : ধুবলিয়া, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ১০ নভেম্বর ২০১৪

[৪৯৭] সাক্ষাৎকার, মো. সানু শেখ (৭৯), পিতা : জয়েন শেখ, পেশা : গায়ক, গ্রাম : আগতেরিল্যা, ডাকঘর : ধুবলিয়া, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ০৯ নভেম্বর ২০১৪

[৪৯৮] সাক্ষাৎকার, মো. আব্দুল কাদের মেম্বার (৭১), পিতা : শমসের আলী, পেশা : গায়ক, গ্রাম : পাছতেরিল্যা, ডাকঘর : ধুবলিয়া, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ০২ জানুয়ারি ২০১৪

[৪৯৯] *ঐ*

[৫০০] হায়দার আকবর খান রনো, *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৪৩
[৫০১] ইসরাইল খান, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬
[৫০২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
[৫০৩] মযহারুল ইসলাম, *সাহিত্য পথে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬
[৫০৪] কামাল লোহানী (বক্তৃতা), *শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকবক্তৃতা*, ডাব্লিউভিএ, ২৬ জুন ২০১৫
[৫০৫] আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৬৯-১৭০
[৫০৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯
[৫০৭] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫
[৫০৮] মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে পত্র-পত্রিকার অবদান

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংবাদপত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে।[১] ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পত্র-পত্রিকাসমূহও পূর্ব-বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তানের সামগ্রিক আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটে এবং তা জনসাধারণের সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।[২] ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করে পত্রিকার সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলিত হয়।[৩] এপর্বে পূর্ব-বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে সেগুলোতে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের বিচিত্র রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এজন্যে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ও সাংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতির দিক নির্দেশে এ সময়-পর্বের সংবাদ-সাময়িকপত্রসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৪] পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে কতকগুলো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। যার প্রতিফলন সংবাদপত্রগুলোতে দেখা যায়। দেশ বিভাগের পর ঢাকা থেকে–*দৈনিক আজাদ*, *মনিং নিউজ*, *পাকিস্তান অবজারভার*, *দৈনিক ইনসাফ* ও *দৈনিক সংবাদ* ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। কিন্তু এই পত্রিকাগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন।[৫] কিন্তু বাঙালির স্বার্থে পক্ষের কোনো পত্রিকা ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে ঢাকা থেকে পূর্ব বাংলার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে জনমত প্রকাশ ও গঠনের জন্য সংবাদপত্রের তাগিদ অনুভূত হতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে এক সভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী *ইত্তেফাক* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। তাঁর এ উদ্যোগের ফলে ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে আত্মপ্রকাশ করে 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক'।[৬] মওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি বের করেন।[৭] প্রাথমিক পর্যায়ে পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।[৮] ফলে সংবাদপত্রের রাজনীতিতে একটি সমতা আসে। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রকাশ তদানীন্তন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন যাত্রার সংযোজন করে। আস্তে আস্তে আরও পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত–*ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *পূর্বদেশ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *অবজারভার*, *টাইমস্* প্রভৃতি তখনকার নামকরা দৈনিক পত্রিকা। এগুলোর পাঠক-গ্রাহক সংখ্যাও ছিল প্রচুর। হামিদুল হক চৌধুরীর অবজারভার ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার *ইত্তেফাক*-গ্রুপ অব পাবলিকেশনস এবং সরকারি *দৈনিক পাকিস্তান* প্রভৃতি পত্রিকার জগতে প্রভাবশালী ছিল। ১৯৭১ সালের শেষ নাগাদ দৈনিক সংবাদপত্র ছিল দশটির মতো।[৯] এগুলো ভারত বিভক্তির পর এদেশের সাংবাদিকতা সংবাদপত্র ও সাহিত্যজগতের পুনর্গঠন কাজে ব্যাপৃত হওয়ায় এখানকার শিল্পসাহিত্য বিকাশের পথ কিছুটা হলেও প্রশস্ত ও ত্বরান্বিত হয়। কারণ যে কোনো বিবেচনায় কোনো দেশ থেকে দৈনিক সংবাদপত্র বেশি প্রকাশিত হলে জনসমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১০]

তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলো নিয়ে এ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো ছিল দ্বিধাবিভক্ত। ফলে পত্রিকায় প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ঘটনার পক্ষ-বিপক্ষ দাঁড়িয়ে যায়। ফলে ৬০-এর দশকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোকে পর্যালোচনা করলো আমার তাতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন পাব। পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয়, দর্শন, বৈশিষ্ট্য, লেখার বিষয় ইত্যাদি আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কীভাবে তা বাঙালিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে পত্র-পত্রিকার অবদানকে আমরা দুইটি পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো–এক. সংবাদপত্র, দুই. সাহিত্য পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিন।

পটভূমি

পাকিস্তান পূর্বকালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। তাই প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকা কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল। ঢাকা ছিল তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহর। ঢাকা থেকেও নানা ধরনের মানসম্পন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর 'বাসন্তিকা', 'শতদল' প্রভৃতিসহ সাপ্তাহিক 'চাবুক', 'ঢাকা প্রকাশ', 'দরদী' এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার', 'আজাদ' প্রভৃতি পত্রিকার আঞ্চলিক অফিস ও ম্যানেজারিয়াল-ব্যবস্থা ঢাকায় বলবৎ ছিল।[১১]

'চাবুক' পাকিস্তান যুগের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা যা ঢাকা থেকেই বাঙালির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। 'চাবুক' ১৯৪৭ সালেই 'বাংলা' কে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। এর গায়ে মুদ্রিত পরিচিতি ছিল : 'পূর্ব বঙ্গের জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক বলে।'[১২] কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় 'কাফেলা' ১৯৪৭ সাল থেকে মাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আব্দুল গণি হাজারীর সম্পাদনায় পিপলস পার্টির রাজনৈতিক সাপ্তাহিক মুখপত্র 'আলোড়ন', ফয়েজউদ্দীন সম্পাদিত 'আজাদ', পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণের মুখপত্র 'ফরিয়াদ' এবং কাজী আব্দুল মান্নান ও একরামুল হক সম্পাদিত 'ছাত্রলীগ' ১৯৪৭ সালে আজাদ পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি রূপান্তর পরিবর্তন ও নতুন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা শাহেদ আলী ও এনামুল হক সম্পাদিত এবং মোহাম্মদ আবুল কাসেম প্রকাশিত ঢাকার 'সাপ্তাহিক সৈনিক' ও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক'। বাংলা নামের দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ'ও প্রকাশিত হলো। 'আজাদ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ইংরেজি 'দৈনিক মর্নিং নিউজ'-এর প্রতিক্রিয়াশীলতাকে রোধ করার জন্যে দৈনিক 'অবজারভার'ও বের হলো। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্র সাময়িকী তথা পত্র-পত্রিকার জগৎ ব্যস্ত ও সচল হয়ে ওঠে।[১৩]

এই যাত্রা পথে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাঁচশতাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এপর্বে ২০১টি মাসিক, ১২৮টি সাপ্তাহিক, ৫৭টি পাক্ষিক ও ২৭টি দৈনিক, ২৭টি ত্রৈমাসিক, ১৪টি দ্বিমাসিক, ১০টি ষান্মাসিক, ৭টি অর্ধ-সাপ্তাহিক, ৭টি সংকলন, ৬টি বার্ষিকী, চতুর্মাসিক ২টি, মহিলা ১৭টি, কিশোর পত্রিকা ৩৩টি, বিজ্ঞান ১৮টি এবং ১১টি ধর্মবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয় বলে শামসুল হক তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্র' ১৯৪৭-৭১ গ্রন্থে (১৯৭৩) উল্লেখ করেছেন।[১৪] কিন্তু তালিকা বড় হলেও উন্নতমানের পত্রিকা পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলা থেকে খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। সংবাদপত্র গবেষক ইসরাইল খান বলেছেন,

> উন্নতমানের কোনো সাহিত্যপত্রিকা এখানে নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রকট। বড় অভাব ছিল ভালো লেখার। লেখক সম্প্রদায় তখন কেবল গড়ে উঠছেন। অথচ হঠাৎ করে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল। এ অবস্থায় নব্যশিক্ষিত হাতেখড়ি দেওয়া লেখকদের রচনাতেই ভরে থাকতো তাবৎ পত্রিকা। দুচারজন সম্পাদক কেবল উন্নতমানের লেখকদের নির্বাচন করে ভালো লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। আবার রাজনৈতিক কারণে বাঙালি হিন্দু লেখক ও শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারত গমণের ফলে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তা পূরণ করতে গিয়ে স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান বাঙালি এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু সাহিত্যিক স্ট্যান্ডার্ড মান তাঁরা বজায় রাখতে পারেননি। তা অর্জন কাতে সময় ক্ষেপণ করতে হয় অনেক। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সম্পর্ক ভালো না থাকায় পূর্ব বাঙলায় সাহিত্য-সমাজও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।[১৫]

এগুলোর কতিপয় 'সাহিত্য-সাপ্তাহিকী' খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলেও অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক আদর্শ-সম্প্রচারক। এছাড়া কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় 'বেগম' প্রকাশিত হওয়া শুরু করলে মহিলাদের জন্য মহিলা–সম্পাদিত পত্রিকার ধারা উন্মোচিত। 'সুলতানা' (১৯৪৯), 'অনন্যা', 'মহিলা' (১৯৬১), 'বান্ধবী' (১৯৬৫), 'ললনা' (১৯৬৬), 'লাবনী' (১৯৭০) ইত্যাদি যুদ্ধপূর্বকালে বাঙালির মহিলা মহলে মানসগঠনে ভূমিকা রাখে।[১৬]

কিন্তু এ বাঙালিত্বের পক্ষে যে সব পত্রিকা কথা বলেছে, সেইসব পত্রিকাকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়। এ সম্পর্কে সংবাদসাময়িকপত্র বিষয়ক গবেষক ইসরাইল খান-এর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন,

> বাঙালির স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট উন্নতমানের কোনো শ্রেণীর কাগজই নিয়মিত নির্বিঘ্নে, বিনা ঝুঁকিতে প্রকাশিত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে যেসকল পত্র-পত্রিকা অখণ্ড পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছে, আর বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত করে। বিরোধীতা, শত্রুতা ও ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছে, সেসব পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিলনা, উপরন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যেতো। কিন্তু বাঙালির জাগরণের, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি প্রস্তুতের কালে আদর্শবাদী পত্রিকাগুলোই ছিল সজীব, প্রাণস্ফূর্তিতে পরিপূর্ণ, আকর্ষণীয় এবং একালের জন্য স্মরণীয়।[১৭]

সেকালের পত্রিকা জগৎকে বোঝার জন্যে *আজাদ*, *ইত্তেফাক* ও *সংবাদ*–এই তিনটি দৈনিক পত্রিকার নাম নিয়ে তিনটি ধারার পরিচয় অনুসন্ধান করা যায়। মওলানা আকরাম খাঁ প্রতিষ্ঠিত দৈনিক আজাদ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময়ে সদর্থক, সৎ সাংবাদিকতার আদর্শে অবিচল থাকলেও 'আজাদ' ছিল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সম্প্রচারক।এর প্রতিপক্ষে *ইত্তেফাক* (সাপ্তাহিক অবস্থায় এবং পরে দৈনিক হয়েও) ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক। *সংবাদ* ছিল সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র। এছাড়া এদের কিছু সহায়ক ও সমর্থক ছোটো কাগজ ছিল। বাংলা পত্রিকার ন্যায় ইংরেজি *দৈনিক মর্নিং নিউজ* এবং *অবজারভার* দুই পক্ষের সহায়ক-সমর্থক ছিল। *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *অবজারভারে*র দুই সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং হামিদুল হক চৌধুরী পাকিস্তানপন্থিদের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের ওপর প্রতিনিয়ত অত্যাচার-নির্যাতনের সুযোগ খুঁজতো এবং তাদের ওপর জেল জুলুম চাপিয়ে দিত।[১৮] ঐকালে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা তথা সৃজনশীল মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক ও বিভিন্ন সংকলনগুলোকে উপর্যুক্ত তিনটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার গোত্রভুক্ত করেই বিচার করতে হবে। অতএব বর্ণিত তিনটি মোটাদাগে ভাগ করে দেখলে সেকালের পত্রিকাগুলোকে এভারে ভাগ করা যায়–

ক. **পাকিস্তানবাদী পত্রিকা** : *দৈনিক আজাদ*-এর নেতৃত্বে যুদ্ধপূর্বকালে *মিল্লাত*, *আমার দেশ*, *বুনিয়াদ*, *পূর্ব পাকিস্তান* (চট্টগ্রাম), *আজাদী* (ঐ), *পয়গাম*, *মর্নিং নিউজ*, *দৈনিক পাকিস্তান* (সরকারি, ঢাকা) প্রভৃতি ইংরেজি ও বাংলাভাষার দৈনিক সংবাদপত্রগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে গণ্য করে আগাগোড়া বিরোধিতা করেছে।[১৯] পাকিস্তানবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এইসব পত্রিকা তথ্য ও ইতিহাস বিকৃত ঘটিয়েছে। পত্রিকগুলোর বিশেষ কোনো ধর্ম ও আদর্শ ছিলনা। সবকিছুর উর্ধ্বে তাদের লক্ষ ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা।

এ ধারার মাসিক সাহিত্য পত্রিকাগুলোও ছিল প্রতাপশালী। মাসিক মোহাম্মদী, মাহেনও, দিলরুবা, আল-ইসলাহ, নওবাহার, দ্যুতি, তাহজিব, দিগন্ত, অভিযান, অতএব, *পূবালী*, লেখকসংঘ পত্রিকা, পরিক্রম, সংলাপ, উত্তর-অন্বেষা প্রভৃতি হচ্ছে আজাদ-এর ধারার প্রধাস সাময়িকী।

খ. **বাঙালি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা** : *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *অবজারভারে*র ধারায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী ধারার *দৈনিক পূর্বদেশ* ছাড়া বেশি সংখ্যক বড় পত্রিকা ছিল না। মাসিক পত্রিকাও ছিল সংখ্যায় অল্প তাও সময়ে-সময়ে ডিক্লিয়ারেশন রক্ষা করার জন্য সরকারি ধ্যান-ধারণার প্রচার করা হতো। *সওগত*, *সমকাল*, *ইমরোজ*, *সাহিত্য*, *উত্তরণ*, *পূর্বমেঘ*, *পূবালী*, *স্বদেশ*, *মেঘনা*, *নাগরিক*, *পলিমাটি* ছিল এদের সহযাত্রী। আর ছিল অনিয়মিত সংকলন, একুশের সংকলনরূপে যেগুলো বের হতো।

গ. **সমাজতন্ত্রীভাব ধারা পত্রিকা** : *সংবাদ*-এর ধারায় রয়েছে *দৈনিক জিন্দেগী*, *ইনসাফ* ও *চাষী* ইত্যাদি। এ ধারার পত্রিকার মধ্যে সমাজতন্ত্রী কমিউনিষ্টদের প্রভাব ছিল বলে কোনো জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। কমিউনিস্টদের সাপ্তাহিক, মাসিক ও অনিয়মিত পত্র-পত্রিকা ছিল, কিন্তু সেসব আণ্ডার গ্রাউণ্ড পত্রিকা জাতীয়-জীবনে এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে সুদূরপ্রসারী ধারাবাহিক কোনো প্রভাব রাখেনি।[২০]

পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রতিবন্ধতা

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে তিন ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। প্রথমত, পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। ভারত বিভাগের ফলে প্রায় সকল সম্পাদক ও প্রকাশকের দেশত্যাগের ফলে হিন্দু সম্পাদিত পত্রিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তাই প্রাথমিকভাবে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে জগতে স্থবিরত দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, তখন ঢাকায় কোনো দৈনিক পত্রিকাও ছিল না।[২১] দ্বিতীয়ত, সংবাদ সাময়িকপত্রের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। আইয়ুব খান সরকার দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করে সংবাদ সাময়িকপত্রের স্বাধীনতাকে হরণ করার প্রচেষ্টা চালায়। প্রথমত, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন এবং দ্বিতীয়ত, আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে সাংবাদিকদের চরিত্রহানি ঘটানো। তৃতীয়ত, সাংবাদিকতা তখনও পেশা হিসেবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। আবু জাফর শামসুদ্দীন বর্ণনায় পাকিস্তানি আমলে শুরুতে সংবাদপত্রের অবস্থা জানা যায়। তিনি বলেন, '১৯৫২ সালের ভাষা সংগ্রমের দিনগুলোতে আমি পুস্তকের দোকান করি, কোনো পত্রপত্রিকায় কাজ করি না। পত্রপত্রিকা তেমন একটা ছিল না।'[২২]

তবে সংবাদ সাময়িকপত্রের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় কারণে তা শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে নি। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাতে নতুন কোনো সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশ না হয়। এজন্য তারা প্রথম থেকে বিভিন্ন আইন, অর্ডিন্যান্স জারি করতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ৯ জুন পূর্ব বাংলা সরকার 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স' নামে এ রকমই একটি নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করে। কিন্তু তা কার্যকর করা হয় আরও আগে থেকে। সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয় এই অর্ডিন্যান্সটি কার্যকর হবে ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ থেকে। এই অর্ডিন্যান্সটির সাথে একটি ধারা সংযোজিত করে সম্পূর্ণভাবে অথবা বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সময়ের জন্যে পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, পুস্তিকা ও অন্য যে কোন প্রকার মুদ্রিত কাগজপত্রাদির আমদানি নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। অর্ডিন্যান্সটির আদেশ কেউ অমান্য করলে তার পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডের ব্যবস্থাও অর্ডিন্যান্সটিতে রাখা হয়।[২৩]

ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্যেই যে উপর্যুক্ত অর্ডিন্যান্সটি পূর্ব বাংলা সরকার কর্তৃক জারি করা হয় এবং তার মাধ্যমে সরকারের স্বৈরাচারী রূপই যে সুস্পষ্টভাবে উদঘটিত হয় সে বিষয়ে 'স্বৈরাচারের নূতন রূপ' নামক একটি সম্পাদকীয়তে *সাপ্তাহিক নওবেলাল* পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয় :

> পূর্ব বঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠার পর হইতেই নাজিম মন্ত্রীমণ্ডলী যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন–তাহাতে জনসাধারণের মনে ক্রমশঃ এই ধারণাই বদ্ধমূল হইতেছে যে পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন সুযোগ থাকিবে না।...পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক সরকার যেভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে স্বভাবতঃই পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধেও সাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।...সংবাদপত্রের মারফতে অথবা পুস্তিকার আকারে সরকারকে সমালোচনা করা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট নহেন এমন লোকের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে- কিন্তু তার পথও বন্ধ করিবার জন্য নাজিম সরকারের চেষ্টার ত্রুটি নাই। ঢাকার একখানা পত্রিকা এই সরকারের নানাবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত কোন জায়গায়ই স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা করার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। পূর্ব বঙ্গ সরকারকে সমালোচনা করার সকল সম্ভাবনা উপরোক্ত সরকার সেইদিন (অর্থাৎ ৯ই জুন, ১৯৪৮-ব.উ.) একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।... সোজা কথায় সরকার তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কোন মুদ্রিত কাগজই পূর্ব বঙ্গে প্রকাশ করিতে দিবেন না। আরও সোজা কথায় বলিতে হইবে সরকার কোন প্রকার সমালোচনাই বরদাসত করিবেন না।...বর্তমানে পূর্ব বঙ্গ সরকার যে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাতে তাহাকে ফ্যাসিষ্ট বলা কোন অবস্থাতেই অন্যায় নহে।[২৪]

এরূপ সমালোচনা করে সম্পাদকীয় প্রকাশের শাস্তি যে *সাপ্তাহিক নওবেলাল*-কে পেতে হবে তা অনুমেয়ই ছিল। ১৯৪৯ সালের মে মাসে ঢাকার এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিলেটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি সার্কুলার পাঠিয়ে তাতে কাগজের দুস্প্রাপ্যতার উল্লেখ করে কাগজের সংকট লাঘবের জন্যে *নওবেলাল*-এর প্রকাশনা বন্ধ করার

নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'নওবেলাল' আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮ আগস্ট সিলেটের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ডি.আই.জির আদেশ অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের পেপার কনট্রোল অর্ডারের ৯ক ধারা অমান্য করার অপরাধে পত্রিকাটি বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় চার মাস পরে নিষেধাজ্ঞা সরকার কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয় এবং 'নওবেলাল' পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের ৯ ডিসেম্বর।[২৫]

১৯৪৯ সালের মে মাসে পূর্ব বাংলা সরকার একটি আদেশ জারি করে *হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড*, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *ইত্তেহাদ*, ও *দি নেশন*-এই চারটি ভারতীয় পত্রিকার পূর্ব বাংলা প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই নিষেধাজ্ঞা কয়েকমাস বলবৎ থাকার পর এর প্রতিবাদে পাকিস্তান ছাত্র র‌্যালীর উদ্যোগে ১২ আগস্ট ১৯৪৯এ ফজলুল হকের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ একই মাসে পূর্ব বাংলা সরকার চট্টগ্রামের দৈনিক 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের' নিকট হতে তিন হাজার টাকা জামানত তলব করেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পাদকী ও সংবাদসমূহের ওপর প্রিসেন্সরশীপের নির্দেশ দেন। ঢাকার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ইষ্টার্ন স্টার'-এর ওপর প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৬ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশের পূর্বে সরকারের অনুমোদন লাভের আদেশ জারি করেন।[২৬]

চট্টগ্রামের দৈনিক 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের' নিকট জামানত তলব করে ও তার ওপর প্রিসেন্সরশীপের ব্যবস্থা করে সরকার যে দমন নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন তার প্রতিবাদে পত্রিকাটির সম্পাদক আব্দুস সালাম ১ জুন ১৯৪৯ থেকে আমৃত্যু অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।[২৭] দৈনিক 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের' ও 'ইষ্টার্ন স্টার'-এর ওপর সরকারি নির্দেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এই সময় সাপ্তাহিক নওবেলাল বলেন :

> সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই প্রতিবাদ জানাইয়া অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহাদের আদেশ বলবৎ রাখিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংবাদপত্রের সংখ্যা পাকিস্তানের অন্য প্রদেশের তুলনায় খুবই অল্প। এই প্রদেশে শক্তিশালী সংবাদপত্র যাহাতে ত্বরিত গড়িয়া উঠে সরকারের উচিত ছিল সে ব্যবস্থা করা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সরকার তার বিপরীত পন্থাই অবলম্বন করিতেছেন। দেশের জাগ্রত জনমত তাহা কোনমতেই অনুমোদন করিতে পারে না এবং করেও নাই। জনমতের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা সরকারকে আরও একবার অনুরোধ কবির–আপনাদের আদেশ প্রত্যাহার করুন।[২৮]

১৯৪৯ সালের ১০ জুন ফরিদপুর জেলার পাংশা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'খাতক' পত্রিকায় 'আমাদের ফরিয়াদ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় এবং তাতে সরকারের কিছু সমালোচনা থাকে। এই সম্পাদকীয়টি প্রকাশের জন্যে ৭ আগস্ট 'খাতকের' সাতাত্তর বৎসর বয়স্ক সম্পাদক খোন্দকার নাজিরউদ্দীন আহমদকে পাংশা ষ্টেশনে ১৯৪৯ সালের পূর্ব বঙ্গ স্পেশাল অর্ডিন্যান্সের ৭ ধারা মতে গ্রেফতার করা হয়। 'খাতক' সম্পাদকের এই গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চলে কিছুটা বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই বিক্ষোভের অন্যতম কারণ পত্রিকাটি মুসলিম লীগ, জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম ও তবলীগ জমায়াতের সংবাদ পরিবেশক হিসেবে প্রায় দশ বৎসর ধরে ফরিদপুর জেলার পাংশা থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং গ্রামাঞ্চলের ধার্মিক মুসলমানদের মধ্যে পত্রিকাটির বেশ কিছু প্রভাব ছিল। *খাতক* সম্পাদকের গ্রেফতারের জন্যে জেলা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে 'নওবেলালের' একটি উপসম্পাদকীয়তে বলা হয় :

> সাতাত্তর বৎসর বয়স্ক সাংবাদিক পাংশার (ফরিদপুর) 'খাতক' পত্রিকার সম্পাদক জনাব নাজিরউদ্দিন আহমদের গ্রেফতারে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক মহলে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইবে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় এই অপকার্যের জন্য তথাকার স্থানীয় কৃর্তৃপক্ষই দায়ী। পূর্ব্ব বঙ্গ সরকার এত কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়িবেন আমরা এ বিশ্বাস করি না। ফরিদপুর জেলা কর্তৃপক্ষের এই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কার্যের আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইতেছি।[২৯]

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে পুলিশ ঢাকার ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার কার্যালয় ও আল-হেলাল প্রেসে দুই ঘণ্টাব্যাপী খানা তল্লাসী চালায় এবং কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায়। সিলেটের মৌলভীবাজার থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'অভিযান'-এর সম্পাদককে পুলিশ নভেম্বর মাসে গ্রেফতার করে।

১৮ নভেম্বর সিলেটের গোবিন্দ পার্কে মুসলিম লীগ ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনর্বহালের দাবিতে একটি জনসভা আহ্বান করে। সেই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক 'আজান' পত্রিকার সম্পাদক এম.এ বারী সিলেটের ডেপুটি কমিশনার হামিদ হাসান নোমানীর কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, দেশে যখন দারুণ খাদ্যাভাব বিরাজ করছে তখন তিনি প্রস্তাবিত উর্দু স্কুলের জন্যে চাঁদা আদায়ে ব্যস্ত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, তাঁর এই সমালোচনার জন্যে পরের দিন তাঁকে গ্রেফতার করলেও তিনি আশ্চর্য হবেন না। *আজান* সম্পাদকের এই আশংকাই আংশিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়। পরদিন অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর তাঁর বাড়ি, পত্রিকার অফিস এবং ছাপাখানা আনন্দ প্রেসে পুলিশ খানা তল্লাশী চালায়। প্রেস থেকে কমপোজড ম্যাটার হস্তগত করে তারা আনন্দ প্রেস তালাবদ্ধ করে চয়ে যায়।

সিলেট জেলা সাংবাদিক সমিতি একটি জরুরি সভা আহ্বান করে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উত্তর সিলেট জেলা মুসলিম লীগ ও সিলেট জেলা সাংবাদিক সমিতি যৌথভাবে ২২ নভেম্বর, ১৯৪৯ সালে একটি জনসভা আহ্বান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য মাহমুদ আলী। সিলেটের ডেপুটি কমিশনার নোমানী কর্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ ও তাঁর নানান স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ ও সরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়।[৩০]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ ও হামলা জারি থাকলেও পূর্ব বাংলায় এ পর্যন্ত সাংবাদিকদের কোন নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে ২১ জানুয়ারি ১৯৫০ এ ঢাকাতে পূর্ব বাংলার কিছুসংখ্যক সাংবাদিক[৩১] এক সভায় মিলিত হন। পূর্ব বাংলায় একটি সাংবাদিক সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩২]

১৫ মে ১৯৫০ এ অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সম্পাদকদের এক সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ঢাকার এবং প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত পত্রিকা সম্পাদকরা ৬৯টি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদককে এই 'সম্পাদক সম্মেলন'-এর সদস্য তালিকাভুক্ত করেন। এ সম্পাদক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটি একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করে।[৩৩] ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্মেলন'-এর সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও 'পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্মেলন'-এর সভাপতি পীর আরী মহম্মদ রাশেদীর মধ্যে এক আলোচনার ফলে স্থির হয় যে, পূর্ব বাংলার সংগঠনটি পাকিস্তানের সংগঠনের একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করবে এবং পূর্ব বাংলার যাবতীয় ব্যাপারে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।[৩৪]

শুধু পূর্ব বাংলা সরকারই যে এ সময় সংবাদপত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর নানাভাবে হামলা চালাচ্ছিল তা নয়, পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশেও একইভাবে সরকারি নির্যাতন জারি ছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালের ৭ই এপ্রিল করাচিতে 'পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন'-এর একটি সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের 'জননিরাপত্তা' আইন সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক হয়। সংবাদপত্রের ওপর এই আইনের প্রয়োগ যাতে না হয় এবং সম্পাদকদেরকে যাতে এই আইনের আওতাভুক্ত করা না হয় তার জন্যে প্রস্তাব গৃহিত হয়।[৩৫] কিন্তু সরকার তাদের গৃহিত প্রস্তাবের প্রতি কোনো সম্মান না দেখিয়ে একের পর এক পত্রিকা এবং পত্রিকার সম্পাদকের ওপর চরম নির্যাতন করতে থাকে। ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে ফেনী থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক সংগ্রাম* পত্রিকার সম্পাদক ফয়েজ আহমদকে 'জননিরাপত্তা আইনে' গ্রেফতার করা হয়।[৩৬]

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সরকারি নির্যাতন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়,

সংবাদ পরীক্ষার নির্দেশ দান করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের উপর নির্যাতন করিয়া জামানত ইত্যাদির দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার যে প্রবণতা সরকারী মহলে দেখা যাইতেছে সম্মেলন তাহা গভীর আশঙ্কার সহিত পর্যালোচনা এবং এইভাবে জনমত দাবাইয়া রাখার চেষ্টার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সরকারকে সাবধান করিয়া দিতেছে।[৩৭]

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত এ রকম অত্যাচার নির্যাতন চলতে থাকে। সামরিক শাসন জারির পর তা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সালের ৬ আগস্ট তারিখে প্রেসিডেন্সিল অর্ডার নং ১৩ হিসেবে এবডো জারি করা হয়। এবডোর অধীনে প্রয়োজনীয় বই পুস্তক বা হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের দলিল কিংবা বিভিন্ন অভিযোগ সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও ছিল। ১০নং ধারার (২) উপধারাতে এই বিষয়টি সংযোজিত ছিল। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল :

(2) A Tribunal may, by an order in writing, direct any gazetted police officer ti enter any building or place where it has reason to believe that any books of account or other documents (Whether any have to do with account or not) relating to any matter before it may be found, and may in the said order direct him to seize such books or documents of to take copies thereof or of any part thereof, and the provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1998 (Act v of 1898), shall so far as may be, apply to the proceeding of such officer.[৩৮]

সামরিক সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এবং এর সঙ্গে জড়িত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জেল-জুলুম নির্যাতন নেমে আসে। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের কথা, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কথা যে সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেত–যেমন : *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* সেগুলোকে কালো তালিকাভূক্ত করে সরকারি ও আধাসরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করা সামারিক শাসন বিরোধী সাংবাদিকদের বিদেশ গমণের বাধা দেওয়া হয়।

সামরিক শাসন প্রথম থেকেই আঘাত হেনেছে সংবাদপত্রের ওপর। সংবাদপত্র সরকারের দমনের বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালন করে। সাংবাদিকরা সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলতে গিয়ে বন্দি ও দমিত হয়। সুব্রত শংকর ধর পাকিস্তানের সামরিক শাসনে সংবাদপত্রের করণীয় ভূমিকার ওপর মন্তব্য করতে গিয়েছে বলেছেন,

প্রথম সামরিক শাসনের কড় বিধিনিষেধের চাপে পাড়ে এখানকার সংবাদপত্রগুলো যেন একটু দমেই গেলো। সামরিক শাসন জারির পরবর্তী কয়েকটি দিন *আজাদ*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামেও যে বক্তব্য এসেছে তা হলো দেশের রাজনীতির চরম নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এবং এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটানো তাদের পক্ষেই সম্ভব; অতএব তাদের এই ক্ষমতা গ্রহণ অভিনন্দনযোগ্য।[৩৯]

অর্থাৎ সামরিক শাসন জারির প্রথম দিকে সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা ভালো ছিল না। সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর বিভিন্ন অভিযোগে রাজনীতিবিদদের গণহারে বন্দি এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়। সুতরাং এ সময় জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যাবলি তুলে ধলার মাধ্যম ছিল একমাত্র সংবাদপত্র। কিন্তু সামরিক শাসকের অসন্তুষ্টির ভয়ে কোনো পত্রিকা অবাধে সংবাদ ও মতামত প্রকাশ করতো না।[৪০] এমনি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে *দৈনিক ইত্তেফাক* দুঃসাহসের ওপর ভর করে সামরিক শাসনকে কৌশলে সমালোচনা করতে শুরু করে।[৪১] *ইত্তেফাকে*র সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে সামরিক শাসক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে এবং সামরিক আদালত সংক্ষিপ্ত বিচারে তাঁকে দন্ডাদেশ দেয়। ভবিষ্যতে লেখনীতে সতর্কতা অবলম্বর করবেন এ মর্মে লিখিত আশ্বাস দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নির্দেশে সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু কারামুক্তির পরও তাঁর লেখনীতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নি।[৪২] শেখ মুজিবুর রহমান ও মানিক মিয়া দু'জন জেলে আলাদা আলাদা সেলে ছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের সাক্ষাত হতো। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন* গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমান এক স্মৃতিকথা থেকে তাঁর (মুজিব) ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কথোপকথন তুলে ধরেছেন,

> একদিন...মানিক ভাই জানালেন, 'সরকার পক্ষ মানিক ভাইকে আপস করার অনুরোধ জানিয়েছিয়ে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি বলেছেন?' মানিক ভাই উত্তর দিলেন, 'চৌদ্দ বছর জেল খাটতে হয় সে-ও কবুল। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপস চলেন, এ কথাই ওদের জানিয়ে দিয়েছি।[৪৩]

মানিক মিয়ার আদর্শের প্রতি যে আপোসহীন। এই কথোপকথন থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শুধু কথার কথা নয়, তিনি সাংবাদিকতা বা রাজনৈতিক জীবন স্বার্থের জন্য কখনও আপোষ করেন নি। এ সম্পর্কে অলি আহাদ যথার্থ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

> ... ছদ্মনাম মোসাফির লিখিত পোস্ট এডিটরিয়েল রাজনৈতিক মঞ্চ জেল রাজবন্দীদের জন্য সঞ্জীবনী সুধাবৎ ছিল। ইহা স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার সংগ্রামের অন্যতম দৃষ্টান্ত ছিল। উক্ত প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে।[৪৪]

কিন্তু কিছু কিছু সংবাদপত্র সামরিক সরকারের সমালোচনা এড়িয়ে চলতো। শুধু নয়, সরকারের প্রসংশায় পঞ্চমুখ ছিল। এর মাধ্যমে তারা সরকারের বা ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হয়। *দৈনিক সংবাদের* ম্যানেজিং ডিরেক্টর আহমেদুল কবির সামরিক সরকারের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন এবং গভর্নর জাকির হোসেন কর্তৃক গঠিত শিল্প-উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।[৪৫]

কিন্তু সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সরকার তার নীতি বজায় রাখে। ১৯৬৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর আইয়ুব সরকার প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৩ জারি করে। এই অধ্যাদেশে পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও পত্রিকার ওপর কতকগুলো বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। এই অধ্যাদেশ বলে সরকারি প্রেস নোট এবং তথ্য বিবরণী অনুপুঙ্খ মুদ্রণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। অধ্যাদেশটি ঘোষণা করার সাথে সাথে সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

১৯৬৮ সালের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বিরোধ চরমে পৌঁছে। আইয়ুব খান পূর্ব বাংলায় এ সময়ও সাংস্কৃতিক দমন অব্যাহত রাখেন। জরুরি অবস্থার সুযোগে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ লেখকদের গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করার নীতি গ্রহণ করে সরকার। এই লক্ষে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান সরকার কুখ্যাত 'প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অডিন্যান্স' জারি করে। মৌলিক অধিকার তথা স্বাধীন চিন্তা ও বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী এই আদেশের বিরুদ্ধে লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীরা প্রবল প্রতিবাদে সোচ্চার হন।[৪৬]

এভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পুরো সময় সংবাদপত্রের ওপর বিভিন্নভাবে দমন নীতি অব্যাহত রাখে। পাকিস্তান সরকার বিশেষ করে উর্দু ভাষার পত্রিকাগুলোকে অযাচিতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে চায়, আর বাংলা ভাষার পত্রিকাগুলোর কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টায় কোন গাফিলতি রাখতো না। ফলে স্বাধীন স্বাধীন সাংবাদিকবৃত্তি বাধাগ্রস্ত হয়।[৪৭] সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে মূল কারণ পত্রিকাগুলো শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে জাগাতে চেষ্টা করেছে। সংবাদপত্রের ওপর শাসকগোষ্ঠীর এই আচরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে থাকে।

সংবাদ সাময়িকপত্রে পাকিস্তানি রাজনীতির প্রতিফলন

পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে ১৯৪৭ সালের জুন মাস থেকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা বিষয়টি লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময় পত্র-পত্রিকায় বাংলাভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং ঐ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় এবং বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৮] ১৯৫২ সালের পর ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইংরেজি *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার* পূর্ব-পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া তুলে ধরার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। পত্রিকাটির এই সরকার বিরোধী ভূমিকার জন্য একাধিকবার সরকারি কোপানল পড়ে।[৪৯] *অবজারভার*-এর পরেই *ইত্তেফাক* পত্রিকার কথা আসে। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতির বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে *ইত্তেফাক* পত্রিকার জন্ম। ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের রক্তের অঙ্গীকার এই পত্রিকাটি বহন করেছিল। সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রকাশ তদানীন্তন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক

অঙ্গনে নতুন মাত্রার সংযোজন করে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন লিয়াকত আলী খান অথবা খাজা নাজিমুদ্দীনকে দেশ পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতেন, *ইত্তেফাক* সেই বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে, পরিসংখ্যান দিয়ে সাবলীল করে তুলত।[৫০] এই পত্রিকাটি শুধু যে আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে কথা বলেছে তা নয়। বরং পত্রিকায় সাধারণ জনগণের পাওয়া না পাওয়ার বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত সংবাদ পরিবেশিত হতো। এছাড়া *ইত্তেফাক* পত্রিকায় নিয়মিত রাজনৈতিক কলাম প্রকাশ করতো যা রাজনৈতিক কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে লেখকগণ ছদ্মনামে লিখতেন। কারণ ব্যক্তির ওপর নেমে আসতো আত্যাচার নির্যাতন। তফাজ্জল হোসেন মুসাফির ছদ্ম নামে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' শিরোনামে কলাম লিখতেন।[৫১]

পত্রিকাগুলো যে সবসময় বাঙালির স্বার্থের পক্ষে লিখত তা নয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামিরক শাসন জারির এক সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকার প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকাতে যে সকল সংবাদ, নিবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামরিক শাসনের প্রশংসা করা হয়েছে। সামরিক আইন জারির পর সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত প্রায় সবগুলো দৈনিকের সম্পাদকীয় নিবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল, দেশের রাজনৈতিক নেতাদের চরম ব্যর্থতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতার কারণে 'ত্রাতা' হিসেবে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে *দৈনিক ইত্তেফাকে*'র ভূমিকা ছিল খানিকটা ব্যতিক্রম। ১৭ অক্টোবর তফাজ্জল হোসেন তাঁর নির্ধারিত কলাম 'রঙ্গমঞ্চ' তে দীর্ঘ সময় দেশে সামরিক শাসন বলবৎ থাকলে সেনাবাহিনীর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এ মর্মে মন্তব্য করে লিখে,

> যে কোনো দেশের সামরিক বাহিনীকে স্থায়ীভাবে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হইলে তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালনে অর্থাৎ দেশ রক্ষা ব্যবস্থায় শৈথিল্যের ভাব দেখা দিতে পারে। কারণ একই লোক বা সংস্থার পক্ষে দুইটি বিরাট দায়িত্ব অনির্দিষ্ট কালের জন্য পালন করা কষ্ঠসাধ্য হইয়া পড়িবার কথা।[৫২]

দৈনিক ইত্তেফাক সামারিক সাশনের সরাসরি বিরোধিতা করতে না পারলেও সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করানোর মাধ্যমে তা করতে সক্ষম হয়। কোনো পত্রিকার পক্ষেই তখন সামরিক শাসনের বিরোধিতা করা সম্ভব হতো না কঠোর সামরিক বিধিনিষেধের কারণে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ওপর এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয় যে, কেউ ইঙ্গিতেও যদি সামরিক শাসনকে বা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সমালোচনা বা বিদ্রুপ করছে বলে তারা মনে করে তাহলেও শুধুমাত্র তার সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে নূন্যতম শাস্তির বিধান রাখা হয় ৭ বছর কারাদন্ড।[৫৩]

সামরিক আইন জারির পর শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই রাষ্ট্রে যে অব্যবস্থানা ছিল তা জনগণের সামনে তুলে ধরে। এই রকমই একই অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে *দৈনিক আজাদ* ২৫ অক্টোবর ১৯৫৮ 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়,

> সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্তানের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিয়া একটি সরকারী এশতেহার প্রকাশিত হইয়াছে। এশতেহারে প্রাদেশিক অর্থনৈতিক অবস্থার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা সত্যই ভয়াবহ। বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন উজির সভায় ক্রমাগত কুশাসন ও দায়িত্বহীন কার্য্যকলাপের ফলে এ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক সরকারের পশ্চাশ কোটি টাকারও অধিক ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতির ফিরিস্তি দিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, চলতি একাউন্টে ২৭ কোটি ঢাকা, চাষী ও অন্যান্যদের অগ্রিম ঋণদান বাবদ ১০ কোটি টাকা এবং খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিক্রয় বাবদ প্রায় ১৩ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই বিপুল ক্ষতিপূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২৩ কোটি টাকারও অধিক ঋণ ও অগ্রিম দান করেন। তাছাড়া, স্টেট ব্যাংকের নিকট প্রচুর পরিমাণ ওভারড্রাফটও গ্রহণ করা হয়। এক সময়ে এই ওভারড্রাফটের পরিমাণ ১৪ কোটি টাকারও অধিক হইয়া পড়ে।
>
> ...আশ্বাসের কথা এই যে, পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসনকর্তা প্রদেশের এই চরম অর্থনৈতিক দুর্নীতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ইহার প্রতিরোধকল্পে অবিলম্বে আর্থিক ও শাসনকার্য্যের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন। প্রদেশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী কার্য্যকরীকরণের কাজ বিলম্বিত না হইয়া যাতে দ্রুততর হয়, সেদিকে অবহিত হওয়ার জন্যও তিনি সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আমাদের বিশ্বাস আছে, তাঁর নির্দ্দেশ যথাযথভাবে পালিত হইবে।[৫৪]

শুধু *দৈনিক আজাদ* নয়, তখন প্রকাশিত প্রায় সকল পত্রিকাতে সামরিক শাসনের পক্ষে সম্পাদকীয় ও সংবাদ ছাপা হয়। আইয়ুব খানের শাসনামলের শুরু থেকে পূর্বের তুলনায় সংবাদপত্রের ওপর আরও বেশি বিধি-নিষেধ জারি করা হয়। পূর্বপাকিস্তানের সংবাদপত্র জগত এরূপ নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের এক বছর অতিক্রান্ত করে। এক বৎসরেও সংবাদপত্রের ওপর থেকে সেন্সরশিপ প্রত্যাহার করা হয়নি। সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন সবকিছু প্রকাশের পূর্বে তথ্যমন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র বা পূর্ব অনুমোদন নিতে হতো। সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের পর 'Censored and Passed'-এরূপ সীল ও সংশ্লিষ্ট অফিসারের দস্তখত প্রাপ্তির পর এসব সংবাদ প্রতিবেদন পত্রিকায় ছাপা হতো।[৫৫]

১৯৫৯ সালে সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত আইন-কানুন সংস্কারের জন্যে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সমন্বয়ে প্রেস কনসালটেটিভ কমিটি।[৫৬] এ কমিটি পরপর কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু বৈঠকে সংবাদপত্রের ওপর থেকে 'সেন্সরশিপ' প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি গৃহীত হলেও সামরিক আইনের আওতায় ১৪ বছরের কারাদণ্ড সম্পর্কিত বিধিটি প্রত্যাহারের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় তফাজ্জল হোসেনের আপত্তিতে প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনার অল্পদিন পরই ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সামরিক আইন লংঘনের অভিযোগে তফাজ্জল হোসেন গ্রেফতার হন।[৫৭]

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে *বিবিসি*-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন,

> দেশের অবস্থা ও পরিবেশের সাথে খাপ খায় এবং জনসাধারণ তাহা বুঝতে ও কার্য্যকরী করিতে পারে, পাকিস্তানের জন্য তেমন এক নয়া শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের নিমিত্ত একটি কমিশন গঠন করা হইবে।...ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার জন্য পাকিস্তানে সাফল্যের সঙ্গে বৃটেনের আদর্শে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কার্য্যকরী হইতে পারে না।[৫৮]

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মূলত মৌলিক গণতন্ত্রের কথার দিকেই ঈগিত দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রেসিডেন্টের উক্তি সমর্থন করে *দৈনিক আজাদ* 'পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে অভিমত তুলে ধরে,

> পাকিস্তানের জন্য যে শাসনতন্ত্র পরিকল্পিত হইবে তাহা বৃটেনের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ হইবে না। কারণ পাকিস্তানে নিরক্ষরতার যে ব্যাপকতা রহিয়াছে, তাতে বৃটেনের অনুরূপ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এখানে চালু করা সম্ভব নহে। তেমন গণতন্ত্র এখানে বনতন্ত্রে পরিণত হওয়ার সম্ভবনা খুব প্রবল। তার নমুনা কিছুটা গত কয়েক বৎসরে প্রত্যক্ষও করা গিয়াছে। প্রেসিডেন্টের এই অভিমতের সাথে অনেকে হয়ত একমত নাও হইতে পারেন, কিন্তু তার কথার ভিতরে যে তীক্ষ্ণ সত্য রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা কঠিন।[৫৯]

১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর আইয়ুব 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' ঘোষণা করেন।[৬০] কিন্তু এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো পত্রিকায় কোনো সম্পাদকীয় বা প্রতিবেদন ছাপা হয়নি। শুধু তাই নয়, মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আইয়ুব খান নির্বাচিত হলে পত্রিকাগুলো অভিনন্দনও জানায়। *দৈনিক আজাদ* 'আস্থা ভোট' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে আইয়ুব খানের বিজয় লাভকে অভিনন্দন জানায়। পত্রিকাটি সম্পাদকীয়তে বলে,

> মৌলিক গণতন্ত্রেও মাধ্যমে ৮০ হাজার সদস্যেও মধ্যে শতকরা ৯৬ জনের আস্থা-ভোট লাভ করিয়া ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁ পাকিস্তানের সদর নির্ব্বাচিত হইলেন। আমরা নবনির্ব্বাচিত সদরকে জাতির পক্ষ হইতে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাইতেছি এবং তাঁর এই নূতন কর্ম্মজীবনের পরিপূর্ণ কামিয়াবি কামনা করিতেছি।[৬১]

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সত্যিকার অর্থেই পূর্বপাকিস্তানের সংবাদপত্রের অঙ্গন ছিল নির্জীব ও স্থবির। এ সময় থেকে সামরিক সরকারের দ্বারা আরোপিত কঠোর নিয়ন্ত্রণ আর চাপের মধ্য দিয়ে চলতে হয় সংবাদপত্রসমূহকে।

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সামরিক সরকার নিরাপত্ত আইনে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে পূর্বপাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ অবস্থায় আইয়ুব খান ঢাকা সফরে আসেন। প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। সংবাদপত্রগুলো ছাত্র আন্দোলনের খবরাখবর অধিক হারে পরিবেশন করে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এক পর্যায়ে সরকার সংবাদপত্রের ওপর

কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করে ছাত্র আন্দোলন সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৬২] সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিবাদে ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রেস ক্লাবের সামনে ঐ দিনে প্রকাশিত ঢাকার সকল সংবাদপত্র অগ্নিদগ্ধ করে। ৩ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করলে বিক্ষুব্ধ ছাত্র নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে তাদের বক্তব্য না ছাপার প্রতিবাদ করে। এছাড়া ৬ ফেব্রুয়ারি *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার মুদ্রিতব্য সকল সংবাদের ওপর প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। একই দিনে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিতীয় বারের মতো *দৈনিক ইত্তেফাকে*র সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে আন্দোলনরত ছাত্ররা পূর্বপাকিস্তান সফররত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে ঘেরাও করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে শুধুমাত্র এক সরকারি প্রেসনোট ছাড়া ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত কোনো খবর প্রকাশ করতে পারেনি। তবে, সরকারি প্রেসনোট[৬৩] ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে পরোক্ষভাবে ছাত্র আন্দোলনের খবরাখবর প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[৬৪] ছাত্র রাজনীতির এরূপ উত্তপ্ত অবস্থায় আইয়ুব খান সরকার ১৯৬২ সালের ১ মার্চ নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। তখন প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংবিধান বিরোধী প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রদর্শন করে।

সংবাদপত্রে শাসনতন্ত্র বিরোধী সংবাদ-প্রতিবেদন এবং ছাত্র আন্দোলনের খবর ও বিবৃতি ছাপা হতে থাকে। শাসনতন্ত্র বিরোধী জনমত সংগঠনে সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকার বিষয়টি সরকার উপলব্ধি করে এবং তা রোধকল্পে সামরিক আইনে শাসনতন্ত্র কেন্দ্রিক সকল আলোচনা সমালোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৬৫]

১৯৬২ সালের মধ্যভাগে সামিরক শাসন শিথিল করে আইয়ুব খান সরকার কর্তৃক সীমিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। সংবাদপত্রগুলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রচারে এগিয়ে আসে। এ সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে আইয়ুব খানবিরোধী ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। প্রথমে শরীফ শিক্ষা কমিশন এবং পরবর্তী সময়ে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এ সকল ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সারির পত্রিকা *ইত্তেফাক*, *আজাদ*, *সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* সর্বোতভাবে উৎসাহিত করতে থাকে।

১৯৬২ সালের ২৫ জুন রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এরপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। বিশেষ করে নতুন প্রণীত শাসনতন্ত্র প্রত্যাহার, ছাত্রদের ওপর নির্যাতন বন্ধ এবং রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির দাবি করে। এ সময় নয়জন[৬৬] রাজনৈতিক নেতা সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিটি ঢাকার প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ নতুন প্রণীত শাসনতন্ত্রের নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম-এরূপ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের দাবি জানান। বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকা মন্তব্য করেছিল,

> সত্যিকার গণ-প্রতিনিধি ছাড়া কোন ব্যক্তি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার অধিকারী নয়। করিলে তাহা স্থায়ী, সহজ ও কার্যকরী হইতে পারে না। জনগণ সার্বভৌম-এই হচ্ছে গণতন্ত্রের সারকথা। জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। এই ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত বাধা বিঘ্নমুক্ত ও অবাধ বিকাশের একান্ত প্রয়োজন।[৬৭]

অর্থাৎ *দৈনিক ইত্তেফাক* সুযোগ পাওয়ার সাথেই জনগণের অধিকারের কথা ও গণতন্ত্রের কথা বলে। একইসাথে সামরিক শাসকদের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। পত্রিকাটি দাবি করে জনগণের সার্বভৌমত্ব থাকতে হবে এবং জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু সামরিক সরকারের সময় তা হচ্ছিল না। *দৈনিক ইত্তেফাকের* ঐ সংখ্যায় আরও মন্তব্য করা হয়েছিল,

> শাসনতন্ত্রকে স্থায়িত্বে ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও গুণসম্পন্ন হইতে হইলে সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও বিচার বুদ্ধির প্রতিফলন অবশ্যই থাকিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে প্রণীত বিধানগুলোই বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবী বংশধরদের মনে অকৃত্রিম আনুগত্য ও

আবেগই শাসনতন্ত্রে প্রধান অবলম্বন ও দুর্ভেদ্য বর্ম বিশেষ। জনমতের উপর নির্ভর না করিয়া বাহিরে থেকে চাপানো শাসনতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখে জনসমর্থন লাভ করিতে পারে না। বর্তমান শাসনতন্ত্রের এই গুনাবলী না থাকায় এটা আন্তঃসারশুন্য। যতই প্রচার করা হউক না কেন, জনমতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাস্থাই হইতেছে এই নয়া শাসন তন্ত্রের ভিত্তি ভূমি।[৬৮]

দেশের গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য রাজনীতিবিদদের মুক্তির জন্য *দৈনিক ইত্তেফাক* আরও মন্তব্য করেছিল,

> সরকারের উপর জনগণের আস্থা যাহাতে ফিরিয়া আসে তাহার জন্য বিনা বিচারে আটক সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে গৃহীত যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিতে হইবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু। দেশে অবাধে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পথে যত কিছু বাধা অন্তরায় আছে তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে। দেশ অবাধে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পথে যত কিছু বাধা অন্তরায় আছে তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে। দেশ একটি বিরাট পরীক্ষার মূখে। এক অস্থির অবস্থায় দেশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে।[৬৯]

কিন্তু সরকারি দলের মুখপাত্র *ডন*, *মর্নিং নিউজ* এই বিবৃতির বিপক্ষে বিষোদগার শুরু করে। এ সকল পত্রিকার মাধ্যমে আইয়ুব খানের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ ৯ নেতার বিবৃতিকে 'ব্যাবিলনের নয়জন জ্ঞানীর বিবৃতি' বলে ব্যঙ্গ করতে শুরু করেন।[৭০]

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলিবর্ষণে ছাত্র নিহত হলে পরদিন সংবাদপত্রে মূল খবর করা হয়। পর পর কয়েকদিন এই গুলিবর্ষণ ও তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ ব্যাপক কভারেজ পায় *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *আজাদ* পত্রিকায়। ১৯ সেপ্টেম্বর *দৈনিক ইত্তেফাক* এক সম্পাদকীয়তে লিখেছিল,

> দেশে সুষ্ঠু বলিষ্ঠ এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আজ গঠন করিতে হইবে। দেশে রাজনীতি চলিবে, কিন্তু রাজনৈতিক দল থাকিবে না, এই অবস্থা চলিতে পারে না। কিছুদিন আগেও আমরা বলিয়াছিলাম যে, দলহীন রাজনীতি আর নোঙরহীন নৌকার অবস্থা সমান। এ অবস্থা আগুন লইয়া খেলার সামিল। এরূপ পরিবেশ রাজনীতি করিতে যাওয়া আর নৈরাজ্য এবং উচ্ছৃঙ্খলা ডাকিয়া আনা একই কথা। গত সোমবারের ঘটনাবলী এ কথাই নির্ভুলভাবে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে।[৭১]

সরকারি তথ্য বিভাগের সাথে পূর্ব বাংলার তিনটি বহুল প্রচারিত *দৈনিক ইত্তেফাক*, *সংবাদ* এবং *পাকিস্তান অবজারভার*-এর বিরোধ দেখা দেয়। সুব্রত শংকর ধর মন্তব্য করেছেন,

> ... সরকারি ভাষ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে কাংখিত আচরণ না করার অজুহাতে পত্রিকাগুলোকে ব্লাকলিস্ট করা হলো সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর ১৯৬২ ও শেষের দিকে। অর্থাৎ সরকারি, আধা সরকারি বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির সমস্ত সুযোগ প্রত্যাহার করে নেয়া হলো এই পত্রিকাগুলোর কাছ থেকে। সংগত কারণেই এই সরকারি সিদ্ধান্ত ছিলো পত্রিকাগুলোর অস্তিত্বের প্রতি একটি মারাত্মক আঘাত।[৭২]

আইয়ুব সরকার কর্তৃক জারি করা হয় প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৩।[৭৩] এ অধ্যাদেশের ব্যতিক্রম হলে মুদ্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করা সহ সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ শাস্তির বিধান রাখা হয়। অন্যদিকে পত্রিকার মালিকের জামানত অর্থের পরিমাণ পূর্বের ১০ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ হাজার টাকা ধার্য করা হয়। নতুন অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংবাদপত্র কিংবা প্রেস মালিকের অর্থপ্রাপ্তির উৎস এবং মালিক, সাংবাদিক ও কর্মচারী বিরোধের মতো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তদন্ত করার অধিকার, সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। উক্ত আইনে সরকার ইচ্ছে করলে পত্রিকার প্রকাশনা মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে বা সরকার মনোনীত যে কাউকে প্রেস বা পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবে।[৭৪] অধ্যাদেশের এই সমস্ত বিধি থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়, সরকার সংবাদপত্রের ওপর যখন-তখন হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যই অধ্যাদেশটি জারি করে।[৭৫] অধ্যাদেশটি ঘোষণার পর ৪ সেপ্টেম্বর *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত রির্পোট থেকে জানা যায় যে, এই সকল নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক শতাব্দী প্রাচীন পত্রিকা *সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট*-এর প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[৭৬] এ সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখে,

নয়া অর্ডিন্যান্স সংবাদপত্রের এই অবশিষ্ট স্বাধীনতা খর্ব করিয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বিত যেখানে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার সরকারি বিধি নিষেধে গণ্ডীবদ্ধ- সেই অবস্থা, সেই পরিবেশ অপেক্ষা যে মৃত্যুও অনেক ভাল সেই কথাই সুতীব্র প্রতিবাদের ভাষায় দেশের প্রাচীনতম সংবাদপত্রটি ঘোষণা করিয়াছে। প্রতিবাদের এ সুতীব্র স্বর ক্ষমতাসীনদের শুভবুদ্ধি এই বিলম্বেও জাগ্রত করিবে কিনা কে জানে?[৭৭]

অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে ঐ দিন প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের এই সমাবেশে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বলেন,

...বর্তমানে যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে, তাহা শুধু সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার জীবন-মরণের সংগ্রাম নয়, সেই সংগ্রামের সঙ্গে একটি স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও বিজড়িত।[৭৮]

প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এ প্রসঙ্গে *দৈনিক ইত্তেফাকে*র মোসাফিরের লেখনীও 'রাজনৈতিক মঞ্চের' মাধ্যমে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। মোসাফির লিখেছিল,

সংবাদপত্রের উপর হামলা শুধু কয়েকজন সাংবাদিক, সম্পাদক কিংবা সংবাদপত্র মালিকের উপর হামলা নয়, ইহা গোটা জাতির ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশে স্বাধীনতার উপরই চরম আঘাত। সংবাদপত্র শুধু নিজেদের মতামতই প্রকাশ করে না, জনমত প্রতিবিম্বত করিয়া তোলাই উহার কাজ। প্রধাতনঃ তাহারা জননেতাদের বিবৃতি, বক্তৃতা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রবন্ধাদি এবং মানুষের অভাব অভিযোগ সম্বলিত খবরাদি প্রদান করিয়া থাকে। সংবাদপত্র শিল্প আর দশটা সাধারণ শিল্পের মত নয়...।[৭৯]

৪-৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন *দৈনিক ইত্তেফাক* এবং *দৈনিক আজাদ* প্রথম পৃষ্ঠায় শীর্ষে কালো বর্ডার দিয়ে বক্স করা একটি বাণী লিখে, 'কালো অর্ডিন্যান্স মুর্দাবাদ, পত্রিকার স্বাধীনতা ফিরাইয়া-দাও, সাংবাদিক জনতার ঐক্য জিন্দাবাদ, প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার কর, সাংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা চলবে না'।[৮০]

রেজোয়ান সিদ্দিকী সরকারি প্রেসনোট হুবহু দেওয়া আদেশ সম্পর্কে পত্রিকাগুলোর প্রতিবাদেরধরণ তুলে ধরেন বলেন,

কখনও কখনও তলা আঁটা মুখের স্কেচ ছাপানো হতো প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে। সরকারী প্রেসনোট বা হ্যান্ড আউট অবিকল মুদ্রণের বিধিটিকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালকের অভিবাদন থেকে শুরু করে হ্যান্ড আউট নম্বর, টাইপিস্টের নাম সব কিছু ছাপতে শুরু করে।[৮১]

পাকিস্তানের উভয় অংশের সাংবাদিকরা অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে ৭ সেপ্টেম্বর কালো ব্যাজ ধারণ করেন এবং ৯ সেপ্টেম্বর হরতাল পালন করে। ফলে ১০ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি। ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকার সকল দৈনিক পত্রিকায় বিশার মিছিলের ছবিসহ ধর্মঘট সংক্রান্ত খবর প্রকাশ হয়। প্রেস অর্ডিন্যান্স-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের ছবি পত্রিকাগুলো বিপুলভাবে প্রকাশ করে জনমত সৃষ্টি করতে থাকে। এই দিন *দৈনিক আজাদ* সাংবাদিকদের ঐক্য কামানা করে লিখে, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভয় নাই, ভয় নাই, ইয়ে কাল আইন হঠাও'।[৮২] সাংবাদিকদের আন্দোলনের মুখে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ তারিখে সরকার এক মাসের জন্য নতুন প্রেস অর্ডিন্যান্সের কার্যকারিতা স্থগিত করে।[৮৩]

সংবাদপত্রের ওপর সরকার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে। কারণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য উর্ধ্ব গতির কথা ও জনসাধারণের দূর্ভোগের চিত্র সকলের সামনে ফুটে ওঠে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চড়া মূল্যের জন্যে জনজীবনে দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই চড়া মূল্যের বিরুদ্ধে ঢাকার ১০টি মহিলা প্রতিষ্ঠান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বিবৃতি দেয়, 'পূর্ব্বে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করা হইলে একটি সাধারণ পরিবারের গোটা মাসের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত, বর্তমানে তাহাতে ১৫ দিন চলাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।'[৮৪]

এ বিবৃতির মধ্যে যে কোনো অতিকথন নেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। *দৈনিক আজাদ* 'দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবী' শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে বিষয়টি পর্যালোচনা করে বলা হয়,

চড়া মূল্যের বিরুদ্ধে মহিলাদের বিবৃতি ও প্রতিকারের দাবী খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারণ, দ্রব্যমূল্যের আঘাতের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘরের ভিতর যতখানি পাওয়া যায়, বাহিরের সামাজিক ও পোশাকী জীবনে তাহা ততখানি পাওয়া যায় না। অভাব ও

দৈন্যের প্রকৃত রূপ ঘরের ভিতর আবৃত থাকিতে পারে না। প্রত্যহ বাজার, খাওয়া-পরা, ঔষধপত্র প্রভৃতির খরচের মাধ্যমেই বুঝা যায় যে, সংসার যাত্রার চাহিদার জ্বালা কি। সবসময় ঘরের ভিতর থাকিয়া এবং রান্নাবান্ন ও পরিবেশনের দায়িত্ব বহন করিতে যাইয়া মেয়েরাই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চড়া মূল্যের ও অভাবের কষ্টটা বেশী বুঝিতে পারে।[৮৫]

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে আঞ্চলিক বৈষম্য কেন্দ্রিয় সরকার করছিল তা পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। *দৈনিক আজাদ* 'আঞ্চলিক বৈষম্য' সম্পাদকীয় ভাষ্যে বলা হয়,

পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার গুরুত্বের দাবী দূরে থাকুক, শাসনতন্ত্রে বিঘোষিত এবং সরকার কর্তৃক বার বার স্বীকৃত আঞ্চলিক সংখ্যা সাম্যের নীতিকেও কোন মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। এই বৈষম্যের কারণ জানিতে চাহিলে অর্থ দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী আরও বলেন যে, ইহা চাহিদা ও সরবরাহের প্রশ্ন। বৈদেশিক মুদ্রা প্রদেশের চাহিদা অনুয়ায়ী বরাদ্দ করা হয়। অর্থ দফতর কোন অঞ্চলের চাহিদা কিভাবে দেখিয়াছেন এবং কিভাবে তাহা পূরণ করিয়াছেন, তাহ দফতরের অন্দরমহলের কথা। কিন্তু বাহিরের লোকে যাহা জানে এবং দেখে, তাহাতে সকলেরই চোখে পড়ে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের সীমাহীন দারিদ্র্য ও অপেক্ষাকৃত অধিক দারিদ্র্য।[৮৬]

এই বোধ ষাটের দশকের শুধু *দৈনিক আজাদের* ছিল তা নয়, বাস্তবচিত্রটি শুধু মাত্র পত্রিকাটি তুলে ধরে। শোষণের এই বোধটি পরবর্তী সময়ে ছয়দফা মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হয় এবং তা রাজনৈতিক আন্দোলনের নৈতিক ভিত হিসেবে কাজ করে।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে শাসকগোষ্ঠীর ইন্ধনে পূর্ববাংলায় ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সরকারবিরোধী ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে প্রাদেশিক সরকার ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অজুহাতে এদেশেও অবাঙালিদের সহায়তায় এক ভয়াবহ দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। এই দাঙ্গার সময়ে পূর্বপাকিস্তানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ প্রগতিশীল রাজনীতিক ও জনতার সঙ্গে একত্রিত হয়ে দাঙ্গাবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রথম থেকেই লেখনীর মাধ্যমে *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর বিরুদ্ধে সচ্চোর ছিল। ফলে *দৈনিক ইত্তেফাক* বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেই একদল দুষ্কৃতিকারী পত্রিকাটির অফিসে হামলা করে। মূলত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচার ও নিন্দা করাই পত্রিকাটির ওপর এ হামলা হয়। তারপরেও পত্রিকাটি জাতীয় দায়িত্ব পালন থেকে সরে আসেনি। ১৫ জানুয়ারি *ইত্তেফাকের* সম্পাদকীয় কলামে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প থেকে জানমাল রক্ষার আবেদন জানিয়ে বলা হয়,

সীমান্তের অপর পারে যাহাই ঘটুক, আমাদের স্বদেশ ভূমিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ও আত্মঘাতী রক্তপাত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এদেশের কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী সকলের প্রতি আমরা পুনরায় আকুল আবেদন জানাইতেছি।[৮৭]

১৬ জানুয়ারি ১৯৬৪ সালে *দৈনিক ইত্তেফাক* অফিসে সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের নিয়ে একটি বেসরকারি দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে।[৮৮] ১৭ জানুয়ারি *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ 'পূর্ব পাকিস্তান রুখে দাঁড়াও' শিরোনামে লেখা হলো :

সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ববাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে।... পূর্ববাংলার মানুষের জীবনের ওপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমরা পূর্ববাংলার সকল মানুষকে আহ্বান জানাইতেছি।[৮৯]

দৈনিক ইত্তেফাক-এ আবেদনপত্রটি প্রকাশিত হয় তাতে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের কোনো নাম ঠিকানা ছিল না। আবেদনপত্রটির নিচে শুধু 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' লেখা ছিল। উদ্যোক্তাগণ সরকারের নির্যাতনের ভয়েই নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেনি। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ১৯৬০ সালের প্রেস-এ্যাণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্সের ২ ধারার 'গ' উপ-ধারার ৫০, ৫২ (১) (২) ধারা বলে *দৈনিক ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীসহ বহু রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।[৯০]

সংবাদপত্রের ওপর দমনপীড়ন এখানেই থেমে থাকেনি। *দৈনিক ইত্তেফাকের* ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪ সংখ্যায়, 'দুর্বৃত্তদের দৌরাত্মে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে বিভিষিকা অব্যাহত। মুসলিম দরদীদের আক্রমণে তৃতীয় দিনেও বহু মুসলমান হতাহত। পশুশক্তি রুখিয়া দাঁড়াইবার জন সাধারণ নাগরিকদের দৃঢ় মনোভাব' শিরোনামে সংবাদ প্রতিবেদন এবং একই তারিখে পত্রিকাটি 'প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলুন' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। উক্ত সংবাদ ভাষ্য এবং সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে ২৮ মার্চ প্রাদেশিক সরকার পূর্বোক্ত অর্ডিন্যান্স বলে সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনের নিকট ২৫ হাজার টাকা জামানত তলব করে।

শুধু আইনের দ্বারা নয়, সরকার সমর্থক বিভিন্ন বাহিনী ও দাঙ্গাবাজ দুস্কৃতিকারীরা পত্রিকাগুলোর ওপর বিভিন্নভাবে হামলা করে। ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৪-তে *দৈনিক ইত্তেফাকের* অফিসে হামলা চালায়। এছাড়া ১৭ জানুয়ারি পত্রিকাটি একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, দাঙ্গাবাজ দুস্কৃতিকারীরা ঢাকার তিনটি দৈনিক পত্রিকার অফিসে ঢুকে সংশ্লিষ্টদের হত্যার হুমকি প্রদান করে।[৯১]

এরূপ সরকারি দমনপীড়ন এবং রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সংবাদপত্রগুলো ভয়াবহ দাঙ্গা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্রগুলোর এই তাৎক্ষণিক বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সর্বদলীয়ভাবে প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে দাঙ্গাবিরোধী প্রবল জনমত ও একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগ্রত হয়। ফলে দাঙ্গার লেলিহান আর বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারেনি এবং এই ঐক্য থেকেই শুরু হয় নতুন ধারার রাজনৈতিক আন্দোলন। প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির জাতিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ।[৯২]

১৯৬৪ সালে ১৬ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের তারিখ ছিল। এসংক্রান্ত সরকারে বিরোধী আন্দোলনে যে দমনপীড়ন চলছিল সেবিষয়ে খবর ও প্রতিবেদন *দৈনিক আজাদ* এবং *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় বিস্তারিত ছাপা হয়। ফলে বড় বড় শহরসহ সকল এলাকায় ছাত্র-জনতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'পত্রিকাগুলি ছাত্র জনতার মধ্যে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করছে' এই বলে সরকার উক্ত পত্রিকা দুটির ওপর ত্রিশ হাজার ঢার জামানত তলব করে নোটিশ জারি করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে *দৈনিক আজাদ* ও *দৈনিক সংবাদ*-এর সম্পাদকীয় কলাম 'শূন্য' রেখে পরিবেশন করা হয়। একইসঙ্গে সরকার ২৭ এপ্রিল ১৯৬৪ সাল থেকে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত সবরকম সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে প্রায় একমাস পত্র-পত্রিকা ছাত্র আন্দোলনের কোনো খবর প্রকাশ করতে পারেনি। এ নিষেধাজ্ঞা অবসানের পর ২৮ মে (১৯৬৪) বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাত্র নির্যাতনের ৩০ দিনের সংবাদ প্রকাশিত হয়।[৯৩] *দৈনিক আজাদ* 'পূর্ব্ব পাকিস্তানে ছাত্র নির্যাতনের গত ৩০ দিনের মোটমুটি খতিয়ান' শিরোনামে লিখে,

> কোনো বিশেষ কারণে গত একমাস যাবৎ ছাত্রদের সম্পর্কে কোনো সংবাদ আজাদে প্রকাশ করা হয় নাই। এমনকি গত ৩রা এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন[৯৪] ছাত্রের এম,এ ডিগ্রী প্রত্যাহার, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৫ বৎসরের জন্য ৪ জন, ৩ বৎসরের ৬ জন এবং ২ বৎসরের জন্য ১৪ জনকে রাষ্টিকেট করার সংবাদও আজাদে প্রকাশ করা যায় নাই। ইহা ছাড়া আরও ২০ জন ছাত্রকে সদাচারের গ্যারান্টি দানের নির্দেশও দেওয়া হয়। উপরোক্ত নির্দেশ জারীর পর কর্তৃপক্ষ ঢাকা সহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ১৯ জন ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করিয়াছেন। সরকারি কলা ভবনে ৩ জন এবং ঢাকা কলেজের আর ৯ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ দান করা হইয়াছে।[৯৫]

বিভিন্ন সংবাদপত্রের তরফ থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাই কোর্টে রিট আবেদন করা হয়। কোর্ট সংবাদপত্রের জামাতন তলব অবৈধ বলে ঘোষণা করে সরকারের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করে।[৯৬]

১৯৬৪ সালের মে মাস থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্যে চটকল শ্রমিক, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফসহ অন্যান্য মিল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের বিক্ষোভ-আন্দোলন চলে। এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তৎকালীন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি। আন্দোলনরত শ্রমিক জনতার ওপর সরকার ও সরকারসমর্থিত শ্রমিকরা ক্রমাগত অত্যাচার-নির্যাতন

চালায়।[৯৭] সরকারি নির্যাতন বা আদর্শ গত পার্থক্যের কারণে অন্যান্য পত্রিকা এসব আন্দোলনের খবরাখবর প্রকাশে নিরব থাকে। বামধারার *সাপ্তাহিক জনতা* এবং কোনো ক্ষেত্রে *দৈনিক সংবাদ* সতর্কতার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের ওপর সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৬৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সরকারবিরোধী শ্রমিক জনতার একটি মিছিলের ওপর যে মারাত্মক আক্রমণ পরিচালিত হয় এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে *সাপ্তাহিক জনতা* লিখেছিল,

> গতকল্য পূর্ণ হরতাল পালনকালে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক জনতার মিছিল খাতুমগঞ্জের বাহাদুর শাহ মাজারে পৌছিলে বিশিষ স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক লেলাইয়া দেওয়া গুণ্ডাদল মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। ...পুলিশ সুপার ও মহকুমা হাকিম নেতৃবৃন্দকে রক্ষা করিতে উপস্থিতি হইলে তাহারাও আক্রান্ত হয় এবং মহকুমা হাকিম সহ্য করিতে না পারিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে।[৯৮]

ক্রমাগত এসব সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল যথেষ্ট বিব্রত বোধ করে। এ কারণেই *সাপ্তাহিক জনতা*র ওপর সরকারি খড়ুগ নেমে আসে। সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ জারি করে সরকারবিরোধী আন্দোলন দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

এ সময় বাঙালিরা যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল সে বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রগুলোতে বিবৃতি, সম্পাদকীয় বা নিবন্ধ প্রকাশ হতে থাকে। এইসব লেখায় পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে যে অবাঙালি পুঁজিপতিদের জন্ম দেওয়া হচ্ছে তার নিখুঁত চিত্র ফুটে ওঠেছে। ৭ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে *দৈনিক ইত্তেফাক* এ বিষয়টির ওপর উল্লেখ করা হয়েছিল,

> প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ব্যাপারটাই পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়ন ব্যাহত করিবার জন্য একটি সুচতুর ত্রিমুখী পরিকল্পনা শামিল। এই পরিকল্পনার সাথে তিনটি পক্ষ যথা–ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সরকার, পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের একটি ক্ষুদ্র চক্র এবং বৈদেশিক ঋণদান সংস্থাসমূহ ও তাহাদের বিশেষজ্ঞগণ জড়িত রহিয়াছেন।[৯৯]

১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের উভয়াংশে অনুষ্ঠিত হয় মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন এবং ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকার তার কার্যক্রমের সমর্থনে সম্পূর্ণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে আইয়ুব খানের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালাবার মতো কোনো শক্তিশালী পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না। এ লক্ষ্যে সরকার ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে গঠন করে 'ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট'। বাঙালি বিদ্বেষী ইংরেজি *দৈনিক মর্নিং নিউজ* উক্ত ট্রাস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ৬ নভেম্বর ট্রাস্টের মালিকানাধীন বাংলা দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার। *দৈনিক পাকিস্তানের* সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন *দৈনিক আজাদের* প্রাক্তন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কয়েকজন সাংবাদিক ট্রাস্টের চাকুরি গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি শামসুর রাহমান, সানাউল্লাহ নূরী, আহমদ হুমায়ুন, কবি মোহাম্মদ উল্লাহ, কবি আহসান হাবিব, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, আব্দুল তোয়াব খান এবং মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক প্রমুখ।[১০০] এসকল প্রগতিশীল কবি সাংবাদিকদের সম্পৃক্ততার কারণে *দৈনিক পাকিস্তান* ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও উত্তরকালে এর ভূমিকা ট্রাস্টের অপর পত্রিকা *মর্নিং নিউজে*র ন্যায় বাঙালি সাহিত্য সংস্কৃতি বিরোধী হয়ে উঠে নি। নির্বাচনি প্রচারণার উদ্দেশ্যে একই সময়ে সরকার প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের উভয় অংশে টেলিভিশন কেন্দ্রও চালু করে।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকাসমূহ সরকারের পক্ষে প্রচারণা চালায়। অপরদিকে ট্রাস্ট ব্যতিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা আইয়ুব খানবিরোধী প্রচারণ অব্যাহত রাখে এবং গণমানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রভাবান্বিত করে। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র জগতে এই প্রথম এবং সরাসরি একটি বিভাজনের সৃষ্টি হয়।[১০১]

আওয়ামী লীগ এ সময় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্যে দাবি জোরদার করে। কিন্তু সরকার আওয়ামী লীগের গৃহিত নীতিকে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিকতা শব্দ ব্যবহার করে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ১৯৬৫ সালের ২০ এপ্রিল *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় 'মিঠে-কড়া' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেছিল,

> মূলধন গঠন, সরকারি উন্নয়ন ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য বন্টন, বৈদেশিক মুদ্রা বন্টন, দেশরক্ষা ও প্রশাসনিক বিভাগে চাকুরী রাজস্ব বন্টন, শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকারি অনুকূল ও সুযোগ, সুবিধা তথা জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান অবিরাম কিভাবে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহা অধুনাবহুল আলোচনার বিষয়বস্তু। অতীতে প্রথম যখন এসব বৈষম্য বঞ্চনার কথা তোলা হয়, তখন অপরাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থেও মুখপাত্র গণ সরাসরি ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া 'প্রাদেশিকতা', 'আঞ্চলিকতা', 'দেশানুগত্যহীনতা' ইত্যাদি তিরস্কারের দ্বারা সমস্যাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনকে যেমন ছাই-চাপা দিয়া রাখও যায় না, তেমনি দুটি অঞ্চলে গুরুতর বৈষম্যের বাস্তব সত্যকেও শেষ পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ক্ষমতাসীন মহলের রক্তচক্ষু এবং রাজনৈতিক নির্যাতনের চাপ সহ্য করিয়াও জনগণ বিষয়টি তুলিয়া ধরিয়াছে।[১০২]

বিশেষ করে, ১৯৬৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধ সময় পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে। পত্রপত্রিকা সাধারণ মানুষের মনোবল ধরে রাখার চেষ্টা করে। সাংবাদিকগণও যুদ্ধংদেহি ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম স্মৃতিচারণ করে বলেছেন,

> 'দৈনিক পাকিস্তান' অফিসেও অনেক জায়গার মতোই এক ধরনের যুদ্ধংদেহি ভাব লক্ষ করা গেল। সংক্রামক এই উত্তেজনা, যার ফলে আমার শান্ত মনেও যুদ্ধের হাল্কা ধরনের ধাক্কা লাগল। আমার (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম) ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী হাসান হাফিজুর রহমান এবং কারও কারও মধ্যে আর্কষণীয় উত্তেজনা পরিস্ফুট হলো। সন্দেহ নেই, সংক্রামক এই উত্তেজনা। হাসান হাফিজুর রহমান উত্তেজক-জনপ্রিয় উপসম্পাদকীয় লিখেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি, আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং আরও কোনও কোনও সাংবাদিক পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণ করে যুদ্ধপরবর্তী হাল হকিকত, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শৌর্যবীর্যের কথা ও কাহিনী শুনে ফিরে এসে বেশ কিছু লেখালেখি করেন।[১০৩]

এ যুদ্ধ তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এই চুক্তির বিষয়াবলি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর আহ্বানে লাহোরে 'নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত ৬ দফার একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ৬ দফার তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে কোনোক্রমেই ৬ দফাকে সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। অতঃপর শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলসহ সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করেন এবং একই দিনে লাহোরে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে ৬ দফা ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ কর্তৃক পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ ৬ দফা দাবি উত্থাপিত হলে সংবাদপত্রগুলো এক্ষেত্রেও একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম লীগ সমর্থক এবং ট্রাস্ট ব্যবস্থাধীন পত্রিকাগুলো এই দাবি উত্থাপনকে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে খণ্ডে পরিণত করার কৌশল বলে মনে করে।

পূর্ব বাংলা সফররত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ময়মনসিংহের সার্কিট হাউস ময়দানে ১৭ মার্চ (১৯৬৬) অনুষ্ঠিত এক সভায় বলেন, 'পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করার জন্য একদল বিচ্ছিন্নতাবাদী ছয়দফার নামে দেশকে গৃহযুদ্ধেও দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'[১০৪]

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৬ দফাকে প্রদেশের জনগণের প্রাণের দাবি বলে বার বার ঘোষণা করতে থাকে। *দৈনিক আজাদ*-আওয়ামী লীগের এই দাবি বিপক্ষে বলতে গিয়ে এক সম্পাদকীয়তে লিখে,

> বর্ত্তমান দেশে রাজনৈতিক গোলক ধাঁধার মাঝে ভবিষ্যৎ কি রূপ পাইতে চলিয়াছে, সেটা সন্ধান করাও এ জন্যই একান্ত দরকার। কোন দেশের ভবিষ্যৎ যে সবসময় সংখ্যাগুরু জনমতের উপর নির্ভর করে, তাহা নহে। তাই জনসমর্থনের দাবির বিচার-বিবেচনার বাইরেও অবস্থাটা ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা আছে।[১০৫]

১৯৬৬ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের ছয়দফার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন *দৈনিক আজাদ* 'রাজনৈতিক গোলক ধাঁধা' শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য বলেছিল,

> অবস্থাকে এমনভাবে রূপ দেওয়া হইতেছে যে, মনে হইতেছে কয়েকটি প্রশ্নের আশু মীমাংসা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সে প্রশ্ন গুলি হইতেছে : ১। পাকিস্তান অখণ্ড থাকিবে, না খণ্ডিত হইয়া পড়িবে। ২। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে, না আঞ্চলিক বিচ্ছন্নতার ফলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। ৩। পাকিস্তান অগ্রগতির পথে আগাইয়া যাইবে, না গৃহযুদ্ধের অশুভ পথে নামিয়া পড়িবে।... যে কোন পক্ষ হইতে দেশের অবস্থা সম্পর্কে এ ধরণের প্রশ্ন তুলিয়া ধরা হইলে তাহা চরম বিপজ্জনক অবস্থা বলিয়া বিবেচিত না হইয়া পারে না।[১০৬]

*দৈনিক আজাদে*র আইয়ুব খানের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। *দৈনিক মর্নিং নিউজ* ২১ এপ্রিল ৬ দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে মন্তব্য করে।[১০৭] কিন্তু ছয়দফা দাবিকে *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রথম থেকেই সমর্থন জানায়। পত্রিকাটি ছয়দফার খবরকে নিয়মিত জায়গা দেয়। অর্থাৎ ছয়দফা প্রচারণায় দৈনিক ইত্তেফাক ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মুখপত্র।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিক্রিয়া পরিপ্রেক্ষিতে ছয়দফার যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য আওয়ামী লীগ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬-তে সাংবাদিক সম্মেলন করে। শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার বিবরণ *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকাতে বিশাল গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। ঐ সাংবাদিক সম্মেলন সম্পর্কে পত্রিকাটি মন্তব্য করেছিল,

> ...রাজনীতিতে মধ্যপন্থা বিশ্বাস করা চলে না। তাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) জাতির সামনে ৬-দফা সুপারিশ তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই ৬-দফা কোন রাজনৈতিক দর কষাকষি নয়, কোন রাজনৈতিক চালবাজীও নয়–এই ৬-দফার সহিত পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসীর জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত।[১০৮]

ছয়দফাকে অনেক প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিরোধিতা করলেও দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে তাদের উদ্দেশ্যে *দৈনিক ইত্তেফাক* এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছিল,

> আমরা আর নেতাদের ঐক্যে বিশ্বাস করি না। আমরা জনগণের ঐক্যে বিশ্বাসী এবং জনগণের ঐক্য কায়েমের প্রত্যাশী। আমরা চাই, তথাকথিত প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান ঘটুক এবং রাজনীতি মানুষের অধিকারে আসুক। বিবেকের দংশন যদি অনুভক করেন, আসুন আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীকে সমুন্নত করিয়া তুলুন।[১০৯]

ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ছয়দফার দাবিতে আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। উপায়ন্তর না দেখে আইয়ুব খান রাজনৈতিক ভাবে দমননীতির প্রয়োগ শুরু করেন এমনকি জেলে প্রেরণের হুমকি দেখাতে শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যদি গৃহযুদ্ধ চাপাইয়া দেয় তবে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জাতিকে উহার মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকিতে হইবে।'[১১০] প্রেসিডেন্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘোষণা করেন যে, 'দেশের অখণ্ডতা বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টা সরকার সহ্য করিবে না। প্রয়োজন হইলে 'অস্ত্রের মুখে' উহার জবাব দেওয়া হইবে।'[১১১] ছয়দফার প্রবর্তক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রকাশে জনসভায় আইয়ুব খানের জবাব দেন।[১১২]

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় মুসাফির তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। ২৬ এপ্রিল ১৯৬৬ সালে কলামে মন্তব্য করেন,

> জনতার কাফেলা চলিবেই। আজ দেশ ব্যাপি এমন নেতৃত্ব চায় যাহারা নির্যাতন ও হয়রানীতে হতোদ্যম এবং জনতার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আগাইয়া নিতে পিছপাও হইবেন না। বরং জনদাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জেল জুলুম নির্যাতন হয়রানীকে দেশ সেবার সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।[১১৩]

শেখ মুজিবুর রহমান-এর ছয়দফার পক্ষে প্রচারণায় সরকার ভীত হয়ে পড়ে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৯৬৬ সালের ১০ মে তারিখে মুসাফির তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে লিখলেন,

> ৬ দফা যে বিপুল জনসমর্থন রহিয়াছে, সেই প্রশ্ন এখানে না তুলিয়াও বলা চলে যে, নির্যাতনের পথে কোন সমস্যার সমাধান হয় না, বরং জটিল হয়। যাহারা রাজনৈতিক কারণে বিশেষত: জনগণেল দাবী-দাওয়া ভূলিয়া গিয়া নির্যাতিত,

নিগৃহীত হইতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রহিল জাতির জন্য কোন ত্যাগই বৃথা যায় না, ইহা আজিকার সান্তনা ও প্রেরণা।[১১৪]

শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফতার করলে আওয়ামী লীগ ৭ই জুন পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালনের ডাক দেন। জনগণ তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে। হরতালে পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত হয় এবং ৮০০-এর বেশি লোক গ্রেফতার হয়। ৭ জুনের হরতারের প্রকৃত খবর যাতে জনগণ জানতে না পারে সেজন্য সরকারি প্রেস নোট ছাড়া কোন খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। ৮ জুন তারিখে পত্রিকাগুলোতে অনিবার্য কারণবশত: স্টাফ রিপোর্টারদের হরতাল সংক্রান্ত বিবরণ ছাপানো সম্ভব হলো কথাগুলো মুদ্রিত হয়।

সংবাদ পত্রিকায় ৯ জুন ১৯৬৬ তারিখে কর্মাধ্যক্ষের বরাত দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখেন,

> 'আমাদের নীরব প্রতিবাদ' শিরোনামে এক খবরে বলা হয়, যে মর্মান্তিক বেদনার ভাষা দেওয়া যায়না, সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য (৮ জুন) সংবাদ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের নিরব প্রতিবাদ একক হইলেও আমাদের পাঠকরাও শরীক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি।[১১৫]

১৫ জুন *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে ৬ দফার সমর্থনে পত্রিকায় 'রাজনৈতিক মঞ্চ' শিরোমানে কলাম লেখার কারণে গ্রেফতার করা হয়। ১৬ জুন ১৯৬৬ নিষিদ্ধ হয় *দৈনিক ইত্তেফাক*।[১১৬] এ সম্পকে শেখ মুজিবুর রহমান *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে বলেছেন,

> ঘুম থেকে উঠেই খবর পেলাম ইত্তেফাক কাগজের কোনো এক বড় অফিসারকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। ভাবলাম কে হবে, মানিক ভাই ছাড়া! খবর কেহই সঠিক বলতে পারছে না। পাগলের মতো সকলকেই জিজ্ঞাসা করলাম। কেহই ঠিক মতো বলতে পারে না। এমনভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। আমি চুপ করে বসে আছি, খবর আমাকে জানতেই হবে। বুঝতে পেরেছি মানিক ভাই, কিন্তু পাকাপাকি খবর পাচ্ছি না। একটু পরেই একজন বলল, 'তফাজ্জল হোসেন সাহেবকে ভোরবেলা নিয়ে এসেছে। ১০ নম্বর সেলে রেখেছে'। আমার মনে ভীষণ আঘাত লাগল খবরটায়। এরা মানিক ভাইকেও ছাড়ল না? এরা কতদূর নেমে গেছে। পাকিস্তানের সাংবাদিকদের মধ্যে তাঁর স্থান খুবই উচ্চে। তাঁর কলমের কাছে বাংলার খুব কম লেখকই দাঁড়াতে পারে। বিশেষ কওে তাঁর রাজনৈতিক সমালোচনার তুলনাই হয় না। তাঁর নিজের লেখা 'রাজনৈতিক মঞ্চ', পড়লে দুনিয়ার অনেক দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে সহজ হয়। সাধারণ লোকেরও তাঁর লেখা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁকে এক অর্থে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলা যেতে পারে।[১১৭]

পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রেস ক্লাবে এর প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন করে এবং বিবৃতি প্রদান করে। তারা অবিলম্বে *দৈনিক ইত্তেফাকে*র প্রকাশনা চালু করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচির ঘোষণা দান করে। *দৈনিক ইত্তেফাক* সরকারের ছয়দফার পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ১ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত পত্রিকাটিতে প্রকাশিত খবর পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্ট হয়। এই সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফার পক্ষে প্রচারণায় যে ভাষণগুলো দেন তা *দৈনিক ইত্তেফাক* ফলাও করে প্রচার করে। ছয়দফার প্রচারে শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন জনসভায় যে ভাষণ দেন তা *দৈনিক ইত্তেফাক* যে ভাবে প্রচার করে তা থেকে বোঝা পত্রিকাটির দর্শন। ছয়দফা সম্পৃক্ত *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর শিরোনামগুলো হলো,

> 'এ দাবী সস্তা রাজনৈতিক শ্লোগান নয়' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ মার্চ ১৯৬৬), 'ইহা দলের প্রয়োজনে প্রণীত রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ এপ্রিল ১৯৬৬), 'ছয়-দফা কোন দল বিশেষের কর্মসূচি কিংবা ভোট লাভের কৌশল নয়। ইহা রূঢ় বাস্তবতার প্রতিধ্বনি এবং আমাদের জীবন মরণ প্রশ্ন'(*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ এপ্রিল ১৯৬৬), '৬-দফা বিনিময়যোগ্য বস্তু নয়', '৬-দফা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ এপ্রিল ১৯৬৬), 'ছয় দফা রাজনৈতিক দরকষাকষির কোন ব্যাপার নহে, ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের জীবন-মরণ প্রশ্ন' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৬৬), 'পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিসনদ ৬-দফা' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৬৬), 'আমাদের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, না আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব, ছয়-দফার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা হইতে তাহা বুঝা যাইবে' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৬৬), 'কোন কিছুর বিনিময়ে ৬-দফা প্রত্যাহার করার প্রশ্ন উঠে না। কারণ

৬-দফা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়... দেশবাসীও ৬-দফাকে তাদের মুক্তি সনদ বলিয়া আদৃত করিয়াছেন।...৬-দফা আজ দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৬৬), 'অতীতে জেল খাটিয়াছি, মামলার আসামি হইয়াছি। এবারও জেল খাটিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা বা দাবীর ব্যাপারে কোনরূপ আপোষ করিতে প্রস্তুত নই' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ ১৯৬৬), 'প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ মার্চ ১৯৬৬)'[১১৮]

পরবর্তীকালে ঢাকা হাইকোর্টের এক আদেশ *ইত্তেফাক* পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকলেও একই বছরের ২৭ জুলাই তারিখে পুনরায় প্রাদেশিক সরকার এক বিশেষ নির্দেশ জারি করে এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় এবং ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় নি।

এ থেকে বোঝা যায় পত্রিকাটি জনগণের কথা বলায় তা সরকারের তোপের মুখে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬২ সালে জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেখানে বলা হয়েছিল, 'মানিক মিয়া ঢাকায় থেকে নিয়মিত স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও দাবি নিয়ে ইত্তেফাকে লিখে জনগণকে প্রস্তুত করবে'।[১১৯] শেখ মুজিবুর রহমান *ইত্তেফাক*কে যে পরিকল্পনা করেছিল তা সফল হওয়ায় মূলত পত্রিকাটি সরকারের তোপের মুখে পড়ে।

সমকালীন সংবাদপত্র সমূহ ৬ দফার পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়। তবে প্রথমদিকে ৬ দফার পক্ষে অধিকাংশ সংবাদপত্র যে নীতিগতভাবে দ্বিধাহীন সমর্থন জানিয়েছিল তা বলা যায় না। কিন্তু এ সময় উদ্ভূত সরকারবিরোধী আন্দোলনে বাধার সৃষ্টি হয় এমন কোনো ভূমিকাও সংবাদপত্র নেয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈতনীতিও কয়েকটি পত্রিকা অনুসরণ করেছে। এক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীর ন্যাপ সমর্থক *দৈনিক সংবাদ* সতর্ক ভূমিকা পালন করে। কারণ মওলানা ভাসানী স্বায়ত্তশাসন দাবির জোর সমর্থক হলের প্রথমদিকে ৬ দফা সমর্থন করেন নি। *দৈনিক আজাদ* কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৬ দফা সম্পর্কিত সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করলেও এর স্বপক্ষে কোনো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে নি।[১২০]

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময় শাসকগোষ্ঠী রেডিও পাকিস্তান ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। তখন যুদ্ধের মতো বিশেষ সময়ে সংবাদপত্রসমূহ এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিল। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে যে ছয়দফা আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল শাসকগোষ্ঠী মনে করে রবীন্দ্রসংগীত দেশবাসীকে বিপথে পরিচালিত করছে।[১২১] ফলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারার পরিপন্থি রবীন্দ্রসংগীত রেডিও ও টেলিভশনে প্রচার বন্ধ করার ঘোষণা দেন।[১২২] ২৪ জুন *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকায় সরকারি সংবাদ সংস্থা *এপিপি*র বরাত দিয়ে 'রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করা হবে না' শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়।[১২৩] কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এরূপ বক্তব্য প্রকাশের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এ ঘোষণার পক্ষে-বিপক্ষে সংবাদপত্রে দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি প্রায় সবই *দৈনিক পাকিস্তান* প্রকাশ করে। ১৯৬৭ সালের ২৫ জুন মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে 'রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কিত সিদ্ধান-১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি' শিরোনামে বিবৃতিতে সরকারি সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক বলে আখ্যায়িত করে।[১২৪] প্রবল প্রতিবাদের মুখে *দৈনিক মর্নিং নিউজ* সরকারের মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে 'Clarification' শীর্ষক সংবাদ ছাপে,

> A Spokesman of the ministry of information yesterday clarified Mr. Shahabuddin's about statement Tagore songs. He said the minister had stated that only those songs which were against Pakistan's cultural values' would not be broadcast in future and the use of other songs would also be reduced.[১২৫]

সরকারের উক্ত বক্তব্যের পরেও রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কিত বিতর্কের অবসান ঘটেনি। ২৯ জন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় দু'টি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। একটি ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে ৫ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি, অপরটি সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ৪০ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি।[১২৬]

বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি পত্রিকাগুলোর এ বিষয়টির পক্ষে বিপক্ষে অবস্থা নেয়। ৩০ জন ১৯৬৭ *দৈনিক আজাদ* 'রবীন্দ্র সাহিত্য ও পূর্ব-পাকিস্তান'-শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সরকারে বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে,

বাংলা সাহিত্যের সেই চিরস্থায়ী ব্যবধঅন ভাঙ্গার কাজের রবীন্দ্রনাথ নিজের অতিভাকে কখনো নিয়োজিত করেন নাই। তিনি মনে, প্রাণে, বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় সেই বঙ্কিম, হেম, নবীনেরই ধারার একান্ত অনুসারী এবং সেই ধারাকেই তিনি পরিণত, পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন।...বাংলার অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে তাহার উৎসুক্য ছিল না, এবং মুসলমানদের প্রতি উপেক্ষা ও ঘৃণা লইয়া যে একপেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সীমানা ভাঙ্গায় কিছুমাত্র আগ্রহও তিনি দেখঅন নাই।[১২৭]

দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়,

রবীন্দ্রনাথে কাব্য পাঠ করার সুযোগ এখানে আছে এবং থাকিবে। তবে পাকিস্তানের কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বিদেশী ও বিরুদ্ধভাব ধারার সাহিত্যিক, তাঁহার প্রতিভা যত বড়ই হউক না কেন, তাঁহার বিশেষ স্থান থাকা উচিত নহে।..নিজের আবেগ যাহাতে প্রতিফলিত নহে, সেটা অন্তত বাংলাভাষা শিক্ষার তাগিদে বাধ্যতামূলক পাঠ্য করিয়া এখানকার তরুণদিগতে পড়িতে বাধ্য করা উচিত নহে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সংস্কৃতির প্রশ্নটি অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন এবং সরকারের পক্ষেও এ ব্যাপারে এ ধরণের বির্তকের অবকাশ রাখিয়া দেওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক।[১২৮]

১৯৬৮ সালে 'বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি' সুপারিশ পেশ করে। সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৬৮ সালের ২৭ আগস্ট *দৈনিক আজাদ* 'বাংলা বর্ণমালা সংস্কার প্রসঙ্গে' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখে,

...উর্দু ভাষার পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা যদি উর্দু বর্ণমালা সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা তাত্ত্বিকেরা কেন হঠাৎ এই সংস্কারের ছুরিতে ভাষা বহুধা খণ্ডিত করিতে চাহিতেছেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। ভাষা সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। কারণ বাংলা ভাষার ওপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ আঘাত আসিয়াছে বহুবার।[১২৯]

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় এ সময় ভাষা সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন লেখকরে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে ৪ অক্টোবর প্রকাশিত (১৯৬৮) 'পাকিস্তানী সংস্কৃতি' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে পত্রিকাটি ভাষা সংস্কারের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। ঐদিনই পত্রিকাটি মুনীর চৌধুরী লিখিত 'বাংলা বানান ও বর্ণমালা সংস্কারের সমস্যা' শীর্ষক নিবন্ধে বাংলা ভাষা সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করা হয়। মুনীর চৌধুরীর প্রবন্ধের জবাবে *দৈনিক পাকিস্তানে* ১২ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়।[১৩০]

১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলার প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান জবানবন্দীতে পাকিস্তানের ইতিহাস, আওয়ামী লীগের সংগ্রামের ইতিহাস এবং তার ওপর সরকারের নির্যাতনের কথা ধারাবাহিক জোরালো ভাষায় তুলে ধরেন।[১৩১] শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদৃষ্টি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনি জানতেন মামলার ঘটনাগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। তাই তিনি জনমত সৃষ্টির কৌশল হিসেবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তৎকালীন পত্রিকাগুলো–*দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক সংবাদ* এবং *দৈনিক পাকিস্তান* জবানবন্দীর পূর্ণ বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করে। ফলে সাধারণ মানুষ পত্রিকার মাধ্যমে বিবরণ প্রকাশ হওয়ায় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনমত আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে *দৈনিক আজাদ* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৮ সালের জুন মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৪৭টি শীর্ষ সংবাদ শিরোনাম প্রকাশ করে। এছাড়াও পত্রিকাটি প্রায় ১৭০টি ছোটো বড় খবর প্রকাশি করে।[১৩২]

সংবাদপত্রে নিয়মিত খরব প্রকাশ হওয়া শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রহণযোগ্যতা জনগণের কাছে বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রের কল্যাণেই পরবর্তীকালে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়।

আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জনমতকে সরকারবিরোধী আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৯৬৮ সালের ৩ নভেম্বর ন্যাপ (ভাসানী)-এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানের জনসভায় মওলানা ভাসানী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এবং ভাষণে ছয়দফার গুরুত্ব তুলে

ধরেন, '..পাক ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, পূর্ব পাকিস্তানের অসহায়তা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির একান্ত অপরিহার্যতাকে পুনর্বার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরিয়াছেন।'[১৩৩]

১৯৬৯ সালের শুরুতে ৮ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তাগিদে 'একনায়কত্বের অবসান ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের' সংকল্প নিয়ে গঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ'। এই জোট গঠনকে *দৈনিক আজাদ* এবং *দৈনিক সংবাদ* ইতিবাচক হিসেবে মন্তব্য করে। কিন্তু ট্রাস্ট্রের পরিচালিত ইংরেজি *দৈনিক মর্নিং নিউজ* বিরোধী দলের ঐক্যকে উদ্দেশ্যবিহীন বলে বিদ্রুপ করে।[১৩৪]

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্রগণ পূর্ব নির্ধারিত ১১ দফার দাবিতে ধর্মঘট করলে পুলিশ তাতে বাধা দেয় এবং গুলিবর্ষণ করে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হন। পরদিন এই ঘটনার ছবির মাধ্যমে ফলাও করে তুলে ধরা হয়–*আজাদ*, *সংবাদ*, *পাকিস্তান অবজারভার* এমনকি *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকাতেও। ২১ জানুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠার পুরা পাতা জুড়ে ছিল আন্দোলনের খবর, ছবি ও হরতালের কর্মসূচি। আন্দোলনের ওপর সেদিনও লেখা হলো সম্পাদকীয় নিবন্ধ। *সংবাদ* এর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছিল,

> সামগ্রিকভাবে অগণতান্ত্রিক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে সরকার আজও আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া শান্তিরক্ষার দোহাই দিয়া এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটাইয়া চলিয়াছেন, তাহা কোন সভ্য দেশে চলিতে পারে না। বন্ধ করে এই গুলি গ্যালাজ ও হত্যানীতি।[১৩৫]

আন্দোলনের প্রতি *সংবাদের* শুধু সমর্থনই ছিল না, সে আন্দোলনের পর্যায় বিশ্লেষণ করে তাকে সফল করে তোলার লক্ষে সঠিক খাতে নিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশ ছিল এই সম্পাদকীয়তে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে পত্রিকাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে ২০ জানুয়ারির নির্মম হত্যাকাণ্ডে দৃশ্য ক্যামারাবন্দী করার সময় *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের* ফটো সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন পুলিশের প্রহারে গুরুতর আহত হন। পরবর্তী দুইদিন ঢাকার দৈনিক সংবাদপত্রে এসব ঘটনার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[১৩৬] *দৈনিক সংবাদ* ২১ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে সম্পাদকীয় নিবন্ধে হত্যা-দমন নীতির কঠোর সমালোচনা করে লিখে,

> সামগ্রিকভাবে যে অগণতান্ত্রিক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাকে সরকার আজও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া শান্তি রক্ষার দোহাই দিয়া এই ধরণের মর্মান্তিক ঘটনার পর ঘটনা ঘটাইয়া চালিয়াছে-তাহা কোনো সভ্য দেশে চলিতে পারেনা। বন্ধ করে এই গুলি গালাজ ও হত্যা নীতি।[১৩৭]

বিশেষ করে সরকার পরিচালিত পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* ২১ জানুয়ারি (১৯৬৯) প্রতিবেদনে ছবিসহ পুলিশ কর্তৃক সরাসরি ছাত্রহত্যার বিবরণ প্রকাশ করে লিখে,

> গতকাল সোমবার ছাত্র বিক্ষোভকালে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টরের রিভলবারের গুলিতে জনাব আসাদুজ্জামান নিহত হয়েছেন। পুরনো কলাভবন ও বর্তমান পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন ইসস্টিটিউট সম্মখবর্তী রাস্তায় ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বেলা ২টায় পুলিশেল একটি চলন্ত জীব থেকে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর রিবলবার থেকে গুলিবর্ষন কললে আসাদুজ্জামানের বুকে গুলিবিদ্ধ হয়।[১৩৮]

তবে *দৈনিক পাকিস্তান* অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও এ সম্পর্কিত প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধটি ছিল খুব সাধারণ ও সরলীকৃত। 'ঢাকার পরিস্থিতি' শীর্ষক ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল, সরকার নয়, ছাত্রহত্যার জন্য পুলিশের হটকারী সিদ্ধান্তই দায়ী। এ ব্যাপারে ছাত্র হত্যার জন্য সরাসরি পুলিশের দায়িত্বহীনতার প্রতি নিন্দা জানিয়ে এর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করা হয়।[১৩৯] এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ পত্রিকাটি সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে *দৈনিক আজাদ*। আসাদের মৃত্যুর পর ২২ জানুয়ারি *দৈনিক আজাদের* প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলামব্যাপী সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'মৃত্যুর জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ; কবরের ঘুম ভাঙে/

জীবনের দাবী আজ এতই বিরাট।'[১৪০] প্রতিবেদনটিতে আবেগ ও বাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তবে প্রতিবেদন থেকে খুব ভালোভাবেই পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করা যায়। প্রতিবেদনটি হলো,

> শহীদ আসাদের মৃত্যুর খবর দাবানলের মত সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ার সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের সামনে একদল ছাত্রের গুঞ্জরন থেকে উপরের ঐ শব্দগুলি আমার কানে নয় বুকে এসে বাজল। ছেলেটি আবৃতি করছিল না, যেন চোখ মুখ কণ্ঠ এক করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করছিল। বাকি যে কয়জন শুনছে তাদের চোখেও যেন আগুন জ্বলছে। কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি শোকাহত মর্মে ভাব দেখেনি, দেখিছি সাথীর মৃত্যুতে সমগ্র ছাত্র সমাজের গত এক দশকের সঞ্চিত বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়িয়াছে। জালেমের জিঞ্জির ভাংগার শপথে তাহারা অটল।[১৪১]

প্রতিবেদনে শহরের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছিল,

> দেখে মনে হল, সরকারি নির্যাতন আর বেত, বুলেট বেয়নেট সমগ্র জনতাকে আজ প্রতিবাদমুখর আর বিক্ষুব্ধ করে তুলিয়াছে। মুক্তি পিয়াসী মানুষ আজ আন্দোলনে নামিতে কিছু দ্বিধা করিতেছে না। প্রিয় নওয়াবগঞ্জ এলাকার পানওয়ালা বলিয়াছেন, শুধু ছাত্র-ছাত্রী আন্দোলন অইত না। ইবার হক্কলের এক হওন লাইগ।[১৪২]

ঐদিন *দৈনিক আজাদের* প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত পাঁচটি ছবির ক্যাম্পশানের ভাষাতেও পত্রিকায় সম্পাদকীয় নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ছবির ক্যাপশনগুলো ছিল–

১. সমুদ্র উত্তাল জনতা তরঙ্গ কে রোখে? (মিছিলের ছবি)
২. সেই মৃত্যুহীন প্রাণ (আসাদের ছবি)
৩. আসাদ মরেছে, কিন্ত আমরা মরিনি
   সংগ্রাম আমাদের চলবেই–একজন ছাত্র
৪. ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে
৫. একদিনের হরতালে অইব না। হাজার দিন হরতাল করম।[১৪৩]

২২ জানুয়ারি *দৈনিক সংবাদ* 'সংগ্রামের নিশানা' শীর্ষক অপর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে জনগণের আন্দোলনের প্রতি পত্রিকাটি সর্বাত্মক সমর্থন জানায় এবং পরবর্তী আন্দোলন এগিয়ে যাওয়া ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান করে।[১৪৪]

২৩ জানুয়ারি ১৯৬৯-এ *দৈনিক আজাদ*-এর ব্যানার শিরোনাম ছিল, 'আঘাত হেনেছে নিত্য, অত্যাচার যত লক্ষ চিত্ত, দীপ্ত ক্রোধে এবার বর বারুদ, আসাদ সহস্র মন এখানে জাগ্রত সারাদেশে আজ যেন রক্তের বুদ্বুদ।'[১৪৫] ২৩ জানুয়ারি ৩০ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী মশাল মিছিলে অংশ নেন। সেদিনের মিছিলের ওপর *দৈনিক আজাদে* যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম ছিল,

> যে আলোর পথযাত্রী মুক্তির সংগ্রামী পথে শুরু করিয়াছে তাহার যাত্রা, গত বৃহস্পতিবারের মিছিলে তাহার হাতে মশাল ছিল সে এক অন্যান্য বৃহস্পতিবার। বাহান্নর একুশের অনেক চড়াই উৎরায় ডিঙিয়ে আবার আসিয়াছিল উনসত্তরের জানুয়ারীতে আরেক আলোক দীপ্ত বৃহস্পতিবার। ঢাকায় সেদিন মিছিল ছিল। ওরা ডাক দিয়াছিল মশাল মিছিলের। একুশের উত্তরসূরির ছাত্র সমাজের ডাকে দিকে দিকে বেজে উঠিয়াছে অগ্নিবীনার তার। এমন মিছিলে শরিক হইয়াছে কারখানার শ্রমিক, পথের রিক্সাওয়ালা, গঞ্জের মহাজন, ষ্টেশনের কুলি, ঘরের গৃহিনী, অফিসের কেরানী, নৌকার মাঝি-এক কথায় সব স্তরে মানুষ–তাদের বুলন্দ আওয়াজে করিয়া কাপিয়া উঠিয়াছে রাজধানীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে ফিরিয়াছে। সর্বত এখন এক আওয়াজ আসাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।[১৪৬]

মর্নিং নিউজ পত্রিকাতে গণঅভ্যুত্থানের খবর নিয়মিত ছাপা হলেও তা খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো না। শুধু তাই নয়, ৬৯ গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন আসাদ নিহত হলে পত্রিকাটিতে কোনে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়নি। ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টে অন্য পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তানের* ভূমিকাও একই রকম ছিল। পত্রিকা দুটোর ভূমিকার জন্য সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ২৪ জানুয়ারি ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১৪৭] এই কারণে পত্রিকা দুটি ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় নি।

শত-বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সংগ্রামী জনতা আন্দোলন চালিয়ে যান। ফলে বাধ্য হয়ে আইয়ুব খান পরিস্থিতি অবলোকন করতে ১৯৬৯-এর ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আসেন। পরদিন ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি 'দেশ রক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ' বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ফলে ১৯৬৬ সাল থেকে *ইত্তেফাকের* ছাপাখানা বন্ধ থাকার বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।[১৪৮]

২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হলে ২৩ তারিখে সকল পত্রিকায় তা শিরোনাম করা হয়। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে এ সময় *দৈনিক ইত্তেফাক* আবার সরব হয়। পত্রিকাটি শিরোনাম ছিল, 'ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার মুজিবসহ সকলের মুক্তি লাভ : কারাগার রাজবন্দী শূন্য'। এছাড়াও *দৈনিক ইত্তেফাক* তার বিশেষ সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেছিল :

> পূর্ব বাংলার মাটিতে অবশেষে বাস্তিলের কারাগার ধসিয়া পড়িয়াছে জনতার জয় হইয়াছে। গণদাবীর নিকট নতি স্বীকার করিয়া দোর্দন্ড প্রতাব সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব বাংলার অগ্নিসন্তান, দেশ গৌরব, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই মামলায় অভিযুক্ত সকলকে কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে গতকল্য (শনিবার) মধ্যাহ্নে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন।[১৪৯]

দৈনিক আজাদ পত্রিকাতে পুরো প্রথম পাতাতে আট কলামব্যাপী খবরে শিরোনাম ছিল মুক্তমানব শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে, এসো জনতার মুখরিত সখ্যে।[১৫০]

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আগরতলার মামলা প্রত্যাহার ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাক* যে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন তাতে বাঙালি বিজয়ের আদায়ের কথাই ব্যক্ত হয়েছিল :

> জয় নিপীড়িত জনগণের জয়, জয় নব উত্থান-আজ উৎসবের দিন নয়, বিজয়ের দিন। আজ আনন্দের দিন নয়, স্মরণে দিন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। দুঃশাসনের কারারক্ষ হইতে দেশের প্রিয় সন্তান শেখ মুজিব অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে মুক্ত হইয়া আবার তার প্রিয় দেশবাসীর মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শহীদি ঈদে আমাদের অভিযান সফল হইয়াছে। গণজাগরণের প্রবল প্লাবনের পলিমাটিতে রক্তাক্ষরে লিভিত হইয়াছে। নূতন এক ঊষার স্বর্ণদুয়ার উন্মুক্ত করার অবিস্মরণীয় কাহিনী। এ কাহিনী অসংখ্য শহীদের আত্মদানের, অসংখ্য বীরমাতা ও বীরজায়ার অশ্রু ও হাহাকার সংবরণের কাহিনী।[১৫১]

শেখ মুজিবের মুক্তি উপলক্ষ্যে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় ঐ সম্পাদকীয়তে আরও বলেছিল,

> তবু আজ অহল্যা প্রতিম পূর্ব বাংলা জাগ্রত। তাহার অশোক আকশে ফাল্গুনের রক্ত সূর্যে নুতন প্রাণের পতাকা শিহরিতা। মেঘের সিংহবাহনে নুতন প্রভাত আসিয়াছে। এই প্রভাতের সাধনায় তিমির রাত্রির তপস্যা যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন আজ বিপুল বিজয়ের ক্রান্তি লগ্নে তাহাদেরই সর্বাগ্রে স্মরণ করি। তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই আমাদের অবনত চিত্তের অভিনন্দন। চারিদিকে আজ জয় ধ্বনি। চারিদিকে আজ প্রলয়োল্লাস ব্রজ ভেরীতে প্রাণের সাড়া জাগিয়াছে। বন্দীশালায় সুপ্ত সুবাস কী জাগরণেল প্রথম চমকে দুলিয়া উঠিয়াছে। সব বাধা, সব চক্রান্ত, সব আগল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গণ বিরোধী প্রতিক্রিয়ার দুর্গে গণজাগরণের বিজয় কেতন একদিন উড্ডীন হইবেই, এ প্রত্যয় আমাদের চিরকালের।...দুঃশাসনের লৌহ কপাট ভাঙ্গিয়া, প্রভাতের রক্ত সূর্য ছিনিয়া আনিয়া এ গণ মানুষেরা আবার প্রমান করিল, তাহারা অপরাজেয়। তাহারা চিরকালের অপরভূত শক্তি... ইতিহাসের গতি অনিরুদ্ধ। গণ শক্তির বিজয় অপ্রতিরোধ্য। সকল সংগ্রামের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে তাই আমরা আবার আমাদের লক্ষ্যের ধ্রুবতারা অন্বেষী হইয়াছি। বিজয়ের গৌরবে আমরা যেন মোহবিষ্ট না হই। পথভ্রষ্ট না হই। জনগণের বিজয়ের রথচক্রে সেই ব্রজের ভেরীই নিনাদিত হউক- যাহার মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত সার্থক ও অধিকার চেতনা জাগ্রত। জনগণের জয় সার্থক হউক, জনগণের উত্থান স্থায়ী ও সফল হউক।[১৫২]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর ২৩ ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

দৈনিক আজাদ এবং *দৈনিক সংবাদ* পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে ছাত্র বিক্ষোভের খবর ও ছবি প্রকাশ করে। একই তারিখে পত্রিকা দুটি ডানদিকের উপরের বক্স করা অংশে ছাত্রদের ডাকা হরতালের কর্মসূচি প্রকাশিত হয়। গণঅভ্যুত্থানকালে *দৈনিক আজাদের*

ভূমিক ছিল খুবই জোরালো। পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার একটি অংশ প্রতিদিন শুধু গণআন্দোলনের খবর ও ছবি প্রকাশের জন্যে বরাদ্ধ ছিল। *দৈনিক ইত্তেফাক* নিষিদ্ধ থাকায় *আজাদ*ই পাঠকের চাহিদা পূরণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। আসাদের মৃত্যুর পর ঢাকা শহরের জনসাধারণের মধ্যে বিস্ময়কর জাগরণ ঘটে। ২১ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে বায়তুল মোকাররম মসজিদে অনুষ্ঠিত আসাদের জানাযায় প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ঘটে।[১৫৩]

ঢাকায় ছাত্র হত্যার পরবর্তী সময় থেকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংবাদপত্র উভয়ই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।[১৫৪] ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় অংশে সৃষ্ট ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের ফলে ২৫ মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন।[১৫৫]

আইয়ুব খান বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তাঁর উত্তরসূরী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে একই কৌশলে ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানের পুনরায় সামরিক আইন জারি করে। ৩১ মার্চ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক জারিকৃত সামরিক বিধি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এক সামরিক বিধিতে বলা হয়, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও জনমনে উত্তেজনা সৃষ্টি এবং দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, এমন কোনো খবরাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা যাবে না। এরূপ প্রচেষ্টা করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করা হয়।[১৫৬]

১৯৬৯ সালের ৮ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতারভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রথা বাতিল এবং ‘এক ব্যক্তি এক ভোট’ ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেন।[১৫৭] ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু করারও ঘোষণা দেন। প্রথমে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর পাকিস্তানের ৫টি প্রাদেশিক পরিষদের জন্য সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আগস্ট মাসে ব্যাপক বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব-ঘোষিত তারিখের পরিবর্তে যথাক্রমে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারিত হয়।

সংবাদপত্রগুলো আসন্ন নির্বাচনকে আসন্ন নির্বাচনকে স্বাগত জানায়। কিন্তু একইসাথে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা মোতাবেক আদৌ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা-এরূপ সংশয়ও ব্যক্ত করে। ২৮ মার্চ ১৯৬৯ তারিখে *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রথম মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে,

> সাধারণভাবে সামরিক শাসন ব্যবস্থা কাহারো কাম্য নয়। জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তৃতায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষত ১৯৫৮ সালে প্রবর্তিত সামরিক শাসন দীর্ঘকাল চলিবার পরে দেশে পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তিত করিতে হইবে, ইহা কেহই ধারণা করে নাই।[১৫৮]

ঐ নিবন্ধে আরও বলা হয়,

> আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত জাতীয় ভিত্তিতে একটিবারও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্যই বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।...আমরা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। কেননা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অন্য কোনো ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যাইবে না। নির্বাচন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের প্রকৃষ্ট উপায়।[১৫৯]

স্বাধীন বাংলাদেশের পেছনে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সাধারণ নির্বাচনকে ঘিরে সংবাদপত্রগুলো পুনরায় তাদের নিজ নিজ মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ নির্বাচনে *দৈনিক ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানায়। *দৈনিক সংবাদ* মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টিকে সমর্থন জানায়। বদরুদ্দীন উমরে সম্পাদনায় প্রকাশিত *সাপ্তাহিক গণশক্তি* ও এনায়েতুল্লাহ খানের পরিচালনায় ইংরেজি *সাপ্তাহিক হলিডে* আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচারণায় অংশ নেয়। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়ে *দৈনিক ইত্তেফাকের* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নির্বাচনি খবরাখবর প্রচার ও প্রকাশে যখন পত্র-পত্রিকা ব্যস্ত, ঠিক সে মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় এলাকায়

নেমে আসে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে অবর্ননীয় দূরাবস্থা। ১৫ ও ১৬ নভেম্বর যথাক্রমে *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *দৈনিক পূর্বদেশ*-এ প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন থেকে অনুধাবন করা যায় পত্রিকাগুলোর বিবরণ কত মর্মস্পর্শী ছিল। *দৈনিক ইত্তেফাক* সে ভয়াল রাতে দুর্গত এলাকার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখে,

> সেই দুর্যোগময় রাত্রে উন্মাত্ত দৈত্যরাজির তাথৈ তাথৈ নৃত্যের প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া সামনে যা কিছু পড়িয়াছে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া, ভাসাইয়া দিয়া ধ্বংসের সেই অপদেবতা সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছাস এক সময় বিষাদ নিয়াছে। কিন্তু খুলনা হইতে কক্সবাজার পর্যন্ত সুবিস্তৃত উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলে সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মৃত্যু আর ধ্বংসের বিভীষিকাময় স্বাক্ষর-বাংলার উপকূলে নামিয়া আসিয়াছে মৃত্যুর স্তব্ধতা।[১৬০]

দৈনিক পূর্বদেশ ১৬ নভেম্বর ১৯৭০এ 'বাংলার মানুষ কাঁদো' শিরোনামে আবেগতাড়িত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে,

> পূর্ব বাংলার মানুষ, তুমি কাঁদো। কাঁদো বাংলার মানুষ। এখন কান্না ছাড়া আর তোমার জন্য কি বাকী আছে বলো?...লাখো মানুষের গলিত শব ছড়িয়ে আছে জনপদে, পানিতে, কচুরিপানার মত ভাসছে অচেনা শবের মিছিল-তাঁদের জন্যে কাঁদো বাংলা-কাঁদো।[১৬১]

১৫ নভেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে *দৈনিক পাকিস্তান* প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহত-নিহতদের স্মরণে জাতীয় শোক পালন করার আহ্বান জানায়। কিন্তু দুর্গত এলাকায় ত্রাণ-রিলিফ বিতরণে সরকার যথেষ্ট তৎপরতা দেখায়নি, এমনকি জলোচ্ছ্বাসে আহত-নিহত লাখ লাখ বানভাসী মানুষকে উদ্ধারেও কোনো সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এরূপ উদাসীনতার আর অবহেলার খবর পত্র-পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রচার হতে থাকে। এমনকি সরকারি পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* এক সম্পাদকীয়তে দুর্গতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সরকারি ব্যর্থতার সমালোচনা করে ব্যাপক প্রাণহানির জন্য সরকারকে দায়ী করে। ১৯ নভেম্বর সরকারি পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* সম্পাদকীয় কলামে সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেন,

> ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রের জলোচ্ছাস তার আকস্মিক থাবার আঘাতে লাখ লাখ আদম সন্তানের জীবনাবসান ঘটিয়ে চলে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে আরও লাখ লাখ জীবন্মৃত মানুষ।...ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া যাচ্ছে দীর্ঘদিনের অনাহারে কদাহারে এদের অনেকে মরেছে। মরতে বসেছে। এদের এই মৃত্যুর মতো এদের মৃত্যুও মেন-মেড। এদেশেল মানুষের বিশেষ করে শাসক গোষ্ঠীর অপরিহার্য কর্তব্য ছিল এই জীবনমৃত মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা।...রিলিখ কমিশনার স্বীকার না করলেও ইতিমধ্যে যে তাদের গাফেলতির জন্য বেশ কিছুসংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে-একটু সহৃদয় চেষ্টা চালালেই তাদের বাঁচানো অসম্ভব ছিল না। এই 'মেন-মেড' মৃত্যুর দায়িত্ব তারা এড়াবেন কি করে।[১৬২]

দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সরকারি উচ্চ পর্যায়ে কোনো নেতা বা মন্ত্রী আসেন নি। এ সব ঘটনায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণির প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। দুর্গত এলাকা থেকে ফিরে এসে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রের সঙ্গে মতবিনিময়ে সরকারি কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করে।[১৬৩] রাজনৈতিক জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ নভেম্বর ন্যাপ-এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মওলানা ভাসানী সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। *দৈনিক পাকিস্তান* ২৪ নভেম্বর মওলানা ভাসানীন উদ্ধৃতি দিয়ে ৪ কলাম শিরোনাম করে, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান-জিন্দাবাদ'।[১৬৪] কিন্তু মওলানা ভাসানী ভোটের বিরোধিতা করে স্লোগান দেন, 'ভোটের আগে ভাত চাই'। কিন্তু *দৈনিক ইত্তেফাক* ভোটে বিরোধিতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে উপ-সম্পাদকীয়তে লিখেছিল,

> আসন্ন নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চলিতেছে। বাহ্যতঃ অহেতুক হইলেও এ আশংকা অনেকের মনে জাগিতেছে। অনেকেই খোলাখুলি সে আশংকা প্রকাশ করিতেছেন। আশংকার কোন যুক্তি থাকিবে না। কিন্তু এ আশংকাটার যুক্তিও আছে। মনে হয় দৃশ্য অদৃশ্য হাতে সমবেত চেষ্টা যেন নির্বাচন ভন্ডুল করিবার কাজে নিয়োজিত আছে।[১৬৫]

দৈনিক ইত্তেফাক ভোট পেছনোর রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করে। পত্রিকাটির ভাষ্য হলো :

> ... যে শক্তি নির্বাচনের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে, তাহাদের আমরা চিনি। তাহারা বলিতেছে ভোটের আগে ভাত চাই, বন্যা নিয়ন্ত্রন না হইলে ব্যালট বাক্স জ্বালিয়ে দিব, ইত্যাদি।...নির্বাচন বর্জনটা হুমকি মাত্র। দাবি দুইটার উপর এমফ্যাসিস

দেওয়ার জন্য যখন তারা বলেন ও দুইটা না হইলে নির্বাচন হইতে দিবনা অথবা ব্যালট বাক্স জ্বালিয়ে দিব তখনই তাহারা সীমা লংঘন করেন। ইহাতে হাত মিলাইবার বা বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ এক পাও আগাইবে না; কিন্তু নির্বাচনের তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ একশ পা পিছাইয়া যাইব।[১৬৬]

পুরো নভেম্বর মাস সংবাদপত্রসমূহ বন্যা ও ঝড় জলোচ্ছ্বাসের খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সমালোচনা ও উদাসীনতা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে এবং বাঙালিত্বের প্রতি জনমত গঠন ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাঙালির সামনে ওঠে আসে।

নির্বাচনের পথে নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেষাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দৈনিক ইত্তেফাক স্বস্তি প্রকাশ করে সম্পাদকীয় কলামে লিখে,

অবশেষে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের নির্ধারিত দিবসটি সমুপস্থিত। ইহার পথে বাধা-বিপত্তি অনেক আসিয়াছে, দ্বিধা-সংশয় অনেক জাগিয়াছে, অনেক হুমকি ও উস্কানি প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্ন অজুহাতে নির্বাচন অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখার জন্য প্রেসিডেন্টের উপরও প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে।... কোনো কোনো অতি প্রগতিবাদী মহল এবং ধর্ম ব্যবসায়ী মহল যেন ঐক্যজোট গঠন করতঃ একটা বছর ধরিয়া কাঁদা ছড়াইয়াছে।...এবার নির্বাচন না হইলে এই দুর্ভাগা দেশে কবে নির্বাচন হইত, উহা আদৌ হইতে পারিত কিনা, সামরিকশাসন কতদিন দীর্ঘায়িত হইত, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রতরী কোনদিকে ধাবিত হইত এবং জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার দশা কি দাঁড়াইত কে বলিতে পারে।[১৬৭]

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দল ভিত্তিক প্রতীক ঘোষিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র তাদের সমমনা দলীয় প্রার্থীদেরকে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করে। *দৈনিক ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করার জন্য প্রচারণা চালায়। নির্বাচনি প্রচারণায় *দৈনিক ইত্তেফাক* ছয়দফা ও নৌকা মার্কার পক্ষে ভোট দানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এই নির্বাচনকে *দৈনিক ইত্তেফাক* শোষকদের কাছ হতে বাংলার স্বাধিকার ছিনিয়ে আনার এক চরম লড়াই বলে আখ্যায়িত করেছিল।[১৬৮] ৭০-এর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে *দৈনিক ইত্তেফাক* বাঙালির স্বায়ত্তশাসন ও পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দিয়েছিল। নির্বাচন উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি জনসভার নিউজ কাভারেজ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দায়িত্ব কী হওয়া উচিত? সে প্রসঙ্গে *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

...একথা সত্যি যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ ও দেশের আপামর মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগের নিকট আমরা অনেক কিছু আশা করি। দেশ ও জাতির স্বার্থে আওয়ামী লীগের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস এ দেশের রাজনীতিতে এক ও অনন্য। এই দলের নেতা ও কর্মীরাই এ দেশের বুকে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বিরোধীদলের পত্তনদার, যার অবর্তমান এ দেশে গণতন্ত্রের কথা চিন্তাই করা চলিত না।[১৬৯]

নির্বাচনে যাতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় সে বিষয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে *দৈনিক ইত্তেফাক* 'রাজনীতি ও রাজনৈতিক দায়িত্ব' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে বলেছিল :

স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে গিয়া...দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সহ শত সহস্র কর্মীকে অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হইয়াছে। মূলতঃ তাহাদের ত্যাগ তিতিক্ষার ফলে জাতি আজ তার জীবনে প্রথম দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে শরীক হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। আজ তাই তাহাদের উপর এক বিরাট দায়িত্ব। অতীতে জনগণেল অধিকার প্রতিষ্ঠার যখনই কোন ক্ষেত্র প্রস্তত হইতে চলিয়াছে, ঠিক তখনই স্বার্থান্বেষী মহলের চক্র-চক্রান্ত শেষ মুহূর্তে সব কিছু ভন্ডুল হইয়া গিয়াছে। এবারও যে সে চলিতেছে না বা চলিবে না, কি বলিতে পারে। এদিক দিয়া আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে অতিমাত্রায় সচেতন থাকিতে হইবে।[১৭০]

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে *সংবাদ* ও ইংরেজি *দৈনিক মর্নিং নিউজ* আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন। 'গুন্ডামী বন্ধ কর' শীর্ষক শিরোনামে সংবাদ আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনা করে ন্যাপের পক্ষাবলম্বন করে। ঐ সম্পাদকীয়তে বলা

হয়েছিল, 'গণতন্ত্র ও জনগণের স্বার্থে আওয়ামী লীগের গুন্ডাবাজি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। সুষ্ট নির্বাচনি পরিবেশ রক্ষার জন্যই ইহা প্রয়োজন। কারণ আওয়ামী লীগের বাড়াবাড়ি ও গুন্ডামি চলিতে থাকিলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও উহার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে বাধ্য হইবে।'[১৭১] অন্যদিকে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় এর প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকাটিতে সংবাদ ও মর্ণিং নিউজের এই ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিল,

> রতনে রতন চিনিয়াছে। 'মতিঝিলের মতি'র গ্রুপ অব পাবলিকেশনের ইংরেজী দৈনিকটি এখন উপকথার সেই বিচক্ষন ব্যক্তির মত নিজেকে একমাত্র বুদ্ধিমান ভাবিয়া আর সকলকে গবেট ও বোকা ঠাওরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।...ইংরেজী দৈনিক নিয়াছেন অদৃশ্য দেবতাদের সম্মুখে আওয়ামী লীগকে 'ধ্বংস কর' হিসাবে তুলিয়া ধরার।[১৭২]

দৈনিক ইত্তেফাকের ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০এ প্রকাশিত নিবন্ধে ভোটারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে এদের উদ্দেশ্যে বলা হয়,

> ... ভোটের ক্ষমতা জনগণেরই ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা। মহা পরীক্ষার এই দিনটিতে প্রতিটি দেশপ্রাণ নাগরিক বঞ্চিত-বিশীর্ণ পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের শ্বাশতদাবী সম্মুখে রাখিয়া এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেদের সেই ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করিবেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি লইয়া আজিকার এই মঙ্গল প্রভাতকে আমরা অভিনন্দন জানাই।[১৭৩]

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে *সংবাদ* ও ইংরেজি *দৈনিক মনিং নিউজ* আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে। কিন্তু অন্যান্য সংবাদপত্রগুলোর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সমালোচনা ও উদাসীনতা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে পাকিস্তানবিরোধী জনমত সৃষ্টি করে। ফলে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বরের উভয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এর পেছনে সংবাদপত্রে ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। বিশেষ করে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সংবাদপত্র সমর্থন জানিয়ে যে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে তা নির্বাচনে যথার্থ প্রতিফলিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আরও ত্বরান্বিত করে।

অসহযোগ আন্দোলন

পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সকল পত্রপত্রিকায় অসহযোগ আন্দোলনে জনমতের ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তা নিয়ে উদ্বেগ্ন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল উত্তপ্ত। ১ মার্চ ১৯৭১ এক সরকারি ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল আহসানকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সামরিক প্রশাসক জে. ইয়াকুব খান সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার লক্ষ্যে নতুন করে সামরিক বিধি জারি করেন। ১ মার্চ জারিকৃত সামরিক বিধিতে ঘোষণা করা হয়,

> পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনো ছবি, খবর ও অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্র সমূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হয়ে ২৫ নম্বর সামরিক শাসন বিধি প্রযোজ্য হবে। এর সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।[১৭৪]

কিন্তু ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম, সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও ছবি বিশ্লেষণ করলে কোনো অবস্থায়ই মনে হয় না যে, সে সময়ে সংবাদপত্র আদৌ উপর্যুক্ত বিধি নিষেধের কোনো তোয়াক্কা করেছে। বরং এ সময় একদিকে লাগাতার হরতাল অপরদিকে সরকারের জারিকরা সান্ধ্য আইনের ফলে একমাত্র সংবাদপত্রই আন্দোলনকারী জনতার মূল প্রেরণা হয়ে ওঠে।[১৭৫] শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রসমূহ জনগণের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতেও জনমত সংগঠিত করে। বেশিরভাগ পত্রিকা আন্দোলনের পক্ষে থাকলেও পূর্বের মতোই ইংরেজি পত্রিকা *মনিং নিউজ* বাঙালি বিদ্বেষী ভূমিকা পালন করে। এর সাথে যুক্ত হয় সরকার সমর্থক এবং জামাতে ইসলামীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ও মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম*। এই দুটি পত্রিকা অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও জনমতের দিক বিবেচনা করে চলমান আন্দোলনের খবরাখবর ও ছবি নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকে। *দৈনিক পাকিস্তান* অঘোষিতভাবে সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। কারণ পত্রিকাটির সম্পাদক

আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং কর্মরত সকল সাংবাদিক ছিলেন বাঙালির মুক্তি আন্দোলন সমর্থক।[১৭৬] প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরপরই ২ মার্চ ১৯৭১ *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়,

> প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণা জনসাধারণের নিকট অপ্রত্যাশিত মনে হইয়াছে। এই ঘটনা জনসাধারণের পক্ষে হতাশব্যাঞ্জক সন্দেহ নাই। জনসাধারণ গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তাই সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রতি।[১৭৭]

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকাটি পাকিস্তান পিপলস পার্টির ভুট্টোর দাবিকে কৌতুক-প্রদ বলে মন্তব্য করে।

২ মার্চ থেকে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহ প্রতিদিন প্রথম পৃষ্ঠায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের দৈনন্দিন কর্মসূচি প্রকাশ করতে থাকে। শুধু তাই নয়, মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'সাংবাদিক ইউনিয়ন', 'সাংবাদিক সমাজ', 'সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী' এবং 'সংবাদপত্র হকার সমিতি' রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। ৫ মার্চ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আলী আশরাফের নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ সভায় অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন প্রকাশ করে এবং একইসঙ্গে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান।[১৭৮] শুধু তাই নয়, অপর এক সভায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সরকার কিংবা মালিক পক্ষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করলে তা লঙ্ঘন করার হুমকি দিয়ে বলা হয়,

> সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের ব্যাপারে ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের মৌলিকনীতি ঘোষিত হইয়াছে, তাহা পালনের ক্ষেত্রে আরোপিত বিধি নিষেধাদি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক। সরকার ও মালিক পক্ষ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করিলে সাংবাদিকগণ তাহা স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করিবেন।[১৭৯]

দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার অসহযোগ আন্দোলনের খবরাখবর শ্রকাশ করলেও রাজনৈতিক কারণে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নীতি ছিল স্ববিরোধী। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নিবন্ধে ৪ মার্চ জনতার ন্যায়সংগত আন্দোলনকে লুটতরাজ এবং অরাজকতা বলে মন্তব্য করে।[১৮০]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ঢাকাসহ সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। দৈনিক পত্রিকাসমূহ ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলনের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ৪ মার্চ *দৈনিক ইত্তেফাক* 'ক্ষান্ত হউন' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে পূর্ব পাকিস্তানে নিরীহ জনতার ওপর সামরিক বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানায়।[১৮১] ৪ মার্চ হরতালের ঘটনাবলির বিবরণ দিতে গিয়ে ৫ মার্চ *দৈনিক ইত্তেফাকে*র রাজনৈতিক ভাষ্যকার 'জয় বাংলার জয়' শিরোনামে প্রতিবেদনে লিখেন, 'ক্ষমতার দুর্গ নয়, জনগণই যে দেশের সত্যিকার শক্তির উৎস, বাংলাদেশেল বিগত তিন দিনের ঘটনাবলি তাহাই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিয়াছে।'[১৮২] রাজধানী ঢাকার পরিস্থিতি বর্ণনা দিয়ে *দৈনিক পাকিস্তান* ৫ মার্চ একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়,

> কলকারখানায় বাজছেনা বাঁশী। মানুষ নেই অফিস আদলতে। অগ্নিগর্ভ দেশ আজ পথে নেমেছে। এক-দুই করে কাল কেটে গেছে চারদিন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় দেশ অগ্নিগর্ভ। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা যেন ভেঙ্গে পড়েছে। স্বাধিকার আন্দোলনে প্রাণ দিয়াছে মানুষ–রংপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকায়; বিক্ষুব্ধ এই বাংলাদেশ।[১৮৩]

দেশব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি থাকায় এ সময়ে মূলত সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের খবরাখবর সম্বন্ধে অবগত হয়। বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ জনগণের ওপর বর্বর হামলার বিবরণও পত্রিকার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। ৭ই মার্চ *দৈনিক সংবাদ* 'বীর জনগণের প্রতি অভিনন্দন' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'জনগণের দাবী একমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।'[১৮৪]

হরতালের কর্মসূচি পালনের পর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। পরের দিন পূর্বপাকিস্তানের সব পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় ভাষণরত বঙ্গবন্ধু ও জনসভার ছবিসহ সংবাদ পরিবেশন করে। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতি প্রায় অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা না করে উল্টো সামরিক পথ বেঁছে নেয়। সে উদ্দেশ্যে সরকার ৭ই মার্চ জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে জে. টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিন্তু ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকীসহ সকল বিচারপরিত জে. টিক্কা খানের শপথ পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানান।[১৮৫] ফলে তাঁকে সামরিক শাসনকর্তা হিসেবেই দায়িত্ব পালন করতে হয়।

রাজনৈতিক এরূপ টাল-মালাল অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খঅন সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। 'রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রেসিডেন্টর ঢাকায় আগমন' বলে সরকারি সূত্রে প্রচার করা হলেও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে বোঝা যায় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান পরিচালনার পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। রাজনৈতিক সংকট সমাধানকল্পে ১৬ মার্চ থেকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক শুরু হয়। এ বৈঠক শুরুর প্রাক্কালে ১৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সারির চারটি দৈনিক পত্রিকা *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সংবাদ* ও *পাকিস্তান অবজারভার* 'আর সময় নাই'[১৮৬] শীর্ষক এক যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। অভিন্ন বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট নিরসনের জোর দাবি জানায়। এই যৌথ সম্পাদকীয় জনতার ঐক্যের প্রমাণ। জনতার কতখানি ঐক্য হলে দেশের প্রথম সারির পত্রিকাগুলো এ রকম সম্পাদকীয় প্রকাশ করে তা সহজেই অনুমেয়।

মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠক নিয়ে জনগণের মধ্যে উদ্বিগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিল। সংবাদপত্রগুলোতেও এর প্রতিফলন ঘটে। বৈঠক চলাকালীন কোনো কোনো পত্রিকা সলক প্রকার সংলাপ বন্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের আহ্বানও জানায়। বিশেষ করে ইংরেজি *দৈনিক দি পিপল*-এর কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৭ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের প্রতিবেদন দিতে গিয়ে পত্রিকাটি 'Mujib-Yahya meeting to decide whether Pakistan to stay or go : Independence of Bangladesh at Fait Accompli' শিরোনামে সংবাদে লিখে,

> The frustrated people finally raised the demand of Sovereign and independent Bangladesh. They are no more prepared to be subjected to the undemocratic and repressive measures of a Government sitting, 1300 miles away.[১৮৭]

প্রতিদিনের বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের ব্রিফিং দেন। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলো দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের খবর, রাজনৈতিক ভাষ্য ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে জনমতকে স্বাধীনতার আন্দোলনের দিকে উজ্জীবিত করে। শুধু তাই নয়, সমাজতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত কতিপয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর প্রতি সরাসরি স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার আহ্বান জানায়।

উপসংহার

ষাটের দশকে পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্র যখন রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশন করে জনমত সংগঠিত করছিল–তখনই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার মানসে নতুন করে জারি করা হয়, 'প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৩'।[১৮৮] বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সংগ্রামে সংবাদপত্র প্রথম থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছে। এছাড়াও বাঙালি জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ করে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাঙালির মধ্যে স্বাজাত্যবোধ গঠনে প্রতিনিয়ত কাজ করে যায় এবং সফল হয়। বিভিন্ন দুঃসময়ে পত্রিকাগুলো বাঙালি জাতিকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়। ১৯৬৪ সালে যখন সরকারের ইন্ধনে সারাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পরে। তখন বাংলার মানুষকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ১৭ জানুয়ারি *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ 'পূর্ব পাকিস্তান রুখে দাঁড়াও' শিরোনামে একটি আবেদন দেশবাসীর কাছে করে।[১৮৯] এই আবেদনের মধ্যে একটি নিজস্ব নিজস্ব ভাব আছে। যেখানে নিজেদের মানুষের কাছে একটি আবেদন করা হচ্ছে সর্ব

প্রকার ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার জন্য। এই নিজের লোক হচ্ছে বাঙালি এবং তাদের সতন্ত্র্য আবাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে। একই ধরনের আবেদন আমরা দেখতে পাই ৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের পর। ৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে অবর্নণীয় দূরাবস্থা। সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে পর দূরবস্থা দেখে *দৈনিক পূর্বদেশ* 'বাংলার মানুষ কাঁদো' শিরোনামে প্রতিবেদন করে।[১৯০] শুধু মানবিক আবেদন বা এক হওয়ার জন্য আবেদন করেই পত্রিকাগুলো ক্ষান্ত হয় নি। একইসাথে জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ করে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাকিস্তানি রাষ্ট্রনায়কেরা যখন বাংলার মানুষের প্রাণের দাবি ৬ দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে জাতীয় নেতাদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়েছিলেন, তখন *দৈনিক ইত্তেফাক* এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া লিখেছিলেন, 'ক্ষমতার উচ্চাসন হইতে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাহাতে দেশ বিদেশে পাকিস্তানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।'[১৯১] এইভাবে প্রতি নিয়ত পত্রিকাগুলো বাঙালিত্বের বিকাশে এবং জনমত গঠনে সহযোগিতা করেছে।

১৯৫৩ সালে পূর্ব বাংলা থেকে *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শক্তিশালী বিরোধী দলীয় পত্রিকা হিসেবে জনসাধারণ *ইত্তেফাক* পত্রিকাতেই বুঝত। এজন্য পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠি *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকাকে অসংখ্যবার নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। সরকার নিউজপ্রিন্টের কোটা বন্ধ করে, বিজ্ঞাপন কমিয়ে দিয়ে, প্রেস বাজেয়াপ্ত করে, সম্পাদককে কারাগারে অন্তরীন করে এই পত্রিকা তার সংগ্রামী সম্পাদককে দমন করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া শাসকগোষ্ঠিকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, '*ইত্তেফাক* যদি তার ঐতিহ্য নিয়ে প্রকাশিত হতে না পারে, তবে তিনি *ইত্তেফাক* প্রকাশে আগ্রহী নন।'[১৯২] *ইত্তেফাক* প্রকাশের পর থেকে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত প্রতিটি পাতা ছিল সংগ্রামী মানুষের মুক্তির জন্য নিবেদিত। পূর্ববাংলার বিরোধী রাজনীতির খবর, বিশেষতঃ গণমুখী সংগঠন আওয়ামী লীগের দলীয় সিদ্ধান্ত সভা-সমাবেশের খবর, নেতাদের জুলুম, নির্বাচনের খবরা-খবর ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিবাদ *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হতো। কখনও কখনও আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং সমাবেশের খবরা-খবর প্রথম পাতায় ওপরের দিকে বক্স করে পরিবেশন করা হতো সাধারণ পাঠকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। এদিক থেকে বিবেচনা করলে, *দৈনিক ইত্তেফাক* ছিল পূর্ব বাংলার অধিকার বঞ্চিত জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র জনগণের কথা বলার ফোরাম বা পিপলস পার্লামেন্ট। এক্ষেত্রে *ইত্তেফাক* পিপলস স্পোকম্যান হিসেবেই জনগণের কথা বলেছে, যা পার্লামেন্টের গণ প্রতিনিধিরা করে থাকেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই *ইত্তেফাক* সম্পাদক জেল থেকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি ইত্তেফাককে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহ বা অর্থোপার্জনের অবলম্বর হিসেবে গ্রহণ করি নাই। যে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন *ইত্তেফাক* প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই জনগণের অভাব অভিযোগ, দুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফতিল করাই ছিল আমার ব্রত'।[১৯৩]

সাময়িকপত্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সংবাদ-সাময়িকী ও সাহিত্য-বিষয়ক পত্র-পত্রিকার এক বিরাট বিচিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উনিশ শতকে বাংলাভাষায় সে সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা ধর্মপন্থি, রক্ষণশীল, মানবতাবাদী ও মার্কসবাদী সকল শ্রেণির ইতিহাস-অনুসন্ধানের লক্ষ্যে মৌলিক, আকর-তথ্য রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। বিশ শতকের পত্র-পত্রিকা থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতির বিচিত্র ইতিহাস তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ পত্র-পত্রিকাই বাংলার জাগরণের মূলসূত্র এবং সাময়িকপত্রের পাতাতেই বাংলার জাগরণের এবং জাতির চিন্তাচর্চার আসল চেহারাটা ফুটে উঠেছে।[১৯৪]

সমাজের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিবর্গ নানান পত্রিকার প্রকাশ, প্রচার ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করে সমাজের চিন্তাধারাকে সংগঠিত ও পরিচালিত করেছেন। ফলে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার ধারা বিকশিত হয়েছে। শিল্প-দর্শন, বক্তব্য ও

নৈতিকতার প্রশ্নে এবং সাহিত্য-শিল্পের সাংগঠনিক কাঠামোর বিতর্কে অংশ নিয়ে সক্রিয়ভাবে কোনো-কোনো পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও বিকাশের ধারায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।[১৯৫]

১৯৪৭-৭১ পর্বে বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে সেগুলোর বিচার দরকার। কারণ এপর্বে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ছিল দাবি-আদায়ে সংগ্রাম-আন্দোলনমুখর ও বিতর্ক-বিক্ষুব্ধ। যেভাবেই হোক এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিতর্কসমূহ প্রচলিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে অনেক সময় প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে স্থান লাভ করেছে।[১৯৬] পত্রিকাগুলোর পাতা মেললেও দেখা যায় পাকিস্তানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদর্শগত প্রশ্নে তখন (১৯৪৭-৭১) অনেক বিতর্ক সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য পত্রিকাগুলোর ভূমিকা বাঙালির স্বার্থ প্রয়োজিত না হলেও 'বাংলাদেশের সাহিত্য' নামে ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটেছে।[১৯৭] শুধু তাই নয়, যুদ্ধপূর্বকালে যেসকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তা ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধকে সদর্থক মননশীল ভূমিকা পালন করে প্রধানত সাহিত্যিক কার্যাবলির মাধ্যমে। পাকিস্তান আমলে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা উপলব্ধির জন্য মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর একটি উক্তি তুলে ধরা হলো–

> শুন! সাহিত্যচর্চা বিলাস পরিতৃপ্তি নহে, বিশ্রাম সময়ের বিশ্রামালাপ নহে। সাহিত্য জীবনের সাধ, সাহিত্য সাধনা, সাহিত্য আরাধনার ধন। সাহিত্য জাতির প্রাণরস, সাহিত্য স্ফূর্তি। চিরদিন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় এবং সাধনায় জাতি উঠিয়াছে, এখনও উঠবে।...ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের যে দাবদাহ ইয়োরোপের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বংসের ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া দিয়া গেল, ফরাসীর যে জাতীয় শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে ইয়োরোপের সমস্ত রাজশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, তাহা কিসের শক্তি?... সে শক্তির উন্মেষের জন্য প্রথমেই অপরাজেয় বোনাপার্ট কামান লইয়া আবির্ভূত হন নাই,...তাহা সাহিত্যের শক্তি, তাহা রুশো ও ভল্টেয়ারের লেখনী শক্তি।... মাতৃভাষার চর্চায় সাহিত্যের সাধনায় কেন প্রত্যেক জাতি এমন করিয়া সাড়া দেয়? তাহার প্রাণের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে কেন এমন করিয়া ঝংকার উঠে?
>
> ঝনাৎকার ওঠে, কারণ সাহিত্যে মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষাটি অকৃত্রিম ভাবে প্রতিধ্বনিত হলে, তা পাঠে সহৃদয় হৃদয় সংবেদীর অন্তরে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, স্বাধীনতার চেতনা দুর্বার হয়। আর কামানের শক্তির চেয়ে 'সাহিত্যের শক্তি' যে অধিক তা বলাই বাহুল্য। মাও সেতুঙ লিখেছেন, 'সাহিত্য ও শিল্পকলার জগতে শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা হচ্ছে সংগ্রামের অন্যতম উপায়।'[১৯৮]

এতে তিনি যেসকল মনীষী-দার্শনিক ও স্বাধীনতাযুদ্ধের নায়কদের নাম উল্লেখ করেছেন–তাঁরা সাহিত্যের মাধ্যমে জাতিকে রাজনৈতিক দর্শন প্রচার করে অস্ত্রবিহীন যুদ্ধই করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতেও সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সে সাহিত্য চর্চার সুযোগ করে দেয় সাহিত্য পত্রিকাগুলো। এসবের পেছনে অবশ্যই কতিপয় পত্র-পত্রিকা আর লেখক বুদ্ধিজীবীর অবিস্মরণীয় সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। সাময়িকপত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের কলম সৈনিকরা যেমন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তেমনি পাকিস্তানপন্থিরা বিরোধিতাও করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনার পূর্বেই ভাষা প্রশ্নে এই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

সাময়িকপত্রকে বড় পরিসরে এখানে দুটো ভাগে ভাগ করে দেখানো যায় : একটি হলো–লিটল ম্যাগাজিন; অন্যটি হলো–সাহিত্যপত্র। লিটল ম্যাগাজিনও প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য পত্রিকা। আমাদের ইতিহাসে যেসব সাময়িকপত্র পাই তারও মূল চারিত্র্য সাহিত্য পত্রিকার। উনিশ শতকে সাময়িকপত্রের সূচনার পর যেভাবে যখন যা বেরিয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাহিত্যকে মূল উপজীব্য করেছে। সেদিক থেকে সাময়িকপত্র ও লিটল ম্যাগাজিন একার্থক না হলেও দুয়ের মধ্যে বিষয়গত সংযোগ ব্যাপক।[১৯৯]

লিটল ম্যাগাজিন পাকিস্তানি জাতীয়বাদ ও বাঙালিত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব

শিল্পসাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে চলমান ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারা ও মতামত ব্যক্ত করার মুদ্রিত বাহনকে বলা হয় লিটল ম্যাগাজিন[২০০]। অর্থাৎ লিটল ম্যাগাজিনকে সাধারণত সাহিত্যের এমন একটি মাধ্যম হিসেবে ধরা হয় যেখানে ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারা ও অকুতোভয় মতামতের ছোঁয়া পাওয়া যায়। সমাজের অসংলগ্নতাকে আঙুল দিয়ে

দেখিয়ে দিতে সদা সচেষ্ট থাকে। প্রচলিত অধোপতনমূখো সমাজ ভেঙে, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এ ধরনের পত্রিকা বের করা হয়। এ ম্যাগাজিন অনেকটা অনিয়মিত এবং অবাণিজ্যিক। লিটল ম্যাগাজিন প্রতিনিধিত্ব করে একটি ছোটো সমমনা নব্য গোষ্ঠীর যার চিন্তা-ভাবনা-দর্শন চলমান ধারা থেকে ভিন্ন এবং অভূতপূর্ব। লিটল ম্যাগাজিন নবচেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং লেখক ও পাঠকদের মধ্যে সে নবচেতনাকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যে আন্দোলনে যায়। সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প-চেতনায় যারা গতানুগতিক ধারার বিরোধী, তারা তাঁদের চিন্তাচেতনার প্রকাশ ঘটান নিজেদের সংঘটিত মুখপত্রের মাধ্যমে, কেননা সাধারণের নিকট তাঁরা অপ্রিয়, বাণিজ্যিক কারণে বাজারের পত্রিকার পরিচালকেরা তাঁদের পরিহার করে চলেন। নবধারার নবযুগের শিল্পী সাহিত্যিকেরা তাঁদের মতবাদ প্রচারের জন্য লিটল ম্যাগাজিনের আশ্রয় নেন। লিটল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্যই আসলে ছিল প্রথাবিরোধি হওয়া, তারকাদের বদলে অখ্যাত অথচ উজ্জ্বলদের সামনে তুলে ধরা। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে বলেন,

> ...লিটলম্যাগ ছোট পত্রিকা। তার মানে, সবসময় যে এর কলেবোর ছোট হবে তা নয়। তবে সাধারণত এ ছোট হয়। অনেক সময় বড়ও হতে পারে। ছোট হওয়ার কারণ হচ্ছে, এই পত্রিকা যারা বের করে তারা সাহিত্যে নতুন পা রাখতে যাচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই, সামর্থ নেই, কিন্তু পিপাসা আছে। একটা বড় সাহিত্যের স্বপ্ন তাদের চোখের সামনে। একটা উচ্চতর সাহিত্য যুগের জন্য তারা সংগ্রাম করছে।[২০১]

তিনি আরও বলেন,

> লিটল ম্যাগাজিন আর ব্যবসা এক সঙ্গে হয় না। সাহিত্যের জন্য নিবেদিত কিছু মানুষের শ্রম, আত্মোৎসর্গ এবং স্বপ্ন এর মূল চালিকা শক্তি। অসম্ভব কষ্টের মধ্য দিয়ে এই পত্রিকা বের হয়। যেহেতু এই পত্রিকার কোন প্রচার নেই, সার্কুলেশন নেই, অনেক পাঠক নেই, তাই এর বিজ্ঞাপনও নেই। যেসব বিজ্ঞাপনই এতে পাওয়া যায় তা আসে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে। কিন্তু সেরকম সম্পর্ক একজন তরুণ লেখক বা লেখিকার কতটুকুইবা থাকতে পারে? সেজন্য একটি অসীম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে লিটল ম্যাগাজিন বেঁচে থাকে, এগোয়। কিন্তু আপোষহীন-অপরাজিত স্বপ্ন আর শক্তি নিয়ে তারা এক কাজটা করে।[২০২]

পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে সরকার রাষ্ট্রকে দীর্ঘায়ু করার জন্য প্রচার মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তাই পাকিস্তানপন্থি ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী এবং ধর্মীয় আদর্শের প্রচারপত্ররূপে এক ঝাঁক শক্তিশালী সাহিত্য-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলো, যেগুলো কাজই ছিল প্রগতিকে রোধ করা।[২০৩] সরকারি খরচে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণায় এধারাটি পুষ্ট হয়।[২০৪] পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ বজায় রাখতে সহায়ক হয় এমন বক্তব্য বা রচনারাজি প্রাধান্য পয়েছে এ সব সাহিত্য-পত্রিকায়।[২০৫] সরকারি অপকৌশলের প্রতিবাদে সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ছাত্রসমাজ ও তরুণদের ছোটো ছোটো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই সময়ে তরুণদের উদ্যোগে বহু অনিয়মিত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারিতেও প্রকাশিত হয়েছে বহু সংকলন। নতুন চিন্তাধারার পরিচয় বহনকারী এসব সংকলনেই বিধৃত আছে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস। এসব সংকলনও লিটল ম্যাগাজিন বলে পরিচত।[২০৬] এইসব সংকলন মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ আসে তবে তাকে বিকৃত করার চেষ্টাও হয় পাকিস্তানি, ইসলামি ভাবাদর্শেও দ্বারা। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি যেমন স্বজাত্যবোধে স্বাধীনতা লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, তেমনি পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাইলেও সচেতন-সজাগ বাঙালি ঠিকই 'মুক্তি পাগল' হয়ে উঠেছিল। এই মুক্তি লাভের প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল এসব পত্রিকার মাধ্যমে।[২০৭] এই লিটল ম্যাগাজিনগুলো বাঙালিত্বের বিকাশে ও রাষ্ট্র গঠনে জনগণকে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

লিটল ম্যাগাজিনে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পত্রিকা বা লেখক-সংগঠকের চারিত্র্য। লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে সৈয়দ রিয়াজুল রশীদ *ছোট কাগজ আন্দোলনের ২৫ বছর : স্বপ্নের সারসেরা*'য় লিখেছেন,

> প্রথমে সৃজনশীল যেকোনো লেখা পেশাদার কাগজ মানিয়ে নিতে পারে না। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত থেকে দুটো ব্যবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে–যার একটি নেগেটিভ, অন্যটি পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট। পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট অগ্রসর করে সমাজকে, এবং সমাজকে এক জায়গায় স্থির রাখে বা পশ্চাতে উড়িয়ে নিয়ে যায় নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট। বাণিজ্যসর্বস্ব ও

মুনাফালোভী কাগজের দায়িত্ব নেগেটিভ ডেভেলপমেন্টকে উজ্জ্বল করে তোলা; প্রশ্রয় পায় তাদের কাছে নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট, খরচ করে টাকা, ব্যয় করে প্রচুর অর্থ-গল্প-উপন্যাস-কবিতার জন্য। অনেক আদর্শবাদী প্রগতিশীল লেখক ফলে পরিণত হয় কলম পেশাজীবীতে..লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক ও লেখকেরা মূলত প্রকারান্তরে পজিটিভ ডেভেলপমেন্টকে প্রকাশের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তবে প্রযোজ্য নয় সব ক্ষেত্রে। এমন অনেক লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক আছেন, কবি-গল্পকার আছেন, যারা লিটল ম্যাগাজিনে হাত পাকিয়ে যশ ও খ্যাতির মইয়ে ওঠার ব্যবস্থা হিসেবে নিজেকে লালন করেন।[২০৮]

ষাটের দশকে *লিটল ম্যাগাজিন*গুলোকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-আন্দোলন শুরু হয়। সেসময় মানুষের চেতনাজগতে স্বতন্ত্রধর্মী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা সাহিত্যেও প্রভাব ফেলে। এ সময় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এ সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিছুসংখ্যক *লিটল ম্যাগাজিন* প্রকাশিত হয়। *লিটল ম্যাগাজিন* নবচেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং লেখক ও পাঠকদের মধ্যে সে নবচেতনাকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যে আন্দোলনে যায়।

ফজল শাহাবুদ্দিন সম্পাদিত *কবিকণ্ঠ*, সাঈদুর রহমানের *খাপছাড়া*, মহিউদ্দিন আহমদের *স্পন্দন*, সিরাজুর রহমান সম্পাদিত *সংকেত* প্রভৃতি কাগজ পঞ্চাশের দশকের লিটল ম্যাগাজিন-আন্দোলনকে গতিশীল করে। ষাটের দশকে বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–*সপ্তক* (১৯৬২), *বক্তব্য* (১৯৬৩), *স্বাক্ষর* (১৯৬৩), *স্যাড জেনারেশন* (১৯৬৩), *যুগপৎ* (১৯৬৩), *সাম্প্রতিক* (১৯৬৪), *কালবেলা* (১৯৬৫), *কণ্ঠস্বর* (১৯৬৫), *ছোটগল্প* (১৯৬৬), *না* (১৯৬৭), *বহুবচন* (১৯৭০), *স্বদেশ* (১৯৬৯), *শব্দের বিকৃতি* (১৯৬৯), *শিল্পকলা* (১৯৭০) প্রভৃতি। ষাটের দশকে বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন-আন্দোলন শুরু হয় উপর্যুক্ত আধুনিকতাবাদী লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে।

পটভূমি

লিটল ম্যাগাজিন-এর ধারাতে এ অঞ্চলে প্রথমেই প্রকাশিত হলো–ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ থেকে কার্তিক ১৩৫৪, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৪৭ সালে ‘কৃষ্টি’ নামের একটি মাসিক পত্রিকা। উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জী, ফুলদা রায়, জীবন গোস্বামী প্রমুখ। আর মুসলমানদের ইসলামী প্রজাতন্ত্রে, এক ধর্মজাতির রাষ্ট্রে ভিন্ন মতাবলম্বী লোকেদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সত্য উচ্চারণে অনেক বাধা ছিল। সত্য ও সঠিকতা আক্রমণের শিকার হতো প্রতিনিয়ত। কাজেই ‘কৃষ্টি’ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। কালের দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর কৃষ্টির মাত্র একটি সংখ্যা পাওয়া গেলেও একাধিক সংখ্যা যে প্রকাশিত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।[২০৯] এরই মধ্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলতে লাগল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক পত্রিকাকর্মীদের কার্যক্রম। এ ধারায় ‘ইত্তেফাক’ প্রকাশের আগে পূর্বোক্ত কতিপয় রাজনৈতিক-সাপ্তাহিকীর সঙ্গে যুক্ত হল কিছু ক্ষুদ্রকায় সাময়িকী। প্রধানত একুশের চেতনা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে এরা আত্মনিয়োগ করে এগিয়ে যেতে থাকেন তাঁদের সাংস্কৃতিক কার্যাদি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নারায়ণগঞ্জের ‘কৃষ্টি’র কথা। ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ শীর্ষক প্রবন্ধে কৃষ্টিতে ১৯৪৭ সালেই মনীষী ডক্টর এনামুল হক পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে মেনে না নিলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে।[২১০] এরপরেই ফজলে লোহানীর সম্পাদনায় ১৯৪৯ সালে বের হয় *অগত্যা*। তাঁর সাথে একদল তরুণ ছিলেন। ফলে তিন-চার বছর পত্রিকাটি অগ্রসর হতে পেরেছিল।[২১১] প্রচ্ছদ একেছিলেন হামিদুর রহমান।[২১২] মধ্যবিত্ত, নব্যনাগরিক জীবনের এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে *অগত্যা*র লেখাগুলোতে। এ কারণে পত্রিকাটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়াও সমকালীন মেধাবী ও প্রগতিশীল তরুণ লেখকদের উচ্ছ্বাস, আনন্দ, চিন্তাভাবনা *অগত্যা* পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠিতদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমেই তাঁরা আলোচিত হয়।[২১৩] রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান ছিল মুসলিম লীগের পাকিস্তানবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামী ধারার বিপরীতে। এক কথায় স্টাবলিশমেন্টের বিরোধিতা করা ছিল এইসব তরুণদের উৎসাহী কার্যাবলির মূল প্রেরণা।[২১৪]

পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই লিটল ম্যাগাজিনগুলো প্রকাশিত হতে থাকে। তবে, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করলে লিটল ম্যাগাজিনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কারণ লিটল ম্যাগাজিন মূলত অসংগতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যই প্রকাশিত হতো। আমরা এখানে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর থেকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে লিটল ম্যাগাজিনগুলো বের হয়েছিল সেগুলো পর্যালোচনা করবো। পত্রিকাগুলোর দর্শন কী ছিল এবং বাঙালির মানসগঠন করে কীভাবে পত্রিকাগুলো বাঙালিকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল তা পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে।

উত্তরণ (১৯৫৮)

এনামুল হকের সম্পাদনায় *উত্তরণ* (১৯৫৮) পত্রিকাটি বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। চারুকলার বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে *উত্তরণ* প্রকাশ করে সকলকে তাক লগিয়ে দিয়েছিলেন।[২১৫] এনামুল হক সম্পাদিত পত্রিকার নাম এ প্রসঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণীয়। কারণ ১৯৫৮ সালের প্রবল সামরিক-নিস্পেষণের পরোয়া না করে আবুল ফজলে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এনামুল হক 'উত্তরণ'এ প্রকাশ করেছিলেন। তখন এই লেখা প্রকাশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দাবি করা এবং তার দায়িত্ব স্বীকার করা সমূহ বিপদের কারণ ছিল।[২১৬] আবুল ফজল মহান দার্শনিক লেখকদের উদাহরণ দিয়ে বলেন :

> মানুষের নিজস্ব বলতে একমাত্র জিনিস হচ্ছে মনে চিন্তা। আর সেই চিন্তা প্রকাশ করতে গিয়ে সবসময় রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের আরোপিত সুরে কণ্ঠ মিলাতে না পারলেও সবসময় খুব দোষের হয়না। রাষ্ট্রের সুরে সুর না মেলালেই রাষ্ট্রদ্রোহী হয় না, হয় না রাষ্ট্রের দুশমন বা সমাজের শত্রু।[২১৭]

তিনি আরও বলেন, যে সব বৃত্তি মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে, তার মধ্যে সবার সেরা হচ্ছে (reason) বা যুক্তি। যুক্তি তথা (reason)-এর চর্চা অব্যাহত রাখতে, আর সমাজকে নৈতিক ও মানসিক দাসত্বের হাত থেকে বাঁচাতে হলে-স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও সেই চিন্তাকে প্রকাশ ও গ্রহণ করার অধিকার মানতেই হবে-সমাজকে দিতেই হবে সেটুকু স্বাধীকার। নইলে স্বাধীনতার কোন মানেই থাকেনা।[২১৮]

সামরিক শাসকদের শিল্পী তোষণের জন্য গঠিত 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড' বা লেখকসংঘের পতাকাতলে যখন একত্রিত হয় বাংলার সেরা লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরাও।[২১৯] এমতাবস্থায় তৎকালীন ছাত্রনেতা এনামুল হক সম্পাদিত 'উত্তরণ' শীর্ষক দ্বি-মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় আবুল ফজল লেখেন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনকারী প্রবন্ধ 'শিল্পীর স্বাধীনতা'। এর একটি উক্তি প্রবাদের মতো তখন সকলের মুখে মুখে ফিরত, 'পোষা বাঘ যেমন বাঘ নয়, তেমনি পোষা শিল্পীও খাঁটি শিল্পী নয়।'[২২০] তিনি বাঙালি সকলকে 'খাঁটি' হওয়ার সাধনায় উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'মানুষের নিজস্ব বলতে একমাত্র জিনিস হচ্ছে মনের চিন্তা।' সেকালে পাকিস্তানি স্বাধীনতার কোন উন্নতমানের নাগরিক অধিকার ছিলনা–সেকথা এই রচনা পাঠে বোঝা গিয়েছিল এবং 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' প্রশ্ন উচ্চারিত করেছিল।[২২১]

তবে চারুকলার ব্যাকরণগত মানসম্পন্ন বিচিত্র রঙের চিত্রশোভিত পত্রিকাটি ৩য় বর্ষে পদার্পণ করে আর বের হতে পারেনি। সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দ বিভাগ থেকে সম্পাদককে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে *উত্তরণে*র কণ্ঠরোধ করা হয়।[২২২]

বক্তব্য (১৯৬৩)

বক্তব্য-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ সালে। পত্রিকাটি ছিল গদ্য-রচনার। একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তবে সংখ্যাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।[২২৩] *বক্তব্যে*-র একটি ঘোষণা ছিল এ রকম,

> দলটা তাদেরই–সেইসব অগতানুগতিক অসন্তুষ্ট 'রাগী তরুণদের', অন্তঃসত্ত্বা রক্তে যাদের নতুন সৃষ্টি আগ্রহ উদগ্রীব। এখানকার সাহিত্যের, সমাজের ভানসর্বস্ব অযোগ্য মোড়লদের প্রতি তাদের ঘৃণা, ক্ষোভ, আক্রোশ; যার ফলশ্রুতি হিসেবে এ সাহিত্যে ঘেয়ো, অর্থব নির্জীবদের বয়স্ক প্রভাব থেকে মুক্তিতে তারা কৃতশপথ–তারা একত্রিত, সমবেত, আয়োজিত। উদ্দেশ্য তাদেরও নতুন কিছু, বিস্ময়কর কিছু, আন্তত উপেক্ষিত হাস্যকর কিছু, অসামাজিক, অশ্লীল, গর্হিত কিছু, কিন্তু

কিছু নতুন, কিছু অভাবনীয়। কালের বুকের ওপর নতুন স্বাক্ষরের বেগবান চিন্তায় তারা অশ্বস্ত- যে স্বাক্ষর স্পষ্ট, গভীর, স্থায়ী-এমনকি সাময়িক ও স্বল্পায়ু হলেও সজীব ও স্বাস্থ্যবান।[২২৪]

বক্তব্য-একটি সংখ্যা বের হলেও তা তৎকালীন সমাজকে একটা ঝাঁকনি দিতে সংক্ষম হয়েছিলেন। পত্রিকাটি ঘোষণার মধ্যে তাদের তেজ প্রকাশ পায়।

স্বাক্ষর (১৯৬৩)

স্বাক্ষর ছিল ষাটের দশকের সমাজকে নাড়া দেওয়া অন্যতম পত্রিকা। পত্রিকাটি একটি সাধারণ ও অখণ্ড চেতনায় সমগ্র জাতীয় মানসের প্রতিফলন হয়ে উঠেছিল।[২২৫] ছয়টি মাত্র সংখ্যা (প্রকৃতপক্ষে ৪টি) প্রকাশ করে।[২২৬] প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন–রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল হক।[২২৭] পত্রিকাটি প্রতি সংখ্যার দুজন করে সম্পাদক ছিলেন।[২২৮] *স্বাক্ষর* ছিল কবিতাকেন্দ্রিক পত্রিকা।[২২৯] ষাটের দশকের নতুন কবিদের মুখপত্র। কয়েকটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশ করেই সে একটি কবিতাকেন্দ্রী নতুন স্বরলিপি প্রযোজনা করে।[২৩০] লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে *স্বাক্ষর* উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি বিশৃঙ্খল-ভাবনার তরুণ কবিদের ভাবনায় সামঞ্জস্য বিধান করেছিল। *সাম্প্রতিক* প্রকাশিত হলে *স্বাক্ষর*-এর কেউ কেউ এ পত্রিকায় লেখেছিলেন।

লিটল ম্যাগাজিন *কণ্ঠস্বর*-এর প্রথম সংখ্যার শেষ প্রচ্ছদে *স্বাক্ষরের* একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যেখানে উল্লেখ আছে,

মৃত্যু আমরণ সঙ্গী যাদের
তারা কখনও কখনও
এক হয়
মৃত্যুকে প্রতিরোধ কোরবার
দুর্মর সংকল্প নিয়ে নয়,
দুর্বার শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেও নয়–
কিংবা নয় মস্‌জিদে গীর্জের
ব্যগ্র সমর্পণে, ...
মিলিত হয়
মৃত্যুকে ভয় কোরে দুর্ভাবনায় গভীর নৈরাজ্যে
একজোটে পালিয়ে পালিয়ে ফিরতে। এই
পালিয়ে ফেরার মধ্যবর্তী অীবনশ্বর সময়াংশগুলি
ভয়ঙ্কর মধুর মৃদু করুণ
ঈশ্বর প্রতিম শব্দ সমন্বয়ে
ঘটনা হবে। আর সেই
অন্তরঙ্গ ঘটনাবলীর সাম্প্রতিক গ্রন্থ
স্বাক্ষর
॥তৃতীয় সংকলন॥
এই শীতে বেরুচ্ছে
দাম : এক টাকা।[২৩১]

স্বাক্ষর-ই এ দেশের প্রথম লিটল ম্যাগাজিন যা এক হাতে ধ্বংস আর এক হাতে সৃষ্টি করেছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত জমির ওপর নতুন শহর বসালো *স্বাক্ষর*। *স্বাক্ষর*-এর প্রথম সংখ্যার ঘোষণায়–

এ কথা আজ বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, পূর্ব বাংলার সাহিত্যের এই ক্রান্তিকালে পরীক্ষ-নিরীক্ষা করার মতো দুঃসাহিক পত্র-পত্রিকা একটিও নেই। যা-ও দু-চারটে সাহিত্য-পত্রিকা আছে, তাতে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত মোড়লদেরই আধিপত্য।

সেখানে তরুণতম অথচ নিরীক্ষণশীলদের প্রবেশাধিকার নেই। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই তরুণতম নিরীক্ষণশীলদের মুখপত্র *স্বাক্ষর*-এর আত্মপ্রকাশ।[২৩২]

এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো হয়েছিল যে তরুণ কবিরা, *স্বাক্ষর* তাদের এক শিবিরে পুঞ্জিভূত করেছিল।[২৩৩] আবদুল মান্নান সৈয়দ এ প্রসঙ্গে বলেন,

> এদের কবিতা এ দেশের পুরোনো কবিতার সঙ্গে খাপে-খোপে মিলে যাচ্ছে না। যথারীতি এদের জুটলো তিরস্কার ও প্রত্যাখ্যান, বিদ্রুপ ও বাঁকা-হাসি, বদমাশ-হাসি প্রকাশ্যেই গোপন হাসি : বিশ্ববিদ্যালয়ের আপাত-প্রগতিবাদী-পরিণাম-রক্ষণশীল অধ্যাপক ছদ্মনামে এদের আক্রমণ করে সম্মানিত করলেন; অগ্রজ কবি এদের নিয়ে লিখলেন ট্যারা-ব্যঙ্গকবিতা; সমসাময়িক কোনো কোনো পত্রিকা কোমর বেঁধে পিছু লাগল। আর, চিরকাল যা হয়, তরুণতম পাঠকরাই চিনে নিল তরুণতম এই বাঁশিবাদকদের। বিস্ময়কর এই যে, এরাই বরং পূর্বসূরিদের দাবি যেখানে প্রকৃত, সেখানে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে নিষ্কুণ্ঠভাবে এবং তখনই ঘটেছে প্রকৃত শনাক্তিকরণ, মৌলিক হাঁসের সঙ্গে দেখা।[২৩৪]

সাম্প্রতিক *(১৯৬৪)*

সাম্প্রতিক ছিল অবিসংবাদী এক অভিনব গদ্যের জনক।[২৩৫] এটি ছিল পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপত্র।[২৩৬] আধুনিক মনন ও সমাজবাস্তবতার অনুষঙ্গ এই পত্রিকায় ফুটে উঠেছিল। পত্রিকাটি তৎকালীন প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে একটি শনাক্তযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল।[২৩৭] দুইটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন শাহজাহান হাফিজ। পরে আমিনুল ইসলাম-এর সম্পাদনায় আবার প্রকাশিত হয় হয় পত্রিকাটি।[২৩৮] তবে চারিত্র্যচ্যুত অবস্থায় প্রকাশিত হয়।[২৩৯] *সাম্প্রতিক* প্রকাশিত হলে *স্বাক্ষর*-এর কেউ কেউ ভিড় করেছিল এ কাগজে।[২৪০] *সাম্প্রতিকে*'র প্রথম প্রবন্ধ, বস্তুতপক্ষে, নতুন কথাসাহিত্য বিষয়ক একটি প্রগাঢ় প্রস্তাব। তার চারটি 'অবিনয় প্রস্তাব' এ রকম–১. 'শিল্পের পণ্ডিতের মুখে চাঁটি মারো', ২. 'যাও পশ্চিমে যাও', ৩. 'কলকাতার দিকে তাকিয়ো না-আত্মার দিকে', এবং ৪. 'চলো পাই পরোক্ষে। বলা হলো–

> নব্য কথকেরা পাঠকের মুখে তো চাঁটি মারবেই, বিশেষত পণ্ডিতের মুখমণ্ডল তাদের লক্ষ্যস্থল। যে-কোনো চেতনাশীল লেখককে সময় এই কথাটা ভাবিয়েছে যে, শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগ, যেমন চিত্রকলা, কি ভাস্কর্য, কি সংগীত ইত্যাদি, যখন বাঁকা প্রকাশকে অবলম্বন করেছে, সাহিত্য কেন পুরোনো চালে যাতায়াত করবে? চাই নতুন প্রকাশরীতি, অগোচর মলোবিন্যাশের উন্মোচন, চাই প্রথম জানোয়ারশোভন চীৎকার। কতকগুলি অক্ষরের ক্রীতদাস হয়ে এবং কতকগুলি অতিব্যবহৃত প্রকরণের সেবায় নিযুক্ত করবো কেন নিজেকে? গল্প লিখতে গিয়ে আদি প্রাচীন রচনাসম বিশ্বব্যাপার স্বেচ্ছাকৃত ভুলে। জীবনকে আমরা বিভক্ত করবো না, জীবনকে আমরা জীবনের মতো উপস্থাপিত করবো, নিজেকে উৎসারণ করবো জীবনের পাত্রে দুঃখের মতো সংলগ্ন হয়ে।[২৪১]

সাম্প্রতিক-এ পত্রিকাটির দর্শন উক্ত হয়, 'জীবনকে আমরা বিভক্ত করব না, জীবনকে আমরা জীবনের মতো উপস্থাপিত করব, নিজেকে উৎসারিত করব জীবনের পাত্রে দুঃখের মতো সংলগ্ন হয়ে।'[২৪২] *সাম্প্রতিক* অবশ্য স্থায়ী হয় নি। একটি সংখ্যাতেই অবসিত হয়।[২৪৩]

স্যাড জেনারেশন (১৯৬৩)

স্যাড জেনারেশন পত্রিকাটির প্রকাশকাল ১৯৬৩ সাল। *স্যাড জেনারেশন* পত্রিকাটি একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল ইংরেজি ও বাংলা গদ্য রচনা সংবলিত। প্রকাশক ছিলেন–বুলবুল খান মাহবুব।[২৪৪] *স্যাড জেনারেশন* পত্রিকাটি সমাজের অসংগতি খুঁজে বের করতো। এবং তাদের মূল বিষয়ই ছিল পুরোনোর ফাটল ধরানো এবং ধ্বংস ঘোষণা।[২৪৫]

স্বদেশ (১৯৬৩-৭০)

১৯৬৩ সালে *স্বদেশ* পত্রিকাটি সাহিত্য বার্ষিকী হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী বছরে দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকার রূপ ধারণ করে।[২৪৬] *স্বদেশ* পত্রিকাটির সম্পাদক মফিজউদ্দিন আলী মহামেদ চৌধুরী।[২৪৭] প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন কাজী শামসুল

আহসান। *স্বদেশ* পত্রিকার ১ বর্ষ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭০ সংখ্যায় 'বাংলাভাষা' শীর্ষক প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে পত্রিকাটি ব্যক্ত মতামত বা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়,

> ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কতকগুলো বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে বাংলাভাষার চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে, মাতৃভাষা চর্চার পক্ষে এবং ভাষা-বিতর্কে পাক-বাংলা সৃষ্টির মতকে খণ্ডন করে আরবী-ফার্সী, সংস্কৃত শব্দবহুল প্রচলিত বাংলাভাষার পক্ষে মতামত দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত শব্দ বর্জন এবং আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জনে সংস্কৃতিপন্থী ও মুসলমানী বাংলার পক্ষদের উদ্দেশ্য করে ডক্টর শহীদুল্লাহ ভাষাতাত্ত্বিক মীমাংসাসমূহ তুলে ধরা হয়। ভাষা-রীতি সম্বন্ধে পত্রিকার মতে এটাই শেষ কথা। এবং এই সমস্ত বিতর্কের প্রেক্ষিতে বলা হয় 'বাস্তবিক আমরা এক অদ্ভুত আহাম্মকের স্বর্গেই বাস করছি বটে।[২৪৮]

স্বদেশ পত্রিকা ১৯৭০ সালে আহমদ ছফার সম্পাদনায় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে পুনপ্রকাশিত হয়।[২৪৯] ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত কয়েক মাস পূর্বের সময়কারে প্রকাশিত *স্বদেশে*র সমাজ সমালোচনায় লেখকেরা অনেকটা আলোর দিশা পেয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকদের কঠোর চোখ-রাঙানীকে তখন বাঙালি বেশি ভয় পাচ্ছে না, আর বুদ্ধিজীবীদের চারিত্রও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়েছে। তখন বুদ্ধিজীবীরাই বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। স্বদেশে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদ জয়ী হওয়ার চূড়ান্ত লগ্ন উপস্থিত–এই ভাবসমূহ ফুটে উঠেছে।[২৫০]

ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়–রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম পাকিস্তানী রেকর্ড ১৬ই জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে বাজারে ছাড়া হয়েছে। যাঁরা গেয়েছেন–সন্‌জীদা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, আফসারী খানম, রাখী চক্রবর্তী, কলিম শরাফী প্রমুখ তাঁদের অন্যতম। দি গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইস্ট পাকিস্তান লি. এটা প্রকাশ করে। আহমদ ছফা সম্পাদিত *স্বদেশ*-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছি–

> খুন রাঙা ফাল্গুনের রক্তবেগ তরঙ্গিত মরণহীন সুরেলা আহ্বান বেজেছে পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে। শহীদী প্রাণের মরণবিহীন আকাঙ্ক্ষা এক সুর, এক ছন্দে, এক তালে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শহর থেকে বন্দর, গঞ্জ থেকে গ্রাম, দেশের আনাচ কানাচ সব ঠাঁই সমুদ্র গর্জনের মতো উদাত্ত-গম্ভীর অথচ চিত্তহারী এক বলবন্ত সঙ্গীতের সুওে স্পন্দিত শিহরিত। দিনের পর দিন যাচ্ছে-মাসের পর মাস, গড়িয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। কিন্তু ফাল্গুনের খুন ঝরা সঙ্গীতের রক্তিম বেদনা প্রতিবার আমাদের গণচিত্তে বপন করে নতুন বেদনার বিজুলী, জাগিয়ে তোলে পেলব আশার রক্তমুকুল, প্রেরণা দেয় দুর্জয় মরণপ্রাণ সংগ্রামের। আটই ফাল্গুন তথা একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখটি বাংলা ভাষা-ভাষী মাত্রেরই হৃদয়ের রক্ত-রঙীন পলাশ ফোটার দিন। আমাদের নেই এর চাইতে মহত্তর কোনো পর্বদিন-না আনন্দের, না বেদনার, না আকাঙ্ক্ষার।
>
> আমাদের অতীত ইতিহাসের স্বেচ্ছাচার স্বৈরচারিতা, অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উন্মুখর, সংঘাতে সংক্ষুব্ধ দিনটির প্রতিটি সেকেণ্ড আমাদের কাছে ফুসফুসের নিশ্বাস বায়ুর মতো দামী আর পবিত্র। এ দিনে হৃদযন্ত্রকে হাতে নিয়ে কড়া সূর্যের আলোকে জাতির রক্তশপথ নতুন করে পাঠ নকরি, হাওয়ার সাথে বুকের ধুকপুক মিশিয়ে কান ভরে শুনি কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মুধকর গুঞ্জন। এই দিনেই তাজা প্রাণ বলি দিয়ে আমাদের জাতি অমৃত নির্ঝর মাতৃভাষায় দখল নিয়েছে। মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি নিয়ত নিবিড় চেনাশোনার মাধ্যমে মানুষ নতুন সৃষ্টিলীলায় জীবনের ফনা উচিয়ে তুলছে। এ বিচিত্র সংগ্রামী কর্মপ্রয়াসের মধ্যদিয়ে মাতৃভূমি আপন অনন্ত যৌবনাস্বরূপ প্রকাশ করে চলেছেন। আমাদের ভাষায় সঞ্চারিত হচ্ছে তেজ, সাহিত্যে ধ্বনিত হচ্ছে জীবন, সঙ্গীতে লহরিত হচ্ছে আনন্দ বেদনা সংগ্রাম, আভা আসছে চিত্রকলায়। আমাদের ভাবী ইতিহাসের তোরণদ্বার আটই ফাল্গুন তথা একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের তাবৎ সৃষ্টিকর্মের উৎস। এমন মহান দিনকে সামনে রেখেই আত্মপ্রকাশ করলো 'স্বদেশ'।[২৫১]

স্বদেশ পত্রিকাটি ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে অগ্রসর হয়েছিল। *স্বদেশ* পত্রিকার ১ বর্ষ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭০ সংখ্যা এবং আহমদ ছফা সম্পাদিত *স্বদেশ* (১৯৭০)-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় ভাষা এবং ভাষা আন্দোলনের বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পত্রিকাটির উদ্দেশ্যই ছিল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ও জাতিকে অগ্রসর করা। যার ভিত্তিতে এদেশের জনগণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পায়।

নাগরিক (১৯৬৪)

নাগরিক ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়ে বেশ কয়ক বছর চলে।[২৫২] ভাষা সৈনিক ডা. আহমদ রফিক ছিলেন নাগরিকের মূল ব্যক্তি। যদিও সম্পাদক এবং প্রকাশক ছিলেন বোরহানউদ্দিন ভূইয়া। ত্রৈমাসিক পত্রিকা *নাগরিক*-এর বক্তব্য ও সাহিত্যশিল্পগুণান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনার সমন্বয়ে যে স্টাণ্ডার্ড গড়ে উঠেছিল তেমন আর দ্বিতীয়টি ছিলনা। ১৯৭০ সালের পর পত্রিকটি আর প্রকাশ হয়।[২৫৩]

পলিমাটি (১৯৬৪)

ফজলুল হক সরকার সম্পাদিত *পলিমাটি*।[২৫৪] পলিমাটি একটি সাহিত্য সংকলন। পত্রিকাটির বক্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল উন্নত এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উচ্চকিত।[২৫৫] ব্যতিক্রমী চিন্তাসম্পদে পূর্ণ প্রগতিশীল সাহিত্য সাময়িকী *পলিমাটি*র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের 'বসন্ত ঋতুতে' একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-শহিদদের স্মৃতি সংখ্যারূপে 'কালো যাত্রার ধ্বনি' শোনাবার ব্যাকুল আগ্রহে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ লক্ষ্য করলে দেখা যা, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছয়-দফা আন্দোলন আরম্ভের সমকালে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, রীতি-নীতি, বৈষম্য-বিক্ষুব্ধ, দেশ-প্রেমিক প্রতিবাদী তরুণ সমাজের মুখপত্ররূপে যখন *পলিমাটি* আবির্ভূত হলো, তখন, এদেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া ও চীন থেকে প্রচুর পরিমাণ গ্রন্থ আমদানি হচ্ছিল আর মার্কসীয় মতাদর্শের প্রভাব বাংলার তরুণ সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।[২৫৬]

এদেশের তরুণ সমাজ স্বপ্ন দেখেছে শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় স্বস্তির-শান্তির সৃষ্টিশীল একটি আধুনিক রাষ্ট্রের। মার্কস- লেলিন- মাওসেতুঙের মহান আদর্শ অনুসরণ কওে তরুণতর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মীদের যে অংশের মধ্যে শ্রেণি-সংগ্রাম আর উৎপাদন ব্যবস্থার এবং জনগণের সাংস্কৃতিক স্বাধীকারের প্রশ্নের বিশ্লেষণ-সমালোচনা প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল...পলিমাটিকে ঘিওে আপন আপন স্বকীয় অনুভূতি উপলব্ধিজাত কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প প্রভৃতি প্রকাশের মাধ্যমে স্বদেশহিতের লক্ষ্যে এককালে সংঘবদ্ধ হয়েছিল।[২৫৭]

পলিমাটির লক্ষ্য-আদর্শ সম্পর্কে কাব্যেও ভাষায় প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলা হয়,

> পলিমাটি তাদের সাথে আপোষহীন
> যারা কাব্য কলাকে
> যৌন-সর্বস্ব টেডিনীরূপে দেখতে চায়।
> অথবা যারা কালো বোরখা পরিয়ে
> পর্দানশীল করতে চায়।[২৫৮]

আর ঐ বছরেই ক্ষীণকায় পত্রিকা 'পলিমাটি' প্রকাশিত হয়ে ১৩৭৮ সন পর্যন্ত ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ তাতে প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধ্যা, অন্ধকারাচ্ছন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে উজ্জ্বল আলোক সম্পাতে প্রয়াসী এইসব সাহিত্য পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা-গ্রুপের মাত্র একটির সমান আকৃতি-ওজনের হলেও এগুলোর মধ্যেই নবযুগের অভীপ্সা ব্যক্ত হতে চেয়েছিল।[২৫৯]

কণ্ঠস্বর (১৯৬৫)

মধ্যষাটে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *কণ্ঠস্বর*। প্রায় বারো বছর নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। *সাম্প্রতিক*-এর প্রথম সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপন ছিল এ রকম :

> স্বাক্ষর পরবর্তী সময়ে
> যে সব বিচিত্র সমন্বয়ে প্রকাশ পাবে
> ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্রিকা
> কণ্ঠস্বর
> ত্রৈমাসিক গল্প-পত্রিকা

শব্দরূপ

ত্রৈমাসিক প্রবন্ধ-পত্রিকা

সূচীপত্র

মাসিক সমালোচনা-পত্রিকা

বক্তব্য

স্বাক্ষর প্রকাশনা।[২৬০]

পত্রিকার প্রকাশিকা ছিলেন খালেদা হাবীব। ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো।[২৬১] হলুদ মলাটের ক্রাউন সাইজ ছিল পত্রিকাটি। মোটা আর্টবোর্ডের পিচ্ছিল দিকটাকে ভিতরের দিকে দিয়ে, এর কর্কশ সারফেসে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর চমৎকার বর্ণবিন্যাসে সাজানো *কণ্ঠস্বর* শব্দটি। লেখকরা সবাই ছিল তরুণ এবং শক্তিমান। প্রচ্ছদের বাম দিকে সূচিপত্রে লেখক ও লেখার নাম ছাপা হতো।[২৬২] প্রকাশনার শুরু থেকে *কণ্ঠস্বর* সাহিত্যের বিষয় ও ভঙ্গিতে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ তিনটি ধারাতেই নতুন রীতি-প্রকরণের পরীক্ষ-নিরীক্ষা চালিয়েছে *কণ্ঠস্বর*। এর মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা।[২৬৩] সম্পাদকের পক্ষ থেকে 'কেবল প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের' কাছ থেকেই লেখা আহ্বান করা হয়। বলা হয় যে, 'তাদের মধ্যে কোন নতুন দৃষ্টি বা বিন্দুমাত্র প্রতিশ্রুতি লক্ষ্যযোগ্য হলেই তাঁদের সে সব রচনাকে প্রকাশিতব্য মনে করা হবে।'[২৬৪] ব্যাক-কভারে মুদ্রিত একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন থেকে পত্রিকাটি দর্শন জানা যায়। বিজ্ঞাপনটি হলো–

> যারা সাহিত্যে সনিষ্ঠ, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর; যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীলম অনুপ্রাণিত; যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাস্পৃষ্ট–কণ্ঠস্বর তাদেরই পত্রিকা। প্রবীন মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক, এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহুত।[২৬৫]

নির্মলেন্দু গুণ এই দর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

> সুনির্বাচিত ৪৬টি শব্দবিশিষ্ট কণ্ঠস্বরের এই ইশতেহারটি পাঠ করার পর আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই পত্রিকার মধ্যে নিজের আত্মাকে অবলোকন করি। আমার কেবলই মনে হতে থাকে যে, এটি আমার পত্রিকা। আমারই কণ্ঠস্বর।[২৬৬]

ষাটের দশকে নবজাগ্রত সমস্ত কণ্ঠস্বর পত্রিকাটি গ্রহণ করে, ঘোষিতভাবেই বর্জন করে পূর্বজ লেখকদের তিরিশ সংখ্যা ব্যাপী সে এই অটুট চারিত্র রচনা করে।[২৬৭]

কণ্ঠস্বরের প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬-তে প্রচ্ছদে উল্লিখিত সূচিপত্রের নিচে বলা ছিল, 'নিরীক্ষণশীল তরুণ লেখকদের নতুনতম দৃষ্টিভঙ্গীর, বিষয় এবং আঙ্গিকে অন্তসত্ত্বা, স্বকীয় শক্তিশালী রচনায় 'কণ্ঠস্বর' নিয়মিত আত্মপ্রকাশ অচিরেই শুরু করছে।'[২৬৮]

কণ্ঠস্বর-এর প্রথম সংখ্যার চতুর্থ প্রচ্ছদে সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কের বলেন,

এই সংকলনের উদ্দেশ্য

আমাদের গল্পের বিশেষ একটা ধারা, তার

নিঃসঙ্গ জনকয় লেখক ও

তাদের স্বতন্ত্র

কণ্ঠস্বর।'

আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসায় রক্তাক্ত

আমাদের যে-তরুণ

গল্পকারেরা বুঝেছেন যে :

'সাহিত্য আত্মজৈবনিক হওয়া উচিত,' কেননা

'ডায়েরি আমাদের অন্তর্জীবনের সার্থকতম

ইতিহাস'
বুঝেছেন যে, গল্প আমাদের ব্যক্তিগণ রক্তের
প্রেম
যৌনতা
বিষাদ
আত্মহননের
স্বারক; এই ধারা সেই নিঃসঙ্গ জনকয় লেখকের–
তাদের স্বতন্ত্র
কণ্ঠস্বরের। এই নতুন ধারার গল্পকারেরা যে নতুন
দৃষ্ঠিভঙ্গিও সংযোজন করলেন
বক্তব্যে ও আঙ্গিকে–তারই
স্বার্থকতম উপস্থাপন[২৬৯]

নতুন সাহিত্যের গভীরতর এলাকা সফর করবার বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে তৃতীয় সংখ্যার ঘোষণায়, বোঝা যাবে এখান থেকে জল গভীর হতে শুরু করেছে–

> সাহিত্যকে যাঁরা অনুভব করতে চান শততলে, শতপথে, বিঘ্নিত রাস্তায়; আঙ্গিকের জটিলাক্ষরে, চিন্তার বিচিত্র সরণীতে; কটু স্বাদে ও লোনা আঘ্রাণে; সততায়, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, অভিভূতিতে ও পাপে; মহত্ত্বে ও রিরংসায়, উৎকণ্ঠায় ও আলিঙ্গনে, কণ্ঠস্বর সেইসব পদপাতিবিরল তরুণদের পত্রিকা।[২৭০]

পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপত্র, অথচ কেবল তরুণদের, প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের; এর ফলে তৎকালীন তরুণেরা একটি নিজস্ব জায়গা পেয়ে গিয়েছিল, পেয়েছিল নতুনের উল্লাস-মৌলিক উচ্চারণের সাহস-স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ ক্ষেত্র। প্রতিষ্ঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকার যে-বাঁধা রাস্তা তাতে নতুন কিছু করা অসম্ভব, 'কণ্ঠস্বর' যথেচ্ছাচারের দুয়ার নতুনদের জন্যে অবাধ খুলে দিয়েছিল বলেই '৬০-এর কবিতা ও কথকতায় ও গদ্যরচনায় পেলাম কোনো কোনো মৌলিক কণ্ঠ এবং সমগ্রভাবে '৬০-এর এক নবীয়ান সাহিত্য।[২৭১]

সাহিত্যপত্রিকার আলোচনা এই পত্রিকাটির প্রসঙ্গে বিভিন্নজন নানানভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন (১৯৬৮), 'ঢাকা থেকে সম্প্রতি যে কয়েকটি সাহিত্যপত্র বেরিয়েছে তন্মধ্যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের 'কণ্ঠস্বর' বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।'[২৭২]

কণ্ঠস্বরের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে মুনীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১৯৬৯ সালে আবুল কাসেম ফজলুল হক 'সৃষ্টি বা গড়ার চেয়ে ধ্বংসোন্মুখ জরাজীর্ণ-পুরোনোকে প্রবল আঘাতে সহসা ভেঙে দিয়ে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি বা ক্ষেত্র তৈরির কাজের মধ্যেই এই পত্রিকার মহত্ত্ব দেখতে পেয়েছিলেন।'[২৭৩]

গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন (১৯৭০),

> অগত্যারই উত্তরসূরী কণ্ঠস্বর। কলকাতার 'শনিবারের চিঠি'র মতো (প্রথম দিকের) অবয়ব নিয়ে 'কণ্ঠস্বর'র তরুণ-সাহিত্যিক মহলে কণ্ঠস্বর শুনিয়ে আসছে।... কণ্ঠস্বর'কে কেন্দ্র করে বিশ শতকের ষষ্ঠদশকের কতিপয় প্রতিশ্রুতিশীল লেখক একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ার কাজে উৎসাহী, এ দশকেই আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নবতর সাহিত্যান্দোলন জন্ম নেয়। শুরু হলো সাহিত্যেও পাল-বাদ। দুই যুগ পরে আজ সৃষ্টিপ্রয়াসী তরুণ লেখক ও সাহিত্যব্রতীদের রচনায় যুগধর্ম সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বস্তুতান্ত্রিক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে আজকের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও সমালোচনা।[২৭৪]

আহমাদ মাযহার ষাটের দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে কণ্ঠস্বরের ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> ষাটের দশক ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থানের সময়, পাকিস্তানিদের স্বার্থে বেনিয়া বুর্জোয়াদের বিকাশের সময়। এ দেশের বামপন্থী রাজনীতিও একটি শক্তিশালী অনুষঙ্গ হিসেবে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে এ সময়ই। এ দেশের সাহিত্যে সমাজ-রাজনীতির এই অভিঘাতগুলো ষাটের দশকে বেশ তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। এইসব প্রবণতাকে

> বিচ্ছিন্নভাবে ধারণ করে রেখেছিল ষাটের দশকের লিটল ম্যাগাজিনগুলো। *কণ্ঠস্বর* পত্রিকা তার দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং এর সম্পাদকের উদার ও মুক্ত গ্রহণদৃষ্টির জন্য সক্ষম হয়েছিল সমাজ-রাজনীতির স্পষ্টভাবে অনুভূত এই দ্বিমুখী প্রবণতাকে ধারণ করতে। বাংলাদেশের সাহিত্যের রূপতাত্ত্বিক এবং চেতনাগত বিকাশ যা ষাটের দশকের লিটল ম্যাগাজিন স্রোতের প্রধান অনুষঙ্গ–তাকে সবচেয়ে সম্পন্নভাবে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল *কণ্ঠস্বর*।[২৭৫]

আবদুল মান্নান সৈয়দ 'কণ্ঠস্বর' বলতেই উৎসাহী। কারণ 'লিটল ম্যাগাজিনের আত্মায় মিশে আছে বিদ্রোহ।'[২৭৬]

'কণ্ঠস্বর' **১৯৭১** সালের পূর্বে ২০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ায় এর প্রধান লেখকরা তাঁদের আত্মকণ্ঠকে তীব্র ও স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন; পেরেছেন লেখকের সৃজনীদ্যুতিকে উজ্জ্বল করে তুলতে।[২৭৭]

না (১৯৬৭)

'না' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় **১৯৬৭** সালে।[২৭৮] 'না' নামক পত্রিকাখানি '৬০-এর শিল্পান্দোলনের এক মেরুশেখর। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তুলকালাম শিক্ষার্থী-কবির হাতে বাহিত হয়েছিল। এই প্রায় নাস্তিবাদী প্রায়-ডাডাবাদী পত্রিকাখানি। বেপরোয়া যৌনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবিতার সজ্জাগত এবং পত্রিকাখানির আঙ্গিকগত অভিনতুনত্ব।[২৭৯]

ছোটগল্প (১৯৬৬)

ষাটের দশকের মাঝামাঝি *ছোটগল্প* প্রকাশে মনোনিবেশ করেছিল *ছোটগল্প*, *শ্রাবন্ত* ও *সূচীপত্র* পত্রিকা তিনটি। এ সময় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ছোটগল্প সমিতি' নামে একটি সংগঠনও। এই সমিতি থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় *ছোটগল্প*। সম্পাদক ছিলেন শশাঙ্ক পাল।[২৮০] শুধু ছোটোগল্পকেন্দ্রিক পত্রিকা হিসেবে এটিই বাংলাদেশের প্রথম গল্পবিষয়ক পত্রিকা। *ছোটগল্প*-এর প্রথম সংখ্যায় যে ঘোষণা পত্রটি প্রকাশিক হয়েছিল তা হলো–

> কাব্যভারাক্রান্ত বা কষ্টার্জিত শব্দমণ্ডলীর আপাতমধুর বিভ্রান্তিতে যাঁরা আচ্ছন্ন নয়–নিরীক্ষণমূলক আধুনিক গল্প বলতে যাঁরা ঋজু, তীক্ষ্ণ অথচ সৎ এবং জীবননিষ্ঠ গল্প বোঝেন–ছোটগল্প মূলত তাঁদের পত্রিকা।
>
> দেশের সাম্প্রতিক শিল্পচিন্তার বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি সেইসব তরুণ গল্পকারদের অন্তঃসত্ত্বা প্রচেষ্টাকে আমরা আনন্দে, গৌরবে ও মধুর উৎকণ্ঠায় তুলে ধরতে সর্বদা আগ্রহী।
>
> সুতরাং গল্প লিখুন। যে-গল্প অনাবশ্যক বাগ্মিতা বা অপ্রয়োজনীয় শব্দসম্ভারে ভারাক্রান্ত নয়। যে-গল্প চিন্তার প্রতিটি স্তরে সমান আবেদনময়। গল্পকে কবিতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন এবং জীবনের কাছাকাছি ফিওে আসতে দিন।[২৮১]

দ্বিতীয় সংকলনে প্রকাশকের আলেখনে 'ছোটগল্প প্রসঙ্গে' শিরোনামে বলা হয়েছিল–

> প্রায় দু'বছর আগে আমরা ছোটগল্প সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এ উদ্দেশ্যে নিয়ে যে, ছোটগল্প চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা জীবনের গভীর মর্মবাণীকে ফুটিয়ে তুলবো। এরই জন্যে আমরা এ দেশের সাম্প্রতিক শিল্পচিন্তার বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি আমাদের তরুণতম গল্পকারদের সমবায়ে একটি গল্প-আন্দোলনের সূত্রপাত করার বাসনা পোষণ করছি। এ ব্যাপারে পুরো সাফল্য অর্জিত হবে–এমন দৃষ্ট উক্তি আমরা এ মুহূর্তে করতে হয়তো পারি না, কিন্তু আমাদের হৃদয়, মনন, দৃষ্টিভঙ্গি যে কি বিপুল সম্ভাবনায় অন্তঃসত্ত্বা–আমাদের বিনীত প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গে তার পরিচিত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিরাজমান।[২৮২]

ছোটগল্প-এর মোট ষোলটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[২৮৩]

সূচীপত্র (১৯৭০)

সূচীপত্র তাঁর প্রকাশিত তিনটি সংখ্যায় '৬০-এর কিছু নতুন-পুরোনো গল্পকথককে উপস্থাপন করেছিল। এর প্রথম সংখ্যা প্রথম রচনাটি ('১৯/ চৈতন্যচীন জাগরণ/ইতেহার/৭০') ঘোষণাধর্মী, গল্পসংক্রান্ত না হলেও তেজি ও নতুন চিন্তার বীজলেখা হিসেবে এর প্রথম ও শেষ অংশ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি–

> যদ্দিন আমাদের ভবিষ্যৎ ছিল বাঁধাধরা ফ্রেমের মধ্যে, যদ্দিন আমাদের কাম্য কিছু প্রতিপাদ্য ছিল, সুখ ছিল; ধর্ম ছিল, যৌন-নিয়ম ছিল; তদ্দিন আমাদের সাহিত্যে একটি ব্যাকারণের নিয়ম দরকার ছিল। এখন আর নেই তা।
>
> ভবিষ্যৎ/জীবন/প্রতিপাদ্য/উদ্দেশ্য-সবের মানে হচ্ছে একটি ফ্রেমের মধ্যে ফ্রেমবহির্ভূত জাগরণকে চৈতন্যায়িত করা।

কিন্তু যে ফ্রেম/ যে কার্যকারণ/ যে প্যাটার্নের মধ্যে আমরা চৈতন্যাতীত জাগরণকে চৈতন্যায়িত করতে চেয়েছি সম্প্রতি সে সবের অসারতা/অব্যবহারতা/তূরীয় অর্থহীনতা প্রমাণিত হয়েছে।...

উনিশশো সত্তর থেকে থেকে আমাদের এ দেশে এক অপ্রকাশ্য পালাবদল শুরু হয়েছে। কালচার/রাজনীতি/ভাষা-প্যাটার্নের অন্তর্গত ভুলচক্ষু শোধরানো হবে দ্রুত। সবার আগে নির্মাণ করতে হবে সেই ভাষা-প্যাটার্ন যার মধ্যে চৈতন্য নেই কিন্তু চৈতন্যহীন জাগরণ আছে। লী হর্ফ আর এডওয়ার্ড স্যাপীরের সেই সত্যকথনগুলো মনে পড়ছে যার ভেতর থেকে এক তীব্র স্লোগান বেরিয়ে আসে তুমি তোমার ভাষায় প্যাটার্ন ও অভ্যাসগুলো বদলে ফেলো তোমার রাষ্ট্র/কালচার/ চৈতন্য বদলে যাবে।

অতএব আপাতত দায়িত্ব বর্তালো ভাষাব্যবসায়ীদের ওপর।[২৮৪]

শিল্পকলা (১৯৭০)

১৯৭০ সালে প্রথম *শিল্পকলা* প্রকাশিত হয়।[২৮৫] *শিল্পকলা* ছিল শিল্পবিশ্বাসী এক তরুণ দলের প্রবন্ধ-পত্রিকা।[২৮৬] পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন–আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবদুস সেলিম। পত্রিকাটি ছিল মূলত প্রবন্ধের। মোট আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[২৮৭] *শিল্পকলা* বহু অচেনা সংস্কৃতিমান ব্যক্তিকে লেখকে পরিণত করেছে–এটি ছিল পত্রিকাটির একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য।[২৮৮] এ পত্রিকটি ভিন্নধর্মী ছিল। কারণ পত্রিকাটিতে কবিতাচর্চার পাশাপাশি চিত্রকলা, চলচ্চিত্রসহ সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বিচরণ করেছিল সার্থকতার সঙ্গে।[২৮৯] মূলত সাহিত্যপত্র হলেও সংগীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি বিষয়েও নিবিষ্ট ৬০-এর লেখকদের বহুধা শিল্পোৎসাহের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।[২৯০]

উপসংহার

সাহিত্য অঙ্গনে লিটল ম্যাগাজিনের অবদান অনেক বেশি। লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সাহিত্যের নতুন চিন্তা, নতুন সাহিত্যের দল, নতুন সাহিত্যের ধারা সাহিত্যে ক্ষেত্রে জন্ম নেয়। সাহিত্যেও নতুন বাঁক পরিবর্তন, নতুনদিকে যাত্রা গাতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে, প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করে, নতুন পথে সাহসের সঙ্গে যে যাত্রা সেটা হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিনের যাত্রা। এর মধ্যে একটা প্রথা বিরোধিতা আছে, একটা দুঃসাহস আছে, বিদ্রোহ আছে। নতুন অনিশ্চিত পথে সাহিত্যের পদপাত, নিত্য নতুন পালাবদল লিটল ম্যাগাজিনই ঘটায়।

লিটল ম্যাগাজিন তৎকালীন সমাজকে একটা ঝাঁকনি দিতে সংক্ষম হয়েছিলেন। পুরাতন নেতৃত্ব ও সমাজকে পত্রিকাটি আক্রমণ করেছে। পুরাতনরা ছিল রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার রক্ষক। এই পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা যারা (যে সব তরুণ) ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল, তাঁরাই সময়ে সমাজ ও দেশের নেতৃত্ব হাতে নেয়। পুরাতনকে ভেঙে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে।

ঢাকা থেকে যেসব লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ হতো, তার প্রধান কর্মীপুরুষেরা ছিলেন এক-একটি গুচ্ছে বিভক্ত। কোনো কোনো ব্যক্তি একাধিক গোষ্ঠীতেই চলাফেরা করতেন।[২৯১] অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে বা একটি সংগঠনের আওতায় এসে তারা কাজ করতে পারেনি।

উপর্যুক্ত লিটল ম্যাগাজিনে উদ্ধৃত ঘোষণাপত্রগুলো এবং সাধারণভাবে ব্যক্ত প্রাথমিক পরিচিতি থেকেই এটি স্পষ্ট যে, '৬০-এর এইসব লিটল ম্যাগাজিন আপনাপন উদ্দেশ্যে ও উপায়ে, অন্বিষ্টে ও তীর্থপথে ছিল বিচিত্রগামী, অনেক সময় পরস্পরবিরোধী। এই সমস্ত মিলেই এরা বিশাল জীবনকে চুম্বন করেছিল; বিরাট জীবনকে ওরা বন্দনা করেছিল ঐ সমস্ত মিলেই।'[২৯২]

বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একটি বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ–

> ষাটের দশকে ব্যবসা-বানিজ্য ও শিল্প-মালিকানার প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল মূলত অবাঙালিদের হাতে। ফলে তাদের বাণিজ্যিক শিল্পপণ্যের বিজ্ঞাপন এখানকার গুটিকয় বাংলা দৈনিকসহ হাতে গোনা কয়েকটা ইংরেজি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় মূলত ছাপা হতো, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার ভাগ্যে কখনোই জুটত না। ষাটের মাঝামাঝিতে

একটি সাহিত্য পত্রিকার গোটা তিনেক জায়গা থেকে বিজ্ঞাপন পাবার সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। সাধনা ঔষধালয়ের যোগেশবাবু প্রায় বিনা-প্রার্থনাতেই একটি তিরিশ টাকা মূল্যের বিজ্ঞাপন মঞ্জুর করতেন, কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপনটি ছাপার এবং পরবর্তীতে ঐ বিজ্ঞাপনের টাকার পাবার জন্য যে যাতায়াত খরচ হতো তার হিসাব নেবার পর আমাদের কাছে ঠিক বোধগম্য হতো না বিজ্ঞাপনটি আমরা কেন ছেপেছিলাম। আরেকটি জায়গা থেকে বিজ্ঞাপন পাবার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকত–সেটা বাংলা একাডেমী। বিজ্ঞাপনের এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে আর্থিক অনটনের এই নির্মম পরিবেশে একটি সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে নিয়মিত হওয়া কিংবা বিলুপ্ত না-হওয়া, সত্যি একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সাহিত্য পত্রিকার দুর্বল ও শক্তিশালী প্রায় প্রতিটি উদ্যোগই যে ঐ দশকে স্বল্পায়ু বা ক্ষুদ্রায়তন এক-একটি অনিশ্চিত ছোট্ট লিটল ম্যাগাজিনের সীমিত জীবনপরিসরে জেগে উঠেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ এ-ই।[২৯৩]

আবদুল মান্নান সৈয়দ লিটল ম্যাগাজিনের অবদান সম্পর্কে লিখেছেন,

> কী দিয়েছে এই লিটল ম্যাগাজিনগুচ্ছ? দিয়েছে দীপ্তি, তেজ, জোশ; দিয়েছে নতুনের সাহস, মৌলিকের সাহস, অভাবনীয়ের সাহস, শিখিয়েছে উদ্যমের ব্যথা সইতে, অচেনা রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে, শিখিয়েছে গড্ডলের অস্বীকার, প্রতিষ্ঠার অস্বীকার, এমনকি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার; বলেছে : জীবন মানে অন্ধ অনবর্তন নয়, জাগ্রত উদ্বর্তন। আর শিখিয়েছে শিল্পকে ভালোবাসতে, জীবনের সমান মূল্যবান জ্ঞান করতে। শিল্পসাহিত্যের প্রতি এই আবেগময় রক্তময় ভালোবাসা ছিল বলেই রফিক আজাদ প্রায় প্রতীকার্থে ঘড়ি বিক্রি করে সময়ের দাবি মিটিয়েছেন, আসাদ চৌধুরী প্রকাশক হিসেবে নীতিধ্বজী আমলার মোকাবিলা করেছেন, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ রোজগার করেছেন একসঙ্গে অনেকগুলি জটিল অসুখ, কুমিল্লার মনোরঞ্জন বিশ্বাস জমি বিক্রি করেছেন পত্রিকা বের করবার জন্যে। এইসবই ঘটেছিল বড়ো সেই বেদনার জন্যে, যাকে বলে সৃষ্টিতাড়না।[২৯৪]

সাহিত্যপত্র ও সাময়িকপত্র

সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাকে সাহিত্যপত্র বলা হয়। রাষ্ট্রকে দীর্ঘায়ু করার জন্য পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে সরকারের পাকিস্তানপন্থি ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী এবং ধর্মীয় আদর্শের প্রচারপত্ররূপে এক ঝাঁক শক্তিশালী সাহিত্য-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলো, যেগুলো কাজই ছিল প্রগতিকে রোধ করা।[২৯৫] সরকারি খরচে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত শত শত বিচিত্র সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিকীতে মূলত শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ বজায় রাখতে সহায়ক হয় এমন বক্তব্য বা রচনারাজি প্রাধান্য পয়েছে।[২৯৬]

পূর্ববঙ্গে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র ও হুমকি মুখোমুখি হলো, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত সৃষ্টিশীলতা ও জাতীয় অনুভূতি ধ্বংসের প্রক্রিয়া চললো যখন, তখন সেই সংকটময় শূন্যতার কালে, পূর্ববাংলায় প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল সুস্থ মানবিক চিন্তাভিত্তিক জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সাহিত্য চর্চার উপযুক্ত উন্মুক্ত পরিবেশ। সেজন্য দারকার ছিল ভালো সাহিত্যপত্র ও সাময়িকপত্রের। আর সংগীত, নৃত্য অভিনয় অঙ্কনের বিভিন্ন ধারার গতিশীল সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের অর্থাৎ সরকারেরই নিষেধাজ্ঞায় এবং সাবধানী শর্তের ফলে এমন পর্যায়ে পৌঁছুল যে, বাঙালি সংস্কৃতি ও গণসংস্কৃতির চর্চা গণ্য হতে লাগল রীতিমতো 'কমিউনিস্ট' কার্যাবলি হিসেবে। আর 'ভারতীয় দালাল', 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ছাড়া বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা যে কেউ করতে পারেন, তা ছিল তখন সরকারি বিবেচনায় অসম্ভব ও অভাবনীয়। এমনি এক বন্ধ্যা, সৃষ্টি বিরোধী সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিস্থিতিতে উত্তর কালের স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তি সহায়ক সাহিত্য সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সাতচল্লিশ সাল থেকেই কাজ শুরু করেছিল একদল কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এই শুভবাদীরা সরকারি আদর্শের, সাম্প্রদায়িক চিন্তার, হীন উদ্দেশ্যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের প্রক্রিয়াকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নানান নামে সাময়িকপত্র প্রকাশ আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা কলম ধরেছিলেন প্রগতিশীল মানবতাবাদী নীতি অবলম্বন করে এবং বাংলা ভাষার বিকাশের ও বাংলা সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে।[২৯৭] অর্থাৎ, পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বৈরী পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও

এইসব পত্র-পত্রিকায় বাঙালির জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উন্মোচন করে এমন অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে।[২৯৮] প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও বাঙালির স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়তাকারী, অন্যায়-অবিচার, বৈষম্য ও জাতীয় অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সকল কার্যক্রমকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখোমুখি করে নেওয়ার দুঃসাহস দেখাতে চেয়েছিল এমন কিছু পত্রিকাও ১৯৪৭-৭১ সময়ে বাংলা ভাষায় পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মীদের সম্পাদনা ও প্রযোজনায় প্রকাশিত হয়েছে।[২৯৯] তাছাড়া, শিক্ষিত সমাজের একটা অংশের কাছে পাকিস্তানি আদর্শের একটা বড় ধরনের ভ্রান্তি ধরা পড়ে। ফলে ক্রমে একশ্রেণির লেখক সম্পাদক পৃষ্ঠপোষক উদারনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। তরুণদলের মুখপত্র কম থাকায় তাঁরাও এঁদের সাথে মানবতাবাদ এবং সাধারণভাবে গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করে লেখা শুরু করলেন।[৩০০] এসব সাহিত্য পত্রিকা পরিকল্পিতভাবে প্রকাশিত হয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে। এইসব পত্রিকায় সমাজের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখায় স্থান পায়। চিন্তা-ধারার দিক থেকে এগুলো লিটল ম্যাগাজিনের মতো নয়। বিকল্প বা উন্নতমানের সাহিত্যপত্রের ঐতিহ্য বলতে আমরা যা বুঝি তা ঠিক পঞ্চাশের দশকে গড়ে ওঠেনি। এর সত্যিকার সূচনা ষাটের দশকে, সমকাল প্রকাশের মাধ্যমে।[৩০১] সাহিত্যপত্রে এদেশে তিনটি ধারা ছিল–এক. পাকিস্তানবাদী সাহিত্যপত্র, দুই. উদার নৈতিক মানবতাবাদী ধারা এবং তিন. মার্কসীয় ধারা।

ষাটের দশকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা তথা সৃজনশীল মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক ও বিভিন্ন সংকলনগুলোকে উপর্যুক্ত তিনটি ভাগে বিচার করা যেতে পাড়ে। অতএব বর্ণিত তিনটি মোটাদাগে ভাগ করে দেখলে সেকালের পত্রিকাগুলোকে এভাবে ভাগ করা যায়–

ক. পাকিস্তানপন্থি সাহিত্যপত্র : এই ধারার সাহিত্যপত্রগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে গণ্য করে আগাগোড়া বিরোধিতা করেছে।[৩০২] বাঙালির চিত্ত তখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আলোকে উদ্ভাসিত হতে চলেছে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতাশীনেরা পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু করার উপায় খুঁজছিলেন। পাকিস্তানবাদী এ ধারার লক্ষ্য ছিল 'সমগ্র পাকিস্তান' চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগে সহায়তা করা। তাঁদের মতাদর্শের অনুসারী তথা ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী সরকারি-বেসরকারি বেশ কিছু পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা প্রচারণাও চালায়।[৩০৩] পাকিস্তানবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এইসব পত্রিকা তথ্য ও ইতিহাস বিকৃত ঘটিয়েছে। পত্রিকগুলোর বিশেষ কোনো ধর্ম ও আদর্শ ছিলনা। সবকিছুর উর্ধ্বে তাদের লক্ষ ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা।

এ ধারার মাসিক সাহিত্য পত্রিকাগুলোও ছিল প্রতাপশালী। তাঁরা পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রচার-মাধ্যমের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। তাই পাকিস্তানপন্থি ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী অথবা ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের মুখ্য অস্ত্র রূপে একদল শক্তিশালী পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলো, এগুলোর মধ্যে প্রথমে বের হয় মোহাম্মদী (১৯২৭-৭০), আল-ইস্‌লাহ (১৩৩৯-৭৮) ও *মাহেনও* (১৯৪৯-১৯৭০)। সরকারি তথ্য কেন্দ্র প্রযোজিত 'মাহেনও' প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এবং পরে অচিরেই ঢাকা থেকে (চৈত্র ১৩৫৫) কোমর বেঁধে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো।[৩০৪]

মোহাম্মদী (১৯২৭) ঢাকায় স্থানান্তরিত করে (১৯৪৯) মালিক কর্তৃপক্ষগণ তাঁদেরই কাঙ্ক্ষিত সাধের পাকিস্তানকে নতুন প্রাণ-সঞ্চারের ব্রতে পুনরায় পাঠে নামলেন। এঁদেরকে অনুসরণ করলো একগুচ্ছ সাহিত্যপত্র–*দিগন্ত*, *অভিযান*, *অতএব*, *দিলরুবা* (১৯৪৯); *নওবাহার* (১৯৪৯); *দ্যুতি* (১৯৪৯); *তাহজিব* (১৯৫০); *পূবালী* (১৯৬০), *লেখকসংঘ পত্রিকা*, *পরিক্রম*, *সংলাপ*, *উত্তর-অন্বেষা* প্রভৃতি।[৩০৫]

সরকারি খরচে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পৃষ্টপোষকতায় প্রকাশিত এইসব পত্রিকা শিক্ষিত সমাজে পাকিস্তানবাদীদের ফাঁকি এবং স্বার্থপরতা ও পাকিস্তান হওয়ার পরে পরেই নগ্নভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধিজীবী পরশ্রমভোগী ও শিক্ষিত সমাজে পাকিস্তানবিরোধী বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ না-পেলেও কৃষক শ্রমিক ও শোষিত শ্রেণির সনসমাজে বিক্ষোভ চাপা বিদ্রোহের রূপ লাভ করে। ১৯৫২ ও ১৯৫৪তে এর প্রকাশ ঘটে।[৩০৬]

এ সময় অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থবোধ সমাজের বিবেককে প্রচণ্ডভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বহু কবি, সাহিত্যিক, সম্পাদক, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী পাকিস্তানবাদী ইসলামীধারার চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন সত্তর-একাত্তর সাল পর্যন্ত।[৩০৭] বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের হাতে রাখার জন্য সরকার নানান কৌশল গ্রহণ করে। সরকারি তথ্য বিভাগ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পাকিস্তান কাউন্সিল, নজরুল একাডেমি ও আরও অনেক সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ প্রদান করেছে বুদ্ধিজীবীদের। বিশেষভাবে আইয়ুব শাসনামলে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণির যে অংশ আগাগোড়াই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পাকিস্তানবাদী চক্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে।[৩০৮]

পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবীদের বিপথগামী করার জন্য পাকিস্তানবাদী চক্রের অপকৌশলের কোন অন্ত ছিল না। বেতার, টেলিভিশন, সরকারি পত্র-পত্রিকা এবং তথ্য ও প্রচার বিভাগ প্রভৃতিকে সরকার ব্যবহার করেছে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে। ব্যবসায়ীরা সরকার সমর্থক সৃষ্টির জন্য সাহিত্য পুরস্কারের যে ব্যবস্থা করেছিল, তার পশ্চাতেও ছিল অসৎ উদ্দেশ্য। এমনকি একান্তভাবে ভাষা-আন্দোলনেরই ফলে সৃষ্ট বাংলা একাডেমি যা পুরোপুরি সরকারি প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত নয়–তাকেও সরকার আশ্চর্য কৌশলে ব্যবহার করেছে স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে। বাংলা একাডেমির পরিচালককে দিয়ে কখনও কখনও সরকার রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন করিয়েছে, বাংলা বর্ণমাল সংস্কারের ষড়যন্ত্রে ব্যবহার করেছে, সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বাংলা একাডেমি, পাকিস্তান কাউন্সিল, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, নজরুল একাডেমি প্রভৃতি এবং অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি ও সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ নগ্ন, নির্লজ্জ ও উলঙ্গভাবে।[৩০৯]

পাকিস্তানবাদী এসব বুদ্ধিজীবী পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর গুরুত্ব দেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেন,

> একালে প্রকাশিত সাহিত্যের গা থেকে প্রকাশ কালের চিহ্ন মুছে দিয়ে আমরা ভাবী কালের কাছে পাঠিয়ে দিই তাহলে ঐ কালের সমাজবিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে চিনে নিতে কষ্ট হবে না যে এটা লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে। তিনি বলে দিতে পারবেন যে, সেই সময়টায় নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল...তার মনে জিজ্ঞাসা ছিল বেশ কিছু বিষয়ে। তার ভারি মুস্কিল হয়েছিল আত্মপরিচয় নিয়ে। সে জানত যে গৌরব করার মত বড় একটা ঐতিহ্য তার আছে, কিন্তু নিশ্চিত জানতানা যে কোনটা সেই ঐতিহ্য। বর্জন ও গ্রহণের বিচিত্র তরঙ্গে তার চিত্ত দোদুল্যমান থাকত। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুযোগ ছিল দেশ ভ্রমণে, অবকাশ ছিল স্মৃতি রমন্থনের। তার সমাজে বিজ্ঞান আসছিল ধীরে ধীরে। আর দেশের সাধারণ মানুষ কি করত, কেন কোন দ্বন্দ্ব ও সংকটে তারা পীড়িত ছিল তার একটা ছায়া মধ্যবিত্তদের এইসব লেখায় যদিবা পড়েছে বলে মনে হয় তবু সেটা ছায়াই। ভাবীকালের সেই সমাজবিজ্ঞানী হয়তো আরও বলবেন যে, ধারারণ মানুষের দুর্দশার ছবি তৎকালীন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়, আর সংবাদপত্রের চিত্রকে নির্ভরযোগ্য মনে করলে তারা হয়ত এও বলতে বাধ্য হবেন যে ১৯৪৭-৬৮ (১৯৭১ ধরে নিলেও ক্ষতি নেই) এর সেই নব্য মধ্যবিত্তদের ব্যস্ত চিন্তা ও উৎসাহিত কল্পনা জন-জীবনের বিপুলাংশকে মোটেই স্পর্শ করেনি।[৩১০]

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মন্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত। এই সময় 'মৌলিক গণতন্ত্র' পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং ঐ ধারার সাহিত্যের পৃষ্ঠোপোষকতা করে। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা বা মহকুমা থেকে মৌলিক গণতন্ত্রের মুখপত্র স্বরূপ বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। মৌলিক গণতন্ত্রের কার্যপ্রণালি, উন্নয়ন-কার্যপন্থা এবং স্থানীয় সংবাদ পত্রিকাগুলোতে মূখ্য হলেও সাহিত্যও এ পত্রিকাগুলোতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। নতুন লেখকদের রচনাসম্ভার ছাড়াও কোনো কোনো পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিচয় ছাপা হতো।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র (বাংলা একাডেমি, ইসলামিক একাডেমি, নজরুল একাডেমি, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতি) এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান গবেষণা পত্রিকা ছাড়াও নানা পেশাজীবীদের মুখপত্র ব্যাপক হারে প্রকাশিত হতে থাকে–তাতে প্রচুর নতুন সাহিত্য ও লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। যাঁরা কোনোদিন লিখবেন এবং তা কাগজে ছাপা হবে এমন চিন্তাও করতে পারেন নি, তাঁদের লেখাও নিয়মিত ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলেন।[৩১১] সরকারি আনুকূল্য পাওয়ার

আশায় এইসব লেখক পাকিস্তানবাদী হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কারণ, পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াতেই তাঁদের জন্য লেখক হওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাই তাঁরা পাকিস্তানের সংহতিতে আস্থা রেখেই দেশের ও মানুষের কল্যাণের নামে নিজের নিজের সমৃদ্ধির চিন্তা করতেন এবং 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' আন্তরিকভাই উচ্চারণ করতেন।[৩১২] মফস্বল শহরের প্রতিশ্রুতিশীল লেখকরাও এসব পত্রিকায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল।

মাহেনও (১৯৪৯-১৯৭০)

মাহেনও সাহিত্য পত্রিকাটি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি তথ্য কেন্দ্র প্রযোজিত *মাহেনও* প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পরে চৈত্র ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশ হতে শুরু করে।[৩১৩] *মাহেনও*-প্রকাশিত হতো তদনীন্তন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বাংলা মুখপত্ররূপে, আঞ্চলিক তথ্য ও প্রচার এবং প্রকাশনা দফতর থেকে। কবি আবদুল কাদির পত্রিকাটি সম্পাদকের পাশাপাশি এ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর (পাবলিকেশনস) ছিলেন।[৩১৪] মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ *মাহেনও* পত্রিকার প্রচারিত সংবাদ সম্পর্কে বলেন,

> *মাহেনও*-এর প্রায় সবাই অন্যান্য প্রচারপত্র, পুস্তিকা, বই-পুস্তক ইত্যাদি সম্পাদনা এবং প্রকাশনার কাজও করত। *মাহেনও*-সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হতো কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ ও নিয়ম-নীতি মেনে। পত্রিকায় কি কি লেখা এবং কোন ধরনের লেখা ছাপা হচ্ছে তা পূবাহ্নেই আমাদের জানিয়ে দিতে হতো কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার এবং প্রকাশনা দফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। করাচী থেকে আমাদের পাঠানো বিভিন্ন লেখার 'সিনোপসিস' এবং তালিকা অনুমোদিত হয়ে এলে তবেই সেসব লেখা পত্রিকায় ছাপা হতো।[৩১৫]

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ *মাহেনও* পত্রিকা সম্পর্কে আরও বলেন, 'সরকারী পত্রিকা সম্পাদনা এবং তাতে ইচ্ছামত সব ধরনের লেখা ও আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশের সুযোগ সীমিত থাকায় মন অনেকটাই হাঁপিয়ে উঠেছিল।'[৩১৬] তিনি আরও বলেন,

> সরকারী পত্র-পত্রিকায় কাজ করতে হলে মতামত নির্বিশেষে যে কোনো ধরনের ভালো লেখা ছাপার অধিকার না থাকলে, সৃজনধর্মী লেখা ছাপাতে গিয়েও যে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, জবাবদিহি করা ছাড়া উপায় থাকে না, সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল 'মাহে-নও' পত্রিকায় চাকুরী করার বিভিন্ন পর্যায়েই। একবার একজন তরুণ গল্প লেখকের একটি ছোটগল্প মনোনয়ন ও প্রকাশের ফলে আমার প্রায় চাকুরী যাওয়ার যোগাড় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমার চাকুরী যায়নি বটে, তবে সেই তরুণ লেখক ব্লাকলিস্টেড হয়েছিলেন–'মাহে-নও' পত্রিকায় তার লেখা ছাপা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখনকার সেই তরুণ লেখকই আজকের খ্যাতিমান কথাশিল্পী মাহমুদুল হক।[৩১৭]

মাহেনও সরকারি পত্রিকা হলেও, এটি ছিল একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পত্রিকা এবং এই পত্রিকায় দলমত নিবিশেষে এ দেশের খ্যাতনামা লেখকদের, এক কথায় বলতে গেলে নবীন-প্রবীন প্রায় সবার লেখা প্রকাশিত হতো।[৩১৮]

পূবালী (১৯৬০)

পূবালী প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে।[৩১৯] প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন–আবুল কাসেম।[৩২০] দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ ও পত্রিকটির মনোগ্রাম করেন শিল্প আবদুর রউফ।[৩২১] পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে *পূবালী* নাম করতে সক্ষম হয়েছিল। সকল শ্রেণির সাহিত্যকর্মীর নিকটই আদৃত ছিল। বস্তুত প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এই পত্রিকা জনপ্রিতার শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। পত্রিকাটির মালিক-প্রকাশক-সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম। সহযোগী বা নির্বাহী-সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। তিনি *মাহেনও*-এর কর্মকর্তা ছিলেন। *পূবালী*-এর দায়িত্ব নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন পত্রিকা 'পূবালী' সম্পাদনার দায়িত্ব পাওয়ায় স্বভাবতঃই মনো হলো, এই পত্রিকায় অন্ততঃ উন্নতমানের সব ধরনের লেখা–দলমত নিবিশেষে নবীন-প্রবীন সব লেখকের লেখা প্রকাশ করা যাবে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশ করতেও কোনো অসুবিধা হবে না।

'পূবালী'র স্বত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের আশ্বাস ও আমার মনে এমন বিশ্বাস এবং আশাবাদের জন্ম দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'পূবালী' সম্পাদনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আপনার ওপর থাকবে। আপনি স্বাধীনভাবে এবং আপনার পছন্দ মত সব ধরনের এবং সব লেখকের ভালো লেখাই ছাপাবেন। এ ব্যাপারে কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না।[৩২২]

পূবালীর সাহিত্য সংস্কৃতি ও সামাজিক চিন্তার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছিল মানবতাবাদী প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাধারার।[৩২৩] *পূবালী*র আদর্শ সম্পর্কে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ বলেন,

'পূবালী' কোনো বিশেষ ভাবধারার বা আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে কিংবা কোনো গোষ্ঠীর মুখপত্র ছিল না। ফলে সব ভাবধারার এবং মতাদর্শের লেখকই এই পত্রিকায় লিখেছেন এবং এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন। 'পূবালী' তে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যাবোধ-ভিত্তিক এবং ইতিহাস-নির্ভর রচনা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি এতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, প্রগতিশীল এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও বাঙালী সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী লেখকদের রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলের পত্রিকা বিধায় 'পূবালী'তে পাকিস্তান এবং পাকিস্তানী আদর্শ, জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতিবিষয়ক রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। 'পূবালী'র সম্পাদক ও স্বত্ত্বাধিকারী এবং ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান 'ওসমানিয়া বুক ডিপো'র মালিক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ছিলেন একজন উদার-পন্থী ও আধুনিক মনের মানুষ। ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি যেমন ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধ, তেমনি তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতিপ্রেমিক ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ।[৩২৪]

পূর্ববাংলার প্রধান লেখকদের রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল যাঁরা বিভিন্ন ধারা ও দর্শনের সমর্থক ছিলেন।[৩২৫] পত্রিকটি লেখকদের সম্মানি দেওয়া হতো। ফলে বড় ও প্রতিষ্ঠিত লেখকরা আর্থিক কারণে *পূবালী*র আমন্ত্রণ পরিহার করতে পারত না।[৩২৬] তাই দলমত নির্বিশেষে ভালো রচনার আধার হয়ে *পূবালী* মানবতাবাদী ধারার একটি পত্রিকার আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছি। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পত্রিকা এটি হয়নি।[৩২৭]

১৯৬০ সালে প্রকাশিত *পূবালী*র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত হয়েছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়,

সাহিত্য সংস্কৃতির উপাদান হলেও সংস্কৃতির পরিপূরক ও পরিপোষক হিসেবে সাহিত্যের স্থান সর্বাগ্রে।...তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির সাথে এর অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় মননশীলতার ক্রমবিকাশে সাহিত্য একান্তই অপরিহার্য। তবে প্রত্যেক দেশেই সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সাহিত্য সৃষ্টি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তার উপর আবার রয়েছে ভৌগলিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। পারিপাশ্বিক পরিবেশের প্রভাবকে উপেক্ষা করে সাহিত্য কোনখানেই গড়ে ওঠেনি বা গড়ে উঠতে পারে না। এর জন্ম ও পুষ্টি সবখানেই পরিবেশের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ যে এখনো আশানুরূপ অনুকূল হয়ে ওঠেনি, তা বলা নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি হবেনা। আমাদের পত্রিকাকে অবলম্বন করে সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয় ও সাহিত্য বিকাশ লাভ করে। সাহিত্যের ধারাকে ঠিক পথে পরিচালিতকরার দায়িত্ব সাময়িকপত্র পত্রিকাগুলোই। আজাদী লাভের পর বহু পত্রপত্রিকা এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে সবগুলোই যে ঠিকমতো টিকে আছে বা টিকে গেছে, তা নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে এগুলির বর্তমান সংখ্যা প্রয়োজনানুপাতে নৈরাশ্যজনক নয়। এর উপর নতুন নতুন মাসিক, দ্বিমাসিক, পত্রিকা একটি দুটি করে ক্রমশ চালু হচ্ছে। তবে একথাও ঠিক যে যথাযোগ্যভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালনের ব্যাপারে অনেক পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ শোনা যায়। এসবই অবশ্য কোন বিশেষ মতামতকে কেন্দ্র করে থাকার কারণে।

সাহিত্য সৃষ্টিতে কোন বিশেষ মতামতকে প্রশ্রয় ও প্রাধান্য দেওয়া উচিত কিনা, তা নিয়ে এক বিরাট মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদের কোনদিন অবসান হবে কিনা, তা নিশ্চয় করে কেউই বলতে পারেনা। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে যে কোন পত্রপত্রিকার পরিচালকদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই। অভিযোগ শোনা যা তাদের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে। এখানে একদিকে যেমন অভিযোগ আছে, তেমনি আর এক দিকে পাল্টা অভিযোগও আছে। নিজ নিজ স্বাধীন মত প্রকাশে ও নিজ নিজ মত অনুযায়ী কোন বিশেষ ধারাকে অবলম্বন করার ব্যাপারে অন্ত:সাহিত্যক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন না তোলাই আমরা যুক্তিযুক্ত

মনে করি। কারণ, সাধারণ নীতিবোধ প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকার কাছ থেকেই দেশবাসী আশা করে। সাহিত্যক্ষেত্রে কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠরি অস্তিত্বের প্রতি গুরুত্ব না দেবার নীতি গ্রহণ করেই 'পূবালী'র আত্মপ্রকাশ।[৩২৮]

পত্রিকাটির ৭২টি সংখ্যা বের হয়। ১৯৬৭ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হলে ধীরে ধীরে নুরুল ইসলামের সঙ্গে মতান্তর হয় মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ। কারণ দুজনের রাজনৈতিক বিশ্বাস দু'ধরনের হলেও রাজনৈতিক চর্চা দেশে আগে ছিলনা বলে এক সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হয়েছি।[৩২৯] ইসরাইল খান *পূবালী* সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,

> *পূবালী*-নামের পত্রিকাটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ছিল নামেই তার প্রমাণ। পুর্বিপুর্বি একটা ভাব পূবালী নামের মধ্যে অবশ্যই ছিল। উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার মধ্যেও সাহিত্য ও সমাজসেবার খাঁটি একটা প্রেরণা ছিল, দেশের সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক পরিস্থিতির পরিবর্তন করে নতুন অবস্থায় উন্নীতকরণের সেই প্রেরণা এর সর্বত্রই লক্ষ্যণীয়।[৩৩০]

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ *পূবালী* সম্পর্কে ইসরাইল খানের মন্তব্য নাকচ করে দিয়ে বলেন,

> পত্রিকার বাংলা নাম হলেই কি তা বাঙালীর জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পরিচয় বা উদ্দেশ্য বহন করে? যদি সবক্ষেত্রে এটাই হতো, তা হলে বাঙালী জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বাহক এবং অবাঙালী পাকিস্তানী শাসক-পোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার এবং এ-দেশের পাকিস্তানী শাসক-পোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার এবং এ-দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক মুখপত্র দৈনিক 'ইত্তেফাক' এর নাম উর্দুতে হতোনা।[৩৩১]

তিনি *পূবালী* সম্পর্কে ইসরাইল খানের মন্তব্য নাকচ করে দিয়ে আরও বলেন,

> ওসমানিয়া বুক ডিপোর পুস্তক-তালিকা এবং 'পূবালী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পাঠ করলেই এ-সত্য উপলব্ধ হবে যে, উদার-পন্থী ও আধুনিক মনের মানুষ মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ নির্ভর এবং মুসলিম বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বই-পত্র ও ধর্মীয় পুস্তকাদি কত সংখ্যক বেরিয়েছে, এবং বাঙালী ভাবধারা ভিত্তিক বই-আদৌ বেরিয়েছে কিনা, আর বেরিয়ে থাকলে তার সংখ্যাই বা কত?[৩৩২]

*পূবালী*র দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশকের নিবেদন ছিল এ রকম,

> গত এক বছর অদম্য প্রেরণা ও সাংস্কৃতিক স্পৃহা নিয়ে *পূবালী*কে সর্বাঙ্গীন বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে পথ কেটে এগিয়ে আসতে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সৃজ্যমান সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রগতির পথ রচনা এবং তার সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্র অবারিত করার দায়িত্ব নিয়েই পূবলীর আত্মপ্রকাশ; গত এক বছর এ দায়িত্ব প্রতিপালনে পূবালী যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। তার এ সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী ও সাহিত্যমনা পাঠকবৃন্দ অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাদের এ সমর্থনই পূবালীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও পরিণামে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। গত এক বছর 'পূবালী'কে নানা ফ্রন্টে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যক্ষেত্রে রম্যতাপ্রয়াসী প্রচেষ্টা এবং হালকা সিনেমা পত্রিকার অবারিত আত্মপ্রকারের ফলে সুষ্ঠু সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকার অকালমৃত্যু প্রায় বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে; সিনেমা ও রম্যপত্রিকার রাজত্ব যেখানে একচ্ছত্র ও অবারিত, সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকার ক্ষীণপ্রাণতা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু পাঠক-রুচির নিম্নগামিতা রোধ করে তাকে সুষ্ঠু সাহিত্যের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত করে তোলার দায়িত্ব দেশের সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দের।[৩৩৩]

পূবালী একটি উন্নতমানে সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন বুরো কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।[৩৩৪]

পাকিস্তান সরকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে নানা উপায়ে বিপথগামী করতে চেয়েছে। কিন্তু শুভবাদী বুদ্ধিজীবীরা ও তরুণ ছাত্রসমাজকে সহজে বিভ্রান্ত কর যাযনি। শাসকদের প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাতেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে মানবতাবাদী সাহিত্যি। এইসব সাহিত্য থেকে পাকিস্তানের কোন লাভ হয়নি বরং পূর্ববাংলায় এর জন্য আন্দোলন তীব্র হয়েছে পাকিস্তান অধিকতর স্বল্পায়ু হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনও গড়ে উঠেছে। সমস্ত আঘাতই লেগেছে 'পাকিস্তনের উপনিবেশবাদী সরকারের মসনদের গোড়ায়'।[৩৩৫]

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা

পাকিস্তানপন্থি সাহিত্যপত্রগুলো উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দমন করে, সমগ্র পাকিস্তান চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং ইসলামি পুনর্জাগরণবাদকে প্রচার করা। এর মধ্য থেকেও এক শ্রেণির লেখক, সম্পাদক, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ক্রমেই উদার-নৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, এবং পত্র-পত্রিকায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। তরুণ দলের মুখপত্র কম থাকায় তাঁরাও এঁদের সাথে মানবতাবাদ, গণতন্ত্র এবং শিল্প-সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশে তৎপর হন এবং সরকারি বিষনজর এড়িয়ে চলার পন্থারূপে উদারনৈতিক মানবতাবাদ বা গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী ধারা সাহিত্যপত্র খুব বেশি সংখ্যক ছিল না। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার ফলে তরুণদের মানসে যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহী চেতনার নির্যাস তৈরি হয়–তাকে পরিচায়িত করা যায় 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী ভাবধারা' বলে।[৩৩৬]

ছয়-দফা পরবর্তীকালেই এঁদের চেতনায় পরিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং কারো কারো মধ্যে তা সৃষ্টিশীলতার রূপ নেয়।[৩৩৭]

মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা হিসেবে যেগুলোকে চিহ্নিত করা চলে, তার মধ্যে প্রধান ও প্রথম পত্রিকা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪) প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক সওগাত' (১৯১৮) পাকিস্তান-পর্বে প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, ১৯৫২ সালে। এই কালের প্রধান পত্রিকারূপে যেটি নতুন করে খ্যাতি লাভ করে সেটা হচ্ছে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫) সম্পাদিত 'সমকাল' (১৯৫৭)। এ ধারায়ই বিশিষ্ট কতিপয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সীমান্ত' (১৯৪৭) 'ইমরোজ' (১৯৫০); 'সাহিত্য, (১৯৬০); 'পূর্বমেঘ' ১৯৬০; সুন্দরম (১৯৬৩); 'পূর্বলেখ' (১৯৬৫); মেঘনা (১৯৬৭) প্রভৃতির নাম এখানে উল্লেখ করার মতো। এসব সাহিত্যপত্র পুরো পাকিস্তানি শাসনামলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে, বাঙালির শোষিত হওয়ার চিত্র উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিল। এই কাজ তাঁরা করেছিলেন সর্বাত্মক 'স্বাধীনতা' উপভোগের জীবনপণ যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে। এগুলোর সাথে আরও ছিল অনেক অনিয়মিত সংকলন, একুশের সংকলনরূপে যেগুলো বের হতো।

সাংস্কৃতিক রাজনীতি চর্চার জন্য এই সকল কাগজে প্রকাশিত হয়েছে কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক-সাহিত্য-সমালোচনা।

পটভূমি

বাঙালি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা/উদার নৈতিক মানবতাবাদী ধারায় একইসঙ্গে একুশের চেতানা সম্প্রচারে চট্টগ্রাম থেকে প্রথমেই প্রকাশিত হলো–*সীমান্ত* (১৯৪৭)। বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালে চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ও সুচরিতা চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সীমান্ত* (১৯৪৭-৫২)। ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসে পত্রিকাটি স্মরণীয় হয়ে আছে। এই পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবউল আলম চৌধুরীই হচ্ছেন একুশের প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'র প্রণেতা। স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে প্রারম্ভিক সংস্কৃতিক কার্যক্রম হিসেবে খ্যাত হরিখোলার মাঠে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম শিল্প-সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। 'সীমান্ত' ছিল অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক ও শৈল্পিক ভাবধারা প্রাচারের অন্যতম বাহন। বস্তুতপক্ষে এই পত্রিকা এবং এর লেখক-সম্পাদকগণ একুশের চেতনার প্রকৃত সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁরা যে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকদের ফাঁসির দাবি করেছিলেন।[৩৩৮]

সম্পাদক ও উদ্যোক্তরা মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আদর্শ, বাঙালির সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অখণ্ড অভিভাজ্য ঐতিহ্যের অনুরাগী, সর্বোপরি দাঙ্গাবিরোধী সম্প্রীতির মনোভাব-পুষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা সৃষ্টি করে।[৩৩৯]

সীমান্ত পত্রিকার সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সহকর্মী সমমনাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ'। এই সংগঠনটির উদ্যোগে পূর্ববাংলার প্রথম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৫১ সালের মার্চের ১৬ থেকে ১৯ তারিখ চট্টগ্রামের হরিখোলার অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সাফলতা থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৫২ সালে কুমিল্লায়, ১৯৫৪

সালে ঢাকায় এবং ১৯৫৭ সালে কাগমারিতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এদিক থেকে সীমান্ত পত্রিকার উদ্যোক্তাদের বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সংগ্রামে একটা সদর্থক ভূমিকা আছে বিবেচনা করতে হয়।[৩৪০]

সীমান্ত-এর পরই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অন্যতর একটি প্রধান সাহিত্যপত্র 'সংকেত' (১৯৪৮; পৌষ ১৩৫৫; সম্পাদক সিরাজুর রহমান)। এঁরা দাবি করেছিলেন 'সংকেত পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল মাসিক' পত্রিকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পদকীয় ঘোষণায় বলা হয় :

> যাত্রাপথে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বিগত দেড় বছরের খতিয়ান....সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন দায়িত্ববোধের সূচনা হলো.... দেশ ভাগের ফলে বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশই পড়লেন পূর্ব বাঙলার আওতায়। তাদের জীবন ও মননকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।

এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পত্রিকাটিকে মৃত্যু এসে গ্রাস করে। দ্বিতীয় সংখ্যার পর 'সংকেত' আর প্রকাশিত হয় নি।[৩৪১] আবদুল আলীম চৌধুরী ও আহমদ কবির-এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয় *যাত্রিক* (১৯৫৩)। পঞ্চাশের দশকের প্রধান তরুণ সাহিত্যিকগণের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র ছিল যাত্রিক।

ইমরোজ (১৯৪৯-১৯৫৪) একটি প্রগতি চেতনাসম্পন্ন সাময়িকপত্র। মোহাম্মদ আসাদুল্লাহর সম্পাদনায় পত্রিকাটি বের হতো। ঢাকায় *সওগাত* প্রকাশের পূর্বে নিয়মিত মাসিক পত্রিকা হিসেবে *ইমরোজ*-এ বাঙালির জীবন-ভাবনার সচেতন প্রকাশ ঘটেছিল।[৩৪২]

সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল* (১৯৫৭) পঞ্চাশের দশক থেকে প্রকাশিত হলেও এর প্রকৃত সমৃদ্ধি ষাটের দশক জুড়ে। প্রগতিবাদী-সৃষ্টিশীল *সমকাল*-এ এমনসব লেখাকে স্থান দেওয়া হতো যে-ধরনের লেখা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত *সওগাত* (১৯১৮), *মোহাম্মদী*, *মাহেনও* ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলো থেকে ভিন্ন ধরনের।

সমকাল (১৯৫৭)

মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা হিসেবে ষাটের দশকে যেগুলোপত্রিকা খ্যাতি লাভ করে তার মধ্যে অন্যতম সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫) সম্পাদিত *সমকাল* (১৯৫৭)। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন–হাসান হাফিজুর রহমান।[৩৪৩] সমকালকে একটি উন্নতমানের রুচিশীল পত্রিকারূপে গণ্য হয়। এর প্রচ্ছদ-শিল্পীরা ছিলেন–জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, রশীদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, দেবদাস চক্রবর্তী, মুকতাদির ও নিতুন কুন্ডুর মতো খ্যাতিমান শিল্পীগণ।

১৯৬১ সালে 'রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা' হিসেবে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করে। সমকালের দুটি সংখ্যা (বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭২/১৯৬৫ এবং ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৭২/১৯৬৫) সামরিক শাসনামলে বাজেয়াপ্ত হয়। *সমকাল*-এর প্রথম সংখ্যার সাময়িকীর (সম্পাদকীয়ের) মধ্যে পত্রিকাটি আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলা আছে–

> ঢাকা থেকে নতুন সাময়িক পত্রিকা হরদম বার হচ্ছে। কাজেই আমাদের চেষ্টায় *সমকাল* নামে একটি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করা এমন কিছু বিস্ময়কর সংবাদ নয়। অন্যান্য কাগজের মতো *সমকাল*ও কয়েক মাস পরে বন্ধ হয়ে যাবে না এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোনো লাভ নেই। কারণ তা কেউ বিশ্বাস করবে না। আসলে বিশ্বাস করে বারবার কেউ ঠকতে চায় না। আর ইতিমধ্যেই বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ী প্রায় সকলেই একবাক্যে রায় দিয়েছেন যে, *সমকাল* চলতেই পারে না। পাঠক নেই, বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না। অতএব টেনেটুনে বড়ো জোর তিন মাস। তারপর বিলুপ্ত পত্রিকার তালিকায় আর একটি সংখ্যা যোগ হবে।
>
> পূর্ব পাকিস্তানে একটি সুরচিপূর্ণ সাহিত্য-পত্রিকার একান্ত অভাব। শুধু পাঠকদের পড়া এবং চিন্তার খোরাক যোগাবার জন্যই নয়, কবি-সাহিত্যিকদের দিয়ে লেখাবার তাগিদের জন্যেও একাধিক সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজন। আংশিকভাবে হলেও, সেই প্রয়োজন মেটাবার দুঃসাহস নিয়ে নয় সেই প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখেই *সমকাল* প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। *সমকাল* যাতে করে ব্যাপকসংখ্যক পাঠকের সাংস্কৃতিক মানসের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সেদিকটায় আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখতে পারব বলেই আশা করি। আমাদের কোনো 'ফল' নেই। কাজেই আমাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ফলনিরপেক্ষ হবে। তবে মত-নিরপেক্ষ হবে কিনা সে কথা বলা কঠিন। কারণ, 'ঘন ঘন মতান্তরের রাজত্বে' বসে মতামত সম্বন্ধে দৃঢ় মত পোষণ করা

নিতান্ত সহজ ব্যাপর নয়। কিন্তু আমাদের এই উদ্যোগে আমরা দলমত নির্বিশেষে সকলের সর্বপ্রকার সহযোগিতা সবসময়ই কামনা করব।[৩৪৪]

মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম *সমকাল* সম্পর্কে বলেছেন,

> ঐ সময়ে (৬০-এর দশকে) ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্র *সমকাল* এর কোটাল। তাঁর সাথে রয়েছেন অপর প্রমুখ জন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। কত নতুন লেখকের প্রসূতি-আগার, লালন মন্দির এই *সমকাল*। ১৯৫৭ থেকে ৭১, *সমকাল* আমাদের লেখালেখির অঙ্গনে উজ্জ্বল গর্বাহঙ্কারের মাইলস্টোন।[৩৪৫]

সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মান এবং প্রকাশনা সৌষ্ঠব ছিল খুবই উঁচু দরের। পত্রিকাটি ছিল দেশের প্রতিষ্ঠিত নামী-দামী লেখকদের কাগজ।[৩৪৬] আবু দায়েন *সমকাল* পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

> পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় ফজল শাহাবুদ্দিনের 'কবিকণ্ঠ', সিকান্দার আবু জাফরের 'সমকাল' (১৯৫৭), ফজলে লোহানীর 'অগত্যা', মাহবুবুল আলম চৌধুরীর 'সীমান্ত', এনামুল হকের 'উত্তরণ'সহ বেশ কিছু সাহিত্যপত্র লিটল ম্যাগাজিনের চারিত্র্য ধারণ করেছিল। এর মধ্যে 'সমকাল' প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যপত্রের মর্যাদা পেয়েছিল। এটি দীর্ঘায়ু হয়েছিল। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চৈতন্য ও মনন গঠনে 'সমকালে'র ভূমিকা সুবিদিত। তবে সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় একে লিটল ম্যাগাজিনের করা যায় না।[৩৪৭]

সিকান্দার আবু জাফরের মৌলিক সৃজনশীল সাহিত্যিক প্রতিভা এবং জাত-সম্পাদকের প্রায় নজীরিবিহীন বৈশিষ্ট্যই সমকালকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার তথা সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের ভাগিদার করে রেখেছে। আদর্শে প্রশ্নে সমকাল একাধিকবার বিপদাপন্ন হয়েও সাহসিক ভূমিকা পালন করেছে।[৩৪৮] পত্রিকাটির ওপর সরকার কঠোর নজরদারি আরম্ভ করে। পত্রিকাটির ৪টি সংখ্যা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৩৪৯] পাকিস্তান সরকার *সমকাল*-এর সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করে এই পত্রিকার কার্যকর ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করেছে। এই সম্পাদকের দুঃসাহসী ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে চিন্তাবিদ আবুল ফজল লিখেছেন :

> আজ আমরা সবাই অসম্ভব ভীরুতার শিকার। এ ভীরুতার প্রধান শিকার সম্পাদকরাই। সিকান্দার আবু জাফরের মতো তাঁরা যদি একটু সাহসী হতে পারে পারতেন, সাহসিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতেন-তাহলে আমাদের সাহিত্যের এ দুর্দশা কিছুতেই ঘটতো না। দেখেছি, লেখকেরা সাহসী হতে পারলেও, সম্পাদক আর পত্রিকা মালিকরা তা সাহস করে ছাপাতে পারেন না, অর্থাৎ ছাপাতে সাহস করেন না। ফলে আমাদের সাহিত্য এক অচলায়তনের সম্মূখীন।

তখনকার বন্ধ্যা পরিস্থিতিতে সিকান্দার আবু জাফর লেখকদের সাহসী রচনা লেখার শক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগান। ফলে *সমকালের* জন্য লিখেছেন আবুল ফজল ও আবদুল হকসহ অনেকে। *সমকাল* ছিল লেখকবৃন্দের কাছে বিষেশ পত্রিকা যেখানে তারা গঠনমূলক লেখা নিশ্চিন্তে লিখতে পারতেন। *সমকাল*-এর পাতাতে তাই 'খাম্বুরাবি' ছদ্মনামে জনৈক লেখক লিখেছেন,

> সমকালই একমাত্র কাজ যাকে ঘিরে এই হতাশাপ্লাবিত, ক্লান্তিভরা উদ্দেশ্যবিহীন দেশে চলেছে কিছু সাহিত্যচর্চা। এছাড়া সমকালের পাতায় সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে, সমাজসংগঠন ও রাজনীতির ধারাকে বুঝে দেখবার, বিষয়গত আলোচনা করবার একটা প্রচেষ্টা। এটা সৃজনী সাহিত্য না হলেও এর প্রয়োজন আজ অপরিসীম। কারণ এই পথেই ঘটতে পারে আমাদের আত্মজ্ঞান।[৩৫০]

পাকিস্তান আমলে লেখকদেরকে লেখার বিষয় ও ধরন নিয়ে প্রতিনিয়ত শাসকগোষ্ঠীর তোপে পড়তে হতো। তাই লেখকদের সবসময় চিন্তা করতে হতো শাসকগোষ্ঠীর আদর্শের কথা ও তাদের চাওয়ার কথা। শাসকদের আচরণ ও লেখকদের কৌশলকে ব্যঙ্গ করে *সমকাল*-পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধে আবুল ফজল বলেন,

> এ যুগের সাহিত্যিক শিল্পীরা কালের ও রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে এক রকম বলি বললেই চলে। শহীদ তাঁরা নন, তাঁরা আজ হাড়ি কাঠের বলি। স্বাধীনতার পর দেশের যা অবস্থা হয়েছে, সেই অবস্থার যূপকাষ্ঠে সাহিত্যিক শিল্পীরাই হচ্ছেন নির্ভেজাল বলি। স্বাধীনতার পর থেকেই ভাষার ওপর চলেছে এক উৎপাৎ দেশের জন্য ও দেশের মানুষের জন্য সেই আবেগ ও প্রেরণ আজ রুদ্ধগতি। দেশ বা জাতির কোন চেহারাই আজ আমাদের মানসপটে ফুটে ওঠেনা। আবেগ ও প্রেরণার দেশগত ও

জাতিগত ঐক্যবোধ আজ নিশ্চিহ্ন। ফলে আমাদের বাহিরে ভিতরে সর্বত্র-এক নৈরাজ্য।.... আমরা কি লিখলে, কেমন করে লিখলে শাসকদের বিষনজরে পড়বনা তাও আমাদের এক দুশ্চিন্তা।[৩৫১] ফলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, বিনা আবেগ ও বিনা প্রেরণায় আমরা সাহিত্যিকরাও বহু শ্লোগান আউড়িয়েছি এই এগার বছর ধরে। তা সত্ত্বেও সাহিত্যের অগ্রগতির চেয়ে পশ্চাৎগতিই হয়েছে বেশি।

এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বা অখণ্ডতা যে বাংলাদেশের সাহিত্যের জন্য ক্ষতিকর, তাও তিনি *সমকালের* ঐ প্রবন্ধে বলেন,

> আমাদের মনের সামনে, চোখের সামনে পাকিস্তান বলে কোন দেশ নেই, আছে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। সমগ্র পাকিস্তানের পটভূমিতে, তাঁর ঐতিহ্য ও মানুষের জীবন নিয়ে কিছু লেখা আজ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মন মানসে আমরা আজ হয় পূর্ব পাকিস্তানী না হয় পশ্চিম পাকিস্তানী। এ সত্যকে অস্বীকার করার রাজনৈতিক সুবিধাবাদ হতে পারে কিন্তু বাস্তববোধের পরিচায়ক নয়। 'ইসলাম' ও 'পাকিস্তান' আজ এইভাবে এঁদের মুখে ম্যাজিক-বুলিতে পরিণত হয়েছে।[৩৫২]

পাকিস্তান আমলে আবুল ফজলের উপর্যুক্তরূপ রচনার মতো অনেক লেখা সমকাল প্রকাশ করে বাঙালির চিন্তার জড়তা ও পাকিস্তানের প্রতি মোহাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি ঘটান।[৩৫৩]

আবুল ফজলের এইরূপ রচনার ন্যায় বহু রচনাই 'সমকাল' প্রকাশ করেছিল। 'শিল্পীর প্রতি সমাজের কর্তব্য'; 'লেখকের স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্ব'; 'আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য'; 'ধর্ম ও রাষ্ট্র'; 'মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের[৩৫৪] পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ'; 'মানবতন্ত্র'; 'আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' প্রভৃতি পসঙ্গে বহু জিজ্ঞাসা, তাড়না ও জাগরণমূলক নানা লেখায় তিনি পাকিস্তানের অস্তিত্বের মূলে অনবরত আঘাত হেনে চলেছিলেন।

আবদুল হকও স্বনামে এবং আবু রায়হান ও আবু আহসান ছদ্মনামে সমকালে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এবং জাতীয়তার প্রশ্নে গুমন্ত বাঙালিকে প্রশ্নবানের জর্জরিত হকে তোলা হচ্ছিলো। তিনি–'রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি'; 'সাহিত্যিক মূল্যবোধ'; 'ভাষা স্বদেশ সত্ত্বা'; ' নেতৃত্ব ও গণচেতনা'; 'বাঙালি মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি'; 'পূর্ব পাকিস্তান : বাংলাদেশ'; 'শিক্ষায়োজন : বৈষম্য ও সংস্কৃতি'; 'যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা' প্রভৃতি বিষয়ে লিখেছিলেন যা, তা পাকিস্তান সরকারকে ভাঙনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সমকালে প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস, নাটক, অনুবাদ-সাহিত্য, পুস্তক-সমালোচনা, গ্রন্থ-পরিচয় পত্রিকাটির নিয়মিত বিষয়ভুক্ত ছিল। যার বেশিরভাগ রচনাতে বাংলার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বন্ধাত্ব মোচনে উচ্চারিত হয়েছে স্বাদেশিকতার মন্ত্র। বাঙালির তৎকালীন অবস্থা এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে জীবনাচরণের পার্থক্য বিষয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে পত্রিকাটি পাকিস্তানের রাষ্ট্র দর্শনের মূলে আঘাত হেনেছে। বাঙালিকে নিয়ে গেছে জাগরণের দিকে।[৩৫৫]

'রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শীর্ষক আলোচনায় আবদুল হক বলেন :

> আমাদের প্রাক্তন নেতৃসমাজ শিল্পী-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং এই কারণে সুকুমার মনোভঙ্গী এবং দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল তাঁদের মধ্যে বড় বেশী। তাঁরা ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, অথবা অন্যান্য মহৎ নীতির কথা বলতেন এবং একটু বেশী করে বলতেন, কিন্তু আসলে তাঁরা ছিলেন–ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল-অবিশ্বাস্য রকমের বস্তুতান্ত্রিক....সূক্ষ্ণ চেতনা, চিন্তা ও মূল্যবোধ তাঁদের জগতে ছিল একান্তই বিরল। রাজনৈতিক কূটচালের উল্লেখ করব না, সকলেই জানেন এই কূটচালের মধ্যেও সূক্ষ্মতা থাকতনা। রাজনীতির বাইরেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা নৈতিক সবক্ষেত্রেই তাঁদের চিন্তা ছিল স্থূল এবং বক্তব্য ছিল আরও স্থূল। অতএব স্বাভবতই তাঁরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারে কাছে ঘেঁষতেন না এবং দেশের মনন জগতের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে তাঁদের অবদানও অতি নগন্য। জাতি এক্ষেত্রে তাঁদের কাছে কোন প্রেরণাও পায়নি, পেয়েছে বরং মূল্যবোধের বিপর্যয়।[৩৫৬]

আবদুল হক পাকিস্তানের কর্ণধার, শাসকদের চরিত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মনে রেখে বিশ্লেষণ করে বলেন, সমাজের সমৃদ্ধিতে ভালো করার চেয়ে মন্দ-ধ্বংস ও বিপর্যয় সাধনেই তাঁদের ভূমিকা বেশি। কারণ, ভুল করে হোক আর ঠিক করেই হোক সাধারণ মানুষ নেতৃবৃন্দের জীবনধারা অনুসরণ করে থাকে। তাঁদের অনুগ্রহেরও প্রত্যাশী তাঁরা।

অতএব দেশের নেতৃসমাজ নিছক স্বার্থের প্রেরণায় বহুরূপের উপাসক, অধিকন্তু শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন–সে দেশের সমাজের মানসিক অধোগতির সীমা থাকেনা এবং মানসিক অধোগতি যখন হয় তখন অন্য অধোগতিই বা ঠেকায় কে?[৩৫৭]

আবদুল হক আরও বলেন,

> আর একথাও ঠিক, জাতি সেই রকম নেতাই পেয়ে থাকে, যার সে উপযুক্ত। ....মূল্যবোধর ক্ষেত্রে সমাজ যতদিন নিজের অপচয় ও অবক্ষয় রোধ করতে না পারবে এবং নিজেকে সৃষ্টিমুখর করতে না পারবে ততদিন উত্তম নেতৃসমাজ সে সৃষ্টি করতে পারবে না। অপকৃষ্ট নেতৃত্বহীন হবে তার নিয়তি। মূল্যবোধের বাহন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে নিতে না পারলে এবং মননধারা ও মূল্যবোধের উত্তম ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে না পারলে কোনো সমাজেরই ভবিষ্যৎ নেই।[৩৫৮]

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস্ জিন্নার পরাজয়ের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবদুল হক বলেন, 'সম্মিলিত বিরোধী দল পরিতাপের বিষয়, পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সুবিদিত অভিযোগগুলির প্রশ্নে, তার প্রতি অবিচারগুলির প্রশ্নে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে নির্বাচনি অভিযোগকালে সম্পূর্ণই নীরব ছিলেন।'[৩৫৯]

তাঁরা হয়তো নিখিল পাকিস্তানের ঐক্যের খাতিরে এবং প্রতিপক্ষের ভয়ে এসব প্রশ্নের ওপর বেশি জোর দেওয়া সংগত ছিল না মনে করেছেন। কিন্তু এখানে এবং এখন, স্পষ্ট চিন্তার প্রয়োজন আছে। তাহালো, পাকিস্তান ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরায় এক রাষ্ট্র হলেও চোখ বুঁজে বাস্তবকে অস্বীকার না-করলে একথা মানতেই হবে যে, রাষ্ট্রের দুই অংশ আসলে সহস্রাধিক মাইল দ্বারা বিভক্ত দুই স্বতন্ত্র দেশ এবং এই দুদেশের অধিবাসীরাও স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী।[৩৬০]

এদের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বতন্ত্র, সমস্যা স্বতন্ত্র, প্রগতির ধারা স্বতন্ত্র, এদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধাও বিপুল বৈষম্য বর্তমান। এইসব কারণে তাঁদের স্বার্থ এক রকম হতে পারে না। এই মৌলিক কথাটা উপলব্ধি না করলে পূর্ব পাকিস্তানিদের দুঃখ কোনো কালে ঘুচবে না।[৩৬১]

আবদুল হক পাকিস্তানিদের অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সম্মিলিতভাবে নির্বাচনকালে বাংলার স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার বিপক্ষে বলেন,

> তাঁরা কি সার্বজনীন ভোটাধিকারের পরিণতি সম্পর্কে অবগত নন? সার্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ পূর্ব পাকিস্তানে ভোটের সংখ্যা বেশী হওয়া। এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অর্থ আজ হোক কাল হোক, কোনো পূর্ব পাকিস্তানী প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য বর্তমান অপেক্ষা অনেক খর্ব হয়ে যাওয়া।[৩৬২]

এই বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে লিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে নির্বাচনি ঐক্য গড়তে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মৌলস্বার্থকে চাপা দেওয়া হয়েছে এবং তার ফল এখন এই প্রদেশের জনসাধারণকেই ভুগতে হবে।[৩৬৩]

আবদুল হক আরও বলেন,

> বস্তুত এ যাবৎ লব্ধ আমাদের রাজনৈতিক ও অন্যবিধ অবিজ্ঞতা একথাই বলে যে, একান্তভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অভিযোগগুলো এবং তার প্রতিকার স্বরূপ স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে সর্বাগ্রগণ্য করে এবং তার সঙ্গে সাম্প্রতিক নির্বাচনের অন্যান্য লক্ষ্য সংযুক্ত করে এ প্রদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য গঠন করা উচিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ কতোটা তা মানতো না মানতো তা বড় প্রশ্ন ছিল না। কারণ, প্রাদেশিক দাবি দূরে থাক, সার্বজনীন দাবীগুলির প্রতিও তারা সাম্প্রদয়িক নির্বাচনে ব্যাপক সমর্থন জানায়নি।
>
> পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে এ প্রদেশের দলগুলির নির্বাচনে নামা উচিত ছিল। এতে অবিলম্বে সাফল্য আসুক বা না আসুক, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠারও পথ সুগম হতো। এর একটা অনুসঙ্গ হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক তৎপরতার স্নায়ুকেন্দ্র এ প্রদেশেই স্থাপন করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক তৎপরতা প্রসারিত করা মাত্র। সম্মিলিত বিরোধীদল বস্তুত পূর্বপাকিস্তানেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তার নেতৃত্ব করাচীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটের আশায়।[৩৬৪]

১৯৬৫ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী দাঁড় করাতে পারেন নি বা দাঁড় করাননি। অথচ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙালিরাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল হক লিখেছেন,

> এ প্রদেশে যোগ্য লোক কেউ ছিলেন না একথাটা শুধু বহুধা বিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ঈর্ষাপরায়ণ এবং হীনম্মন্যতার আচ্ছন্ন নেতৃবৃন্দই বলতে পারেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনের তৎপর্য পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা বিবেচনা করা এবং আত্মজিজ্ঞাসায় নিয়োজিত হওয়া এখন তাঁদের প্রধান কর্তব্য। এবডোকৃত নেতাদের বাইরেও প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য লোক এ প্রদেশে একাধিক ছিলেন। দলীয় সংস্কার ও দলীয় স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত অনেক রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিই তাঁদের নাম বলতে পারবেন।[৩৬৫]

আব্দুল হক ছিলেন *সমকাল*-এর একজন অন্যতম প্রধান লেখক। তিনি স্বনামে এবং বেনামে *সমকালে* যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন; তাতে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। জাতীয়তার প্রশ্নে ঘুমন্ত বাঙালিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে দেওয়া হচ্ছিল। তিনি রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন,

> আমাদের প্রাক্তন নেতৃসমাজ শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং এই কারণে সুকুমার মনোভঙ্গি এবং দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল তাদের মধ্যে বড় বেশী। তারা ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা অথবা অন্যান্য মহৎনীতির কথা বলতেন এবং একটু বেশী করেই বলতেন, কিন্তু আসলে তাঁরা ছিলেন–ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল–অবিশ্বাস্য রকমের বস্তুতান্ত্রিক। সূক্ষ্মচেতনা, চিন্তা ও মূল্যবোধ তাদের জগতে ছিল একান্তই বিরল। রাজনৈতিক কূটচালের উল্লেখ করব না, সকলেই জানেন এই কূটচালের মধ্যেও সুক্ষ্মতা থাকত না। রাজনীতির বাইরেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা নৈতিক সবক্ষেত্রেই তাদের চিন্তা ছিল স্থুল এবং বক্তব্য ছিল আরও স্থুল। অতএব স্বাভাবতই তারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারে কাছে ঘেঁষতেন না এবং দেশের মনন জগতের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে তাদের অবদানও সত্যি নগণ্য। জাতি এক্ষেত্রে তাদের কাছে কোন প্রেরণাও পায়নি পেয়েছে বরং মূল্যবোধের বিপর্যয়।[৩৬৬]

সেকালে সিকান্দার আবু জাফর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলের মধ্যে থেকেও সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।[৩৬৭] সমকাল থেকে প্রকাশিত হয়–'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'[৩৬৮], সিকান্দার আবু জাফরের লেখা 'জনতার সংগ্রাম চলবেই'–গানটি ১৯৬৪ সালে *সমকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি সাহিত্যিকগণ সেকালে লেখনীর মাধ্যমে জাতিকে স্বস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন, আপোষহীন করে গড়ে তুলেছিলেন। একদল মসীযোদ্ধার অবলম্বন ছিল সমকাল। *সমকাল* তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কৃতিত্বের ভাগীদার হয়ে রয়েছে। পাকিস্তান সরকার সেকালে যে কয়টি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকের এবং যে সকল কবি সাহিত্যিকদের হয়রানি, বাজেয়াপ্তি রক্তচক্ষু দ্বারা স্থগিত করে দিতে চেয়েছিলেন সেই অপপ্রয়াসের মাধ্যমেই তারা *সমকাল*, *ইত্তেফাক* প্রভৃতি পত্রিকার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে স্বীকৃতি দান করে গেছেন। এমন পত্রিকার খুব দরকার একবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির স্বাধীনতাকে গৌরবোজ্জ্বল করার জন্য।

পাকিস্তানি আমলে বন্ধ্যা পরিস্থিতিতে সিকান্দার আবু জাফর লেখকদের সাহসী রচনা লেখার শক্তি ও অনুপ্রেরণ যোগান। ফলে *সমকালের* জন্য লিখেছেন অনেকে। কিন্তু আব্দুল হক ও আবুল ফজল যা লিখেছেন–ঐকালে সেরকম লেখা বেরিয়েছে খুব কমজনের কলম থেকে। আইয়ুব খানে লেখকদের স্বাধীনতা হরণ করার পর প্রথম প্রতিবাদ তোলেন আবুল ফজল। তাঁর সেই লেখাগুলো সমকাল ও ঐকালের অন্যতম প্রধান পত্রিকা উত্তরণ-এ প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য কালে পূর্ব বাংলায় সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে নানা মাত্রাযোগ ও বিবর্তন-ধারা লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পজগতে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবোধের আত্মপ্রকাশের ক্রমবিবর্তনশীল-ধারার পরিচয় একশ্রেণির সাহিত্য পত্রিকার পাতা মেললেই স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আরও দেখা যায়–

ধর্মীয় জীবনদৃষ্টির নিগড় ভেঙে মাথা তুলেছে যুক্তি অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনদৃষ্টি, পরকালের দিক থেকে মানুষ দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছে ইহকালের দিকে, আর শ্রেণী-নিরপেক্ষ মানবিকতাবাদী মতবাদের বিপরীতে শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদের প্রসার ঘটেছে।[৩৬৯]

এইসব মতবাদ প্রসারের নেপথ্যে কাজ করেছে প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের কর্মকাণ্ডগুলো। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের অবরুদ্ধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা থেকে মুক্তি বা উত্তরণের সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই সিকান্দার আবু জাফর স্বদেশপ্রেমিক ও সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়ে *সমকাল*-এর ন্যায় একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের তাগিদ বোধ করেছিলেন। এই তাগিদ তাঁর রাজনৈতিক সচেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল বলেই পত্রিকাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে বাঙালির জীবনে প্রাণরস সজীব রাখতে সচেষ্ট ও সফল হয়েছিল।[৩৭০]

পূর্বমেঘ (১৯৬০)

দেশের উত্তরাঞ্চল রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হতো–*পূর্বমেঘ*।[৩৭১] শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক এ ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রথম বেরোয় জুন, ১৯৬০ সালে। পত্রিকাটির সম্পাদকদ্বয়ের নাম–জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম। প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন পটুয়াশিল্পী কামরুল হাসান। এর বাইরে ছিলেন আরও দু'জন–সৈয়দ শফিকুল ইসলাম ও মুস্তাফা শওকত কামাল।[৩৭২]

পূর্বমেঘ-এর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এর অন্যতম সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, 'লেখক সংঘের প্রতিক্রিয়া থেকে নয় ইতিবাচক একটি ধারণা বা প্রেরণা থেকে আলোচনার মধ্য দিয়ে, কাজকর্মের পরও যে সময় থাকে, সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য (রাজশাহী থেকে) এই পত্রিকা আমরা প্রকাশের উদ্যোগ নিই।'[৩৭৩]

ত্রৈমাসিক *পূর্বমেঘ* সীমিত সাধ্যেও মধ্য দিয়ে চলতো। এই পত্রিকার সব চাইতে বড় সম্পদ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষক ও ছাত্র।[৩৭৪] *পূর্বমেঘ* গোষ্ঠীর চাওয়া সম্পর্কে মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম বলেন, '...আমাদের প্রয়াস ছিল-পত্রিকাটিতে যাতে ইতিহাসের পালাবদলের কালে মুক্তবুদ্ধির, যুগ-অনুসন্ধিৎসার প্রতিফলন ঘটে। নিজেরা জানতে চেয়েছি, পাঠকের চিত্তে জানবার আগ্রহটি জাগ্রত করে দেওয়ার সাধ্যমতো প্রয়াস পেয়েছি।'[৩৭৫]

পূর্বমেঘ ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। ১১ বছরে ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল ৪৪টি সংখ্যা। কিন্তু ২৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে পত্রিকাটি পূর্ববাংলার সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি স্থান দখল করে আছে।[৩৭৬]

কত ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পত্রিকা প্রকাশ করতে হতো তা মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম-এর কথায় উপলব্ধি করা যায়,

> পাকিস্তানের নামে, ইসলামের দোহাই পেড়ে মোল্লাকীর অপশক্তি আমাদেরকে বেজায় তাড়িত করত। একবারের কথা বলি,–পুলিশের গোয়েন্দা আপিসে তলব পড়েছিল। তা যে কতো ধরনের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা; প্রচ্ছন্ন হুমকি, এমনই আরও কতো কী! *পূর্বমেঘে*-ও আমরা নাকি কমিউনিস্ট, দেশের দুশমন, ভারতের চর, এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রদ্রোহী। ভাগ্যিস ড. এ আর মল্লিকের মতো ব্যক্তি *পূর্বমেঘ* নামের পত্রিকাটির আইন-অনুমোদিত প্রকাশক। তাই উটকো ঐ সব ঝামেলা যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছিল।[৩৭৭]

শুধু তাই নয়, বাইরেও *পূর্বমেঘ* সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক কথা বিভিন্ন মহল থেকে প্রচার করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর শামস উল হক একদিন মুস্তাফা নূর-উল ইসলামকে তলব করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন *পূর্বমেঘ* গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁকে কেউ আপত্তিজনক সংবাদ জানিয়েছিল। ভাইস চ্যান্সেলর তাঁকে তেমন কিছু বলেননি। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'লেখক কারা, কী ধরনের লেখাটেখা প্রকাশ করা হয়, এইসব। এক সেট *পূর্বমেঘ* সৌজন্য উপহার দিয়েছিলাম তাঁকে। ভারি খুশি হয়েছিলেন তিনি।'[৩৭৮]

পূর্বমেঘ দেশকাল সাহিত্য সংস্কৃতি ও পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাদের হামলায় একেবারে অতিষ্ঠ ছিল। পত্রিকাটি অতিষ্ঠ, বিক্ষুব্ধ, উৎপীড়নে শঙ্কিত বাঙালি জনগণের মননের বিচিত্র চিত্র তাই প্রতিফলিত হয়েছে এবং একারণেই একালের

পত্রিকারাজির মধ্যে *পূর্বমেঘ* অতিশয় পরিদৃশ্যমান একটি নক্ষত্রস্বরূপ। অন্যতম সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন,

> সুস্থ শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতি ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার লক্ষ্য আদর্শ সামনে নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল পূর্বমেঘ। সেজন্য এর লেখক শুভনুধ্যায়ী গোষ্ঠীর অধিকাংশই প্রগতিশীল, বামঘেঁষা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদী। সাম্প্রদয়িকতা বিরোধী বাংলাদেশ-আন্দোলনের সপক্ষশক্তির সহায়ক, যোদ্ধা মসীজীবীরা এর প্রধান কন্ট্রিবিউটর।[৩৭৯]

অনেকে বিএনআর পূর্বমেঘকে মাঝেমধ্যে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতো বলে বলেন থাকেন।[৩৮০] কিন্তু পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বক্তব্যে তা নাকচ হয়ে যায়। চাঁদা তুলে এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের মাধ্যমে পত্রিকার ব্যয় সংগ্রহ করা হতো। এই পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে অনেকের অবদান আছে, সে সম্পর্কে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন,

> পত্রিকা প্রকাশের জন্য অর্থ সংকটে পড়লেই স্থানীয় একজন ন্যাপ-নেতা মরহুম জনাব আতাউর রহমান বেরিয়ে পড়তেন, তিনি টাকা সংগ্রহ করতেন, বিজ্ঞাপনও। তাছাড়া আমরাও চাঁদা নিতাম রাজশাহীকেন্দ্রিক সুধী-সমাজের কাছ থেকে। টাকার জন্য অসুবিধা হতো না। লেখার অভাবেই পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে।...এ কে এন আহমেদ তখন পাকিস্তান শিল্পব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি মাঝে-মধ্যে এতে বিজ্ঞাপন দিতেন। ফলে কিছু অর্থের সাশ্রয় হতো। আর তাই উদ্বৃত্ত পয়সা থেকে লেখকদেরকে কিছু কিছু করে সম্মানীও দেয়া হতো।[৩৮১]

বদরুদ্দীন উমর কমিউনিষ্ট হিসেবে পাকিস্তান সরকারের তালিকাভুক্ত ছিলেন। তাঁরা লেখা ছাপা যে কোনো পত্রিকার জন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করতো সরকার।[৩৮২] পূর্বমেঘে প্রকাশিত বদরুদ্দীন উমরের সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক লেখা নিয়ে আরেক কাণ্ড বেধেছিল। পাক ভূমি পাকিস্তানের এবং দীন-ই-ইসলামের হেফাজতির দাবিদাররা সাহেববাজার মসজিদে নালিশি বৈঠক বসিয়েছিলেন। চূড়ান্ত একটা ফায়সালা আদায় করে নিতে তারা বদ্ধপরিকর ছিলেন। পূর্বমেঘে প্রকাশিত বদরুদ্দীন উমরের উল্লেখযোগ্য লেখা ছিল–'আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ', 'মুসলিম সংস্কৃতি', 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতি' প্রভৃতি।[৩৮৩]

মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম লিখেছেন,

> একাদশ বর্ষেই ১৩৭৭-এ (১৯৭১) *পূর্বমেঘে*-ও শেষ সংখ্যা। কৌতূহল জাগাতে পারে, এটা কী কাকতালীয় যোগ যে, পাত্রিকার যাত্রাশুরু আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের কালে, এবং অবসান সামরিক স্বৈরতন্ত্রী ইয়াহিয়া খানের দেশব্যাপী চণ্ড-নিষ্পেষণ যখন চরমে? হয়তো বা। তবে বিবেচনা করি, যেন গভীরে সত্য-ব্যঞ্জনা বেশ কিছু রয়ে গেছে। *পূর্বমেঘ* যথার্থ করেই অনেক কথা বলতে চেয়েছিল, এবং সেই সময়ে বলেও গেছে। দাবি করব যে, জানালা খুলে দিয়েছে।[৩৮৪]

ইসরাইল খান *পূর্বমেঘ* সম্পর্কে লিখেছেন,

> এতে (পূর্বমেঘে) যেসকল বক্তব্য সেদিন উপস্থাপিত হয়েছিল রীতিমতো ভাবে তা ছিল পাকিস্তানের সংহতির জন্য মারত্মক। লেখকদেরকে তুষ্ট রাখার জন্য 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড' গড়ে তোলা হলেও রাজশাহীতে এর কোনো শাখা ছিলনা। অতৃপ্ত, অতুষ্ট, বিক্ষুব্ধ চিত্তের কিছু লেখক তাই ঐ অঞ্চলে ছিলেন, এবং তাঁরা নিজেদের অভিব্যক্তি রূপ দিচ্ছিলেন পূর্বমেঘের পৃষ্ঠাতে। এতে মেজাজের দিক থেকে পূর্বমেঘের তাৎপর্যপূর্ণ তারতম্য সৃষ্টি হয়।...[৩৮৫]

গ. সমাজতন্ত্রীভাব ধারা পত্রিকা /মার্কসীয় ধারা

ধর্মীয় উগ্র রাজনৈতিক সাহিত্যিক কিংবা সাংস্কৃতিক ধারার থেকে উদার নৈতিক মানবতাবাদী ধারার পাশাপাশি মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসীদের দলও ভারি হচ্ছিল প্রধানত অনিয়মিত সংকলন, রাজনৈতিক পার্টির বুলেটিন ইত্যাদি অবলম্বন করে। কিন্তু এঁদের নিয়মিত, দীর্ঘায়ু, উন্নত মানের বিশালবপু কোনো সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। এদেশে মার্কসীয় ধারার কোনো সাহিত্যপত্রিকা *কল্লোল*, *প্রগতি*, *অগ্রগতি* কিংবা *সমকালে*র মতো খ্যাতি অর্জন করেনি। এই শ্রেণির লেখক-সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মসূচির মতোই বুর্জোয়া কোনো বড়ো দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। যে সমস্ত পত্রিকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখকেরা লিখেছেন, সেগুলোই কালে প্রধান ধারা হয়ে

উঠেছিল।[৩৮৬] কমিউনিস্টদের সাপ্তাহিক, মাসিক ও অনিয়মিত পত্র-পত্রিকা ছিল, কিন্তু সেসব আণ্ডার গ্রাউণ্ড পত্রিকা জাতীয়-জীবনের বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে তেমন কোনো প্রভাব রাখতে পারে নি।[৩৮৭]

পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত মুক্তিকামী সাহিত্যপত্রগুলো নিয়মিতো ছিল না। এগুলো পাকিস্তানি ধারার ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী পত্রিকাগুলোর মতো পুষ্টও ছিল না। কিন্তু অনিয়মিত হলেও সেগুলো স্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল ও প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে আছে। চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনকে মুসলিম লীগ প্রাণবাণ করলেও এই আন্দোলনের ধারাকে গতিশীল করেছিলেন প্রগতিবাদী সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিন কর্মী-নেতৃবৃন্দ। এঁদের মধ্য থেকেই পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালের সংবাদ ও সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকপত্রসমূহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার পত্রপত্রিকাসেবীগণ উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা এবং স্বদেশহিতের সহায়ক প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তমদ্দুন মজলিশেল মুখপত্র 'সৈনিক' (১৯৪৮-৫৭); বঙ্কিমচন্দ্র সাহা সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক (পরে অর্ধ সাপ্তাহিক) 'চাবুক' (১৯৩৩-৪৯), কৃষ্টি-সীমান্ত-যাত্রিক-মুকইত সকল পত্রিকার বক্তব্যই প্রগতিশীল, জড়তা-আড়ষ্টতা ও সংস্কারমুক্ত, উন্নত সমাজব্যবস্থার সপক্ষে নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল।

কিন্তু ক্রমে মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থিদের ক্ষমতা দূরীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কমিউনিস্ট কার্যক্রম কঠোরভাবে দমন করা হয়। নন-কমিউনিস্ট অথচ বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বাংলা ও বাঙালি-সংস্কৃতি এবং স্বাধীন চিন্তাচর্চার আগ্রহেরও উচ্ছেদ সাধন করা হয়। তদস্থলে পাকিস্তানি এক জাতীয় ভাষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি চিন্তাধারার বাস্তবায়ন করার যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলে ইসলামি, পাকিস্তানবাদী ধারা সচল-সক্রিয় ও বেগবান হয়ে উঠেছিল। এদেশের বাঙালিরা 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ' শ্লোগানে খুব অল্পকালই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৯৫৪ পর্যন্ত পাকিস্তানবিরোধী রাজনৈতিক সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনি কার্যাবলি সক্রিয় ছিল। তবে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ফলাফল দেখার পর পাকিস্তানের অখণ্ডবাদীরা যখন বুঝতে পারলো যে, গণতান্ত্রিক অধিকারে বাঙালিরা ঔপনিবেশিক শোষণ মুক্ত হতে চায় এবং হয়ে যেতে পারে, তখন তারা কঠোর দমন-নিপীড়নের নীতি গ্রহণ করে এবং ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে সামরিক শক্তিবলে পদানত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সময় গৃহীত অবক্ষয়ী-ব্যবস্থা সমূহের ফলে প্রগতিশীল কার্যাবলি একদম স্তিমিত হয়ে আসে। এজন্য ১৯৪৮ সন থেকে ১৯৫৩-৫৪ পর্যন্ত প্রগতিশীল ও মার্কসীয় আদর্শ প্রভাবিত সাহিত্যচর্চার নমুনা (কৃষ্টি-সীমান্ত-সংকেত-অগত্যা-মুক্তি-পরিচিতি-যাত্রিক-উত্তরণে) কিছু দেখা গেলেও সামরিক প্রাধান্যেরকালে তার প্রায় কিছুই প্রকাশিত হতে দেখা যায় না।

এরপর পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা জারির পর এইসব প্রচেষ্টা 'আন্ডার গ্রাউন্ডে' চলে যায়। অনেকটা সহিষ্ণুতা ও ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তখন গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী ধারায় পূর্ব বাংলার সাহিত্যজগতে প্রকাশিত হয়েছিল 'সমকাল'। একে অনুসরণ করে ষাটের দশকে 'পূর্বমেঘ', 'পূবালী', 'পরিক্রম', 'নাগরিক' এবং তাঁদের সহযোগী কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকার যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এঁদের বিপক্ষে ছিল মাহেনও, মোহাম্মদী এবং সরকারি সাহায্যপুষ্ট একগুচ্ছ প্রভাবশালী পত্রিকা। এই কালের পত্রিকার মধ্যে *সমকালে* ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে পত্র-পত্রিকার অবদান

স্বাধীনতাযুদ্ধে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা আলোচনায় যুদ্ধপূর্বকালের পত্র-পত্রিকার ভূমিকাই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ একালের স্বাধীনতাকামী পত্রপত্রিকাগুলো সঠিক ভূমিকা পালন না করলে যুদ্ধ আরও বিলম্বিত হতো। যদিও পূর্ববাংলা থেকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক কালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার এক ক্ষুদ্রাংশই যুদ্ধ চেয়ে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছিল এবং একালের সকল নিয়মিত প্রভাবশীল পত্র-পত্রিকাই ছিল সরকার-নিয়ন্ত্রিত, স্বাধীনতার বিপক্ষে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রচারক। কিন্তু সংক্ষেপে এখানেও পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ও সে ধারা বিকাশের পটভূমি বলা আবশ্যক।

স্বাধীনতাযুদ্ধে পত্র-পত্রিকার ভূমিকাকে স্পষ্টতর করে তোলার জন্যে এখানে দৈনিক ইত্তেফাক, অবজারভার পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা ও কার্যালয় ধ্বংসের ইতিবৃত্ত স্মরণ করা যেতে পারে। বাঙালির স্বার্থ রক্ষামূলক বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করার জন্যে সম্পাদক ও লেখকগণকে কারাগারে অন্তরীণ করা হয়েছে। আইন করে সাজার মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৯৫৮ সালে আইয়ুবী-সমারিক শাসনের ফলে সকল নাগরিকও মৌলিক অধিকার হৃত হলে লেখক-শিল্পীরাও ভয় পেয়ে কলম ছেড়ে দেন। পত্র-পত্রিকায় বাঙালির স্বার্থ নিয়ে লেখা হচ্ছেনা। ১৯৪৭ থেকে ৫৮ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাভাষীদের বুঝতে বাকি থাকেনা যে তাদের আর এক রাষ্ট্র কাঠামোতে বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর কারসাজিতে এবং নেতৃবর্গের বোকামির ফলে স্বাধীনতার সম্ভাবনা বারেবারেই তিরোহিত হতে বসেছিল। কিন্তু সমকাল, ইত্তেফাক প্রভৃতি দুচারটে প্রধান পত্রিকার অনলবর্ষী যুক্তিবাদী লেখার কারণেই বাঙালি সঠিক পথটি হারায়নি।[৩৮৮]

পাকিস্তানপন্থিরা বাঙালিদের সামন্তযুগীয় গতানুগতিক ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কার ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাগুলোর পরিবর্তন চাচ্ছিলেন না। তারা শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বরং চেয়েছিলেন পুরোনো ধারার সংস্কৃতি তথা চিন্তাধারার প্রবহমানতা। কিন্তু নতুন যুগের আধুনিক মনস্ক তরুণরা সে কাজে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে।[৩৮৯] এক্ষেত্রে পত্রিকাগুলো সমাজের সচেতনা বৃদ্ধি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেকালে সীমান্ত, অগত্যা, মুক্তি, ইমরোজ, পরিচিতি, সওগাত, সমকাল, উত্তরণ, পূবালী, পূর্বমেঘ, পলিমাটি, নাগরিক প্রভৃতি পত্রিকা ছিল।[৩৯০] পাকিস্তানকালের রাজনীতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য শিল্পের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে কোনটার চেয়ে কোনটার ভূমিকা বা গুরুত্ব বেশি ছিল তা নিয়ে ধাঁধায় পড়তে হয়। সকল রাজনৈতিক দলই নিজস্ব পত্রিকা পোষেণ বলে জনমত গঠনে পত্রিকা, সাংবাদিকতা ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য শিল্পের গুরুত্বই সমধিক বলে প্রমাণিত হয়। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্যও প্রয়োজন পড়েছিল পত্রিকার ও প্রচার পুস্তিকার। স্বাধীনতার দলিলপত্রের মধ্যে ঐ কালের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি পত্রিকার বিবরণ তাই সযত্নে সংকলিত হয়েছে।

সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আন্দোলন

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বিরোধ চরমে পৌঁছে ১৯৬৮ সালের দিকে। ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়ার আগে পর্যন্ত স্বৈরাচারী আইয়ুব খান পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক অবদমন অব্যাহত রাখেন। এই লক্ষে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান সরকার কুখ্যাত 'প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অডিন্যান্স' জারি করে। মৌলিক অধিকার তথা স্বাধীন চিন্তা ও বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী এই আদেশ জারি হলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ সময় লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীরা প্রবল প্রতিবাদে সোচ্চার হন।[৩৯১]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার আদেশ জারির প্রতিবাদে ১ ডিসেম্বর ঢাকায় সাংবাদিক ও সংবাদসেবীদের এক প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কিত দৈনিক সংবাদের এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে ঢাকায় সাংবাদিক সমাজ ও সংবাদপত্র সেবীদের সভা ও বিক্ষোভ মিছিল।'[৩৯২] প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন–*ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), আলী আশরাফ, এ বি এম মূসা (প্রেসক্লাবের সভাপতি), শহীদুল্লা কায়সার (সহ-সভাপতি) এবং আতাউস সামাদ (সম্পাদক)।[৩৯৩] সমাবেশ থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পূর্ণ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, দেশরক্ষা বিধি, প্রেস অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন বাতিলসহ সব ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ প্রত্যাহার করার দাবি করা হয়। মিছিলকারীরা *ইত্তেফাকে*র ছাপাখান বাজেয়াপ্তি ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে গভর্নর হাউসের সামনে বিক্ষোভও প্রদর্শন করে।[৩৯৪]

বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং শিল্পী ও লেখকগণ 'প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' বাতিলের দাবি জানায়।[৩৯৫]

উপসংহার

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে বাঙালিত্ব বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। বাঙালিত্ব বিকাশের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সংবাদপত্রগুলো। বিশেষ করে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে, সাংস্কৃতিক জাগরণে, সামাজিক

বিকাশে, সর্বোপরি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবিতে সংবাদ সাময়িকপত্র জনগণের মুখপত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লাভের পূর্ব পর্যন্ত সংবাদপত্রসমূহ বাংলাদেশের জাতীয়জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালিত্বের সমর্থক পত্রিকাগুলোতে সেগুলোর প্রতিফলনও ঘটেছে। এইসব পত্রিকা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করতেও ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকাতা বিরোধী আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও অসহযোগ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে সরকার এই পত্রিকাগুলোকে প্রথমে আইন ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সরকার এই পত্রিকাগুলোর বিপক্ষে প্রচারের জন্য বেশকয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এই পত্রিকাগুলো সবসময় বাঙালিত্বের বিপক্ষে এবং সরকারের পক্ষে কথা বলে গেছে।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে *দৈনিক ইত্তেফাক*। এজন্য একাধিকবার পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠি তোপের সম্মুখীন হয়। *দৈনিক ইত্তেফাক* ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণায় অংশ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ছয়দফা দাবির পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের করণীয় সম্পর্কে অনেক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় এবং নিবন্ধ প্রকাশ করে। এই পত্রিকাটির ভূমিকা আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে *ইত্তেফাক* অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। একটা সময়ে ইত্তেফাক, শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতা সমসূত্রে এসে দাঁড়িয়েছিল।[৩৯৬] *ইত্তেফাক* প্রতিনিয়ত বাঙালির পক্ষের সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করতে এজন্যে পত্রিকাটিকে বার বার সরকারের তোপের মুখে পরতে হয়।

পত্রিকাটির জন্ম ও সংগ্রামের ইতিহাস শুরু হয়েছিল তদানীন্তন মুসলিম লীগের সমালোচনার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের লড়াইকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

দৈনিক আজাদ এক সময় পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়েছিল সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশ সৃষ্টির সাথেও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। অর্থাৎ *দৈনিক আজাদ* যুক্ত হয়েছিল বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাষা আন্দোলনে দৈনিক আজাদের ভূমিকা ছিল জনগণের পক্ষে। কিছু সময়ের জন্য হয়তো আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলার জনগণের কথা বলেছে, বাঙালিত্বের কথা বলেছে।

১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে *দৈনিক পূর্বদেশ*, *দৈনিক দি পিপল* (ইংরেজি), *সাপ্তাহিক হলিডে*, *সাপ্তাহিক গণশক্তি* পত্রিকার আত্মপ্রকাশ করে। *দৈনিক পূর্বদেশ* এবং *সাপ্তাহিক গণশক্তি* সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত হলেও পত্রিকা দুটি সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী মওলানা ভাসানীর কার্যক্রমকে সমর্থন করেনি। *দৈনিক দি পিপল* এবং *সাপ্তাহিক হলিডে* প্রচণ্ড পাকিস্তান বিদ্বেষী এবং একইসঙ্গে সরকারবিরোধী ছিল। তবে সংবাদপত্রগুলো তাদের সমর্থিত দল বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালালেও সামগ্রিকভাবে আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তিলাভের কামনা করে। কোনো কোনো পত্রিকা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য বিজয় স্বীকার করেও আওয়ামী লীগের আদর্শ ও ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে।[৩৯৭]

বাংলাদেশের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মাণ এবং জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সুনিশ্চত করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই নানারকম প্রয়াস-প্রযত্ন লক্ষ্য করা যায়। তার প্রমাণ দেখা যাবে অজস্র স্বাস্থ্যবান রুচিসমৃদ্ধ অনিয়মিত সংকলন, একুশের বিশেষ সংখ্যা এবং কতিপয় নিয়মিত প্রকাশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাহিত্য পত্রিকাতে। এই প্রয়াস শুধু ঢাকার মধ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই ধরনের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই পত্র-পত্রিকাগুলোর আয়ু দীর্ঘ হতে পারেনি। তার এই সুনিশ্চিত করণ এই যে, এই পত্র-পত্রিকাসমূহের পেছনে কোনো সুনিশ্চিত সংগঠিত আর্থিক ও

সামাজিক সহযোগিতা এবং সহায়তা ছিল না। তাছাড়া, পাকিস্তান সরকারও সবসময় সুস্থ পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা নিরুৎসাহিত করতো।

তারপরে শুধু দৈনিক পত্রিকা নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সঞ্চারে লিটল ম্যাগাজিন ও সাহিত্যপত্র সমান ভূমিকা পালন করে। 'সমকাল', 'উত্তরণ', এবং মুস্তফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭) ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮) সম্পাদিত 'পূর্বমেঘ', ফজলুল হক সরকার সম্পাদিত 'পলিমাটি' ১৯৬৪-এর কিছু আগে ও পরে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনামলে যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে তার সমান্তরালে গণ্য করার মতো পত্রিকা খুব কমই পাওয়া যায়। ষাটের দশকে শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র সাধারণ মানুষকে জাগাতে চেষ্টা করেছে। অপরদিকে, শাসকগোষ্ঠী জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সংবাদপত্র বাংলার মানুষকে সজাগ ও সচেতন করার চেষ্টা করেছে। ১৯৬৪ সালের ১৭ জানুয়ারি সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গার বিরুদ্ধে *ইত্তেফাক*, *আজাদ* ও *সংবাদের* প্রথম পৃষ্ঠায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়ে দাঁড়াও' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। শুধু সংবাদপত্র কর্মীরা সংবাদ প্রচার করে ক্ষান্ত হননি তারা আইয়ুববিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সভাপতিত্বে এক দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন।[৩৯৮] শাসকশ্রেণির দমনপীড়নের মুখে যে সব পত্রিকা জনগণের কথা লিখেছে তাদের ওপর নেমে এসেছে নিষেধাজ্ঞার খড়্গ। ৭ জুনের হরতাল সম্পর্কে খবর প্রকাশের কারণে ১৭ জুন (১৯৬৬) *দৈনিক ইত্তেফাক*কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আগের দিন *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকেও সরকার পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে।[৩৯৯] সংবাদপত্রের ওপর শাসকগোষ্ঠীর এই আচরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে থাকে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকাভাষ্য

---

[১] রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২০

[২] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৮

[৩] রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

[৪] রবিউল হোসেন, *সমকাল পত্রিকার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা*, ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১

[৫] বিভাগ-পূর্বকালে পূর্ববঙ্গ থেকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। দৈনিক 'আজাদ' কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জিন্দেগী'; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সনে দৈনিক রূপে প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক সংবাদ' জিন্দেগীকে আত্মীকরণ পূর্বক (একীভূত হয়ে) ১৭ মে ১৯৫০-এ প্রকাশিত হলো। চট্টগ্রাম থেকে ১৯৪৭ সনে 'পূর্ব পাকিস্তান' ও 'পয়গাম' নামে দুটি দৈনিক প্রকাশিত হয়। এরপর দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয় 'ইত্তেফাক'। তবে এটি প্রথমে শুরু হয়েছিল সাপ্তাহিকীরূপে। এ ধারায় *ইনসান*, *মিল্লাত*, *আমার দেশ*, *জমানা*, *ইত্তেহাদ*, *বুনিয়াদ*, *চাষী*, *পূর্বদেশ*, *নাজাত*, *নবজাত*, *আজাদী*, *পয়গাম*, *স্বদেশ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *আওয়াজ*, *জনমন*, *ইসলামাবাদ* প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।*১ এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর 'আজাদ' পত্রিকার প্রকাশানা ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পত্রিকাটি ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর থেকে ঢাকায় প্রকাশনা শুরু করে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন।*২

*১ ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, কাশবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৯৫

*২ মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৫

[৬] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[৭] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

[৮] আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[৯] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

[১০] *প্রাগুক্ত*

[১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪

[১২] *প্রাগুক্ত*

[১৩] *প্রাগুক্ত*

[১৪] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৬

[১৫] সাক্ষাৎকার, ইসরাইল খান, সংবাদ-সাময়িকপত্র গবেষক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মিরপুর ১৪, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫; ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

[১৬] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪-১৭৫

[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

[১৮] *প্রাগুক্ত*

[১৯] *প্রাগুক্ত*

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

[২১] আবু জাফর শামসুদ্দীন, আত্মস্মৃতি অখণ্ড সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১২৮

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১

[২৩] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ২, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৯৫

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫-২৯৬; *নওবেলাল*, ২৪ জুন ১৯৪৮

[২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬

[২৬] *প্রাগুক্ত*

[২৭] *প্রাগুক্ত*

[২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭

[২৯] *প্রাগুক্ত*

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮-২৯৯

[৩১] এই সভায় আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সম্পাদক, আজাদ), বজলুল হক (সম্পাদক, জিন্দেগী), মাহমুদ আলী (সম্পাদক, নওবেলাল), আব্দুল ওয়াহাব (প্রতিনিধি, স্টেটসম্যান), মহম্মদ হোসেন, জহুর হোসেন চৌধুরী (পাকিস্তান অবজার্ভার), এম. এ. আজম (এ.পি.পি.) এবং আজাদ, নওবেলাল ও পাকিস্তান অবজার্ভারের আরও কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

[৩২] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯

[৩৩] কার্যকরী সমিতির সদস্যরা হলেন : সভাপতি, 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সহ-সভাপতি, 'পাকিস্তান অবজার্ভারের' ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অম্বিকা চরণ দাস ও 'আজান' (চট্টগ্রাম) পত্রিকার সম্পাদক। সেক্রেটারী, 'মর্নিং নিউজ' সম্পাদক সৈয়দ মোহসিন আলী। জয়েন্ট সেক্রেটারী, অর্ধ সাপ্তাহিক 'পাকিস্তান' সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের। সহকারী সম্পাদক, 'যুগের দাবী' সম্পাদক খোন্দাকার ইলিয়াস ও সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। কোষাধ্যক্ষ ঢাকাস্থ এ.পি.পি.র প্রতিনিধি এম.এ. আজম। এছাড়া আরও পনের জন পত্রিকা সম্পাদক কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সম্মেলনে সৈয়দ মহসিন আলীকে আহ্বায়ক এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আব্দুস সালাম ও বজলুল হককে সদস্য করে একটি গঠনতন্ত্র সাবকমিটি গঠিত হয়।*

*বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯

[৩৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯-৩০০

[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০০

[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪

[৩৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১), তথ্য মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৯

[৩৯] সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭২; মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪

[৪০] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

[৪১] *প্রাগুক্ত*

[৪২] *প্রাগুক্ত*; অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫-৭৫*, ঢাকা বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ঢাকা, পৃ. ২৬০

[৪৩] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩২

[৪৪] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫-৭৫*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০

[৪৫] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
[৪৬] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৭৬
[৪৭] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[৪৮] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[৪৯] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
[৫০] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[৫১] *প্রাগুক্ত*
[৫২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ অক্টোবর ১৯৫৮
[৫৩] Aleem-Al-Razee, *Constitutional Glimpses of Martial Law in India, Pakistan and Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, 1988, p. 32; মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[৫৪] রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১-৩৪২
[৫৫] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৪১
[৫৬] কমিটির সদস্য হিসেবে *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারে*'র সম্পাদক আব্দুস সালাম, *দৈনিক আজাদের* সাংবাদিক মজিবর রহমান খাঁ, *দৈনিক সংবাদে*'র সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, *দৈনিক ইত্তেফাকে*'র সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, *দৈনিক নাজাতে*'র সাংবাদিক ফরিদ আহম্মেদ এবং *দৈনিক মনিং নিউজের* সাংবাদিক মোঃ বদরুদ্দিন অন্তর্ভুক্ত হন।*

*এম, আর আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, অন্যন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৯
[৫৭] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২
[৫৮] *দৈনিক আজাদ*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৮
[৫৯] *প্রাগুক্ত*
[৬০] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২২৪
[৬১] *দৈনিক আজাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০; রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬
[৬২] তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ : জান্তা না জনতা*, (অনূদিত), ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯০
[৬৩] ৭ ফেব্রুয়ারি *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*-এ প্রকাশিত প্রেস নোটটির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রেসনোট–'Some students absented themselves from the classes on February 1, and incited others, On February 3, they staged an unruly demonstration against a Central Minister who was invited to talk to them at Dacca University.
This morning a number of students of the Dacca University again abstained from attending their classes and about 500 of the gathered at the University premises. At 11am they came out in a procession shouting slogans, passing through in Curzon Hall they came out of the opposite the High Court and started moving towards the secratariate. They reached near the entrance gate of the High Court where they were stopped by police held then back.
At this the students started pelting brickbats at the police as a result of which several policemen were injured. A mild lathi charge was then made by the police forcing the students back un side the Curzon Hall compound. During the lathi charge two persons who were in the forefront received minor injures.'
[৬৪] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪
[৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪-১৪৫
[৬৬] (নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, ইউছুফ আলী চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া, সৈয়দ আজিজুল হক ও মাহমুদ আলী)
[৬৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জুন ১৯৬২
[৬৮] *প্রাগুক্ত*
[৬৯] *প্রাগুক্ত*
[৭০] মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২৫
[৭১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
[৭২] সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
[৭৩] ১৯৬৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর অধ্যাদেশটি জারি করা হয়।

[৭৪] রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮; মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-১৫০
[৭৫] রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
[৭৬] *দৈনিক আজাদ*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
[৭৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
[৭৮] সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮
[৭৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
[৮০] রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
[৮১] *প্রাগুক্ত*
[৮২] *দৈনিক আজাদ*, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
[৮৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
[৮৪] *দৈনিক আজাদ*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
[৮৫] *প্রাগুক্ত*
[৮৬] *দৈনিক আজাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৩
[৮৭] *দৈনিক* ইত্তেফাক, ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
[৮৮] সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০
[৮৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪; মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৯
[৯০] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪
[৯১] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
[৯২] আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, *আমরা বাংলাদেশী, না বাঙালি*, অক্ষরবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২
[৯৩] *দৈনিক আজাদ*, ৯ জুলাই ১৯৬৪
[৯৪] যে দুইজন ছাত্রের এম এ ডিগ্রী প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তারা হলেন–শেখ ফজলুল হক (মনি) এবং ইসমত আলী।
[৯৫] *দৈনিক আজাদ*, ২৮ মে ১৯৬৪; মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬
[৯৬] *দৈনিক আজাদ*, ৯ জুলাই ১৯৬৪
[৯৭] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
[৯৮] *সাপ্তাহিক জনতা*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪
[৯৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ নভেম্বর ১৯৬৪
[১০০] আবুল কামাল শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ পাবলিকেশনস লিঃ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩০৮; মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯
[১০১] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯
[১০২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ এপ্রিল ১৯৬৫
[১০৩] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নিবেদন ইতি উত্তরখণ্ড*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২১১
[১০৪] *দৈনিক আজাদ*, ১৮ মার্চ ১৯৬৬
[১০৫] *দৈনিক আজাদ*, ৯ এপ্রিল ১৯৬৬
[১০৬] *প্রাগুক্ত*
[১০৭] *দৈনিক মর্নিং নিউজ*, ২১ এপ্রিল ১৯৬৬
[১০৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
[১০৯] *প্রাগুক্ত*
[১১০] *সংবাদ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
[১১১] *প্রাগুক্ত*
[১১২] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৬
[১১৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ এপ্রিল ১৯৬৬
[১১৪] *ঐ*, ১০ মে ১৯৬৬
[১১৫] *সংবাদ*, ৯ জুন ১৯৬৬

[১১৬] অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩২
[১১৭] শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৯৫
[১১৮] হারুন-অর-রশিদ, *আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা'র ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৬
[১১৯] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৬
[১২০] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪-১৭৫
[১২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯-১৮০
[১২২] *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৩ জুন ১৯৬৭
[১২৩] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০
[১২৪] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৫ জুন ১৯৬৭
[১২৫] *দৈনিক মনিং নিউজ*, ১৮ জুন ১৯৬৭
[১২৬] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ জুন ১৯৬৭
[১২৭] *দৈনিক আজাদ*, ৩০ জুন ১৯৬৭
[১২৮] *ঐ*
[১২৯] *ঐ*, ২৭ আগস্ট ১৯৬৮
[১৩০] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২
[১৩১] সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য; মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৮৪
[১৩২] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪-১৮৫
[১৩৩] *সংবাদ*, ৪ নভেম্বর ১৯৬৮
[১৩৪] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭
[১৩৫] *সংবাদ*, ২১ জানুয়ারি ১৯৬৯
[১৩৬] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮
[১৩৭] *দৈনিক সংবাদ* ২১ জানুয়ারি ১৯৬৯
[১৩৮] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২১ জানুয়ারি ১৯৬৯
[১৩৯] *ঐ*
[১৪০] *দৈনিক আজাদ*, ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯ (সন্তোষ গুপ্তের কবিতার পঙ্‌ক্তি।)
[১৪১] *ঐ*
[১৪২] *ঐ*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৯
[১৪৩] *ঐ*, ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯; রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
[১৪৪] *দৈনিক সংবাদ*, ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯
[১৪৫] *দৈনিক আজাদ*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৯
[১৪৬] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩
[১৪৭] *প্রাগুক্ত*; লেলিন আজাদ, পৃ. ৮৬
[১৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪
[১৪৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
[১৫০] *ঐ*
[১৫১] *ঐ*
[১৫২] *ঐ*
[১৫৩] *ঐ*, ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯ (সন্তোষ গুপ্তের কবিতার পঙ্‌ক্তি।)
[১৫৪] Rounaq Jahan, *Pakistan : failure in national integration,* Oxford University Press, 1973, P. 172
[১৫৫] *দৈনিক আজাদ*, ২৬ মার্চ ১৯৬৯
[১৫৬] *ঐ*, ১ এপ্রিল ১৯৬৯
[১৫৭] *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৯ মার্চ ১৯৬৯
[১৫৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মার্চ ১৯৬৯

[১৫৯] *ঐ*
[১৬০] *ঐ*, ১৫ নভেম্বর ১৯৭০
[১৬১] *দৈনিক পূর্বদেশ* ১৬ নভেম্বর ১৯৭০
[১৬২] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭০
[১৬৩] *ঐ*, ২৭ নভেম্বর ১৯৭০
[১৬৪] *ঐ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭০
[১৬৫] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪
[১৬৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৭০
[১৬৭] *ঐ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০
[১৬৮] *ঐ*, ১২ নভেম্বর ১৯৭০
[১৬৯] *ঐ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭০
[১৭০] *ঐ*, ১ নভেম্বর ১৯৭০
[১৭১] *সংবাদ*, ২ নভেম্বর ১৯৭০
[১৭২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭০
[১৭৩] *ঐ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০
[১৭৪] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ মার্চ ১৯৭১
[১৭৫] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭
[১৭৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬
[১৭৭] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ মার্চ ১৯৭১
[১৭৮] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭
[১৭৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মার্চ ১৯৭১
[১৮০] *পাকিস্তান অবজারভার*, ৪ মার্চ ১৯৭১
[১৮১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মার্চ ১৯৭১
[১৮২] *ঐ*, ৫ মার্চ ১৯৭১
[১৮৩] *দৈনিক পাকিস্তান*, ৫ মার্চ ১৯৭১
[১৮৪] *দৈনিক সংবাদ*,৭ মার্চ ১৯৭১
[১৮৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মার্চ ১৯৭১
[১৮৬] 'আমরা ঢাকার সংবাদপত্র সমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন আসিয়াছে এবং এই মুহূর্তে এক বাক্যে একসুরে কয়েকটি কথা বলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেইশ বৎসরের ইতিহাসে জাতি আজ চরম সংকটে নিপতিত। দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতি কায়েমের আশায় সমগ্রদেশ জীবনের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে শরীক হওয়ার পর দেশের আজ এই অবস্থা।...ক্ষমতায় যাহারা আজ আসীন আর ক্ষমতাসীনদের সহিত কানাকানি করার সুযোগ যাহাদের আছে, তাহাদের ব্যর্থতাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির কারণ। বহিরাক্রমণ হইতে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হইল সামরিক বাহিনীর কাজ। রাজনৈতিক বিতর্কে হস্তক্ষেপ বা পক্ষ গ্রহণ করা তাহাদের কোনো দায়িত্বের আওতায় আসেনা।...আমরা মনে করি আজ সময় আসিয়াছে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খঅনকে রাজনৈতিক জীবনে এই বাস্তব সত্যগুলি স্বীকার কয়িা লইতে হইবে। আমাদের বিচারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত দেশের বুক হইতে সামরিক আইন তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া, যাহার ফলশ্রুতিতে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।'*১

*১ মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০

[১৮৭] *দৈনিক দি পিপল*, ১৭ মার্চ ১৯৭১
[১৮৮] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫
[১৮৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪; মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৯
[১৯০] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৬ নভেম্বর ১৯৭০

[১৯১] দেলওয়ার হাসান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি মানিক মিয়া ও সমকালীন রাজনীতি*, মানিক মিয়া রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১১৬-১১৭; মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

[১৯২] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

[১৯৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-১৫০

[১৯৪] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

[১৯৫] *প্রাগুক্ত*

[১৯৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

[১৯৭] *প্রাগুক্ত*

[১৯৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬-১৭৭

[১৯৯] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, প্রচলন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৩

[২০০] উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় লিটল ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু। ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস মতে লিটল ম্যাগাজিনের অভিযাত্রা শুরু হয় Ralph Waldo Emerson I Margaret Fuller সম্পাদিত *The Dial* (Boston, 1840-1844)-এর মাধ্যমে। পাশ্চাত্যের আদলে বাংলাদেশেও লিটল ম্যাগাজিন প্রবর্তন হয়।

[২০১] আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, 'লিটল ম্যাগাজিন আর ব্যবসা এক সঙ্গে হয় না', *দৈনিক ইত্তেফাক* (ইত্তেফাক সাময়িকী), ২২ জানুয়ারি ২০১১

[২০২] *প্রাগুক্ত*

[২০৩] যে পত্রিকাগুলো প্রগতিশীলকে রোধ করার জন্যে বের হয়, সেগুলো হলো–'আল্-ইসলাহ্' (প্রথম প্রকাশ বিভাগ পূর্বকালে ১৯৩২ সনে), 'মাহেনও' (১৯৪৯), 'মোহাম্মদী' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৭ সনে), 'দিলরুবা' (১৯৪৯), 'নওবাহার' (১৯৪৯), 'দ্যুতি' (১৯৪৯-৫৩), 'তাহজিব' (১৯৫০), 'দিগন্ত' (১৯৫৩-৬০), 'অতএব' (১৯৬০-৬১), 'অভিযান' (১৯৫৪-৬৪), 'পূরবী' (১৯৬০), ' লেখক সংঘ পত্রিকা' (১৯৬১), 'পরিক্রমা' (১৯৬২-৭০), সংলাপ (১৯৬১-৭০), উত্তর-অন্বেষা (১৯৬৭-৭০) প্রভৃতি পত্রিকা।*

*ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০

[২০৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

[২০৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

[২০৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[২০৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

[২০৮] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[২০৯] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

[২১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

[২১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

[২১২] মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, 'একদা আমাদের লিটল ম্যাগাজিন প্রয়াস', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩৩১

[২১৩] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

[২১৪] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৪

[২১৫] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০; ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

[২১৬] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬-১০৭

[২১৭] *উত্তরণ*, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৬/ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৯; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

[২১৮] *ঐ*

[২১৯] মুনীর চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, ড. মু. এনামুল হক, জসীমউদ্দীন, কে-না–সকলেই তখন সরকারি সংগঠনের সদস্য হয়ে নিরাপদ নির্বাস চিন্তা-চেতনায় আত্মসমর্পণকারী, স্বার্থভোগকারী।*১

*১ ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮-১৭৯

[২২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯

[২২১] *প্রাগুক্ত*

[২২২] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০; ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

[২২৩] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[২২৪] আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ষাটের লিটল মাগাজিন ও আমাদের সাহিত্য', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩৭৯

[২২৫] বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৪২৬

[২২৬] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[২২৭] দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদক : ইমরুল চৌধুরী। চতুর্থ সংখ্যার সম্পাদক : রফিক আজাদ ও রণজিৎ পাল চৌধুরী।*
*মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[২২৮] বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬

[২২৯] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

[২৩০] আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'সাহিত্য-পত্রিকা', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৩

[২৩১] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০৫

[২৩২] আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ষাটের লিটল মাগাজিন ও আমাদের সাহিত্য', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৯

[২৩৩] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[২৩৪] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯

[২৩৫] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[২৩৬] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

[২৩৭] বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৭

[২৩৮] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[২৩৯] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[২৪০] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[২৪১] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

[২৪২] আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ষাটের লিটল ম্যাগাজিন ও আমাদের সাহিত্য', আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

[২৪৩] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

[২৪৪] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

[২৪৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[২৪৬] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

[২৪৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬৩

[২৪৮] *প্রাগুক্ত*

[২৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

[২৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

[২৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭

[২৫২] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

[২৫৩] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[২৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮২

[২৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

[২৫৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[২৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯

[২৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

[২৫৯] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

[২৬০] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১-১৫২

[২৬১] নির্মলেন্দু গুণ, *আমার কণ্ঠস্বর*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৩
[২৬২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২
[২৬৩] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[২৬৪] নির্মলেন্দু গুণ, *আমার কণ্ঠস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[২৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৪
[২৬৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
[২৬৭] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[২৬৮] *কণ্ঠস্বর*, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬; ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০৩
[২৬৯] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০৪
[২৭০] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২
[২৭১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২-১৫৩
[২৭২] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[২৭৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬১
[২৭৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[২৭৫] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[২৭৬] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[২৭৭] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[২৭৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[২৭৯] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩
[২৮০] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[২৮১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
[২৮২] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০
[২৮৩] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
[২৮৪] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১
[২৮৫] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
[২৮৬] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
[২৮৭] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
[২৮৮] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
[২৮৯] মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[২৯০] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
[২৯১] *প্রাগুক্ত*
[২৯২] *প্রাগুক্ত*
[২৯৩] আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, 'লিটল ম্যাগাজিন : ষাট ও সত্তর দশক', *উত্তর প্রজন্ম*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৯১
[২৯৪] আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ষাটের লিটল ম্যাগাজিন ও আমাদের সাহিত্য', আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
[২৯৫] যে পত্রিকাগুলো প্রগতিশীলকে রোধ করার জন্যে বের হয়, সেগুলো হলো–'আল্-ইসলাহ্' (প্রথম প্রকাশ বিভাগ পূর্বকালে ১৯৩২ সনে), 'মাহেনও' (১৯৪৯), 'মোহাম্মদী' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৭ সনে), 'দিলরুবা' (১৯৪৯), 'নওবাহার' (১৯৪৯), 'দ্যুতি' (১৯৪৯-৫৩), 'তাহজিব' (১৯৫০), 'দিগন্ত' (১৯৫৩-৬০), 'অতএব' (১৯৬০-৬১), 'অভিযান' (১৯৫৪-৬৪), 'পূরবী' (১৯৬০), ' লেখক সংঘ পত্রিকা' (১৯৬১), 'পরিক্রমা' (১৯৬২-৭০), সংলাপ (১৯৬১-৭০), উত্তর-অন্বেষা (১৯৬৭-৭০) প্রভৃতি পত্রিকা।*
*ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০
[২৯৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[২৯৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮
[২৯৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
[২৯৯] *প্রাগুক্ত*

[৩০০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
[৩০১] আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, 'লিটল ম্যাগাজিন : ষাট ও সত্তর দশক' *উত্তর প্রজন্ম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
[৩০২] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫
[৩০৩] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৮৮
[৩০৪] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
[৩০৫] *প্রাগুক্ত*
[৩০৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[৩০৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
[৩০৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮
[৩০৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭-৯৮
[৩১০] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সাহিত্য', *আমাদের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৯১-১১৬; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯
[৩১১] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪
[৩১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৫
[৩১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
[৩১৪] মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, *'পূবালী'র দিনগুলি ও সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৯
[৩১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
[৩১৬] *প্রাগুক্ত*
[৩১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[৩১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭
[৩১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
[৩২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
[৩২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
[৩২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১
[৩২৩] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
[৩২৪] মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, *'পূবালী'র দিনগুলি ও সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫
[৩২৫] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
[৩২৬] *প্রাগুক্ত*
[৩২৭] *প্রাগুক্ত*
[৩২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
[৩২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[৩৩০] *প্রাগুক্ত*
[৩৩১] মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, *'পূবালী'র দিনগুলি ও সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮
[৩৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫
[৩৩৩] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭-৪৮
[৩৩৪] মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, *'পূবালী'র দিনগুলি ও সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪
[৩৩৫] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮
[৩৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[৩৩৭] *প্রাগুক্ত*
[৩৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭-১৭৮
[৩৩৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯
[৩৪০] *প্রাগুক্ত*
[৩৪১] *প্রাগুক্ত*
[৩৪২] রবিউল হোসেন, *সমকাল পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা*, ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩২

[৩৪৩] আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'সাহিত্য-পত্রিকা', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭
[৩৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯
[৩৪৫] মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, 'একদা আমাদের লিটল ম্যাগাজিন প্রয়াস', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭
[৩৪৬] নির্মলেন্দু গুণ, *আমার কণ্ঠস্বর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২
[৩৪৭] আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
[৩৪৮] হাসান হাফিজুর রহমান, 'সওগাত থেকে সমকাল', *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, রফিকউল্লাহ খান (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২১০
[৩৪৯] রবিউল হোসেন, *সমকাল পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
[৩৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
[৩৫১] আবুল ফজল, 'সাহিত্যের সংকট', *সমকাল*, ২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৫, পৃ. ৩৩২-৩৩৮; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭
[৩৫২] *প্রাগুক্ত*
[৩৫৩] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯
[৩৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭
[৩৫৫] রবিউল হোসেন, *সমকাল পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫
[৩৫৬] আবদুল হক, 'রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি', *সমকাল*, ২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ৫৮২; ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
[৩৫৭] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
[৩৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
[৩৫৯] *প্রাগুক্ত*
[৩৬০] *প্রাগুক্ত*
[৩৬১] *প্রাগুক্ত*
[৩৬২] *প্রাগুক্ত*
[৩৬৩] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০
[৩৬৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০
[৩৬৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১
[৩৬৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯
[৩৬৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭
[৩৬৮] আবদুল হক, 'সমকাল-এর ভূমিকা', *বাঙালির জাগরণ*, আহমদ মাযহার (সম্পা.), অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৩০; রবিউল হোসেন, *সমকাল পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
[৩৬৯] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮
[৩৭০] রবিউল হোসেন, *সমকাল পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪
[৩৭১] মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, 'একদা আমাদের লিটল ম্যাগাজিন প্রয়াস', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭
[৩৭২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৬
[৩৭৩] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[৩৭৪] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নিবেদন ইতি উত্তরখণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯
[৩৭৫] মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, 'একদা আমাদের লিটল ম্যাগাজিন প্রয়াস', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮
[৩৭৬] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯
[৩৭৭] মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, 'একদা আমাদের লিটল ম্যাগাজিন প্রয়াস', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭
[৩৭৮] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নিবেদন ইতি*, *উত্তরখণ্ড*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯৮

[৩৭৯] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[৩৮০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১
[৩৮১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[৩৮২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
[৩৮৩] মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, 'একদা আমাদের লিটল ম্যাগাজিন প্রয়াস', *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭
[৩৮৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯
[৩৮৫] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
[৩৮৬] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
[৩৮৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬
[৩৮৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯
[৩৮৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬-১৬৭
[৩৯০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭
[৩৯১] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৭৬
[৩৯২] *দৈনিক সংবাদ*, ১ ডিসেম্বর ১৯৬৮
[৩৯৩] *ঐ*, ২ ডিসেম্বর ১৯৬৮
[৩৯৪] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬
[৩৯৫] সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২৪-১২৫
[৩৯৬] ইসরাইল খান, *মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭
[৩৯৭] মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪
[৩৯৮] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১১৪-১১৫
[৩৯৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

উপসংহার

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শাসকশ্রেণি শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করারও সমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করে। শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই রাষ্ট্র ভাষাকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত বাঙালির ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তায় প্রাচীনকাল থেকে ভাষাকেন্দ্রিক যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল তা ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আরও পরিপুষ্ট হওয়া শুরু করে। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু গণ-আন্দোলনের চেতনা নয়, এটা ছিল সার্বিক মুক্তি আন্দোলন এবং প্রস্তুতির কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম সুসংহত স্ফুরণ। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ বলেছেন,

> পূর্ব-বাংলার সংখ্যাগুরু মানুষ পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। আবার দেশটির শাসকগোষ্ঠীর আচরণে হতাশ হয়ে পড়েন। মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ হবার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রচেতনা থেকে বাঙ্গালীরা আরও দ্রুত বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন।[১]

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সাথে আরও যে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো পূর্ববাংলার জনগণের ঐক্য ও চেতনাকে বিকাশে সহায়তা করে, সেগুলো হচ্ছে–পহেলা বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাঙালি জাতিসত্তার চেতনা। এগুলো বাঙালিত্বের শক্তিশালী ভিত্তি। জাতিসত্তার এই চেতনাকে উজ্জীবিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আত্মদান[২] শুধু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে উর্দুকে চাপিয়ে দিতেই বাধা দেয় নি, বরং ষাটের দশকে শাসকগোষ্ঠীর বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে তা সবই ব্যর্থ করে দেয়। শাসকগোষ্ঠী আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অনাবশ্যকভাবে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাঙালি সংস্কৃতির বিভাজন প্রভৃতির যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করেছিল। পাকিস্তানি শাসকদের আঘাতে আঘাতে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত আত্মপরিচয় সম্পর্কে বাঙালিরা ক্রমে সচেতন হয়েছে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ততোই ঘটেছে। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েই শুধু এ-ভাবধারা পুষ্ট হয় নি। বাংলা নববর্ষ-উদ্‌যাপন, ঋতু-উৎসব-পালন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যত বেশি সরকারি বাধা এসেছে, রোমান হরফে বাংলা লেখার কিংবা বাংলা বর্ণমালা-সংস্কারে উদ্যোগ নিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বাঙালিজাতিকে যত দূরে সরাবার চেষ্টা হয়েছে, ততোই তারা নিজেদের জাতিসত্তার অহঙ্কারকে আঁকড়ে ধরেছে।[৩] আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেন,

> বাঙালী মুসলমান যে বাঙালী নয় এবং বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি যে তাদের নিজস্ব নয়, বরং এগুলো ইসলাম বিরোধী এটা তাদের বুঝাবার জন্য বহুকাল ধরে এদেশের বিভিন্ন শাসকশক্তি অপচেষ্টা চালিয়েছে। পাকিস্তান আমলে তো পূর্ববঙ্গ কথাটাও মুছে দিয়ে বাঙালী কথাটার ব্যবহার কার্যতঃ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আমাদের একমাত্র পরিচয় ছিল পাকিস্তানী বা পূর্ব পাকিস্তানী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই আরবী (উর্দু) হরফে বাংলা লেখার সরকারী অভিযান শুরু করা হয়। বাংলা নববর্ষ পালন, বৈশাখ মেলা, নতুন ফসল ওঠার হৈমন্তী নবান্ন উৎসব, বসন্ত উৎসব প্রভৃতি বাঙালীর জাতীয় উৎসবগুলোকে বিজাতীয় ও হিন্দুদের উৎসব আখ্যা দিয়ে বর্জন করা হয়। বাংলা ভাষাকে প্রাদেশিক সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দিতেও প্রথমে পাকিস্তান সরকার অসম্মত হন। বাংলা ভাষার আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয়। বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রসহ সকল অমুসলিম সাহিত্যিকের লেখা পঠন পাঠন নিষিদ্ধ করার জন্য উগ্র মৌলবাদী ও জামাতপন্থীদের দ্বারা দাবি তোলানো হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালী নামের বিলোপ, বাংলা হরফের বদলে আরবী/উর্দু হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ, বাংলা ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদাদানেও প্রথমদিকে মুসলিম লীগ সরকারের অস্বীকৃতি, ভাষা আন্দোলনকারীদের নির্যাতন ও হত্যা, রবীন্দ্র সঙ্গীত বর্জনের আন্দোলন, এমনকি নজরুলের গজল ও ইসলামী গানগুলো ছাড়া অন্যান্য কবিতা ও গান বর্জনে সরকারী উৎসাহ দান

> ইত্যাদি সবই ছিল বাঙালীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও জাতীয়তাবোধকে বিলোপ করার নব্য ঔপনিবেশিক অপচেষ্টা। এই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করেই ... বাংলাদেশের মানুষ অপহৃত বাঙালী পরিচয় ফিরে পেয়েছে।[৪]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রচর্চার বিরোধিতা ও বেতারে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার বন্ধের প্রতিবাদে উনসত্তরে পূর্ববাংলার সর্বত্র ঝড় বয়ে যায়। এবারও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়; বেতার এবং সর্বত্র রবীন্দ্রচর্চা পূর্বের চেয়ে আরও ব্যাপক হারে শুরু হয়। মোটকথায় এসবের মিথষ্ক্রিয়া বাঙালিত্ব এবং এগুলোর সংমিশ্রণে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন, যার প্রত্যক্ষ ফল বাঙালির রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া।

বাঙালিত্বের এই চেতনার সঙ্গে জড়িত ছিল অসাম্প্রদায়িকতা।[৫] অন্যদিকে পাকিস্তানিবাদের মূল অনুষঙ্গ হলো–ধর্মের ব্যবহার। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিল ধর্ম। ধর্মকে মূলমন্ত্র করে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলকে শোষণ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ধর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইতো। শুধু তাই নয়, ধর্মকে অবলম্বন করে তারা জাতিগত নিপীড়ন করেছে। বাঙালির জাতীয় স্বাতন্ত্র্য (সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্ট) প্রকাশের জায়গাগুলোতে পশ্চিমা শাসকচক্র ইসলামীকরণের অপচেষ্টা চালাতে থাকে। এ ব্যাপারে পশ্চিমা শাসকচক্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কতিপয় বুদ্ধিজীবী। তাঁরা School Text Book Board-এর মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের মধ্যে 'তাহজীব ও তমদ্দুন' প্রচারে যত্নবান হয় এবং মনগড়া ইতিহাস শিখিয়ে এদেরকে আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়। বাংলা ভাষা ও জাতীয়তাবাদের গলা টিপে ধরার সব রকমের অপচেষ্টাকে বানচাল করে দেয় বাংলার জনতা। এই বিষয়গুলো আঘাত করে বাঙালির মানসে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অসন্তোষের চেতনা জন্মাতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত দমন নিপীড়ন বাঙালিকে প্রতিরোধে উজ্জীবিত করে। মননচর্চায় বাঙালি পাঞ্জাবি বা বেলুচদের থেকে পিছিয়ে নেই। তাহলে কেন প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর থেকে বাঙালি পিছিয়ে থাকবে? অন্য জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা নিপীড়ন হবে? এই কথা শিক্ষিত বাঙালিরা বুঝতে পারলো যে তারা পশ্চিম পাকিস্তানি জাতিগোষ্ঠীর অধীনস্ত হয়ে গেছে। শিক্ষিত সচেতন বাঙালিরা সিদ্ধান্তে পৌঁছায় এই রাষ্ট্র তাদের নয়। যদি তাদের রাষ্ট্র হতো তাহলে শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালিকে অধস্তন করে রাখার চেষ্টা করতো না।

ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মীদের নির্যাতন, কারাগারে প্রেরণ, নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে চক্রান্তের মাধ্যমে বাতিল করা, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতিদানে বিলম্ব (১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান করা হয়। কিন্তু বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে মর্যাদা দিলেও তাকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না দেবার গোপন অভিসন্ধি, ষড়ষন্ত্র চলতে থাকলো।), শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালিকে পশ্চাৎপদ রাখার ষড়যন্ত্র, বাঙালি পুঁজির বিকাশে বাধাদান প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সচেতন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে পাকিস্তানি প্রশাসনের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা তীব্র রূপ ধারণ করে।[৬] এ প্রসঙ্গে মনসুর মুসা বলেন,

> ৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাঙলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেও, সরকারী সদিচ্ছার অভাবে তা বাস্তবে কার্যকরী হয় নি। ৫৮ সালে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে বাতিল ঘোষণা করে ধনিকদের স্বার্থে সামরিক চক্র শাসনক্ষমতা দখল করে নেয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে হতাশা তীব্র আকার ধারণ করে। সামরিক শাসনের পক্ষপুটে প্রতিষ্ঠিত হলো মৌলিক গণতন্ত্র ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। ৫৮ থেকে ৬৮ স্বৈরাচারের দশ বছর। এর মধ্যে ৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পূর্ব-বাংলার অরক্ষিত অবস্থাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় একযুগের আশাহত বিক্ষোভ উত্তাল গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয় ঊনসত্তরে।[৭]

১৯৪৭-১৯৭১ সময়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা বাঙালিরা শোষিত হয়ে আসছিল। ভাষা আন্দোলনের পর দুইবার সামরিক শাসন এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারেনি। ফলে বাঙালি শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে

থাকে। আন্দোলন-সংগ্রামের ফল হলো সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ উক্ত সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অনবরত চেষ্টা চালায়। অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যই ছিল ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। ফলে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও বাঙালির পারস্পরিক চাওয়ার বৈপরিত্যের ফলে একটা দ্বান্দ্বিক ভাব পুরো আমলেই ছিল।
৬০-এর দশকে এ ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বাঙালিত্ব বোধ একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। এ ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে এই বোধটি পরিপুষ্ট হলো–আমরা পাকিস্তানি, একইসাথে বাঙালিও। ১৯৫২ সালে বাঙালির সংস্কৃতির ওপর বড়ো ধরনের অভিঘাত নেমে আসে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির মধ্যে এই উপলব্ধি আসে, তারা যে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তা আসলে অর্জিত হয় নি। তাই বাঙালি যখনই সুযোগ পায় তারা তখনই পাকিস্তানি শাসনের বিপক্ষে রায় দেন। উদাহরণ ৫৪-এর নির্বাচনে বাঙালিরা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে রায় দেন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পরাজয় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি বলে বার বার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে বাঙালির সকল ধরনের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেয়। বাঙালিরা পাকিস্তানিদের সামরিক শাসন মেনে না নিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য আন্দোলন করতে থাকে। এ সময় ছাত্র সংগঠনের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। ছাত্রদের মাধ্যমে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আন্দোলন।
১৯৬২ সাল থেকে পাকিস্তানের সামরিক শাসন গণপ্রতিরোধের মুখে পড়ে। সামরিক শাসনের বিরোধী শুরু হয়েছিল গণআন্দোলন। তারপর ধাপে ধাপে বিকশিত হয়–ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সর্বোপরি বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।[৮] বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে ৬ দফা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা এনে বাঙালির রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হন। বাঙালিত্বের বিকাশ, বাঙালিত্ব, রাষ্ট্র সাধনা বিষয়গুলোকে ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পরিবেশের মধ্যে বঙ্গবন্ধু কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এটা পূর্বপাকিস্তানের মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব।
ষাটের দশক আমাদের জাতীয়জীবনের প্রথম সুযোগের যুগ। মননচর্চার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বাঙালির অগ্রসর হতে থাকে। ফলে এই দশকের শুরু থেকেই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন সহ জাতীয়জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালির সাথে যে বৈষম্য তা সকলের সামনে চলে আসে। বিশেষ করে ষাটের দশকে শক্তিশালী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। যারা শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অচিরেই এই শ্রেণি উপলব্ধি করলো তারা বঞ্চিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে শাসকশ্রেণির দ্বারা। চাকরিতে তাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না, দিলেও বড়ো পদে যেতে দেওয়া হয়। ফলে তাদের আর্থিক জীবনে একটা সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় যা পারিবারিক জীবনে নানা সংকটের জন্ম দেয়। শাসকগোষ্ঠীর শোষণে শহরের নানাস্তরের মধ্যবিত্তদের জীবনে নেমে আসে সংকট। নির্মম অসহায়তার শিকার হয় শহরের নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন শ্রমজীবী শ্রেণি। শহরের বিকাশোন্মুখ মধ্যবিত্তের বিকাশও ব্যাহত হয়। শাসকশ্রেণি ও তাদের সহযোগীগোষ্ঠীর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে দেশবাসী। শুধু তাই নয়, জোতদার, মাতব্বর ও মৌলিক গণতন্ত্রীদের দৌরাত্ম্যে-দাপটে জনজীবনে নেমে আসে নানাবিধ সংকট। জোতদার মাতব্বরদের নানারূপ অত্যাচার ও খাজনা বৃদ্ধিতে, মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুর্নীতি ও দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক জনজীবন। এই প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে। ফলে কৃষকরাও ধীরে ধীরে শহরের শ্রমিকদের মতো অংশ নিচ্ছে আন্দোলনে। অর্থাৎ এই পরিস্থিতিতে শহর-গঞ্জ গ্রাম সর্বত্রই জনজীবনে জমতে থাকে ক্ষোভ। ফলে, এই ক্ষোভ থেকে তারা হয়ে উঠেছে গণ-আন্দোলনের সমর্থক। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে।
ষাটের দশকের যে স্ফুরণ তা ধারণ করে তরুণরা। তারা বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চাপেও রেখেছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে। সবক্ষেত্রে যে এই রকমা ঘটনা ঘটেছে তা নয়। বিদ্যমান আর্থিক পরিস্থিতির সুযোগ না পেয়েও মধ্যবিত্তের একটি অংশ আবার ভীষণভাবে ছিল আন্দোলনবিমুখ। এদের কারও কারও কাছে ঘৃণার বিষয়ও এ-সব আন্দোলন। এ

অবস্থাটি শুধু যে বয়স্ক প্রবীণদের মধ্যে দেখা গিয়েছে তা নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত সন্তানদের অংশ বিশেষের মধ্যেও তা লক্ষণীয়। তারাও আন্দোলন বিরোধী এবং স্থিতাবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিসন্ধানী। কিন্তু ধীরে ধীরে এই বিমুখ অংশের অনেককে দ্রুত সচেতন হয়ে উঠতে দেখা যায়। আন্দোলনে আগ্রহী হয়ে ওঠে অনেকে এবং সক্রিয় অংশও নেয় তাদের কেউ কেউ। আবার আন্দোলনে আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ বৈষয়িক বিবেচনায় পারিবারিক সদস্যদের আন্দোলনে মেতে ওঠার ব্যাপরটি মেনে নিতে পারছে না। কোনো কোনো পরিবার আবার এ ব্যাপারে একেবারেই ভ্রুক্ষেপহীন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিতা-মাতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার জন্য সন্তানদের উৎসাহ জোগাচ্ছেন।

ষাটের দশকের আন্দোলন-সংগ্রামে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় সবাই সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৮-৬৯-এর গণ-আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে ছাত্রদের আন্দোলনই প্রাধান্য পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশে দেশে বঞ্চিত মানুষের পক্ষে প্রগতিশীল শক্তি বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও মুক্তিসংগ্রাম থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে। যা তাদেরকে সাহস ও প্রেরণা যোগায়। এ সময় পৃথিবীব্যাপী একটা উদারনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। এই পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে পরাধীন জাতিগুলো নিজেদেরকে স্বাধীনতার দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর করে। এই সময় স্বাধীন হয় এশিয়া ও আফ্রিকার[৯] অনেকগুলো দেশ। এই জাতিসমূহের স্বাধীনতার সংগ্রামের দ্বারা বাঙালিরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাই আমরা দেখি কঙ্গোর প্রতিষ্ঠাতা প্যাট্রিস লুমুম্বা কিংবা মাও সেতুংকে নিয়ে বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকরা লিখছেন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো ষড়যন্ত্র করে লুমুম্বাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। লুমুম্বার হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বে প্রচণ্ড ঘৃণা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কঙ্গোর বিপ্লবে অংশ নিতে কিউবা থেকে ছুটে এসেছিলেন চেগুয়েভারা ও কিউবার কমরেডরা।[১০] আসাদ চৌধুরী এ নিয়ে লিখেছিলেন এক অসাধারণ কবিতা 'ইতিহাসের আরেক নায়ক।' আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রাম বাংলাদেশেও নতুন প্রজন্মকে কতোটা স্পর্শ করেছিল তা প্রামণিত হয় ঐ সময়ে রণেশ দাশ গুপ্ত *দৈনিক সংবাদের* উপসম্পাদকীয় পাতায় আসাদ চৌধুরীর কবিতাটি ছাপিয়েছিলেন। শুধু আফ্রিকান নেতার মৃত্যু পত্রিকার খবরেই সীমাবদ্ধ থাকে নি তা বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে তা প্রেরণা জোগায়।

ষাটের দশকে ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বীভৎস ও বর্বর ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এ সময় ভিয়েতনাম ছিল বিশ্বব্যাপী প্রতিদিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতার সংবাদ। ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এমনকি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল বাংলাদেশেও। আইয়ুব সরকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে কমিউনিস্ট উস্কানি বলে আখ্যায়িত করে দমন করতে চেয়েছিল। এ সম্পর্কে হায়দার আকবর খান রনো বলেন, সেই সময় আমরা স্লোগান দিতাম, 'আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম-ভিয়েতনাম।' বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের মাও সে-তুঙ আর হো চি মিন তরুণদের মনে প্রবল আবেগ তৈরি করেছিল।

কবি-সাহিত্যিকদের লেখনি বাঙালি তরুণদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে, ছাত্ররা দেশবাসীকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করতে চেষ্টা করেছে। এদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে পাকিস্তানের জন্মসূত্রের ফাঁক ও ফাঁকি। ফলে এসব আন্দোলনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির পাশাপাশি তারা স্বাধীন পূর্ববাংলার দাবিও তুলে ধরে। তাদের সাথে একত্ব হয়ে কৃষক শ্রমিক জনতা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী আন্দোলন-সংগ্রামকে সহজভাবে নেয় নি। তাই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠী কারফিউ, সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা সহ বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ঘোষণার পর বাঙালির মধ্যে যে স্বাধীনতার তৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছিলো তা এইসব বাধাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। বাঙালিরা স্লোগান তোলে 'কারফিউ ভাঙব, রাস্তায় নামব।'

ষাটের দশকে যে রাজনৈতিক কার্যক্রম তা সাহিত্য ও শিল্পের এই মাধ্যমগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে যে বিশেষ শ্রেণির সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার অবলম্বন ছিল এদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংগ্রাম। অর্থাৎ পূর্ববাংলার প্রবহমান ঐতিহ্য, লোকজ জীবন, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শহিদ দিবস ও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে বিষয় কেন্দ্র করে রচিত জাতীয়তাবাদী-চেতনামূলক কবিতা। এই ধরনে রচনার সূচনা হয় ১৯৫২

সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে। এই ধারার বিকাশে আরও বৈচিত্র্য ও গভীরতা এসেছে শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে রচিত কবিতাসমূহের মাধ্যমে। এ কবিতাগুলোয় মুখ্য হয়েছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবাদী বক্তব্য; বাংলাভাষা সংস্কারের মুখে রচিত হয়েছে আবেগোদ্বেল কবিতা, পূর্ববাংলার জনজীবনের দুর্দশাকে কবিগণ কবিতায় এনেছেন বেদনা ও দরদের সঙ্গে, কেউ কেউ লোকায়ত ঐতিহ্যকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে উপজীব্য করেছেন বাংলার প্রাণশাক্তিকে উপলব্ধি ও আবিষ্কারের আশায়। সমাজে পরিবর্তন নিয়ে আসার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও গণজাগরণমূলক সাহিত্য রচিত হয়েছে এ সময়। লেখকগণ এ ধরনের সাহিত্য রচনা করেছেন অন্যায়-অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে। ভাষা আন্দোলনের পর এই ধারার সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বাঙালিত্বের বিকাশ ও জাগরণ ধীরে ধীরে পরিস্ফুটিত হতে থাকে। এরপর থেকে বাঙালিত্বের যে প্রভাব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিদ্যমান ছিল তা ধীরে ধীরে দৃশ্যমান ও স্পষ্ট হতে থাকে। অপরদিকে, ধর্ম ও পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে '৪৭ সালের আগে থেকে সাহিত্য রচনা হতে থাকে। একইসাথে বাঙালিত্বের বিকাশমান ধারাকে অবদমন করার জন্য আবার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লেখকগণ আরও বেশি করে পাকিস্তানকেন্দ্রিক ও ধর্মকে কেন্দ্র করে রচনা করতে থাকে। ফলে দ্বান্দ্বিকরূপ আরও স্পষ্ট হয় এবং শেষ অবধি বাঙালিত্বের প্রভাব বেশি প্রসারিত হয় তা বাঙালিকে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

উনসত্তরের অভ্যুত্থানের পর সত্তর সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বঠঢ়নে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে।[১১] বাঙালিরা এ সম্পর্কে সজাগ ছিল। তাদের কাছে মনে হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা এখন অর্থহীন ও অপমানজনক। পাকিস্তানি শোষকদের কবি সিকান্দার আবু জাফর বাংলা ছাড়ার আদেশ দিচ্ছেন এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ভার তুলে নেওয়ার কথা বলেছেন 'বাংলা ছাড়ো' কবিতায় :

> কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে
> কেউটে সাপের ঝাঁপি!
> আমার হাতেই নিলাম আমার
> নির্ভরতার চাবি; তুমি আমার আকাশ থেকে
> সরাও তোমার ছায়া,
> তুমি বাংলা ছাড়ো।[১২]

কবি উনসত্তরের অভ্যুত্থানের সময় *বাংলা ছাড়ো* কাব্যগ্রন্থের 'বাংলা ছাড়ো' কবিতার একটি অংশ লেখেন। শোষণকারীর মুখোশ কবির কাছে খুলে গেছে। বিগত বছরগুলোর তিক্ত এবং বেদনাময় স্মৃতি কবির মনে যে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে সেই সমস্ত বেদনা এবং ঘৃণার আগুন একত্র হয়ে যেন 'বাঙলা ছাড়ো'র প্রথম স্তবকে জ্বলে উঠেছে।[১৩] পরবর্তী সময়ে এটি আর কবির কথা হয়ে থাকেনি, বাংলা জনগণের কথা কবির কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে। শ্লোকগুলো কবির কলম থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে বাঙালি নিজের করে নিয়েছিল। এই কবিতার মাধ্যমে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বাঙালির ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালির একাত্মতার স্বপ্ন যখন মিলিয়ে গেল, প্রীতির বিনিময়ে বাঙালিরা যখন পেল প্রতারণা; খরা ও হতাশা যখন স্থায়ী হতে শুরু করলো, তখন শেষবারের মতো এদেশের মানুষ মাথাচাড়া দিয়ে ডাক দিলো–তোমরা বাংলা ছেড়ে যাও। উনসত্তর পরবর্তী সময়ে সংঘটিত আন্দোলন-সংগ্রামে এই কবিতাটা প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করেছে। বলা যায় 'বাংলা ছাড়ো' কবিতাটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার কাব্য-ভিত্তি রচনা করেছিলেন।[১৪]

আবার উল্টো দিকে রাজনীতিও শিল্প-সাহিত্যের শাখাগুলোকে প্রভাবিত করেছিল। ৭ই মার্চের ভাষণ সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। কবিগণ ৭ই মার্চ নিয়ে কবিতা লিখেন। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে যে ভাষণ দেন তাঁর মুখ থেকে বাণী আকারে বের হওয়ার সাথে তা জনগণের হয়ে যায়। কবি জসীম উদ্‌দীন ১৬ মার্চ রেডিওতে নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি করেন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর লেখা তাঁর কবিতা।

মুজিবুর রহমান
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।
বঙ্গদেশের এ-প্রান্তে হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে,
জ্বালায় জ্বলিয়ে মহাকালানল ঝঞ্ঝ-অশনি বেয়ে
… … …
জীবন দানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনানী পাছে,
তোমার হুকুম তামিলে লাগি সাথে তব চলিয়াছে।
রাজ ভয় আর কারাশৃঙ্খল হেলায় করেছে জয়
ফাঁসির মঞ্চে মহত্ত্ব তব কখনো হয়নি ক্ষয়।
বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ,
প্রতি বাঙালীর হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার তক্ত-তাজ।
তোমার একটি আঙুল হেলনে অচল সে সরকার
অফিসে অফিসে তালা লেগেছে গেছে-স্তব্ধ হুকুমদার।[১৫]

এইভাবে পুরো ষাটের দশকে কখনও সাহিত্য রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে, আবার কখনও রাজনীতি হয়ে ওঠেছে সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। কখনওবা সমান্তরালভাবেই চলে রাজনীতি ও সাহিত্য। তাই দেখা যায় ১৯৬২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশকে স্বাধীন করা জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রি জহওরলাল নেহেরুর সাথে যোগাযোগ করছে, ঠিক একই সময় কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখছেন 'স্বাধীনতা' কবিতাটি। একই সময়ে সমান্তরালভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাহিত্যিকগণ স্বাধীনতার কথা বলছেন বা ভাবছেন। এর অর্থ হলো সমাজ সার্বিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হওয়া শুরু করেছিল। তাই রাজনীতিক, শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের ভাবনা এক বিন্দুতে উপনীত হয়েছিল।

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি পূর্ববাংলার বেশিরভাগ সংবাদপত্র একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনেও এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এরপর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬ দফা এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে সংবাদপত্র ছিল পূর্ব বাংলার জনসাধারণের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। অর্থাৎ ষাটের দশকে শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র সাধারণ মানুষকে জাগানোর চেষ্টা করেছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে *দৈনিক ইত্তেফাক* এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বহুবার কারা নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু কোনো নির্যাতনই তাঁকে ও তাঁর দৈনিক পত্রিকা *ইত্তেফাক*কে বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।[১৬] শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬২ সালে জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেখানে বলা হয়েছিল, 'মানিক মিয়া ঢাকায় থেকে নিয়মিত স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও দাবি নিয়ে ইত্তেফাকে লিখে জনগণকে প্রস্তুত করবে'।[১৭] শেখ মুজিবুর রহমান *ইত্তেফাক*কে ঘিরে যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা সফল হওয়ায় মূলত পত্রিকাটি সরকারের তোপের মুখে পড়ে। তারপরেও সংবাদপত্র বাংলার মানুষকে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। ১৯৬৪ সালের ১৭ জানুয়ারি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে *ইত্তেফাক*, *আজাদ* ও *সংবাদে*র প্রথম পৃষ্ঠায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়ে দাঁড়াও' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। শুধু সংবাদপত্রকর্মীরা সংবাদ প্রচার করে ক্ষান্ত হননি তারা আইয়ুববিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে সভাপতি করে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন।[১৮] শাসকশ্রেণির দমনপীড়নের মুখে যেসব পত্রিকা জনগণের কথা লিখেছে তাদের ওপর নেমে এসেছে নিষেধাজ্ঞার খড়ুগ। ৭ জুনের হরতাল সম্পর্কে খবর প্রকাশের কারণে ১৭ জুন (১৯৬৬) *দৈনিক ইত্তেফাক*কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আগের দিন *ইত্তেফাক* সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকেও সরকার পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে।[১৯] সংবাদপত্রের ওপর শাসকগোষ্ঠীর এই আচরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে থাকে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি সৃষ্টিতে সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইসাথে সরকারসমর্থিত পত্রিকাগুলো বাঙালিত্বের বিপক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টির মাধ্যমে ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে। পরস্পরবিরোধী সংবাদ, প্রতিবেদন, উপসম্পাদকীয় ও সম্পাদকীয় মাধ্যমে জনগণকে নিজেদের পক্ষে রাখার চেষ্টা করা হয়।

সরকারি খরচে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণায় শত শত বিচিত্র সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিকী এধারাকে পুষ্টি জোগালেও শিক্ষিত সমাজে পাকিস্তানি আদর্শবাদীদের ভ্রান্তি বড়ো হয়ে ধরা পড়েছিল। ক্রমে একশ্রেণির লেখক-সম্পাদক পৃষ্ঠপোষক উদারনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। তরুণদলের মুখপত্র কম থাকায় তাঁরাও এঁদের সাথে মানবতাবাদ এবং সাধারণভাবে গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করে লেখা শুরু করলেন।[২০] সরকারি অপকৌশলের প্রতিবাদে সবসময়ই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে ছাত্রসমাজ ও তরুণদের ছোটো ছোটো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। নতুন চিন্তাধারার পরিচয় বহনকারী এসব সংকলনেই বিধৃত আছে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্বরূপ। এসব সংকলন লিটল ম্যাগাজিন বলে পরিচত।[২১] ষাটের দশকে *লিটল ম্যাগাজিন*গুলোকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-আন্দোলন শুরু হয়। সেসময় মানুষের চেতনাজগতে স্বতন্ত্রধর্মী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা সাহিত্যেও প্রভাব ফেলে। *লিটল ম্যাগাজিন* নবচেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং লেখক ও পাঠকদের মধ্যে নবচেতনাকে সঞ্চারিত করে। এই পরস্পরবিরোধিতা পূর্ববাংলার মানুষের অর্থাৎ বাঙালির মানসগঠন ও জনমত সংগঠন করে, যা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে।

সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে মানুষের সব ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপকরণ হিসেবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্তুগত তথা সৃজনশীল ও নান্দনিক সাংস্কৃতিক চর্চা হয়ে ওঠে প্রধান। তাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চেয়ে ক্ষেত্রবিশেষে সংগীত, নাটক, কবিতা-আবৃত্তি, সাংস্কৃতিক উৎসব, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্য, দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্য; চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক, গণসংগীত, নৃত্যকলা, যাত্রা, বেতার ও কবিতা-আবৃত্তি প্রভৃতি প্রভৃতি মানুষকে দ্রুত নাড়া দেয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে এবং অনড় থাকতে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তির সাথে একাত্ম বোধ করে। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (বিএনআর)-কে সরকার কাজে লাগিয়ে শিল্পকলাকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। শিল্পীরা সরকারের এই প্রভাব কাটিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করে গণমুখী শিল্পসৃষ্টির চেষ্টা করে। অর্থাৎ ডানপন্থি রক্ষণশীল তথা পাকিস্তানবাদী মতাদর্শের অপর একটি সাংস্কৃতিক তৎপরতা পূর্ব বাংলায় বরাবর বিদ্যমান থাকলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল ধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলনই প্রধানতম রূপে প্রস্ফুটিত হয়। শিল্পীগণ তাদের সৃষ্টিকর্মে সমকালীন সামাজিক বৈষম্য, ধনবৈষম্য এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে তার প্রতি আঘাত করেন। শিল্পীগণ নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করেন। তাদের উজ্জ্বল কর্মতৎপরতাতেই বাংলাদেশকেন্দ্রিক মানসগঠন সহজতর হয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন উন্নততর হয়। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছর সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রই প্রস্তুত করে নি, কখনও কখনও রাজনৈতিক সংগ্রামের বিকল্প হিসেবেও কাজ করেছে। পূর্ব বাংলার মানুষের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সফল বিজয় অর্জন পর্যন্ত সর্বত্র সাংস্কৃতিক সংগ্রামের উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল।[২২]

বাঙালিত্ব ও পাকিস্তানিবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মূলত দার্শনিক। সামন্তবাদী পাকিস্তানি শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে বাঙালি এই সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেরিয়ে এসে মানবতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শিল্পসংস্কৃতিতে সামন্তবাদী ও ধর্মীয় জীবনভাবনা ও মূল্যবোধের প্রাধান্য ছিল। বাঙালিরা নিজেদের শিল্প ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তার মাধ্যমে আত্মসঞ্জীবনের চেষ্টা করে। এজন্যে অনেকগুলো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন পঞ্চাশের দশকে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলে। যার ভিত্তিতে বাঙালি নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করে। একাজে কেন্দ্রের ভূমিকাকে পরিপুষ্ট, প্রবল ও প্রভাবিত করে প্রান্তের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও সংগঠনসমূহ।

এইসব সম্মেলন ও সংগঠনসমূহ সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তোলে। যা অন্তিমে বাঙালিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে প্রেরণা জোগায়। এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রান্ত ও কেন্দ্র যেমন একে অপরকে প্রভাবিত করে, তেমনি রাজনীতিকেও সমানভাবে প্রভাবিত করে। গ্রামীণ বৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা এই দেশের সন্তান তাদের দেশের রাজনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার অদম্য স্পৃহাই প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠককে উজ্জীবিত করেছিল সংস্কৃতি সম্মেলন আয়োজনে। দেশজ সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে জাতিগত ও শ্রেণি নিপীড়নকে উৎখাত করতে সংস্কৃতিক আন্দোলনসমূহ রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রাণিত করেছিল, যা বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণের ও সাংস্কৃতিক ভিত ভূমি। এই সম্মেলনগুলো বাঙালির মানসগঠনে ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ একদিকে সামন্তবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থ ও দর্শন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা, অন্যদিকে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে এই চাপিয়ে দেওয়া দর্শনের বিপরীতে নিজেদের অবস্থান জানান দেন এবং গড়ে তোলে প্রতিরোধ। এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব বাঙালি সমাজে নতুন উপলব্ধির জন্ম দেয়। একসময় বাঙালিদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বাঙালির মধ্যে নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক যে বোধ তৈরি হয় তা বাঙালিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যায়। বিশশতকের ষাটের দশকে এধারা সম্পর্কে মুস্তফা নূরউল ইসলাম বলেন, '...যতই সময় গড়াচ্ছে প্রতিবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন আর প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন কেমন এক স্রোতোধারায় মেশামেশি হয়ে যাচ্ছে। দিশা বাঙালিত্ব অর্জনের সঙ্গম তীর্থমুখে।'[২৩] পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে আসা অভিঘাতগুলো পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির আলাদা এই বোধটা তৈরি হয়। বাঙালি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তারা কোনোভাবেই পাকিস্তানিদের সাথে থাকতে পারে না। কারণ পাকিস্তানিরা বাঙালির ভালো চায় না। একই ধর্মের হওয়া সত্ত্বে জাতিগত বাঙালি ছিল ভিন্ন। পাকিস্তানিরা প্রতিনিয়ত বাঙালিকে শোষণ করে যাচ্ছিল। একইসাথে বাঙালির সংস্কৃতির কোনো কিছু ওপর তাদের সম্মান বোধ ছিল না। শুরু হয়ে যায় বিদ্রোহ। এর প্রত্যক্ষ ফল ৬৯ অভ্যুত্থান এবং চূড়ান্ত ফল ৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে পূর্ব বাংলাবাসী বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ থেকে মুক্তির পক্ষের রায় দিয়েছে। নয়তো বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মতো গণযুদ্ধে যেতে পারতো না।

কাজী নজরুল ইসলাম 'বাঙালির বাঙলা' প্রবন্ধে বলেছিলেন, "বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে–'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে।"[২৪] কবি কাজী নজরুলের সেই ঐক্যের আশা পূর্ণ হলো ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্য দিয়ে। এই রকম ঐক্যবদ্ধ বাঙালি কখনো হয়নি।[২৫] বাঙালি দীর্ঘ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে সেই জায়গায় উপনীত হয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি নজরুলের সেই 'অসাধ্য সাধন' করে লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। বাংলাকে নিজের করে পায়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকাভাষ্য

[১] হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. পূর্বকথন

[২] বাংলাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ধারায় রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন।

[৩] আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ২৪১

[৪] আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, *আমরা বাংলাদেশী, না বাঙালি*, অক্ষরবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২০-২১

[৫] '১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পরেই অসাম্প্রদায়িকতার প্রতি সচেতনভাবে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম, ১৯৫৩ গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দের বর্জন–এসবই এক্ষেত্রে একেকটা মাইলফলকের মতো। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রাচনার কালে আওয়ামী লীগের নেতারা রাষ্ট্রের ইসলামি প্রজাতন্ত্র নামকরণে আপত্তি জানান ...'*

বঙ্গবন্ধু যিনি বাঙালি জাতির জনক। তিনি রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে যখন স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান গ্রহণ করা হলো তখন এ বিষয়টিতে পরিপূর্ণতা নিয়ে আসেন। তিনি সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ছক দেন তা অসাম্প্রদায়িকতার উন্নতরূপ। ৭২-এর সংবিধান গ্রহণের দিন প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, '... ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবে না। ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম করবে তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে নিয়ে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন ব্যাভিচার-এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পরিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।' *২

* আনিসুজ্জামান, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি', *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

*২ মোনায়েম সরকার, *বাঙালির কণ্ঠ*, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪০-৩৫৪

[৬] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৪

[৭] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৯

[৮] *আমাদের বুধবার*, ২৩ জুলাই, ২০১৪

[৯] ষাটের দশকে এশিয়া ও আফ্রিকার যে দেশগুলো স্বাধীন হয় তারা তালিকা–

১৯৬০-দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, ক্যামেরুন, সাইপ্রাস, নাইজার, চাঁদ, নাইজেরিয়া, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, টোগো, মালি, সোমালিয়া, লেসেথো, মাদাগাস্কার, কঙ্গো, গণতান্ত্রিক কঙ্গো, আইভরিকোষ্ট, বারকিনো, গ্যাবন ও বেনিন।

১৯৬১-তাঞ্জানিয়া, কুয়েত, মঙ্গোলিয়া, সিয়েরা ও লিওন।

১৯৬২-রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি ও সানমেরিনো, আলজেরিয়া, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, উগান্ডা, পশ্চিম সামোয়া, কেউম্যান ও দ্বীপপুঞ্জ।

১৯৬৩-কেনিয়া।

১৯৬৪-জাম্বিয়া, মাল্টা ও মালাউই।

১৯৬৫-সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ, গাম্বিয়া।

১৯৬৭-ইয়েমেন।

১৯৬৮-সোয়াজিল্যান্ড, নিরক্ষীয় গিনি, মরিশাস।

১৯৭০-ফিজি ও টোঙ্গা।

[১০] হায়দার আকবর খান রনো, *উত্তাল ষাটের দশক*, পুথিনিলয়, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৮

[১১] মুজিবর রহমান (সংকলক ও সম্পাদক), *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার কথা*, রাঢ়বঙ্গ প্রকাশনী, রাজশাহী, ২০১৫, পৃ.১২৮

[১২] সিকান্দার আবু জাফর, *বাংলা ছাড়ো*, মাটিগন্ধা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬২

সিকান্দার আব জাফরের 'বাংলা ছাড়ো' কাব্যের কবিতাগুলো রচনা শুরু হয় উনসত্তরের অভ্যুত্থানের সময়। সর্বশেষ কবিতাটি রচিত হয়েছে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে।*২

*২ সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩০২

[১৩] মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৯

[১৪] আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. আটাইশ

[১৫] মো. সালা উদ্দিন, 'কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : একটি পর্যালোচনা', (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ), পৃ. ২-৩

[১৬] মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৭

[১৭] মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৬

[১৮] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ ১৯৯৪, পৃ. ১১৪-১১৫

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

[20] ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২০

[21] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[22] বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৫-১৬

[23] মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *নিবেদন ইতি, উত্তর খণ্ড*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১২

[24] শামসুজ্জামান খান, হাবীব-উল-আলম, ওবায়দুল ইসলাম, মোবারক হোসেন (সম্পা.), *একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯৫*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৯

[25] বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি এই ঐক্য অর্জন করেছিল। তার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই, '১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ হলো যেখানে বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত থেকেও ছিলেন উপস্থিত।' এটা সম্ভব হয়েছিল বাঙালি ঐক্যবদ্ধ থাকায়। ১৯৪৭ সালে বাঙালির যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, বলা যেতে পারে সেই যাত্রার সমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

পরিশিষ্ট ১

বাঙালির বাঙলা

কাজী নজরুল ইসলাম

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হতে বলতে পারবে– "বাঙালির বাংলা" সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট-সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছান্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তমসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে হয়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়, দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয় বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তমকে শাসন করতে পারে একমাত্র রজগুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্ষি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ব-বিজয়ী ব্রক্ষশক্তি আছে তা তাকে তমগুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংহার করে ফেলে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগলো না বলে দিব্যশক্তি কোনো কাজে লাগলো না– বাঙালির চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদইগরণ করলো না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণান্বিত। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ। সত্ত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ত্ব গুণের প্রধান শত্রু তমগুণকে প্রবল ক্ষাত্রশক্তি দমন করে। অর্থাৎ, আলস্য, কর্ম-বিমুখতা, পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবনশক্তিকে চির-জাগ্রত রাখে, যৌবলকে নিত্য তেজ-প্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য অবিশ্বাস, জরা ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালি মস্তিস্ক ও হৃদয় ব্রক্ষমন কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঋণে, ব্যাধিতে, অভাবে, দৈন্যে, দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মত জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈবশক্তির লীলা-নিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হৃদ-গুহার অন্তর স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ-নদী রূপে আমাদের মাঠে-ঘাটে ঝরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জন নিত্য প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য উর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা পলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ– আল্লাহ, ভগবানের উপাসনা, উপবাস-উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনো ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণ- রেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায়? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃ-ভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্ম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশী লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ তো করি না, উল্‌টো তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লিখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র সহস্র ফকির-দরবেশ ওলী গাজীর দর্গা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই

স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতামন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের, কর্ম-বিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে তারাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর বলেন বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আজ নিরক্ষর বিদেশীর দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সারা দেহমনে আসে প্রলয়েল কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রুজল। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ মেঘ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র বৃষ্টিধারায় ঝড়ে পড়ে, শ্যামায়মান অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ-শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে,– হার তারা এই অপমান এই দাসত্ব বিদেশী দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কি করে সহ্য করে? ঐশী ঐশ্বর্য– যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে বিসর্জন করে অর্জন করেছি এই দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব, লাঞ্ছনা। বাঙালি সৈনিক হতে পারল না। ক্ষাত্র শক্তিকে অবহেলা করলো বলে তার এই দুর্গতি তার অভিশাপ্তের জীবন্ তার মাঠের ধান পাট রবি ফসল তার সোনা তামা লোহা কয়লা– তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশী দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বেস দেখে। বলতে পারে না "এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য! খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে– তাকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে বিনাশ করবো, সংহার করবো।"

'বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :

"এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির-আমাদের।
দিয়া প্রহারেণ ধনঞ্জয়
তাড়াব আমার কবি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।"

বাঙলা বাঙালির হোক। বাঙলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক।

নবযুগ, ৩রা বৈশাখ, ১৩৪৯

শামসুজ্জামান খান, হাবীব-উল-আলম, ওবায়দুল ইসলাম, মোবারক হোসেন (সম্পা.), *একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯৫*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৯-১১

পরিশিষ্ট ২

কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল
অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ
মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

সমবেত আমার প্রিয় কাউন্সিলরগণ। প্রায় এক বৎসর পর আমরা আবার সমবেত হয়েছি। ঢাকার রঙমহলে অনুষ্ঠিত বিগত অধিবেশনের পর আওয়ামী লীগ ছিল বিরোধী দলে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন আবু হোসেন মন্ত্রিসভা কায়েম। কেন্দ্রেও তখন চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ কৃষক-শ্রমিক মন্ত্রিসভা ক্ষমতার আসনে আসীন। এখন আর সে অবস্থা

নেই। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন। কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা কায়েম।

দীর্ঘ নয় বৎসর ধরে ক্রমাগত সংগ্রাম করার পর এই সর্ব প্রথম আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা পেলো। এ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়, অন্যান্য দলের সহযোগিতা নিতে হয়েছে ক্ষমতা পেতে। তবু অনেকের মনে হতে পারে, আমরা বিরাট জয়লাভ করেছি। যা কিছু করণীয় সবই হয়েগেছে, মন্ত্রিরা দেশ শাসন করুক, আমরা বাড়িতে বিশ্রাম নেই।

বন্ধগণ, যদি কারও এরূপ ধারণা হয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ ভুল। এ ভুল যত শিগগির ভাঙে ততই মঙ্গল। আপনারা মুসলিম লীগের ইতিহাস বিস্মৃত হবেন না। একদা মুসলিম লীগ ছিল পাক-ভারতের মুসলমানদের সব চেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। পাকিস্তান কায়েম হবার পর ক্ষমতা ও মানমর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। অন্তত ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান কায়েম হবার পরে পাকিস্তানে অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। আমি নিজে ত বটেই, আজ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের অধিকাংশ মুসলিম লীগের সভ্য ছিলেন। জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল তখন মুসলিম লীগের উপর। পাকিস্তানকে শক্তিশালী সুদৃঢ় ও দুর্নীতি কালোবাজারি প্রভৃতি সর্বপ্রথম কলুষ থেকে মুক্ত করার, অপরিসীম আগ্রহ ও কর্মস্পৃহা তখন দেশের সকল শ্রেণির জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। সরকারি কর্মচারীগণ তখন ৮ ঘন্টার স্থলে প্রয়োজনবোধে ১৬ এমনকি ১৮ ঘন্টা খাটছেন। ঘুষখোরী, মুনাফাখোরী প্রভৃতি ভাটার পথে। মুসলিম লীগ দেশবাসীর এই অকুণ্ঠ কর্মস্পৃহা, নিঃস্বার্থ দেশসেবা ও বিপুল স্বদেশিকার বলে বলীয়ান। কিন্ত মাত্র নয়টি বৎসর না যেতেই আজ মুসলিম লীগ জনসাধারণের মন থেকে ধুয়ে মুছে গেল। এত বড় একটা রাজনৈতিক দলের এরূপ অপমৃত্যু পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিগত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের যে হার হয়েছে সেরূপ হার পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো কালে ক্ষমতাসীন দলের হয়নি।

কেন এমন হলো-কেন মুসলিম লীগের এমন শোচনীয় মৃত্যু হলো? আওয়ামী লীগ কর্তৃক কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতা অধিকারের পর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে যে অতন্দ্র দৃষ্টি এবং সর্বদা তীক্ষ্ণ প্রহরাধীন না রাখলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু যত শিগগির ডেকে আনে এত শিগগির আর কিছুতে আনে না। বিরোধী দল হিসাবে দু-একটা ভুল করলে সর্বসাধারণ অনেক সময় ক্ষমা কওে থাকে; কিন্তু ক্ষমতাসীন দল হিসাবে ভুল করলে সে ভুলের ক্ষমা নেই।

মুসলিম লীগ কী কী ভুল করেছিল তার একটা হিসাব নিলেই আমাদের পক্ষে সাবধান হওয়া সহজ হবে বলে নিম্নে আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে মুসলিম লীগের ভুলগুলি একে একে বলছি।

প্রথমত : ক্ষমতা তাঁদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। তার প্রমাণ পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি লোকের মতামতা না নিয়ে মুসলিম লীগ করাচীতে রাজধানী নিয়ে গেল, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করলো এবং সর্বোপরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ ও চাকুরি বন্টনে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে চললো।

দ্বিতীয়ত : তাঁরা ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনলেন। নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যার জন্ম সেই মুসলিম লীগের দোষক্রটির ন্যায্য সমালোচনাকে তাঁরা ইসলাম বিরোধিতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে জনমনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করবার প্রচেষ্টা মত্ত হলো।

তৃতীয়ত : মুসলিম লীগ নেতাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের কোনো অনুশাসন রক্ষিত হওয়ার নামমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত না হলেও, তাঁরা রাজনৈতিক সভা-সমিতিকে প্রধানত ধর্মমূলক ওয়াজ-নসীহতের জলসায় পরিণত করলেন।

চতুর্থত : মুসলমানের আল্লাহ এক, ধর্ম এক, রসুল এক এবং কেতা এক এই যুক্তিতে রাজনৈতিক দলও হবে এক বলে প্রচার চালালেন তাঁরা। একই যুক্তিতে তাঁরা বলে যেতে লাগলেন-বিরোধী দলমাত্রই রাষ্ট্রদ্রোহী।

পঞ্চমত : মুসলিম লীগের কর্ণধারগণ পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারি মনে করে নিজেদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি-বৃদ্ধিও জন্য স্বজনপ্রীতিতে গা ভাসিয়ে দিলেন। এ অবস্থা যখন সরকারি কর্মচারীগণের চোখে ধরা পড়লো তখন তাদের অনেকে সম্পদ লুণ্ঠনের কার্য্যে অবতীর্ণ হলেন। দুর্নীতি যে কেলেঙ্কারিজনক পর্যায়ে পৌছেছিল তার কিছু খবর ইদানীং খবরের কাগজে বের হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত একটি সংবাদে আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন পরলোকগত জনম গোলাম মুহম্মদের জামাতা জনাব হোসেন মালিক ফ্রান্স থেকে ওয়াগন কেনার নাম করে কীভাবে বিগত সাত আট বছর কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৬ লাখ টাকা নিজের ব্যক্তিগত তহবিল ভুক্ত করে রেখেছেন। ব্যাংকের সুদ শতকরা তিন টাকা করে ধরলেও ৪৬ লক্ষ টাকার সুদ বৎসরে ১৩৮ হাজার। সরকারি অর্থ দাদনের নজির আধুনিক বিশ্বে পাওয়া অসম্ভব। মধ্যযুগে যখন শাসক ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে সম্রাট তখনই শুধু সরকারি অর্থ এরূপভাবে নিজের ব্যক্তিগত কাজে লাগানো সম্ভব ছিল। বলাই বাহুল্য সেসব কার্য সরকারি কর্মচারীদের কাছে গোপন থাকে না, কাজেই তারাও ভ্রমণের নাম করে বিদেশে গিয়ে অর্জন করেছেন এবং সুইস, ভারতীয় প্রভৃতি ব্যাঙ্কে জমা করেছেন। পাকিস্তান হবার পর আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার মতো রাতারাতি অনেকেরই কপাল ফিরেছে। এদের মধ্যে মুসলিম লীগের নেতা, উপনেতা ও সরকারি কর্মচারী দুইই আছেন। তাদের সম্পত্তি কিভাবে অর্জিত হলো যদি তার তদন্ত কোনো দিন হয় তবে পাকিস্তানী লুণ্ঠনের যে চিত্র জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়বে তা অতীতে সমস্ত রাজনৈতিক অসততা, দুর্নীতি, ফেরেববাজি ও চুরি-চামারীকে হার মানাবে।

ষষ্ঠত : পাকিস্তানের মালিক হওয়া মুসলিম লীগ নেতাগণ নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতার সীমারেখা অতিক্রম করলেন। এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর মুসলমানদের সমাজ জীবন গোমরাহী ও মুর্খতায় নিমজ্জিত হয়। সেই গোমরাহী ও মুর্খতা থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে তারা প্রবেশ করতে থাকে মাত্র বিংশ শতকের দ্বিতীয় শতক থেকে। বস্তুতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে মাত্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক থেকে। সে গড়া আজও শেষ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে যদিও তা আজ অনেকটা সুদৃঢ়; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা আজও গড়ে নি। মুসলিম লীগ নেতাগণ এই ঐতিহাসিক সত্য ভুলে গেলেন। তাঁরা নিজেদের মনে করতে লাগলেন পরম ও চরম দক্ষতার অধিকারী ও নির্ভুল। ফলে অযোগ্যতার সঙ্গে অহমিকা বা ইংরাজীতে যাকে বলে এরাগেন্স তার মিশ্রণ হলো। বলাই বাহুল্য, মূর্খ যদি মূর্খতা স্বীকার করে নিয়ে অবতীর্ণ হয় এবং অপরের গঠনমূলক উপদেশাদি গ্রহণ করতে রাজি থাকে, তবে তা তেমন দৃষ্টিকটু হয় না। কিন্তু মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার মিশ্রণ একেবারেই অসহ্য।

সপ্তমত : মুসলিম লীগ অর্থনীতিকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেললেন। রাজনীতি অনেক সময় জনগণের ভাবালুতা কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু অর্থনীতি বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের একটি শাখা। সুতরাং ভাবালুতাভিত্তিক অর্থনীতি আধুনিক জগতে একেবারেই অচল। মুসলিম লীগ এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করে রাজনৈতিক মতামত ও ভাবালুতার দ্বারা দেশের অর্থনীতি পরিচালিত করতে লাগলেন। একাউনটেন্ট বা হিসাবরক্ষক বা পরীক্ষকদের তারা বড় বড় অর্থনীতিবিদ বলে ঠাউরে নিয়ে মূর্খতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মূল কথা হলো লাভলোকসান। চরম ও পরম শত্রুর সাথে লাভ হলে ব্যবসা করতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বিলাত থেকে জার্মানী প্রচুর সমরোপকরণ কিনেছিল।

আজকের দিনেও গ্রেটব্রিটেন কমিউনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য করছে। কিন্তু মুসলিম লীগের কর্ণধারগণ ব্যবসায় বাণিজ্যের মূলনীতি বিস্মৃত হয়ে ভারতে সঙ্গে কায়কারবার প্রায় বন্ধ করে দিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে বা অব্যবহিত পরে ভারত পাকিস্তান থেকে প্রায় বেল পাট ক্রয় করত। তুলাও ক্রয় করত পনের লাখ বেল। মুসলিম লীগের ভ্রমান্নকনীতি ভারতকে পাট চাষ বৃদ্ধি করতে বাধ্য করল। আজ ভারত আমাদের কাছ থেকে মাত্র দশ লাখ বেল পাট ক্রয় করছে। আমরা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার বহু কালের প্রবাদ অনুযায়ী পাটের মূল্য ঠিক রাখার জন্য পাট উৎপাদন কমাও নীতি অনুসরণ করলাম। ব্রিটেন রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার

রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বহুকাল ইতস্তত করেছে। মূর্খতা কতদূর অগ্রসর হতে পারে চিন্তা করে দেখুন। শুধু এসব করেই পাকিস্তানের একাউন্টেন্ট অর্থনীতি...

খান মাহবুব (সম্পা.), মওলানা ভাসানীর রচনা, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৯৯-২১২

পরিশিষ্ট ৩

রোডম্যাপের নকশা

শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারণা। বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুর অন্বেষণ

১৯৬২ সালের অক্টোবরে চীন সামরিকভাবে অপ্রস্তুত ভারত দখল করতে শাঁখের করাতের মত দ্বিমুখী আক্রমণ চালায়। পশ্চিমে আকসাই চীন ভেদ করে ভারতীয় প্রদেশ জন্মু ও কাশ্মিরের লাদাখ অঞ্চল এবং পূর্বে হিমালয় পর্বতমালা ও তিব্বতের মালভূমি পেরিয়ে অরুণাচল প্রদেশেল ভেতরে তেজপুর পর্যন্ত ১৯৬২ সালের অক্টোবর নাগাদ চীন দখল করে নেয়। ভারতীয় ভূখণ্ডের অনেক বড় একটি অংশে চীনের এই অবৈধ দখলদারিত্বে নয়াদিল্লী বিব্রত অবস্থায় পড়ে। পরাজয় ও ভূখণ্ড হারাবার এই ধাক্কা ভারতকে এতটাই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যে আজও প্রায় অর্ধশতক পরেও জাতি এখানো ভুলতে অথবা তাদের ক্ষমা করতেও প্রস্তুত নয় যে চীন কীভাবে ভারতের গৌরব এবং আত্মবিশ্বাসে আঘাত হেনেছিল। তার দুবছরের মধ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু, আন্তর্জাতিক কুশলী কূটনীতিবিদ হিসেবে যিনি সুপ্রসিদ্ধ, তিনি মৃত্যু বরণ করেন প্রধানত জাতির এই লজ্জার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত হতাশার কারণে। কৌশলগত ক্ষেত্রে যুদ্ধ থেকে ছিটকে যাবার পর পরপরই নয়া দিল্লীর সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ায় স্থিতাবস্থা আসে। ফলশ্রুতিতে ভারত চীন সম্পর্কিত কূটনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যা সেরে উঠতে অনেক বছর লেগে যায়। এখন পর্যন্ত তাা আংশিক অর্জিত হয়েছে। ভারতের প্রতি চীনের ইতিবাচক মনোভাগ বিগত বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু পুরোপুরি সহায়ক হয় নি।

স্বতঃস্ফূর্ত নয়, একটি প্রতিক্রিয়াপ্রবণ রাষ্ট্র হিসেবে চীনা দখলদারিত্বের বিষয়টি ভারতের জন্য ছিল ঘুম ভাঙ্গার গান।

চীন-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী ৩ মাসে যখন ভারতের আত্মদর্শন চলছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতাপশালী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর মাথায় দেশের মানুষের মুক্তির বিপ্লবী চিন্তা-ধারণা লালন করতে শুরু করেন। দক্ষিণ এশিয়ার এই শত্রুভাবান্ন ও জটিল পরিস্থিতিতে তার পরিকল্পনা কতখানি কার্যকরী হতে তাই নিয়ে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন।

তাঁর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে তিনি সাহায্য ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্য কার কাছে যাবেন তা নির্ধারণ করা। উল্লেখ্য, তিনি আসলেই জানতেন যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তির এই সংগ্রামের সফল সমাপ্তি সম্ভব নয়। তার ঘাড়ে তখন নিপীড়নকারী সামরিক একনায়কতন্ত্র ও দেশের মানিতে তৈরি বিপ্লবী এক সাথে ঝুলে ছিল। মুজিবের তাই প্রয়োজন ছিল বৃহৎ শক্তির সমর্থন। মুজিবের কৌশলগত চিন্তা ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার বলে বলীয়াণ। এই সম্পদেও সর্বোচ্চ ব্যবহারে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন মুক্তির সংগ্রামে কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র হতে পারে। তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে মিত্র যেই হোক না কেন বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের কৌশলে যেন একটি বিস্তৃত আন্তর্জাতিক অবস্থান থাকে। স্নায়ুযুদ্ধ ছিল তখন সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ।

মুজিবের ভয় ছিল পাকিস্তানের কৌশলগত মিত্র চীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মুক্তি নিয়ে তাঁর যে স্বপ্ন তা ধ্বংস করার কোন সুযোগ ছাড়বে না। তার মতানুসারে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে মুক্ত হতে হবে পাঞ্জাব পারিচালিত নিপীড়ক সামরিক

একনায়কতন্ত্রের কবল থেকে যা অনেকদূরে অবস্থিত রাওয়ালপিন্ডি থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মুজিব ঝুঁকির মুখে দমে যাবার পাত্র ছিলেন না, তিনি ঝুঁকি নিতে জানতেন।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ ভারতের জন্য ছিল ঘুম ভাঙ্গার ডাক। নয়াদিল্লী সেই সময় তার কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। এই পরিস্থিতি মুজিবকে সুযোগ করে দেয় ভারতের সামনে এক অভিনব ও পূর্বে অপরীক্ষিত এক নীতি উপস্থাপনের– যা ছিল বাঙালাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন। এই সাহসী চিন্তা যাকে বলা যেতে পারে 'মুজিব স্পেশাল' মুজিবকে হুট করেই নিয়তি নির্ধারক করে তোলে।

একথা চিন্তা করা ভুল হবে যে মুজিব একরকম তাড়াহুড়ো করেই ১৯৬২ সালে স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজাতে মনস্থির করেছিলেন। এমন নয় যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধেও চাকে ঢিল ছুড়লে যে ঝামেলা হতে পাওে সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-উভয়ের কাছেই বিপুল পরিমান আনবিক অস্ত্রের মজুদ ছিলো যা দিয়ে দশবার এই পৃথিবী ধ্বংস করা সম্ভব। এই দুই পরাশক্তি আপন আপন দর্শনের সংঘাতে আটকে ছিলো। এই পরাশক্তিগুলির মধ্যে মিত্র কারা মুজিব তা খুব ভালো করে জানতেন। তাঁর চিন্তা ছিলো এই কৌশলগত দাবার বোর্ডে বাঙলাদেশের অবস্থান নিয়ে।

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশ যুক্তরাষ্ট্র তখন নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত। এই কাজের জন্য তারা সবচেয়ে ঘৃণিত সামরিক একনায়কতন্ত্র তৈরি করেছিল। এর সাথে সবচেয়ে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় পাকিস্তানের, যার কবল থেকে মুজিব বাংলাদেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন। তাই অল্পকথায় বলতে গেলে বাংলাদেশের এই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রকে মিত্র হিসেবে পাওয়া যেত না।

পাকিস্তানের সাথে চীনের কৌশলগত বারোমাসি মিত্রতা ততদিনে সবই জানে। তাই বেইজিং-এর কাছে সমর্থন ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্য যাওয়াও ছিল নিরর্থক। একটা ধারণা মুজিবের মাথায় ছিল যে মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন যদি পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ায় তবে তা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের গণতান্ত্রেও আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

মুজিব যখন পরিকল্পনা করছিলেন সমর্থনের জন্য কার কাছে যাবেন, তার মাথায় চীনের সাথে ভারতের শত্রুতার বিষয়টি খুব ভালোভাবে গাঁথা ছিল। ভারত দখলের জন্য চীন ১৯৬২ সাল বেছে নেয়া তার সময় জ্ঞান ও হিসেবের পরিচয় দেয়। সেই বছর 'The Bay of pigs Crisis' সংকট চলছিল যার ফলে দুই পরাশক্তি কিউবাকে কেন্দ্র করে আনবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখী অবস্থান করছিল। চীন নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিল যে সেই সময়টা ভারতের অপ্রস্তুত অবস্থার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পরিক সংঘাতে ব্যস্ত থাকবে। তাই একথা ধরেই নেয়া যেত যে ওয়াশিংটন ও মস্কো তখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকবে যদি না পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই নেতিবাচক আবহাওয়ায় মুজিবের পক্ষে অত্যন্ত সাবধানী না হয়ে কোন উপায় ছিল না।

একথা নিশ্চিত ছিল যে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ভারতের সবচেয়ে বিশ্বাসী মিত্র ও কৌশলগত অংশীদার। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর সমাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র চিন্তাটা কোন বিষয় ছিল না। সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল বিশ্বেও সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। কিন্তু অতি-সাবধানী, নমনীয় ভারতকে প্রভাবিত করা কোন সহজ কাজ ছিল না। যাই হোক, বাঙালাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতের সমর্থন পাওয়া মানে ছিল বিশ্বেও তৎকালীন পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঙালাদেশের পাশে পাওয়া। এটি ছিল মুবিবের কৌশলগত চিন্তার ফলাফল যার ফসল সময় এলে ঘরে তোলা যাবে। শুধুমাত্র একজন অংশগ্রহণকারী নয়, শেখ মুজিবুর রহমান ইন্দো- সোভিয়েত কৌশলগত মিত্রতা শক্তিশালী করতে একটি নিয়াম হিসেবে কাজ করেছেন।

শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী, *ভারত, মুজিবুর রহমান, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান*, অপরাজিতা সাহিত্য ভবন, নাড়ায়নগঞ্জ, ২০১৯, পৃ. ৩৯-৪২

পরিশিষ্ট ৪

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আইয়ুবকে দেয়া স্মারকলিপি

পাকিস্তানের অর্থনীতির নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট রয়েছে, যা একে বিশ্বের অধিকাংশ অর্থনীতি থেকে একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। দেশটি দুটি দূরবর্তী অঞ্চলে বিভক্ত, ফলে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে শ্রমিক-যাতায়াতের অত্যন্ত সামান্য সুযোগ এবং পুঁজি, পণ্য ও সেবা খাতের ত্রুটিপূর্ণ প্রবাহ। এই মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছাড়াও দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবেশ ব্যাপকভাবে ভিন্ন। পূর্ব পাকিস্তান অত্যন্ত জনবহুল এবং এখানে জীবনযাপন প্রায় সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান হাল্কা বসতিপূর্ণ এবং এর রয়েছে বৃহৎ ও ক্রমবর্ধমান শিল্প। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। যার ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি।[১] দুই অঞ্চলের উন্নয়ন বৈষম্যের অন্যান্য প্রমাণ হলো: দুই অঞ্চলে আদায়কৃত কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব করের পরিমাণে পশ্চিম পাকিস্তানের অবদান পূর্ব পাকিস্তানের চার গুণের কাছাকাছি এবং দালানকোঠা তৈরির পরিমাণ, শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেল সংখ্যা, গাড়ি ও টেলিফোন ব্যবহারের পরিমাণ, সড়ক ও রেলপথের দৈর্ঘ্য, বিদ্যুৎশক্তি, লোহা, সিমেন্ট ইত্যাদি ব্যবহারের পরিমাণ– এ সবের প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে।[২]

এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণ অনেকেই পাকিস্তানকে একটি অর্থনীতির বদলে দ্বৈত অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছে।

অন্য কথায়, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলকে পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবহার অথবা ভোগের দৃষ্টিকোণ থেকে একক দুটি পৃথক সত্তা হিসেবে বিবেচিত করা উচিত। এই ধারণা অনুযায়ী, একটি অংশে উৎপাদিত পণ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্য অংশের জনগণের পক্ষে অনেক উচ্চতর মূল্য ব্যতীত কেনা সম্ভব নয়। তাই অধিকাংশ পণ্য অন্য থেকে আমদানি না করে এক অঞ্চলে অনেক সস্তায় উৎপাদন করা যেতে পারে বা অন্য কোন দেশ থেকে সস্তায় আমদানি করা যেতে পারে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, এক অঞ্চলের উন্নয়ন অন্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে সামান্য সাহায্যও করবে না। দ্বৈত অর্থনীতির ধারণার প্রবক্তারা অপরিহার্যভাবেই স্ব-স্ব অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পৃথক পরিকল্পনার পক্ষপাতী।

যারা এই যুক্তি দেখান যে, পাকিস্তন একটি একক অর্থনৈতিক সত্তা, তারা আসলে কখনো গভীরভাবে ধারণাটি ব্যাখ্যা দেননি এবং এর অনুসরণের কি ফলাফল তাও বোঝার চেষ্টা করেননি। তারা রাজনৈতিক ঐক্যের সঙ্গে একক অর্থনীতির মতবাদটি মিলিয়ে দেখেছেন। তাদের মতে, যেহেতু পাকিস্তান একটি একক রাষ্ট্র, সেহেতু এর অর্থনীতিও একটি একক অর্থনীতি। শ্রমিক-যাতায়াতের সীমাবদ্ধতা, ব্যক্তিপুঁজির সীমিত প্রবাহ এবং পণ্য পরিবহনের উচ্চমূল্য– এ সব বৈশিষ্ট্যকে তারা উপেক্ষা করে গেছেন বা ছোট করে দেখেছেন। তাদের মতে, জাতীয় আয় যেন সম্ভাব্য উচ্চহারে বৃদ্ধি পায়, সে জন্য এমন অঞ্চলে বিনিয়োগ করা উচিত, যেখানে লাভ বেশি হবে, যদি তা অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকা হয়, তবুও। তারা মনে করেন, সমষ্টিগত অর্থে চিন্ত করা উচিত এবং সেই হিসেবে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে একটি একক পণ্য উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। যতোক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র দেশের আয় ও কর্মসংস্থান সমষ্টিগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আয় ও কর্মসংস্থান অবস্থার অবনতি বা সেই অঞ্চলের উন্নয়নে ব্যর্থতা চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। আবার পণ্য পরিবহনের ব্যয় যা-ই হোক না কেন, পণ্য সেখানেই উৎপন্ন করা উচিত যেখানে উৎপাদন ব্যয় সবচেয়ে কম এবং এ ক্ষেত্রে একটি অঞ্চলে পণ্যের মূল্যের সঙ্গে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ওই পণ্যের মূল্যের তুলনা করা উচিত নয়।

---

[১] পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক উপদেষ্টা জনাব নরবিইর হিসাব থেকে প্রাপ্ত, যা ৩১ জুলাই ১৯৫৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সংগৃহীত।

[২] আঞ্চলিক বৈষম্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ হিসাব স্মারকলিপির সংযোজন ১-এ ছিল, কিন্তু এই পুস্তকে মুদ্রিত করা হয়নি।

পাকিস্তানের একক অর্থনীতি অনুসরণ সমগ্র দেশ ও অধিকাংশ নাগরিকের কল্যাণের জন্য যতোটা ক্ষতিকর হয়েছে, নীতিনির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে দ্বৈত অর্থনীতির ধারণা অনেক কম ক্ষতিকর হতো, বরং উত্তম হতো। অতীতে পাকিস্তান সরকারি নীতির ভিত্তি ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত অর্থনীতি, যা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই দেখা যায়, যেখানে এ রকম আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য বিদ্যমান, সেখানে কম উন্নত এলাকা থেকে বেশি উন্নত এলাকায় শ্রমিকদের স্থানান্তর বা বসতির পরিবর্তনে এই বৈষম্য দূরীভূত হয়। অতীতে কেন্দ্রীয় রাজধানী ও পশ্চিমে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকারের বিনিয়োগ নীতি কর্তৃপক্ষের এ বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে যে, সমগ্র জাতির কল্যাণের আলোকে উন্নয়ন কার্যক্রমের আঞ্চলিক অবস্থান নিতান্তই তাৎপর্যহীন। তারা বরং অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা দিয়ে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান এ উন্নয়ন বৈষম্যকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এ প্রসঙ্গে যা বলা যায় তা হলো, অন্যান্য দেশের আঞ্চলিক বৈষম্য যা সক্রিয় নীতিমালার প্রয়োগে দূরীভূত করার চেষ্টা হয়, সেখানে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য শুধু যে থেকেই যাবে তা নয় বরং ভবিষ্যতে তা আরো প্রকট হবে। অন্যান্য দেশে আঞ্চলিক বৈষম্য হয়েছে সরকারের খুব সীমিত ভূমিকা ও মুক্ত অর্থনীতির আওতায়; যখন সেই সব দেশে সাম্প্রতিক সরকারি নীতি ঐ বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত, তখন পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য মূলত সরকারি কর্মসূচি ও নীতির ফল। পাকিস্তানের এই বৈষম্য যে দিন দিন বাড়ছে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এ বৈষম্যকে আরো বৃদ্ধি করবে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন বৈষম্যের কারণসমূহ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে পুঁজি সৃষ্টি করা। সড়ক, রেলপথ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদিতে বিনিয়োগের ফলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন আসবে। প্রমাণ রয়েছে যে, স্বাধীনতার পর পূর্বের চেয়ে পশ্চিমে এই ক্ষেত্রসমূহে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ সব সময়ই বেশি ছিল।[৩]

পশ্চিমে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয় নিয়মিতভাবেই বেশি ছিল। প্রাদেশিক সরকারের ব্যয়ও পশ্চিমে বেশি ছিল, কারণ বৃহত্তর সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ থেকে উৎপাদিত আয় প্রাদেশিক রাজস্ব সম্পদ আরো বৃদ্ধি করেছে। উপরন্তু, বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ চলে যেতো পশ্চিমে এবং খুবই সামান্য অংশ বরাদ্দ দেয়াা হতো পূর্বের জন্য।[৪]

পূর্বের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল দুর্বল এবং নিজস্ব দক্ষ জনসম্পদ ছিল সীমিত। তা ছাড়া, কিছুদিন আগে পর্যন্তও পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চস্থানীয় সরকারি পদসমূহে স্থানীয় লোক না নেয়ার কারণে পশ্চিম থেকে আসা সরকারি কর্মকর্তারা পূর্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাটিকে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই প্রধানত পশ্চিমের উন্নয়নের প্রতি তাদের দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিল।

প্রায়শই যুক্তি দেখানো হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের কারণ প্রধানত সেখানকার উৎসাহী বেসরকারি উদ্যোগ এবং পূর্বে উন্নয়নের অভাবের কারণ সেখানকার বেসরকারি উদ্যোগের অপ্রাচুর্য। এটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি খাতে বিশাল বিনিয়োগ হয়েছে, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই অল্প। সরকারের আমদানিনীতিও সব সময় পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষেই কাজ করেছে। পূর্বের চেয়ে পশ্চিমের অনেক বেশি আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে, যা পশ্চিমের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে তা শিল্পে বিনিয়োগের মূলধন জোগাতে সাহায্য করেছে। পূর্বের তুলনায় পশ্চিমের অনেক বেশি পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানি সেখানে শিল্পায়নকে সহজতর করেছে। প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক খাতে প্রত্যক্ষভাবে

---

[৩] প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পূর্বে উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ পশ্চিমের অর্ধেক ছিল।

[৪] অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৩০ জুন ১৯৬০ পর্যন্ত প্রকল্প সাহায্য ব্যতীত পূর্বের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১২৮৮.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পশ্চিম ও করাচির জন্য ছিল ২৬১৯.২ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬০-৬১ সালে পশ্চিমের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৫১৯.৮ মিলিয়ন ডলার এবং পূর্বের ছিল ১২৭.৮ মিলিয়ন ডলার। এই সারণিতে অবশ্য দুই প্রদেশের মধ্যে অবন্টনযোগ্য একটা বড় অংশের উল্লেখ আছে, যা এই উপাত্তের ব্যবহার সীমিত করে।

অনুন্নয়নশীল সরকারি ব্যয়ও পশ্চিমের বেসরকারি উদ্যোগকে সহায়তা করেছে। প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় চাকরিতে সরাসরি নিয়োগ ছাড়াও পশ্চিমের অনেক শিল্প ও কর্মক্ষেত্র প্রত্যক্ষভাবে এ ধরনের সরকারি ব্যয় থেকে লাভবান হয়েছে। নির্মাণশিল্প বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রতিরক্ষা খাতে পণ্যসামগ্রী ও সেবা খাতে সরবরাহ করে সব ধরনের ঠিকাদার ও শিল্পপতি বিপুল পরিমাণে আয় করেছেন। বেসরকারি খাতে ব্যাপক আকারে ব্যাংকঋণ দান পশ্চিমের বেসরকারি সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। এমনকি পশ্চিমে সরকারি ব্যয়ের বিরাট ঘাটতিও ঋণগ্রহণের মাধ্যমে মেটানো হয়েছে। অবশ্য পশ্চিমে এ সব উন্নয়ন-ব্যয় পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত রপ্তানি-আয় এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর প্রচুরভাবে নির্ভর করতো। একইসঙ্গে যুক্ত ছিল সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যাংকঋণের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ, আমদানি ব্যবসায়ীদের লাভের পুনর্বিনিয়োগ এবং শিল্পপতিদের একটি সুরক্ষিত অভ্যন্তরীণ বাজার সুবিধা।
পূর্ব ও পশ্চিমে উন্নয়ন-ব্যয়ের এ বৈষম্যকে প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় এই যুক্তিতে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বে পূর্বের অবদান মাত্র ২০ শতাংশ, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের অবদান ৮০ শতাংশ। এই যুক্তির আরো একটি ভিত্তি হচ্ছে, ১৯৫৯ সালে পরিকল্পনা কমিশনের একটি অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের রিপোর্ট– সেখানে বলা হয়, পূর্বে যা- কিছু উন্নয়ন তার পেছনে রয়েছে পশ্চিম থেকে পূর্বে সম্পদের স্থানান্তর। এ ধরনের যুক্তির সত্যতা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের বর্তমান ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশের সত্যিকার অবদান পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এটা সবার জানা যে, করাচিতে প্রধঅন কার্যালয় আছে, এমন অনেক প্রতিষ্ঠান সমস্ত দেশে অর্জিত আয় এবং সম্পূর্ণ ব্যবসার ওপরে প্রদত্ত কর করাচিতেই প্রদান করে। সেই কারণে উভয় প্রদেশের সত্যিকারের কর আদায়ের পরিমাপ করা যাবে না। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর পশ্চিমে যে উৎপাদন শুল্ক ও বিক্রয় কর বসানো হয়, তার ভার পূর্ব পূর্বের ক্রেতাকেই বহন করতে হয়। এটাও মনে রাখাতে হবে, একটি প্রদেশে সংগৃহীত রাজস্ব করের পরিমাণ শুধু ওই অংশের সাধারণ উন্নয়নের ওপর নয়, সরকারি নীতির ওপরও নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বের চেয়ে পশ্চিমে বেশি আমদানি অনুমতি দেয়ার কারণে পশ্চিমে আমাদানি শুল্ক ও বিক্রয় করের সংগ্রহ অনেক বেশি হয়, যদিও এ সব আমদানি পশ্চিমে পূর্বের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার স্থানান্তরের কারণেই সম্ভব হয়েছে। যদি পূর্ব তার বৈদেশিক মুদ্রার আয় সম্পূর্ণভাবে তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারতো, তবে আমদানি শুল্ক ও বিক্রয় করের সংগ্রহের পরিমাণে দুই প্রদেশের অবস্থান সম্পূর্ণ উল্টো হতো। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুন্নয়ন ব্যয় পশ্চিমে পুঞ্জীভূত করার অর্থই হলো সরকারি চাকুরে, ঠিকাদার বা ব্যবসায়ীসহ সবার কাছ থেকে আরো আয়কর সংগ্রহ। অবশ্য, এই সব যুক্তি সত্ত্বেও পূর্বে চেয়ে পশ্চিম নিশ্চিতভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহে বেশি অবদান রাখবে। এর বিপরীতে, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে খুবই অল্প।[৫] এ রকম হতেই পারে যে, যদি প্রয়োজনী উপাত্ত পাওয়া যেতো, তাহলে হয়তো দেখা যেতো যে পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান ব্যয় বা রাজস্ব ব্যয় ওই অঞ্চলের সংগৃহীত রাজস্ব করের চেয়ে কম।

পশ্চিম থেকে পূর্বে সম্পদের প্রবাহের তথাকথিত তত্ত্বের মূলে রয়েছে কয়েকটি পূর্ব ধারণা। (ক) পূর্বের নিম্ন মাথাপিছু আয় সত্ত্বেও, পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুন্নয়ন ব্যয় বহনে সমান অবদান রাখবে। (খ) পূর্ব ও পশ্চিম উভয়ই এ সকল ব্যয় বহনে সমানভাবে অবদান রাখবে যদিও এ সকল ব্যয়ের বেশিরভাগ পশ্চিমে কেন্দ্রীভূত এবং তা পূর্বের জন্য সরাসরি লাভজনক নয়। (গ) প্রত্যেক প্রদেশের আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ভারসাম্য সেই প্রদেশের বর্হিদেশীয় বাণিজ্য ভারসাম্যের সঙ্গে সুবিধামতো একই পর্যায়ে বিবেচনা করা যাবে। (ঘ) বৈদেশিক সাহায্য এই বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা বেশ পরিষ্কার যে 'ক' এবং 'খ' অত্যন্ত অসমর্থযোগ্য ধারণা। এটা সকল গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু করব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চল ধনী অঞ্চলের সমান কর প্রদান করবে, বিশেষত যখন দরিদ্র অঞ্চলটি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় থেকে ধনী অঞ্চলের চেয়ে কম লাভবান হয়।

---

[৫] দুর্ভাগ্যবশত, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সরবরাহকৃত উপায়ে কেন্দ্রীয় ব্যয়ের একটা বড় অংশ 'অবণ্টযোগ্য' হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে বিশ্লেষণের জন্য এ সব ব্যয়ের সঠিক খাতগুলো জানা আবশ্যক।

পূর্বের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার উদ্বৃত্ত আয় আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির চেয়ে বেশি। এটা বেশ পরিষ্কার যে, দুই প্রদেশের মধ্যে উচ্চ পরিবহন-মূল্যের কারণে অত্যন্ত বর্ধিতমূল্যে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য চলছে। একটি সঠিক চিত্র পেতে আমদানি থেকে সৃষ্টি উদ্বৃত্ত উপযুক্ত পরিমাণে হ্রাস করতে হবে, আর তা না হলে পূর্বে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্র আয়ের যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজার হার অনুযায়ী। এটা করতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি উদ্বৃত্ত ও পরিসেবাসমূহের জন্য ব্যয় কর্তনের আগের হিসেবে। এটাও মনে রাখতে হবে, পশ্চিম থেকে আমদানিকৃত পণ্যেও মান অন্য দেশ থেকে আমদানি করার পণ্যেও তুলনায় অনেক নিম্নমানের। আবার এ সব পণ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বে উন্নয়নভিত্তিক প্রয়োজনকে ঠিকমতো মেটাতে পারে না। পূর্ব তার উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ ব্যবহার করে যে সব মালামাল সংগ্রহ করতে পারতো এগুলোকে তার বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আশ্চর্যজনকভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অর্থনীতিবিদ প্যানেলের নজর এড়িয়ে যায়। এই কারণে একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তত্ত্বকে সমর্থণ করার জন্য তাদের রিপোর্টকে ব্যবহার করা হয়েছে। সত্য হলো এই যে, পাকিস্তান এককভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। পাকিস্তানের মোট বিনিয়োগ দেশীয় সঞ্চয়ের চেয়ে অনেক বেশি। পশ্চিমে প্রকৃত বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের মধ্যে পার্থক্য পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশি, যদিও পূর্বে বিনিয়োগের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। কাজেই বলা যায়, যেহেতু পশ্চিম নিজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু পূর্বে পশ্চিমের নিজস্ব সম্পদের প্রকৃত স্থানান্তর আদৌ সম্ভব নয়। অথচ যুক্তি হিসেবে যা বলা হয়েছে, পশ্চিমের প্রাপ্ত বৈদেশিক সম্পদের একটি অংশ পূর্বে স্থানান্তর করা হয়েছে।

নীতি-সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ

এটা ধরে নেয়া যায়, জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে দুই অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়ন বৈষম্য কাম্য নয়। যতোক্ষণ পর্যন্ত একটি অঞ্চলের উন্নয়ন অন্য অঞ্চলের উন্নয়ন অন্য অঞ্চলের চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে কম হবে, ততোক্ষণ অনুন্নত নীতিনির্ধারণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হবে দেশের দুই অঞ্চলের উন্নয়নের সমতাকে অগ্রাধিকার দেয়া। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাথমিক রূপরেখায় এ বৈষম্য দূর করার ব্যাপারটি লক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ে সেটি বাদ দেয়া হয়। যদিও পূর্ব ও পশ্চিমের অভ্যন্তরীণ অনুন্নত এলাকাসমূহে উন্নয়ন বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তবুও কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্য কমানোর ব্যাপারে উৎসাহী নয়। সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিমের অনুন্নত অঞ্চলগুলোকে কর অবকাশের ক্ষেত্রে সমানভাবে বিচার করার বর্তমান নীতি গুরুতর আপত্তিকর। বাস্তবে প্রয়োজন হলো, সমগ্র পশ্চিমের তুলনায় পূর্বকে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে আরো আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা। যদি একজন পশ্চিমের বিনিয়োগকারীকে পূর্ব ও পশ্চিমের কিছু সংখ্যক অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য একই রকম অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, তবে পূর্বে বিনিয়োগ করার জন্য তার কোন উৎসাহ থাকবে না। যদিও নিকট অতীতে সরকারের শিল্প বিনিয়োগ তফসিল পূর্বে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও এই তফসিল যদি বাস্তবায়িত হয়ও, তবু তা বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস না করে বরং আরো বাড়িয়ে দেবে। কেননা চূড়ান্ত বিচারে পশ্চিমে বিনিয়োগের বৃদ্ধি পূর্বের চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি।

যদি দুই অঞ্চলের সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নই লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্রীয়ভূতকরণের যে নীতি চালু রয়েছে তার অধীনে ঐ লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা কতোটুকু? এটা সত্য যে, দেশ বিভাগের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি দুই প্রদেশের মধ্যে উন্নয়ন বৈষম্যকে কেবল বৃদ্ধিই করে এসেছে। কেন্দ্রের পরিকল্পনার অধীনে এমন একটি নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা সম্ভব, যা বৈষম্যকে দূর করতে বা অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারে। দুই প্রদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অথবা অর্থনৈতিক কার্যক্রম নির্ধারণে বর্তমান ও সম্ভাব্য কার্যক্রমের খরচের একটি

তুলনামূলক নিরীক্ষা করা উচিত। এর মধ্যে অন্যতম বিচার্য হবে, সামাজিক অবকাঠামোগত মূলধনের পরোক্ষ ফলাফল। পূর্বে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের জরুরি প্রয়োজনে বিনিয়োগের এই তুলনামূলক নিরীক্ষায় পূর্বের জন্য সংশোধিত হওয়া উচিত। এর মধ্যে অন্যতম বিচার্য হবে, সামাজিক অবকাঠামোগত মূলধনের পরোক্ষ ফলাফল। পূর্বে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের জরুরি প্রয়োজনে বিনিয়োগের এই তুলনামূলক নিরীক্ষায় পূর্বের জন্য সংশোধিত হওয়া উচিত। অধিকন্তু, পূর্ব ও পশ্চিমের কোন প্রকল্প-ব্যয়ের তুলনার ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রাদেশিক পরিবহনের ও বিতরণের উচ্চমূল্যের ব্যাপরটি ঠিকভাবে বিবেচনা করা উচিত। এ ধরনের তুলনায় দেখা যেতে পারে, পূর্বে অনেক পণ্যের উৎপাদন খরচ পশ্চিম থেকে আনা পণ্যের মোট খরচের চেয়ে কম হবে। এ ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের বিপরীতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের 'সামাজিক মূল্যায়ন'কে বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হবে। যদি তা করা হয়, তবে শ্রমঘন প্রকল্পসমূহ পশ্চিমের চেয়ে পূর্বে অনেক কম ব্যয়ে করা সম্ভব হবে। কারণ পূর্বে পশ্চিমের তুলনায় শ্রমিক পর্যাপ্ত তারপরও যে কোন কারণে দুই প্রদেশের বিদ্যমান মজুরির হার পূর্ব পাকিস্তানের তুলনামূলকভাবে শ্রমিকের প্রাচুর্যেও প্রতিফলন নেই।

মনে রাখতে হবে, পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য 'আয় বৃদ্ধি' ও 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির' নির্ণায়কগুলিকে আলাদাভাবে স্থির করতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারের পৃথক সংখ্যাভিত্তিক টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর দুই প্রদেশের জন্য আলাদাভাবে বিস্তারিত উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করতে হবে। অর্থাৎ দুই প্রদেশের জন্য পরিকল্পনাকে আলাদাভাবে প্রণয়ন করে পাকিস্তানের জাতীয় পরিকল্পনার দুটি অংশ হিসেবে একত্র করা যেতে পারে। এই দুই পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিতে এমনভাবে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে দুই অঞ্চলের নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা। এই দুটি পরিকল্পনা ও সম্পদ বন্টনে এক সুতোয় বাঁধতে এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনকালে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন স্কিম সৃষ্টির খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা যে নীতি দ্বারা পরিচালিত হবো, তা হচ্ছে আয়ের স্তরে পার্থক্যকে হ্রাস করা এবং সেটা কেবলই সম্ভব যখন পূর্ব পশ্চিমের তুলনায় উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অতীত কার্যকলাপের আলোকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অঞ্চল যেন অন্যটির পেছনে পড়ে না থাকে, সে জন্য একটি সাংবিধানিক ধারা থাকা উচিত, যা পূর্ব ও পশ্চিমের মোটামুটি সমানভাবে উন্নয়ন নিশ্চিত করা অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, বিশ বছরের মধ্যে মাথাপিছু আয়- বৈষম্য দূরীকরণ– এটি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রধান দায়িত্ব বলে গৃহীত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারও এ উদ্দেশ্যে সঠিক নীতি গ্রহণ করবে। এই নীতি অনুসরণে, প্রথম বছরগুলোতে পূর্বের বিনিয়োগ অতি দ্রুতগতিতে বাড়াতে হবে, যার ফলে এখানে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ পশ্চিমের চেয়ে অনেক বেশি হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ২০ বছরের মধ্যে বৈষম্য লাঘব করতে হয়, তবে পূর্বে সমগ্র পাকিস্তানে মোট বিনিয়োগের অংশ, যা ১৯৬০-৬৫ সালে ৩০ শতাংশ ছিল, তাকে ১৯৭৫-৮০ সালে ৬০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের নীতির প্রয়োগ যে কঠিন হতে পারে তা অস্বীকার করা উচিত হবে না। অবশ্য এমন একটি পদ্ধতি বের করা সম্ভব, যা উন্নয়ন- বৈষম্যকে একটি সহনীয় সীমায় আটকে রাখতে পারে। অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদদের একটি কমিটি এ সমস্যা পর্যালোচনা করে একটি নির্দিষ্ট কার্যনীতি প্রণয়ন করতে পারে।

যদি এ রকম মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এ রকম কোন দায়িত্ব নিতে পারবে না, তবে একটি সন্তোষজনক সমাধান হলো দুই প্রদেশের সম্পদ সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দেয়া এবং প্রত্যেক প্রদেশকে তার নিজের মতো করে সম্পদ বৃদ্ধির অনুমতি দেয়া। এ সমাধানটি দুই প্রদেশের জনগণের কাছেই গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। অর্থনৈতিক নীতির এ রকম সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকারণের প্রস্তাব নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের বিষয়গুলোর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। অন্যান্য সব বিষয় দুই প্রদেশের অধীনে থাকবে। প্রত্যেক প্রদেশ তার সামর্থ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় থেকে সুবিধা পাওয়ার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ভার বহন করবে। বৈদেশিক সম্পদসহ সকল সম্পদ থাকবে প্রদেশের অধীনে এবং প্রদেশ তার উন্নয়ন ও অন্যান্য চাহিদা অনুযায়ী তা ব্যবহার করবে। একটি মাত্র স্টেট ব্যাংক ও একটি মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে সমগ্র দেশের জন্য, কিন্তু ঋণ নিয়ন্ত্রণের সকল নীতি এবং প্রদেশ সরকারের দেয়া ঋণের নীতিনির্ধারিত হবে স্ব-স্ব অর্থবিভাগের অধীনে স্টেট ব্যাংকের স্থানীয় পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক।

ঐদি রাজস্বের সম্পূর্ণ পৃথককরণ এবং উন্নয়ন দায়িত্ব-সংক্রান্ত ওপরের প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়, তবে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিস্তারিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে পারে।

নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৩-৩৯

পরিশিষ্ট ৫

১

সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠীর ঘোষণা

সৃজনীর লেখক ও শিল্পীরা সবসময় মনে রাখে যে তাদের প্রত্যেকের যেমন স্বতন্ত্র ও চিহ্নিত ব্যক্তিসত্তা বা ভূমিকা ও প্রতিভা রয়েছে, তেমনি তারা প্রত্যেকেই সর্বসাধারণের অবিভাজ্য অংশ।

সৃজনীর প্রাণের উৎস তারুণ্য; স্থবিরের শাসনকে সে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু স্থবিরও যে একদিন নবীন ছিল, একথা সৃজনী ভোলে না; সৃজনীর তাচ্ছিল্য প্রকাশের মন নেই।

সৃজনী জীবন-বিমুখ নয়, জীবনের জয়গান করে। অপরাজেয় আশাবাদী সৃজনী। ধ্বংস ও মৃত্যুও কুৎসিৎ ভ্রূকুটি তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না।

সৃজনী মাতৃভূমিকে স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী মনে করে। বসুধাকে মনে করে পরমাত্মীয়। সৃজনী বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে এবং বিশ্বযুদ্ধে বিপক্ষে নৈতিক সমর্থন যোগাবে। অতি জাতীয়তাবাদ কিংবা তথাকথিত বিশ্বপ্রেমিকতাকে সে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। প্রতিক্রিয়ার সাথে সংঘাতকে অবশ্য এড়িয়ে চলবে না সৃজনী।

সৃজনী তার প্রতিভা ও অভিজ্ঞতাকে নিয়োজিত করবে এমন সব রূপসৃষ্টিতে, যা গণমানসকে সচেতন করে তুলবে। সাধারণ মানুষের কাছে শিখে নেবে তার সহজ প্রকাশভঙ্গী।

সৃজনী গোষ্ঠীসর্বস্বতা, অহমিকা, কূপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা সর্বদা পরিহার করে চলে মনে প্রাণে।

সৃজনী ভবিষ্যদ্বাদী হয়েও খেয়াল রাখে সে অ-মূল তরু নয়। তার প্রাণবত্তার শিকড়গুলি প্রোথিত রয়েছে পারিপার্শ্বিক সমসাময়িক গণজীবনের বেদীতে। নিত্য নতুন অভিনবের অনুসারী হয়েও সৃজনী মেকী নতুনত্বের মুখোশ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে দ্বিধা করবে না কখনও। সৃজনীর কল্পনা অভ্রভেদী, কিন্তু ভূমিতে রয়েছে তার পা।

সৃজনীর লেখক শিল্পীরা বাংলা ভাষার লোকায়ত্ত, আবহমান ও সর্বজনীন মুক্ত ধারাকে সবসময় বাধমুক্ত রাখার প্রয়াস পাবে। দেশী উপকরণকে সৃজনী দেবে অগ্রাধিকার। সৃজনী ঐতিহ্য মেনে চলবে ঠিক ততখানি তার অশেষ পরিব্যাপ্তি ও সম্মুখগামিতাকে মেনে চলবে ঐতিহ্য।

সৃজনী সেই অভিনব দেশ ও ধরণীকে গড়ে তুলবার কাজে শরীক ও ব্রতী, যে- দেশ ও ধরণীতে হবে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এবং এই কারণেই মানুষ শোষিত হবে না মানুষের কাছে।

সৃজনীর লেখক শিল্পীরা প্রতিভার ছলে কখনও আত্মপ্রবঞ্চনা করবে না। শানবাঁধানো পথে চলবে না বলেই সৃজনী নিজের পথ কেটে নেবার ব্যাপারে অসতর্ক হবে না। সৌন্দর্য এবং সত্যকে সাথে করে নিত্য উত্তরিত ও উৎসারিত হয়ে চলবে সৃজনী। সে জানে এর বিকৃতিতে ঘটবে তার বিচ্যুতি।

[১৯৬৩ সালে এক সাধারণ সভায় গৃহীত। *ষাট ও সত্তরের দশক : সৃজনী*, প্রথম স্তবক, ঢাকা, জুলাই ১৯৮৭ সংকলন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।]

মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১১৭

২

উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ ঘোষণাপত্র

১. আমাদের সমাজে মৌলিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

২. বর্তমান সমাজের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বিশৃংখলা নতুন সমাজের জন্মকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। ঔপনিবেশিক শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের সর্বাধুনিক কৌশলসমূহও জনগণের সামনে নগ্নভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জনগণের শিবির ও তার শত্রু শিবিরের মধ্যেকার প্রভেদ রেখাটি পূর্বের তুলনা বর্তমানে অনেক বেশী স্পষ্ট।

৩. অবক্ষয়ী সামন্ত শক্তি, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দর্শন, সংস্কৃতি ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছেও নবতর ছদ্মবরণে টিকে থাকার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

৪. চূড়ান্তভাবে জনগণের শত্রু শিবিরের ধ্বংস অনিবার্য, নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রামের বিজয় অপ্রতিরোধ্য।

৫. লেখক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমাজের এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে নিষ্ঠার সাথে অনুধাবন করতে হবে এবং লেখায়, শিল্পকর্মে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও আন্দোলনে তাকে রূপ দিতে হবে।

৬. সাহিত্য ও শিল্পকলা জনগণের সম্পদ, কারো খেয়ালখুশী বা ভাব বিলাস থেকে নয়, জনগণেল প্রয়োজনেই এর জন্ম ও বিকাশ– এই সত্য আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমাদের অনুশীলন পরিচালনা করতে হবে।

৭. আমাদের লক্ষ্য জনগণের গণতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা। জনগণের গণতান্ত্রিক নতুন সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্যদিয়েই কেবল এই নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে।

৮. সুতরাং লেখক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের অবশ্যই জনগণের সাথে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কেবল নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

৯. 'যা কিছু পুরাতন তাই পরিত্যাজ্য আর যা কিছু নতুন তাই গ্রহণীয়' আমরা এই ধারণার ঘোরতর বিরোধী; সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে যা কিছু সহায়তা করেছে আমরা সেই সব শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী– যা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে

আমরা তা বাতিল করি; নতুনের ক্ষেত্রেও আমাদের একই দৃষ্টিভঙ্গী : গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নটি কেবলমাত্র সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির নিরীখেই বিচার্য।

১০. সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে জনগণের নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান; এই ধারাকে উজ্জীবিত ও বিকশিত করতে হবে।

১১. সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক দাসত্ববোধ, সামন্তবাদী পশ্চাদপদ ভাবাদর্শ এবং জজগণের শত্রু শিবিরের কাছে লেখক, শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মীদের আত্ম-বিক্রয় ও আত্মসমর্পণকে আমরা কেবল তীব্রভাবে ঘৃণাই করি না– এসবের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম ক্ষান্তিহীন এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে আমাদের প্রয়াস অনলস এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১২. এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে–

ক. সমমনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মী এবং সংগঠনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে;

খ. বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরের সমমনা সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে;

গ. তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে;

ঘ. সময় সময় সম্মেলন, সেমিনার, নাট্যানুষ্ঠান, প্রকাশনা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের উদ্যোগ নিতে হবে।

ঙ. প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে আন্দোলন করতে হবে;

চ. বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে হবে;

ছ. ছোট বড় সকল জাতিসত্তার সমান সামাজিক ও ভাষার অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হবে।

[১৯ সেপ্টেম্বও, ১৯৭৬-এ অনুষ্ঠিত 'উন্মেষ'-এর সাধারণ সভায় সংশোধনীসহ গৃহীত। উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ-এর সাহিত্য সম্মেলনের *স্মরণিকা* (১৯৭৭) থেকে সংগৃহীত।]

মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১১৮-১১৯

৩

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ঘোষণাপত্র

মুক্তির ব্রত নিয়ে হতাশা নৈরাজ্য আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে যখন জেগে উঠেছে শৃঙ্খলিত মানুষ, সেই আন্দোলন মুখরিত ঊনসত্তরে গণ-অভ্যুত্থানের প্রাক-পর্বে শ্বাসরুদ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে আটষট্টির ঊনত্রিশে অক্টোবর শিল্পীসংগ্রামী সত্যেন সেনের নেতৃত্বে ঢাকা নগরীর উত্তর প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী'। নিপীড়িত মানুষের গান গাইবার অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল উদীচী। ১৯৭১ সালে হাজারো মুক্তিসংগ্রামীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদীচীর ভাইবোনেরা যুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতার যুদ্ধে। শিল্পী-সাহিত্যিখ-বুদ্ধিজীবীর রক্তধারা মিশেছিল অযুত বীরের আত্মবলিদানের সঙ্গে।

লক্ষ মানুষের পরম আত্মদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে শোষণ বঞ্চনার যেমন অবসান ঘটবে, তেমনি সংস্কৃতি বিকাশের পথ হবে বন্ধনমুক্ত– এই আকাঙ্ক্ষা ছিল সকলের মনে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের যে সংগ্রাম, শহিদদের যে আত্মদান, তার মূল লক্ষ্য ছিল একটি শোষণহীন সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা। সামাজিক আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতার অভিশাপ মোচন করে দেশ অগ্রসর হবে প্রগতির পথে। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা মোচন করে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে মানবিক বিকাশের পথ হবে উন্মুক্ত।

ব্যক্তিসর্বস্বতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অপসংস্কৃতির দ্বারা লালিত বিকৃত চিন্তা- চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজের পরিপূর্ণতা অর্জনের সাধনায় মানুষ ব্রতী হবে এই ছিল আশাবাদ।

কিন্তু আজ এক গ্লানিকর বিপরীত বাস্তবতা আমাদের জীবন ঘিরে রেখেছে, গ্রাস করে চলেছে আমাদের স্বাধীনতার বিভিন্ন অর্জনসমূহ। রুদ্ধ করে চলেছে আমাদেও মানবিক বিকাশের সকল পথ। মুক্তিযুদ্ধেও মাধ্যমে অর্জিত সংবিধান আজ ক্ষতবিক্ষত। রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতির মধ্যে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ আজ নির্বাসিত। মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টিকারী অবাধ ধনবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেশে ও সমাজকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত কওে দিচ্ছে। পুঁজিবাদের দানবিক উত্থান, তৃতীয় বিশ্বের একটি পশ্চাৎপদ দেশে বৈষম্যমূলক ধনবাদী অর্থনীতি একদিকে যেমন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণ নিপীড়নে শিকারে পরিণত করেছে, অপরদিকে তেমনি গোটা দেশকে নয়া-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিকট বন্ধক রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই পুঁজিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সমর্থক ও সাহায্যপুষ্ট হয়ে স্বীয় ক্ষমতা জোরদার করছে। লুটেরা ও মুক্তবাজার অর্থনীতি কায়েমের মাধ্যমে দেশকে ঋণগ্রস্ত ও পরনির্ভও করে ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ, জাতীয়করণকৃত শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় প্রত্যর্পণ, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের পথ রুদ্ধ কওে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এই পরনির্ভরশলি ধনবাদী ব্যবস্থায় দেশবাসীকে শৃঙ্খলিত করার জন্য একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রীতিকে পদদলিত করা হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি জাতীয় সংস্কৃতিকে বিকৃত, বিভ্রান্ত ও বিনষ্ট করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ফলে আমাদের সামাজিক সংস্কৃতি আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। দেশে নিরক্ষরতার ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা সঙ্কটসময়তায় ভেঙে পড়ছে। শিক্ষা মানবিক শক্তি ও গুণাবলি সম্প্রসারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রসারের নামে শিক্ষার ঢালাও বাণিজ্যিকীরণ বস্তুত শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত। পুঁজিবাদী ধারায় শিক্ষার প্রসারই অর্থনির্ভর শিক্ষানীতি; যার মূল উদ্দেশ্য আমাদেও জাতিসত্তার শেকড় উৎপাটন। মানবিক মূল্যবোধগুলো আজ ভূ-লুণ্ঠিত। উগ্র ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে। দুর্নীতি ও লুণ্ঠন ধনোপার্জনের পন্থা হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। ধনবাদী প্রথানুযায়ী একশ্রেণির রাজনৈতিক নেতা তাদেও সকল লাজলজ্জা বিসর্জন নিয়ে নীতিহীনতার দম্ভে স্ফীত হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাগুলোর অপব্যবহার করে বিকৃত মানসিকতার প্রসার ঘটিয়ে জনগণের সুকুমার বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করা হচ্ছে।

অসুন্দর ও অমানবিকতার দাপটে সুন্দর ও মানবিকতার শক্তি আজ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। মারাত্মক পরিবেশ দূষণে মানবজীবন আজ হুমকির সম্মুখীন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা মানুষকে করে তুলেছে অমানবিক। তার স্বাভাবিক মানবিক গুণাবলি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির কাঠামোর চাপে। দুর্নীতি, লালসা, হিংসা, পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি ঢেকে দিচ্ছে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, মানবপ্রেমের মতো সকল সদর্থক মূল্যবোধকে।

আমরা মনে করি, এই গভীর অন্ধকার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আমাদের আলোক অভিযান সফল করে তুলতে হলে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক শক্তিতে এক নতুন জাতীয় উজ্জীবন ঘটাতে হবে। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, শিল্পী ও শিল্পের মৌলিক ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সমাজকে নিরন্তর প্রগতি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া, মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত হওয়া। আমরা মনে করি যে, আমাদের বিপুল ঐতিহ্যসমৃদ্ধ সংস্কৃতি, শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের নানা সৃষ্টিশীল উপাদানে যা সমৃদ্ধ, তা আজ আমাদেও আরো গভীরভাবে বরণ করতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যের সকল সদর্থক দিক ও প্রগতিশীল উপাদানসমূহ একান্তভাবে আত্মস্থ করে নতুন সৃষ্টিশীলতার দ্বারা সংস্কৃতির নবতর বিকাশে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

যেকোনো সমাজের সংস্কৃতির বিকাশ ও নবজাগরণের মূল ভিত্তি তার লোকসংস্কৃতি। বাঙালির লোকায়ত জীবনের সংস্কৃতি নানা উপাদান ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। লোক ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতিতে নবতর বিকাশ ঘটানোর চেতনা দ্বারা সিঞ্চিত করে আমরা তা উজ্জীবিত করে তুলতে পারব।

একটি ব্যাপকভিত্তিক সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির এই নবজাগরণ ঘটাতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আন্তর্জাতিকভাবেও সংস্কৃতির মানবিক জীবনবাদী ধঅরার সথে সম্পৃক্তি রচনায় আমরা প্রয়াসী।

পীড়নমূলক শাসক ও শোষণব্যবস্থা মানুষের সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পচেতনা, তার সৃষ্টিশীলতা ও সংস্কৃতিময়তা, মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ ও ভালোবাসা এবং শিল্পের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে আত্মবিকাশের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে বিনষ্ট করে দেয়। এই মানবিক বোধসমূহ জাগ্রত ও বিকশিত করে তোলা শিল্পী, শিল্পীগোষ্ঠী বা শিল্পীসম্প্রদায়ের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে আমাদের ওপর বর্তায়। এই দায়িত্ব পালনের অবিচল ও সদা তৎপর থাকতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। মুক্তির পথ রচনার এই নিরন্তর ও একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতার মাধ্যমে উদীচী সেই সমাজ গঠনের নিশ্চিত পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে; যে সমাজে সুষ্ঠু মানবতাবাদী সুকুমার বৃত্তিগুলোর হবে পরিপূর্ণ বিকাশ; আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা সেখানে বেড়ে উঠবে এক পরিপূর্ণ বিকাশ; আমাদেও ভবিষ্যৎ বংশধররা সেখানে বেড়ে উঠবে এক পরিপূর্ণ মানবিক গুণাবলি ও অধিকারসম্পন্ন মানুষ হিসেবে। সেখানে আমরা দেখব আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল নবজাগরণ।

মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১২০-১২২

পরিশিষ্ট ৬

ইতিহাসের আরেক নায়ক

হ্যানিবল, তোমার নামের পাশে আর একটা নাম যোগ হল অনেক শতাব্দীর রক্ত ক্ষরণের পর।

সে নাম: বহু কণ্ঠে কোরাসের মত কালো কয়লার খনিতে আগুন লাগার মত। কঙ্গো তীরের কালো কালো গাছগুলোর দাবানলের মত, শুধু জ্বলছে। আর জ্বালাচ্ছে কতগুলো হৃদয়, যে হৃদয় ভালোবাসতে পারে, যে হৃদয়ে হাসি আছে, কান্না আছে, সুর আছে।

তোমার দেশের মেয়ে চুল দিয়েছিল না, হ্যানিবল ধনুকের ছিলার জন্য? তবু তো পারলে না। তোমার সাধের সোনার স্বাধীনতা বিকোলো অবশেষে। তারপর কত না র‍্যাফেল আঁকলে মাতৃমূর্তি আর সে দেশের লোক জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে গেল কুমারী সধবাকে। নকলমুক্তা ছুঁড়ে দিয়ে-কালো আফ্রিকা তোমার বুক হতে। নির্মম বিচারক ইতিহাস এগুলো মনে রাখবে।

নিগ্রোর কালো রংয়ের মত ওদের বুট জুতোর আঘাতে কত শত লক্ষ কোটিবার রক্তের ফোয়ারা ছুটছে।

আর কোন মেরী অঁতিনোয়াতে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল, ‘কি আশ্চর্য্য, এদের রক্ত দেখি আমাদের রক্তের মতই টুকটুকে লাল’।

হ্যানিবল, তোমার পাশে আজ যে দাঁড়াল সে আমার লুমুম্বা।

পল রবসন, ওরা তোমায় গাইতে দেবে না, নইলে তুমি কি গাইতে না বেহালা ছুঁড়ে ফেলে জ্যাজের তীব্র স্বরে জনতার সাথে গলাগলি করে, চাই একবার, লুমুম্বার হত্যার বিচার?

অসহায় কাসাডুবু কেঁদে বলে, ওদের প্রভু পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে সে এখন লক্ষকোটি জীবন লুমুম্বা। প্রভু লুমুম্বার মৃত্যু নাই যে আর। তাকে ফের মারতে পারছি না যে!

শ্বেতাঙ্গ প্রভু চমকে দেখে আফ্রিকার আয়নায় তার মুখ কালো হ'য়ে গেছে। সভ্যতার মেকআপ মুছে গেছে কালো এক লুমুম্বার রক্তে।

একখ কোন মুখে লজ্জা ঢাকবে সে তার?

দুহাতে মুখ ঢেকে যিশু জননী কেঁদে উঠে কতবার হে ইতিহাস, আর কত বার বলি দেবে আমার সন্তান, আমার সামনে বারবার?

মামুন সিদ্দিকী (সম্পা.), *সেলিনা বানু : সংগ্রামী নারী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬৪-২৬৫

পরিশিষ্ট ৭

কাগমারী সম্মেলনের পরে পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য বিষয়ে আঁকা কামরুল আহসানের কার্টুন। ছবির ডানের ছবিটির মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থান এবং বাম পাশের শিশুর ছবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৯৫

সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রতিবাদে কামরুল হাসানের কার্টুন

সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?

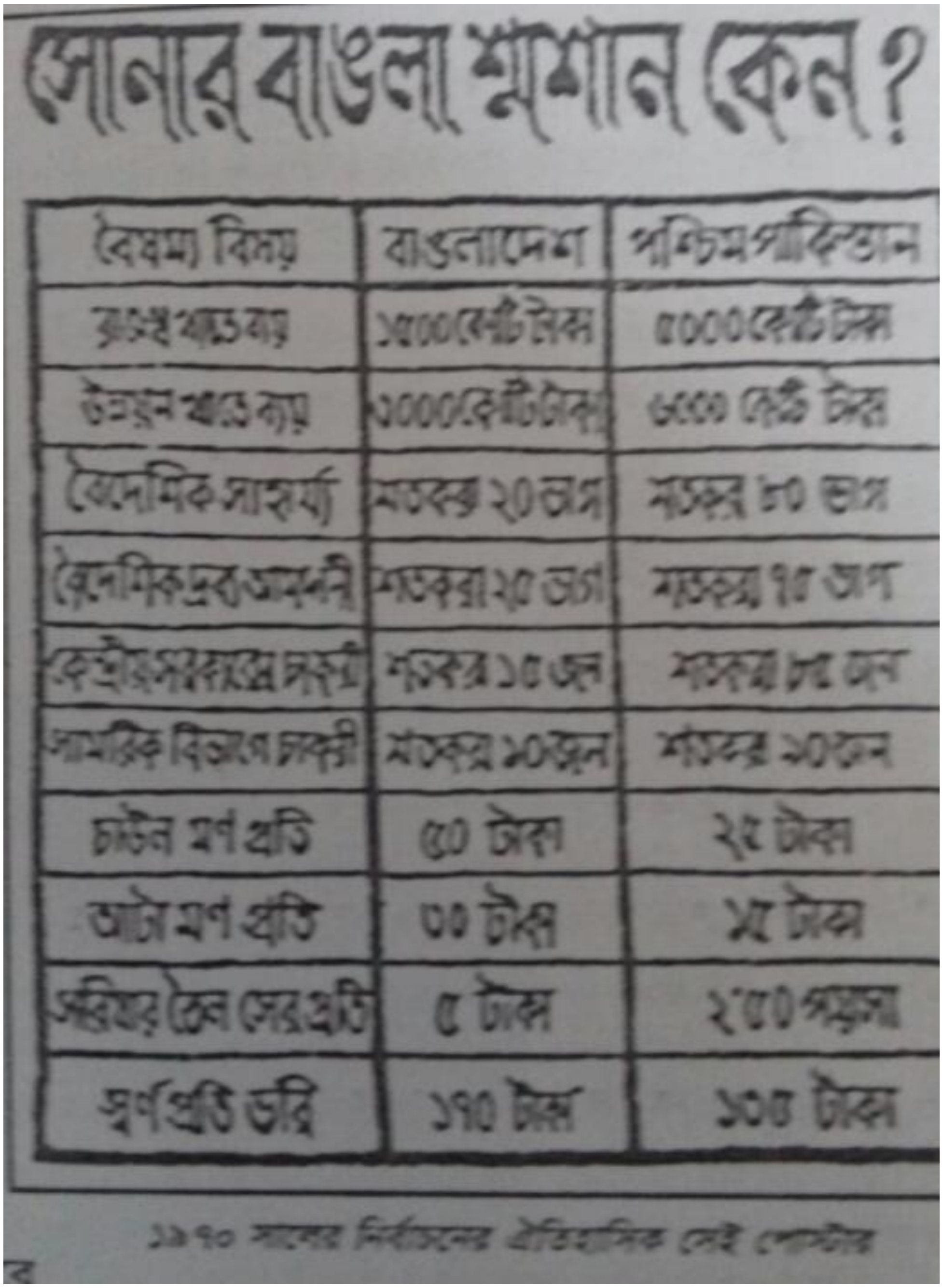

সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাঙলাদেশ	পশ্চিমপাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকুরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২·৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ঐতিহাসিক সেই পোস্টার

হাশেম খান, ‘ছয় দফা সংবিধান এবং একটি পোস্টার’, লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.), *নেপথ্য কাহিনী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪১

পরিশিষ্ট ৮

নির্বাচনী ইশতেহার, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ১৯৭০

জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে। যে শক্তিশালী চক্র গত ২২ বছর ধরে পাকিস্তান শাসন করেছে, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সকল প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরা সেইসব গোষ্ঠী যারা সাধারণ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন। এমনকি নির্বাচনের পরেও তারা শোষণের অবসান ঘটানোর প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্যে সক্রিয় থাকবে।

এজন্য প্রয়োজন হলে তারা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়োজিত করবেন। তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মানুষ আপসহীনভাবে সাফল্যের সাথে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জনতার জনয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি

পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের পাশে পাশেই থাকবে। স্বৈরাচারী ও শোষকগোষ্ঠীর মোকাবেলার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। কোনো জাতি কোনোদিনই আত্মাহুতি না দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার পায়নি। তাই আজ আওয়ামী লীগ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে জানিয়ে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবেলা আওয়ামী লীগ অবশ্যই করবে। গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা হলে আওয়ামী লীগ সব শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম, আর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ।

তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যেই আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপসহীন সংগ্রাম শুরু করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি। ক্ষমতাসীনচক্র সংগ্রামী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্যে হামলার পর হামলা চালিয়েছেন। আঘাতের পর আঘাত হেনেছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুরো কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নকে আমরা পরাভূত করেছি– বিজয়ী হয়েছি। এ বিজয়ই আমাদেরকে গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবেলা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে।

জাতীয় সংকটের মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ

যে সংকট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে সে সংকটসমূহের অবসান ঘটাতেই হবে। আজে জাতীয় সংকটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত, দ্বিতীয় জানগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত, তৃতীয় অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত এগুলি বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি।

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একট সুস্পষ্ট পথ নিদের্শ করা হয়েছে। দেশের প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভঅবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরোখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যানসারের মতো যে দুর্নীতি বিস্তার করে আছে, তাকে অবশ্যই নির্মূল করতে আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

শোষণের অবসান অবশ্য করতে হবে

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ মাত্র দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাংকিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ এ দু'ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাংকের লগ্নিকৃত অর্ধেক শতকরা ৮০ ভাগ আজ মাত্র শতকরা তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশে যে কর প্রথঅ কায়েম রয়েছে তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাদমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ অর্থ আদায় হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপর পক্ষে লবণের মতো অত্যাবশ্যকিয় দ্রব্যাদির উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ করা বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্ন হারে বিশেশি মুদ্রার ঋণ ও অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সৃষ্টির সুয়োগ করে দিয়েছে।

একদিকে সম্পদের পাহাড় অন্যদিকে

ছিটেফোঁটা ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও অধিকারী রয়েছে। তারা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। তাদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকদে অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয়বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর। মজুরি যা বাড়ছে তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয়বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, স্বল্পবেতনভুক্ত কর্মচারী, বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী আজ তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে।

বাংলাদেশ কি পেয়েছে

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত ২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতে মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শত কোটি টাকার মতো (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৩ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু ৩ হাজার কোটি টাকার বিদেশি দ্রব্য তারা আমদানি করেছে। বাংলাদেশর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিন গুণ বেশি বিদেশি দ্রব্য আমদানি করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশি মুদ্র আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি ২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি দ্রব্য আমদানি করতে পেরেছে। তার কারণ বাংলাদেশের অর্জিত ৫০০ কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরও সর্বপ্রকার বিদেশি সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে

সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানও একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে বাঙালির সংখ্যা আজও শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা ১০ ভাগেরও কম। সার্বিখ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একই প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে।

বাংলায় অর্থনৈতিক দুরবস্থা

বাংলার বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধুমাত্র অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, তার শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষেত্রে প্রতিমণ মোটা চালের দাম ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে সে চালের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিষার তেলের দাম আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে সরিষার তেলের দাম ৫ টাকা। করাচিতে যে সোনার দাম প্রতিভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে সোনার মূল্য ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা। তার পরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমসের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গত ২২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুরেছেন, এসব অবিচার তারই পুঞ্জিভূত ফলশ্রুতি। এ অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, অতীতের অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ চতুর্থ পরিকল্পপনার ব্যয় বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৬-দফাতেই রয়েছে সমাধান

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি যে কর্মসূচিতে ১১-দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে কর্মসূচি আঞ্চলিক অন্যায়-অবিচারের বাস্তব সমাধঅনের পথ নির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তর ব্যয় বরাদ্দ আদায়ের চেষ্ট করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণত হিসেবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে, শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যান করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে আওয়ামী লীগের ৬-দফা ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবিত এই স্বায়ত্তশানকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই দিতে হবে। এজন্যেই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশ মুদ্রা অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাদানের ব্যাপারে আমরা সব সময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি। এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলো হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার উর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেল সরকার পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে এক ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল সরকার কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকারের পরিপকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকৈ ফেডারেল চাকুরিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলো যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা মিলিটারি বাহিনী গঠন করে তবে তারা কার্যকরীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে চায় বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের পরিকল্পনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থণ পাবে। আমাদের বিশ্বাস শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব। অন্যান্য অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্যে দেশবাসী কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণী ও সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারব। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম-অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়কারণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলিসহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা, অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনৈতিক এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হতে হবে সরকারি অর্থাৎ জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবে। বেসরকারি পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুবিধা রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কঠিন প্রথার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করতে হবে। কর ব্যবস্থাকে সত্যিকারভাবে গণমুখী করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরো করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভঅবে সমর্থন করে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা এবং রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পাট সমস্যার সমাধান

এ যাবত বাংলার সোনালি আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া বেপারিরা পাট চাষিদের ন্যায্যমূল থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান উৎপাদনের হার ব্যাপকভঅবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতি একই ধরনের গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সেজন্যে আমরা মনে করি তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল, চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপানের ব্যাপারে যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসলের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষিদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চিয়তা দিতে হবে।

কৃষি বিপ্লব চাই

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানিদের জমিদারি, জায়গিরদারি, সরদারি প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমির সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারি খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষিদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ভূমি রাজস্বের চাপে নিস্পিষ্ট কৃষককূলে ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমির রাজস্ব প্রথা তুলে দেবার কথাও ভাবছি। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বনজ সম্পদ,

ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগির চাষ, দুগ্ধ খামার সর্বোপরি মৎস চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানিসম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ-পরিবহন গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক ভিত্তির তিনটি স্তম্ভ

অর্থনৈতিক মৌলিক ভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তম্ভ সেগুলিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটি সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে বিজলি। বিপুলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে বিজলির সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যুৎ মরকরাগ তরদে গকে এবং এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে হবে।

তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টিকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদীর উপর এবং বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষ্যার উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর এবং সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল ব্যবস্থার উপরেও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছি।

শিক্ষার উন্নতি

সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগ আর হতে আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাবার পরিসংখ্যা একট ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর রোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকের বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথীমক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাতে বাংলা ও উর্দু ও ইংরেজির স্থান দলখ করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

বিত্তহীনদের বাসস্থান সমস্যা

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলি বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তুহারা ও বিত্তহীনের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথাকুটে ফিরছে। ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থার প্রয়োজন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে

চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপনের দরকার। চিকিৎসা গ্র্যাজুয়েটদের জন্যে 'ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে বিপুল সংখ্যক প্যারা মেডিকেল পার্সোন্যালদের ট্রেনিং দেয়া দরকার।

শিল্প শ্রমিক

শিল্প শ্রমিকরা গণ-আন্দোলনের মতোই অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জন্যে বেঁচে থাকবার মতো মজুরি, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম আইন বাতিল করতে হবে। শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা দানের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে শিল্ উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মিটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক্ত ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্য দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে।

সকল নাগরিকের সমান অধিকার

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আমরা সব সময়ই সবপ্রকারের সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করে আসছি। সংখ্যালঘুরা অন্যান্য নাগরিকের মতোই সমান অধিকার ভোগ করবে। আইনের সমান রক্ষকবচ সকল ক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরাপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবনের সবক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এই জন্য উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের সবক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এই জন্য উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকার বসবাসকারীরা যাতে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্যে তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থঅনীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সবক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোত করতে পারেন।

মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করুন

৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরান ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোনো আইনই এ দেশে পাস হতে বা চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না।

পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে

পররাষ্ট্র নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আজ বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোনোমতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এজন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হবে। আমরা ইতিপূর্বে 'সিয়াটো', 'সেন্টো' ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে

আসার দাবি জানিয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোনো জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে, সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।

"কারুর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব" এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে, বিশষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী।

আমরা মনে করি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত। এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্য প্রতিবেশীদের মধ্যে বিরোধসমূহের নিস্পত্তির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। জাতিসংঘের প্রস্তাব মোতাবেক কাশ্মীর সমস্যার একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি।

ফারাক্কা বাঁধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ভয়ঙ্কর ও স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে, অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবেলা করতে হবে। কালবিলম্ব না করে এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

গণ-প্রতিনিধিরাই কেবল শাসনতন্ত্র দিতে পারে

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচি ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোটরূপে আমরা গ্রহণ করেছি। একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দিতে পারে– যে শাসনতন্ত্র জনগণের একত্রে বসবাসেসর স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। এ কারণেই আমরা বার বার উল্লেখ করেছি যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। আইনগত কাঠামো আদেশেল বিধিনিষেধ সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্যে আমি পুনরায় প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি

রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এবং বিগত গণ-অভ্যুত্থানকালীন দায়েরকৃত মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হলে গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনের জন্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

সেনাবাহিনী ও রাজনীতি

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করা কোনো প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্র বাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারে অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়।

সর্বশেষে

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবই। প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই একত্রে বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোনো উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তার বিধান করতে হবে। এই ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্য প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকার হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাআল্লাহ, আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হব।

নূহ-উল-আলম লেনিন (রচনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময় প্রকাশন, ঢাকা ২০১৫, পৃ. ২৫৯-২৬৬

পরিশিষ্ট ৯

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ

ভায়েরা আমার,
আজ-দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান 'মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।
আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো-এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।
ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম-আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।
ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপুর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তি-পূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা, আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু-আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলেছি কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখ অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবেনা। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে-শুধু সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমারা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দিবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দিবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো-কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১৫০-১৫২

পরিশিষ্ট ১০

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন হয়। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ উদ্ধৃত হলো।

জনাব স্পীকার সাহেব,

আজ প্রথম সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম নজির যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রদান করছে। বোধহয় নয়, সত্যিই প্রথম-বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে গণপরিষদে এসে তাদের দেশের শাসনতন্ত্র প্রদান করছেন। আজ আমাকে অনেক কিছু স্মরণ করতে হয়, অনেক দিনের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়, কিন্তু আমি তা করতে চাই না। কেবল এই টুকু বলতে চাই, তদানীন্তন ভারতবর্ষ, যাকে আমরা উপমহাদেশ বলতাম- সেখানে সে যুগে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে তার হিসাব করলে দেখা যাবে তাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই রক্তদান করছে বেশি। তার স্বাক্ষর আছে চট্টগ্রামের জালালাবাদে, স্বাক্ষর আছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। বাংলার এমন কোনো জেলা ছিল, এমন কোনো মহকুমা ছিল না যেখানে সে-আমলে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে নাই। সেই আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে সিপাহী বিদ্রোহ এই বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয়েছিল। তারপর বাংলাদেশের জনসাধারণ বহু যুদ্ধ করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে বার বার সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তারা জেল-যন্ত্রণা ভোগ করেছে বহুবার, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেছে অনেক। কিন্তু দুঃখ, বাঙালির জীবনে সুখ কোনো দিন আসেনি। বাংলাদেশ সম্পর্কে ঠাট্টা করে একবার আমাকে একজন বলেছিল, তোমার বাংলার উর্বও জমি তোমার দুঃখের কারণ। তাই বোধ হয়, শকুনিদের বার বার এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কারণ তারা এ দেশের অর্থ-সম্পদের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল। দুনিয়ার সেই সব লোভীরা এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের যারা শাসক ছিল, তারা বাংলার অর্থ, বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে অন্যত্র। গৃহহারা সর্বহারা কৃষক মজুর দুঃখী বাঙালি যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেছে, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায়নি, তাদেরই সম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে কলকাতার বন্দর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, তাদেরই সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠেছে করাচী, ইসলামাবাদ, লাহোর। গড়ে উঠেছে ডাণ্ডি- গ্রেট বৃটেন। এই বাংলার সম্পদ ছিল বাঙালির দুঃখের কারণ। সংগ্রামী বাঙালিরা বার বার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তিতুমীর, যুদ্ধ করেছে হাজী শরীয়তউল্লাহ। তাদের কথা আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়; কারণ বাঙালি আজ শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। স্মরণ করতে হয় শেরে বাংলা ফজলুল হকের কথা, স্মরণ করতে হয় সোহরাওয়ার্দী মরহুমের কথা, আরো স্মরণ করতে হয় মানিক মিয়ার কথা। যদি তাঁর কলম দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। স্মরণ করতে হয় সে সব সহকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যারা জীবন দিয়েছেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ৯ মাসই হয় নাই; স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে। সে সংগ্রামের একটা ইতিহাস আছে। তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। একদিনের সে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছে নাই। ৯ মাস আমরা যে চরম সংগ্রাম করেছি, সে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বহুদিন থেকে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ করে সংখ্যায় মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও বাঙালিরা সব কিছু হারিয়ে ফেলে। জনাব জিন্নাহ সাহেব, যাকে অনেকে নেতা বলে মানতেন, বাঙালিকে এক শকুনির হাত থেকে আরেক শকুনির হাতে ফেলে দিয়ে করাচীতে রাজধানী কায়েম করলেন। এমন কি জিন্নাহ সাহেব মরার পূর্বে তাঁর সম্পত্তির যে দলিলপত্র করে গিয়েছিলেন সেই দলিল অনুসারে ভাগ পেয়েছিল পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, পেয়েছিল বোম্বের হাসপাতাল এবং করাচী স্কুলকেও তিনি কিছু দান করেছিলেন। কিন্তু বাংলার কোনো মানুষের জন্য এক পয়সাও দান করে যান নাই। বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুগে মেতে পরের ছেলেকে বড় করে দেখি, এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোনো দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোন শব্দ পাই না এক বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতরতা খুব বেশি। ইংরেজি ভাষায়, রাশিয়ান ভাষায়, ফ্রেঞ্চ ভাষায়, চাইনিজ ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোন শব্দ নাই, একমাত্র বাংলাভাষা ছাড়া। এই কারণে বাঙালিদের মধ্যে যেমন ত্যাগ ও সাধনা করার শক্তি ছিল, তেমনি পরশ্রীকাতরতার মনোভাবও দেখা গেছে। বাংলাদেশের যে সকল নেতারা সংগ্রাম করেছেন আমরা তাঁদেরকে বুঝতে পারি নাই; আমরা বুঝেছি মিঃ জিন্নাহ বুঝি আমাদের নেতা হয়ে চলে এসেছেন বোম্বাই থেকে। যা হোক, সেই ইতিহাস এবং ১৯৪৭ সালের করুণ ইতিহাস অনেকেই জানেন।

জনাব স্পীকার সাহেব, ১৯৪৭ সাল থেকে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল বাংলাদেশের মানুষকে একটা কলোনি করে রাখার জন্য। বহু আগেই পশ্চিমা শক্তিকে এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের একদল লোক

ছিল যারা স্বার্থের লোভে, পদের লোভে, অর্থের লোভে তাদের সঙ্গে বার বার হাত মিলিয়েছে, তারা বার বার চরম আঘাত হেনেছে আমাদের উপর। আঘাত হেনেছে ১৯৪৮ সালে, আঘাত হেনেছে ১৯৫২ সালে, আঘাত হেনেছে ১৯৫৪ সালে। এমনকি ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র রচনার সময় যখন বাঙালিরা পরিষদ থেকে 'ওয়াক আউট' করে, তখনো বাঙালিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বেঈমানি করে পশ্চিমাদের সঙ্গে হাত মেলায় মন্ত্রিত্বের লোভে। ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' বাংলার উপর আসে বাঙালিকে শোষণ করার জন্য। যখন পশ্চিমারা দেখে বাংলার মানুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তখন তারা বাংলার মানুষের উপর শক্তি প্রয়োগ করে, তাদের শক্তি ছিল একটা, সেই শক্তি তাদের সামরিক বাহিনী। ইংরেজ তাদের সাম্রাজ্যবাদ রক্ষা করার জন্য সামরিক বাহিনী গঠন করতে পাঞ্জাবের কয়েকটি এলাকা বেছে নিয়েছিল, সেখান থেকে সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হতো। বাঙালিকে বিশ্বাস করা হতো না, বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে নেয়া হতো না; কারণ বাঙালিরা বিদ্রোহ করে, এই হচ্ছে তাদের দোষ। ১৯৪৭ সালে তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় ছিল বেশি, বুদ্ধিতে ছিল ভালো, লেখাপড়া ভালো জানত, আক্কেল তাদের প্রখর ছিল। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বাঙালিদের ছিল, যার জন্য বার বার তারা মার খেয়ে গেল, যদিও তা পূরণের জন্য আমাদের অনেক সহকর্মী চেষ্টা করেছিলেন, সেটা ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি। সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি তার অধিকার আদায় করতে পারে নাই। যখন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছে তখনই এসেছে চরম আঘাত। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারার বলে শেরে বাংলা ফজলুল হককে ঘরের মধ্যে অন্তরীণ করা হয়, আমিসহ ৫০ জন সহকর্মী যাঁরা তদানীন্তন এম, এল, এ, ছিলেন তাঁদেরকে এবং প্রায় ৫ হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। সে যুগের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস, সে কথা কল্পনা করতেও শিউরে উঠি; যখন মানুষ আমাদের একটু স্থান দিত না, কারো বাড়িতে জায়গা পাওয়া যেত না, আত্মীয়-স্বজন ভয় করতো, একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করতো না। সে যুগে ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ আমলে জিন্নাহ সাহেবের জীবিত অবস্থায় যাঁরা এদেশে বিরোধী দল গঠন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তাঁদের কথা যদি স্মরণ না করি তবে অন্যায় হবে। তাদের কথা আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আরো স্মরণ করি তাদের কথা যাদের রক্তে এই ২৫ বছর বাংলাদেশের পথ-ঘাট-রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে; যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, কত মা আজ পুত্র হারা, কত পিতা আজ সন্তান হারা, কত সংসার যে ছারখার হয়ে গেছে তার সীমা নাই। পশ্চিমা শোষকরা শেষ পর্যন্ত কত খেলা খেলে গেল। উড়ে এস এক একজন জুড়ে বসত।

জনাব স্পীকার সাহেব, আমি গত নির্বাচনের পূর্বে ও পরে বলেছিলাম যে জাতি একবার রক্ত দিতে শিখেছে সেই জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না, সেই জাতিকে কখনো কেউ পদানত করতে পারে না- সেকথা অক্ষরে অক্ষরে আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। অনেকে দালালি করেছেন প্রগতির নামে; হিয়া খানের দালালি আইয়ুব খানের দালালি করেছেন। আজকের অনেকেই তখন রাজনৈতিক জীবনের জন্ম হয় নাই, তারাও অনেক সময় আজ সমালোচনা করেন আমাদের। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি বলে সমালোচনা করার অধিকার দিয়েছি। সমালোচনা করুন, সত্য কথা বলতে ভয় না পাওয়া সৎ সাহসের কাজ। গত সংগ্রামের সময় ২৫ মার্চ তারিখে আক্রমণ চলে এবং আমার বাড়িতে মেশিনগান মেরে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়, সেই সময় আমার সহকর্মীদের আমি হুকুম দিয়েছিলাম– যাও, চলে যাও, যার যার এলাকাতে গিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোল এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাও। ২৫ মার্চ তারিখে যে আক্রমণ চলে সে আক্রমণ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সেনাবাহিনীর উপর, বাঙালি ইপিআর, বাঙালি পুলিশ, বাঙালি রক্ষীবাহিনীর উপর, আর বিশেষ করে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর। এবং যারা এ দেশের দুঃখী মানুষ তাদের বস্তি পুড়িয়ে দেয়া হয়। রাস্তায় ঢাকা শহর থেকে আরম্ভ করে সারা বাংলাদেশে সেই ২৫ তারিখ রাত থেকে অত্যাচার শুরু হয় এবং মেশিনগান চলে। যখন আমি বুঝতে পারলাম আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে– মনে হলো এই বুঝি আমার শেষ, তখন চেষ্টা করলাম কি করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছে দেয়া যায় এবং তা আমি পৌঁছিয়েও দিয়েছিলাম। সেদিন আমিলাশ দেখেছি, রক্ত দেখেছি। সেই রক্তের উপর দিয়ে, রক্তাক্ত মানুষের লাশের পাশ দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন আগুন আমি দেখেছি। তাদের শুধু বলেছিলাম, তোমরা আমাকে হত্যা কর, আমার মানুষকে প্রাণে মের না। তারা আমার কথা শোনে নাই, তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তারা আমার সহকর্মীদের হত্যা করেছে, এই গণপরিষদের বহু কর্মীকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে, দুনিয়ার ইতিহাসে তা দেখা যায় না। হালাকু খাঁ কাহিনী পড়েছি, চেঙ্গিস খাঁর কাহিনী পড়েছি, হিটলার মুসোলিনির কাহিনী পড়েছি, কিন্তু মানুষ যে এত জঘন্য পশু হতে পারে তা দেখি নাই। তারা দুই বছরের দুধের বাচ্চাকে হত্যা কওে তার বুকে 'বল জয় বাংলা'

লেখা এঁটে গাছের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছে। মানুষ এত জঘন্য পশু না হলে ৭০ বছরের বৃদ্ধার উপর কি পাশবিক অত্যাচার করতে পারে? তারা লক্ষ লক্ষ দুধের বাচ্চাকে হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। সে রক্তের স্মৃতি আমরা ভুলতে পারি না। তাদের কথা আমাদের স্মরণ করতেই হয়।

আওয়ামী লীগ আমার সহকর্মীরা বা আমি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি নাই। ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করতে চাই না। ক্ষমতা চাইলে ক্ষমতা ভোগ করতে পারতাম। সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম। আমার সহকর্মীরা বাংলার ক্ষমতা মন্ত্রিত্ব করতে পারত। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে, বাংলার মানুষ সুখী হবে, বাংলার সম্পদ বাঙালিরা ভোগ করবে। সেই জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। জনাব স্পীকার সাহেব, বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ অনেক সময় আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমার সহকর্মীরা সবাই তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, এই পরিষদের এমন কোন সদস্য নেই যার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয় নাই, আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করা হয় নাই। আজ অনেকে এদের সম্পর্কে অনেক কথা বলে, বলাটা স্বাভাবিক। কারণ যে কাজ করে তারই বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলে, যে কাজ করে না তার বিরুদ্ধে মানুষ বলে না। আওয়ামী লীগের এমন অনেক সদস্য আমার কর্মী ভাইবোন আছে যাদের ঘরবাড়ি এমন কি সর্বস্ব চলে গেছে তবুও তারা ক্ষমতা চায়নি। সেদিন তারা সর্বস্বান্ত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে বুঝতে পারছে না কি করবে, আমি তাদের কাছে নাই। আমি ঘোষণঅ করে বলে গিয়েছি, সমস্ত জেলায় মহকুমায় এক সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু কর এবং হয়েছিলও তাই। আমার সহকর্মীরা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে স্বাধীন সরকার গঠন করে দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সেদিন অনেকেই এগিয়ে আসেন নাই। শুধু আরাম করে খেয়েছেন। এই সংগ্রামের কথা চিন্তাও করেন নাই। সেই ভাঙাচুরা দল অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে দুনিয়ার কাছে সমস্ত কিছু পরিস্কার করে তুলে ধরে, তারপর পুরোদমে সংগ্রাম করে চলে। নির্ভীক বাংলার সৈনিক, নির্ভীক মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ, সাবেক ইপিআর, নির্ভীক বাংলার ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও সরকারী কর্মচারীদের একাংশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই নমরুদের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম হয়েছিল চরম সংগ্রাম। তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছিল, তখনো তারা অন্যান্য জায়গা থেকে অস্ত্র পায়নি; দেশের মধ্যে থেকে অস্ত্র যোগাড় করে নিয়ে তারা সে সংগ্রাম করে। সেই ভাবেই এক মাস দুই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে। তারপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী ভাল ভাল আধুনিক অস্ত্র পেয়ে গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর জ্বালিয়ে দেয়; কিন্তু পদানত হয়নি বাঙালি। সেজন্য আমি স্মরণ করি সেই ৩০ লক্ষ লোককে, যারা রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। আমি আরো স্মরণ করি আমার সেই পঙ্গু ভাইদের কথা যারা আজ পঙ্গু হয়ে বসে আছে। তাদের জন্য কর্তব্য করতে চেষ্টা করছি, পঙ্গু ভাইদের জন্য ট্রাস্ট করে দিয়েছি ৪ কোটি টাকা ব্যয় করে, সেখান থেকে তারা পেনশন পাবে সারা জীবন। আমি আরো স্মরণ করি আমার নির্যাতিতা মা- বোনের কথা। ২ লাখ নির্যাতিতা মা-বোন আজো ক্যাম্পে ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের ইজ্জত নষ্ট করে দিয়ে গেছে পাকিস্তানী সেই দস্যুরা যারা ইসলামের নাম নিয়ে চিৎকার করতো, মুসলিম বাংলা বলে চিৎকার করতে লজ্জাবোধ করে নাই। সেই ২ লাখ মা- বোনের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় করা হবে।

যাক, সে সব কথা, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি অনেক রক্তের বিনিময়ে। আমি প্রথমেই বলেছি, এই শাসনতন্ত্র শহীদের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। কোন দেশে কোন যুগে আজ পর্যন্তও এত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এত তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই। স্বাধীনতার পর দেশে যে অবস্থা বিরাজ করছিল জনসাধারণ তা জানে, বৈদেশিক মুদ্রা কয় পাউন্ড ছিল তা সকলের জানা আছে, রাস্তাঘাটের কি অবস্থা ছিল এই সবই আপনাদের জানা আছে। মানুষের ভুললে চলবে না যে, স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশ একটি কলোনি মাত্র ছিল, শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী মাল এখানে বিক্রি করে তা অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো। সব কিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে যায়, যাবার বেলায় তারা গর্ব করে বলে যায়, বাঙালি যে স্বাধীনতা পেল তা আর কতদিন, দেশকে এমন করে দিয়ে গেলাম যে, লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরবে আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ বাংলার মানুষ কোমর সোজা করে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক, স্পীকার সাহেব, বিপ্লবের পর ৯ মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র দেয়া, মানুষের মৌলিক অধিকার দেয়ার কারণ হলো আমরা জনগণের উপর বিশ্বাসী, এই জনগণের উপর আস্থা নিয়েই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জনগণের উপর আমার আস্থা রয়েছে। আমি আগেই বলেছি, জনগণকে আমরা ভয় পাই না, জনগণকে আমরা ভালোবাসি। সেই জন্য আজ আপনার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। তাঁরা রাতদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। ৫ বছর পর্যন্ত আমরা অনায়াসে শাসনযন্ত্র চালাতে পারতাম, কেউ চ্যালেঞ্জ করলে বাংলার মানুষের কাছে গণভোট দিয়ে প্রমাণ করে দিতাম যে,

বাংলার মানুষ কাদের ভালোবাসে, কিন্তু তা আমরা চাইনি, চেয়েছি মানুষের অধিকার। এই অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। তাই আজ শাসনতন্ত্র দিয়েছি। আমার সহকর্মীর একজনও আপত্তি করে নাই যে, আমরা পরিষদ ভাঙব না। এ জন্য আমি গর্বিত। যাঁরা এই পরিষদের সদস্য হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যাঁরা এই গণপরিষদ সদস্য তাঁরা শাসনতন্ত্র পাস করে বলতে পারতেন যে, ভবিষ্যতে আমরা জাতীয় পরিষদরূপে কাজ করব। কারো কিছু বলার অধিকার ছিল না, কেননা কনভেনশানের রীতি রয়েছে। কিন্তু তা করা হয় নাই। আওয়ামী লীগ যে ক্ষমতার লোভী নয়, এটা তার আর একটি প্রমাণ। সে শাসনতন্ত্র দিয়েছে এবং নির্বাচনে যাবে। আজ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়েছে। আমার সহকর্মীরা প্রায় সকলেই বক্তৃতা করেছেন। যিনি একজন বিপক্ষে আছেন এবং দুইজন স্বতন্ত্র দলে আছেন, তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদেরকে এখানে বেশি সুযোগ দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁরা এখানে আসতে পারলে আরো সুযোগ পাবেন, তাতে আপত্তি নাই, আর যদি না আসতে পারেন তাতেও আপত্তি নাই, জনগণই ঠিক করে দেবে কে এখানে আসবে আর কে আসবে না। ৯ মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র দেয়া হয়েছে, এটা হলো আর একটি নতুন দৃষ্টান্ত। আমি আগেই বলেছি শাসনতন্ত্র ছাড়া, মৌলিক অধিকার ছাড়া দেশের অবস্থা হয় মাঝিহীন নৌকার মত। তাই মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে তারই জন্য আমাদের পার্টি এই শাসনতন্ত্র প্রদান করল। আশা করি জনগণ শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে, তারা খসড়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছেও। কারণ আমরা জনগণের প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা এখানে এসেছি। কেউ আমাদের পকেট থেকে বের করে দেন নাই অথবা আমরা আসমান থেকে পড়ি নাই কিংবা কেউ এসে আমাদের মার্শাল ল' জারি করে বসিয়ে দেন নাই। মার্শাল ল' জারি আমরা করতে পারতাম। যেদিন আমার বন্ধুরা, সহকর্মীরা এখানে এসে সরকার বসান, সেদিন তাঁরা বলতে পারতেন, Emergency, no democracy, no talk for 3 years–এবং সেটা মানুষ গ্রহণ করতো। কোন সমালোচনা চলবে না, কোন কথা বলা চলবে না, কোন মিছিল হবে না, কোন পার্টির কাজ চলবে না। কারণ দেশের যা অবস্থা ছিল, তাতে এটা সহজেই করা যেত। সব দেশে, সব যুগে বিপ্লবের পরে তাই হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা চাই নাই। শক্তি আমাদের ছিল। আমাদের শক্তি আমাদের জনগণ। কেউ যদি মনে করেন যে, শক্তির উৎস বন্দুকের নল, আমি তা স্বীকার করি না। আমি স্বীকার করি, আমার দল স্বীকার করে শক্তির উৎস হলো জনগণ।

জনাব স্পীকার সাহেব, ৪টা মূল স্তম্ভের উপর এই শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে।

এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হাউসে হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই এর উপর বক্তৃতা করেছেন। আমার সহকর্মী ডঃ কামাল হোসেনও অনেক কথার উত্তর দিয়েছেন। এই যে ৪টা স্তম্ভের উপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকারই হচ্ছে মূল বিধি। মূল ৪টা স্তম্ভ–জনগণ ভোটের মাধ্যমে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে। শুধু ভোটের মাধ্যমে নয়, ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে? জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ছিল চরম মরণ সংগ্রামে। জাতীয়তাবাদ না হলে কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে। অনেক ঋষি, অনেক মনীষী, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক শিক্ষাবিদ এ সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আর নতুন সংজ্ঞা নাই বা দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি যে বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি। এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকলের সাথে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে, তাহলে কোন জাতি বড় হতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু কিন্তু সেখানে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে, তারা একটি জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই। জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির উপর। আজ বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে; এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল যার উপর ভিত্তি করে, এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছি যার উপর ভিত্তি করে সেই অনুভূতি আছে বলেই আমি বাঙালি, আমার 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদ।

দ্বিতীয় কথা, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র-সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারণা আছে এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যে সব দেশে চলেছে, দেখা যায় সে সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রটেকশন দেয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই, শোষিতের গণতন্ত্র এবং শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো- আমার দেশে যে গণতন্ত্রেও বিধিলিপি আছে তাতে সে সব, বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়, শোষকরা যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অন্যের পার্থক্য আছে। সেটা আইনের অনেক শিডিউলে রাখা হয়েছে, অনেক বিলে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেক বিলে রাখঅ

হয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনিও জানেন। অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। সুতরায় নিশ্চয় আমরা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি। তার মানে হলো, শোষক গোষ্ঠী যাতে এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে। শোষিতকে রক্ষা করার জন্য এই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হবে। সেজন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।

তৃতীয়, সোশ্যালিজম্-অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ঐগুলো জাতীযকরণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না তাদের আগে বুঝা উচিত সমাজতন্ত্র কি। সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর বার হয়ে গেলো, অথচ এখনো তারাও সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয়-অমনি চেখে খাওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিন সময় প্রায়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছা যায়। এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ-যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি- শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কি আবহাওয়া, কি ধরনের অবস্থা, কি ধরনের মনোভাব, কি ধরনের আর্থিক অবস্থ সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে চীন তা করেনি সে অন্যদিকে চলেছে। রাশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে। ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনদিন সমাজতন্ত্র তাঁরা কোনদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। কারণ লাইন, কমা, সেমিকলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না- যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনেবৃত্তি, তাদের রীতিনীতি, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সবকিছু দেখে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোন দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম্ এনেছে তারাও সেগুলো করতে পারেন নাই- এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোন কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তারপরে আসলো ধর্ম নিরপেক্ষতা। ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবে না। ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম করবে তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে নিয়ে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন ব্যাভিচার-এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পরিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলবো ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যদি বলে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নাই, আমি বলব সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যদি গুটিকয়েক লোকের অধিকার হরণ করতে হয়, তা করতেই হবে।

কোন কোন বন্ধু বলেছেন, শিডিউলে এ জিনিস নাই ও জিনিস নাই। জনাব স্পীকার সাহেব, কেবল শাসনতন্ত্র পাশ করলেই দেশের মুক্তি হয় না, আইন পাশ করলেই দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয় না। ভবিষ্যৎ বংশধর জনসাধারণ কি করে, কিভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে তারই ওপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের সাফল্য, তার কার্যকারিতা। আমরা চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র দিয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন যে, সরকারী কর্মচারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তাঁরা অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রও পড়ুন। সরকারী কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তাঁরা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তাঁরা কোন ভিন্ন শ্রেণী নন। ইংরেজ আমলেও তাদের প্রটেকশন দেয়া হতো, সেই প্রটেকশন আবার পাকিস্তান আমলেও দেয়া হতো। আমলাতন্ত্রের সেই প্রটেকশন-এর উপর আঘাত করেছি, অন্য জায়গায় আঘাত করিনি।

এই শ্রেণী রাখতে চাই না, কারণ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আইনের চোখে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজদুর-কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা হয়। মজদুর-কৃষকদের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তাঁরা পেতে পারেন না। সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন, সেবক। Some people came to me and wanted protection from me. I told them, “My people want protection from you, gentlemen” আমি তাঁদেরকে তাঁদের মনোভাব আমূল পরিবর্তন করতে বলেছি। কেউ কেউ শাসনতন্ত্রের নবম ভাগের সমালোচনা করেছেন। গত ৯ মাসে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থ গ্রহণ হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আরো বেশি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে। আজ যে কাজ করবে এবং লোকে তাকে কতটুকু ভালবাসে তার উপর নির্ভর করবে তার প্রমোশন। প্রমোশনের ব্যাপারে গরিব, অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদেরও অধিকার থাকবে। গরিব কর্মচারীদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আজীবন সংগ্রাম করেছি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। আজো বলছি, ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব। তারা গরিব আমি জানি। তাদের অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানে। আমরা ‘সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি’ গঠন করেছি। সেই কমিটির সদস্যদের বলছি, ডঃ কামাল হোসেনও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ১২৫টি ষ্টেপ বা প্রাদেশিক সরকারের ৩৩টি ষ্টেপ আমরা রাখব না। এই ১২৫ ও ৩৩টি ষ্টেপের মধ্যে যে কত ফাঁক ছিল যার সুবিধা নিয়ে অনেক প্রমোশন হতো। মাত্র ৭ আসমান- অর্থাৎ ৭টি স্তর-এর বেশি ষ্টেপ সরকারী চাকরিতে থাকবে না। এতে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু কিছু লোক গোপনে গোপনে ফুসফাস করছেন এবং এম,সি,এ- দেও কাছে যাওয়া আসা শুরু করেছেন। আমি এহিয়া খান, আইয়ুব খানের তমঘা নিয়ে বেড়াইনি। আমরা চোঙ্গা ফুকে রাস্তায় ঘুরে জনসমর্থন নিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আজ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, এহিয়া খান, আইয়ুব খানের সেই প্রটেকশন পাবেন তা'হলে ভুল করেছেন। সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যাঁরা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের খতম কর, ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, তাঁরাই আবার সভা করে উল্টো প্রস্তাব পাস করেন। নীতি এক হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলে সরকারকে ধ্বংস করার জন্য অফিসগুলোতে দালালে ভরে গিয়েছে। দালাল আছে, সত্য। কাজ না করে টেবিল চেয়ারে বসে থাকা আজকাল যেন একটা স্টাইল হয়েছে। Mentality must be changed, ঐ CSP, PSP., বাংলাদেশের থাকবে না। সরকারী চাকরিতে ৭টি স্তর থাকবে। সার্ভিসেস রি-অর্গানাইজেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাঁরা নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসবেন তাঁলা কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আইন পাস করবেন তখন সব হবে। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করে কাজ করা হচ্ছে। স্ক্রুটিনি কমিটি করা হয়েছে, সেটা থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে। বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। সেটা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে, বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ ৭৫ টাকা বেতন পাবে কেউ ২ হাজার টাকা পাবে তা হতে পারে না। সকলে বাঁচবার মতো অধিকার থাকতে হবে। একজন সবকিছু পাবে, আরেকজন পাবে না তা হতে পারে না। বেতন কমিশন সরকারী কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতন ঠিক করে দিবেন। সম্পদ ভাগ করে খেতে হবে।

বিরোধী দলের নাম শুনতে পাই। দেশে এ রকম কোন পার্টি আছে কিনা জানি না। নির্বাচনের আগে এ রকম কোন পার্টি ছিল না। অনেকেই ভোট না পেয়ে পশ্চাৎপসরণ করেছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যদি তারা ভোট না পায় সে দোষ আমাদের হবে না। ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুন, আমরা বিরোধী দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায়নি তারা বলে আমরা বিরোধী দল। ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুন আমরা বিরোধী দল। তা না হলে বলুন এই এই আমাদের দাবি।

গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার ব্যবহার করতে হবে। তার জন্য ethics মানতে হয়। খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করতে হলে ethics মানতে হবে। তা না হলে ethics impose করা হয়। গণতন্ত্রের যে অধিকার তা কেবল চেঁচিয়ে বেড়ালে পালন করা হয় না, বক্তৃতা করলে হয় না। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ২৪ লাখ .. খাবার বিদেশ থেকে এনে ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এ জন্য ধন্যবাদ দেয়া উচিত। রেলওয়ে ব্রিজ নাই, কাঠ নাই, বাঁশ নাই। ৬৫ হাজার গ্রামে খাবার পৌঁছে দিয়েছি।

যারা বিরোধিতা করেছেন তাঁরা মেহেরবানী করে যান না, রিলিফ কমিটি করে চাঁদা তলে একটা গ্রামের কিছু লোককে যদি কিছু খাওয়াইতে পারেন, পাঁচটা পাঁচটা লোকে যদি খাওয়াইতে পারেন তাহলেও বুঝি যে দেশের লোকদের জন্য কিছু করছেন। শুধু খবরের কাগজে নাম উঠার জন্য বক্তৃতা করে গণতন্ত্র চাই বললে কি হবে? গণতন্ত্রে যেমন অধিকার আছে

তেমনি সাথে সাথে কর্তব্যও রয়েছে। সেই জন্য শাসনতন্ত্র রচা করার সময় আমরা ৪টি স্তম্ভ ঠিক রেখেছি। এমি শাসনতন্ত্রের clause by clause উপর বলতে চাই না। আমার সহকর্মীরা clause by clause আলোচনা করেছেন। সেই জন্য, জনবা স্পীকার সাহেব, গণতন্ত্রের কথা আমরা যেমন শাসনতন্ত্রে বলেছি তেমনি সেখানে কর্তব্যের কথাও রয়েছে। জনগণের দাবির মধ্যে আছে ভোটের দাবি। গত বছর পর্যন্ত ভোটারের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা ছিল ২১ বছর, আমরা শাসনতন্ত্রে সেটা ১৮ বছর করেছি। এটাও জনগণের দাবির মধ্যে একটা। আমরা শাসনতন্ত্র প্রদান করেছি, এর উপর আইন পাস হবে যার দ্বারা দেশ পরিচালিত হবে। আমার ভায়েরা ভুল করেছেন, শাসনতন্ত্রেও অর্থ আইন নয়। শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইন হয়। আইন যে কোন সময় পরিবর্তন করা যায়। শাসনতন্ত্র একটা জিনিস যার একটা আদর্শ, নীতি থাকে, সেই শঅসনতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে আইন পাশ করতে হয়। অনেকে ভুল করেছেন, ভুল করে যাচ্ছেন। বলছেন, শাসনতন্ত্র বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কেউ বুঝবার চেষ্টা করেন নাই বা বুঝবার মতো আক্কেল নাই তাই বুঝতে পারেন না কিংবা বুঝতে চান না। শাসনতন্ত্রের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে আইন হয়। সেই মৌলিক নীতির উপর ভবিষৎ এসেম্বলীতে আইন পাস হবে। এই মৌলিক নীতি বিরোধী কোন আইন হতে পারবে না। শাসনতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে, ধর্ম নিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, দুঃখী মেহনতি মানুষকে যেন কেউ exploit করতে না পারে। তাদের শোষণ করার জন্য যারা দায়ী সেই সব শোষকদের অধিকার খর্ব করা হবে। শোষকদের ভোটের অধিকার দেয়া হয় নাই বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার দাবিও আছে। আমার দেশে ফিরে আসার আগে দেশের লোক তাদের যে মেরে ফেলে নাই সেজন্য তাদের শোকর করা উচিত। আমরা এমন শাসন ব্যবস্থা কয়েম করবো যেখানে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা থাকবে। সাধারণভাবে দোষী, যারা দালালি করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারির কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি। অনেককে জেলে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি। আইনের শাসন আমরা মানি। যারা নিরাপরাধ তারা নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। যারা দোষী, যারা জনসাধারণের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের তারা নাগরিক অধিকার দিতে চায় না। তাদের নাগরিক অধিকার পাওয়া উচিত নয়, কারণ প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে ঘোড়া দিয়ে তারা পাক মিলিটারিকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ধরে, আমাদের ছেলেদের ধরে, মিলিটারির কাছে দিয়েছে। নানা ভাবে তারা দাললী করেছে। স্পীকার সাহেব, এই এসেম্বলীতে যে চেয়ারে আপনি বসে আসেন তার আশপাশে এবং এই এসেম্বলীর এমন কোন দেয়াল নেই সেখানে আমাদের ছেলেদের রক্তের দাগ ছিল না। এই আইন সভায় সে সব দাগ আমাদের পরিষ্কার করতে হয়েছে। আইন পরিষদ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থান, সেখানে তারা ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে কত লোককে ধরে ধরে হত্যা করেছে। আপনি দেয়ালের সেইসব দাগ দেখেছিন কি না জানি না। এই পরিষদে যারা কর্মচারী আছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এখানকার ঘরে ঘরে কামরায় কামরায় দেয়ালে রক্তের দাগ। অনেকে নিজের রক্ত দিয়ে দেয়ালের গায়ে 'জয় বাংলা' লিখে গিয়েছে। এই এসেম্বলীর হলের মধ্যে তারা দালালদের সাহায্যে বহু মানুষকে ধরে এনে জুলুম করেছে। নিরাপরাধ যারা আছে তাদের খালস দেয়া হবে কিন্তু যারা তাদের সাথে সহযোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের- যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের আসন খালি করিয়ে আচকান গায় দিয়ে উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাদের বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার দেয়ারও জনগণ আপত্তি করেছে। জনগণ তাদের বাইরে পেলে কেটে ফেলতো, তাদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি। যাই হোক, আমরা সংবিধানের সিডিউলে যা রেখেছি তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, পূর্বের শাসনকালের কিছু কিছু আইনকে আমরা প্রটেকশন দিয়েছি। সবদেশেই এটা করা হয়ে থাকে, তা না হলে লিটিগেশন করে সব শেষ করে ফেলবে। দেশের প্রয়োজনেই এগুলোর প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কতগুলো আইন পাস করতে হলে আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির প্রয়োজন হবে, কতগুলো শুধু মেজরিটিতেই পরিবর্তন করা যাবে। এই প্রকার পার্থক্য না রাখলে অসুবিধা হবে।

জনাব স্পীকার সাহেব, আজ এই পরিষদে শাসনতন্ত্র পাস হয়ে যাবে। কবে হতে এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবে তা আমাদের ঠিক করতে হবে। আমি মনে করি সেইদিন, যেদিন জল্লাদ বাহিনী রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রের মিত্রবাহিনীর যুদ্ধ কমান্ডের কাছে আত্মসমপর্ণ করেছিল সেই তারিখে। সেই ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বর তারিখ থেকে আমাদের শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবে। সেই দিনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। স্পীকার সাহেব, সেই ইতিহাস আমরা স্মরণে রাখতে চাই। আজ আমাদের কাজ শেষ হবে, আপনি ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষদ মুলতবি করতে পারেন। ১৪ ডিসেম্বর তারিখে সদস্যরা এসে আপনার সামনে মূল সংবিধানে দস্তখত করবেন। শাসনতন্ত্র বাংলায় হাতে লেখা হচ্ছে তাতে

সদস্যরা আপনার সামনে দস্তখত করবেন। ১৪ ও ১৫ তারিখের পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখে শাসনতন্ত্র চালু হবে। চালু হবে বাংলার মানুষের নতুন ইতিহাস।
স্পীকার সাহেব, আপনার কাছে আজ আর একটা কথা ঘোষণা করতে চাই। আমি নির্বাচন কমিশনারের সাথে কথা বলেছি, সরকারের সমস্ত সাহায্য তাঁকে দেব, আমি আশা করি তিনি তা গ্রহণ করবেন। আমি উল্লেখ করছি যে, নির্বাচনের তারিখ স্থির করা হোক ঐ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। সেইদিন, যেদিন বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছিলাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই ৭ মার্চ বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হবে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত সাহায্য করতে চাই এবং জনসাধারণ সম্পূর্ণ সাহায্য করবে বলে আমি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে এ ব্যাপারে আবেদন করবো।
জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার ধৈর্য আমি আর নষ্ট করতে চাই না। আপনি গত রাতে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করেছেন, আমিও কিছু সময় এখানে ছিলাম। আপনাকেসহ পরিষদের সকল কর্মচারীকে তাই ধন্যবাদ জানায়। তাঁরা শ্রদ্ধার সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন। আমি যদি সাংবাদিকদের কিছু না বলি তাহলে মহা অন্যায় হবে, তাই শ্রদ্ধার সাথে বলি আপনারা যে এত কষ্ট করেছেন-এত কষ্টের মধ্যে বসেছেন-বসাবার জায়গা আপনাদের ভালোভাবে দিতে পারি নাই, এই কষ্টের মধ্যে যে ভালভাবে পরিষদের কার্য বিবরণীর রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেছেন তার জন্য এই গণপরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, জানাই মোবারকবাদ। আশা করি ভবিষ্যতে আরো কয়েক বছর কষ্ট স্বীকার করবেন, কারণ নতুন পরিষদ ভবন না নেয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্টের সীমা নাই, আমারও নাই। আর দেশবাসী যখন কষ্ট করছে তার কিছু ভাগ আমাদেরও নেয়া উচিত। জনাব স্পীকার সাহেব, এই কক্ষের পক্ষ থেকে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। জনাব ডেপুটি স্পীকার সাহেব, আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই, তারপর যারা প্রেসে কাজ করেছেন এবং রাত জেগে শাসনতন্ত্রের জন্য ২/৩ শিফটে কাজ করতে হয়েছে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই ৩৪ জন সদস্যকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শাসনতন্ত্র রচনা করেছেন ১১ এপ্রিল তারিখ থেকে। সেই ১১ তারিখে আমরা শাসনতন্ত্র কমিটি গঠন করি তখন দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, দলমত নির্বিশেষে আপনাদের কাছে যে- কোন প্রস্তাব হোক বা কোন মতামত থাকলে মেহেরবানী করে কমিশনের কাছে পাঠাবেন। যদিও তা দু'একটা কেউ দিয়েছেন, কিন্তু যারা খবরের কাগজে বিবৃতি দেন, মাঠে বক্তৃতা করেন, তাঁরা একখানাও দেন নাই। অন্য মানুষদের কাছ থেকে, অধ্যাপকদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি- সেটা সাহায্য করেছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র যারা মানেন না, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' যারা এই ধরনের লোক আছেন তাঁরা কষ্ট করে এক কলমও লিখে পাঠান নাই। এটা আমাদের অভ্যাস, এটা স্বাভাবিক! কথায় আছে জাত যায় না ধুলে, খাসলত যায় না মরলে।
জনাব স্পীকার সাহেব, আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজ আবার স্মরণ করি আমার জীবনের বিপদসমূহের কথঅ যেসব থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি; কিন্তু তা সত্ত্বে আজকে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন, সে আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে আজকে আমার দল যে ওয়াদা করেছিল তার এক অংশ পালন করলো-কিন্তু জনতার শাসনতন্ত্রে কোন কিছু লেখা হয় না। তারা এটা গ্রহণ না করলে প্রবর্তন করা হবে না, ব্যবহার না করলে হবে না। ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মী নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ গঠন করতে পারে, তাহলে আমার জীবন সার্থক। স্পীকার সাহেব, আজ বিদায় নেয়া হচ্ছে, সদস্যরা আবার সই করতে আসবেন। যাঁরা ৫ বছরের জন্য এখানে এসেছিলেন তাঁরা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিলেন, যে উদারতা দেখালেন তা বিরল। ভবিষ্যতে যাঁরা এখানে আসবেন তাঁরা যেন তা উপলব্ধি করেন। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

মোনায়েম সরকার, *বাঙালির কণ্ঠ*, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪০-৩৫৪

গ্রন্থপঞ্জি

আত্মজীবনী ও জীবনী গ্রন্থ

আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৭০
আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩
আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি* প্রথম খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯
আত্মস্মৃতি অখণ্ড, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *নিস্ফলা মাঠের কৃষক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১
আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ পাবলিকেশনস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮৫
আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৫
আত্মকথা, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮
আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রথম অ্যাডর্ন প্রকাশক ২০১২
আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবন* প্রথম খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮
কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রথমা সংস্করণ ২০১৮
খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক* (১৯৩৮-১৯৬৮), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮
গোলাম মোস্তফা, *আমার চিন্তাধারা*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৬৮
নির্মলেন্দু গুণ, *আমার কণ্ঠস্বর*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪
মহাজীবনের কাব্য, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩
বদরুদ্দীন উমর, *আমার জীবন* তৃতীয় খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯
মালেকা বেগম, *সুফিয়া কামাল*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯
মামুন সিদ্দিকী, *ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২
শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬
মাহমুদ নূরুল হুদা, *আমার জীবনস্মৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯
মিজানুর রহমান, *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮
মুর্তজা বশীর, *আমার জীবন ও অন্যান্য*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *নিবেদন ইতি উত্তরখণ্ড*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭
মোনায়েম সরকার, *আত্মজৈবনিক*, ভাষাচিত্র, ঢাকা, ২০১৫
রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথরেখায়*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৯
শহীদুল্লাহ মৃধা, *মহাস্থবির শীলভদ্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪
শামসুর রাহমান, *কালের ধুলোয় লেখা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪
শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, জুন ২০১৩
কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭
শেখ লুৎফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩
সরদার ফজলুল করিম, *নানা কথা*, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭২
সেলিম জাহাঙ্গীর, *সুফিয়া কামাল*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯
সৈয়দ আজিজুল হক, *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮
জয়নুল আবেদিন সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫
সফিউদ্দীন আহমেদ, বেঙ্গল পাবলিকেশন লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩
সৈয়দ আলী আহসান, *জীবনের শিলান্যাস*, বাড কম্প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২
সৈয়দ জাহাঙ্গীর, *আত্মপ্রতিকৃতি স্মৃতির মানচিত্র*, বেঙ্গল পাবালিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৫
সৈয়দ মোহম্মদ শাহেদ, *রমেশ শীল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

হায়দার আকবর খান রনো, *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

রচনাবলি

আনিসুজ্জামান (সম্পা.) *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪
আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫
আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পা.), *হাজার বছর ধরে*, *জহির রায়হান রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ১৯৮০

মনসুর মুসা (সম্পা.), *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), *আবদুল গনি হাজারী রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

রফিকউল্লাহ খান (সম্পা.), *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫
রাজিয়া সুলতানা (সম্পা.), *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, ঢাকা, ১৯৮৯

শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, *শরৎ সাহিত্য সমগ্র*, *ভলিউম ১*, সুকুমার সেন (সংকলন), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৩ বাংলা

সৈয়দ আকরাম হোসেন (সম্পা.), *চাঁদের অমাবস্যা*, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬

সাহিত্য
(নাটক, উপন্যাস, কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ)

নাটক

আলাউদ্দিন আল আজাদ, *মরক্কোর জাদুকর*, চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য
আসকার ইবনে শাইখ, *বর্তমান নাট্যচর্চা*, *ঢাকা মহানগী নাট্যচর্চা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ, *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭

সাবিরা মনির, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭
সুকুমার সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

সৈয়দা খালেদা জাহান, *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩
সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

হোসনে আরা জলী, *বাংলাদেশের নাটক বিষয়-চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২*, অবসর, ঢাকা, ২০১২

উপন্যাস

আবু রুশদ, *নোঙর*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, পরিবর্তিত সংস্করণ, ১৯৭০

কুদরত-ই-হুদা, *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস আঙ্গিক বিচার*, আদর্শ, ঢাকা, ২০১৬

মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪
মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

সুধাময় দাস, *বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ*, মনন প্রকাশ, ঢাকা

কবিতা

আল মাহমুদ, *সোনালি কাবিন ও নির্বাচিত ১০০ কবিতা*, শিকড়, ঢাকা, ২০১৫

রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২

সফিউদ্দিন আহমদ, *সাহিত্যের সেকাল ও একাল*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৬

সিকান্দার আবু জাফর, 'অনিবার্য', *বৈরী বৃষ্টিতে*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫
'আগরতলা ধর্ষিত বন্ধুকে', *বৃশ্চিক লগ্ন*, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭১
'ইতিহাসচারিণী বাঙলা', *বাংলা ছাড়ো*, মাটিগন্ধা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪১
বাংলা ছাড়ো, মাটিগন্ধা, ঢাকা, ২০১২
'সংগ্রাম চলবেই', *কবিতা* ১৩৭২, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮
সৈয়দ শামসুল হক, 'ঘরে ফেরা', *আনন্দের মৃত্যু*, ১৯৬৭
হাসান হাফিজুর রহমান, *আরো দু'টি মৃত্যু*, লেখক সংঘ, ঢাকা, ১ম সং, ১৯৭০
হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫

ছোটগল্প

আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪
আবু ইসহাক, 'জোঁক', *মহাপতঙ্গ*, ১ম সং, ঢাকা, ১৯৬৩
'প্রতিবিম্ব', *মহাপতঙ্গ*, ১ম সং, ঢাকা, ১৯৬৩
আবু জাফর শামসুদ্দীন, 'একজোড়া প্যান্ট', *একজোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য গল্প*, ১৯৬৭
'তাকাল', *আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প*, বর্ধিত ২য় সং, ঢাকা, ১৯৭৪
আবুল ফজল, 'জয়', *আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠগল্প*, ১ম প্রকাশ, চট্টগ্রাম, ১৩৭১
'হাকিম', *আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠগল্প*, ১ম প্রকাশ, চট্টগ্রাম, ১৩৭১
আবুল মনসুর আহমদ, 'ইস্রাফিলের বেটা', *আবেহায়াত*, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৮
খালেদা হানুম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৭
মুহম্মদ হায়দার, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ছোটগল্প*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৩
মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯
শওকত ওসমান, *উভশৃঙ্গ*, 'নেমক হালাল', ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮
উভশৃঙ্গ, 'রাতা', ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮
প্রস্তর ফলক, 'বর্ণামৃত', ঢাকা, ১ম সং, ১৯৬৪

প্রবন্ধ

আনিসুজ্জামান, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৭
আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫
আবুল ফজল, *রেখাচিত্র*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮
সমাজ ও সংস্কৃতি সাধনা, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬১
সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮
সমকালীন চিন্তা, বিবিধ প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ১৯৭০
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, *আমরা বাংলাদেশী, না বাঙালি*, অক্ষরবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৯৭
আবদুল হক, *ক্রান্তিকাল*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬২
বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৩
সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬
সাহিত্য ও স্বাধীনতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪
আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন*, ডানা প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৮৭
আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*, মহাকাশ, ঢাকা, ২০১৩
বিচিত্র চিন্তা, চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮
এম. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন মানুষ ও সমাজ উনিশ শতক*, অবসর, ঢাকা, ২০১৩
গোলাম মোস্তফা, প্রবন্ধ-সংকলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮
বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, মুক্তধারা, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৪
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়ীকতা, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ জুন ১৯৬০

ভবেষ রায়, *হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ শত বাঙালি মনীষীর কথা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা
মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব*, র‌্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫
মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *বাংলাদেশ-দর্শন*, মিতা ট্রেডার্স, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪
রহমান হাবিব, *বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭
রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শন : প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, সুরভী পাবলিকেশন, নরসিংদী, ২০১৬
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *আমাদের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৯
হুমায়ুন আজাদ, *আমার নতুন জন্ম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

শিল্প, সংস্কৃতি, সংবাদ-সাময়িকপত্র, চলচ্চিত্র, মনন সাহিত্য ও ইতিহাস

অজয় দাশগুপ্ত, *সংবাদপত্রে হরতালচিত্র ১৯৪৭-২০০০*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০১
অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১২
অনুপম হায়াৎ, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র, পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১১
অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫-৭৫*, ঢাকা বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ঢাকা
আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ*, অনন্যা, ঢাকা, আগস্ট ২০০৯
আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮
রবীন্দ্রসাধক ওয়াহিদুল হক, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১
আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষাআন্দোলল স্বাধীনতা*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫
আবদুল্লাহ আল-মুতী, *স্বাধীনতা শিক্ষা অন্যান্য প্রসঙ্গ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৫
আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬
আবু দায়েন, *বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন*, প্রচলন, ঢাকা, ২০১৫
আবুবকর সিদ্দিক, *রুদ্রপদাবলী : গণমানুষের গান*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮
আবুল মনসুর, *শিল্পকথা শিল্পীকথা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬
আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২
আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, সপ্তম সংস্করণ মে ১৯৯৮
আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গবর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯
আহমেদ আমিনুল ইসলাম, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮
ইসরাইল খান, *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র প্রগতিশীল ধারা ১৯৪৭-৭১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬
মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, কাশবন, ঢাকা, ১৯৯৯
এ জামান, *সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে যশোরের স্পর্শ*, প্রকাশক : এ বি এম আশরাফউজ্জামান, যশোর, ২০০৪
এম, আর আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, অন্যন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯
এম, কুদরাত-এ খুদা, *পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-সম্ভাবনা*, ঢাকা, ১৯৬৪
এম এম আকাশ, *বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮
এস ওয়াজেদ আলী, *আকবরের রাষ্ট্র সাধনা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, নবযুগ সংস্করণ ২০১৮
ভবিষ্যতের বাঙালি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬
কাবেরী গায়েন, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ*, বেঙ্গল পাবলিকশন্‌স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩
কামরুল হাসান, *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০
কামাল লোহানী, *আবহমান বাংলা*, আকাশ প্রদীপ, ঢাকা, ১৯৯৩
আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬
কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

খান মাহবুব, *বাংলার সাহিত্য সম্মেলন*, একাত্তর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

গোলাম মুরশিদ, *বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯

তপন বাগচী, *বাংলাদেশেল যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, শিখা প্রকাশনী , ঢাকা, ২০০৮

তোফায়েল আহমেদ, *ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

দেবেন সিকদার, *উপমহাদেশের কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি*, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮

দেলওয়ার হাসান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি মানিক মিয়া ও সমকালীন রাজনীতি*, মানিক মিয়া রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২০১৫

নূরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৮

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, কলিকাতা, ১৯৮০

পলাশ রাউত, *স্লোগান চেতনায় প্রজ্জ্বলিত দুর্বার উচ্চারণ*, শোভা প্রকাশ, ২০১৩

ফকির আলমগীর, *গণসঙ্গীতের অতীত ও বর্তমান*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪

বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২

পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ২, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২

বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম : সাংস্কৃতিক ধারা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *কামরুল হাসান*, জার্নিম্যান বুক্‌স, ঢাকা, ২০১৬

জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা, জার্নিম্যান বুক্‌স, ঢাকা, ২০১৬

নানা শিল্পীর নানা কাজ, জার্নিম্যান বুক্‌স, ঢাকা, ২০১৭

বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে শিল্পীসমাজ*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫

মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা (সাল)

মুনতাসীর মামুন, *রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আমাদের হলেন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩

বাংলাদেশ বাঙালি মানস রাষ্ট্রগঠন ও আধুনিকতা, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৭

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪

বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩

বাংলাদেশের রাজনীতি : একদশক (১৯৮৮-১৯৯৮), অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯

মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৫

মুনতাসীর মামুন, জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫

মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

মামুন সিদ্দিকী, *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫

মাসুদ-উর-রহমান, *স্মৃতি ধন্য অন্তর*, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

মহসিন শস্ত্রপাণি, *লাল পতাকার নিচে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০১৭

মাহফুজুর রহমান, *পূর্ববাংলায় নৃত্যকলা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

মাহফুজুর রহমান, *বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ*, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম, ২০১৪

মাহবুবুল হক, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, বাংলাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

মাহবুব আলম চৌধুরী, *সংস্কৃতি : জাতীয় মুখশ্রী*, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা

মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০

মিজান রহমান, *লিটল ম্যাগাজিন*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫

মুনীর চৌধুরী, *বাংলা গদ্যরীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

মুহম্মদ খসরু, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন*, পড়ুয়া, ঢাকা, ২০০৪

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, দ্বি-স, ঢাকা, ১৯৮৯

মো. এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮
মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সংবাদপত্র ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৩
মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯
মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলার চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) : দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২
স্বাধীনতার পটভূমি ১৯৬০ দশক, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪
মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের ইতিহাস*, বিজয় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯
মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
বাংলাদেশেল ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ওয়ার্সী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭
যতীন সরকার, *আমাদের চিন্তাচর্চার দিক্-দিগন্ত*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮
রফিক হোসেন, *বাংলাদেশের ১০ চিত্রশিল্পী*, 'শিল্পী জয়নুল আবেদিন', ভূমিকা, ঢাকা, ২০১০
রফিকুল ইসলাম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা, ঐতিহ্য, ২০০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর, অনন্যা, ঢাকা, ২০১২
রবিউল হুসাইন, *বাংলাদেশের স্থাপত্যসংস্কৃতি ও অন্যান্য রচনা*, জার্নিম্যান বুক্‌স, ঢাকা, ২০১৭
রবিউল হোসেন, *সমকাল পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা*, ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫
সমকাল পত্রিকার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা, ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩
রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬
রেহমান সোবহান, *উতল রোমন্থন : পূর্ণতার সেই বছরগুলো*, SAGE Publications India Pvt. Ltd, New Delhi, 2016
রোজিনা কাদের, *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৪
লেলিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৭
শওকত ওসমান, *সমুদ্র নদীসমর্পিত*, নবজীবন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩
শরীফ আতিক-উজ-জামান, *শিল্প ও শিল্পী*, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১৬
শিবনারায়ণ রায়, *বাঙালিত্বে খোঁজে এবং অন্যান্য আলোচনা*, দে'জ পাবালিশিং, কলকাতা
শেখর দত্ত, *ষাটের দশকের গণজাগরণ : ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা প্রভাব*, সমাজ বিকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫
শৈলেশকুমরা বন্দ্যোপাধ্যয়, *বাঙলা ও বাঙালী*, পাটনা, ১৯৯০
সন্‌জীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫
সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯
সিদ্দিকুর রহমান স্বপন, *বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন স্লোগান প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার*, সুবর্ণ ও বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, ২০০৮
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১১
সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১
সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা
সুব্রত শংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা : তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০
সৈয়দ আলী আহসান, *যখন সময় এল*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২
সৈয়দ আবুল মকসুদ, *কাগমারী সম্মেলন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭
স্বয়ম্ভু সরকার, *বাংলার গণসংগীত*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬
হারুন-অর-রশিদ, *আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা'র ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬
বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ, ২০১৫
বঙ্গীয় মুসলিম লীগ : পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮
বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

হারুনর রশীদ, *চলচ্চিত্রকার সালাহ্উদ্দিন*, চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১১

হাসান মোহাম্মদ, *জাতীয়তাবাদ : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ২০০১

হায়দার আকবর খান রনো, *উত্তাল ষাটের দশক*, পুথিনিলয়, ঢাকা, ২০১৬

হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০

সম্পাদনা ও সংকলন

অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস* চতুর্থ খণ্ড (প্রথম পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

অজয় দাশগুপ্ত (সংকলন ও সম্পাদিত), *সাত দশকের হরতাল ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮

অনুপম হায়াৎ (সং ও সম্পা.), *পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সমালোচনা (১৯৫৬-২০০৯)*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১০

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *চোখের দেখা প্রাণের কথা*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা, ২০০৪

আনিসুজ্জামান, 'সংস্কৃতি সংসদের কথা', হামিদ কায়সার অপু (সম্পা.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন '৮৯ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা, ঢাকা, ১৯৮৯

আনিসুর রহমান (সম্পা.), *চর্যাপদ*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সংগ্রহ) ও অতীন্দ্র মজুমদার (অনু.), জ্ঞানের আলো, ঢাকা

আবুল হাসনাত (সম্পা.), *অনন্য আমিনুল ইসলাম*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২

আবদুল হক, 'সমকাল-এর ভূমিকা', *বাঙালির জাগরণ*, আহমদ মাযহার (সম্পা.), অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, 'লিটল ম্যাগাজিন : ষাট ও সত্তর দশক', *উত্তর প্রজন্ম* (সম্পা.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

কবির চৌধুরী, 'বাঙালি জাতীয়তাবদ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', সম্পাদনা পরিষদ, *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বর্ষে বিজয় দিবস উদযাপন কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৭

কামাল লোহানী ও অন্যান্য (সম্পা.) *উদীচী : বিপ্লবী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার*, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, ঢাকা, ২০১৯

কাজী মাহমুদুর রহমান (সম্পা.), *বেতার স্মৃতি*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৭

নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *পথরেখা, প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, *পথরেখা, প্রসঙ্গ : চিত্রকলা ও স্থাপত্য*, ঢাকা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্মারকপত্র, সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, খুলনা, ২০-২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), *লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭

বাঙালি বাংলাদেশ (সম্পা.), ১৪০০ সাল উদ্‌যাপন পরিষদ, ঢাকা, ১লা বৈশাখ ১৪০০

মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.) *কাগমারী সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ*, কাগামারী সম্মেলনের ৫০ বর্ষ পূর্তি কমিটি, ঢাকা, ২০১১

মহিউদ্দিন আহম্মেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর : মুক্তিযুদ্ধ স্মারক গ্রন্থ*, সিডিএল, ঢাকা, ২০০৬

মামুন সিদ্দিকী (সম্পা.), *সেলিনা বানু : সংগ্রামী নারী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

মাহবুব হাসান (সম্পা.), *সাংস্কৃতিক আন্দোলন চট্টগ্রাম; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দেলন : প্রগতিশীল ধারা*, চট্টগ্রাম, ১৯৯১

মিন্টু বসু (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর*, বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ, বরিশাল, ১৯৯৬

মুজিবর রহমান (সংকলক ও সম্পাদক), *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার কথা*, রাঢ়বঙ্গ প্রকাশনী, রাজশাহী, মার্চ ২০১৫

মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.), *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৭০

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *আবহমান বাংলা*, আকাশ প্রদীপ, ঢাকা, ১৯৯৩

আমাদের বাঙালীত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৪

বাঙালির আত্মপরিচয়, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১১

মোনায়েম সরকার, *বাঙালির কণ্ঠ*, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৮

রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *নাট্য-পরিক্রমা চার দশকের বাংলাদেশ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

রেজোয়ানা সিদ্দিকী (সম্পা.), *আজাদ ও সমকালীন সমাজ সম্পাদকীয় : ১৯৩৬-১৯৭১*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৪

রেহমান সোবহান (রচনা সংকলন), *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ঢাকা, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.), *নেপথ্য কাহিনী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

শওকত হোসেন, শরমিন নিশাত (সম্পা.), *হালখাতা*, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা*, ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪, ঢাকা

শরীফ হারুন (সম্পা.), *বাংলাদেশে দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

শামসুজ্জামান খান, হাবীব-উল-আলম, ওবায়দুল ইসলাম, মোবারক হোসেন (সম্পা.), একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

সাঈদ-উর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা), *আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

সালাহ্‌উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৪৭* (৩য় খণ্ড), বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৭

সেলিম রেজা (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতি ও গান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮

সৈকত আসগর (সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রা শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

স্বরোচিত সরকার (সম্পা.), *জাগরণ ও অভ্যুদয়*, আইবিএস সেমিনার ভলিউম ১১, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

হামিদ কায়সার অপু (সম্পা.), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন' ৮৯ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯

হারুন হাবীব (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ : নির্বাচিত গল্প*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৪

হালী মোস্তফা, *বাংলাদেশের স্থাপত্যজগৎ*, মামুন সিদ্দিকী (সং ও সম্পা.), সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৮

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *একুশে ফেব্রুয়ারী*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

অনুবাদ গ্রন্থ

কাজী আনওয়ারুল হক, *তিন পতাকার তলে*, (অনুবাদ : নূরুল ইসলাম খান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২

জেমস জে নোভাক, *বাংলাদেশ : জলে যার প্রতিবিম্ব*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ঢাকা, ১৯৯৫

তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ : জান্তা না জনতা*, (অনূদিত), ঢাকা, ১৯৯৭

শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী, *ভারত*, *মুজিবুর রহমান*, *বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান* (অজানা তথ্য), তানভীর চৌধুরী (অনু.), সঞ্চিতা, নারায়ণগঞ্জ, ২০১৯

স্মৃতিকথা

আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ ১৯৫৩-'৯৩*, নূরুল হুদা (সম্পা.), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, *'পূবালী'র দিনগুলি ও সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৫

রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪

বক্তৃতা, স্মারক বক্তৃতা ও অন্যান্য

আনিসুজ্জামান, *বাংলা একাডেমি ও আমাদের সমাজ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা ৩রা ডিসেম্বর ২০১৯

ওয়াহিদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম*, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশে গবেষণা ইন্সটিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০

কামাল হোসেন (বক্তৃতা), 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ১৯৭২-১৯৭৫', *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ডিরেক্টর ট্রেনিংয়ের আর্কাইভে সংরক্ষিত ভিডিও, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ আগস্ট ২০১৫

মুনতাসীর মামুন, ১৮৮তম মাঘোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ* গ্রন্থ আলোচনা-২০১৮, বাংলাদেশ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা, তারিখ : ২০ জানুয়ারি ২০১৮

মুনতাসীর মামুন (বক্তৃতা), 'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা ও তার বাস্তবায়ন', জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বক্তৃতা, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, সুফিয়া কামাল মিলনয়াতন, জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২৪ আগস্ট ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

মুনতাসীর মামুন (বক্তৃতা), 'শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকবক্তৃতা', ডাব্লিউভিএ, ২৬ জুন ২০১৫

শামসুজ্জামান খান, 'বাংলা, বাঙালিত্ব : বাঙালি মুসলমানদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রসাধনা', *মাস্টারদা সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতা-২০১৬*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৭

সন্‌জীদা খাতুন (বক্তৃতা), 'শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মারকবক্তৃতা', ডাব্লিউভিএ, ২৬ জুন ২০১৫

হারুন-অর-রশিদ (বক্তৃতা), উপাচার্য, ডিরেক্টর ট্রেনিংয়ের আর্কাইভে সংরক্ষিত ভিডিও, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২ আগস্ট ২০১৫

হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৪

পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ আয়োজিত ৭ম মাসিক সভা, ঢাকা, ১৪ আগস্ট ২০১৮

হাশেম খান, *শিল্পীর স্কেচ খাতা*, 'মিসবাহউদ্দিন খান স্মারক বক্তৃতা- ১২',বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, ২০১৯

দলিলপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১

সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ঢাকা, ২০০০

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১), তথ্য মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২

ইংরেজি গ্রন্থ

Aleem-Al-Razee, *Constitutional Glimpses of Martial Law in India, Pakistan and Bangladesh,* University Press Limited, Dhaka, 1988

Golam Morshed, `Pakistan 1971 Elections and the liberation of Bangladesh : Apolitical Analysis', *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol, XI, 1988

Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947*, UPL, Dhaka, 2015, pp. 294-295

I.N. Mukherji, `Economic Development of Bangladesh : A Probe into viability' S.P. Varma & Virendra Narain (Ed.), *Pakistan Political System in Crisis, Emergence of Bangladesh,* Jaipur, 1972

Mohammad Asghor Khan, *General in Politics : Pakistan 1958-1981,* UPL, Dhaka, 1983

Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh,* University Press limited, Dhaka, 1986

Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics, Problem and Issues,* UPL, Dhaka, 1980

Pakistan : failure in national integration, Oxfort University Press, 1973

ওয়েবসাইট

zuddhodolil.com

bn.banglapedia.org/index.php?title=ওয়ালীউল্লাহ, _সৈয়দ

https://shahedarefin.blogspot.in/2015/01/chander-amabossa.html?m=1

এমফিল, পিএইচডি থিসিস

এ. কে. এম মোমিনুল ইসলাম, আব্দুল রসুল ও বাংলার রাজনীতি, এম.ফিল থিসিস (অপ্রকাশিত), ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা, ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও বাংলাদেশের কবিতা (১৯৬১-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০১৮

রওশন আরা, বাংলাদেশের কবিতায় স্বদেশচেতনার প্রকৃতি ও রূপান্তর (১৯৪৭-২০০০), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

আজিজুর রহমান মল্লিক, 'বাংলা একাডেমীর ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ, ১৯৮৩', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *বাঙালির আত্মপরিচয়*, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১১

আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মুনীর চৌধুরীর নাটক (প্রবন্ধ), *বাংলাদেশের নাট্য চর্চার তিন দশক*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত ও সংকলন), ১৯৯৯

আবুল ফজল, 'সাহিত্যের সংকট', *সমকাল*, ২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৫

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 'কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ– ১৯৫২, আগস্ট ২২', 'আমাদের কথা', পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্মারকপত্র, সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, খুলনা, ২০-২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আবদুল গণি হাজারী, 'সাহিত্যে বিপন্নবাদ', *মাসিক সওগাত*, অগ্রাহয়ণ, ১৩৫৯

আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'পঁচিশ বছরের ছোটগল্প : একটি আন্তর্জরিপ', আবদুল্লা আবু সায়ীদ (সম্পা.), *কণ্ঠস্বর*, ১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

আবদুল হক, 'রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি', *সমকাল*, ২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৬

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, 'লিটল ম্যাগাজিন আর ব্যবসা এক সঙ্গে হয় না', *দৈনিক ইত্তেফাক* (ইত্তেফাক সাময়িকী), ২২ জানুয়ারি ২০১১

আবদুল্লাহ জাহিদ, 'কিংবদন্তি ভাস্কর নভেরা', *প্রথম আলো*, ৫ মে ২০১৮

আমিনুল ইসলাম, 'বাঙালির দর্শন', শরীফ হারুন (সম্পা.), বাংলাদেশে দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

আহমদ রফিক, 'অক্টোবর বিপ্লবের সাহিত্যের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী', *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ৪ নভেম্বর ২০১৭

'আমি আর কবিতা লিখিনা', মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ ১৯৫৭

ইসরাইল খান, 'সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাহিত্য-সম্মেলন', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *সুন্দরম*, শীত সংখ্যা, ১৪০২

ঈসমাইল মোহাম্মদ, 'নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর', *সমকাল*, সিকান্দার আবু জাফর স্মৃতি সংখ্যা

এম সুলতান উল আলম, 'মুক্তিযুদ্ধের অবিস্মরণীয় দুটি মঞ্চ নাটক', *ইতিহাসের খসড়া*, বর্ষ-২, সংখ্যা-৪, মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা, ২০১৬

এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের রূপ*, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬

ওবায়দুল হক সরকার, 'নাট্য আন্দোলনের স্মরণীয় দিন', *দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার মুসলমানের আত্মপরিচয় (মধ্যযুগ)', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *বাঙালির আত্মপরিচয়*, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০১১

ওয়াহিদুল হক, 'কলম ছেগে গানে', মহিউদ্দিন আহম্মেদ (সম্পা.), *আমাদের একাত্তর : মুক্তিযুদ্ধ স্মারক গ্রন্থ*, সিডিএল, ঢাকা, ২০০৬

কবীর চৌধুরী, *থিয়েটার পত্রিকা*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৬

কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাঙালীর বাঙলা', *বাঙালি বাংলাদেশ*, ১৪০০ সাল উদ্যাপন পরিষদ, ঢাকা, ১লা বৈশাখ ১৪০০

কে, এম, মোহসীন, 'বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক দিক: ঐতিহাসিক পটভূমি', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৭৮-১৯৭৯

কণ্ঠস্বর, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

খান আতাউর রহমান, 'নবাব সিরাজদ্দৌলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব', উদ্ধৃত, মাহবুব আজাদ, *খান আতাউর রহমান* (জীবনী), ঢাকা, ২০০০

গোলাম মওলা, 'হারিয়ে যাওয়া ২২ ধনী পরিবার', *বাংলা ট্রিবিউন*, ৮ মে ২০১৭

উত্তরণ, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৬/ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৯

চৌধুরী শাহজাহান, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প॥ প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ ডিসেম্বর ২০১৮

জওশন আরা জলি, 'মানবতাবাদী দার্শনিক ধারা ও বাঙালি মানস', *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, সংখ্যা ২৩, রাজশাহী, ২০১৬, পৃ. ১৫২

জাহীদ রেজা নূর, 'রাজনৈতিক ভাষ্যকার : সিরাজদ্দীন হোসেন', *প্রথম আলো*, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩

'তার শিল্প ভুবন', *সংবাদ*, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯০

নজরুল ইসলাম, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ৫৮ বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ॥ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চবর্ষ পূর্তি উৎসব, স্মারকপত্র, সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, খুলনা, ২০-২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

ফারুক আলমগীর, *সংস্কৃতি সংসদ* (হেমন্ত, ১৩৭২)

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯', *মুক্তিযুদ্ধ : নির্বাচিত গল্প*, হারুন হাবীব (সম্পা.), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৪

বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, 'শিল্পী এস. এম. সুলতান : বাঙালিত্বের চেতনাধারী চিত্র লেখক', *আইবিএস জার্নাল*, অষ্টাদশ সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, মার্চ ২০১১

'বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন', *মাহে-নও*, বৈশাখ ১৩৫৬

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, 'মৌসুমী', *অবিচ্ছিন্ন*, ১৯৬০

মজিদ মাহমুদ, 'বাংলা কবিতায় সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ', *রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ : ২৬, সংখ্যা : ৬, রাজশাহী, এপ্রিল ২০১২

মতলুব আলী, 'জয়নুল আবেদিনের চিত্রশিল্পে দেশাত্মবোধ', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্তসংখ্যা ৬২-৬৩, ঢাকা

মহসিন শস্ত্রপাণি, 'কাগমারী সম্মেলন : পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্য', মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.) *কাগমারী সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ*, কাগামারী সম্মেলনের ৫০ বর্ষ পূর্তি কমিটি, ঢাকা, ২০১১

মানজারে হাসীন, 'বাংলাদেশের প্রামান্যচিত্রের চর্চা : ভারত ভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ', *ভোরের কাগজ*, ১১ নভেম্বর ২০০৫

মাহবুবউল আল চৌধুরী, *সাংস্কৃতিক আন্দোলন চট্টগ্রাম; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দেলন : প্রগতিশীল ধারা*, মাহবুব হাসান (সম্পা.), চট্টগ্রাম, ১৯৯১

মাহমুদ হাসান, 'সংস্কৃতি সংসদ: একটি ঐতিহ্য একটি আন্দোলন', *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর, ১৯৭০

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, 'চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ-১৩২৬', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *আমাদের বাঙালীত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৪

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৪০২

মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, 'শীলভদ্র : সপ্তম শতকের জগদ্বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ জুলাই ২০১৮

মুনতাসীর মামুন, 'কামরুল হাসানের স্মৃতি', *কামরুল হাসান*, আবুল হাসনাত (সম্পা.), *থিয়েটার*, ঢাকা, ১৯৯০

মো. সালা উদ্দিন, 'কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : একটি পর্যালোচনা', (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ)

মফিদুল হক, 'ষাটের দশকের সমাজ ও সঙ্গীত', *ওয়াহিদুল হক স্মারণিক মিলনোৎসব ২০১০*, *কণ্ঠশীলন*, ঢাকা, ২০১০

রহমান চৌধুরী, 'বাংলাদেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের নাট্য চর্চা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রত্রিকা*, ডিসেম্বর, ২০০২, বিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

রফিকুল ইসলাম, 'সাংস্কৃতিক মুক্তিযুদ্ধ', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ মার্চ ১৯৯৭ (স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা)

রাশেদ খান মেনন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সময়', আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *চোখের দেখা প্রাণের কথা*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা, ২০০৪

শাহমান মৈশান, 'সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ : ৫৩ সংখ্যা : ২, ঢাকা, ২০১৬

শেখ মেহেদী হাসান, 'শিল্পী ও বিপ্লবী সত্যেন সেন', *ইতিহাসের খসড়া*, বর্ষ-২, সংখ্যা-৪, মার্চ-এপ্রিল ২০১৬

শিখা সরকার, 'বাংলাদেশের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ', *রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ : ২৬, সংখ্যা : ৬, রাজশাহী, এপ্রিল ২০১২

সন্‌জীদা খাতুন, 'বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তি সংগ্রাম আর সংস্কৃতি সাধনা', *বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ২৪ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬

সা'দত আলী আখন্দ, 'বাঙালী', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *আমাদের বাঙালীত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ*, *প্রাগুক্ত*

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'রাষ্ট্র ও বাংলাভাষা', সুব্রত বড়ুয়া, ফরহাদ খান (সম্পা.), *অমর একুশে বক্তৃতা ১৯৮৫-৯৪*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

সুশান্ত সরকার, 'যাত্রা শিল্পের সংকট সমস্যার ক্ষেত্র ও বিষয় নির্দেশ', সৈকত আসগর (সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রা শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২

সৈদয় আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, 'জয়নুল আবেদিন', নিসার আলী, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, ২০১৬

সৈদয় আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, 'জয়নুল আবেদিনের বাংলাদেশ-সাধনা', মতলুব আলী, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, ২০১৬
সৈদয় আজিজুল হক, *জয়নুল আবেদিন জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, 'জয়নুল আবেদিনের স্মৃতি', আনিসুজ্জামান, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, ২০১৬
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'গুণের আগুন, গুণের জল', *প্রথম আলো*, ১৯ জুন ২০১৫
হামেদ আলী, 'বাসনা', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *আমাদের বাঙালীত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ*, *প্রাগুক্ত*
হাশেম খান, 'ছয় দফা সংবিধান এবং একটি পোস্টার', লুৎফর রহমান রিটন (সম্পা.), *নেপথ্য কাহিনী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

সাক্ষাৎকার

আলী ইমাম (৬৯), সাহিত্যিক, স্থান : নিজ বাসভবন, ধানমণ্ডি, ঢাকা, ২৪ অক্টোবর ২০১৯
আবদুর রশিদ (৭০), রাজশাহী আর্টস কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : নিজ বাসভবন, রাজশাহী, তারিখ : ৬ জুলাই ২০১৯
ইসরাইল খান, সংবাদ-সাময়িকপত্র গবেষক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মিরপুর ১৪, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫
কামাল লোহানী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মধুরিমা, বাড়ি নং ১১, রোড নং ১৩, ধানমণ্ডি, ঢাকা, ২৫ নভেম্বর ২০১৮
তৌফিকুল আলম টিপু, পিতা : আকবর হোসেন আকন্দ, জলেশ্বরীতলা, কালিমন্দির, বগুড়া সদর, বগুড়া, নিজ : বাসভবন, ১১ জুন ২০১৮
সৈয়দ দুলাল, সাংস্কৃতিক কর্মী, বরিশাল, ৫ অক্টোবর ২০১৮
মনোয়ার আলী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, খুলনা, ১ অক্টোবর ২০১৬
মো: মমরেজ আলী বয়াতী (৬৭), পিতা : মোহাম্মদ আলী শেখ, পেশা : গায়ক, গ্রাম : আগতেরিল্যা, ডাকঘর : ধুবলিয়া, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ১০ নভেম্বর ২০১৪
মো : সানু শেখ (৭৯), পিতা : জয়েন শেখ, পেশা : গায়ক, গ্রাম : আগতেরিল্যা, ডাকঘর : ধুবলিয়া, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ০৯ নভেম্বর ২০১৪
মো. আব্দুল কাদের মেম্বার (৭১), পিতা : শমসের আলী, পেশা : গায়ক, গ্রাম : পাছতেরিল্যা, ডাকঘর : ধুবলিয়া, উপজেলা : ভূঞাপুর, জেলা : টাঙ্গাইল, ০২ জানুয়ারি ২০১৪

পত্রিকা

দৈনিক আজাদ, ১ জানুয়ারি ১৯৪৯
৩ জানুয়ারি ১৯৪৯
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ (সম্পাদকীয়)
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ (সম্পাদকীয়)
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭
২৭ এপ্রিল ১৯৫৮
৪ ডিসেম্বর ১৯৫৮
৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০
২৯ মার্চ ১৯৬১
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
৬ ডিসেম্বর ১৯৬৩
২৮ মে ১৯৬৪
৯ জুলাই ১৯৬৪
১৬ অক্টোবর ১৯৬৪
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
১৮ মার্চ ১৯৬৬
৯ এপ্রিল ১৯৬৬
৩০ জুন ১৯৬৭
৯ ডিসেম্বর ১৯৬৮
১৫ জানুয়ারি ১৯৬৯
২২ জানুয়ারি ১৯৬৯
২৩ জানুয়ারি ১৯৬৯
২৬ মার্চ ১৯৬৯
১৩ মার্চ ১৯৭১
১৫ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ অক্টোবর ১৯৫৮
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯
২৫ জুন ১৯৬২
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
১৫ জানুয়ারি ১৯৬৪
১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪
৪ অক্টোবর ১৯৬৪
৭ নভেম্বর ১৯৬৪
২০ এপ্রিল ১৯৬৫
১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
২৬ এপ্রিল ১৯৬৬
১০ মে ১৯৬৬
১২ জুলাই ১৯৬৬
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
২৮ মার্চ ১৯৬৯
১৯ অক্টোবর ১৯৭০
১ নভেম্বর ১৯৭০
৪ মার্চ ১৯৭১
৫ মার্চ ১৯৭১
৬ মার্চ ১৯৭১
৯ মার্চ ১৯৭১
১০ মার্চ ১৯৭১
১৩ মার্চ ১৯৭১
১৬ মার্চ ১৯৭১
১৮ মার্চ ১৯৭১

পাকিস্তান অবজারভার, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
২ অক্টোবর ১৯৬৪
২৩ জুন ১৯৬৭
২৯ মার্চ ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

৪ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান, ২৪ জুন ১৯৬৭
২৫ জুন ১৯৬৭
২৯ জুন ১৯৬৭
২১ জানুয়ারি ১৯৬৯
১৯ নভেম্বর ১৯৭০
২ মার্চ ১৯৭১
৫ মার্চ ১৯৭১
১৩ মার্চ ১৯৭১
১৫ মার্চ ১৯৭১
১৭ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক দি পিপল, ১৭ মার্চ ১৯৭১
দৈনিক পূর্বদেশ ১৬ নভেম্বর ১৯৭০
দৈনিক মর্নিং নিউজ, ২১ এপ্রিল ১৯৬৬
১৮ জুন ১৯৬৭

দৈনিক সংবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭
২০ মার্চ ১৯৬৪
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
৯ জুন ১৯৬৬
১৮ মার্চ ১৯৬৭
২১ জুন ১৯৬৭
৪ নভেম্বর ১৯৬৮
২১ জানুয়ারি ১৯৬৯
২২ জানুয়ারি ১৯৬৯
২ নভেম্বর ১৯৭০
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
৬ মার্চ ১৯৭১
৭ মার্চ ১৯৭১
১০ মার্চ ১৯৭১
১১ মার্চ ১৯৭১
১২ মার্চ ১৯৭১
১৬ মার্চ ১৯৭১
১৭ মার্চ ১৯৭১

সাপ্তাহিক জনতা, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪
সাপ্তাহিক চিত্রালী, ৮ মে ১৯৭০
আমাদের বুধবার, ২৩ জুলাই, ২০১৪